2.1.75

পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা



অনুসন্ধান, সংকলন ও গ্রন্থনা অরুণ কুমার রায়
তত্ত্বাবধায়ক সুকুমার সিংহ

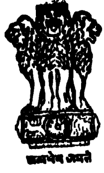
সম্পাদক অশোক মিত্র


পশ্চিমবঙ্গের
পূজা-পার্বণ ও মেলা

পি. আর. জি. ১৬৩ (বি) (iv) (এন)
১,০০০

অন্থ প্রেস, ৫১এ, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯, ভারত হইতে মুদ্রিত এবং দি কণ্ট্রোলার্ অব্ পাবলিকেশনস্, সিভিল লাইনস্, দিল্লী হইতে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত।

মূল্য : ১০ টা. ৫০ প. বা পা. ১.২৩ বা ৩ ড. ৭৮ সে.



ভারতের জনগণনা, ১৯৬১
পশ্চিমবঙ্গ
ভল্যুম্ ১৬, পার্ট ৭-বি

পশ্চিমবঙ্গের

পূজা-পার্বণ ও মেলা

চতুর্থ খণ্ড

অনুসন্ধান, সংকলন ও প্রস্তুনা
অরুণ কুমার রায়

তত্ত্বাবধায়ক
সুকুমার সিংহ

সম্পাদক
আশোক মিত্র

মানচিত্র : শ্রীজলধীভূষণ দাশগুপ্ত
ও
শ্রীসুবীর চট্টোপাধ্যায়

আলোকচিত্র : শ্রীঅরুণ কুমার রায়,
শ্রীরামকিংকর সিংহ, বাঁকুড়া
ও
আনন্দবাজার পত্রিকা

রেখাচিত্র : শিল্পী শ্রীজিতেন দাস

প্রচ্ছদপট
পরিকল্পনা
ও অঙ্কন : শিল্পী শ্রীজিতেন দাস
ও
শ্রীঅরুণ কুমার রায়

- পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
  প্রথম খণ্ড (প্রকাশিত)
- পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
  দ্বিতীয় খণ্ড (প্রকাশিত)
- পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
  তৃতীয় খণ্ড (প্রকাশিত)
- পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
  চতুর্থ খণ্ড (বর্তমান গ্রন্থ)
- পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
  পঞ্চম খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

ভূমিকা

'পশ্চিমবঙ্গ জনগণনা দপ্তর' থেকে পশ্চিমবঙ্গের উৎসব ও মেলা সম্পর্কে যে তালিকা তৈরী করা হয়েছিল তা প্রতিটি জেলায় পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট এবং জেলাবোর্ড কর্তৃপক্ষ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। সংগৃহীত তালিকা দুটির সমন্বয়ে কয়েকটি স্তম্ভে বিভক্ত একটি বিস্তীর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা হয়। যেমন—প্রতি জেলায় থানাওয়ারী মৌজা নম্বরসহ গ্রামের নাম, স্থানীয় নামে খ্যাত উৎসব ও মেলার নাম, ইংরাজী মাসানুসারে উক্ত উৎসব ও মেলার সময়কাল, স্থায়ীত্ব ও পরিশেষে লোকসমাগমের সংখ্যা দেওয়া হয়। এই ধরণের তালিকা সংগ্রহের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়ে একটি সার সংগ্রহ করা এবং বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশব্যাপী বিশেষ কোন উৎসব বা মেলার বিস্তৃতির চিত্র তুলে ধরা।

নানা বিরুদ্ধ কারণবশতঃ কতকগুলি চিরাচরিত ও প্রাচীন উৎসব ও মেলা আজ অবলুপ্ত হতে চলেছে। ঐ দ্রুত অপস্রয়মান উৎসব ও মেলাগুলি সম্বন্ধে এখনই স্থায়িভাবে নথী প্রস্তুত করতে না পারলে ভবিষ্যতে আর কোন দিনই সুযোগ পাওয়া যাবে না। এই প্রয়োজনে এবং পূর্ব প্রকাশিত পুস্তকটি যে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিল তা লক্ষ্য করে, জনগণনা দপ্তর এ বিষয়ে আরো বিশদ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন মনে করেন।

এই কর্তব্য সাধনে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করে কি উপায়ে বিস্তারিত প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে তার বিচার করা হয়। কেবলমাত্র সরকারী বা আধা সরকারী বিভিন্ন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর না করে প্রতিটি অঞ্চলের অধিবাসীর কাছে তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদন জানানো প্রথম প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। স্থির হয়, প্রথমতঃ প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নিকট, জেলার দৈনিক ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলির সম্পাদকের নিকট, যুব সংঘ, গ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গ্রাম ও শহরের গ্রন্থাগারগুলি, এমন কি ডাকবিভাগের পিওনদের নিকটও আবেদন জানানো হবে। প্রথমবারের তুলনায় এবারে তথ্য সংগ্রহের উপায় এইভাবে বহুলাংশে ব্যাপক করা হয়। বলাবাহুল্য, জেলাবোর্ড পঞ্চায়েত এবং আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট আবেদন জানানো হবে বলে স্থির করা হয়। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়ে একটি সুপরিকল্পিত প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে এমন একটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা যায় যা অর্থপ্রকাশে স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ আবেদনে পর্যাপ্ত, যার ফলে যে কোন সংবাদদাতার সম্মুখে এই প্রশ্নমালা উপস্থিত করলে তিনি সহজেই তাঁর ভাষায় স্থানীয় তথ্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পাবেন।

পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে এ বিষয়ে বারবার আলাপ আলোচনা করে চূড়ান্ত প্রশ্নমালা তৈরি করতে যথেষ্ট সময় ব্যয়িত হয়।

প্রশ্নমালা প্রস্তুতকালে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর সর্বদা লক্ষ্য রাখা হয়।

(ক) প্রশ্নগুলির ভাষা এমন সহজবোধ্য হবে যাতে প্রাথমিক শিক্ষাজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও বুঝতে অসুবিধা না হয়। অন্যপক্ষে ঐগুলির প্রয়োগ এমন ব্যাপক রাখা দরকার যাতে সকল প্রকার তথ্য আহরণ করা যায়। সম্পাদনাকালে অপ্রাসংগিক অংশ বাদ দিয়ে বিশদ তথ্যাদি সংরক্ষণে সযত্ন হতে হবে।

(খ) প্রশ্নগুলির সমন্বয়ে যেন যে গ্রামে বা স্থানে মেলা বসে বা উৎসব পালন করা হয়, সেই গ্রামের বা স্থানের পারিপার্শ্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকার চিত্র সুস্পষ্টভাবে আহরণ সম্ভব হয়।

(গ) পূজা বা পার্বণের যে সকল বিশিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান বা ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক বিশেষত্ব ফুটে ওঠে সেই সকল বৈশিষ্ট্যের উপর যেন এই প্রশ্নমালা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

(ঘ) প্রশ্নমালার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য এবং সুবিদিত উৎসবের বা মেলার তথ্যাদি ছাড়াও যেন স্বল্পখ্যাত অথচ গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ও মেলার তথ্য অন্বেষণও সম্ভব হয়। জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত উৎসবাদি ও মেলা ব্যতীতও অন্যান্য উৎসব বা মেলার বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই কারণে যে, অনুমোদিত উৎসব বা মেলার সংখ্যা সমস্ত উৎসব ও মেলার সংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য।

(ঙ) মেলা যে আয়তনেরই হোক না কেন প্রতিটির প্রকৃতি ও ক্রয়-বিক্রয়ের আয়তন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। আহৃত তথ্যের ভিত্তিতে সেই অঞ্চলের গ্রাম্য শিল্প, শিল্পের গতি ও গঠন পদ্ধতি, কাঁচা মালের গতি ইত্যাদি অনুধাবন করা সম্ভব হবে। এসব তথ্য ছাড়াও প্রশ্নমালা থেকে স্থানীয় জনপ্রিয় আমোদপ্রমোদের একটি তালিকা পাওয়া যাবে।

চূড়ান্ত প্রশ্নমালা তৈরি করতে বেশ কয়েক মাস সময় লেগে যায়। অতঃপর প্রশ্নমালা ছাপানোর পর পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রায় দশ সহস্র প্রশ্নমালা ডাকযোগে প্রেরিত হয়। এই আহ্বানে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সংখ্যায় এবং সহৃদয়তায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। পূরণ করা প্রতিটি ফর্ম পাওয়ার পর পরীক্ষা করা হয়েছে এবং যে সব ক্ষেত্রে আরও বিশদ বিবরণের প্রয়োজন মনে হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে আরও পত্রালাপের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

প্রথমে সংগৃহীত তথ্যাদি জেলা ও থানা বরাবর পৃথক করা হয়েছে। পরীক্ষা ও সত্যাসত্য নিরূপণের পর পরে সেগুলি আবার সংকলনের সুবিধার জন্য তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—

(ক) প্রশ্নমালার 'ক' বিভাগের তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রথম পর্বে গ্রাম, তার অধিবাসী, গ্রামবাসীর উপজীবিকা, যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং গ্রামের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারাবাহিক তথ্য ও বিবরণী দেওয়া হবে।

(খ) প্রশ্নমালার 'খ' বিভাগের তথ্যাদির ভিত্তিতে দ্বিতীয় পর্বে উৎসব, দেবদেবীর পূজা, বিশেষ করে অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য ও বিবরণী দেওয়া হবে।

(গ) প্রশ্নমালার 'গ' বিভাগের তথ্যাদির ভিত্তিতে মেলা ও সংশ্লিষ্ট আমদানি-রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয় ও আমোদ প্রমোদ সম্পর্কে তথ্য ও বিবরণী দেওয়া হবে।

উল্লিখিত পর্ব তিনটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধের সম্পূরক হিসাবে একটি বিস্তারিত সূচীপত্র এবং সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য বিষয়ে গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিশেষ উৎসব ও মেলা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ ও নথীপত্র থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হবে।

প্রচুর তথ্যাদি পাওয়া সত্ত্বেও অনুসন্ধানের পরে দেখা যায় যে, অনেক মেলা-পার্বণ বাদ পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন থানায় হয়তো মাত্র কয়েকটি উৎসব ও মেলা ছাড়া অন্য কোন উৎসব মেলার বিবরণী আসেনি। তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে, সংবাদ সংগ্রহে ফাঁক থেকে গেছে। অতএব, সারা বৎসরে এক একটি বিশেষ অঞ্চলে কোন কোন বিশেষ দেবদেবীর পূজাচার কিভাবে পালন করা হয় এবং সারাদেশব্যাপী ঐ সকল উৎসবাদির প্রসার সম্পর্কে সঠিক অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ডাকযোগে দ্বিতীয়বার একটি সমীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সংবাদদাতাদের নিকট প্রেরিত পত্রের নমুনা

পত্রসংখ্যা ১

তারিখ : ৯ই জুলাই, ১৯৫৭।

সবিনয় নিবেদন,

বিগত জনগণনার (১৯৫১ সাল) কার্যে সমগ্র দেশবাসীর নিকট হইতে আমাদের দপ্তর যে অকুণ্ঠ সাহায্যলাভ করিয়াছে, কৃতজ্ঞতার সহিত সর্বদাই আমরা তাহা স্মরণ করি। জনগণনার সারণী ও বিবরণী সমূহে আমরা আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপটিই তুলিয়া ধরিতে চেষ্টিত হইয়াছিলাম। এ বিষয়ে যতটুকু সাফল্য অর্জিত হইয়াছে তাহা আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রসাদগুণেই সম্ভব হইয়াছে; যতটুকু হয় নাই তাহা আমাদেরই অক্ষমতায়। আমাদের বিভিন্ন কার্যে আমরা সর্বদাই আপনাদের নিকট হইতে উদার ও অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতা পাইয়া থাকি; ইহা আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য। নিজের দেশকে প্রকৃতভাবে বুঝিবার ও জানিবার জন্য আজ সকলেই যে আগ্রহান্বিত, ইহা তাহারই অভ্রান্ত পরিচয়।

১৯৫১ সালের জনগণনার পরে "পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পরবের" একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আসন্ন হওয়ায় সুধী ও বিদ্বৎজনেরা অনেকেই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, যেন দ্বিতীয় সংস্করণে পশ্চিমবঙ্গে উপাসিত দেবদেবী এবং তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব, মেলা ও পরবের বিশদ বর্ণনা ও বিবরণী এই পুস্তকে স্থান পায়। বলাবাহুল্য, ইহা করিতে পারিলে পুস্তকখানির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হইবে, এবং সুধী ও বিদ্বৎ সমাজে এবং সাধারণভাবে দেশবাসীর নিকট ইহা সমাদৃত হইবে। একান্ত প্রয়োজনীয় এই দায়িত্ব পালনে আমরা ব্রতী হইয়াছি। এতদ্‌সংলগ্ন প্রশ্নপত্রটি এই উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে।

এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে বিপুল তথ্যরাজি সংগ্রহ আবশ্যক। বলা বাহুল্য, সরকারের পক্ষ হইতে নিযুক্ত কর্মচারী মারফত তাহা সম্ভব নয়। কারণ, সত্যনিষ্ঠার সহিত এই ধরণের তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার একান্ত প্রয়োজন; ইহা ছাড়া প্রয়োজন স্ব স্ব গ্রাম ও অঞ্চল সম্পর্কে প্রগাঢ় মমতা ও একাত্মবোধ এবং তাহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতনতা। এগুলির অভাবে সংগৃহীত তথ্য কোন ক্রমেই সম্পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। আমাদের বিচারে, সত্যনিষ্ঠ এই তথ্যসংগ্রহ শুধু মাত্র আপনাদের মত ব্যক্তিরাই করিতে পারেন। আমরা জানি, নিজের দেশের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার কাজে নানারকম কষ্ট স্বীকার করিয়াও বিনা পারিশ্রমিকে আপনারা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বিমুখ নন। আপনাদের কাছে আমরা যে নিষ্ঠা, সততা ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণী আশা করি, তাহা অল্প সময়ের জন্য স্বল্প বেতনে নিযুক্ত কর্মচারীদের নিকট হইতে আশা করা যায় না।

আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনি যদি সংলগ্ন প্রশ্নপত্রটি যথাসাধ্য পূরণ করিয়া ফেরত পাঠান, তবে এই কার্যে বিশেষ সহায়তা হইবে। মুদ্রিত প্রশ্নগুলি ছাড়াও আপনি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অন্যান্য তথ্য যোগ করেন, তাহার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। এক দফায় সম্ভব না হইলে, দুই তিন দফাতেও তথ্য প্রেরণ করিতে পারেন। সংলগ্ন খামটিতে উত্তরসহ প্রশ্নপত্রগুলি পাঠাইবেন, তাহা হইলে আপনাকে ডাক মাশুল দিতে হইবে না।

আপনার সংগৃহীত তথ্য পুস্তিকায় সন্নিহিত করিবার সময় আমরা আপনার নাম ঠিকানা প্রকাশ করিয়া ঋণ স্বীকার করিব। আশা করি আপনার আপত্তি হইবে না। অনুগ্রহপূর্বক পত্রপ্রাপ্তির পক্ষকালের মধ্যে উত্তর পাঠাইলে বাধিত হইব। ইতি—

প্রশ্নমালার উত্তর প্রসঙ্গে

১। উত্তর লিখিতে শুরু করিবার আগে প্রশ্নমালাটি আগাগোড়া একবার পড়িয়া নিলে ভালো হয়।

২। প্রত্যেকটি প্রশ্নের ডান দিকের খালি অংশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া কালিতে উত্তর লিখিতে হইবে। যে সব প্রশ্নে কিংবদন্তী, ইতিহাস, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তৃত উত্তর চাওয়া হইয়াছে স্বভাবতঃই ডানদিকের খালি অংশে সেইগুলির উত্তরের স্থান সংকুলান হইবে না। সেই কারণে প্রশ্নমালার শেষে ৪, ৫ ও ৬ নং পৃষ্ঠা খালি রাখা হইয়াছে। প্রশ্নসংখ্যার উল্লেখপূর্বক এই প্রশ্নগুলির উত্তর এই তিনটি পৃষ্ঠাতে লেখাই যুক্তিসঙ্গত হইবে। প্রয়োজন হইলে সমান মাপের সাদা কাগজ যুক্ত করিয়া পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করাও চলিবে।

৩। আমরা আশা করি উত্তরদাতারা সকলেই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার জন্য চেষ্টিত হইবেন। উত্তরগুলি যাহাতে সত্যনিষ্ঠ এবং যথাযথ হয় সেদিকে বিশেষভাবে সজাগ থাকিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

৪। কোনো কারণে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর না হইলে, উত্তরদাতাদের নিকট হইতে আমরা অন্ততঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নসংখ্যাগুলির উত্তর অবশ্যই আশা করিব :

২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮।

৫। উত্তর সংগ্রহ কাজ সম্পন্ন করিতে স্বভাবতঃই কিছু সময় লাগিবে। আমরা আশা করি প্রশ্নমালা পাইবার পর অনধিক পক্ষকালের মধ্যে উত্তরগুলি লিখিয়া এটি ফেরত পাঠানো সম্ভব হইবে। মুদ্রিত প্রশ্নমালার বাহিরে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্যাদি থাকিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। উৎসব, পার্বণ বা মেলার প্রত্যক্ষ বিবরণীসমূহ একদফায় সম্ভব না হইলে দুই তিন দফায় পাঠানো চলিবে। প্রশ্নমালাটি যত্ন করিয়া রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে ; কারণ ময়লা হইলে বা ছিঁড়িয়া যাইলে উহা হইতে উত্তরের পাঠোদ্ধার ও সংকলন খুবই দুরূহ হইবে।

৬। উত্তর লেখা শেষ হইলে সংলগ্ন খামটিতে উত্তরসহ প্রশ্নমালাটি ফেরত পাঠাইতে হইবে। খামে সেন্সাস অফিসের ঠিকানা ও ডাক মাশুল দেওয়া আছে।

[প্রশ্নমালাটি ১১নং পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।]

সংবাদদাতাদের নিকট প্রেরিত পত্রের নমুনা

পত্রসংখ্যা ২

তারিখ : ১৮ই মার্চ, ১৯৫৮।

সবিনয় নিবেদন,

পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাস দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হইয়াছে। সংগৃহীত তথ্যাদি সেন্সাস দপ্তর হইতে প্রকাশিতব্য একটি পুস্তকে সংকলিত করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ সম্পর্কে সামগ্রিক চিত্র পাইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি গ্রামে সারা বৎসরে কি কি পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। আপনার ডাকঘরের ইউনিয়নের অধীনে যে গ্রামগুলি আছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে সারা বৎসরে কি কি পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা যদি আপনার ডাকঘরের ইউনিয়নের কর্মীদের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া আমাদের জানাইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা একান্ত বাধিত হইব।

পর পৃষ্ঠায় আমরা পূজা-পার্বণের একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট করিতেছি। বলা বাহুল্য, এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে এবং ইহার বহির্ভূত বহু পূজা-পার্বণ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন গ্রামে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক একটি গ্রামে যে যে, পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেগুলি আমাদের প্রদত্ত এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত, সেগুলির ক্ষেত্রে সেই সেই গ্রামের নামোল্লেখ পূর্বক তালিকা অনুযায়ী পূজা-পার্বণগুলির ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ করিলেই চলিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি 'ক' গ্রামে 'শ্রীপঞ্চমী', 'বিশ্বকর্মা', 'নাগপঞ্চমী' পূজা বা উৎসব পালিত হয় তবে 'ক' গ্রামের নাম লিখিয়া তাহার কক্ষে ৬১।৩৯।২৯ লিখিলেই চলিবে। তালিকায় নাই, এমন পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হইলে অনুগ্রহ করিয়া পরিস্কারভাবে উহার নামটি লিখিয়া দিবেন। পূজা-পার্বণের নামগুলি লিখিবার সময় প্রত্যেকটির পাশে যে মাসে উহা অনুষ্ঠিত হয় যদি তাহার উল্লেখ করিতে পারেন, তাহা হইলে খুবই ভালো হয়। একান্ত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক এবং নিত্যনৈমিত্তিক পূজা-পার্বণগুলির উল্লেখ না করাই বাঞ্ছনীয় হইবে।

এতদ্‌সংলগ্ন পোষ্টকার্ডটিতে উক্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া ফেরত পাঠাইলে, আপনাকে ডাক মাশুল দিতে হইবে না। উত্তর লিখিবার সময় জেলা ও থানার নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি গ্রামের পূজা-পার্বণগুলি সম্পর্কে উপরিউক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিলে, আমাদের এই গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ হইবে; এবং উহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হইবে। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই তথ্য সংগ্রহ সম্ভব নহে। আমরা জানি, নিজ নিজ কর্তব্যকর্মে সবিশেষ ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, নিজের দেশের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার এই প্রচেষ্টায় নানারকম কষ্ট স্বীকার করিয়াও বিনা পারিশ্রমিকে আপনারা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বিমুখ হইবেন না। এ বিষয়ে আপনাদের এই কষ্ট ও যত্ন স্বীকার আমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিব। অনুগ্রহ করিয়া পত্রপ্রাপ্তির পক্ষকালের মধ্যে উত্তর পাঠাইলে বাধিত হইব। ইতি—

পূজা-পার্বণের তালিকা

১। অনন্তচতুর্দশী
২। অন্নপূর্ণা
৩। অক্ষয়তৃতীয়া
৪। অম্বুবাচী
৫। আদিবাসী উৎসব
(উৎসবের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
৬। ইদলফেতর
৭। ইদুজ্জোহা
৮। ইন্দ্র
৯। উত্তরায়ণ
১০। কার্তিক
১১। গঙ্গা (জাহ্নবী)
১২। খ্রীষ্টান উৎসব
(উৎসবের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
১৩। গণেশপূজা
১৪। গম্ভীরা
১৫। গন্ধেশ্বরী
১৬। গাজন
১৭। গোষ্ঠাষ্টমী
১৮। গৌরী
১৯। চড়ক
২০। চণ্ডী
২১। জগদ্ধাত্রী
২২। জুমাৎ-উল-ভিদ
২৩। ঝাঁপান
২৪। ঝুলনযাত্রা
২৫। দশহরা
২৬। দোলযাত্রা
২৭। দুর্গা
২৮। ধর্মরাজ
২৯। নাগপঞ্চমী
৩০। নারায়ণ
৩১। নীল
৩২। পদ্মা
৩৩। পীরের উৎসব
(পীরের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
৩৪। পৌষ সংক্রান্তি (মকর সংক্রান্তি)
৩৫। ফতেহা-দোয়াজ-দাহাম
৩৬। বারুণী
৩৭। বাসন্তী
৩৮। বিশালাক্ষী
৩৯। বিশ্বকর্মা
৪০। বিষহরি
৪১। বিষ্ণু
৪২। বৈশাখী পূর্ণিমা
৪৩। ব্রহ্মা
৪৪। ভীম একাদশী
৪৫। ভাতৃদ্বিতীয়া
৪৬। মনসা
৪৭। মহরম
৪৮। মাঘী পূর্ণিমা
৪৯। মাঘোৎসব
৫০। রটন্তীচতুর্দশী
৫১। রথযাত্রা
৫২। রাখী পূর্ণিমা
৫৩। রামনবমী
৫৪। রাস
৫৫। লক্ষ্মী
৫৬। শনি
৫৭। শিব (যে নামে উপাসিত, তাহার উল্লেখ করিতে হইবে)
৫৮। শিবরাত্রি
৫৯। শীতলা
৬০। শ্যামা
৬১। শ্রীপঞ্চমী (সরস্বতী)
৬২। ষষ্ঠী
৬৩। সত্যনারায়ণ
৬৪। সাধুসন্তের আবির্ভাব বা তিরোধান উৎসব
(সাধুসন্তের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
৬৫। সবেবরাত
৬৬। স্নানযাত্রা
৬৭। সূর্য্য
৬৮। ক্ষেত্রপাল

পশ্চিমবঙ্গের উৎসব পার্বন ও মেলা

প্রশ্নমালা

গ্রামের নাম :
মৌজা :

থানা :
জেলা :

ক। গ্রাম বিবরণী :

১। গ্রামের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো ইতিহাস বা কিংবদন্তী জড়িত থাকিলে তাহার বিবরণী দিন।

২। গ্রামে কোন কোন জাতির বাস? কতোগুলি পাড়া আছে? ঘর বা জনসংখ্যা হিসাবে পাড়াগুলিকে ক্রমিকভাবে উল্লেখ করুন। প্রধান উপজীবিকা কি কি?

৩। গ্রামে যাইবার প্রধান পথ কি? নিকটবর্তী রেলস্টেশন, মোটর ও নৌকা চলাচল ব্যবস্থার উল্লেখ করুন।

খ। পূজা-পার্বণ ও উৎসবের বিবরণী :

৪। উৎসবের নাম, উপলক্ষ ও সময়কাল।

৫। কতোকালের প্রাচীন উৎসব? কোনো ইতিহাস বা কিংবদন্তী থাকিলে তাহার বিবরণী দিন। উৎসবটি কি নির্দিষ্ট গ্রাম ও এলাকা বা জাতি ও শ্রেণীর নিজস্ব বিশেষ উৎসব? না, সমগ্র জেলা বা অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব?

৬। দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে হইলে দেবদেবীর নাম ও মূর্তির বর্ণনা (ধ্যান জানা থাকিলে ধ্যান উদ্ধৃত করুন): গ্রামের সাধারণের দেবদেবী, না ব্যক্তিবিশেষের দেবদেবী? মন্দির বা স্থান আছে? থাকিলে তাহার মোটামুটি বর্ণনা। মূর্তি না থাকিলে উপাস্য দেবদেবীর স্বরূপ কি? শক্তি হইলে তাঁহার ভৈরব কে, এবং কাছেপিঠে তাঁহার স্থান কোথায়? শিব হইলে তাঁহার প্রকাশ কি? গ্রামে কয়টি পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসা প্রভৃতি আছেন।

৭। উৎসবের উপলক্ষ কি কোনো সাধুসন্ত বা পীরের আবির্ভাব বা তিরোধান? সাধু বা পীরের জীবনী, ধর্মপ্রচার, তাঁহার সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী বা ইতিহাসের বিবরণী দিন।

৮। পূজা বা উৎসব কবে হইতে শুরু হয়, কতোদিন ধরিয়া চলে? উহার প্রস্তুতি কবে হইতে শুরু হয়—প্রস্তুতির মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহার উল্লেখ করুন। প্রত্যেক দিনের পূজা বা উৎসব পদ্ধতির ধারাবাহিক বিবরণী দিন। সমগ্র পূজা বা উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? সর্বজনীন ভোজ, অন্নসত্র বা প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির আয়োজন হয় কি?

৯। মানত দেওয়া হইলে সাধারণতঃ কি কি মানত দেওয়া হয়? বলি দেওয়া হইলে কি কি পশুপাখী বলি দেওয়া হয়? কি ভাবে এবং উৎসবের কোন সময়ে বলি দেওয়া হয়?

১০। পূজা বা উৎসবের প্রধান সেবায়েত বা ভক্ত কোন সম্প্রদায় বা জাতির লোক? পূজারীর বর্ণ, গোত্র ও পদবী কি?

১১। হিন্দু দেবদেবীর পূজা হইলে অহিন্দুরা অংশ গ্রহণ করে? অহিন্দু উৎসব হইলে হিন্দুরা অংশ গ্রহণ করে? মোটামুটি সংখ্যা কতো?

১২। পূজা বা উৎসব উপলক্ষে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীর আগমন হয়? কারণ কি?

গ। মেলা বিবরণী :

১৩। মেলা বসে কোথায়? কয় বিঘা জমিতে বসে? কাহার জমি—জমিদারের না উপাস্য দেবতার? দান, তোলা প্রভৃতি আদায় করা হয়? মেলা সকালে বসে না বিকালে বসে? নির্দিষ্ট এই স্থানটিতে মেলা বসিবার কারণ কি?

১৪। কতোদিনের প্রাচীন মেলা? কতোদিন ধরিয়া চলে? কতো লোক আসে? প্রধানতঃ কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোক আসে? আশপাশের কোন কোন গ্রাম বা ইউনিয়ন হইতে লোক আসে? সর্বাপেক্ষা দূরের যাত্রী কোথা হইতে এবং কতো আসে? পুরুষ ও নারীর মোটামুটি সংখ্যা কতো? যাত্রীরা প্রধানতঃ কি কি যানবাহনে আসে?

১৫। মেলায় জিনিসপত্র বিক্রেতারা প্রধানতঃ কোন কোন স্থান হইতে আসে? তাহারা কি প্রতি বৎসরই আসে? কি কি জিনিস বেশি আসে?

১৬। মেলায় কতোগুলি দোকানপাট বসে? খোলা জায়গায় কতো লোক বসে? ফেরিওয়ালার সংখ্যা কতো?

১৭। সমস্ত দোকানপাট ও ফেরিওয়ালার মধ্যে কতোগুলি :

(ক) খাবারের দোকান—ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবার।

(খ) বাসনকোসনের দোকান—তামা, পিতল, লোহা, কাঁচ, মাটি ইত্যাদি।

(গ) মনিহারী দোকান—লণ্ঠন্, টর্চলাইট, আয়না, চিরুনি, অন্যান্য রকমারী জিনিসপত্র।

(ঘ) ঔষধপত্রের দোকান—কবিরাজি, হাকিমী, টোট্‌কা প্রভৃতি।

(ঙ) বই, ছবি, পুস্তিকা প্রভৃতির দোকান—কি ধরনের বই, ছবি ও পুস্তিকার প্রচলন বেশি?

(চ) কাপড়চোপড়ের দোকান—মিল, তাঁত, কাটা-কাপড়, লুঙ্গি, গামছা, সতরঞ্চ, তৈরী পোযাক ইত্যাদি।

(ছ) কৃষি বা কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান—কি কি যন্ত্রপাতি? গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয় হয় কি?

(জ) শিল্প সামগ্রী বা কারুশিল্পের দোকান—তাঁতের তৈরী জিনিসপত্র, বেত, চ্যাঙারী, ধামা, কুলো, মাটির পুতুল বা হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, পাত্র, বাঁশেরজিনিস, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জিনিসপত্র। এগুলি প্রধানতঃ কোন কোন অঞ্চলের বা গ্রামের? ইহারা কি প্রতি বৎসরই আসে?

(ঝ) অন্যান্য দোকান।

১৮। মেলায় আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা কি? খেলাধূলা, নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, জুয়া, লটারী, যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, জলসা ইত্যাদির বিবরণী দিন। যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান ও অন্যান্য গান-বাজনার বিষয়-বস্তু কি? কাহাদের দল, কোথা হইতে আসে? গ্রামের কোনো নিজস্ব দল আছে? অধিকারীর নাম ও ঠিকানা। পালা বা গান সংগ্রহ করিয়া পাঠানো সম্ভব? প্রতিবার কি একই লোক আসে? কতো লোক দেখে বা শোনে?

১৯। উৎসব উপলক্ষে মাদকদ্রব্য পান কি কোনো প্রয়োজনীয় ধর্মাচার?

২০। অন্যান্য মন্তব্য।

অশোক মিত্র

অন্বীক্ষা

'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' (চতুর্থ খণ্ড) শীর্ষক বর্তমান গ্রন্থে বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলার বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ ও মেলা সম্পর্কে আহৃত এবং অনুসংহিত তথ্য সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রাথমিক তথ্য কেবল ধর্ম, সংস্কার, লোকাচার, দেবদেবীর উপাখ্যান, আরাধনা ও পূজার উপচার, মেলার উপলক্ষ, সময়কাল, লোকসমাগম প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোকপাত করা ছাড়াও, গবেষক সমাজ-বিজ্ঞানীর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে পরোক্ষ আরও অনেক মূল্য বহন করবে। এর আগে 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' (তৃতীয় খণ্ড) নামে প্রকাশিত গ্রন্থে 'অবতরণিকা ও অবেক্ষা' শীর্ষক আলোচনায় চব্বিশ-পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার পূজা-পার্বণ ও মেলাভিত্তিক তথ্যের এক সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে তার মূল্যমান নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছিলাম।

গ্রামে ও শহরে বসবাসকারী জনসাধারণের জীবনযাত্রা, মূল্যবোধ, মানসলোক, সমাজ-জীবন প্রভৃতির স্বরূপ ও প্রকৃতি ভিন্ন হলেও, পথঘাট, যানবাহন ও ভাব আদানপ্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগব্যবস্থার নানা ধরনের উন্নতি ও প্রসারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মানুষের ব্যবধান বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস। এই পরিপ্রেক্ষিতজনিত প্রতিবেশে ঐতিহ্য, সংস্কার এবং বিশ্বাসের ভিত্তিমূল আদৌ শিথিল হয়েছে কিনা এবং না হয়ে থাকলে, পরিবর্তনবিমুখতার কারণ নির্ণয় করার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। ১৯৬০-৭০ দশকে পশ্চিমবঙ্গে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত এই আগ্রহকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। সমাজ-কাঠামোতে এক দ্রুত পরিবর্তন আনার তাগিদে বিভিন্ন মত ও পথের বিভেদ এবং নীতিগত বিরোধ ও সংগ্রাম, শান্তি ও শৃংখলাবোধের ক্রমাবনতি, ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে মতানৈক্য ও পার্থক্যের পরিণামহেতু বলপ্রয়োগ ও হিংসার আশ্রয়, ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির প্রত্যাশিত লক্ষমাত্রায় উপনীত না হতে পারার ব্যর্থতায়, ক্ষোভে ও হতাশায় পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যখন দিশাহারা হয়ে উঠেছিলেন, তখন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বার্তা ও কার্যক্রম বাস্তবানুগ কিনা, তৃতীয় খণ্ডের বিশ্লেষণী নিবন্ধটিতে তার আলোচনা করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, বর্তমানে প্রকাশমান চতুর্থ খণ্ডের এই গ্রন্থে বিবৃত তথ্যের ভিত্তিতে বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় গ্রামের ও শহরের মানুষের

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকে নিয়ে আলোচনা করার পর, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার গতিশীলতার সংগে ঐ জীবনের ছন্দ প্রতিসম কিনা পরীক্ষা করা যেতে পারে।

ভূসংস্থান ও ভূমিবৃত্তির দিক থেকে বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য দুইই লক্ষ্য করার মত। গাঙ্গেয় নিম্ন উপত্যকার পশ্চিমাঞ্চলে রাঢ় নামে পরিচিত ভূখণ্ডের মধ্যে দুইটি জেলার অবস্থান। আয়তনে এই রাজ্যের অন্যান্য জেলার সংগে তুলনামূলক বিচারে, বাঁকুড়া ও বীরভূম যথাক্রমে চতুর্থ ও নবম স্থান অধিকার করে আছে। সারা রাজ্যের মোট আয়তনের ১৩ শতাংশ জমি এই দুইটি জেলার মধ্যে বিস্তৃত। জনসংখ্যার ভিত্তিতে (১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী) বিভিন্ন জেলার মধ্যে বাঁকুড়া ও বীরভূমের স্থান যথাক্রমে নবম ও একাদশ। পশ্চিমবঙ্গের ৮·৬ শতাংশ জনসংখ্যা জেলাদ্বয়ে বাস করেন। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় জনবসতিপূর্ণ ও জনবসতিহীন গ্রামের (মৌজার) সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৮২৬ এবং ২,৪৭২ ; অর্থাৎ রাজ্যের ১৫·২ শতাংশ গ্রামের অবস্থিতি দুইটি জেলার মধ্যে সীমিত। আয়তনে সারা রাজ্যের গ্রামীণ ভূখণ্ডের ১৩·২ শতাংশ জমি বাঁকুড়া ও বীরভূমের মোট ৬,২৯৮টি মৌজায় (জনবসতিপূর্ণ এবং জনবসতিহীন) পরিব্যাপ্ত এবং রাজ্যের ১০·৬ শতাংশ মানুষ দুইটি জেলার ৫,৭৩৮টি জনবহুল গ্রামে (মৌজায়) বাস করেন। বাঁকুড়ায় পাঁচটি এবং বীরভূমে ছয়টি শহর পশ্চিমবঙ্গের মোট শহরের এক অকিঞ্চিৎকর (৪·৯ শতাংশ) অংশ অধিকার করে আছে। সমগ্র রাজ্যের পৌরাঞ্চলীয় মোট আয়তনের ৫·৭ শতাংশ স্থান জেলাদ্বয়ের এগারটি শহরের এলাকাধীনে থাকলেও, রাষ্ট্রের মোট শহরবাসী লোকসংখ্যার মাত্র শতকরা ২·৫ অংশ দুইটি জেলার শহরাঞ্চলে বসবাস করেন। জেলা দুইটির গ্রামীণ প্রকৃতিকেও অনুরূপ সংখ্যাসূচকের সাহায্যে বোঝা যাবে। পশ্চিমবাংলায় যেখানে প্রতি দশহাজার মানুষের মধ্যে ৭,৫২৫ জন লোক গ্রামে বাস করেন, সেখানে একই মাপকাঠিতে দেখা যাচ্ছে প্রতি দশ হাজারে ৯,২৭৩ জন মানুষ বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা।

পশ্চিমবাংলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে গ্রামাঞ্চলে গড়ে ৩৮৮ জন এবং শহরাঞ্চলে ৫,৬২৮ জন লোকের বসতি। আলোচ্য জেলা দুইটির যৌথহিসাবে দেখা যাচ্ছে, প্রতি বর্গ-কিলোমিটার গড়ে ৩১২ জন গ্রামে এবং ২,৪৬৯ জন মানুষ শহরে থাকেন। রাজ্যে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে যথাক্রমে ৯৪২ ও ৭৫১। বাঁকুড়ায় ও বীরভূমে গ্রামে ও শহরে প্রতি হাজার পুরুষের হিসাবে নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৯৬১, ৯৭৪, ৯২০ ও ৮৯৩। ১৯৬১-৭১ দশকে রাজ্যের গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা গড়পড়তা বার্ষিক শতকরা ২·৬ ও ২·৮ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাঁকুড়ায় ও বীরভূমে প্রতি বছর গড় হিসাবে প্রতি হাজার মানুষের মধ্যে গ্রামে যথাক্রমে ২২ ও ২৩ এবং শহরে (দুইটি জেলাতেই) ২৪ জন লোককে অতিরিক্ত দেখা গিয়েছে।

অন্যান্য জেলার মত বাঁকুড়ায় ও বীরভূমে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি বাস করলেও, জনগণনার সময় কেবল তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতির হিসাব গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ঐ তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি দশ হাজার মানুষ পিছু বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় যথাক্রমে ২,৮২২ এবং ৩,০০০ জন তপশীলী জাতির মানুষ দেখতে পাওয়া যাবে। দুইটি জেলার তপশীলী জাতির লোকসংখ্যা সমগ্র রাজ্যের তপশীলী জাতিভুক্ত জনসংখ্যার ১২.৫ শতাংশ। আবার অন্য দিকে, তপশীলী উপজাতির লোকসংখ্যা বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার সামগ্রিক জনসংখ্যার যথাক্রমে শতকরা ১০.৩ ও ৭.১। যুগ্মহিসাবে সারা পশ্চিমবাংলার তপশীলী জাতি ও উপজাতির লোকসংখ্যার শতকরা ১৩.২ অংশ বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার নিবাসী। স্বতন্ত্র আর একটি হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দুইটি জেলার মিলিত লোকসংখ্যার শতকরা ৩৮.৫ এবং ৩৭.১ অংশ যথাক্রমে তপশীলী জাতি এবং তপশীলী উপজাতিভুক্ত।

জেলা দুইটিতে কর্মরত জনগণের ৮০.৪ শতাংশ কর্মী কৃষক এবং কৃষিমজুররূপে চাষবাসের কাজে নিযুক্ত। শিক্ষা মানুষকে লোকায়ত দৃষ্টিভংগী দেয় কিনা অথবা মানুষকে যুক্তিবাদী করে তুলতে কতটা সাহায্য করে, সে প্রশ্ন এই মুহূর্তে তুলছি না। কিন্তু সাক্ষর মানুষ নিরক্ষরতার অসমর্থ দুর্বলতা থেকে যে অনেক মুক্ত, এ কথা সকলেই মেনে নেবেন। প্রতি হাজার মানুষের মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় ২৬৮ জন ও বীরভূম জেলায় ২৬৬ জন লোক সাক্ষরতার দাবী করতে পারেন অর্থাৎ সাক্ষরতার মানদণ্ডে জেলা দুইটির মধ্যে সাধারণভাবে প্রভেদ খুবই সামান্য। আবার তুলনামূলক বিচারে নারীশিক্ষার প্রসারও অপেক্ষাকৃত কম। কারণ সংখ্যার মাপকাঠিতে পুরুষের তুলনায় সাক্ষরতার ক্ষেত্রে নারীরা অনগ্রসর বলেই বিবেচিত হ'বেন। ১৯৭১ সালে প্রতি হাজার নারীর মধ্যে বাঁকুড়ায় ১৪৫ জন এবং বীরভূমে ১৭৪ জন মহিলা সাক্ষর বলে গণ্য হবেন। সাক্ষরতার হিসাবের মধ্যে অবশ্য পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়ের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন মানের শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষও আছেন।

পূজা-পার্বণ ও মেলার তথ্যের আলোচনায় বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী জনগণের সংখ্যা জানারও প্রয়োজন আছে। ১৯৭১ সালের জনগণনার হিসাব পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, বাঁকুড়া ও বীরভূমের জনসাধারণের মধ্যে শতকরা যথাক্রমে ৯০.৯ জন এবং ৭০.৬ জন হিন্দু। বীরভূমে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা যথেষ্ট বেশী (বাঁকুড়ার ও বীরভূমের জনসংখ্যার যথাক্রমে শতকরা ৪.৯ ও ২৯.২ অংশ মুসলমান)। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় প্রতি দশ হাজার মানুষের মধ্যে যথাক্রমে ১২ জন ও ১৮ জন খ্রীষ্টান, একজন শিখ (উভয় জেলাতেই) এবং তিন জন ও পাঁচ জন জৈনের সন্ধান পাওয়া যাবে। অন্যান্য ধর্মমত অনুসরণ করেন এমন লোকের সংখ্যা বীরভূমে সামান্য কিন্তু বাঁকুড়ার জনসংখ্যার প্রায় ৪.১ শতাংশ। তপশীলী উপজাতিভুক্ত জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী লোকসংখ্যার হিসাব ১৯৭১-এর আদমসুমারীতে কত এখনও প্রকাশিত হয়নি। ১৯৬১ সালের জনগণনার হিসাব থেকে দেখা যায় যে, তপশীলী উপজাতিভুক্ত বসবাসকারী বীরভূম জেলায় গ্রামাঞ্চলে ১০৫,৫০০

লোকের মধ্যে ৫২২ জন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী এবং ৩১ জন সাঁওতাল ধর্মে বিশ্বাসী। অন্যদিকে বাঁকুড়া জেলায় ১৭৩,৩৮৯ জন তপশীলী উপজাতির লোকসংখ্যার মধ্যে ১,৩১৬ জন খ্রীষ্টের উপাসক, ৬৪১ জন মারাংব্রুরু ধর্মে বিশ্বাসী, ২৯,১১৯ জন সারিধর্মাবলম্বী হ'লেও সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকই হিন্দু বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন।

মোটামুটি একটা পরিচয় জেলা দুইটির লোকেদের বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। জেলা দুইটি প্রধানতঃ গ্রামভিত্তিক। শহরের পত্তন যা হয়েছে তার সংখ্যা, আয়তন এবং লোকসংখ্যার দিক থেকে সামান্য। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে বৃটিশ শাসনের সময় প্রধানতঃ প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই নয়টি শহর গড়ে উঠেছিল। কোন বড় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়নি জেলা দুইটিতে। কাজেই অর্থনীতির বনিয়াদ কৃষিভিত্তিক এবং গ্রামীণ। শহরের সংখ্যা কম বলে, গ্রামের মানুষের পক্ষে নিজেদের গণ্ডীর বাইরে যাবার প্রয়োজন বড় একটা হয় না। সুতরাং গ্রামের জীবনে শহরের প্রভাব খুব বেশী বলে মনে করার কোন কারণ নেই। জেলা দুইটির মধ্যে তপশীলী উপজাতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ দীর্ঘকাল হিন্দুদের সঙ্গে বসবাস করার জন্যে অনেকেই হিন্দু সমাজের আচারব্যবহার, বিশ্বাস ও সংস্কার গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের হিন্দু বলেই মনে করেন। তবু একটা অংশ আছেন যাঁরা তাঁদের নিজস্ব উপজাতীয় ধর্মমত ও বিশ্বাস এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁদের জীবনে পুরাতন সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য এখনও বজায় থাকাটাই স্বাভাবিক।

স্যার চার্লস মেটকাফ্ ১৮৩৩ সালে ভারতবর্ষের গ্রাম সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা প্রায়শঃ আজও উধৃত হয়ে থাকে। তিনি বলেছিলেন, 'The Village Communities are little Republics, having nearly everything that they want within themselves, and almost independent of any foreign relations. They seem to last where nothing else lasts. (Sir Charles T. Metcalf's Minute, dated 7th November, 1830, as quoted by Romesh Dutt in 'The Economic History of India under Early British Rule,' London, Routledge & Kegan Paul Ltd., 1950, p. 386)। স্যার হেনরী মেইন ভারতের গ্রামের সমাজ সংগঠনের উল্লেখ করার সময় এক সুরেই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে ('Village Communities in the East and West,' London, John Murray, 1881) লিখেছিলেন,'......the least destructible institution of society which never willingly surrenders any of its wages to innovation. Conquests and revolutions seem to have swept over it without disturbing or displacing it......' ভারতীয় গ্রামের

এই স্বয়ংসম্পূর্ণরূপের অপরিবর্তনীয়তা অন্যদিকে স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলও লক্ষ্য করেছিলেন ১৮১২ সালের প্রকাশিত হাউস অব কমন্সের এক রিপোর্টে এবং তাঁর গ্রন্থে (Sir George Campbell, 'Modern India : A Sketch of the System of Civil Government,' London, John Murray, 1852, p. 84-85) উদ্ধৃত করেছেন, 'The boundaries of the villages have been but seldom altered ; and though the villages themselves have been sometimes injured, and even desolated by war, famine or disease, the same name, the same limits, the same interests, and even the same families have continued for ages. The inhabitants gave themselves no trouble about breaking up and divisions of kingdoms, while the village remains entire, they care not to what powers they are transferred, or to what sovereign it devolves ; its internal economy remains unchanged.' গ্রামের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার মধ্যে কার্ল মার্কস্ ভারতীয় তথা এশিয়ার সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনবিমুখী প্রকৃতিকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর মতে, 'the simplicity of the organization for production in these self-sufficing communities that constantly reproduce themselves in the same form, and if distroyed by chance, spring up again on the same spot and with the same name—this simplicity supplies the key to the secret of the unchangeableness of Asiatic societies, an unchangeableness in such striking contrast with the constant dissolution and refounding of Asiatic states, and the neverceasing changes of dynasty.' (Karl Marx, Capital, Vol. I, Berlin, Dietz Volksaugabe, I, 1867 p. 374-76)।

ডেভিড জি. ম্যাণ্ডেল্বম্ সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে কোন ভারতীয় গ্রামই স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ংনির্ভর এবং সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করার কোন কারণ নেই। বিভিন্ন সময়ে গ্রামের রূপ পালটেছে এবং ভারতীয় প্রাচীন সমাজব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে কোন গ্রামের পক্ষে স্বাধীনভাবে বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। রাস্তাঘাট খারাপ এবং চলাচল বিপদসংকুল হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে যাতায়াত ছিল, বিভিন্ন গ্রামের অনেক পরিবারের মধ্যে এক বৈবাহিক সম্পর্ক সামাজিক বন্ধন স্থাপন করত এবং গ্রামের দম্পতীরা নূতন সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচনা করতেন (David G. Mandelbaum, 'Society in India, Volume 2, Change and Continuity,' Berkeley, University of California Press, 1970,

p. 328)। মরিস ওপ্‌লার বারাণসীর কাছে সোনাপুর গ্রাম সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন, প্রত্যেক অঞ্চলে বিভিন্ন পেশা আর কাজের জন্য এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে (Morris Opler, The Extensions of an Indian Village- The Indian Village, a symposium in the Journal of Asian Studies, 16 ; p. 7)। ব্যবসায়িক লেনদেনের কেন্দ্ররূপে গ্রামের হাটে ও বাজারে বিভিন্ন মানুষের যাতায়াত ও দেখাসাক্ষাতের মধ্যে গ্রামের নিঃসঙ্গতা বেশ কিছুটা দূর হয়েছে। তাছাড়া, উৎসব উপলক্ষেও আঞ্চলিক ভিত্তিতে দর্শনার্থী ও অংশগ্রহণকারী মানুষ বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর ভেঙ্গে নির্জনবাসের সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করেছেন।

ম্যাণ্ডেল্‌বমের মত যাই হোক না কেন, পূজা-পার্বণ ও মেলাকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রাম যে, এক একটি বিশেষ ঐতিহ্যের পরিমণ্ডলে বেষ্টিত হয়ে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পূজা-পার্বণের কথা আলোচনা করার আগে একটি গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ পর্যালোচনা করা জেলা দুইটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই সম্পর্ক, বলা বাহুল্য, বিভিন্ন জাতি ও পেশার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবার কথা। তাই, বাঁকুড়া ও বীরভূমের বিভিন্ন গ্রামে বসবাসকারী জাতি এবং উপজাতির (উভয় ক্ষেত্রে তপশীলী এবং তপশীল বহির্ভূত) নামকরণ সম্পর্কে গ্রামবিবরণীতে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তার পুনর্বিন্যস্ত বর্ণানুক্রমিক তালিকা নীচে দেওয়া হল :

অগ্রদানী, আকুড়্যা, আকুড়্যা ডোম, আহির গোপ, উগ্রক্ষত্রিয়, একাদশতিলি, কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ, কালু, কলুই, কামার, কারেঙ্গা, কায়স্থ, কাহার, কুমার, কুরি, কুর্মি, কুর্মিক্ষত্রিয়, কুলাই, কুড়ল, কেওট, কেওড়া, কৈবর্ত, কোটাল, কোনাই, কোল, কোড়া, খয়রা, খেইরা, খ্রীষ্টান, গণক, গন্ধবণিক, গন্ধবেনে, গরাই, গড়াই, গড়ুই, গড়োই, গোপ, গোয়ালা, গোস্বামী, গোড়, গোঁসাই, ঘাটোয়াল, ঘেটেল, ঘেড়্যা, চামার, চাঁড়াল, চুনারী, চুনরি, ছত্রী, ছত্রীব্রাহ্মণ, ছুতার, জেলে, ডোম, ঢুলি, তমালি, তামেলী, তাম্বুলী, তাঁতি, তিলি, তিয়র, তুঁয়া, তেলি, দণ্ডমাঝি, দাই, দুলে, দেশীখ্রীষ্টান, দেশোয়ালী, ধাঙ্গড়, ধীবর, ধুনিয়া, ধোপা, নমঃশূদ্র, নড়ি, নাপিত, পটিদার (চিত্রকর), পরামানিক, পল্লগোপ, পশ্চিমা মাড়োয়ারী, পাণ্ডা, পার্শী, পোদ্দার, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ফুলমালী, বণিক, বর্গক্ষত্রিয়, বায়েন, বাউরী, বাগল, বাগ্দী, বারুই, বারুজীবী, বেদে, বেনিয়া, বেনে, বৈদ্য, বৈরাগী, বৈশ্য, বৈশ্যসাহা, বৈষ্ণব, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, ভড়, ভাট, ভাণ্ডারী, ভুঁঞা ভুঁইমালী, ভুঁইয়া, ভুঁইহার, ভূমিজ, ভেড়িয়াল, মগ, মণ্ডল, মল্ল, ময়রা, মহন্ত, মহাদণ্ড, মহান্ত, মাঝি, মাদুর, মাল, মালপাহাড়ী, মালাকার, মালি, মাহাতো, মাহালী, মাহিষ্য, মাড়োয়ারী, মুখি, মুচি, মুসলমান, মেটিয়া, মেটে, মেট্যা, মেথর, মোদক, যুগী, যোগী, রজক, রবিদাস, রাজপুত, রাজপুতক্ষত্রিয়, রাজবংশী, রাজমান, রাজোয়ার, রামাব্রত, লায়েক, লেট, লোহার, শংখবণিক, শবর, শূদ্র, শাঁখারী, শুঁড়ি, সৎচাষী, সদ্গোপ, সরাক, সর্দার, সামন্ত, সাহা, সাহু,

সাঁওতাল, সুবর্ণবণিক, সোনার, সোহানা, সৌমণ্ডল, স্যাকরা, স্বর্ণকার, হাড়ী, হিন্দু ও ক্ষত্রিয়। পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, সম্প্রদায় প্রভৃতির নামকরণে নৃকুলবিদ্যার গবেষণার উপযোগী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার বাংলার জনসাধারণের মধ্যে প্রধানতঃ দুটি নৃকুলভিত্তিক উপাদানের উল্লেখ করে বলেছেন: 'Broadly speaking, we can distinguish two elements in the people of Bengal ; Sabaras, Pulindas, Hadi, Dom, Chandala and others designated as the Mlechhas ; and the other consisting of the higher classes of people which come within the framework of the caste system (Dr. R. C. Majumdar, 'History of Bengal,' Vol. I, Dacca, University of Dacca, 1963, p. 557)। বলা বাহুল্য কোল, শবর, ডোম, হাড়ী, চণ্ডাল প্রভৃতি নাম তালিকায় পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা আজও তাঁদের উপজাতীয় সবগুলি বিশেষত্ব বহন করছেন। বাস্তবিক পক্ষে, জাতিপ্রথার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসের অবতারনা করা বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কয়েকটি গোষ্ঠী যে বহুকালের প্রাচীন এবং দীর্ঘকাল পরেও তারা যে একই নামের পরিচয় বহন করে চলেছেন, সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করার প্রয়োজন ছিল।

ভারতবর্ষের সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য স্বীকার করা হয়নি। বরং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সব মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার সংবিধানের মুখবন্ধে রয়েছে। অথচ পরিকল্পনা কমিশন্ থেকে লোকসভা পর্যন্ত সর্বত্রই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবানুগ কার্যক্রমে রূপায়িত করার চেষ্টায় রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ্, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ্ ও অন্যান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ব্রতী। সকলেই বিরামহীন অনুসন্ধান করে চলেছেন, কি করে ভারতের প্রাচীন সমাজের পুরাতন কাঠামোকে আধুনিক যন্ত্রযুগের উপযোগী করে পুনর্গঠিত করা যায়। এই প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধানের ফলে প্রতিনিয়ত নানা তত্ত্ব ও তথ্য সকলের গোচরে আসছে। কিন্তু এই সংস্কারের কাজটি যে কত জটিল ও দুরুহ, তা বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলার শহরে ও গ্রামের সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, জাতি ও উপজাতির কয়েকটি নামের বিন্যাস থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। মানুষকে আজও নিজের পরিচয়জ্ঞাপনের প্রয়াসে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের নামের আশ্রয় গ্রহণ করতে হচ্ছে। ঐ নাম কখনও বর্ণভিত্তিক, কখনও পেশাভিত্তিক, আবার কখনও বা ধর্মভিত্তিক। এই রাজ্যের তথা ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায়, কোন ব্যক্তির পরিচয় কেবলমাত্র তাঁর নিজস্ব নাম ও পদবী বা পরিবারের উপাধি কিংবা বংশপরিচায়ক সংজ্ঞার মধ্যেই সম্পূর্ণ নয়। যদি বংশগত নাম তাঁর জাতি, গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়ের স্বয়ং-নিরূপিত সংজ্ঞাবাচক না হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তি কোন্ জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত

সেই প্রশ্ন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে পড়ে। কিন্তু বর্ণ যে জাতির সমগোত্রীয় দ্যোতক নয়, একথা সমাজবিজ্ঞানীরা সকলেই জানেন। অথচ তালিকায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে অভিহিত বর্ণচতুষ্টয়ের উল্লেখ থাকায় গবেষকরা প্রশ্ন করতে পারেন, বাঁকুড়া ও বীরভূমের গ্রামীণ সমাজে কোন কোন গোষ্ঠী নিজস্ব জাতির নাম বিস্মৃত হয়েই বর্ণভিত্তিক নামের পরিচয় দিয়েছেন, নাকি সমাজের মধ্যে তাঁদের জাতির মর্যাদাসূচক প্রকৃত অবস্থান গোপন রাখতে বর্ণের আশ্রয় নিয়েছেন? জাতিকে কোন বিশেষ বর্ণের বর্গক্রমে উন্নীত করার অতীত ইতিহাস এই গ্রন্থের সম্পাদকমহাশয় শ্রীঅশোক মিত্র ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থের (A. Mitra, 'The Tribes and Castes of West Bengal,' 1951 Census, Alipore, West Bengal Government Press, 1953) ভূমিকায় করেছেন। পশ্চিমবাংলার সমাজকাঠামোয় বিভিন্ন জাতির অবস্থানগত গুরুত্ব, অর্থনৈতিক ভূমিকা এবং ক্রমবিকাশ ছাড়াও, ইংরাজ ঔপনিবেশিক রাজত্বে শাসককুল বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের জীবিকার ভিত্তিমূল ছিন্ন করে এবং বিভাজন নীতির দ্বারা কিভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মনিয়ন্ত্রিত সামাজিক শ্রেণীবিভাগের বৈষম্যকে চিরস্থায়ী করে এক সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি সৃষ্টি করার নীতিকে অনুসরণ করেছিলেন, তার ইংগিত ঐ ভূমিকায় আছে (A. Mitra, op. cit., p. 1-8)।

কিন্তু, বর্ণের সংগে জাতির নাম যুক্ত করে হিন্দু পল্লীসমাজের শ্রেণীবিন্যাসে অন্য জাতির তুলনায়, কোন একটি বা একাধিক বিশেষ জাতি মর্য্যাদাসূচক আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়েছে কিনা, এবং হয়ে থাকলে, পরিবর্তনের মূলে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের সচেতন বা অচেতন কোন প্রচেষ্টা ছিল কিনা জানার প্রয়োজন আছে। আবার গ্রামীণ বা শহুরে সমাজের পরিসরে এই পরিবর্তন মৌলিক অর্থনৈতিক রূপান্তর আনতে সক্ষম হয়েছিল কিনা জানা নেই। অথচ বর্ণভিত্তিক পরিচয়ের ফলে, শুধু সমাজতাত্ত্বিক কিংবা নৃতাত্ত্বিক দিক থেকেই নয়, রাষ্ট্রের পক্ষেও এক সাংবিধানিক আইনগত সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সাংবিধানিক নির্দেশে বিশেষভাবে উল্লিখিত কয়েকটি জাতি ও উপজাতি ভারতের রাষ্ট্রপতির আদেশনামায় ১৯৫০ সালে এবং ১৯৫৬ সালে সংশোধিত নূতন আদেশনামায় তপশীলভুক্ত হয়ে, রাষ্ট্রস্বীকৃত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগসুবিধার অধিকার পেয়েছেন। যেমন, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় পোদ বা পৌণ্ড্র তপশীলী জাতিভুক্ত। কিন্তু, তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতির মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নামটি না থাকার জন্য, পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়কে পোদ অথবা পৌণ্ড্ররূপে গণ্য করার পথে সাংবিধানিক ও আইনগত বাধা আছে। শ্রীঅশোক মিত্র ১৯৫১ সালে দেশোয়ালী নামে এক জাতির সন্ধান বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া হুগলী এবং ২৪-পরগণা জেলাতে পেয়েছেন, এবং স্যার হার্বার্ট রিস্‌লীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে দেশোয়ালীকে মানভূম জেলার সাঁওতাল উপজাতির একটি গোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করেছে (A. Mitra, 'Glossary of Caste Names, West Bengal, Census of India 1951, 'Calcutta, Office of the Superintendent of Census

Operations, 1956 : Mimeographed Report, p. 45)। বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ থানার বড়্ডি গ্রামে (মৌজা নং ২৬), দেউলি গ্রামে (মৌজা নং ৫৩), শুখলা গ্রামে (মৌজা নং ৫৮), দেশোয়ালী নামে বর্ণিত সম্প্রদায়ের উল্লেখ যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন প্রশ্ন উঠবে, এই গোষ্ঠীকে কি সাঁওতালের মত তপশীলী উপজাতির মর্যাদা দেওয়া হবে? নৃতাত্ত্বিক সমস্যাটি এই যে, দেশোয়ালীরা সাঁওতালদের একটি শাখা কিনা এবং যদি হন, তাহলে তাঁরা সাঁওতালরূপে নিজেদের পরিচয় দেননা কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, যদি সাঁওতাল দেশোয়ালীরা উপজাতিভুক্ত হন, তখন কি তাঁরা তপশীলী উপজাতির সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন সাংবিধানিক ও আইনগত কারণে? এই ধরনের একটি তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক অনেক প্রশ্ন ও সমস্যা তুলতে পারেন।

অবশ্য, তালিকায় বর্ণিত বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মধ্যে কারেঙ্গা, কেওট, কেওড়, কোটাল, কোনাই, কোড়া, খয়রা, চামার, ডোম, তিয়র, দুলে, ধাঙ্গড়, ধোপা, নমঃশূদ্র, বাউরী, বাগ্দী, ভুঁইঞা ভুঁইয়া, ভুঁইমালী, ভূমিজ, মগ, মাল, মাল পাহাড়ী, মাহালী, মুচি, মেথর, রাজবংশী, রাজোয়ার, লোহার, সাঁওতাল এবং হাড়ী তপশীলভুক্ত।

জাতির তালিকায় হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নামও পাওয়া যাবে। কিন্তু যে গোষ্ঠী দেশীখ্রীষ্টান নামে পরিচিত, তাকে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের থেকে পৃথক করার ধারণাবশতঃ দেশী শব্দটিকে উপসর্গের মত যুক্ত করা হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে, কেন হয়েছে কেউ যদি প্রশ্ন করেন, তার উত্তর শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে দেওয়া সংগত হবে না। বরং কেন তা হ'ল জানার চেষ্টা করাটাই হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। আবার রাজপুতদের রাজপুতানা থেকে আগত মানবগোষ্ঠী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ভিন্নরাজ্যের অধিবাসীদের জাতিগত বৈশিষ্ট এই পরিচয়ে স্পষ্ট হয় না, বিশেষ করে যেখানে অনেকে নিজেদের রাজপুতানার রাজপরিবারের সংগে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে বলে দাবী করেন। রাজপুতদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষত্রিয় বর্ণের সংগে সমাসবদ্ধ অবস্থায় রাজপুতক্ষত্রিয় নামে অন্য কোন সম্প্রদায়দ্যোতক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছেন বলে, সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। কারণ তখন এই গোষ্ঠীভুক্ত জনগণ গ্রামের অন্যান্য লোকেদের কাছে নিজেদের পরিচয় অবিস্মরণীয় করে ফেলেছেন। জিজ্ঞাসু সমাজবিজ্ঞানীর বুঝতে অসুবিধা হবে, এই গোষ্ঠীর লোকজন কবে, কেন এবং রাজপুতানার (বর্তমান রাজস্থানের) কোন্ জায়গা থেকে এদেশে এই গ্রামে পৌছলেন। তাছাড়া ওঁদের জাতি ও আদি পেশা কি ছিল তা'ও জানা যায় না। চতুবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণভুক্ত হয়ে, এঁরা নিজেদের প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত রাখতে চাইছেন কিনা প্রশ্ন উঠতে পারে। আবার রাজপুত রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভূত যোধ্বকুলের সংগে এঁরা কোন এক সময় সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিনা জানা যাচ্ছে না। অনুরূপভাবে রাজস্থানের মাড়োয়ার অঞ্চলের অধিবাসীর পরিচয়ে মাড়োয়ারীগোষ্ঠীকে বাঁকুড়া ও বীরভূমের গ্রামের ক'জন মানুষ চেনেন

সন্দেহ আছে। বরং রাজস্থানের ব্যবসায়ীসম্প্রদায় বলেই মাড়োয়ারীরা সকলের কাছে পরিচিত; যদিও নৃতাত্বিক জানেন যে, এঁদের জাতিগত ও পেশাগত ভিন্ন ভিন্ন নামের পরিচয় আছে। আবার গ্রামবাসীদের চোখে পশ্চিমা মাড়োয়ারী সম্প্রদায় নামে কোন কোন বহিরাগত মাড়োয়ারী ভিন্নতর রূপে চিহ্নিত। বাঁকুড়া ও বীরভূমে গ্রামের ও শহরের জনগণ বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে পশ্চিম-বাংলার পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলরূপেই বেশী চেনেন ও জানেন। পশ্চিমা কথাটি ভৌগোলিক দিক ও অঞ্চল নিরূপণে সাহায্য করে বলে, সাধারণ গ্রামবাসী রাজস্থানী মাড়োয়ারীভাষী ব্যবসায়ীগোষ্ঠীকে পশ্চিমা মাড়োয়ারী নামের আখ্যায় ভূষিত করেন। কিন্তু নৃতাত্বিকের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলে মনে হয়। জেলা দুইটির বিভিন্ন গ্রামে পেশার প্রয়োজনে দীর্ঘকাল বসবাস করে এবং স্থানীয় ভাষা, আচারব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করার পরেও, এই ভিন্নরাজ্যের অধিবাসীরা নিজেদের কৃষ্টি আর একটি রাজ্যের পৃথক প্রতিবেশে ভুলে গেলেন না কিংবা নিজেদের গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট বিস্মৃত হয়ে বাঙালী বৈশ্যে রূপান্তরিত হ'লেন না। তা'হলে দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য রাজ্য থেকে অধিবাসী বহিরাগতগণ পশ্চিমবাংলার দুইটি জেলার বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে দীর্ঘদিন কাটিয়েও, এখানকার সমাজ ও সংস্কৃতি গ্রহণ করলেন না এবং এখানকার মানুষ পরবাসী বলেই তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখলেন।

জাতির তালিকাতে অনেক বৃত্তিকেন্দ্রিক গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু গোষ্ঠীটি কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত জানা যায় না। আবার যেখানে কোন গোষ্ঠীর নাম ও জাতির নাম এক, সেখানে ঐ জাতির আদি পেশা কি সঠিক বলার উপায় নেই। ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবংগে গ্রামীণ সমাজের পুরাতন অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থায় বিভিন্ন বৃত্তিকেন্দ্রিক জাতির বিশেষ ভূমিকা ছিল। বৃটিশ শাসনের প্রবর্তনের পর ঔপনিবেশিক শোষণ এবং শাসকবর্গের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে, যন্ত্রসভ্যতার নূতন সৃষ্ট বহু শিল্পপণ্য গ্রামীণ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বৃত্তিকেন্দ্রিক জাতির নিজস্ব পেশার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল এবং তারপরে সমাজের অর্থনৈতিক ভাঙ্গন সুরু হয়েছিল। বৃত্তিচ্যুত ছিন্নমূল অনেক জাতিকেই প্রাণধারণের জৈব প্রয়োজনে জাতিপেশা ছেড়ে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ে যোগ দিতে হয়েছিল। অবশ্য এই প্রক্রিয়া বহুলাংশে শিল্প ও শহরের ব্যাপ্তি, বিকাশ ও প্রসার ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার সংগে অংগাংগী জড়িত। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় এগারটি শহরের মধ্যে নয়টি শহরের জন্ম প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে। মাত্র দুইটি শহর ১৯৫১-৬১ দশকে উদ্ভূত হয়েছে। তাছাড়া, এই জেলাগুলিতে আধুনিক কোন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা না হওয়ায়, যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য প্রসার না ঘটায় এবং বড় নগরের অবস্থান না থাকায়, এখানকার অধিকাংশ গ্রামই পুরাতন ঐতিহ্যবাহী অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল বলে স্বীকার করতে কোন বাধা নেই। তাছাড়া জেলা দুইটির প্রধানতঃ

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি জনসংখ্যার বিশ্লেষণে আগেই প্রমানিত হয়েছে। আবার এই অঞ্চলে খরা, সেচব্যবস্থার অভাব, জমির অনুর্বরতার জন্য জেলা দুইটিকে অনগ্রসর বলে মনে করারও কারণ আছে। এই অবস্থায় জেলাগুলির গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি তাঁদের সব বৃত্তি হারিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হয় না। কারণ এই জেলা দুইটির বহু গ্রামে ও শহরে এখনও প্রাচীন বৃত্তি ও কারুশিল্প কিছু কিছু বর্তমান। তবে সামগ্রিকভাবে যেখানে বৃটিশরাজত্বে দেশের নিজস্ব শিল্প ও অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেখানে এই দুইটি জেলার গ্রামের মানুষ তার শিকার হননি ব'লে মনে করা অযৌক্তিক হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করে কয়েকটা প্রশ্ন গ্রন্থের তথ্যের ভিত্তিতে উঠতে পারে। বৃত্তিভিত্তিক জাতিগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি তাঁদের পেশা ছেড়েছেন এবং কি সংখ্যক কর্মী জাতিপেশা আজও আঁকড়ে রয়েছেন এই প্রশ্ন অবান্তর নয়। যাঁরা বৃত্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা নূতন কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করলেন, এ জিজ্ঞাসাও গবেষকের কাছে মূল্যবান বলে মনে হতে পারে।

জাতিতালিকাভুক্ত অগ্রদানীরা অতীতেই শ্রাদ্ধের দান এবং ভাগ্যবিচারের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করে ব্রাহ্মণকুলে নিম্নশ্রেণীর শাখা ভুক্ত হয়ে ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়েছিলেন। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বিচারে তাঁরা নিম্নবৃত্তির জন্য প্রথমোক্তশ্রেণীর সম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। বর্তমানে ঐ অগ্রদানী জাতির পেশা কি এবং ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁরা হৃত সম্মান ও লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন কি? ব্রাহ্মণকুলভুক্ত এক সম্প্রদায়-রূপে গণককে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে এবং ভাগ্যপরীক্ষা, ভবিষ্যৎগণনা, কোষ্ঠী প্রস্তুত ও বিচার করা তাঁদের আদি পেশা ছিল বলে অনেকে মনে করেন। এখনও গণকরা সেই পুরাতন বৃত্তির উপর নির্ভর করে আছেন কিনা কারুর মনে এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। আহিরগোপ, গোপ ও গোয়ালার কি গোপালন এবং দুধের ব্যবসাই প্রধান উপজীবিকা? কলু কি তৈলকারের পেশায় লিপ্ত এবং একাদশতিলি, তিলি ও তেলি কি আজও তৈল ও তৈলবীজের ব্যবসায়ের সংগে সংযুক্ত? কামার ও লোহারেরা লোহার কৃষিসরঞ্জাম এবং কারুশিল্পীর লোহার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ও মেরামত করে চলেছেন কি? গন্ধবণিক ও গন্ধবেনেরা গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায়ে কি আজও যুক্ত আছেন? একইভাবে চুনারী চূণ প্রস্তুতির কাজে, ছুতার কাঠের আসবাব ও সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতির বৃত্তিতে; জেলে, কেওট, ধীবর মাছধরার কাজে এবং মাছের ব্যবসায়ে; তমালী এবং তাম্বুলী পানের ব্যবসায়; তাঁতী কাপড়বোনার কাজে; ধুনিয়া তুলার শয্যাবস্ত্র প্রস্তুতিতে কি ব্যাপৃত আছেন? বণিক, বেনিয়া অথবা বেনে কি পৃথক কোন জাতি এবং এঁদের জাতিপেশা কি? পটিদার (চিত্রকর) কি আজও পট আঁকেন?

তালিকায় বর্ণিত এই ধরণের বৃত্তিনির্ভর অনেক জাতির উল্লেখ আছে (শংখকার, শংখবণিক, স্বর্ণকার স্বর্ণবণিক প্রভৃতি) যাঁরা বৃটিশ শাসনকালে অথবা বর্তমানে শিল্পকেন্দ্রিক

অর্থনীতির সংগে প্রতিযোগিতায় আদৌ স্বীয় পেশার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন কিনা এবং গ্রামীণ সমাজের কাঠামোয় তাঁদের ভূমিকা অপরিবর্তিত আছে কিনা জানার বিশেষ প্রয়োজন আছে। শ্রীরমেশ দত্ত বৃটিশ শাসনকালে ভারতের অর্থ নৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেছিলেন, 'It is, unfortunately true that the East Indian Company and the British Parliament following the selfish commercial policy of a hundred years ago, discouraged Indian manufactures in the early years of British rule in order to encourage the rising manufactures of England. Their fixed policy, pursued during the last decades of the eighteenth century and the first decades of the nineteenth, was to make India subservient to the industries of Great Britain, and to make the Indian people grow raw produce only, in order to supply material for the looms and manufactories of Great Britain. ......orders were sent out, to force Indian artisans to work in the companies' factories......millions of Indian artisans lost their earnings; the population of India lost one great source of their wealth' (Romesh Dutt, op. cit., p. viii)। বলা বাহুল্য এই অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ে অল্পবিস্তর সব জাতির পেশাই, বিশেষ করে গ্রামীণ কারুশিল্প, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং অনেক জাতিকেই তাদের নিজস্ব বৃত্তি ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছিল। শ্রীরমেশ দত্ত এই প্রসংগে উল্লেখ করেছেন কিভাবে লক্ষ লক্ষ মাঝিমাল্লা, নৌশিল্পে নিযুক্ত কারিগরেরা, গোশকটচালক এবং বলদের মালিকেরা তাঁদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন (op. cit. p. 311)। পরিবর্তিত এই অর্থনৈতিক পটভূমিতে যদি বৃত্তিভিত্তিক জাতি তাঁদের পেশা ছাড়তে বাধ্য হয়ে থাকেন, তখন তাঁদের জাতির কোন্ বৈশিষ্ট বজায় থাকে, এই প্রশ্ন শ্রীঅশোক মিত্রের মনকে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর মতে 'Strripped of its functional content, caste now seemed totally pointless ; an instrument of oppression of Brahmanism and little more." (A. Mitra, Preface to the Tribes and Castes of West Bengal, Alipore, West Bengal Government Press, 1953, p. 8)। বৃটিশ শাসকসমাজের শোষণের এই নগ্নরূপ যখন হাউস অব্ কমন্সে বিতর্কের ঝড় তুলেছিল, তখন কার্ল মার্কস্ 'The British Rule In India' শিরোনামায় ১০ই জুন, ১৮৫৩ সালে একটা চিঠি লেখেন, যা New York Daily Tribune সংবাদপত্রের ৩,৮০৪ সংখ্যায়, ২৫শে জুন, ১৮৫৩ তারিখে প্রকাশিত হয়। তখন তিনি অর্থ নৈতিক এই দুরবস্থার মধ্যে মনে করেছিলেন, এক সামাজিক বিপ্লব বৃটিশ শাসকেরা ঘটাতে চলেছেন। তিনি লিখেছিলেন, 'English

interference having placed the spinner in Lancashire and the weaver in Bengal, or sweeping away both Hindu spinner and weaver, dissolved these semi-barbarian, semi-civilized communities, by blowing up their economical basis, and thus produced the greatest, and to speak the truth, the only social revolution in Asia.

'Now sickening as it must be to human feeling to witness those myriads of industrious patriarchal and inoffensive social organizations disorganized and dissolved into their units, thrown into a sea of woes and their individual members losing at the same time their ancient form of civilization and their hereditary means of subsistence, we must not forget that these idyllic village communities, inoffensive though they may appear, had always been the solid foundation of oriental despotism, that they restrained the human mind within the smallest possible compass, making it the unresisting tool of superstition; enslaving it beneath traditional rules, depriving it of all grandeur and historical energies' (Karl Marx, 'The British Rule In India, The First Indian War of Independence 1857-1859', Moscow, Foreign Languages Publishing House, Second Impression, p. 19-20)। ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার যে রূপ মার্কসের দর্শনে বিধৃত হয়েছে, সেটা বোধ হয় সম্পূর্ণ সত্য নয়। মার্কস্ ভেবেছিলেন যে, ভারতের কৃষিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিদেশী শিল্পপণ্য প্রবেশ করে তার অর্থনৈতিক ভিত্তিমূল শিথিল করে দেবে এবং এই বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় হোতার আসন গ্রহণ করবেন বৃটিশ বণিক-সমাজ এবং শাসকবর্গ। কিন্তু হিন্দুসমাজের ভাঙ্গাগড়া ও উত্থানপতনের মধ্যেও পুরাতন ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সভ্যতার কোন সঞ্জীবনী স্পর্শ ছিল, যে কারণে সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি। মার্কসের কাছে যা বিপ্লবের মোহনরূপ ধরে এসেছিল, তা' মরীচিকা মাত্র। তাই যদি না হত, তবে আজও বাঁকুড়ার কোতালপুর থানার মীর্জাপুর মৌজায় রায়বাঘিনী গ্রামে শঙ্খকারেরা শাঁখের শিল্পসামগ্রী একই পুরাতন পদ্ধতিতে উৎপাদন করতেন না। কিংবা বিষ্ণুপুরের রেশমশিল্পের অস্তিত্ব ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকত। পাঁচমুড়ার টেরাকোটা মৃৎশিল্পও প্রাচীন ও আধুনিক সমাজের মধ্যে আজ এক যোগসূত্র রচনা করত না। মার্কসের ব্যাখ্যা কয়েকটি ভ্রান্ত অনুমানের উপর নির্ভর করেছিল। পরবর্তীকালে,

১৮৬৭ সালে প্রকাশিত ক্যাপিটাল্ গ্রন্থে ভারতীয় উৎপাদনব্যবস্থার অবিনশ্বরতা অথবা ও অমরত্ব এবং সমাজের পরিবর্তনবিমুখতা (পূর্বেই আলোচিত) লক্ষ করে মার্কস্ আক্ষেপ করেছিলেন যে, যেখানে রাজনৈতিক আকাশে দুর্যোগের মেঘ পুঞ্জীভূত, সেখানে সমাজের অর্থ নৈতিক ভিত্তিপ্রস্তরে সামান্য আঁচড়ও লাগে না।

ইতঃপূর্বে জেলা দুইটির গ্রামীণ প্রকৃতি ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, এই ধরনের সমাজকাঠামোয় প্রত্যেক জাতি এবং সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট স্থান ও বিশেষ ভূমিকা থাকে। যে কোন সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বিন্যাসের মধ্যে প্রত্যেক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের নিজস্ব সত্তা ও অধিকার মৌলসমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। প্রমাণস্বরূপ গ্রামের বিভিন্ন অংশ, মহল্লা বা পাড়ার নামগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, বেশীর ভাগ নামই ঐ পাড়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের পরিচয় বহন করছে। গ্রামগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাম্প্রতিককালের পত্তন নয়, বরং অনেক গ্রামেই বিভিন্ন জাতি বহু শত বৎসর ধরে বসবাস করছেন। তাঁরা নিজের নিজের এলাকার এক্তিয়ার সীমাবদ্ধ করে, তদনুসারে তাদের নামকরণ বিভিন্ন সময়ে করেছেন। শুধু গ্রামেই যে সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীভিত্তিক অঞ্চল আছে এবং এক একটি পাড়ায় বা মহল্লায় প্রধানতঃ কোন একটি জাতিবিশেষ বাস করেন তাই নয়। শহরগুলির ক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও সেই একই ধাঁচের মহল্লাভিত্তিক জাতির বিন্যাস এবং বিন্যাসানুযায়ী মহল্লার নামকরণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, বাঁকুড়া শহরটি ১৯০১ সালের পৌর পরিচয়ে স্বীকৃত হয়ে থাকলেও, এখানে কেওটপাড়া, যুগীপাড়া, পোদ্দারপাড়া, শাঁখারীপাড়া এবং পাঠকপাড়া যে বহুপূর্বে ঐ মহল্লায় বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির নামেই হয়েছিল তাই নয়, সেই নাম আজও বজায় রয়েছে এবং সেই প্রধান জাতিগুলি আজও সেখানে বাস করছেন। বিষ্ণুপুরও ১৯০১ সালে পৌরাঞ্চল বলে গণ্য হয়েছিল। সেখানেও বাউরীপাড়া, হাজরাপাড়া নামে অঞ্চল আছে এবং ঐসব মহল্লায় বাউরী, হাড়ি প্রভৃতি জাতিরা এখনও বাস করেন। পাত্রসায়র শহরের জন্ম ১৯২১ সালে এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীর মত সময় কেটে গিয়েছে। কিন্তু, শহরের তেলিপাড়া, মুচিপাড়া, মুসলমানপাড়া, বাউরীপাড়া, পালপাড়া, মল্লপাড়া, তাঁতিপাড়া, রাজপুতপাড়া, কামারপাড়া ও হাজরাপাড়ায় নামকরণকারী প্রধান প্রধান জাতি বা সম্প্রদায়ের বসতির বিন্যাসের কোন পরিবর্তন আজও হয়নি। শহরের পরিচয়ে চিহ্নিত হলেও, গ্রামীণ সমাজের প্রতিচ্ছায়া উল্লিখিত স্থানগুলির উপর প্রভাব ফেলেছে এবং নগরসভ্যতার সামাজিক গড়নের অভাব ঐ শহরগুলিতে লক্ষ করা যাচ্ছে। গিডীয়ন্ জোবার্গ অবশ্য এই ধরনের শহরগুলিতে প্রাক্-শিল্পযুগীয় নগরের বৈশিষ্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন, 'Subdivisions along ethnic and/or occupational lines are manifested in the preindustrial city in the numerous wards or quarters, well-defined neighbourhoods with relatively homo-

geneous populations that develop special forms of social organization......Segregation by ethnic groups, which in turn are associated with specific occupations, occurs widely in pre-industrial cities' (Gideon Sjoberg, 'The Industrial City Past and Present', Illinois, The Free Press of Glencoe, 1960, p. 100)। গ্রাম এবং শহরের মহল্লাগুলিতে জাতিভিত্তিক বসতির বিন্যাস দেখে মনে হতে পারে যে, আধুনিক যন্ত্রযুগে বাস করেও প্রাচীন সমাজের অসংখ্য সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর এক সমন্বিত খণ্ডচিত্র বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার সমাজের পটে পরিস্ফুটিত। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, এই গোষ্ঠীগুলি কতদূর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতে নিজেদের অস্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র বহন করতে পেরেছেন? পারস্পরিক বিরোধ যদি কোথাও থাকেও, তবে কখনও সে বিরোধ কোন আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় পর্যবসিত হয়নি। সেরকম কিছু হয়ে থাকলে, সম্প্রদায়গুলি অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে যেতো। বরং, পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক এবং সহযোগী মনোভাব থাকার জন্য, গ্রামীণ সমাজের নিজস্ব সত্বা বিকাশ লাভ করতে পেরেছে।

বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও জাতির বৈচিত্রের সঙ্গে উপাস্য দেবদেবী, সাধু-সন্ত এবং পীরের বহুত্ব মানুষের ধর্মবিশ্বাস এবং লোকায়ত আচার ও সংস্কারের উৎসসন্ধানে গবেষককে উৎসাহিত করবে। নীচে বিভিন্ন দেবদেবী এবং উপাসিত সাধু-সন্ন্যাসী ও পীরের এক বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল ঃ

অক্ষয়কুমার, অট্টহাস, অদ্বৈতাচার্য, অদ্বৈতানন্দ, অনন্তদেব, অনাদি লিঙ্গ, অন্নপূর্ণা, অপরাজিতা, অবলোকিতেশ্বর, অম্বিকাদেবী, অশ্বারূঢ়া জিনাসিনী, আটবাইচণ্ডী, আবগি, আশনাসিনী, ইন্দ্র, ঈশ্বরীদেবী, উমাকান্ত শিব, উড়েশ্বরী, একেশ্বর শিব, এরঃশিম, কংকালী, কটারায়, কনকেশ্বরী, করাম, কলেশ্বরনাথ, কড়রাসিনী, কাটানীপীর, কামাখ্যাদেবী, কামিন্যাদেবী, কার্তিক, কালঞ্জয় শিব, কালভৈরব, কালাচাঁদ, কালাচাঁদজীউ, কালাচাঁদ ঠাকুর, কালাচাঁদ মহাদেব, কালামহাধন, কালারাজ, কালী, কালীয়, কালুরায়, কালাপাহাড় দেবতা, কুদরাসিনী, কুদরীঠাকুর, কুড়ারাজঠাকুর, কুঁকড়াসিনী, কৃষ্ণ, কৃষ্ণানন্দ, কেন্দুয়াসিনী, কেলাকরাসিনী, কৈলাশবাসিনী, কৌতুকরায়, খচ্চরবাহিনী, খাঁদারানী, গঙ্গা, গঙ্গাধর শিব, গণেশ, গণেশজননী, গদাইসেনী, গন্ধেশ্বরী, গম্ভীরা, গুহ্যকালী, গেরাম, গোকুলচাঁদ, গোপালজীউ, গোপালঠাকুর, গোপীনাথজীউ, গোরক্ষনাথ শিব, গোরাচাঁদঠাকুর, গোঁসাই, গৌরাঙ্গ, ঘোড়ালীপীর, চণ্ডী, চতুর্ভুজা দুর্গা, চন্দ্রশেখর শিব, চান্দপীর, চামুণ্ডা, চাঁচসিনী, চাঁদরায়, চিন্তামণি, চৈতন্যমহাপ্রভু, ছোটকালী, ছোট ঠাকরুণ, জগদ্ধাত্রী, জগন্নাথ, জগতরায়, জটাধারী, জটামুড়িদেবী, জনসিং, জনার্দনজীউ, জরৎকারুমুনি, জরাসুর, জলেশ্বর

শিব, জানকীরামজীউ, জামবেদিয়াসিনী, জাহেরবুরু, জীমুৎবাহন, ঝগড়াভঞ্জনীদেবী, ডাবুকেশ্বর শিব, তারাদেবী, ত্রৈলক্যতারিণীদেবী, দক্ষিণেশ্বর, দণ্ডকেশ্বর শিব, দধিবামন, দামোদরচন্দ্র, দামোদর শিব, দিদিঠাকুরুন, দুর্গা, দেউলেশ্বর শিব, দ্বারদেবতা বিরূপাক্ষ, দ্বারবাসিনী, দ্বিভুজা ভবানী, ধর্মরাজ, ধিয়ানরায়, ধুল্যাবুড়ি, নটরাজ, নন্দলাল, নন্দলাল-জীউ, নন্দিনীদেবী, নাচনচণ্ডী, নারায়ণজীউ, নারায়ণেশ্বর, নাড়ুগোপাল, নিস্তারিণীদেবী, নীলকণ্ঠ, নৃসিংহদেব, পঞ্চদুর্গা, পঞ্চানন্দঠাকুর, পদ্মাসন শিব, পলাশবাসিনী, পাতালফোঁড়া শিব, পাথরাবুড়ি দেবী, পার্থিব শিব, পার্বতী দেবী, পাষাণকালী, পাহাড়ীসিনী, ফটিকেশ্বর, ফলহারিণী কালী, ফুল্লরা, বনখণ্ডি, বরুণেশ্বর শিব, বলদাবুড়ি, বসন্তকুমারী, বসন্তচণ্ডী, বসুধাজাহ্নবী, বয়রাভাই, বড়কালী, বড়পাহাড়, বড়াম, বড়ামবুড়ী, বংশীবদন, বাখরাইচণ্ডী, বাগরাসিনী, বাগুতবীর, বাঘরায়সিনী, বাণলিঙ্গশিব, বাণেশ্বর, বাবাঠাকুর, বামনিসিনী, বালুকেশ্বরশিব, বাসন্তী, বাসুদেব, বাসুলী, বাঁকারায়, বাঁকুড়ারায়, বাঁশিসিনী, বিন্দু-বাসিনী, বিরিঞ্চি নারায়ণ, বিশালাক্ষ্মী, বিশ্বকর্মা, বিশ্ববাসিনী, বিষ্ণু, বিষ্ণুবাণলিঙ্গশিব, বিহারীনাথশিব, বুদ্ধদেব, বুড়াপীর, বুড়াবুড়ি, বুড়াশিব, বুড়ো রাধেশ্যাম, বুংকেশ্বরশিব, বৃদ্ধমাতা কালী, বৃদ্ধরায়, বেচারায়, বেলবনী, বেলাইচণ্ডী, বেহুলা, বৈদ্যনাথশিব, বোলতলা-দিনী ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মদৈত্য, ভগবতী, ভবানীদেবী, ভাদু, ভাসুর বোয়াসিন, ভুবনেশ্বর শিব, ভুবনেশ্বরী, ভেদুয়াসিনী, ভৈরব, ভৈরবনাথ, ভৈরবরাজ, মঙ্গলচণ্ডী, মটুকবনীবুড়ি, মৎসাবতার, মদনরায়, মদামিসিনী, মনসা, মল্লেশ্বর শিব, মহাদানাঠাকুর, মহাপ্রভু, মহামায়া, মহাবীর, মহিউদ্দীন মিরগীজ শাহ পীর, মহিষমর্দিনী, মড়েকু, মাতঙ্গীদেবী, মাথাসিন, মারাংবুরু, মৃন্ময়ীদেবী, মেজকালী, মেজঠাকুরুণ, মোজরাবুড়ি, মৌলেশ্বর শিব, যদুগোপালজীউ, যাত্রাসিদ্ধিরায়, যুগলকিশোর, যোগাদ্যা, যোগিনী, রক্ষাকালী, রঘুনাথজীউ, রঙ্কিনীদেবী, রটন্তী কালী, রত্নেশ্বর শিব, রসিকরায়, রাজরাজেশ্বর, রাধাদামোদর, রাধাবল্লভজীউ, রাধাবিনোদ, রাধারমণ, রাধারানী, রামকৃষ্ণ, রামগোপালজীউ, রামচন্দ্র, রুদ্রদেব শিব, লখনমাঝি, লক্ষ্মী, লক্ষ্মীজনার্দন, লক্ষ্মীনারায়ণ, লখিন্দর, লদাসিনী, ললাটেশ্বরী, লৌহজনপীর, শঙ্কাসুর, ধর্মঠাকুর, শনিঠাকুর, শান্তিনাথ, শালইহুতলা, শালুই, শালুইহলা, শিমূলসিনী, শীতলা, শ্মশানকালী, শ্মশাননাথ শিব, শ্যামচাঁদ, শ্যামচাঁদজীউ, শ্যামসুন্দরজীউ, শ্যামা, শ্রীধরচন্দ্র, ষষ্ঠী, ষষ্ঠীঠাকুরানী, ষড়চক্রবাসিনীদেবী, সত্যনারায়ণ, সত্যপীর, সরস্বতী, সর্বেশ্বরী দেবী, সহরায়, সাদমবঙ্গা, সাবিত্রীদেবী, সিদ্ধেশ্বর শিব, সুন্দররায়, সুরথেশ্বর, সূর্য, স্বরূপনারায়ণ, স্বরূপরায় ধর্মরাজ, স্বর্ণমুখী, সংহারভৈরব, সিংহনাদ লোকেশ্বর, সিংহেশ্বরী, হরিহর শিব, হিকিমসিনী, হংসরাজ, ক্ষিরাইসিনী, ক্ষুদিরায় ও ক্ষ্যাপাকালী।

দেবদেবী এবং উপাসিত ঐশীশক্তির তালিকায় হিন্দুধর্ম স্বীকৃত দেবদেবীর স্থান যেমন আছে, তেমনি অনেক লৌকিকদেবদেবী ও উপজাতি-পূজিত অতিপ্রাকৃত শক্তির উল্লেখও রয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারক এবং পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠী এবং

সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজস্ব ধর্মের আচার বিশ্বাস আরাধ্যদেবদেবীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবদেবীর আসনে তারা, কালী, শ্যামা, শিব ও বিষ্ণুর বিভিন্নরূপ এবং নামকরণ পূজা-পার্বণকে বৈচিত্রময় করে তুলেছে। আবার অন্যদিকে কার্তিক, গণেশ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মপুরাণে বর্ণিত দেবকুলের ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। গঙ্গা না থাকা সত্ত্বেও, গঙ্গা-পূজার কারণ সম্পর্কে "পূজা-পার্বণ ও মেলা" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'কথাপ্রসঙ্গে' আলোচনা করা হয়েছে। সূর্য্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের আদিদেবতা নন। কালের প্রবাহে বিদেশী কুষাণ উপজাতির দেবতা হিন্দুসমাজে শুধু প্রবেশই করলেন না, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলাতে তিনি ভক্তদের পূজা গ্রহণ করে চললেন। জৈন ও বৌদ্ধ উপাসকবৃন্দের কাছে মহাবীর এবং বুদ্ধ আজ কোন ধর্মমতের পথপ্রদর্শকই কেবল নন, তাঁদের পরমারাধ্য দেবতাও বটে। এই দুই জেলায় যে সব উপজাতি তাঁদের নিজেদের ধর্মের বৈশিষ্ট বজায় রাখতে পেরেছেন, অন্যান্যদের তুলনায় তাঁরা সংখ্যালঘু। সেইজন্য তাঁরা তাঁদের দেবতা এবং লৌকিক বিশ্বাস পরম যত্নে রক্ষা করে চলেছেন। যেমন, বড় পাহাড়, বড়াম, জাহেরবুরু, মারাংবুরু ইত্যাদি তার প্রমাণ বহন করছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবাসের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও প্রভাবান্বিত হয়েছেন। যেমন, এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকটি জাতি বা গোষ্ঠী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অনেক দেবতাকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যখন নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে সুরু করেছেন, তখন তাঁরা তাঁদের উপজাতির দেবদেবী ও ধর্মবিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে পারেননি। অবশ্য প্রশ্ন থেকেই যাবে যে, উপজাতিরা নিজেদের হিন্দু বলে মনে করলেও, বৃহত্তর হিন্দুসমাজ তাঁদের আদৌ গ্রহণ করেছেন কি ?

অস্পৃশ্যতাবোধ মানুষের মধ্যে জন্মসূত্রে আসেনি ; হিন্দুসমাজে বৃত্তির প্রকৃতি অনুসারে তা নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু, জাতিব্যবস্থায় নিম্নবর্গের কয়েকটি জাতি উচ্চকোটীভুক্ত কয়েকটি জাতির একই দেবতাকে উপাস্য ঈশ্বর বলে গ্রহণ করেছেন। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, একই গ্রামে নির্দিষ্ট জাতির জন্য নির্দিষ্ট স্থানে একই দেবতা পৃথক পৃথক ভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কে জানে, দেবতাদের মধ্যে যে জাতিভেদ প্রথা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল তার সমাপ্তি সাম্যবাদের কোন মন্ত্রে রচিত হবে ? বিভিন্ন জাতির উপাস্য কয়েকটি বিশিষ্ট দেবতার উল্লেখ শ্রীঅশোক মিত্র তাঁর 'Tribes and Castes of West Bengal' (p. 70-81) গ্রন্থে করেছেন। তার মধ্যে এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা হলো, যা এখনও বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় ঐ সব জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। যেমন, বাগ্দী, দুলে, দণ্ডমাঝিদের মধ্যে গোঁসাই, বড় পাহাড়, মনসা এবং ভাদু ; বাউড়ীদের মধ্যে মনসা, ভাদু, বড় পাহাড় ও কুদরাসিনী ; ভুঁইয়াদের মধ্যে কুদরী ; ভূমিজদের মধ্যে কুদরা এবং করাম ; ডোমদের মধ্যে ধর্মরাজ, কালী এবং ভাদু ; হাড়ীদের মধ্যে কালী এবং শীতলা ; কোনাইদের

মধ্যে মনসা ও ধর্মরাজ ; কোড়াদের মধ্যে মনসা, ভাদু, কুদরা এবং ভৈরব ; কোটালদের মধ্যে কালী, লক্ষ্মী ও ষষ্ঠী ; মাল এবং মাহালীদের মধ্যে মনসা ; মালপাহাড়ীদের মধ্যে সূর্য এবং মহাদানা ; মুচিদের মধ্যে বিশ্বকর্মা ও শীতলা ; নমঃশূদ্রদের মধ্যে মনসা ; শুঁড়িদের মধ্যে গণেশ, গন্ধেশ্বরী ও কার্তিক ; তিয়রদের মধ্যে বুড়াবুড়ি, গঙ্গা ও মনসা এবং কুর্মীদের মধ্যে বড় পাহাড় ও বরাম।

বৃত্তিভিত্তিক জাতির পক্ষে এক প্রাচীন উৎপাদনব্যবস্থাকেন্দ্রিক সমাজে কোন সময়ে বৃত্তি-পরিবর্তনের প্রস্তাব শুধু অবাস্তবই নয়, দুরাশা বলেই পরিগণিত হ'ত। প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় শ্রমবিভাগ অনুসারে উৎপাদিত পণ্য একটি গ্রামে আবদ্ধ না থেকে বেশ কয়েকটি গ্রামের চাহিদার যোগান দিত। বিভিন্ন হাটে প্রচলিত বিনিময়প্রথায় এবং পরবর্তীকালে সমকালীন মুদ্রার সাহায্যে অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পন্ন হ'ত। এই ধরনের সমাজে শিল্পী, কারিগর এবং কৃষিজীবী মানুষ মুলতঃ উৎপাদনের কাজেই ব্যস্ত থাকতেন ; হাটে বেচাকেনা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। বণিকশ্রেণী এই কেনাবেচার কাজটা দেখতেন। শঙ্খকারের পণ্য শঙ্খবণিক, স্বর্ণকারের স্বর্ণালঙ্কার স্বর্ণবণিক, বারুজীবির পান তাম্বুলী হাটে ক্রেতাদের কাছে সরবরাহ করতেন। হাটের সম্পূরক সরবরাহ-কেন্দ্ররূপে মেলা তৎপর হয়ে উঠত। উৎসব বা পার্বণের প্রধান আকর্ষণ কেনাবেচা যতই হোক্ না কেন, উৎসবের জনসমাবেশকে কেন্দ্র করে কিন্তু মেলার জন্ম। কয়েকটি গ্রামের পণ্যের আদানপ্রদানের কেন্দ্ররূপে হাট দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ। কিন্তু বিশেষ ধরনের পণ্য অথবা বিশেষ আঙ্গিকে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য, যা সচরাচর হাটে বাজারে পাওয়া যায়না, এনে হাজির করতে হয় মেলা প্রাঙ্গণে। উদ্দেশ্য, প্রধানতঃ ভক্তকে ক্রেতায় পরিণত করা এবং ক্রেতাকে ঐ পণ্যের সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বর্তমান যুগের সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন এবং প্রচার ব্যবস্থার কাজটা মেলার মাধ্যমে বরাবর পরিচালিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে।

এই দুইটি জেলার ৫৬৪টি মেলার জনসমাবেশভিত্তিক এবং মাসানুক্রমিক দুইটি তালিকা দেওয়া হ'ল।

জনসমাবেশভিত্তিক মেলার তালিকা

জেলা	১,০০০	১,০০১-৫,০০০	৫,০০১-১০,০০০	১০,০০১-২৫,০০০	২৫,০০১-৫০,০০০	৫০,০০১ ও তদূর্ধে	অনির্দিষ্ট জনসমাবেশ	মোট
বাঁকুড়া	১৭৫	১৩৫	২৬	২১	২	৩	৩৮	৪০০
বীরভূম	৮১	৩৫	১১	৪	১	...	৩২	১৬৪
মোট	**২৫৬**	**১৭০**	**৩৭**	**২৫**	**৩**	**৩**	**৭০**	**৫৬৪**

মাসানুক্রমিক মেলার তালিকা

মাস	বাঁকুড়া	বীরভূম	মোট সংখ্যা
বৈশাখ	১১৬	২৫	১৪১
জ্যৈষ্ঠ	৪০	৯	৪৯
আষাঢ়	১৭	১৭	৩৪
শ্রাবণ	১৫	৪	১৯
ভাদ্র	৩	...	৩
আশ্বিন	২৬	৯	৩৫
কার্তিক	৩০	১৩	৪৩
অগ্রহায়ণ	১	১	২
পৌষ	২৩	৭	৩০
মাঘ	৪৮	২২	৭০
ফাল্গুন	২৬	২২	৪৮
চৈত্র	৫২	২৭	৭৯
সময় অনির্দিষ্ট	৩	৮	১১
মোট	**৪০০**	**১৬৪**	**৫৬৪**

মাসানুক্রমিক মেলার তালিকা একটি বিষয়ের ওপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। অগ্রহায়ণ মাসে বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা দুইটিতে মেলার সংখ্যাল্পতা, ভাদ্র মাসে বাঁকুড়া জেলায় অন্যান্য মাসের তুলনায় মাত্র তিনটি মেলানুষ্ঠান এবং একই মাসে বীরভূম জেলায় মেলার অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করার মত। এর আগে বলা হয়েছে, মেলার অর্থনৈতিক একটা দিক থাকলেও, তার বনিয়াদ্ কিন্তু উৎসবভিত্তিক। অর্থাৎ কোন উৎসবে বা পার্বণে জনসমাবেশের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন মেলায় উপস্থিত ব্যবসায়ীবৃন্দ। সুতরাং কোন উৎসবের জনসমাবেশ ব্যবসায়িকভিত্তিতে বিভিন্ন পণ্যের কেনাবেচার পরিমাণকে লাভজনক করে না তুললে, সেখানে মেলা অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। তাছাড়া, উপস্থিত দর্শনার্থী এবং অংশগ্রহণকারী মানুষের হাতে টাকাকড়ি কিংবা ক্রয়ক্ষমতা না থাকলে, কোন পণ্যদ্রব্য মেলায় নিয়ে যাওয়া অর্থহীন হয়ে পড়ে। বাঁকুড়া ও বীরভূমের কৃষিভিত্তিক সমাজের অর্থনীতি এমনই যে, ভাদ্র মাসে কৃষিজীবী মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত কম থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে ফসল কাটার কাজে সকলে ব্যস্ত থাকায় এবং ঘরে ফসল এসে না পৌঁছান পর্যন্ত ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি না পাওয়ায়, কোন উৎসবই মেলার কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে না। যোগাযোগব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার জন্য দুইটি জেলায় ভাদ্র মাসের বর্ষায় গ্রামবাসীদের পক্ষে মেলায় আসা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এখানে শুধু জাতীয়, রাজ্য অথবা জেলা সড়কের কথা ভাবলেই হবে না। সামগ্রিকভাবে দূরদূরান্তের গ্রামের সংগে ঐ সড়কের সংযোগকারী রাস্তার কথাও মনে রাখতে হবে। বলা বাহুল্য, এই দুইটি জেলাতে সেই ধরনের যোগবাহী পথের অপ্রতুলতা গ্রামের মানুষকে বর্ষাকালে বাসস্থান থেকে বেশী দূরে যেতে সাহায্য করে না। একই কারণে, পণ্যসরবরাহকারী ব্যবসায়ীরা এই অসুবিধাজনক

পরিস্থিতিতে শিল্পসামগ্রী নিয়ে উৎসবপ্রাঙ্গণে যাওয়ার ভরসা পান না। তাই চৈত্র থেকে আষাঢ় পর্যন্ত ছয় মাসে প্রায় শতকরা ৭৩ ভাগ মেলাই এই জেলা দুইটিতে অনুষ্ঠিত হয়।

মেলার লোকসমাগমের তালিকায় দেখা যাবে, শতকরা ৪৫টি মেলায় লোকসমাবেশের সংখ্যা হাজার পর্যন্ত এবং শতকরা ৩০টি মেলায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এক হাজার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অর্থাৎ শতকরা ৭৫টি মেলায় পাঁচ হাজারের বেশী লোক হয় না। জনসমাবেশের দিক হতে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক প্রকৃতির এই মেলাকে হাটের সম্পূরক এক অর্থনৈতিক কেন্দ্ররূপে গণ্য করা যেতে পারে। অবশ্য মেলার ছোট আকারের পিছনে অনেক কারণ আছে। উপলক্ষের দিক থেকে বাঁকুড়ায় গাজনের এবং বীরভূমে ধর্মরাজপূজার আধিক্য বেশী। বাঁকুড়ায় ১৪২টি মেলাই গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে এবং বীরভূমে ৪৫টি মেলা ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আঞ্চলিকভিত্তিতে উৎসবগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট। কিন্তু জেলা দুইটির বাইরের মানুষ যদি সেই উৎসবে কোন না কোন কারণে আকৃষ্ট না হ'ন, তাহলে জনসমাবেশের সংখ্যা কিছুতেই বেশী হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, মেলায় অংশগ্রহণকারীদের গ্রামের বিস্তৃতি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, আশেপাশের গ্রাম থেকেই লোকজন অধিকাংশক্ষেত্রে মেলা দেখতে আসেন। তৃতীয়তঃ, সামগ্রিকভাবে জেলায় গ্রামের জনসংখ্যাভিত্তিক আকৃতির উপর মেলার জনসমাবেশ নির্ভর করে। বাঁকুড়া জেলায় জনবসতিপূর্ণ ৩,৫৪৮টি এবং বীরভূমে ২,২৩৫টি মৌজার মধ্যে যথাক্রমে ২,২০৬টি এবং ১,০৮৫টি মৌজার প্রতিটির লোকসংখ্যা পাঁচ শতের বেশী নয়। সুতরাং এই অবস্থায় অঞ্চলভিত্তিক মেলায় খুব বেশী লোকের সমাবেশ না হওয়াটাই স্বাভাবিক। মেলার আকর্ষণ ও জনসমাবেশ বৃদ্ধির পিছনে যোগাযোগ ব্যবস্থারও বিশেষ এক ভূমিকা থাকে।

গ্রন্থে বর্ণিত প্রত্যেক গ্রামের বসবাসকারী জাতি বা সম্প্রদায়ের নাম দেখে মনে করার কোন অবকাশ নেই যে, গ্রামগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে এককভাবে স্বয়ংনির্ভর এবং পারস্পরিকভাবে বিচ্ছিন্ন। অবশ্য স্যার চার্লস মেট্‌কাফের বিশ্লেষণ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে ভুল হবে। স্যার হেনরী মেইন্‌ গ্রামীণ সমাজের স্থায়িত্বকে তার অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার সংগে কার্যকারণের এক সম্বন্ধে যুক্ত করার চেষ্টা করে ডেভিড জি. ম্যাণ্ডেলবম্‌ কর্তৃক সমালোচিত হয়েছেন (David G. Mandelbaum, op., cit., p. 328)। সেণাপুর যেমন অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে স্বয়ংনির্ভর অঞ্চল গড়ে তুলেছে, বাঁকুড়া এবং বীরভূমের গ্রামগুলিতেও সেই একই প্রকারের অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটি গ্রামকে কেন্দ্র করে যেমন হাটে গ্রামের বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশার মানুষ উৎপন্ন পণ্যের বিনিময় করে থাকেন, তেমনি মেলাতেও হাটের পরিপূরক এক বিপনীকেন্দ্র সৃষ্টি হয়। তবে এই মেলাগুলি বৃহত্তর জগতের সংগে খুব কম ক্ষেত্রেই গ্রামগুলির যোগাযোগ গড়ে তুলতে পেরেছে এবং মেলায় শহরের লোকজন ও ব্যবসায়ীসম্প্রদায়ের ভীড় কমে। সুতরাং আঞ্চলিক আন্তঃগ্রামীণ যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক মেলার মধ্যে রচিত হয়েছে, তার

পরিধি খুব বড় নয়। এই অর্থে গ্রামের না হোক, গ্রামভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা এখনও বজায় রয়েছে। মেলায় কেনাবেচার পণ্যসামগ্রীও আঞ্চলিক বৈশিষ্টমণ্ডিত এবং রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর সংগে জেলা দুইটির অধিকাংশ ছোট মেলার বা গ্রামের এখনও কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রচিত হয়নি।

ভারতবর্ষে বৃটিশশাসনের বিষয়ে কার্ল মার্কস্ ১৮৫৩ সালে মন্তব্য করেছিলেন, 'England, it is true, in causing a social revolution in Hindustan... ...If not, whatever may have been the crimes of England she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution' (Karl Marx, op., cit., p. 21)। আবার ভারতে বৃটিশশাসনের ভবিষ্যত ফল সম্পর্কে লণ্ডন থেকে ১৮৫৩ সালে ২২শে জুলাই উনি একটি চিঠিতে (১৮৫৩ সালের ৮ই অগাষ্ট তারিখে ৩৮৪০তম সংখ্যার নিউইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন নামে সংবাদপত্রে প্রকাশিত) ভারতীয় রেলপথ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'The British having broken up this self-sufficient inertia of the villages, railways, will provide new want of communication and intercourse.' (Karl Marx, op., cit., p. 37)।

এই গ্রন্থের পূজা-পার্বণ এবং মেলার তথ্য পরীক্ষা করে দেখা যাবে, গ্রামের সমাজের প্রাচীন গঠন অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ পালটায়নি, জাতির বিন্যাস এবং পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকাংশে কালবাহী ঐতিহ্য থেকে মুক্তি পায়নি, গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ প্রধানতঃ পথ ও যানবাহনের সুবিধার উপর নির্ভর করে কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে এবং ধর্ম, উৎসব এবং মেলার ধারাবাহিকতা গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে বেঁচে আছে। গ্রামে শহরের প্রভাব বিশেষ প্রসারিত হয়নি। কারণ জেলা দুইটিতে লৌকিক এবং গ্রামীণ দেবদেবীর প্রাধান্য এখনও সমানভাবেই বজায় রয়েছে। অধিকাংশ মেলায় আঞ্চলিক পণ্যই এসে থাকে। সুতরাং গ্রামের নিজস্ব শিল্পের অবস্থা যত খারাপই হোক, তার চাহিদা গ্রামের মানুষের কাছে আজও সমান রয়েছে। শতাধিক বৎসরের রেলপথ গ্রামের নিজস্ব বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ নষ্ট করিতে পারেনি। যেমন, বৃটিশ শাসনে 'হিন্দুস্থান' মার্কসীয় কোন সামাজিক বা শিল্পবিপ্লব দেখতে পায়নি। লর্ড ওয়েলেস্‌লী বৃটিশ শিল্পজাত পণ্যের বাজারের সন্ধানে উদ্যোগী হয়ে রোহিলখণ্ডে মেলা সংগঠিত করে, সেখানে বৃটিশ পশমজাত এক বস্ত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বৃটিশ প্রতিনিধিকে হরিদ্বারের মেলাতেও একই উদ্দেশ্যে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই মর্মে শ্রীরমেশ দত্ত উল্লেখ করেছেন (Romesh Dutt, op., cit., 258-59)। কিন্তু বৃটিশ শিল্প ভারতের মাটিতে শিল্পবিপ্লব ঘটাতে পারেনি। প্রাচীন উৎপাদন এবং বণ্টনব্যবস্থা বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, আমূল পরিবর্তিত হয়নি।

প্রখ্যাত নোবেল পুরস্কারবিজয়ী সুইডিশ অর্থনীতিবিদ্ গুণার মীর্ডাল সামাজিক এই স্থিতাবস্থার জন্য লোকায়তধর্মকে বেশী দায়ী করেছেন (Gunnar Myrdal, 'The

Challenge of World Poverty', New York, Vintage Books, 1970, p. 59)। এদেশে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য যা আজও রয়েছে, লোকায়তধর্ম তাকে কতটা স্থায়িত্ব দিয়েছে সেটা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু স্তরীভূত গ্রামীণ সমাজের বিন্যাস চিরাচরিত রীতি এবং প্রথা কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে আসছে। মীর্ডালের মতে, 'The existing social and economic stratification that is the product of history is supported by custom. In turn, this custom gets from religion a support that often means that the under-privileged themselves do not question or protest against their plight but instead look upon their fate as ordained by the gods and the whole paraphernalia of supernatural forces' (Gunnar Myrdal, op., cit., p. 59)। আবার পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থাও একইভাবে রীতি ও প্রথা এবং গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মীর্ডাল মনে করেন, 'A considerable part of what comes to the market, particularly but not exclusively that produced by sharecroppers, is extracted from cultivators by landowners and moneylenders. The extraction process is governed not by ordinary market forces but by custom and by economic and social power in the village' (Gunnar Myrdal, op. cit., p. 121)। পরিবারভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা এবং গ্রামের চাহিদা পূরণ করার সুনিশ্চিত পদ্ধতি যেমন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুরক্ষিত, তেমনি আর একদিকে এক গ্রামের পণ্য অন্য গ্রামে আন্তর্বাণিজ্যিক ব্যবসার মাধ্যমে সরবরাহ করার কাজও এই ব্যবস্থায় সুসম্পন্ন হচ্ছে। বাঁকুড়া এবং বীরভূমের মেলায় বিভিন্ন গ্রামের যোগসূত্র এবং পেশাভিত্তিক জাতির বৃত্তি থেকে মনে হয়, এখানকার গ্রামগুলি সম্পূর্ণভাবে না হলেও, অংশতঃ আঞ্চলিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। রাস্তাঘাট এবং যাতায়াতের মাধ্যমে সব গ্রাম যেখানে শহরের সংগে সংযুক্ত হতে পারেনি, সেখানে এই ধরনের ব্যবস্থা এখনও কার্যকরী আছে বলেই মনে হয়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ জন্ গলব্রেথের মতেও অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা গ্রামগুলিকে তাদের নিজস্ব একাকীত্বের মধ্যে থাকার শক্তি দিয়েছে। 'The selfsufficiency of the village was its strength ; to be left alone was its greatest good fortune. The lesson of centuries is not soon unlearned' (J. K. Galbraith, 'Introducing India', in Sunday, Vol II, Issue 15, Calcutta, 23 June, 1974, p. 9)।

আশ্চর্যের কথা, মার্কস্ যে পরিবর্তনের স্বপ্ন বৃটিশ শাসনের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির দ্বারা সম্ভব হতে পারে বলে মনে করেছিলেন তা বাস্তবে সত্য হয়ে ওঠেনি। পক্ষান্তরে মেটকাফ্ কিংবা মেইণ্ গ্রামগুলির যে রূপ প্রত্যক্ষ করে তাদের মৌল প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছিলেন, তা আজ নির্মম বাস্তব হয়ে রইল।

দুই ॥

'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' গ্রন্থমালা প্রণয়নের উদ্যোগে পূর্বে কেন ব্রতী হয়েছিলেন, সম্পাদক মহাশয় 'ভূমিকা'য় ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রামে এবং শহরে তথ্য সংগ্রহ করার কাজ আজকাল ক্রমেই দুরূহ হয়ে পড়েছে। এক দশকেরও আগে যে খবর গ্রামের সংবাদ-প্রেরকদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র, গ্রন্থ এবং গবেষণালব্ধ রচনায় প্রকাশিত নূতন তথ্যের আলোকে তাকে যতদূর সম্ভব পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে অনুসন্ধানভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। কিন্তু জেলা দুইটির প্রত্যেকটি গ্রামের তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। যদিও প্রত্যেকটি গ্রামের জন্য লিপিবদ্ধ প্রশ্নের সাহায্যে সংবাদপ্রেরক বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রথম পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল, তবুও সকলেই সংবাদ পাঠাননি। আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে তথ্যাহরণ করার কাজ ১৯৭০ সাল পর্যন্ত করা হয়। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রেই সে প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। এই গ্রন্থে পরিবেশিত গ্রামগুলি জেলা দুইটির সমস্ত গ্রামের এক সামান্য নমুনা হলেও, এর তাৎপর্য এবং মূল্য কম নয়। যদি সব গ্রামের তথ্য সংগৃহীত হত, তাহলে এই দুইটি জেলার বিবরণ আরও কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দিত। জনগণনা দপ্তরের প্রধান কর্মযজ্ঞ বিরাট সন্দেহ নেই ; কিন্তু লোকগণনার কাজের সংগে এই ধরনের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির অন্য আর একটি কাজকে একই সময়ে আর্থিক, প্রশাসনিক এবং অন্য নানা কারণে যুক্ত করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য পত্রের মাধ্যমে সংবাদপ্রেরকদের যোগাযোগ করে যতটা তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব, তা করা হয়েছিল। গ্রন্থে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ভাবে এই অবদান স্বীকার করে, তথ্যপ্রেরক ব্যক্তি বা সংস্থার নাম ও ঠিকানা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। তবু তাঁদের অমূল্য সাহায্যের কথা স্মরণ করে, তাঁদের সাগ্রহ সহযোগিতার জন্য সকলকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গ এবং ১৯৬১ সালে ভারতবর্ষের আদমসুমারী দফ্‌তরের কর্মতৎপরতা কেবল হিসাবনিকাশের মধ্যে পরিসীমিত না করে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন ডক্টর অশোক মিত্র, আই. সি. এস্.। তিনি বর্তমানে রাষ্ট্রপতির সচিব পদে অধিষ্ঠিত এবং দিল্লীতে জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক। ভারতের জনগণনায় সামাজিক রূপান্তর বা পরিবর্তন শুধুমাত্র পরিসংখ্যানের হিসাব ছাড়াও সমীক্ষাভিত্তিক তথ্যের বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, একথা ডক্টর মিত্র বুঝেছিলেন বলেই বর্তমান গ্রন্থমালা প্রকাশ করা সম্ভব হল। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও, জনবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানে, ডক্টর মিত্রের সুগভীর পাণ্ডিত্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি আজ সুবিদিত। তিনিই ভারতের জনগণনা দফ্‌তরকে বহুমুখী পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমে এমন এক বৈশিষ্ট দিয়েছেন, যা ভারতকে

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে এক সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ডক্টর মিত্রের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা এবং তাঁর নির্দেশে কাজ করা অত্যন্ত দুর্লভ সুযোগ বলেই আমি মনে করি। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে বিপুল জনসংখ্যার পরিসংখ্যান বুঝতে গেলে, এই দেশের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, ভাষা, জাতিগোষ্ঠী, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকার প্রয়োজন যে অত্যাবশ্যক, আমি এই মন্ত্র ডক্টর মিত্রের কাছেই পেয়েছিলাম। আমার অপটু শক্তি দিয়ে তার গভীর অর্থ বুঝবার চেষ্টা করেছি দীর্ঘ বার বৎসর। তবু মনে হয়েছে তাঁর কাছে শেখার এখনও অনেক কিছু বাকী রয়েছে। ডক্টর মিত্র এবং আমার মধ্যে শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধ আজও অচ্ছেদ্য রয়েছে। তাই শিক্ষকের কাছে আমার ঋণ ক্রমেই বেড়েই চলেছে। কেবল গুরুবন্দনাতেই নয়, এই ঋণকে জীবনের প্রতিমুহূর্তে স্বীকার করার চেষ্টা যে করি তাকে প্রাণের গভীর অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করার কথা। শুধু ভাষায় সে কথা প্রকাশ করি কি করে?

এই প্রসঙ্গে ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে আদমসুমারীর প্রাক্তন অধীক্ষক শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত, আই. এ. এস্., মহাশয়ের কথাও সুগভীর শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করছি। এই দফ্তরে বর্তমান কাজের দায়িত্ব তিনি পরম বিশ্বাসে আমার হাতেই অর্পণ করেছিলেন। জানিনা, তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা কতখানি রাখতে পেরেছি।

১৯৭১ সালে এই রাজ্যে জনগণনা দফ্তরের প্রধানের পদে শ্রীভাস্কর ঘোষ, আই. এ. এস্., মহাশয় যোগদান করেন। বর্তমানে উনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের প্রধান এবং পদাধিকারে জনগণনা দফতরের অধিকর্তা। শ্রীঘোষের কাছে কাজের স্বাধীনতা এবং চিন্তাভাবনার মুক্ত অধিকার সর্বদা পেয়েছি, তাঁকে আমি আমার কাজের নানা সমস্যায় বিব্রত করেছি এবং তাঁর কাছে দুর্বোধ্য বিষয়ের গুরুভার নিয়ে গিয়ে সমস্যাপীড়িত করেছি। কিন্তু, কোন সময়েই তাঁর সহৃদয় আনুকুল্য থেকে বঞ্চিত হইনি। আমি বিনম্র চিত্তে শ্রীভাস্কর ঘোষ মহাশয়কে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আমি গত বার বৎসর ধরে ১৯৭১ সালে ভারতের প্রাক্তন রেজিষ্ট্রার জেনরল্ শ্রীএ. চন্দ্রশেখর, আই. এ. এস., মহাশয়, ভারতের ডেপুটি রেজিষ্ট্রার জেনরল্ (সমাজবিজ্ঞান) ডক্টর বি. কে. রায়বর্মণ, ভারতের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার জেনরল্দ্বয় শ্রীখগেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী এবং শ্রী আর. সি. নিগমের কাছে নানাভাবে বহু সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ করছি।

শ্রীঅরুণ কুমার রায় এই গ্রন্থের সংকলন, অনুসন্ধান ও গ্রন্থনার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, এক উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং পবিত্র সংকল্প নিয়ে। নিছক কাজ করার জন্যেই শ্রীরায় মনোনিবেশ করেননি। আমাদের দেশের মানুষকে দেখা, চেনা এবং জানার গভীর আকুতি নিয়ে শ্রীরায় অনেক জায়গায় নানা অসুবিধার মধ্যে ঘুরে বেরিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দকে অস্বীকার করার অংগীকার ছিল বলেই, এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীরায়ের সাহচর্য আমার জীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায়রূপে চিহ্নিত হয়ে রইল। ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রীরায়কে জানাই আমার সকৃতজ্ঞ চিত্তের গভীর ভালবাসা ও শুভেচ্ছা।

আমার আর এক সহকর্মী শ্রীসহিদুল হকও পাণ্ডুলিপি-প্রণয়নে শ্রীঅরুণ কুমার রায়কে অক্লান্ত সাহায্য করে বিশেষভাবে শ্রদ্ধার্হ হয়েছেন। গ্রন্থে ব্যবহৃত মানচিত্রগুলি আঁকতে শ্রীজলধী ভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রীসুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায়কে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু, আমার সৌভাগ্য সরকারী প্রশাসনিক নিয়মকানুনের মধ্যে আমার সহকর্মী বন্ধুদের হারাতে হয় নি। তাঁরা আমার এত কাছের মানুষ যে, তাঁরা আমার সব দাবী বিনাবাক্যে মেনে আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসায় বন্দী করেছেন। আমার সাধ্য কি যে সে বাঁধন খুলে ফেলি ?

এই গ্রন্থের আলোকচিত্রগুলি নানা সূত্রে অনেকের কাছে পাওয়া গিয়েছে। আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় ব্যতীত, সোনামুখী হাড়মাসড়া গ্রামের প্রাচীন দেউল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের শ্যামসুন্দর জীউ ও সোনাতাপলের সূর্যমন্দির, পোড়ামাটির শলন মূর্তির আলোকচিত্রের জন্য বাঁকুড়া জেলার ভাদুল গ্রাম নিবাসী শ্রীরামকিংকর সিংহ মহাশয়কে, শুশুনিয়া পাহাড়, নৃসিংহতলা, মৌলেশ্বর শিবমন্দির ও আটবাই গ্রামের বাসুলী মন্দিরের আলোকচিত্রের জন্য শ্রীদুর্গাপদ সরকার, ডব্লিউ. বি. সি. এস্., (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডি. এল. আরের পি. এ.) এবং অন্যান্য কয়েকটি আলোকচিত্রের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও আনন্দবাজার পত্রিকাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই দফ্‌তরের ও. এস্. শ্রীসুনীল কান্তি মজুমদার মহাশয় বিভিন্ন সময়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, হতাশ মুহূর্ত আশাব্যঞ্জক করে তুলেছেন এবং প্রশাসনিক পরামর্শে চিন্তাভার লাঘব করে আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। তাঁকে আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

মুদ্রণবিভাগের ভারপ্রাপ্ত শ্রীরাম চন্দ্র ভড় মহাশয় আপাতঃ দৃষ্টিতে কঠোর বলে মনে হলেও, কোমল-ভাবাপন্ন হৃদয়ের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তি। সদাসর্বদা মুদ্রণালয়ের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন এবং প্রুফ্‌ সংশোধনের জন্য তাগাদায় ব্যতিব্যস্ত করে তুললেও, আজ তাঁর দান স্মরণ করছি কৃতজ্ঞতার সংগে। তাঁর দুই সুযোগ্য সহকর্মী সর্বশ্রী অপূর্ব্ব কুমার সেনগুপ্ত এবং হিমাংশু সাহা চৌধুরীর কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

ব্লক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান আর্ট এনগ্রেভার্সের সর্বশ্রী এন্. কে. বসু ও টি. কে. বসু, মুদ্রণালয় অনু প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীতিনকড়ি বারিক এবং প্রাচীন কর্মী শ্রীবিজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয়ের ব্যক্তিগত আগ্রহে ও অন্যান্য কর্মীদের সহযোগিতায় মুদ্রণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সকলকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ব্যক্তিজীবনের অবসর-মুহূর্তে বাসগৃহে লেখার স্বাধীনতা এবং অবকাশ পাওয়ার দুর্লভ সুযোগ সকলের ভাগ্যে আসে না। স্তূপীকৃত বই এবং পাণ্ডুলিপি আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের যত কাজেই আসুক, গৃহস্থালীর সুষ্ঠু পরিচালনায় তারা বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে মাত্র। কিন্তু আমার কপালে বিড়ম্বনা জুটেছে কম। অম্লমধুর সম্ভাষণে সাংসারিক জগতে এই লেখাপড়ার প্রয়োজন অস্বীকার করলেও, জানি এই কাজের পিছনে এক অলিখিত সমর্থন জানিয়ে যে অন্তরালবর্তিনী আমাকে ভবিষ্যতের কাজে উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন, তিনি আমার সহধর্মিনী শ্রীমতা জয়তী সিংহ। আমাদের সাড়ে ছয় বৎসরের কন্যা চন্দ্রাণী (চন্দ্রাবলী) অবশ্য তাঁর সংগে সহযোগিতা না করলে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হত। অতএব উভয়কেই নীরবে স্মরণ করছি।

সবশেষে, আজ একজনের কথা স্মরণ করার সময়ে এক তীব্র বেদনা হৃদয়ে অনুভব করছি। আমার প্রত্যেকটি লেখার শেষে যাঁকে প্রণাম করে আমি ধন্য হতাম, সেই ব্যক্তি আমার পিতা শ্যামাপদ সিংহ। আজ তিনি স্বর্গত। এর আগে বরাবরই তিনি তাঁর কথা সর্বসমক্ষে প্রচার করার জন্য আমাকে আপত্তি জানাতেন। আজ নীরবে নিভৃত মুহূর্তে অশ্রুসজল চোখে তাঁর কথা লিখবার সময়ে ভাবছি, আজ কোথা থেকে তিনি আমাকে ভৎ´সনা করে নিবৃত্ত করবেন। যদি করেনও, তবুও বারংবার তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে অমূল্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করব।

মত ও মন্তব্য যা ব্যক্ত করলাম, তা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ও নিজস্ব চিন্তাধারাপ্রসূত। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোন কর্মসূচী, কার্যধারা কিংবা নীতির সংগে এই রচনার প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কোন যোগ অথবা দায়িত্ব নেই। গভীর আগ্রহ, সৎ চেষ্টা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সত্ত্বেও, এই গ্রন্থে ত্রুটিবিচ্যুতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪,
সমাজবিজ্ঞান শাখা,
পশ্চিমবঙ্গ আদমসুমারী দফ্তর,
কলিকাতা।

সুকুমার সিংহ

সংকলন ও গ্রন্থনা প্রসঙ্গে

বর্তমান গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ জনগণনা দফ্‌তর হইতে প্রকাশিত "পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা" গ্রন্থমালার চতুর্থ খণ্ড রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এই গ্রন্থ খণ্ডে বাঁকুড়া ও বীরভূম এই দুইটি জেলার তথ্য বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইল। প্রকাশিত চারিটি খণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৩টি জেলায় অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ ও মেলার তথ্যাদি পরিবেশন করা হইয়াছে। শেষ অর্থাৎ পঞ্চম খণ্ডে বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলার তথ্য বিবরণী দেওয়া হইবে যাহা আগামী বৎসর প্রকাশ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা আশা রাখি।

এই গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যাদি মূলতঃ ১৯৫৭ সালের শেষার্ধ হইতে ১৯৬০ সালের প্রথমার্ধকাল পর্যন্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগৃহীত। এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া জেলায় ১,০০৫টি এবং বীরভূম জেলায় ৮৩০টি অর্থাৎ মোট ১,৮৩৫টি মুদ্রিত প্রশ্নমালা ঐ উভয় জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে বাঁকুড়া জেলা হইতে ৪২০টি এবং বীরভূম জেলা হইতে ১৫৫টি প্রশ্নমালা আমাদের নিকট ফেরত আসে। তবে উহার মধ্যে ৮৪টি প্রশ্নমালায় কোন তথ্যবিবরণী না থাকায় অথবা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রেরণ করিবার জন্য গ্রন্থে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই।

সম্পাদনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত তথ্যাদি 'গ্রামবিবরণী', 'উৎসব বিবরণী' ও 'মেলা বিবরণী' এই তিন অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। 'গ্রাম বিবরণী' অধ্যায়ে প্রদত্ত গ্রামগুলিকে প্রতি জেলার থানাভিত্তিতে ক্রমিক মৌজা নম্বর অনুসারে সাজানো হইয়াছে। যেক্ষেত্রে গ্রামের নাম, মৌজার নাম হইতে ভিন্ন, কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে মৌজার নামটি বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রামের সহিত প্রদত্ত প্রথম স্তবকের সংখ্যাগুলি গ্রামের মৌজা নম্বর, দ্বিতীয় স্তবকের সংখ্যাগুলি বর্গ মাইলে গ্রামের আয়তন, তৃতীয় স্তবকের সংখ্যাগুলি গ্রামে বসবাসকারী মোট পরিবারের সংখ্যা এবং চতুর্থ স্তবকের সংখ্যাগুলি গ্রামের মোট লোকসংখ্যা বুঝিতে হইবে। উদ্ধৃত পরিসংখ্যানটি ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে প্রদত্ত।

'গ্রাম বিবরণী' অধ্যায় (ক) হইতে (চ) পর্যন্ত ছয়টি স্তম্ভে গ্রাম সম্পর্কে নানা তথ্য-বিবরণী পরিবেশিত হইয়াছে। উহার (ক)-এ গ্রামে যে-সকল জাতি বা সম্প্রদায়ের বাস ও মোট পাড়ার সংখ্যা, (খ)-এ গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা, (গ)-এ গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশনসহ যাতায়াতের ব্যবস্থা, (ঘ)-এ গ্রামের সারা বৎসরে অনুষ্ঠিত যাবতীয় পূজা-পার্বণাদি, (ঙ)-এ গ্রামে অনুষ্ঠিত মেলার উপলক্ষ, সময়, স্থায়িত্ব ও প্রাচীনত্ব এবং (চ)-এ গ্রাম্য দেব-দেবী ও পূজার নির্দিষ্ট স্থান, মন্দির, মসজিদ-দরগাহ এবং পরিশেষে গ্রামের নামকরণ ও

গ্রাম সম্পর্কে কোন ইতিহাস বা কিংবদন্তী থাকিলে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রতিটি 'গ্রাম বিবরণীর' শেষে সংবাদদাতার নাম, পেশা ও ঠিকানা দেওয়া হইয়াছে।

'উৎসব বিবরণী' অধ্যায়ে 'গ্রাম বিবরণী'তে উল্লিখিত উৎসব-পার্বণাদির মধ্যে যেগুলি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে কেবলমাত্র সেইসব উৎসব-পার্বণাদির বিবরণ উৎসবের নামানুসারে বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কালী তাহা যে নামেই উপাসিত হউক না কেন উহা 'কালীপূজা' ; ধর্মরাজের গাজন, শিবের গাজন, চড়ক বা নীলপূজা প্রভৃতি পূজা-পার্বণগুলিকে 'চড়ক-গাজন-নীলপূজা' অথবা ধর্মরাজ, জগন্নাথ বা রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি যে-কোন দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইলে উহা 'রথযাত্রা' ; হিন্দু সাধুসন্ত বা মুসলমান পীর-ফকিরের আবির্ভাব বা তিরোভাব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবগুলিকে 'আবির্ভাব বা তিরোভাবের উৎসব' এবং আদিবাসীদের যে কোন পূজা-পার্বণ তাহা "আদিবাসী উৎসব" ; এইরূপ শিরোনামার অন্তর্ভুক্ত করিয়া একত্রে উহার বিবরণীর লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

'মেলা বিবরণী' অধ্যায়ে 'গ্রাম বিবরণী'তে উল্লিখিত মেলাগুলির মধ্যে যেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে কেবলমাত্র সেইগুলির বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে মেলা বিবরণীগুলি উৎসব বিবরণীতে প্রদত্ত শিরোনামা অনুসারে বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যে ক্ষেত্রে আমাদের সংবাদদাতা কোন গ্রামে অনুষ্ঠিত একাধিক মেলার স্বতন্ত্র বিবরণী না দিয়া কেবলমাত্র একটি মেলার বিস্তারিত বিবরণী দিয়া অন্যগুলি উহার অনুরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে আমরাও একটি মাত্র মেলার বিশদ বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। প্রতি ক্ষেত্রে একই মেলা বিবরণী বারবার উল্লেখ করা অপ্রয়োজনবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থে প্রতিটি জেলার "পূজা-পার্বণ", "মেলার স্থান, উপলক্ষ ও লোকসমাগম", "মেলার মাসপঞ্জী" এবং "প্রতীকগোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনার স্থানাদি"—এই চারি প্রকারের মোট আটটি মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। "পূজা-পার্বণ" ও "প্রতীকগোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনা স্থানাদি" মানচিত্রে সমগ্র জেলার পূজা-পার্বণগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি ভাগের জন্য পৃথক প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। মানচিত্রের সহিত প্রদত্ত নির্দেশিকাতে ঐ সকল প্রতীক চিহ্নের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "প্রতীকগোষ্ঠী অনুযায়ী উপসনা স্থানাদি" বলিতে যে সকল মন্দিরে বা দেবালয়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং নিয়মিত নিত্যপূজা হয়, মানচিত্রে কেবলমাত্র সেই সকল স্থানের মন্দিরাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। বিগ্রহহীন পরিত্যক্ত দেবালয়গুলিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, স্থানভাবহেতু কোন কোন ক্ষেত্রে মানচিত্রে গ্রন্থে উল্লিখিত সমুদয় পূজা-পার্বণ, মেলা বা মন্দিরাদি দেখানো সম্ভব হয় নাই। এই কারণেই "প্রতীক গোষ্ঠী

অনুযায়ী উপাসনার স্থানাদি" শীর্ষক মানচিত্রে গ্রামের অবস্থানকে যথাযথ রাখিয়া তীর চিহ্ন দ্বারা উপাসনার প্রতীকটিকে দেখানো হইয়াছে।

ছোট অথবা বড়, খ্যাত অথবা স্বল্পখ্যাত সকল প্রকার উৎসব ও মেলার তথ্যই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। প্রধানতঃ সংবাদদাতাদের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতেই গ্রন্থটি রচিত। এবিষয়ে আমাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা বা মতামতের কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। কেবলমাত্র সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু বর্জন করা হইয়াছে মাত্র। তথ্য বিবরণী যাহাতে নির্ভুল হয় সে-বিষয়ে যতদূর সম্ভব যত্ন গ্রহণ করা হইয়াছে; তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য বা ভুল-ক্রটি থাকা অসম্ভব নহে। বলা-বাহুল্য বিবেচক এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন যে, সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া তথ্য সংগ্রহ করা বা ক্রটী-বিচ্যুতি সংশোধন করা সম্ভব নহে।

কথায় বলা হয়, বাংলাদেশে বারো মাসে তের পার্বণ। শুধু ভারতবর্ষে নহে বোধ করি সারা পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন দেশ বা জাতির জীবনে এত উৎসব প্রিয়তা বা উৎসবের আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানাকরণবশতঃ সমাজ জীবনের ধারক ও বাহক আমাদের দেশের চিরাচরিত ও সুপ্রাচীন উৎসব-পার্বণ ও মেলাগুলি ক্রমেই অবলুপ্তির পথে চলিয়াছে। উৎসব আড়ম্বরশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, পূজা-পার্বণের সঙ্গে জড়িত নানা আচার-অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের ফলে পূজা-পার্বণের আধ্যাত্মিক মাধুর্য্যও অনেকাংশে ম্লান হইয়া গিয়াছে। কালের প্রভাবে নূতন সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উৎসব-পার্বণের রূপ ও বৈশিষ্ট পরিবর্তিত হইয়াছে, হইতেছে। অথচ এই সকল পূজা-পার্বণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা আচার অনুষ্ঠানে, ক্রিয়া-কর্মে, দেবদেবীর ধ্যানে ও মূর্তি পরিকল্পনার মধ্যে জড়াইয়া আছে নানাকালের নানাযুগের আমাদের কামনা-বাসনা, বিশ্বাস-সংস্কার। যুগধর্ম প্রভাবের জট ছাড়াইয়া আমাদের ধর্মীয় সাংস্কৃতির তথা পূজা-পার্বণের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা আজ এক দুরূহ ব্যাপার।

কেবল পূর্জা-পার্বণ নহে পূজা-পার্বণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলাগুলিও যুগধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। মেলায় ক্রয়বিক্রয়ের জন্য আমদানীকৃত উপকরণ বিশেষ করিয়া শিল্প-সামগ্রীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন আরও বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে মেলায় আয়োজিত আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে। মেলায় আমোদ-প্রমোদের আসরে দীর্ঘদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত পুতুলনাচ, তরজা, কবিগান অথবা রাজা-বাদশা-জমিদার প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের উত্থান-পতনের ঘটনাবলীকে বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া অভিনীত যাত্রা-থিয়েটার আজ আর তেমন করিয়া দর্শক মহলে সাড়া জাগায় না।

তাই সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের শিক্ষা ও রুচি অনুসারে কেবলমাত্র যাত্রা-থিয়েটারে অভিনয়ের বিষয়বস্তুই পরিবর্তন হয় নাই ; পরিবর্তিত হইয়াছে অভিনয় রীতির, সাজ-সজ্জার ও অন্যান্য কলাকৌশল। তরজা, কবিগান প্রভৃতির স্থানে আজ আসর জমাইয়াছে আধুনিক জলসা।

দ্রুত অপসৃয়মান এই সকল উৎসব-পার্বণ ও মেলা সম্পর্কে ভবিষ্যত পণ্ডিত-গবেষকদের জন্য কিছু প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করাই বস্তুতঃ এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ এবং সমাজ জীবনের উপর তার প্রভাবের অন্ততঃ একটি সাধারণ চিত্র ভবিষ্যত গবেষকরা এই গ্রন্থ হইতে পাবেন বলিয়া আমরা আশা রাখি। সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া ইহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিবার পূর্ণ যোগ্যতা আমাদের নাই। তাই এ বিষয়ে অনধিকার হস্তক্ষেপ করিতে সর্বদাই আমরা নিজদিগকে বিরত রাখিয়াছি। আমরা আশা রাখি যোগ্য ব্যক্তি এই সকল তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের দেশের পূজা-পার্বণের যথার্থ মূল্যায়ণ করিবেন এবং তাহা হইলেই আমরা আমাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিব।

মহালয়া, ১৩৮১,
পশ্চিমবঙ্গ আদমসুমারী দফ্‌তর,
কলিকাতা—১।

অরুণ কুমার রায়

সূচী

বাঁকুড়া জিলা ✻ বীরভূম জিলা

পৃষ্ঠা ২৪৪-২৪৫ লালজী মন্দির।

জোড়বাংলা মন্দির।

আর একটি জোড়বাংলা মন্দির।

বিষ্ণুপুরের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দিররূপে পরিচিত।

পথের ধারে পাথরের রথ।

প্রখ্যাত রাসমঞ্চ।

বাঁকুড়ার অন্যান্য কয়েকটি মন্দির :

সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির—বহুলাড়া।

মল্লেশ্বর শিবমন্দির—বিষ্ণুপুর।

এক্তেশ্বর শিবের মন্দির—বাঁকুড়া।

কালঞ্জয় শিবের মন্দির—পাত্রসায়র।

পোড়ামাটির অলঙ্কারসমৃদ্ধ একটি প্রাচীন মন্দির—পাত্রসায়র।

অম্বিকাদেবীর মন্দিরের সন্নিকটে গাছতলার বাঁদিকে কালুরায়রূপে পূজিত বীরস্তম্ভ এবং ডানদিকে ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি—অম্বিকানগর।

অম্বিকাদেবীর মন্দিরের সন্নিকটে শিবরূপে পূজিত বিষ্ণুমূর্তি।

কূর্মাকৃতি যাত্রাসিদ্ধিরায়—ময়নাপুর।

মন্দিরাভ্যন্তরে কামিণ্যা কলসীসহ যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্মরাজ—ময়নাপুর।

রামকৃষ্ণজীউর মন্দির—সাত্রাকোন।

রামকৃষ্ণ বিগ্রহ—সাত্রাকোন।

সোনামুখীর বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কুলদেবতা শ্যামসুন্দরজীউ।

শনির মেলায় আগত জনতার একাংশ—মটগোদা।

শিলায় খোদিত মহামায়া বিগ্রহ—সাহারাজোড়া।

শতাব্দীর সিন্দুরলিপ্ত আটবাইচণ্ডীর অস্পষ্ট শিলামূর্তি—আটবাইচণ্ডী।

হাড়মাসড়া গ্রামে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত প্রাচীনতম দেউল।

বাঁকুড়ার একটি মন্দির।

একটি প্রাচীনতম সূর্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ—সোনাতাপল।

বাঁকুড়ার পোড়ামাটির শঙ্খনমূর্তি।

শুশুনিয়া পাহাড়, ডানপাশে নৃসিংহতলা।

শ্রীধরমন্দির গাত্রে পোড়ামাটির কাজ, ডানদিকে স্বর্ণময়ী মন্দির—সোনামুখী।

প্রাচীন মৌলেশ্বর শিবমন্দির, পিছনে নির্মীয়মান নূতন মন্দির—ছাতনা।

মৌলেশ্বর শিবমন্দিরের সম্মুখে রক্ষিত কয়েকটি ভগ্ন শিলামূর্তি।

পঞ্চরত্ন মন্দির—বিষ্ণুপুর।

ভগ্নদশা প্রাপ্ত প্রাচীন বাসুলীমন্দির—আটবাইচণ্ডী।

তারামায়ের মন্দির—তারাপীঠ।

শ্বেতকুণ্ডের ধারে বক্রেশ্বর শিবমন্দির—দুবরাজপুর।

বক্রেশ্বর শিবমন্দির সংলগ্ন অসংখ্য মন্দিরের কয়েকটি।

পৃষ্ঠা ২৪৪-২৪৫ পৌষ উৎসবে ব্রহ্মোপসনা মন্দির প্রাঙ্গণে সমাগত ভক্ত নরনারীবৃন্দ—শান্তিনিকেতন।

ছাতিমতলা—শান্তিনিকেতন।

বাউলের আসর—শান্তিনিকেতন।

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার একাংশ।

'আমি কোথায় পাব তারে'—জনৈক বীরভূমের বাউল।

প্রস্তরে খোদিত প্রাচীন মনসামূর্তি—বীরভূম।

প্রত্যুষে অজয় নদ পেরিয়ে লোক চলেছে জয়দেব মেলায়।

রাধামাধব মন্দির—জয়দেব কেন্দুলি।

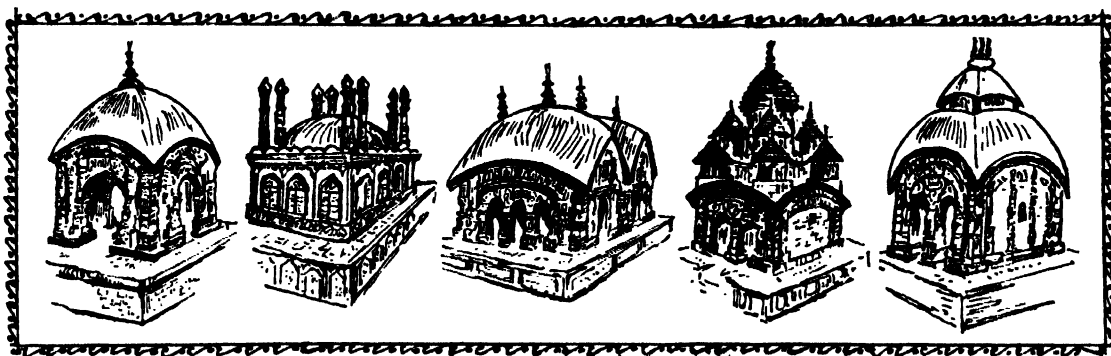
পোড়ামাটির কাজে অলঙ্কৃত রাধামাধব মন্দিরের দেওয়াল গাত্র।

জয়দেব মেলায় পণ্যসামগ্রী বহনকারী অসংখ্য গরুর গাড়ী।

বাউলের আসর—জয়দেব কেন্দুলি।

দ্বারবাসিনী দেবী—সাঁইথিয়া।

বাঁকুড়া



মানচিত্রে

বাঁকুড়া জিলার

পূজা-পার্বণ ও মেলা

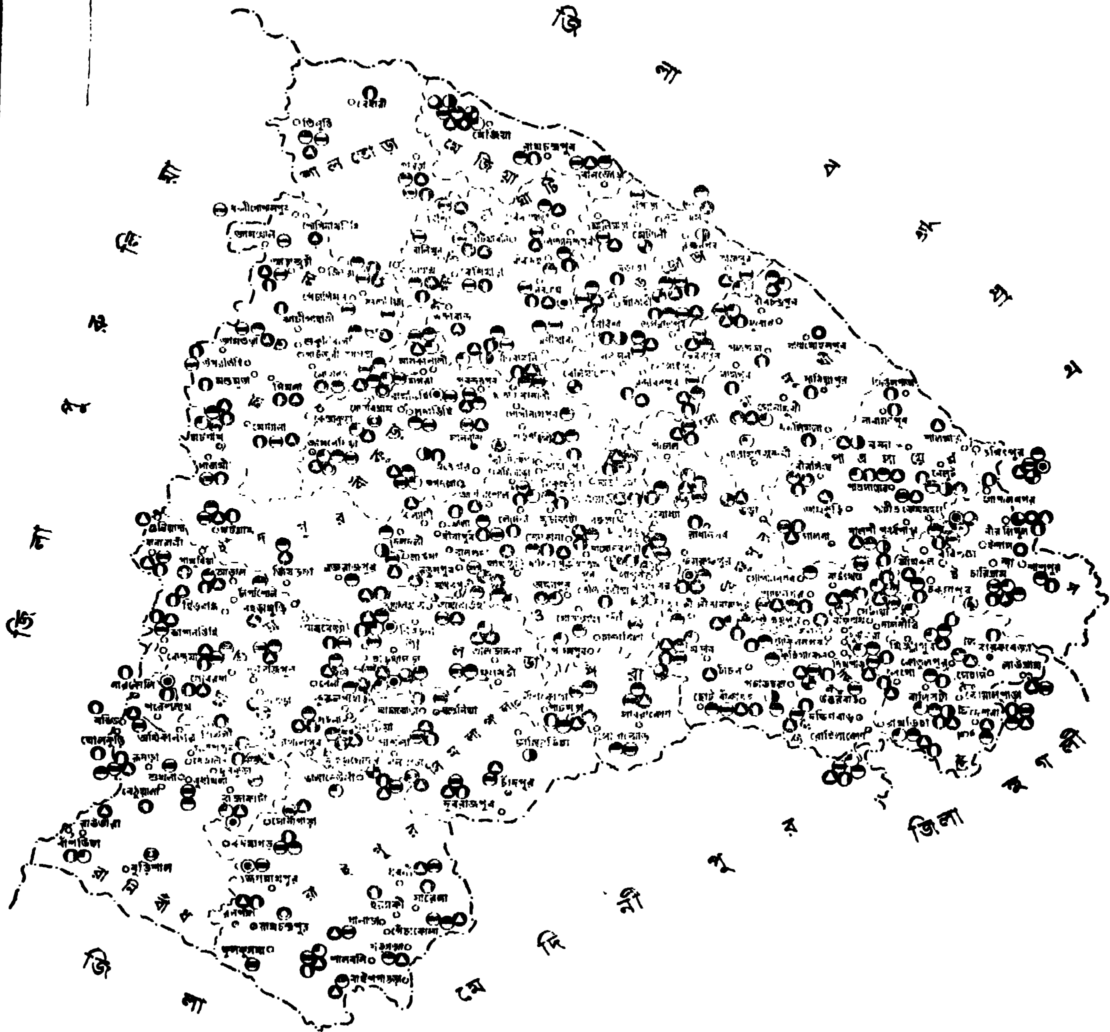
পূজাপার্বণ ও অন্যান্য উৎসবের প্রতীক নির্দেশক

শৈব দেবতা	[শিবপূজা, শিবরাত্রি, চড়ক, গাজন, নীলপূজা প্রভৃতি।] ... ...
বিষ্ণু আদি দেবতা	[রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, অক্ষয় তৃতীয়া, অনন্ত চতুর্দশী, রাস, দোল, ঝুলন, রথ, স্নান, গোষ্ঠ প্রভৃতি দ্বাদশ যাত্রা এবং বৈষ্ণবীয় মহোৎসব।]
শক্তি	[কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, গন্ধেশ্বরী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি]
ধর্মরাজ	[ধর্মরাজ পূজা, ধর্মরাজের গাজন প্রভৃতি] .. ..
লৌকিক ও গ্রাম্য দেবদেবী	[ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী, ওলাবিবি, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, দক্ষিণরায় প্রভৃতি]
পুণ্যস্নানাদি পর্ব	[বারুণী, পৌষসংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা, অষ্টমীস্নান প্রভৃতি] ... ...
তিথিঘটিত পর্ব	[বাংলা নববর্ষ, পৌষপার্বণ, অম্বুবাচী, জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি] ..
অন্যান্য দেবতা	[কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি] ... ...
আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসব	[হিন্দু সাধুসন্তদিগের] .. ..
পীরের উরস	[মুসলমান পীর, ফকির, দরবেশ প্রভৃতি] ... ...
আদিবাসী উৎসব	[করমপূজা, বাঁধনা পর্ব প্রভৃতি] ... ...
মুসলমানদিগের উৎসব	[মহরম, ঈদ, সবেবরাত প্রভৃতি] ... ...
জৈন উৎসব	[জৈন সম্প্রদায়ের যাবতীয় উৎসব] . ...
বৌদ্ধ উৎসব	[বুদ্ধজয়ন্তী প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের যাবতীয় উৎসব] ... ...
খৃষ্টানদিগের উৎসব	[ইংরাজী নববর্ষ, বড়দিন, প্রভৃতি খৃষ্টানদিগের যাবতীয় উৎসব] .. ...
বিবিধ উৎসব	[ভারতের স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, প্রখ্যাত দেশনেতার জন্মোৎসব] ..

ম.চ.

উত্তর

পূজা পার্বণ ও অন্যান্য উৎসব
জিলা বাঁকুড়া



সাংকেতিক

জিলার সীমানা	
মহকুমার সীমানা	
থানার সীমানা	
মৌজার অবস্থিতি	০

মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব।
—— সম্পাদক।

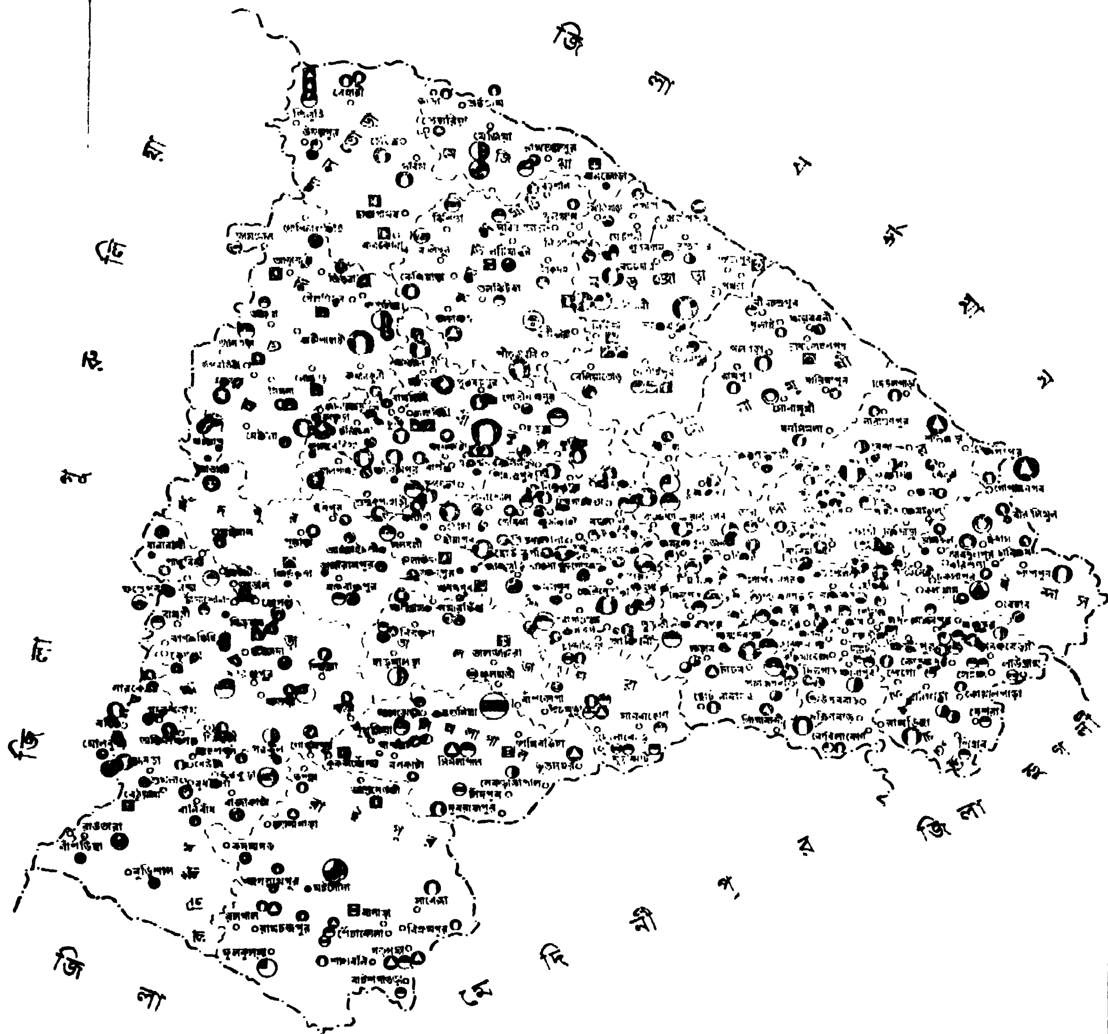
শ্রীফণিভূষণ দাশগুপ্ত

মেলার উপলক্ষ ও লোকসমাগমের প্রতীক নির্দেশক

শৈব দেবতা	[শিবপূজা, শিবরাত্রি, চড়ক, গাজন, নীলপূজা প্রভৃতি]
বিষ্ণু আদি দেবতা	[রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, অক্ষয়তৃতীয়া, অনন্তচতুর্দশী, রাস, ঝুলন, গোষ্ঠ, দোল রথ, স্নান প্রভৃতি দ্বাদশযাত্রা এবং বৈষ্ণবীয় মহোৎসব।]
শক্তি	[কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, গন্ধেশ্বরী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি]
ধর্মরাজ	[ধর্মরাজপূজা, ধর্মরাজের গাজন প্রভৃতি]
লৌকিক ও গ্রাম্য দেবদেবী	[ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী, ওলাবিবি, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, দক্ষিণরায় প্রভৃতি]
পুণ্যস্নানাদি পর্ব	[বারুণী, পৌষসংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা, অষ্টমীস্নান প্রভৃতি]
তিথিঘটিত পর্ব	[বাংলা নববর্ষ, পৌষপার্বণ, অম্বুবাচী, জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি]
অন্যান্য দেবতা	[কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি]
আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসব	[হিন্দু সাধুসন্তদিগের]
পীরের উরস্	[মুসলমান পীর, ফকির, দরবেশ প্রভৃতি]
আদিবাসী উৎসব	[করমপূজা, বাঁধনা পর্ব প্রভৃতি]
মুসলমানদিগের উৎসব	[মহরম, ইদ, সবেবরাত প্রভৃতি]
জৈন উৎসব	[জৈন সম্প্রদায়ের যাবতীয় উৎসব]
বৌদ্ধ উৎসব	[বুদ্ধজয়ন্তী প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের যাবতীয় উৎসব]
খৃষ্টানদিগের উৎসব	[ইংরাজী নববর্ষ, বড়দিন প্রভৃতি খৃষ্টানদিগের যাবতীয় উৎসব]
বিবিধ উৎসব	[ভারতের স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, প্রখ্যাত দেশনেতার জন্মোৎসব]

লোকসমাগম অনির্দিষ্ট	
১,০০০ পর্য্যন্ত	
১,০০১ — ২,৫০০	
২,৫০১ — ৫,০০০	
৫,০০১ — ১৫,০০০	
১৫,০০১ — ২৫০০০	
২৫,০০১ এবং তদূর্দ্ধ	

মেলার স্থান, উপলক্ষ ও লোকসমাগম
জিলা বাঁকুড়া



সাংকেতিক

জিলার সীমানা ...	—·—·—·—·—
মহকুমার সীমানা ...	— — — — — —
থানার সীমানা	— —·—·— —
মেলার অবস্থিতি	o

মানচিত্রটি বিবরণ-প্রেরকের সংবাদের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব।

——সম্পাদক।

শ্রীকমলবিভূষণ দাশগুপ্ত

মাসপঞ্জীর প্রতীক নির্দেশক

বৈশাখ . . . .

জ্যৈষ্ঠ . . . .

আষাঢ় . . . .

শ্রাবণ . . . .

ভাদ্র . . . .

আশ্বিন . . . .

কার্তিক . . . .

অগ্রহায়ণ . . . .

পৌষ . . . .

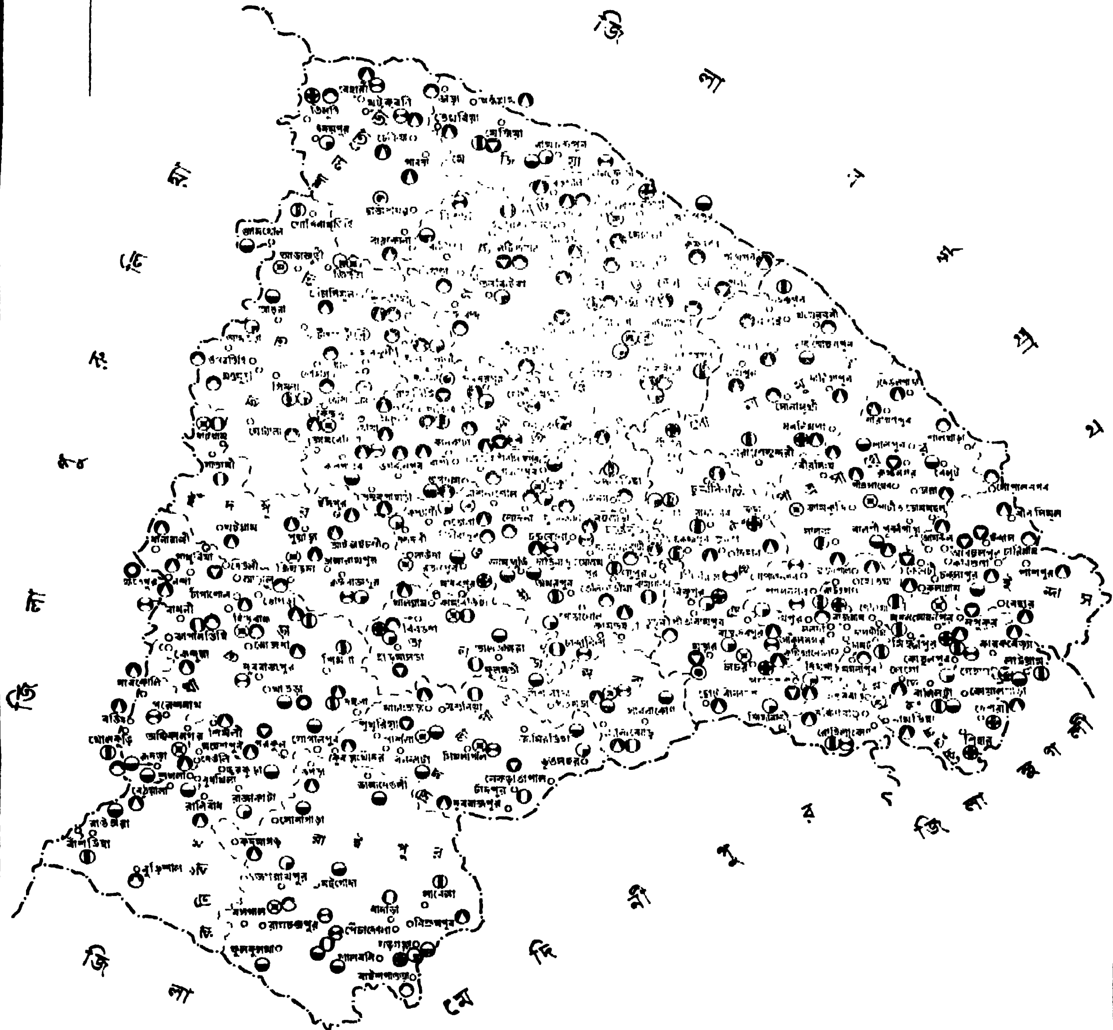
মাঘ . . . .

ফাল্গুণ . . . .

চৈত্র . . . .

চান্দ্রমাস . . . .

মাস অনির্দিষ্ট . . . .


মেলার মাসপঞ্জী
জিলা বাঁকুড়া
সাংকেতিক
জিলার সীমানা
মহকুমার সীমানা
থানার সীমানা
মেলার অবস্থিতি
মানচিত্রটি বিবরণ-প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব।
সম্পাদক।

উপাসনাস্থলাদির প্রতীক নির্দেশক

কালী, দুর্গা, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, মহামায়া প্রভৃতি . . . .

শিব, ধর্মরাজ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি . . . .

চণ্ডী, শীতলা, মনসা, বিশালাক্ষী, ষষ্ঠী, পঞ্চানন, বাবাঠাকুর প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবী . . . . . .

বিষ্ণু আদি যাবতীয় দেবতা . . . .

হিন্দু সাধুসন্তদের সমাধিমন্দির . . . .

পীর-ফকির প্রভৃতির সমাধিস্থল . . . .

মুসলমান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল . . . .

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল . . . .

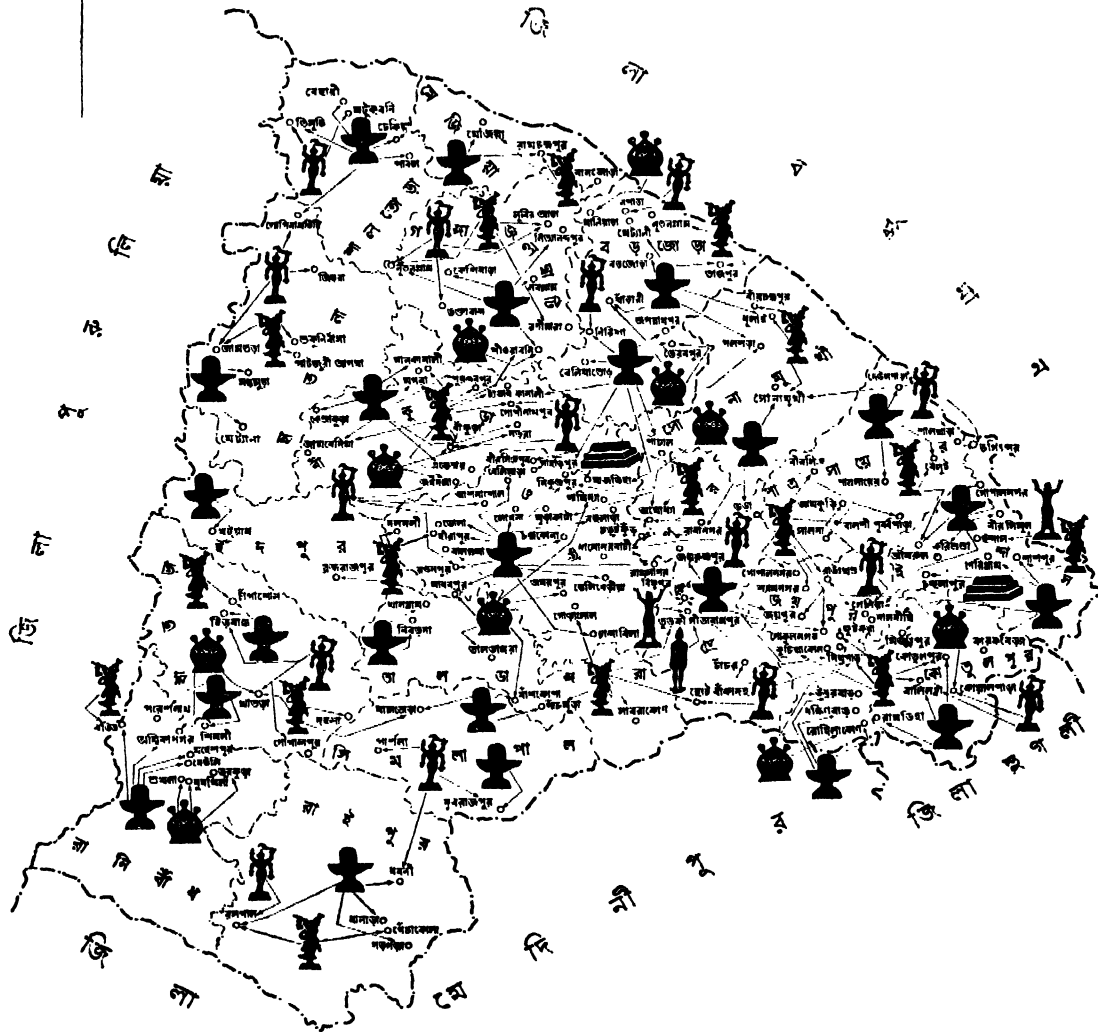
জৈন সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল . . . .

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল . . . .

আদিবাসীদের উপাসনাস্থল . . . .

প্রতীক-গোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনাস্থলাদির বিন্যাস

জিলা বাঁকুড়া



সাংকেতিক

জিলার সীমানা	—·—·—·—
মহকুমার সীমানা	— — — —
থানার সীমানা	— — —·—·—
মৌজার অবস্থিতি	○

যে স্থানে এখনও পূজা, আরাধনা অথবা ভক্ত সমাগম হয়, সেই উপাসনার প্রতীক অনুযায়ী মানচিত্রটিতে স্থান নির্দেশিত হইয়াছে।

মানচিত্রটি বিবরণ-প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব।

—সম্পাদক।

থানা ঃ বাঁকুড়া

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ মগরা। ২১।২৩৫·৭৪।১৭০।১,১২২

(ক) কামার, শুঁড়ী, বাউরী, ময়রা, তাঁতী ও গোয়ালা। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে 'মান-কানালী-বড়চক' রাস্তাটি গ্রামের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহাছাড়া, ছাতনা রেলস্টেশন হইতেও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণসংক্রান্তিতে মনসাপূজা, ভাদ্রসংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং ফাল্গুন মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহাছাড়া, এই স্থানে সাড়ম্বরে অদ্বৈতানন্দ মহা-প্রভুর আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। দুর্গাপূজাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

অদ্বৈতানন্দ মহাপ্রভুর জন্মোৎসবটি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব হইতে প্রচলিত। জানা যায়, এই উৎসবটি অদ্বৈতানন্দের বিশেষ ভক্ত নবকুমার কর্মকার কর্তৃক প্রবর্তিত হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা শ্রীভোলা-নাথ কর্মকার কর্তৃক উৎসবটি পরিচালিত হইতেছে। সাধারণতঃ দুইদিনব্যাপী উৎসবটি চলে এবং প্রত্যহ হরিনাম সংকীর্তন, ভাগবতপাঠ, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূজা ও শাস্ত্রপাঠ এবং ধর্মালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাছাড়া, সর্বজনীন ভোজ ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

(ঙ) অদ্বৈতানন্দের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে দুই-দিনব্যাপী মেলা। প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মধ্যস্থলে একটি পাকা শিবমন্দির বিদ্যমান।

গ্রামের উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে বৃন্দাবন কর্মকার নামে জনৈক গ্রামবাসী ছাতনার জমিদারগণের নিকট হইতে এই মৌজার বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। তৎপর এই স্থানের বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বসতি স্থাপনের উপযোগী করিয়া তুলেন এবং বাউরী সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে তিনি সঙ্গে আনিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। অনেকের অনুমান কর্মকার এবং বাউরী সম্প্রদায়ের লোকজন এই স্থানের আদি বাসিন্দা।

শ্রীনবীনানন্দ ঘোষাল, শিক্ষক,
গ্রাম : কাঁটাবনী, পোঃ মানকানালী,
বাঁকুড়া।

২। গ্রাম ঃ মানকানালী। ২৪।২৫৫·২০।৩।৮

(ক) ব্রাহ্মণ, তিলি, তাঁতী, কুমার, স্বর্ণকার, নমঃশূদ্র, কলু, ছুতার, মেটিয়া, লোহার, খয়রা, ডোম, বাউরী ও মুচি। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ছাতনা হইতে রিলিফ কমিটি কর্তৃক নির্মিত পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণসংক্রান্তিতে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিক-পূজা এবং কার্তিকী পূর্ণিমায় রাস উৎসব এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি স্থানীয় মুখোপাধ্যায় পরিবার এবং রাসযাত্রা উৎসবটি দে পরিবারের পারিবারিক উৎসব হইলেও সর্বসাধারণ ইহাতে যোগদান করেন। শেষোক্ত উৎসব দুইটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক পূর্ণিমা হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে স্থানীয় দে পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির, একটি বিষ্ণুমন্দির এবং একটি সুবিশাল রাসমন্দির আছে। রাসমন্দিরটির সতেরটি চূড়াবিশিষ্ট। ইহার গঠনপদ্ধতি ও শিল্প কার্য খুবই প্রশংসনীয়।

স্থানীয় মুখোপাধ্যায় পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গ্রামে আরো দুইটি শিবমন্দির এবং শালগ্রাম শিলাসহ একটি বিষ্ণুমন্দির আছে। নমঃশূদ্রপাড়ায় স্থানীয় বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বিষ্ণুমূর্তি ও শিবলিঙ্গ আছে।

শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র দে, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ মানকানালী, বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম ঃ পলাশবনী (মৌজা ঃ লদাডিহি)।
৫৩।৩০।১·৬০।১৭২।৮৯৩

(ক) তিলি, বাউরী ও তাঁতী।

(খ) কৃষিকার্য ও তাঁতশিল্প ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে চব্বিশপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব এবং ভাদ্রসংক্রান্তিতে সর্বজনীন মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মনসাপূজাটি খুব প্রাচীন।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনচারদিন-ব্যাপী।

মনসাপূজার মেলা। ভাদ্রসংক্রান্তির দিন। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে 'সন্ন্যাসী ঠাকুর' এবং 'চিন্তামণি ঠাকুরের' নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ আচ্য, শিক্ষক,
পলাশবনী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৪। গ্রাম ঃ রামডিহি। ৫৪।১৬৮'২৩।১৪।৭১

(ক) তিলি ও বাউরী। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া। গ্রামে যাতায়াতের জন্য কোন নির্দিষ্ট পথ নাই। সাধারণতঃ মাঠের উপর দিয়া যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে পৌষপার্বণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে 'বাউল সন্ন্যাসী' নামক জনৈক সাধু পুরুষের তিরোভাব উৎসবও পালন করা হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) পৌষপার্বণের মেলা। পৌষসংক্রান্তি হইতে চারদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বাউল সন্ন্যাসী ঠাকুরের নামে একটি নির্দিষ্ট বেদী আছে।

শ্রীহরিগোপাল শেঠ, শিক্ষক,
রামডিহি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৫। গ্রাম ঃ ধোবারগ্রাম। ৫৭।৩৩৫'৪৪।৬৪।৩৫৮

(ক) গ্রামটি সাঁওতালী প্রধান এবং শশগুটু, কাড়মাকুলী ও নামপাড়া নামে তিনটি পাড়ায় বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ছাতনা হইতে মধুবনগামী মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) স্থানীয় সাঁওতাল সম্প্রদায় প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া দশমী তিথিতে দুধ-পায়েস এবং ছাগ ও মোরগ বলি দিয়া মারাংবুরুপূজা করেন। ইহা ব্যতীত, বৎসরের বিভিন্ন সময় বাদনা পরব, শাকুইপূজা এবং মাঘীপূজা করিয়া থাকেন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত হেমব্রম পদবীধারী জনৈক ব্যক্তি মারাংবুরু পূজায় পৌরোহিত্য করেন। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) মারাংবুরুপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি সম্প্রতি কালের। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা সাঁওতালী-পূজার মেলা নামে পরিচিত।

(চ) গ্রামে মারাংবুরুর প্রস্তর নির্মিত মূর্তি আছে। গ্রামে তিনটি প্রাচীন আমগাছের নীচে উল্লিখিত পূজা-পার্বণগুলি অনুষ্ঠিত হয়।

জনশ্রুতি আছে যে, এই স্থানে একসময় ছাতনা রাজবাড়ীর ধোপাদিগের বাস ছিল। সম্ভবতঃ সেই কারণে এই গ্রামটির নাম "ধোবারগ্রাম" হইয়াছে। কালক্রমে গ্রামটিতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বহু লোকজন আসিয়া বসবাস স্থাপন করায় বর্তমানে ইহা সাঁওতালী প্রধান গ্রাম হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীকিরীটি ভূষণ পাত্সা, শিক্ষক,
ধোবারগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৬। গ্রাম ঃ কেঞ্জাকুড়া। ৮৯।২১৭'৬১।৩৪৬।২.১৬২

(ক) ব্রাহ্মণ, তাম্বুলী, কামার, তাঁতী, স্বর্ণকার, বাউরী, ডোম, গন্ধবণিক, বৈরাগী ও ভূমিজ। কামারপাড়া, তাঁতীপাড়া, তাম্বুলীপাড়া, পোদ্দারপাড়া, নামপাড়া, বাউরী-পাড়া প্রভৃতি নামে গ্রামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, তাঁতশিল্প, কাঁসাশিল্প ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ছাতনা হইতে মোটর-বাসে গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে গণেশপূজা, ভাদ্র মাসে বিশ্বকর্মাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি বহুদিনের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের একটি শিবমন্দির এবং একটি দুর্গামণ্ডপ এবং মনসাপূজার দুইটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গ্রামটীর পূর্বনাম কাঞ্চনকুড়া, বর্তমানে অপভ্রংশে 'কেঞ্জাকুড়া' হইয়াছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র পাল, প্রধান শিক্ষক,
কেঞ্জাকুড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ও
শ্রীরামদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
কেঞ্জাকুড়া উচ্চ বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৭। গ্রাম ঃ লক্ষ্মীশোল (মৌজা ঃ জামবেদিয়া)। ১০৩।১৮৩·৪৫।৩৫।১৭৫

(ক) বৈদ্য ও বাউরী।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ছাতনা। কেঞ্জাকুড়া-ইন্দ্রপুর অথবা কেঞ্জাকুড়া-মালিয়ান বাসপথে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণসংক্রান্তিতে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহাছাড়া, দোল উৎসবের দিন জনৈক অজ্ঞাতনামা সাধু পুরুষের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সাধুর পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। উৎসবগুলি গত প্রায় আটান্ন বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে শিবদুর্গার মূর্তিসহ একটি মন্দির এবং দামোদরের শিলামূর্তিসহ একটী মন্দির আছে। শিবমন্দিরটির উচ্চতা আঠার হাত এবং প্রস্থে পনর হাত হইবে।

শ্রীযুগল কিশোর মণ্ডল, শিক্ষক,
লক্ষ্মীশোল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জামবেদিয়া,
বাঁকুড়া।

৮। গ্রাম ঃ জগদল্লা। ১৯৬।৫১৩·২৫।২১৫।১,১৯৩

(ক) ব্রাহ্মণ, তিলি, শুঁড়ী, কামার, ডোম, কারেঙ্গা, ছুতার, নাপিত, ধোপা, মুচি, খয়রা, মাল, বাউরী, কলু এবং বৈরাগী। গ্রামে পনরটি পাড়া আছে। যেমন—মাঝেরপাড়া, তিলিপাড়া, শুঁড়ীপাড়া, বাগানপাড়া, বাউরীপাড়া, রায়পাড়া, মালপাড়া, ডোমপাড়া, কলুপাড়া, কারেঙ্গাপাড়া, ছুতারপাড়া, নাপিতপাড়া, ধোপাপাড়া, পালপাড়া ও মুচিপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, শিল্পকর্ম ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া। বাঁকুড়া-খাতরা রাস্তাটি গ্রামের মধ্য দিয়া এবং বাঁকুড়া-রাইপুর রাস্তাটি গ্রামের পাশ দিয়া গিয়াছে। এই উভয় রাস্তা দিয়াই নিয়মিত মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং শ্রাবণ মাসে মনসাদেবীর পূজা, ভাদ্রসংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মাপূজা এবং কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে কালীয়দমন উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা ও মাঘীপূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাসযাত্রা, দোলযাত্রা ও কালীয়দমন প্রভৃতি উৎসবগুলি প্রায় চারশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। অন্যান্য উৎসবগুলির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে জানা যায় যে, এইগুলি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

স্থানীয় অঞ্চলে অনুষ্ঠিত কালীয়দমন উৎসবটি বাংলা দেশের মধ্যে খুব অল্প স্থানে দেখা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে কালীনাগকে দমন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে স্থানীয় গ্রামবাসীগণ সেই দিনটিকে স্মরণ করিয়া এই উৎসবের আয়োজন করেন। ইহাতে আশেপাশের বহু গ্রামাঞ্চল হইতে অগণিত নরনারী উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। মাঘীপূর্ণিমা হইতে চারদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রাধামাধবমন্দির, দুর্গামন্দির, সরস্বতীমন্দির এবং মনসামন্দির আছে। তন্মধ্যে রাধামাধবমন্দিরটি পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট এবং দর্শনীয়। তাহাছাড়া, গ্রামের অনেক স্থানে মনসাদেবীর বেদী আছে। এই স্থানে তিনটি সন্ন্যাসীঠাকুর এবং দুইটি কালভৈরবঠাকুরের স্থান আছে বলিয়া জানা যায়।

শ্রীঅনাদি ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম : জগদল্লা, পোঃ ভাদুল,
বাঁকুড়া।

৯। গ্রাম ঃ এক্তেশ্বর। ২০২।৪৬৫·৪৪।২,৩১১।১,২৭৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, মালি, লোহার, বাউরী, ডোম, জেলে, মাল ও বৈরাগী। শঙ্করহাটী, মুড়রা, ভৈরবডাঙ্গা ও এক্তেশ্বর প্রভৃতি নামে গ্রামটিকে চারটি পাড়ায় বিভক্ত করা হইয়াছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া জংশন। গ্রামে সাধারণতঃ দুইটি পথে যাতায়াত করা যায়। যেমন—বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর রোডে বাঁকুড়া শহরের পূর্বদিকে অবস্থিত ভাদুর গ্রাম হইতে দক্ষিণাভিমুখী জেলাবোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া অথবা বাঁকুড়া শহরের দক্ষিণাংশ হইতে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরবর্তী পূর্বাভিমুখী

রাস্তায় গ্রামে পৌঁছান যায়। উভয় পথেই মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর এক্তেশ্বরনাথ শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া পৌষসংক্রান্তি উৎসব, ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী উৎসব এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) এক্তেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে একদিন, শিবরাত্রি উপলক্ষে একদিন এবং গাজন উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী মেলা বসে। মেলাগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি মনসাদেবী ও একটি ভৈরব আছে। তাহাছাড়া, এক্তেশ্বরনাথের মন্দিরটি এই অঞ্চলের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু।

এই গ্রামের নাম পূর্বে কি ছিল তাহা সঠিকভাবে জানা যায়না। অনেকে অনুমান করেন এই গ্রামে এক্তেশ্বর স্বয়ম্ভুলিঙ্গের অবস্থানহেতু স্থানটি এক্তেশ্বর নামে খ্যাত হয়। ডাঃ কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাঁকুড়া সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সম্ভবতঃ ক্ষুদি মন্নন্তরী বা তাঁহার পরবর্তী কোন এক রাজা এই স্থানে উচ্চনীচ সকল সম্প্রদায়কে একত্রে বসাইয়া ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন বলিয়া একতার স্মৃতিস্বরূপ গ্রামের নাম 'এক্তেশ্বর' হইয়াছিল। গ্রামে এইরকম নানা কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি শোনা যায়। এ সম্পর্কে এক্তেশ্বরের উৎসব বিবরণী দ্রষ্টব্য।

শ্রীবিশ্বরঞ্জন মিত্র, প্রধান শিক্ষক,
এক্তেশ্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ও
শ্রীবিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, শিক্ষক,
দি ক্রীশ্চান কলেজিয়েট স্কুল,
ও
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়,
গ্রাম : শঙ্করহাটী, বাঁকুড়া।

১০। গ্রাম ঃ সানবান্দা। ২১০।২০৬·৩৩।২০৬।১.১৬১

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কামার, ছুতার, সদগোপ, তিলি ও লোহার। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, ছুতারপাড়া, ক্ষত্রিয়পাড়া, সদগোপপাড়া, তিলিপাড়া, লোহারপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে পাকা রাস্তায় মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে চণ্ডীপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে চারটি মনসার স্থান আছে।

এই গ্রামে একটি অতি প্রাচীন শান বাঁধানো পুষ্করিণী আছে বলিয়া গ্রামটির নাম সানবান্দা হইয়াছে এইরূপ অনুমান করা হয়।

শ্রীসূর্য নারায়ণ রায়, প্রধান শিক্ষক,
সানবান্দা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সানবান্দা,
বাঁকুড়া।

১১। গ্রাম ঃ পুরন্দরপুর। ২৪৪।৬৮১·৭৪।১২৪।১,২৬৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, সদগোপ, নাপিত, কলু, শুঁড়ী, পোদ্দার ও বাউরী। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে রাণীগঞ্জ যাইবার রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে গ্রামটি অবস্থিত। এই রাস্তা দিয়া নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা ও আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা ও মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ব্যতীত গ্রামে প্রতিষ্ঠিত রাধারসিকনাগর (রাধাকৃষ্ণ) বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও কালীয়দমন উৎসব এবং কার্তিক মাসে রাসযাত্রা ও ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি বাংলা ১০৭৬ সন হইতে প্রচলিত বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক পূর্ণিমা হইতে চারদিনব্যাপী। ইহা প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

(চ) গ্রামে দুইটি মঞ্চে শ্রীরাধারসিকনাগরের অষ্টধাতু নির্মিত দুইটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাছাড়া, পনরটি বিষ্ণুমূর্তিসহ একটি বিষ্ণুমন্দির এবং একটি শিব-মন্দির বিদ্যমান। গ্রামের মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং মনসার পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীঅক্ষয় কুমার চটরাজ, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ পুরন্দরপুর,
বাঁকুড়া।

১২। গ্রাম ঃ ছাতার কানালী। ২৩৮।৩৩২·৮৭।৭৫।৫।৫

(ক) ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয়, সৎচাষী, কৈবর্ত, কামার, জেলে, তিলি ও বাউরী। গ্রামে উগ্রক্ষত্রিয়পাড়া, জেলেপাড়া, কৈবর্তপাড়া, বাউরীপাড়া, কামারপাড়া, তিলিপাড়া ও ব্রাহ্মণপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ওন্দাগ্রাম হইতে গ্রামে যাতায়াতের জন্য জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে চব্বিশপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে রাস উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল ও শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাস উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি রাসমঞ্চসহ গোপালজীউর প্রস্তর নির্মিত মন্দির, একটি চণ্ডীমণ্ডপ, একটি শ্রীরাধিকামন্দির ও একটি শিবমন্দির ব্যতীত আর একটি মাটির ঘরে শিবপূজা হইয়া থাকে।

শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ নন্দী, প্রধান শিক্ষক,
ছাতার কানালী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

১৩। গ্রাম ঃ গোপীনাথপুর। ২৭১।১৭০·৯৬।৬৭।৪৪৯

(ক) ব্রাহ্মণ, ব্যগ্রক্ষত্রিয় ও বাউরী। গ্রামে তিনটি সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও দিনমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ওন্দাগ্রাম হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গোপীনাথজীউর দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা দুইশতাধিক বৎসরের প্রাচীন উৎসব বলিয়া জানা যায়। প্রধানতঃ স্থানীয় গোস্বামীগণ কর্তৃক এই উৎসব পরিচালিত হইলেও সর্বসাধারণ এমন কি প্রতি বৎসর শতাধিক সাঁওতাল নরনারী ইহাতে যোগদান করেন। দোল পূর্ণিমা হইতে সাতদিনব্যাপী এই উৎসব চলে। ভক্তেরা পরমান্ন দিয়া মানত পূজা দেন এবং সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়। গোস্বামীগণই পূজার পৌরোহিত্য করেন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে সাতদিনব্যাপী। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) এই গ্রামের গোপীনাথজীউর মন্দির একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীরাধিকাসহ গোপীনাথজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাভিন্ন, গ্রামে চারটি শিব ও দুইটি মনসা আছে।

গোস্বামীদিগের প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথজীউর নামানুসারে গ্রামের নাম গোপীনাথপুর হইয়াছে।

শ্রীপ্রভাকর মহান্তি, প্রধান শিক্ষক,
মাইথা-গোপীনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মাজডিহা, বাঁকুড়া।

১৪। গ্রাম ঃ নড়রা। ২৭৫।১৯৭·০৮।৪০।১।,৯২০

(ক) ব্রাহ্মণ, তাম্বুলি, তিলি, কেওড়া, ধীবর, গোয়ালা, বাউরী, নাপিত, বৈরাগী, কামার, স্বর্ণকার, ধোপা, কলু, মাঝি, মুচি, ডোম, বেনিয়া, ধুনিয়া, তাঁতী, মাহিষ্য, ছুতার প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে নবান্দা রেলস্টেশন হইতে জেলাবোর্ডের একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিবাসরের মহোৎসব, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও পূর্ণিমা তিথিতে রাসযাত্রা উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পনরটি শিবমূর্তিসহ তিনটি শিবমন্দির এবং দশটি মনসামন্দির আছে।

শ্রীশান্তিময় পাত্র, প্রধান শিক্ষক,
নড়রা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নড়রা, বাঁকুড়া।

১৫। গ্রাম ঃ গোবিন্দধাম (পূর্বনাম কানিয়ামাড়া)।

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজপুতক্ষত্রিয়, গন্ধবণিক, তাঁতী, শুঁড়ী, তিলি, ডোম, হাড়ী, বাউরী, গোয়ালা, চামার, ময়রা, বৈরাগী, খয়রা প্রভৃতি। গ্রামে চৌদ্দটি পাড়া আছে। যেমন—বাউরীপাড়া, রাজপুতক্ষত্রিয়পাড়া, শুঁড়ীপাড়া,

গন্ধবণিকপাড়া, তাঁতীপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, তিলিপাড়া, গোয়ালাপাড়া, খয়রাপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, ময়রাপাড়া, হাড়ীপাড়া, চামারপাড়া, ডোমপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী ও তাঁতশিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া। বাঁকুড়া শহর হইতে রাণীগঞ্জ যাইবার জন্য পি, ডব্লিউ, ডি-র রাস্তাটি গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাভিন্ন, এই স্থানে স্থানীয় কংগ্রেসী নেতা গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ মহাশয়ের জন্মোৎসব ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসিতেছে। উৎসবগুলি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গোবিন্দ প্রসাদের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে সাত-দিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতিকালের। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা "গোবিন্দধামের মেলা" নামে পরিচিত।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির, তিনটি বিষ্ণু-মন্দির, একটি চণ্ডীমণ্ডপ এবং ছয়টি মনসামন্দির আছে। বিষ্ণুমন্দিরগুলির মধ্যে একটি মন্দিরের অবস্থা খুবই জীর্ণ।

শোনা যায়, গ্রামটির পূর্ব নাম ছিল 'কানিয়ামারা'। জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, পূর্বে এই স্থানটি জংগলাকীর্ণ ছিল। কোন এক সময় নববিবাহিতা কন্যাকে লইয়া তাহার আত্মীয়পরিজন পিত্রালয়ে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নববিবাহিতা কন্যা নিহত হয় এবং দস্যুদল তাহার গায়ের অলঙ্কারাদি লইয়া প্রস্থান করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই আদিতে এই গ্রামের নাম 'কন্যামারা' অপভ্রংশে 'কনিয়ামারা' হয়। সম্প্রতি স্থানীয় কংগ্রেসী নেতা গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ মহাশয়ের নামানুসারে গ্রামের নাম গোবিন্দধাম হইয়াছে।

শ্রীদুর্গাপদ তেওয়ারী, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ গোবিন্দধাম,
বাঁকুড়া।

উৎসব বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

বাঁকুড়া জেলার এক্তেশ্বর বাংলাদেশের একটি অতি প্রাচীন শৈবতীর্থ বলিয়া পরিচিত এবং শিবমন্দিরটি এই জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির বলিয়া খ্যাত। প্রায় পঞ্চাশ ফুট উচ্চ প্রস্তর নির্মিত পশ্চিমমুখী এই শিবমন্দিরটির চারিদিক পরিখা দ্বারা বেষ্টিত এবং ইহার দক্ষিণদিক দিয়া দ্বারকেশ্বর নদী প্রবাহিত। মন্দিরের চারিদিকের প্রবেশ পথের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমদিকের তোরণদ্বারটিই প্রধান। ইহার দুই পার্শ্বে দ্বারপাল মূর্তি, উপরিভাগে শিবদুর্গা মূর্তি ও নহবতখানা ব্যতীত তোরণগাত্রে চূণ-বালি দ্বারা নির্মিত আরো আঠারটি দেবী মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মল্লরাজগণ মন্দির সংস্কারকালে মূর্তিগুলি নির্মাণ করান। মূল শিবমন্দিরটি প্রস্তর দ্বারা নির্মিত এবং অদ্যাপি বেশ সুগঠিত। যদিও ইহার শিখরটি ভগ্নপ্রাপ্ত।

কিংবদন্তী অনুসারে বলা হয় মন্দিরটি স্বয়ং বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত। মন্দিরের গর্ভগৃহে অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর কুণ্ডের মধ্যে এক্তেশ্বর নামে খ্যাত স্বয়ম্ভু শিবের মূর্তি পূজিত হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে 'বিরূপাক্ষের আসন' নামে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। কথিত আছে যে, জনৈক শক্তিধর যোগীপুরুষ ঐ স্থানে বহুকাল যোগাসনে বসিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মন্দিরের কয়েক রশি দূরে কালভৈরবের স্থান ব্যতীত চারটি নাতিবৃহৎ পৃথক মন্দিরে যথাক্রমে খাঁদারাণী, শিবের বাহন বৃষ এবং দুইটি শিবলিঙ্গ আছে। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনেকে মনে করেন অতীতে এই শিবমন্দির বৌদ্ধমন্দির ছিল এবং বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বরই এক্তেশ্বর শিবরূপে পূজিত হইতেছেন এবং বৌদ্ধদিগের ধর্মঠাকুরের গাজনই বর্তমান শিবের গাজনরূপে চলিয়া আসিতেছে। এককালে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। অদ্যাপি বাঁকুড়া জেলায় হিন্দুদিগের ধর্মাচারণের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ধর্মপূজা পদ্ধতির 'শূন্য-পুরাণ' প্রণেতা রামাই পণ্ডিত এই জেলারই অধিবাসী ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে পূজিত ধর্মরাজ, বিশালাক্ষ্মী, বাঁসুলী, আটরাইচণ্ডী বা অষ্টভুজাচণ্ডী প্রভৃতি

দেবদেবী আদিতে বৌদ্ধদিগের দেবদেবী ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ছাতনার বাঁসুলী দেবীর মূর্তি বৌদ্ধমূর্তি বলিয়া স্বীকার করা হয়।

এক্তেশ্বর মন্দির সম্পর্কে শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—এ রকম বিশাল স্তম্ভের মতন মন্দির বাংলায় দেখা যায় না। মন্দিরগাত্রের উদ্‌গত অংশগুলি দেখে মনে হয়, যখন সম্পূর্ণ শিখরটি ছিল, তখন মন্দিরটির উচ্চতাও ছিল যথেষ্ট। এক্তেশ্বর মন্দির 'বাংলা মন্দির' নয়। রেখ দেউলের প্রতিটি অংশের বর্ধিত রূপ তার মধ্যে স্পষ্ট, কেবল শিখর শূন্য বলে রূপটি অর্ধ সমাপ্ত হয়েছে। মন্দিরের গায়ে কোন কারুকার্য নেই, কিন্তু ছোট ছোট দেউলের মণ্ডিতরূপের নক্‌শা আছে। সংস্কারের সময় মন্দিরের আসল রূপটির দিকে যে বিশেষ নজর দেওয়া হয়নি, তারও প্রমাণ আছে যথেষ্ট। কিন্তু তাহলেও এক্তেশ্বরের মন্দিরটি বিস্ময়কর, কারণ মন্দিরের এরকম ভারী ও নিরেট গড়ন আর কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ের গা থেকে খোদাই করা শিখামন্দিরের মতন এক্তেশ্বরের মন্দিরটি বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদের তীরে ঠেলে উঠেছে। (পৃঃ ১১৫)

এক্তেশ্বর মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী ও মূর্তি সম্পর্কে শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা ১৩৭১ সনে প্রকাশিত তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থ 'বাঁকুড়ার মন্দির'-এর নানাস্থানে যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন তাহার অংশবিশেষ এইস্থানে উদ্ধৃত করা হইল—বিশেষ কোন স্থাপত্য-রীতির মধ্যে পড়ে না এরকম কিছুসংখ্যক খ্যাত-অখ্যাত দেবালয়ও বাঁকুড়া জেলায় রয়েছে। এই 'অ-দলীয়' দেবসৌধগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐতিহ্যমণ্ডিত ও উল্লেখ-যোগ্য দৃষ্টান্ত সম্ভবত এক্তেশ্বরের শিব-মন্দির। বাঁকুড়া শহরের দু'মাইল দক্ষিণ-পূর্বে, দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে, এ-মন্দিরটি অবস্থিত। কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকায় সঠিক বয়স নিরূপণ কষ্টকর হলেও, আকার-প্রকারে এ-দেবালয়টিকে বাঁকুড়া জেলার সর্বপ্রাচীন মন্দিরগুলির অন্যতম বলে সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয়। ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্টে মিঃ বেগলার উল্লেখ করেছেন যে সে-সময়েরও পূর্বে এ-ইমারতটির অন্তত তিনবার সংস্কার হয়েছিল। তাঁর অনুমান অনুসারে, অতীতে কোন সময়, মন্দির-শিখর একেবারে ভেঙে পড়লে সেটি সম্পূর্ণরূপে পুনর্নির্মিত হয়। কিন্তু সংস্কারকালে শিখরের পূর্বতন আকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। তাঁর মতে এ-সময়ে শিখর নির্মাণের জন্য এক নতুন পরিকল্পনা অনুসৃত হয়েছিল যার ফলে সৌধটির পূর্বতন দেউল-গঠনের 'গণ্ডী' অংশটি খুবই হ্রস্ব করে 'আমলক' ও 'কলস' তার উপরে স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় সংস্কারের সময় ল্যাটেরাইট-নির্মিত আদি মন্দিরে ইঁট ও চুনবালির পলস্তারা লাগিয়ে অল্পস্বল্প মেরামত করা হয় এখানে-সেখানে। তৃতীয় সংস্কারের সময় ইমারতটির সামনের দিকে সংযোজিত হয় ইঁটের তৈরী একসারি খিলান। বেগলার সাহেবের রিপোর্টের পরেও অন্তত আর একবার, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে, মন্দিরের পাণ্ডাদের নির্দেশে ব্যাপকভাবে মেরামতের কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল যখন চুনবালি-পলস্তারার যথেচ্ছ প্রয়োগে সৌধটির চেহারা বেশ আধুনিক হয়ে উঠে। পূর্বতন গঠন-প্রকরণের গুরুতর পরিবর্তন সাধন করে ক্রমানুয়ে বহুবার সংস্কারের ফলে এক্তেশ্বর শিব-মন্দিরটি বর্তমানে যে-রূপ পরিগ্রহ করেছে তাতে এটিকে নির্ধারিত কোন মন্দির-স্থাপত্যশৈলীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। আধুনিক আকৃতিতে এই প্রাচীন দেবালয়টি শুধু বাঁকুড়া জেলার নয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের দেবসৌধগুলির মধ্যে এক বিরল মন্দির-নির্মাণপদ্ধতির নিদর্শন। অথচ আদিতে এটি যে দেউল—সম্ভবত পীঢ়া-দেউল-শৈলীর ছিল তার প্রমাণ বহু-সংস্কৃত এ-মন্দিরটির দেওয়ালে এখনও বিদ্যমান। মূল মন্দিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিরূপ সৌধগাত্রে উৎকীর্ণ করবার প্রথাটি এক্তেশ্বরেও অনুসৃত হয়েছে। বারংবার সংস্কার সত্ত্বেও সৌভাগ্যক্রমে এই প্রতিরূপগুলি নষ্ট হয়নি। এই প্রতিরূপগুলি থেকে মনে হয় এক্তেশ্বর শিব-মন্দির আদিতে পীঢ়া-দেউল পদ্ধতিতে নির্মিত দীর্ঘ শিখরযুক্ত এক দেবালয় ছিল। বর্তমান হ্রস্বাকৃতি সৌধের তুলনায় সে-দেবগৃহের মোট উচ্চতা অনেক বেশী হওয়ারই সম্ভাবনা। মন্দিরটির অত্যধিক পুরু দেওয়ালগুলিও এ-অনুমান সমর্থন করে। উচ্চ-শিখরযুক্ত বৃহৎ ইমারতের ভার বহন করবার উপযোগী করেই যে দেওয়ালগুলি নির্মিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে দেউলের 'শিখর' অংশ প্রায় সম্পূর্ণ অপসৃত হওয়াতে বর্তমান মন্দিরের হ্রস্বাকৃতির তুলনায় দেয়ালগুলির প্রস্থ অতি অস্বাভাবিক মনে হয়। মিঃ বেগলার বলেছেন মন্দির-পাদদেশের উদগত অংশগুলি (mouldings) এতই বলিষ্ঠ যে সে-রকমটি তিনি কুত্রাপি

দেখেন নি। এ-উক্তি থেকেও একথার সমর্থন পাওয়া যায় যে দেবালয়টি আদিতে রীতিমত বৃহৎ গঠনের ছিল। মন্দিরগাত্রে কোন ভাস্কর্যের চিহ্ন মিঃ বেগলারের নজরে পড়েনি। অতি আধুনিক কালে উগ্র রঙে রঞ্জিত কিছু কিছু অলংকরণ দেওয়ালের এখানে-সেখানে স্থাপিত হয়েছে, মূল মন্দিরের গাম্ভীর্যের সঙ্গে যেগুলির কোনই সামঞ্জস্য নেই। মন্দির-প্রাঙ্গণে রক্ষিত মহিষাসুরমর্দিনী, গণেশ ও একটি বৃষ-মূর্তি ভাস্কর্যগত বা অন্যবিধ কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

'এক্তেশ্বর' নামটির উৎপত্তি বিষয়ে মতানৈক্য আছে। স্বর্গত আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে একপাদ-ঈশ্বর কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ এক্তেশ্বর। বেদে 'একপাদেশ্বরের' উল্লেখ আছে এবং সেই নজিরেই তিনি আলোচ্য শিবমূর্তিটির নামকরণ করেছিলেন। মন্দিরের মেঝে থেকে প্রায় সাত ফুট গভীর এক কুণ্ডের মধ্যে এক্তেশ্বর লিঙ্গটি স্থাপিত। কথিত হয় সেই কুণ্ড থেকে পার্শ্ববর্তী দ্বারকেশ্বর নদ অবধি ভূগর্ভস্থ এক সুড়ঙ্গপথ আছে। সেই পথে দ্বারকেশ্বরের জল এসে কুণ্ডের মধ্যে শিবলিঙ্গটিকে সর্বদা আংশিকভাবে নিমজ্জিত করে রাখে। চোখে যতটা দেখা যায় এবং হাত দিয়ে যতটা অনুভব করা যায় তাতে লিঙ্গটিকে মহিষপৃষ্ঠের মত বক্রাকৃতি বলে মনে হয়; যোনিপট্টভেদকারী প্রচলিত শিবলিঙ্গের সঙ্গে এটির আকৃতিগত সাদৃশ্য নেই। বেদে উল্লেখিত একপাদরূপী রুদ্রের ধ্যানমূর্তির সঙ্গে এই মহিষপৃষ্ঠাকৃতি লিঙ্গটির মিল নেই বললেই চলে। সেজন্য আচার্য বিদ্যানিধি মহাশয়ের সিদ্ধান্ত কতদূর অভ্রান্ত সেকথা বলা শক্ত। একটি সংশয় অবশ্য এখানে উত্থাপিত হতে পারে। মন্দিরটি বারংবার সংস্কৃত হয়েছে। সে-সব সংস্কারের সময় আদি লিঙ্গটি পরিবর্তিত বা স্থানান্তরিত হয়েছে কিনা সেকথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কিন্তু এ-সংশয় এক আনুমানিক সম্ভাবনার কথাই ব্যক্ত করে মাত্র; 'একপাদ-ঈশ্বরের' স্বপক্ষে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে না কিছুই। কিংবদন্তী-আশ্রিত আর একটি অনুমান এই যে বহু যুগ পূর্বে মল্লভূম ও সামন্তভূমের রাজাদের মধ্যে রাজ্যের সীমানা নিয়ে যে-বিরোধ বাধে তার মীমাংসা করেন স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব এবং তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে দুই সীমানা যেভাবে নির্ধারিত হয় তারই সংযোগস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় একতা-সম্পাদনকারী একতা-ঈশ্বর অথবা একতেশ্বরের মন্দির; 'এক্তেশ্বর' একতেশ্বরেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। পার্থিব নৃপতিদের রাজ্য-সীমানা নির্ধারণ করে দিচ্ছেন স্বয়ং শিব এ-ধারণা যে উদ্দাম কল্পনাপ্রসূত তাতে সন্দেহ নেই। 'এক্তেশ্বর' নামটি সেজন্য এখনও সঠিকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

সাধারণের কিন্তু ধারণা এটি প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ নয়, স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ; কোন পার্থিব ভাস্করের হাতে এটি নির্মিত হয়নি। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে মন্দিরটি যেখানে অবস্থিত সেখানে ভূগর্ভস্থ পাথরের এক স্তর আছে মনে হয়। সেই স্তরের শীর্ষদেশ খোদিত করে লিঙ্গটির সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। পরে কুণ্ডমধ্যস্থ লিঙ্গের উপরে মন্দিরটি নির্মিত হয়ে থাকবে। শিবলিঙ্গটি স্বয়ম্ভূ বা প্রতিষ্ঠিত যা-ই হোক না কেন, শৈবতীর্থ হিসাবে এক্তেশ্বরের প্রাচীনত্বে সন্দেহ নেই। ইহা কম-বেশী হাজার বছরের প্রাচীন।

মিঃ বেগলার প্রায় একশত বৎসর পূর্বে (১৮৭২-৭৩ খৃঃ) এক্তেশ্বর মন্দির পর্যবেক্ষণ করিয়া এক্তেশ্বর মন্দির সম্পর্কে 'Report of the Archaeological Survey of India, Vol. VIII' গ্রন্থে যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয়ের রচিত District Handbook 1951, Bankura গ্রন্থ হইতে উৎসাহী পাঠকের জন্য আমরা উহার সমুদয় অংশ নিম্নে পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

The temple is remarkable in its way; the mouldings of the basement are the boldest and the finest of any I have seen, though quite plain. The temple was built of laterite, but has had sandstone and brick additions made to it since. There are traces of three different restorations or repairs executed to this temple. The first was a restoration of the upper portion, which had apparently fallen down. In the restoration, the outline of the tower and the general appearance of the temple before its dilapidation appears to have been entirely ignored, and a new design adopted. After this, repairs on a small scale were carried out, of which traces are to be seen in various patchy portions of brick and mortar. Lastly, a series of brick arches were added in front of the temple. The object of worship inside is a *lingam*, which is said to have thrust itself up through the ground. Several pieces of sculpture, both broken and sound, and almost all Brah-

manical, lie in groups on platforms outside, none of any special interest and none inscribed.

Every year the *Charak Puja* is observed at this shrine with great enthusiasm. The festival, or *parab*, commences in the middle of the month of Chaitra. On the fourteenth day before the end of the month the *pat bhakta* as the chief devotee is called, shaves and prepares himself to live the life of an ascetic till the close of the festival. Long before the dawn of the next day, the loud sound of the drum awakens the sleeping inhabitants of the neighbourhood and reminds them that the great *parab* has approached. On this day the *pat bhakta* is admitted, for the time being, into the order of devotees, and wears the *uttariya* or sacred thread. Thenceforward, he daily takes out from the temple the *pat* or sacred seat, consisting of a wooden plank studded with iron nails and having an iron pillow, and bathes it in a neighbouring tank. From day to day the number of devotees increases. Clad mostly in coloured clothes with nothing but coloured napkins to protect their heads and shoulders from the summer sun, these devotees proceed in batches to and from the temple, with baskets of flowers or garlands in their hands, followed by the beating of drums, repeating loudly and fervently the various names of the god Shiva. On the 27th day of the month the majority of the *bhaktas* become initiated; and on the 28th (or the 29th, if the month has 31 days) on what is known as the *phalbhanga* day, they eat nothing but fruit, and have by immemorial custom liberty to take fruit from any tree or garden they like. The next day, known as the *dadurghata* day, is the most important day of the festival, for it is the *parab* or *gajan* day.

On this day a *mela* or fair is held within a spacious compound adjoining the temple, which, is attended by thousands of people of all classes, male and female, young and old, from every part of the neighbouring country, all in their best attire. The crowd becomes larger as the day advances, and is at its largest in the afternoon. The whole place is a lively market, where articles of the most miscellaneous description, including toys and clay figures for children, are exposed for sale. Just before evening the *pat* is taken to the river *ghat*, is there worshipped by the devotees, and is then carried back to the temple, with the *pat bhakta* lying upon it, on his back, followed by the crowd of devotees. The pathway from the river *ghat* to the temple is filled with a long procession of devotees, attired in their peculiar manner, with reeds, baskets of flowers, and garlands in their hands, round their heads, and round their necks. They have fasted the whole day, and have not had even a drop of water to moisten their lips, but repeat as usual, in loud vioces, the various names of the great deity, and scatter flowers over the *pat;* here and there one sees solitary *bhaktas* not walking on foot but rolling on the ground towards the temple. Later on, the pathway is illuminated, not by oil lamps or candles, but by numbers of female devotees carrying on their heads earthen pots filled with burning charcoal, kept alive by pouring powdered resin over it. As night advances, the crowd gradually withdraws, and only a few spectators remain to pass the night in the holy place. Among other ceremonies performed in the darkness which follows, a great fire is lit, which is said to be an imitation of the cremation of a *sati* or virtuous wife with the corpse of her husband, the ceremony being therefore called *satidaha.*

The last (*Sankranti*) day of Chaitra was the day set apart for *charak* or swinging, which was formerly regularly practised but has now been given up. Early on the morning of the *Sankranti* day, a ceremony known as *agun sanyas*, *i.e.*, walking over burining charcoal, took place. A long post of strong *sal* wood, over 30 feet high, was set up in the open plain adjoining the temple. The top had a strong pivot, to which was affixed a large cross beam, about 24 feet long, which revolved round it, about two-thirds being on one side and one-third on the other. A long rope was tied firmly to and suspended from the end of the smaller portion of the beam. At the other end was fastened another short rope with a

large hook affixed to its lower end. This structure was known as the *charak gachh* or swinging trees. On one side of it, raised rectangular platform, about 20 feet high, was formed by placing four beams upon four posts planted in the ground with slender cross-beams over them.

When the people were ready, the *charak* post was sanctified by a priest with the customary puja. The smaller arm of the whirling cross-beam at the top was turned and brought over the wooden platform. The man who was to swing climbed the platform by a temporary staircase of wood with some other devotees, while two more stood below holding the longer rope in their hands. When he was ready, they would reduce the pressure on the rope, so as to make the arm of the cross-beam on their side go up and the other arm bend down. The hook was then thrust through the flesh on the back of the man; but if he showed any signs of fainting, he was not allowed to undertake the risk of swinging. Otherwise, he was lifted off his feet by the men below pulling down the other end of the beam; and one or both of them holding the large rope went quickly round the post, so as to whirl the man in the air. This continues for 10 or 15 minutes, according to the man's power of endurance, the devotee all the while uttering the names of Mahadeva and scattering flowers upon the assembled worshippers below. His turn being over, the others would follow him one by one until it was time for them to disperse.

(p. lxvii-lxviii)

এক্তেশ্বর শিবের নিত্য পূজা হয়। তবে প্রতি সোমবার শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে ও পূজা দিতে মন্দিরে বহু ভক্তের সমাগম হয়। সোমবার এক্তেশ্বর শিব দর্শন পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত। ইহাছাড়া, প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে, ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজন উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলির মধ্যে এক্তেশ্বরের গাজন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান।

চৈত্র মাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গাজন উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়। ঢাক-ঢোলের বাজনার সঙ্গে ভক্তদের কণ্ঠে উচ্চারিত "এক্তেশ্বর নাথ মণি মহাদেব, পাতালভেদী নাথ মণি মহাদেব, কালভৈরব নাথ মণি মহাদেব"-এর জয়ধ্বনিতে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠে। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা 'চোতগাজন' নামে খ্যাত। চৈত্রসংক্রান্তির পনর-দিন পূর্ব হইতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভক্তরা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। পূর্বে অবশ্য কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হইতে সন্ন্যাস বা ভক্ত গ্রহণ করা হইত; এখন যে-কোন লোকই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে পারেন, শুধু 'পাটভক্ত' ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সন্ন্যাসব্রতীরা গলায় উত্তরীয় ধারণ ও গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করেন এবং হাতে একটি বেতের ছড়ি রাখেন। ইঁহাদিগকে শিব-গোত্রান্তরিত করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় গলায় উপবীত দেওয়া হয়। উৎসবের কয় দিন সন্ন্যাসীরা সারাদিন উপবাস থাকিয়া নানাপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন এবং দিনান্তে ফলমূল আহার করিয়া উপবাস ভঙ্গ করেন। চৈত্রসংক্রান্তির দিন মধ্য রাত্রিকালে সন্ন্যাসীগণ 'আগুন সন্ন্যাসব্রত' পালন করেন। এই পর্ব উপলক্ষে মন্দিরের পিছন দিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ভক্তরা একের পর এক ধীরে ধীরে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়া অক্লেশে হাঁটিয়া যান।

চৈত্রসংক্রান্তির তিনদিন পূর্ব হইতে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত মহাসমারোহে এক্তেশ্বর শিবের যথারীতি পূজা ও হোম-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসব উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে প্রায় সত্তর-আশী হাজার নরনারীর সমাগম হয়। এই সময় সর্বসম্প্রদায়ের ভক্তগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিতে পারেন। সংক্রান্তির পূর্ব দিন নীলপূজা উপলক্ষে মন্দিরে সর্বাধিক স্ত্রীলোকের সমাগম হয়। অনেকে অনুমান করেন কাশীর বিশ্বনাথ বা গয়ার গদাধরের ন্যায়ই বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর প্রাচীন এবং সেই সময় হইতেই মন্দিরে এই সকল উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে; তবে দিল্লীর সম্রাট সিকন্দর শাহ-এর আমলে হিন্দু তীর্থযাত্রীদিগের উপর অত্যধিক অত্যাচারের ফলে কিছুকাল 'এক্তেশ্বরধাম' অনাদৃত অবস্থায় ছিল। পরে ষোড়শ শতাব্দীতে মল্লরাজ বীর হাম্বীর ও দুর্জন সিং-এর আমলে এই মন্দির সংস্কার করিয়া পূজা ও উৎসবের পুনঃপ্রচলন হয়।

গাজন উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথি হইতে ভীমাষ্টমী তিথি পর্যন্ত প্রতিদিন এক্তেশ্বর

শিবমন্দিরে সাড়ম্বরে ভোগ-পূজাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং উৎসব সমাপ্তির দিন সর্বজনীন অন্নভোগ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে এই মন্দিরে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে প্রায় পঁচিশ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং রাত্রিকালে মহাসমারোহে এক্তেশ্বরের পূজাদি হইয়া থাকে।

মনসাপূজা

মানকানালী গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণসংক্রান্তিতে মহাসমারোহের সহিত একযোগে গ্রামের সাতটি স্থানে মনসাপূজা ও ঝাঁপানপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং ইহাতে গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে বিশেষভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। ঝাঁপানপর্বে মূলতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই অংশ গ্রহণ করেন। কোন কোন ভক্তকে ঝাঁপানের পর দৈবশক্তি ভর করিতে দেখা যায়। ভরপ্রাপ্ত ব্যক্তি মানুষের ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কে নানা কথা বলিয়া থাকেন। তাহাছাড়া, অনেকে তাঁহার নিকট দেবীর উদ্দেশ্যে নানা বিপদ মুক্তির কামনায় মানত করেন এবং মনস্কামনাপূর্ণ হইলে বাৎসরিক পূজার দিন মহাধূমধামের সহিত মানত পূজা শোধ করেন। মানত হিসাবে প্রধানতঃ ষোড়শোপচারে পূজা, দুধ ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। পূজার পরদিন ভক্তগণ বাদ্যভাণ্ড সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন। শোভাযাত্রাকালে অনেকে সাপ খেলা দেখান। গ্রাম প্রদক্ষিণের পর তাঁহারা এক সর্বজনীন ভোজে মিলিত হন।

মেলা বিবরণী

আদিবাসী উৎসব উপলক্ষে মেলা (মারাংবুরুপূজা)

ধোবারগ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে সাঁওতালী সম্প্রদায়ের মারাংবুরুপূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। ইহা 'সাঁওতালী মেলা' নামে পরিচিত। এই মেলার প্রবর্তন সম্পর্কে একটু ইতিহাস আছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক বৎসর পূর্বে সাঁওতাল জাতির অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন ও তাঁহাদের জাতীয় ঐক্য সাধনের জন্য শ্রীকমলা কান্ত হেমব্রমের নেতৃত্বে এই স্থানে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমুনসেফ হেমব্রম। ইহাতে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং বীরভূম, বিহার ও আসাম হইতে বহু আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতা যোগদান করেন। এই সম্মেলনের পর এই স্থানে সাঁওতালদিগের দেবতা মারাংবুরুর প্রতীক স্বরূপ একটি শিলামূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা ও উৎসবের প্রচলন করা হয়। তদবধি এই স্থানে প্রতি বৎসর একটি মেলা বসিতেছে। বর্তমানে শ্রীবদন চন্দ্র হেমব্রম এই উৎসব ও মেলার পরিচালনা করিতেছেন।

মেলায় প্রধানতঃ ছাতনা, আঁচুড়ি, ঘোষেরগ্রাম, কালপাথর, শালডিহা, শুশুনিয়া এবং পুরুলিয়ার আদরা ও হুড়া হইতে প্রায় তিন-চার হাজার সাঁওতালী নরনারী আসেন। বাঁকুড়া শহর, ছাতনা, কেঞ্জাকুড়া, আঁচুড়ি প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। প্রায় পঞ্চাশটি দোকানের মধ্যে বিভিন্ন রকম খাবার ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, কেঞ্জাকুড়া, ছাতনা, হরেকৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে হাতাবেড়ী এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী নানাপ্রকার সৌখীন জিনিসপত্রের আমদানী হয়। ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদ উপলক্ষে সাঁওতালী নাচগানের আসর বসে। বহু সাঁওতালী নরনারী মদ্যপান করিয়া নাচগানে যোগদান করেন।

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা (অদ্বৈতানন্দ)

মগরা গ্রামের মেলাটি সাধারণতঃ অদ্বৈতানন্দ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে গ্রামের ডিহি সংলগ্ন প্রায় পনর-কুড়ি বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

মানকানালী, ছাতনা, বাঁকুড়া শহর প্রভৃতি স্থান হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় আট হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ প্রধানতঃ গরুর গাড়ী করিয়া আসেন।

নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল এবং বাঁকুড়া শহর ও ছাতনা থানা হইতে মেলায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন।

মেলায় সত্তর-আশিটি দোকানপাট বসে এবং অনেক ফেরিওয়ালা আসেন। ইহাতে খাবার, মনিহারী, কাপড়-চোপড়, হাঁড়ি-কলসী, পুতুল প্রভৃতি দোকানপাট ব্যতীত স্থানীয় শিল্পীদের তৈয়ারী বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্র আমদানী হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং কীর্তন ও বাউল গানের আসর বসে।

(গোবিন্দপ্রসাদ)

কনিয়ামারা অধুনা গোবিন্দধাম গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে স্থানীয় জননেতা গোবিন্দ প্রসাদ সিংহের জন্মোৎসব উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা "গোবিন্দধামের মেলা" নামে পরিচিত।

বিহারজুড়িয়া, হলাইগড়িয়া, খাটা, গোয়ালডাঙ্গা, ক্ষুদারডাঙ্গা, আড়বত, বড়জুড়ি, মালকঁড়, মৌতড়া, বনগ্রাম, গোবিন্দপুর, থুমকঁড়, অমরকানন, কঁড় প্রভৃতি স্থান হইতে ইহাতে প্রায় সাতশত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ মোটর গাড়ী ও গরুর গাড়ী করিয়া আসেন।

উল্লিখিত গ্রামগুলি হইতেই প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। প্রধানতঃ মিষ্টান্ন, মনিহারী ও কাপড়চোপড় প্রভৃতি জিনিসপত্রের কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য খেলাধূলা, কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

এক্তেশ্বর গ্রামে এক্তেশ্বর শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি হইতে দুইদিনব্যাপী একটি বৃহৎ মেলা বসে। ইহা বাঁকুড়া জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বৃহৎ মেলা বলিয়া পরিচিত। মেলাটি সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া ও কলিকাতা হইতে প্রধানতঃ যাত্রীরা আসেন। ইহাভিন্ন, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতেও কিছুসংখ্যক যাত্রী আসেন। মোট প্রায় আশি হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং বিহারের দুমকা জেলা হইতে মেলায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। ইহাতে প্রায় তিনশত দোকানপাট বসে এবং অগণিত ফেরিওয়ালা আসেন। মন্দির সংলগ্ন আংশিক দেবোত্তর ও আংশিক ব্যক্তিবিশেষের প্রায় সত্তর বিঘা জমির উপর মেলা বসে।

দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, মনিহারী, তেলেভাজা, বাসনকোসন, বই-ছবি, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহাছাড়া, ঔষধপত্র, কাপড়চোপড় প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকানপাটও বসে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ সারা বৎসরের প্রয়োজনীয় ঘরগৃহস্থালির দ্রব্য-সামগ্রী এই মেলা হইতে ক্রয় করিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে আদায়ীকৃত খাজনার অর্থে মন্দির সংস্কার ও উৎসবের ব্যয়ভার নির্বাহ করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য মেলায় সাধারণতঃ নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক ও লটারীর দল আসে। তাহাছাড়া, কীর্তনগান, বাউলগান, কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। অগণিত নরনারী এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

মেলায় যাত্রীদের সুখ-সুবিধা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পুলিশবাহিনী ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দল বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এক্তেশ্বর শিবকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে। তবে এক্তেশ্বরের গাজনের মেলাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও বৃহৎ মেলা। উল্লিখিত মেলা দুইটিতে প্রায় চল্লিশ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং গাজনের মেলার তুলনায় দোকানপাট কিছু কম আসে।

দুর্গাপূজার মেলা

কেঞ্জাকুড়া গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে শারদীয়া সপ্তমী তিথি হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত চারদিনব্যাপী ব্যক্তিবিশেষের প্রায় দশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা 'বাসীহাটের মেলা' নামে খ্যাত এবং ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় শালডিহা, কালপাথর, তেঘরি, ছাতনা, ঘোষেরগ্রাম, ঝাটিপাহাড়ী প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায়

আট-দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। তাহাছাড়া, রাজগ্রাম ও বাঁকুড়া শহর হইতে মোটরবাসে কিছু সংখ্যক যাত্রী আসেন।

প্রধানতঃ বাঁকুড়া শহর, ছাতনা, ঝাটিপাহাড়ী, রাজগ্রাম, হুড়া, শালডিহা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতা ও ফেরিওয়ালারা আসেন। মেলায় দেড়শতাধিক দোকান বসে এবং ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়-চোপড়, কৃষিযন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো, ঝুড়ি, খেলনা, পুতুল, পাথরের জিনিসপত্র, বই-ছবি এবং শাকসব্জী ও ফলমূল আমদানী হইয়া থাকে।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, পুতুল-নাচ, ম্যাজিক ও সাঁওতালীনাচের ব্যবস্থা করা হয়। অগণিত দর্শক এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

দোলযাত্রার মেলা

জামবেদিয়া মৌজার অন্তর্গত লক্ষ্মীশোল গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে চারদিন-ব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে হাঁটিয়া প্রত্যহ গড়ে প্রায় আট-নয় শত নরনারীর এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। মেলায় প্রধানতঃ কয়েকটি ময়রা ও তেলেভাজার দোকান বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য হরিনাম সংকীর্তন ও যাত্রাভি-নয়ের ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রাদল সাধারণতঃ কেঞ্জাকুড়া গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসে।

গোপীনাথপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে গোপীনাথজীউর দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বৈকালের দিকেই মেলায় লোকসমাগম হয়।

নিকুঞ্জপুর, মাজডিহা, কুষ্টিয়া এবং ওন্দা প্রভৃতি গ্রাম হইতে দৈনিক গড়ে প্রায় এক হাজার যাত্রী আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্যাদির পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়, তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ খাজনা আদায় করা হয় না।

মেলার তিনদিনই আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন বৎসর গ্রামের যুবক দল থিয়েটারের আয়োজন করেন।

পৌষপার্বণের মেলা

রামডিহি গ্রামে পৌষসংক্রান্তি হইতে চারদিনব্যাপী পৌষপার্বণ উপলক্ষে একটি ছোট মেলা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা 'বকুলতলার মেলা' নামে পরিচিত। মেলায় দোকানপাটের সংখ্যার এবং লোকসমাগমের দিক দিয়া তেমন উল্লেখযোগ্য না হইলেও প্রাচীনত্বের দাবী রাখে। সাধারণতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মাত্র দেড়-দুইশত নরনারীর সমাগম হইতে দেখা যায় এবং ময়রা ও মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকান-পাট বসে। মেলার কয়েক দিন প্রত্যহ রাত্রিকালে যাত্রাভিনয় ও কীর্তনগান অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামেই একটি যাত্রাদল আছে, অধিকারীর নাম—শ্রীভোলা নাথ আঠা।

রথযাত্রার মেলা

নড়্রা গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের উত্তর প্রান্তে উন্মুক্ত মাঠে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং কাপিষ্ঠ, শালবান্দা, পুরন্দরপুর, বেলিয়া-তোড়, শালতোড় প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় দশ হইতে পনর হাজার নরনারী প্রধানতঃ গরুর গাড়ী ও মোটরবাসে করিয়া মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বাঁকুড়া শহর, বেলিয়াতোড়, সোনামুখী, বেলবোনী, প্রতাপপুর, উপরবন্দো, সাহাপুর, শিরসাড়া, পলাশডাঙ্গা, আইংটা, বীরসিংহপুর, আগয়া, একড়াবাদ, নবান্দা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় প্রায় দেড়শত দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, তালপাতার বাঁশী ও পাখা, মাটির খেলনা–পুতুল প্রভৃতি আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, সার্কাস, নাগরদোলা ও লটারীরদল ব্যতীত প্রতি বৎসর যাত্রাভিনয়

ও জলসার আসর বসে। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। অধিকারী—শ্রীঅম্বুজাক্ষ পাত্র।

রাসযাত্রার মেলা

জগদল্লা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উপলক্ষে গ্রামের রাসতলায় চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় প্রতিদিন গড়ে পাঁচ-ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় খাবার, মনিহারী, বাসনপত্র, বই-ছবি, কৃষিযন্ত্রপাতি, খেলনা-পুতুল ইত্যাদি আমদানী হয়। বিক্রেতারা প্রধানতঃ বাঁকুড়া শহর হইতে আসেন। আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আসে।

[বাঁকুড়া শহর এবং এই জেলায় বিভিন্নস্থানে অনুষ্ঠিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পূজা-পার্বণ ও মেলা সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় ও সংবাদদাতা বাঁকুড়া নিবাসী ডাঃ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তথ্যের ভিত্তিতে রচিত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

এক সময় বাঁকুড়া জয়বেলিয়া পরগণার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে বিষ্ণুপুর রাজ বীর হাম্বীরের এক পুত্র বাঁকুড়ামল্লের নাম অনুসারে উক্ত ক্ষুদ্র পল্লীটির নাম বাঁকুড়া হয়। শতাধিক বৎসর পূর্বে বাঁকুড়া শহরকে কেন্দ্র করিয়া স্বতন্ত্র বাঁকুড়া জেলার পত্তন হয়। বর্তমানে ইহা বাঁকুড়া জেলার সদর শহর। ১৯৬১ সনের জনগণনা অনুসারে এই শহরের লোকসংখ্যা ৬২,৮৩৩। পূর্ব রেলপথে এইস্থানেই একটি স্টেশন আছে। এই শহরে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, তেলী, তাম্বুলী, মোদক, সোনারবেনে, গন্ধবেনে, তাঁতি, শুঁড়ি, কামার, কলু, কেওট, শাঁখারী, লোহার, বাউরী, বাগদী, ছুতার, নাপিত, ভেড়িয়াল, মুখি, হাড়ি, যুগী, মুসলমান, দেশীয় খৃষ্টান এবং পশ্চিমা হিন্দুস্থানী ও উৎকল প্রদেশের লোকজনেরা বসবাস করিতেছেন।

বাঁকুড়া শহরের মধ্যে অনেকগুলি পাড়া বা মহল্লা আছে। ঐ সকল মহল্লায় যে শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোকজন বেশী বসবাস করেন তাহার উল্লেখ করিয়া মহল্লাগুলির নাম নীচে উল্লেখ করা হইল। রাজগ্রাম (তাঁতি ও তাম্বুলী), কানকাটা, পাঠপুর, কেঠেরডাঙ্গা (তেলি), লোকপুর কেন্দুয়াডিহি (ভেড়িয়াল), গোপীনাথপুর (তাঁতী), লালবাজার দোলতলা, (কামার ও মুচি), যুগীপাড়া (ব্রাহ্মণ ও যুগী), পোদ্দারপাড়া (পোদ্দার), কেওটপাড়া (কেওট), ইদগামহল্লা (মুসলমান), নূতনচটি (মুচি, গন্ধবেনে ও দেশী খৃষ্টান), মোলডুবকা (কামার, ব্রাহ্মণ, বাউরী), কুরকুরিয়া (বাউরী, লোহার, বাগদী, ব্রাহ্মণ), পাঠকপাড়া (ব্রাহ্মণ ও কণৌজিয়া ব্রাহ্মণ), শাঁখারীপাড়া (শাঁখারী), তেলগড়িয়া জিনাগিনিপাড়া (বাউরী), নূনগোলা (পোদ্দার), রামপুর (ব্রাহ্মণ, শুঁড়ি, সৎগোপ)।

শ্রী বি, রায় মহাশয় ১৯৬১ সালের 'ডিষ্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক বাঁকুড়া' গ্রন্থের মুখবন্ধে বাঁকুড়া জেলার নামকরণ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

The district has been so named after its chief town Bankura. It was spelt differently in different times. In Rennell's Map (1779) it appeared as 'Bancoorah' to denote a small village. It was also referred to as 'Bakoonda' or sometimes as 'Bankoorah' in various official papers. Colonel J. E. Gastrell, the Revenue Surveyor referred to the town as 'Bancoorah' in his Statistical and Geographical Report on the district.

O'Malley says in his Gazetteer that, "According to local tradition, the town was named after its reputed founder, a chieftain called Banku Rai, from whom the Rais of Badra, a small hamlet of Bankura, claim descent. Another local legend is that the town is so called after Bir Bankura, one of the twenty-two sons of Bir Hambir, Raja of Bishnupur, who divided his kingdom into as many *tarafs*

or circles and gave one to each of his sons. *Taraf* Jaybelia fell to the lot of Bir Bankura, who established himself at the present site of the town, which was then in the midst of thick jungle." O'Malley also suggested that, "the name is a corruption of Bankunda, meaning the five tanks. The name Bankunda is found in a Sanskrit verse by Edu Misra (a genealogist of the 15th century, now regarded as an authority on the history of Bengal families), which records the fact that the great poet and ascetic, Sriharsa of the Bharadwaja *gotra* (Sriharsa, the son of Medhatithi or Tithimedha is perhaps meant) lived in Kanka in Bankunda to the west of Burdwan".

According to late Jogesh Chandra Ray Vidyanidhi, a noted scholar of Bankura, the place might have been so named because of the curved (*banka*) position of the *lingam* in the famous Siva temple of Ekteswar, two miles outside the town. He also suggested that the two words *bam* (left) and *kunda* (a spring or a reservoir) may have combined to form, in succession, the words Bamkunda, and then, Bankura. But scholars differ on these various theories of the origin of the name of the district.

The National Professor Suniti Kumar Chatterji thinks that the word 'Bankura' may have sprung from the Sanskrit root word ***vakra***, meaning 'crooked or serpentine', which in Prakrit became ***vakka*** and then ***vanka***, which latter word had transformed into New 'Indo-Aryan' ***banka***, ***vanka***, ***banku***, ***vanku***. It was used to denote biggishness giving the form ***Bankuda*** or ***Bankura*** and this could be used as an epithet or sobriquent meaning "the nice handsome one who is to be treated with respect". This, apparently, was one of the descriptive names of the popular deity ***Dharma*** who was very widely worshipped in West Bengal under one of his names ***Bankura Ray*** (King Bankura). This is fully corroborated by various mediaeval Bengali literature, (the ***Mangal Kavyas***) as also many notable temples of the area. As an expression of the popularity of the ***Dharma*** cult in the Rarh area, the district of Bankura may have got its name as such after the name of the popular ***Dharma*** deity 'Bankura Ray'.

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব

বাঁকুড়ার সোনামুখীতে চৈত্র মাসের রামনবমী তিথিতে সিদ্ধ মহাত্মা মনোহর দাস বাবাজীর তিরোভাব উপলক্ষে কেন্দুবিল্বের জয়দেবের মেলার ন্যায় একটি বিরাট মেলা বসে। এই মহোৎসবে প্রায় দশ হাজার নেড়ানেড়ি, বাউল, সাঁই ও বৈষ্ণবদিগের সমাগম হয় এবং বহু দোকানপাট বসে। সোনামুখীতে মনোহর দাস বাবাজীর সাধনস্থলে একটি আখড়া প্রতিষ্ঠিত আছে।

ইন্দ পরব

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, ছাতনা, খাতড়া প্রভৃতি স্থানে মল্লভূম, সামন্তভূমের রাজারা একসময় খুব ধূমধামের সহিত ভাদ্র মাসের ইন্দ্র দ্বাদশী তিথিতে ইন্দ পরব পালন করিতেন। ইহাই 'শক্রোত্থান' উৎসব। অদ্যাপি খাতড়ায় এই উৎসব খুব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে একটি ডালপালাহীন সুউচ্চ শাল বৃক্ষকে উৎসবের স্থানে পুঁতিয়া ইন্দ বা ইন্দ্র রাজারূপে পূজা করা হয়। লোকে বলে 'ইন্দকাঠ'। এই আস্ত শাল কাঠটিকে নানা রংয়ের কাপড় দ্বারা জড়াইয়া উহার অগ্রভাগে একটি ছত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইন্দ্র রাজাকে কপি কলের সাহায্যে কাছি বাঁধিয়া যখন লম্বাভাবে দাঁড় করাইয়া পোঁতা হয়, তখন বহু দর্শক উপস্থিত থাকেন। ইহাকে 'ইন্দ্রউঠা' পর্ব বলে। মূল ইন্দের চারিদিকে ষোড়শ মাতৃকার প্রতীক স্বরূপ সুসজ্জিত ষোলটি অপেক্ষাকৃত ছোট শালের গুঁড়ি পোঁতা হয়। এইগুলিকে লোকে বলে ইন্দের মাসী-পিসী। খাতড়ার ইন্দ পরব একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং দর্শনীয় উৎসব। উৎসবে স্থানীয় লোকজন ব্যতীত নানা স্থান হইতে বহু সাঁওতাল নরনারী আসেন এবং উৎসব প্রাঙ্গণে অনেকগুলি দোকানপসার বসে।

গোপাষ্টমীর মেলা

বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে গন্ধেশ্বরী নদীর অপর পারে এক্তেশ্বর গোশালায় স্থানীয় মাড়োয়ারীদের পরিচালনায় গোপাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে সুন্দর সুন্দর মৃণ্ময় মূর্তি

নির্মাণ করিয়া প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উৎসব প্রাঙ্গণে ময়রা, তেলেভাজা, মণিহারী, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির দোকানপসার বসে এবং আমোদ প্রমোদের জন্য দুইদিন যাত্রাভিনয় হয়।

তুষুপূজা

বাঁকুড়া শহরে এবং এই জেলার বিভিন্ন পল্লীর ঘরে ঘরে সারা পৌষ মাসব্যাপী মেয়েরা তুষুপূজা করেন। তুষু-পূজা উপলক্ষে একটি নূতন মাটির সরায় তুষ বোঝাই করিয়া মধ্যস্থলে গাঁদা ফুল ও উহার চারিপাশে মাটির প্রদীপ দিয়া সাজানো হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে প্রদীপগুলি জ্বালাইয়া দিয়া ঘরের মেয়েরা মিলিতভাবে কিছুক্ষণ তুষুর গান গাহেন এবং মুড়ি, কাঁচা মূলা ও খেজুর পাটালি দিয়া তুষুর পূজা করেন। পৌষসংক্রান্তির পূর্ব দিন 'তুষুর জাগরণ' ব্রত পালন করা হয়। এই দিন সারা রাত জাগিয়া তুষুর গান করিতে হয়। পরের দিন প্রাতঃকালে কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইয়া তুষুর গান গাহিতে গাহিতে মেয়েরা নদীতে বা পুষ্করিণীতে তুষু ভাসাইতে যান এবং তুষগুলি জলে ভাসাইয়া উক্ত মাটির সরায় জল ভরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। ইহাকে 'মকর জল' বলে এবং ঐ জল বাড়ীর সকলে পান করেন। ইহার পর 'দুবড়ি' ও 'লবড়ি' পিঠা তুষুর নামে উৎসর্গ করিয়া সকলে মিলিয়া পিঠা খাইতে বসেন। নীচে বাঁকুড়া জেলার পল্লীতে পল্লীতে গীত একটি তুষু গান লিপিবদ্ধ করা হইল। মূলতঃ বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র ঠিক এই ধরণেরই গান গাওয়া হয়; কোন কোন স্থলে এই গানের সহিত দেশের সমসাময়িক ঘটনার বিবরণ ও কিছু কিছু রঙ্গ-তামাসা ছড়ার ছন্দে ইহার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়।

তুষ তুষালু, গাঙ্গ তুষালু, তুষালু গো রাই,
তুমার দৌলতে মোরা দুবড়ি পিঠা খাই,
দুবড়ি লবড়ি গাঙ্গ সিনানে যাই।
গাঙ্গের জলে রাঁধিবাড়ি মকরের জল খাই,
চার মাস বরষা, পখন্নায় যাই।
পখন্নার জলটুকু ঝিলিমিলি করে,
তায় বসে বাবা-খুড়া কন্যাদান করে।
কন্যাদান করতে করতে আখেঁ পড়ে লো,
আন্ বাপ-মা লাল গামছা আঁখের পুঁছাই লো।
নদীর জলে বেগুন রুলাম, বেগুন খেলেক বাঁদরে,
বাঁদরে কি দোষ দুব মা, ঝাপ দুব দামুদরে।
ও দামুদর! ও দামুদর! কোন ঘাটে সরু বালি,
আমার তুষুর বিয়া দুব যার ঘরে সোনার ঝারি।
ও দামুদর! ও দামুদর! কোন ঘাটে মটা বালি,
উয়ার তুষুর বিয়া দুব, যার ঘরে ভাঙ্গা হাড়ি। ইত্যাদি

(তুষুর গানে উল্লিখিত 'গাঙ্গ' হইল দামোদর নদ ও 'পখন্না' দামোদরের তীরবর্তী পখন্না গ্রাম—সেই সিংহবর্ম্ম বিত্র বর্মাৎ "পাকর্ণা" বলিয়া অনুমিত।)

দুর্গাপূজা

বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায়ই বাঁকুড়া শহরে আশ্বিন মাসের শারদীয়া তিথিতে ধূমধামের সহিত দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই স্থানের বিশেষত্ব এই যে, কোন ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক দুর্গাপূজার তেমন প্রচলন নাই, এক এক শ্রেণীর বারোয়ারী বা ষোল আনার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন পোদ্দার ষোল আনা, কেওট ষোল আনা, রক্ষিত ষোল আনা ইত্যাদি। ব্রাহ্মণদিগের পূজা ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর দুর্গাপূজায় পশু বলি দেওয়া হয় না। পূজায় দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর রেওয়াজ নাই, তবে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে প্রচুর টাকার আতসবাজী পোড়ান হয়। স্থানে স্থানে দুর্গামূর্তির মধ্যে কিছু পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। কেওট, পোদ্দার ও শাখারী ষোল আনার যে মূর্তি নির্মাণ করা হয় তাহাতে নন্দীসহ শিব-দুর্গার মূর্তি থাকে, গণেশাদির মূর্তি থাকে না। কোথায়ও দুর্গার কেবল মুখমণ্ডল (মণ্ডকী) ও একটি তলোয়ার থাকে। রায়পুরে প্রস্তরের প্রাচীন মহামায়া মূর্তি অজ বা মেষমুখী ও ষড়ভূজা। আবার কোন কোন মণ্ডপে কার্তিক-গণেশাদিসহ মহিষমর্দিনী দুর্গা মূর্তি পূজা করা হয়। বাঁকুড়া শহরের নিকটবর্তী দ্বারকেশ্বর নদীর পারে তপোবন গ্রামে বিজয়া দশমীর দিন রামের বিজয় যাত্রার রথ বাহির হয়, লোকে বলে 'রাবণকাটা রথ'। এই রথযাত্রা উপলক্ষে তপোবনে একটি বড় মেলা বসে। এই অঞ্চলে পূজিত দুর্গা প্রতিমাগুলি এক মাসব্যাপী ক্রমে ক্রমে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বিষ্ণুপুর এবং খাতরার রাজবাড়ীতে। উভয় উৎসবই প্রতি বৎসর

জীতাষ্টমী তিথি হইতে শুরু হয়। বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীতে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনি মৃন্ময়ী দেবী নামে খ্যাত এবং নিত্যপূজা হয়। ৩০৩ মল্লাব্দে অর্থাৎ ৪০৪ বঙ্গাব্দে মহারাজ জগৎমল্ল কর্তৃক এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে জীতাষ্টমীর পরের দিন অর্থাৎ নবমী তিথিতে বড় ঠাকরুণ, শারদীয়া চতুর্থী তিথিতে মেজ ঠাকরুণ ও সপ্তমী তিথিতে ছোট ঠাকরুণ নামে তিনটি পটে (কাপড়ের উপর) অঙ্কিত মূর্তি পূজার পর যথারীতি মৃন্ময়ী দেবীর পূজা হয়। খাতরার রাজবাড়ীতেও জীতাষ্টমীর পরের দিন অর্থাৎ নবমীতে প্রথম ঘট স্থাপন করিয়া পূজা আরম্ভ হয় এবং শারদীয়া সপ্তমী তিথিতে মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া যথারীতি উৎসব পালিত হয়।

নাগরদোলা পরব

পৌষসংক্রান্তির দিন বাঁকুড়া জেলার সাঁওতালদের সর্বাপেক্ষা বড় উৎসব 'নাগরদোলা' পরব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে সাঁওতালরা যে-যেখানেই থাকুন সংক্রান্তির পূর্বদিন সকলেই স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসেন। সংক্রান্তির পূর্ব দিন সাঁওতালদের 'ওঝা' বা 'দিয়াসী' উপবাসী থাকেন এবং সংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে স্নান করিয়া উৎসব প্রাঙ্গণে আসিলে তাঁহার উপর বঙ্গার (দেবতার) ভর হয়। ভরপ্রাপ্ত অবস্থায় 'ওঝা' ভীষণভাবে মাথা ঝাকাইতে থাকেন। ইহার পর একটি উনানের উপর একটি বড় কড়ায় মহুয়ার তেল চাপাইয়া উহাতে গুড় দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার পিঠা (আরসে) ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং উত্তপ্ত তেল হইতে ঐ সকল পিঠাগুলিকে ওঝা খালি হাতে ছাঁকিয়া তোলেন। এই অনুষ্ঠানের পর স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হাঁড়িয়া পান করিয়া মাদলের তালে তালে সারাদিন নাচ-গানের মাধ্যমে আনন্দ উৎসব করিয়া থাকেন। সাঁওতালদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসব বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়। এই উৎসব উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলার সাংড়া ও পাকুড়ডিহা গ্রামে উল্লেখযোগ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং বড় মেলা বসে। মেলায় নানাবিধ জিনিসপত্রের অনেক দোকানপসার আসে। সাংড়ায় একদিন এবং পাকুড়ডিহা গ্রামে দুই-দিনব্যাপী মেলা স্থায়ী হয়।

পৌষ পার্বণ

পৌষ পার্বণ বা 'এখ্যান' বাঁকুড়ার একটি বিশিষ্ট উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলার নানাস্থানে মেলা বসে। উহার মধ্যে এক্তেশ্বরের মেলাই বড়। পৌষসংক্রান্তির দুইদিন পূর্ব হইতে উৎসব শুরু হয়। পৌষসংক্রান্তির পূর্বের দিনকে বাউড়ী এবং তাহার পূর্বের দিনকে বলে চাউড়ী। এই দুইদিন এক্তেশ্বরে অনেকগুলি ছাগ বলি দেওয়া হয়। চাউড়ীর দিন গৃহস্থদের ঘরে ঘরে দিনরাত ঢেঁকীতে চাল কোটার ধুম পড়িয়া যায়। বাউড়ীর দিন গৃহস্থরা রন্ধনের পুরান মাটির হাড়ি-খোলা ফেলিয়া দেন এবং ধাতুর তৈয়ারী জিনিসপত্রগুলি পরিস্কার করেন। কোন কোন বাড়ীতে পৌষলক্ষ্মীপূজা হয়। সন্ধ্যায় প্রতি বাড়ীর গৃহকর্ত্রীরা ধানের শিষ দিয়া 'বাউড়ী' বাঁধেন এবং ''চাউড়ী-বাউড়ী কোথাও না যেও, তিন দিন বসে বসে পিঠে ভাত খেও'' মুখে এইরূপ ছড়া কাটিয়া ধানের গোলায়, ভাঁড়ার ঘরে, টাকার বাক্সে ও ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্রের সঙ্গে 'বাউড়ী' ঝুলাইয়া দেন। এই দিন গ্রামের ছেলে-মেয়েরা স্নানের ঘাটে, নদী ও পুষ্করিণীর পাড়ে খড়, বাঁশ ও গাছের ডালপালার দ্বারা ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর বা 'কুমা' তৈয়ারী করিয়া রাখে। সংক্রান্তির দিন ভোরে গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা নির্বিশেষে নদী বা পুকরিণীতে মকর স্নান করিয়া নূতন জামা-কাপড় পরেন এবং ঐ কুমাগুলিতে আগুন ধরাইয়া কিছুক্ষণ আগুন পোহান। পরে ছেলে-মেয়েরা হৈ হল্লা করিতে করিতে মেলায় যান। গৃহকর্ত্রীরা ঘরে ফিরিয়া উঠানে চালের গুঁড়ি ও সিন্দুর দ্বারা 'পৌষ লক্ষ্মীর' মূর্তি নির্মাণ করিয়া ধামা চাপা দিয়া পৌষ আগ্‌লান। পৌষ আগলানোর সময় ছড়া কাটেন 'এস পৌষ যেও না, জন্ম জন্ম ছেড়ো না। যদিবা ছাড়িবে তুমি পরাণে মরিব আমি।' ১লা মাঘ উত্তরায়ণ, 'আখ্যান' দিন, প্রাচীনকালের নববর্ষের প্রথম দিন বলিয়া বিবেচিত। এই দিন গৃহস্থরা বাড়ীর উঠান নিকাইয়া ধানের শিষ, মরাই, লাঙ্গল, গরু, গরুরগাড়ী, লক্ষ্মীর পা ইত্যাদি চিত্র আলপনা দিয়া তাহার উপর লক্ষ্মীর আসন পাতেন ও লক্ষ্মীর পূজা করেন। সন্ধ্যাকালে প্রথম শৃগালের ডাক শুনিয়া লক্ষ্মী মূর্তিকে উঠান হইতে ঘরে তোলেন। আখ্যান দিন অর্থাৎ নববর্ষের প্রথম দিন, এই দিন সেকালের রাজরাজড়ারা সদলবলে বাদ্যভাণ্ডসহ রাজপুতনার আহেরিয়ার মত মৃগয়ায় বাহির হইতেন। শিকারের ফলাফল দেখিয়া সারা বৎসরের ভালমন্দ ফলাফল নির্ণীত হইত। প্রথম দিন শিকারে কিছু পাওয়া না গেলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনেও শিকার চলিত। মল্লভূমে আজ আর

সেই রাজরাজড়া নাই, তবু আজও তার স্মৃতিস্বরূপ বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র 'এখ্যান' দিনে নিকটবর্তী জঙ্গলে শিকারে যাইবার প্রথা প্রচলিত আছে।

বাসুলী পূজা

বাঁকুড়া জেলার নানাস্থানে বাসুলী পূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাঁকুড়া শহর হইতে প্রায় আট মাইল দূরে প্রাচীন সামন্ত রাজাদের রাজধানী ছাতনায় সামন্তকুলের আরাধ্য দেবী বাসুলীর বার্ষিক পূজা ও মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মণিহারী, খেলনা, পুতুল ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্যের অনেকগুলি দোকান বসে।

বারুণী স্নান

বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝরণার ধারে, বিষ্ণুপুরের সারেশ্বর নদীর তীরে ও বাঁকুড়া শহরের নিকটবর্তী সান্তোড় গ্রামে চৈত্র মাসে বারুণী স্নান ও তদুপলক্ষে মেলা বসে। ইহাদের মধ্যে বিষ্ণুপুরে সারেশ্বরের মেলাই সর্বাপেক্ষা বড় মেলা। সান্তোড় গ্রামে ঘুঁটিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে 'ঘুঁট্যা বারুণীর মেলা' বসে। এই মেলায় কেবলমাত্র মাটির তৈয়ারী হাঁড়ি-কলসী, খেলনা-পুতুল ইত্যাদি আমদানী হয়।

ভাদু উৎসব

প্রতি বৎসর ভাদ্র সংক্রান্তির দিন বাঁকুড়া জেলায় নানা-স্থানে ভাদুপূজা হয়। ইহার মধ্যে বাঁকুড়া শহরের উৎসবই বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, ভাদুমণি কাশীপুরের রাজার এক রূপবতী ও গুণবতী কন্যা ছিল। কুমারী অবস্থায় অকস্মাৎ ভাদুমণির মৃত্যু হয়। ভাদুপূজা তাহারই স্মৃতি স্মরণ উৎসব। বাঁকুড়া জেলার গৃহস্থ ঘরের কুমারী মেয়েরা এবং গণিকারা কেবলমাত্র এই উৎসব পালন করেন। শহরের ছুতাররা এই উপলক্ষে নানা রকমের অসংখ্য ভাদুমণির মূর্তি গড়িয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ভাদুপূজার মণ্ডপে ভাদু মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া মণ্ডপের চারিদিকে বড় বড় খাজা, জিলাপী, লেডিক্যানি ইত্যাদি খাবার সুতায় বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এই সময় বাঁকুড়া শহরের ময়রার দোকানগুলিতে হরেক রকমের খাবার থরে থরে সাজাইয়া রাখা হয়। উহার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাজা ও জিলাপীই প্রধান। সন্ধ্যার পর রোসনাই ও বাদ্যভাণ্ড সহকারে শহরের গণিকারা নাচিতে নাচিতে ভাদুর জল সইতে যান এবং 'ভাদু জাগরণ' উপলক্ষে নাচ-গান বাজনা, ইত্যাদি আমোদ আহ্লাদে সারারাত্রি অতিবাহিত করেন। ভাদু লইয়া প্রতিবেশীদের মধ্যে ছড়া কাটার প্রতিযোগিতা হয়। এই সকল ছড়ার মূল বিষয়বস্তু নিজের ভাদুর প্রশংসা ও অপরের ভাদুর নিন্দা প্রচার করা। প্রতি বৎসর বাজারের নূতন নূতন 'ভাদু সঙ্গীত' পুস্তিকা বিক্রয় হয়। এই সকল পুস্তিকায় ভাদুর গান ব্যতীত, রাধাকৃষ্ণের লীলা, প্রেমিক-প্রেমিকার রসালাপ ও দেশের সমসাময়িক ঘটনা প্রভৃতি বিষয়বস্তু অবলম্বনে গান রচিত হয় এবং এই সকল গান দলে দলে ছেলেরা সং সাজিয়া (কেহ কেহ মেয়েদের সাজ সজ্জা পরিয়া) পাড়ায় পাড়ায় গাহিয়া বেড়ান ও আমোদআহ্লাদ করেন।

নিম্নে বাংলা ১৩৭৬ সনে রচিত বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি ভাদু গানের নমুনা উদ্ধৃত করা হইল।

সমসাময়িক ঘটনা প্রসঙ্গে:

(চাঁদে অভিযান)

হাজার বছরের স্বপ্ন আজকে সত্য হলো।
চাঁদের উপর পৃথিবীর মানুষ আজকে চলে গেল।।
চাঁদে গিয়ে আড়াই ঘণ্টা করল হাঁটাহাটি।
একটা থলে ভর্তি করে কুড়িয়ে আনল মাটি।। ইত্যাদি।

(কলিকাতা ছেলেধরা হিড়িক)

কোথায় যাসনে তোরা
শুনেছি বেরোল ছেলেধরা।
... .
ছেলেধরার অপরাধে, সাধু-সন্ন্যাসী যারা।
দেখলে ঝোলা, বটে এই শালা, বেদম মার খাচ্ছে তারা।
ইত্যাদি।

(বাঁকুড়ায় পানামা সার্কাস প্রদর্শনী)

মাসী সারকাসেতে
তোদের জামাই নিয়ে গেছল খেলা দেখাতে।।
... ...
মিস্ বেঙ্গল পুতুল সাহা গো দেখলাম কি সুন্দরেতে
ষাটমণ ওজনের হাতী নিল এসে বুকেতে।।
কামান দাগে টিয়াপাখী গো, চমকায় তার আওয়াজেতে।
আবার বাঘের খেলা, দেখে মাসী প্রাণটা লাগল
কাঁপিতে।। ইত্যাদি।

(জানপুরের নিকট ট্রেণ দুর্ঘটনা)
পুরী প্যাসেঞ্জারে
দুর্ঘটনায় কত মানুষ গেছে মরে।।
জগন্নাথের রথযাত্রারে, এ বছর নবকলেবরে।
এই উৎসবে যোগদানের জন্য, যাচ্ছিল সব যাত্রীরে।
ইত্যাদি।

দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রসঙ্গে:
(যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠন)
ওরে জীবে ভাবনা কি আর।
হয়েছে দেশে যুক্তফ্রণ্ট সরকার এবার।।
জোতদার বলতে দেশের থাকবে না থাকবে না আর।
তোদের দুঃখ ঘুচে গেলরে, হবে লাঙ্গল যার জমি তার।।
ইত্যাদি।

সামাজিক ব্যঙ্গ প্রসঙ্গে:
(কলির বৌ)
ছাড়ল নারী ভাতের হাড়ী লো, চাকরী বিনে করে না।
চেয়ারে বসে চায়ের কাপটি গো, নভেল ভিন্ন পড়ে না।।
ইত্যাদি।

(প্রেমিক-প্রেমিকা)
শুন নাগরী প্রাণ করে মোর আলমাল।
কোন বনে বাজিল বাঁশী লো,
কেবা নারী বধের পাপ নিল।
ছিলাম চেতন, হই অচেতন গো, মদন শরে দহিল।
বাঁশী আর ডাকিস না রাধা বলেরে,
এই অবলার প্রাণ গেল।। ইত্যাদি।

ভাদু প্রসঙ্গে:
(প্রতিবেশিনী কর্তৃক ভাদুর নিন্দা)
ছি, ছি, তোদের ভাদুটা কাল।
মনে হয় যে আড়াচে তোলা ছিল।।
যেমন আশী বছরের বুড়িলো, জাতিতে বাগদী, মাল।
দরাঘাটা, খেয়ে বুঝি কাপড় হয়েছে অসামাল।।
ইত্যাদি।

(ভাদুর বিদায়)
সারা রাত হাসি ফূর্তি লো, এবার মরিব মন কেমনে।
কেঁদনা, কেঁদনা ভাদু গো, আবার আসবে বছর দিনে।।
বুক ফেটে যায় দিতে বিদায় লো, আজ পহলা আশ্বিনে।
আর কিছুদিন থাক ভাদু গো, তবেই শান্তি যে পাব মনে।।
আন আলতা সিন্দুর লো, দে পরিয়ে যতনে।
হায় হায় আসা যাওয়া যদি না থাকিত গো,
এত দুঃখ ছিল না জীবনে।।

বাঁকুড়ার ভাদু উৎসব সম্পর্কে উপেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত একটি প্রবন্ধ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:

The festival most remarkable in the district of Bankurah and in that part of the non-regulation province of Chutia Nagpur which goes under the name Manbhum (and better known as Parulia), is the Bhadu, which takes that name on account of its celebration in the month of Bhadra.

The Bhadu originated with the Bauris, the aborigines of Bankurah and Purulia. It is celebrated on the two last days of the month of Bhadra, and is personified in an idol of a small size representing a young girl, seated on a lotus or sometimes on a small square table: like all Hindu idols, the Bhadu wears a coronet on the head, and is decorated with garlands. The month of Bhadra is an interesting season for the people of Bankurah. In the beginning of the month, the idol is ushered into the house of every well-to-do Bauri woman with shouting and singing; and every evening (till the end of the month) there is a gathering of women and girls round the Bhadu, who pay homage in songs to their adored deity. It is interesting to note that the Bhadu is not actually worshipped with *mantras*, as it has notgot the sanction of the Hindu religion, but is adored with songs. The Bauris are probably the descendants of the adjoining hill tribes, and are an able-bodied and strong race who follow the hard and laborious profession of the *Palki* bearer. In complexion they are dark, but in their structure they are symmetrical and well proportioned. Their food consists generally of rice of the coarsest kind, dal, and meat of all sorts, especially pork. The women are of a robust make. Country spirit is their chief drink, and the great peculiarity is, that women and men

generally join when drinking and singing. At marriage feasts women and men sing round the bride and bridegroom, and men play the 'madal'. Their music is not harmonious, the sound of the 'madal' resembles that of an English drum. But to return to the Bhadu. The last two days of the month of Bhadra are passed in continually beating the tom-tom: at night people get no sleep; and the whole town seems to be as it were in a state of complete excitement: on the Sankranti, or the last day of the month, the drawing of the idol in the famous tank of Duberband takes place.

History of the Bhadu: The Bhadu saw the light only twenty-five years ago in some village within the Pachet Raj in the district of Manbhum. It is said that one of the Rajahs of Pachet had a little daughter, who was the very personification of humanity and beauty. She was noted for her extreme kindness towards the Bauris and other lower orders of the people whose extreme poverty had excited her compassion. This little girl died very early in the month of Bhadra, and on her death the people round Kashipur commended to worship her. According to others, Bhadu had its origin in the royal house of Pachet, where the Ram in memory of her daughter Bhadrabatti had a small idol prepared and adored in the month of Bhadra when her daughter died.

Whatever may have been the origin of the Bhadu, it has a hold on the lower orders of the people, who in the absence of other idols to worship, adore the Bhadu with songs.

(Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1873, pp. 202-03)

মনসাপূজা

বাঁকুড়া জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই 'মনসা মেলা' অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থানে সর্পফণাভূষিত পোড়ামাটির মনসামূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মনসা মেলায় যে-সকল ঘট প্রতিষ্ঠিত থাকে এই অঞ্চলে তাহাকে 'বারি' বলে। স্থানীয় লোহার, বাগ্দী ও বাউরী সম্প্রদায় বিশেষ ধূমধামের সহিত মনসাপূজা করিয়া থাকেন। সারা শ্রাবণ মাসের প্রতিদিন সন্ধ্যায় 'বিষম ঢাক' বা ডুগ্‌ডুগি বাদ্যসহকারে মনসা মেলায় 'মনসার ভাসান' পালাগানের আয়োজন করা হয়। শ্রাবণ-সংক্রান্তি তিথিতে ব্রতীরা সারাদিন উপবাস থাকিয়া সন্ধ্যায় বাদ্যভাণ্ডসহ মশাল জ্বালিয়া নিকটবর্তী পুষ্করিণী হইতে ঘটে জল ভরিতে যান। বারি ভরিয়া ফিরিবার পথে অনেকে ধুনা পোড়াইয়া থাকেন এবং ঘটের উপর একটি ছত্র ধারণ করা হয়। ইহার পর মনসা মেলায় সুসজ্জিত মনসামূর্তি স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন সূর্যোদয়ের সময় মনসার নিকট ছাগ ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। ইহার পর (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) প্রধান ব্রতীর উপর দেবীর ভর হয়। ভরপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাথা ঝাকাইতে ঝাকাইতে নানাপ্রকার দৈব ঔষধ ও মানুষের ভালমন্দ সম্পর্কে নানারূপ বিধান দিয়া থাকেন। এই সময় প্রচণ্ডভাবে ঢাক-ঢোল বাজিতে থাকে। এইরূপ ভর হওয়াকে স্থানীয় লোকে 'ঝাঁপাল আসা' বলেন। এই দিন ঝাঁপান উপলক্ষে কয়েকটি গরুর গাড়ীর উপর প্লাটফর্ম তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর আট-দশটি সাপের 'হুড়পি' বা ঝাপি রাখিয়া গরুর গাড়ীগুলিকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হয়। প্রদক্ষিণ কালে গরুর গাড়ীগুলির পিছনে সাপের ওঝা বা গুণীনরা হাতে, গলায় বিষধর সর্প জড়াইয়া এবং উক্ত 'হুড়পি' হইতে নানা জাতের সাপ বাহির করিয়া খেলা দেখাইয়া থাকেন এবং অনেকে সং সাজিয়া নানারূপ রঙ্গ-তামাসা ও ভাড়ামি করিতে করিতে গরুর গাড়ীগুলির অনুসরণ করেন। ঝাঁপানের শোভাযাত্রা দেখিতে বহু দর্শকের সমাগম হয়। বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী অযোধ্যা গ্রামে 'কালিবুড়ি' নামে খ্যাত মনসার গাজন উপলক্ষে খুব ধূমধাম হয় এবং তদুপলক্ষে একটি মেলা বসে।

মহোৎসব ও উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের স্মরণ উৎসব

বাঁকুড়া শহরের সুবর্ণ বণিকেরা প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পরম বৈষ্ণব উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের স্মরণ উৎসব উপলক্ষে শহরের বাহিরে গন্ধেশ্বরী নদীর তীরে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন।

ইহাভিন্ন, বাঁকুড়া জেলার নানাস্থানে খুব ধূমধামের সহিত অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবতঃ মল্লভূমের রাজারা বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় এই অঞ্চলে এত বেশী মহোৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে। এই সকল অনুষ্ঠানে অষ্টমপ্রহর, চব্বিশপ্রহর অথবা পঞ্চরাত্র বা নবরাত্রব্যাপী নামকীর্তন এবং কোন কোন স্থলে 'চৌদ্দ মাদলের' আয়োজন করা হয়। চৌদ্দ

মাদলে একযোগে চৌদ্দটি হরিমেলায় অবিরাম হরিনাম কীর্তন হয়। জেলার নানা স্থান হইতে কীর্তনের দল আসে। সাধারণতঃ আসরে একটি মণ্ডপে গৌর-নিতাই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া উক্ত মণ্ডপটিকে চক্রাকারে পরিক্রমা করিয়া একের পর এক কীর্তনীয়ার দল কীর্তন করেন। মহোৎসবের কয়দিন গৌর-নিতাই বিগ্রহের পূজা ও একটি অনির্বাণ প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা হয়। উৎসবের শেষ দিন রাত্রিকে 'জাগরণ' বলা হয় এবং পরের দিন 'ধুলট' অনুষ্ঠানের পর উৎসবের সমাপ্তি হয়। বাঁকুড়া শহরের দোলতলায় পঞ্চরাত্র মহোৎসবে খুব ধুমধাম হয় এবং জাগরণের রাত্রে রাস্তার চৌমাথায় ঝুমুরগান ও কৃষ্ণযাত্রার আসর বসে।

রথযাত্রা

বাঁকুড়া শহরে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে সাড়ম্বরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন, উৎসব উপলক্ষে শহরের দুইটি অঞ্চলে যথারীতি জগন্নাথদেবের পূজা এবং পদ্মফুল ও আলোকমালায় সজ্জিত দুইটি বৃহৎ পিত্তলের রথ বাহির হয়। রথ দুইটির গায়ে নানারূপ সুন্দর চিত্র খচিত আছে। রথের দড়ি টানিতে হাজার হাজার যাত্রীর সমাগম হয় এবং রথযাত্রার অনুসরণ করিয়া ঢাক-ঢোল, সানাই, ব্যাগপাইপ বাদ্যাদিসহ রায়বেঁশে নাচ, কাঠি নাচ, সাঁওতালী নাচ, জমিদারী নাচ, পাখনী নাচ, ছৌ নাচ ও খোল-করতাল সহ হরিনাম সংকীর্তনের দল চলিতে থাকে। রথ দুইটি ব্যক্তি-বিশেষের নহে, শহরের দুইটি অঞ্চলের বারোয়ারী রথ। প্রতি বৎসর এই দুই দলের মধ্যে রথযাত্রায় জাঁকজমকের প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। রথযাত্রা উপলক্ষে শহরে একটি বড় মেলা বসে।

রাসযাত্রা

প্রতি বৎসর কার্তিকী পূর্ণিমায় বাঁকুড়া শহরে ও বিষ্ণুপুরে সাড়ম্বরে রাসযাত্রা উৎসব পালন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে নির্দিষ্ট সুসজ্জিত রাসমঞ্চে নানা স্থান হইতে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহাদি আনিয়া যথারীতি উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। এই জেলার নানা স্থান হইতে বহু লোকজন বাঁকুড়া শহর ও বিষ্ণুপুরে রাস উৎসব দেখিতে আসেন।

শিবের গাজন

বাঁকুড়া জেলার উল্লেখযোগ্য শিবের গাজন উৎসবগুলির মধ্যে প্রথমেই নাম করা যায় এক্তেশ্বরের শিবের গাজন। ইহাভিন্ন, বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিবের গাজন, অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে পাত্রসায়েরের কালঞ্জর শিবের গাজন, মৌলবনায় মৌলেশ্বর শিবের গাজন, জগন্নাথপুরে রত্নেশ্বর শিবের গাজন, কেসরার অনাদিলিঙ্গ শিবের গাজন এবং পঞ্চাল ও হরিহরপুরের গাজন। হরিহরপুরে ১লা বৈশাখ গাজন উপলক্ষে মেলা বসে। কালঞ্জরের গাজন উপলক্ষে প্রচুর আতসবাজী পোড়ান হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রতি বৎসর আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বেলিয়াতোড় গ্রামে মহাসমারোহের সহিত ধর্মরাজের গাজন ও মেলা হয়। ধর্মরাজের গাজন উপলক্ষে অনেকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং বাণফোঁড়া হয়।

বাঁকুড়া শহরের নিকটবর্তী দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে একটি অষ্টকোণাকৃতি ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে এক্তেশ্বর স্বয়ম্ভু শিবের প্রস্তর নির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা প্রায় এক হাজার বৎসরের প্রাচীন মন্দির। মন্দির প্রাঙ্গণের চারিপাশ সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মন্দির প্রবেশ পথের ধারে দ্বারদেবতা বিরূপাক্ষ ব্যতীত মন্দির প্রাঙ্গণে তিনটি ছোট মন্দিরে দ্বাদশ বাহু অবলোকিতেশ্বর, খাঁদারাণী, একটি শিবলিঙ্গ, একটি ক্ষয়প্রাপ্ত সূর্যমূর্তি, একটি কূর্মাকৃতি ধর্মরাজমূর্তি, একটি বৃহদাকার লম্বোদর গণপতি, একটি দ্বিভুজা ভবানী মূর্তি ও একটি বৃহদাকার বৃষমূর্তি, দুইটি বট ও একটি অশ্বত্থ গাছ আছে। গাছগুলি প্রাচীন এবং উহাদের গোড়া ইঁট দ্বারা বাঁধানো। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রায় চার-পাঁচ হাত নীচে গর্ভগৃহে কোণাকুণি ভাবে শায়িত মর্কট প্রস্তরের অনাদিলিঙ্গ এক্তেশ্বর আছেন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ প্রভাবের যুগে মন্দিরের প্রধান দেবতা ছিলেন অবলোকিতেশ্বর। পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুদ্ধারের সময় অবলোকিতেশ্বরকে মূল মন্দির হইতে নির্বাসিত করিয়া শিবের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধমন্দির শিব-মন্দিরে রূপান্তরিত হইবার কালে নূতন কিংবদন্তীরও উদ্ভব হয়। কিংবদন্তী আছে, একদা এক গোয়ালার দুগ্ধবতী গাভী সকলের অলক্ষ্যে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দাঁড়াইলে তাহার দুগ্ধাধার হইতে আপনি দুগ্ধ ঝরিয়া পড়িত। এই দৃশ্য গোয়ালা একদিন প্রত্যক্ষ করেন; ইহার পর গোয়ালার প্রতি স্বপ্নাদেশ অনুসারে শিব আবির্ভূত হন। মন্দিরের অনতিদূরে 'গাইগয়লা' পুষ্করিণী অদ্যাপি সেই কিংবদন্তীর স্মৃতি বহন করিতেছে।

মন্দির বেষ্টনীর বাহিরে ছিল ভৈরবের স্থান। সেখানে পাঁঠা বলি হইত; এখন ভৈরব ধামাতকর্ণিদের (শিবের সেবায়েতকে ধামাতকর্ণি বলা হয়) গৃহে অধিষ্ঠিত আছেন।

এক্তেশ্বরের গাজন উপলক্ষে মূল উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নীলপূজা ও চৈত্রসংক্রান্তি তিথিতে। অবশ্য পক্ষকাল পূর্ব হইতেই উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়। গাজনে ব্রাহ্মণেতর সকল জাতির লোকই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। স্যান্নসব্রতীরা 'ভক্ত্যা কামানে'র পর গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন, সঙ্গে একটি গৈরিক গামছা রাখেন এবং গলায় মালার মত করিয়া উত্তরীয় পরেন। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পর সন্ন্যাসীরা সংযম পালন করেন এবং সারাদিন উপবাস থাকিয়া শিবের পূজা করেন। সন্ধ্যায় ফলমূল ও দুধ-মিষ্টি আহার করেন। গাজনের দুইদিন পূর্বে 'ফলভাঙ্গা' পর্ব উপলক্ষে তাহারা প্রতিবেশীদের গাছ হইতে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনেন। পরের দিন 'দাদুর ঘাটা' পর্বে গাজনের সন্ন্যাসীরা কেবলমাত্র দুধ ও গুড় দিয়া আটা মাখিয়া খান। গাজনের দিন সন্ন্যাসীদের নিরম্বু উপবাস পালন করিতে হয়।

চৈত্রসংক্রান্তির তিনদিন পূর্ব হইতে ঢাক-ঢোলের বাদ্যসহকারে প্রতিদিন 'পাট' স্নান করান হয়। অসংখ্য তীক্ষ্ণ শলকা বিদ্ধ একটি কাঠের পাটাতনকে 'পাট' বলে। নীলপূজার দিন পাট স্নান করানর পর মূল ভক্ত্যা বা পাট-ভক্ত্যাকে উক্ত পাটের শলাকার উপর শোয়াইয়া মাথার নীচে একটি ঘট উপুড় করিয়া দিয়া সেই অবস্থায় পাটাটিকে কাঁধে করিয়া অন্যান্য ভক্ত্যারা মন্দিরে আনেন। পাট-ভক্ত্যার মন্দির যাত্রাকালে অনেক মানতকারী মাথায় ও হাতে মাটির সরা রাখিয়া উহাতে ধুনা পোড়াইয়া থাকেন এবং অনেকে দণ্ডী খাটেন। সন্ধ্যায় বহু স্ত্রীলোক শিব মন্দিরে নীলের প্রদীপ জ্বালাইয়া দেন।

চড়কের দিন ভোরে 'আগুন সন্ন্যাস' পর্ব উপলক্ষে প্রায় পাঁচ হাত দীর্ঘ দেড় প্রস্থ জমির উপর প্রায় আট ইঞ্চি উচ্চ কাঠ কয়লার গন্‌গনে আগুন করা হয়। উহার দুই প্রান্তে দুই দুইটি গর্ত কাটিয়া তাহাতে একটি কলাপাতার উপর কিছু লতাপাতা (ইহাকে দল বলে) রাখিয়া কিছু দুধ ঢালিয়া দেওয়া হয়। আগুন সন্ন্যাসীরা সেই দলের উপর পা রাখিয়া জোড় হাত করিয়া আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া অপর প্রান্তে উপস্থিত হন এবং পুনরায় ঐ প্রান্ত হইতে ঠিক একইভাবে এই প্রান্তে আসেন। পাটভক্ত্যা ও আগুন সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের ব্রত পালন করেন; এই কারণে তাঁহাদের নামে দেবোত্তর জমি দেওয়া আছে। শেষ দিন ধামাতকর্ণি বা দেঘরিয়া সন্ন্যাসীদের উৎরী (উত্তরীয়) খুলিয়া তাঁহাদের সন্ন্যাস হইতে মুক্ত করেন। উত্তরীয় খোলার পর সন্ন্যাসীরা শিব ও দেঘরিয়াদের অশ্লীল গালিগালাজ করিয়া থাকেন। ইহাকে 'সতীঝাড়া' বা 'শিবের খেউড়' বলা হয়। গাজন উপলক্ষে এক্তেশ্বরের মেলাই এই জেলার সর্বাপেক্ষা বহৎ মেলা বলিয়া পরিচিত।

এক্তেশ্বর শিবের নিকট দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পুরুষেরা মানসিক করিয়া সন্ন্যাসব্রত পালন করেন ও দণ্ডী খাটেন, স্ত্রীলোকেরা ধুনা পোড়ান এবং সাধারণ লোকে পাঁঠা বলি দেন। মানতের পাঁঠাগুলিকে-ভৈরবের নির্দিষ্ট স্থানে বলি দেওয়া হয়। এক্তেশ্বরের সেবায়েতগণ ধামাতকর্ণি বা শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

সরস্বতীপূজা

প্রতি বৎসর মাঘী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বাঁকুড়া শহরে এবং এই জেলার বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে অসংখ্য সরস্বতীপূজা হয়। তবে এখানকার পল্লী অঞ্চলের সরস্বতীপূজার বৈশিষ্ট এই যে, প্রত্যেকটি শুঁড়ী প্রধান গ্রামে শুঁড়ীদের নিজস্ব একটি সরস্বতী মেলা (নির্দিষ্ট স্থান) আছে। শুঁড়ী জাতীয় ধনীরা ঐ স্থানে প্রতি বৎসর খুব ধুমধামের সহিত তিনদিনব্যাপী সরস্বতীপূজা করিয়া থাকেন। প্রথম দিন যথারীতি পূজা, দ্বিতীয় দিন পান্তা ভাত ও গোটা সিদ্ধ (গোটা আনাজ দিয়া রান্না করা ব্যঞ্জনাদি) ভোগ দিয়া পূজা, তৃতীয় দিনে আটাভাজা ইত্যাদি শুখনা ভোগ দিয়া পূজা হয়। চতুর্থ দিনে সরস্বতী মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়। শুঁড়ীদের গ্রাম ব্যতীত, দুই-একটি ব্রাহ্মণ পল্লীতেও 'সরস্বতী মেলা' আছে। সরস্বতীপূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজন ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

মুসলমানদের পর্ব

বাঁকুড়া শহরে মুসলমানদের মহরম, ঈদ ও সবেবরাত —এই তিনটি উৎসব খুব ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত হিন্দু পালোয়ান, কুস্তীগীর ও লাঠিয়ালগণ মহরম উৎসবে আয়োজিত খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করিতেন। ডাঃ কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—"আমি পল্লীর মুসলমানদের স্বয়ং

'কৃষ্ণযাত্রা' করিতে শুনিয়াছি। বাঁকুড়া শহরের লোককুর ও কেন্দুয়াডিহি মহল্লায় এক শ্রেণীর ভেড়িয়াল বাস করেন। ইহারা হিন্দু, টিকি রাখেন। কিন্তু ইহাদের মহল্লায় মুসলমানদের মত 'দরগা' আছে ও ইঁহারা অদ্যাপি মহরমের তাজিয়া মিছিলের সঙ্গে মকবারা বা তাজিয়া বাহির করেন।'' শহরের মাচানতলায় একটি মসজিদ আছে।

বাঁকুড়া শহরের কয়েকটি দেবালয় ও গ্রাম্য দেবদেবী

বাঁকুড়া শহরের নূতনগঞ্জ মহল্লায় চক্রবর্তীদের একটি প্রাচীন মন্দিরে প্রস্তর নির্মিত নিস্তারিণী নামে খ্যাত কালী মূর্তি, রায়পুর তেমাথায় একটি কালীমন্দির, রামপুরে বড়কালী মন্দির, কুচকুচিয়ায় পাষাণকালী মন্দির এবং লীক্ষ্যাতোড়ায় একটি নবনির্মিত মন্দিরে শ্মশানকালী প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্মশানকালী মন্দিরে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যায় উৎসব ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসে। সুভাষ রোডে পোদ্দারদের প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরে ভগবতী মূর্তি, উমেশ দত্ত লেনে দত্তদের প্রতিষ্ঠিত একটি দুর্গামন্দিরে অষ্টধাতু নির্মিত দুর্গামূর্তি এবং কেন্দুয়া-ডিহি ভৈরবের স্থানে একটি কালী ও একটি দুর্গামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দশেরবাঁধ শিবমন্দিরে প্রতি বৎসর ২০শে বৈশাখ শিবের গাজন ও মেলা বসে এবং কানকাটায় ২৫শে বৈশাখ শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। পাঠকপাড়ায় পাশাপাশি দুইটি প্রাচীন মন্দিরে গোপালজীউ ও রাধাবল্লভ-জীউ বিগ্রহ, ঘটকপাড়ায় একটি মন্দিরে শ্যামসুন্দরজীউ বিগ্রহ, রামপুরে মিত্রদের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন মন্দিরে রঘুনাথজীউ বিগ্রহ এবং রাসতলায় রাসমঞ্চ ও দোলতলায় দোলমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর রাধাবল্লভ ও শ্যাম-সুন্দরজীউর মন্দির হইতে রথযাত্রা উপলক্ষে দুইটি সুউচ্চ পিতলের রথ বাহির হয়। ইহা বাঁকুড়া শহরের সর্বাপেক্ষা আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান (রথযাত্রা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে)। উল্লিখিত রাসমঞ্চে কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব ও তদুপলক্ষে মেলা (রাসযাত্রা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে) এবং দোলমঞ্চে জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা তিথিতে পঞ্চরাত্রিব্যাপী নাম সংকীর্তন ও মেলা বসে। ইহাভিন্ন, নূতনগঞ্জে শনিঠাকুরের মন্দির ও নিত্যানন্দ আশ্রমে গৌরাঙ্গমন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন রোডে রামকৃষ্ণ-মন্দির, দোলতলায় মারোয়াড়ীদিগের মহাবীরমন্দির ও বিষ্ণু-মন্দির, নূতন পট্টিতে খৃষ্টানদিগের একটি গীর্জা, স্কুলডাঙ্গায় ব্রাহ্মমন্দির, কেন্দুয়াডিহিতে ভারতসেবা সঙ্ঘ এবং স্টেশন রোডে মারোয়াড়ীদিগের আর একটি মন্দির আছে। নিত্যানন্দ আশ্রমে দোলপূর্ণিমায় গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব মহোৎসব, রামকৃষ্ণ আশ্রমে দুর্গা ও কালী পূজা ব্যতীত ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব, দোলতলায় মাড়োয়ারী-দিগের মন্দিরে শ্রাবণ মাসে ঝুলন এবং মহাবীরমন্দিরে চৈত্র মাসের রামনবমী তিথিতে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বাঁকুড়া শহরে একটি অশ্বারূঢ় পঞ্চানন্দ, জিনাগিনী লেনে একটি গাছের নীচে অশ্বারূঢ়া জিনাগিনী (ইনি বাঁকুড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী), একটি প্রাচীন শীতলামন্দির ও লোহার-বাউড়ী পাড়ায় কয়েকটি মনসার স্থান আছে। মনসাপূজার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রাবণ-সংক্রান্তি তিথিতে ঘরে ঘরে মনসাপূজা উপলক্ষে গৃহস্থরা অরন্ধন পালন করেন এবং পান্তা ভাত খাইয়া থাকেন। এই দিনে মশলা পেশা শিল-নোড়াগুলি ধুইয়া মুছিয়া উহাতে সিন্দুর লেপন করিয়া একটি হলুদ মাখা নূতন বস্ত্র খণ্ডের উপর স্থাপন করিয়া পূজা করা হয়। পূজার শেষে কেলেকোঁড়া নামে একপ্রকার ফল দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া মনসার প্রসাদরূপে সকলে খাইয়া থাকেন। মনসার পালন হিসাবে শ্রাবণ মাসের দুইটি শনি-মঙ্গলবার 'খৈ-নারা' অর্থাৎ ভাতের পরিবর্তে খৈয়ের মোয়া এবং অপর দুইটি শনি-মঙ্গলবার 'ক্ষীর-পিঠা' অর্থাৎ লুচি পায়েস ইত্যাদি খাওয়া হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাঁকুড়া শহরে ও এই জেলার অন্যান্য স্থানের গৃহস্থরা আশ্বিন মাসে জীতাষ্টমী তিথিতে জীমূতবাহনের পূজা করেন। পূজায় শালুক ফুলের মালা দ্বারা সজ্জিত একটি চিত্রিত পিতলের কলসী স্থাপন করিয়া উহাতে ভিজা মটর কলাই দিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করান হয়। পূজার দিন বাড়ীর সদর দরজার সম্মুখে একটি আতা গাছের ডাল পুঁতিয়া তাহার সহিত মাটির একটি শিয়াল ও একটি শকুনি দিয়া সাজাইয়া রাখা হয়। ব্রাহ্মণের পূজা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা "শকুনি গেল ডালে, শিয়াল গেল খালে'' ছড়া কাটিতে কাটিতে উক্ত ডালটিকে বিসর্জন দিবার জন্য নিকটবর্তী কোন পুকুরে লইয়া যায় এবং বিসর্জনকালে পুকুরে ডুব দিয়া উঠিয়াই একটি শশা খাইয়া থাকে। ব্রতী মহিলারা জীমূতবাহনের পূজার দিন অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করেন না; ভিজা কলাই, শশা, দৈ-মিষ্টি ইত্যাদি খাইয়া থাকেন।

রাধাষ্টমী তিথিতে গৃহস্থেরা গোয়াল পূজা করেন। এই দিন গোয়াল ঘর পরিষ্কার করিয়া গরুর গায়ে রংয়ের ছাপ দেন এবং গরুগুলির গলায় শালুক ফুলের মালা ও গোয়াল ঘরটিকে শালুক ফুল দিয়া সাজান। ইহা ভিন্ন, বাড়ীর বাহিরের চারিদিকের দেওয়াল গাত্রে গোবর দিয়া 'বেড়ী' বা রেখা টানিয়া দেওয়া হয়। এইদিন চাল গুঁড়ার সহিত গুড় মিশ্রিত করিয়া তেলে ভাজিয়া একপ্রকার পিঠা তৈয়ারী করিয়া সকলে খাইয়া থাকেন।

বাঁকুড়া শহরে অনুষ্ঠিত রথযাত্রার মেলা সম্পর্কে বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅনিল কুমার মণ্ডল ও অধ্যাপক সুখময় চট্টোপাধ্যায় যে বিবরণী আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

বাঁকুড়া শহরে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে সুভাষ রোডের উভয় পার্শ্বে রথের দিন অপরাহ্নে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং মাত্র একদিনই স্থায়ী হয়। প্রধানতঃ বাঁকুড়া শহর হইতে মেলায় লোক-জন আসিয়া থাকেন। স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। মেলার বিক্রেতারাও স্থানীয়। ইহাতে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকান পঞ্চাশটি, বাসন-কোসনের দোকান ত্রিশ-চল্লিশটি, মনিহারী দোকান পঞ্চাশটি, ঔষধপত্রের দোকান পাঁচ-সাতটি, বই-ছবির দোকান কুড়ি-পঁচিশটি এবং ইহা ভিন্ন, অনেকগুলি শিল্পসামগ্রী ও কারুশিল্পের দোকান, খেলনা-পুতুলের দোকান ও আম, কলা, নারিকেল, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের দোকান বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিকের দল আসে এবং কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।



থানা ঃ ওন্দা

গ্রাম বিবরণী

১। **গ্রাম ঃ হীরাপুর** । ৬।১৭৬·৪৩।৭৩।৪০২

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, নাপিত, শুঁড়ী, মাল ও মাঝি। গ্রামে ঘোষপাড়া, মালপাড়া, বামুনপাড়া, শুঁড়ীপাড়া প্রভৃতি নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) দক্ষিণপূর্ব রেলপথে বাঁকুড়া স্টেশনে নামিয়া মোটরবাসে বাঁকুড়া-তালডাংরা পাকা সড়কে দুবড়াকোন গ্রামে নামিয়া সেখান হইতে প্রায় দুই মাইল কাঁচা রাস্তা হাঁটিয়া গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শিবের গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি খুবই সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির এবং একটি রাসমঞ্চ আছে। তাহা ছাড়া, গ্রামে দুইটি বিষ্ণুমন্দিরে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীগুইরাম পাত্র, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ হীরাপুর,
বাঁকুড়া।

২। **গ্রাম ঃ ভোলা** । ৭।২৯৬·৯৭।১২২।৫৮৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, গোয়ালা, নাপিত, মাল, শুঁড়ী ও মাঝি। ঘোষপাড়া, মালপাড়া ইত্যাদি নামে গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) বাঁকুড়া রেলস্টেশনে নামিয়া রায়পুরের রাস্তায় প্রায় ছয় মাইল মোটরবাসে আসিয়া তাহার পর প্রায় দুই মাইল হাঁটাপথে কিংবা গরুর গাড়ীতে গ্রামে পৌছান যায়। তাহা ছাড়া, মোটরবাসে দুবড়াকোন গ্রামে নামিয়া প্রায় দুই মাইল কাঁচা পথ হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ১৩ই বা ১৪ই তারিখে এই গ্রামে মহাধুমধামের সহিত শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা এই অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব। উৎসবের দুইদিন গ্রামবাসীগণ ভক্তব্রত গ্রহণ করেন। প্রত্যেক দিন পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মানত হিসাবে ষোড়শোপচারে ভোগ-পূজা দেওয়া হয়।

(ঙ) শিবের গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির এবং পাঁচটি মনসার স্থান আছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মালগোপ, কৃষিজীবী,
নূতনগ্রাম,
ও
শ্রীগুইরাম পাত্র, শিক্ষক,
গ্রাম: হীরাপুর,
বাঁকুড়া।

৩। **গ্রাম ঃ কল্যাণী** । ১৩।৪২৮·২৫।১৪৭।৬৮৬

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, মাল ও শুঁড়ী। গ্রামে বামুন-পাড়া, মালপাড়া, গোয়ালাপাড়া ও শুঁড়ীপাড়া নামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে মোটরবাসে দুবড়াকোন হইয়া নূতনগ্রামে নামিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। তাহা ছাড়া, গ্রামে যাতায়াতের জন্য স্টেট রিলিফের একটি রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরে কালীমূর্তি স্থাপিত আছে। দেবীর নিত্য পূজা এবং প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে সাড়ম্বরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সর্বসাধারণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। দেবীর নিকট মানত হিসাবে ছাগ, ইক্ষু ও কুমড়া বলি দেওয়া হয়। উৎসবটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

(চ) গ্রামে একটি মাটির দেবালয়ে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীনীরোদবরণ শর্মা, কৃষিজীবী,
গ্রাম: কল্যাণী, পোঃ হীরাপুর,
বাঁকুড়া।

৪। **গ্রাম ঃ দলদলী** । ১৫।২,০০৬·০৯।৩০৮।১,৬৯১

(ক) গোয়ালা, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, নাপিত, বৈরাগী,

কামার, কলু, তাঁতী, মাল, শুঁড়ী, খয়রা, বেনিয়া, পোদ্দার ও সাঁওতাল।

গ্রামে গোয়ালাপাড়া, শুঁড়ীপাড়া, মালপাড়া, সাঁওতালপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, খয়রাপাড়া, কায়স্থপাড়া, তাঁতীপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া এবং মোটরবাস স্ট্যাণ্ড দুবড়াকোন ও নতুনগ্রাম। গ্রামে যাতায়াতের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমা হইতে তিন-দিনব্যাপী মহাসমারোহে রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে যথারীতি ভোগ-পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন এবং যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন এবং স্থানীয় জনৈক গোপ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি উৎসবের সেবায়েত।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক পূর্ণিমা হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি পৃথক মন্দিরে রাধানাথ ও দামোদর-জীউ নামে খ্যাত শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরের সহিত রাসমঞ্চ ও ভোগরন্ধন ঘর আছে।

শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল, কৃষিজীবী,
গ্রাম : দলদলী,
পো: হেলনা শুশুনিয়া,
বাঁকুড়া।

৫। **গ্রাম : লাউদা। ১৭।১৯৩°০৪।৫৮।৩২৪**

(ক) ব্রাহ্মণ, তিলি ও খয়রা। ব্রাহ্মণপাড়া, তিলি-পাড়া এবং খয়রাপাড়া নামে গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও দিনমজুরী।

(গ) গ্রামের প্রায় সাত মাইল দূরে ওন্দা রেলস্টেশন হইতে স্টেট রিলিফের নাকাওজুড়ি গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়; এই রাস্তাটি অবশ্য যানবাহন চলাচলের উপযোগী নহে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী তিথিতে পুণ্য-স্নান, শ্রাবণ মাসে মনসার ঝাঁপান উৎসব এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় একশত ষাট বৎসরের প্রাচীন। দুর্গাপূজাটি এই গ্রামে আদি বাসিন্দা চক্রবর্তী মহাশয়গণের পারিবারিক উৎসব। রামমোহন চক্রবর্তী মহাশয় এই গ্রামে বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবটি আরম্ভ করেন। বাংলা-দেশের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দেবীর পূজা সম্পন্ন হয়। তবে বিজয়া দশমীর দিন আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের লোকজন তাঁহাদের নিজ নিজ 'নাচকাঠির দল' লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে গ্রাম পরিক্রমায় বাহির হন। এইরূপ পরিক্রমাকালে দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন এবং অন্যান্য হাস্যকৌতুকমূলক গান গাহিয়া থাকেন। উৎসব উপলক্ষে সর্বজনীন ভোজ ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

এই গ্রামের একটি নির্দিষ্ট স্থানে মনসাদেবীর প্রতীক সর্প অঙ্কিত মাটির কলসী এবং মাটির হাতী-ঘোড়া স্থাপন করিয়া শ্রাবণ মাসে সাড়ম্বরে মনসার ঝাঁপান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজার দিন মধ্যাহ্নে ভক্তগণ উপবাসী থাকিয়া মনসার ঝাঁপ ব্রত পালন করেন। ইহাকে দেবীর 'ভরম' বলা হয়। 'প্রণাম সেবা' দিবার জন্য ভক্তগণ তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহ হইতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে পূজা স্থান পর্যন্ত আসেন। বহু ভক্ত আগুন সন্ন্যাস ব্রত পালন করেন। রাত্রিকালে ভক্তগণ মনসার প্রতীক মাটির হাতী, ঘোড়া কাঁধে করিয়া মনসামঙ্গল গান গাহিতে গাহিতে ও ছড়া কাটিতে কাটিতে গ্রাম পরিক্রমায় বাহির হন। সাধারণত: শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিনেই উৎসব সম্পাদিত হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিনদিন-ব্যাপী। প্রায় একশত ষাট বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

(চ) গ্রামে দুর্গাদেবীর আটচালা বিশিষ্ট একটি দেবালয় এবং মনসাদেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

প্রায় একশত ষাট বৎসর পূর্বে এই স্থানটি জন-বসতিশূন্য এবং বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। জানা যায় বিষ্ণুপুরের কাদাকুলিপাড়ার অধিবাসী রামমোহন ও মথুরামোহন নামে দুই ভ্রাতা বিষ্ণুপুর রাজার নিকট হইতে জমিদারীসূত্রে প্রাপ্ত পুনাশা নামক গ্রামে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। কিয়ৎকাল পরে উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় রামমোহন পুনাশা গ্রাম ত্যাগ করিয়া জরকাবাইদ গ্রামে ও পরে লাউদা গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। রামমোহন গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় তাঁহাদের কুলদেবতা রঘুনাথজীউ নামক বিষ্ণুশিলা সঙ্গে করিয়া আনেন এবং এই গ্রামে স্থাপন করেন। তিনিই এই গ্রামে সর্ব প্রথম অধিবাসী বলিয়া পরিচিত। বর্তমানে তাঁহার বংশধরগণ এই স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা। রামমোহনের একান্ত প্রচেষ্টায় এই স্থানে একটি

বিরাট বাঁধ নির্মিত হইয়াছিল, যাহা আজিও স্থানীয় কৃষক-গণের কৃষিকার্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছে।

শ্রীরামসত্য চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক,
লাউদা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গোড়াসোল,
বাঁকুড়া।

৬। **গ্রাম ঃ বালুগুমা। ২৫।৩৯২·৯০।১৩৪।৬১৯**

(ক) সৌমণ্ডল, লোহার, কলু ও মাল। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া। মোটরবাস ষ্ট্যাণ্ড রতনপুর ; চুঁচুড়া রোডে বাঁকুড়া হইতে রাইপুর পর্যন্ত যাওয়া যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মনসাপূজা, ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা, কালাচাঁদ ঠাকুরের পূজা, মহাদানা ঠাকুরের পূজা এবং কুদরী ঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সৌমণ্ডলগণ উল্লিখিত উৎসবাদি পরিচালনা করিয়া থাকেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে মনসাদেবীর একটি মন্দির এবং আটচালা ঘর আছে।

শ্রীঅবনীভূষণ মজুমদার, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ রতনপর, বাঁকুড়া।

৭। **গ্রাম ঃ আমাদহ (মৌজা ঃ বালুগুমা)। ২৫।৩৯২·৯০।১৩৪।৬১৯**

(ক) গোয়ালা ও মাল। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলষ্টেশন বাঁকুড়া। মোটর ষ্ট্যাণ্ড রতনপুর। চুঁচুড়া রোডে বাঁকুড়া হইতে রাইপুর পর্যন্ত মোটরে যাওয়া যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে স্থানীয় মালপাড়ায় মনসাপূজা ও রাণী ভবানী প্রবর্তিত কালীপূজা, গোয়ালাপাড়ায় অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে হিকিমসিনীর পূজা এবং পৌষ মাসের শেষ সপ্তাহে ভেদুয়াসিনীর পূজা ব্যতীত ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা হয়।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীঅবনীভূষণ মজুমদার, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ রতনপুর, বাঁকুড়া।

৮। **গ্রাম ঃ সাতখুল্যা (মৌজা ঃ বালুগুমা)। ২৫।৩৯২·৯০।১৩৪।৬১৯**

(ক) মাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকড়া। মোটরবাস ষ্ট্যাণ্ড রতনপুর। চুঁচুড়া রোডে বাঁকুড়া হইতে রাইপুর পর্যন্ত মোটরে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণসংক্রান্তিতে মনসাপূজা হয়। মনসাপূজায় পায়রা ও ছাগল বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে মনসাপূজার জন্য একটি দেবালয় আছে।

শ্রীঅবনীভূষণ মজুমদার, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ রতনপুর, বাঁকুড়া।

৯। **গ্রাম ঃ মাধবপুর। ৩১।৯৫৯·০৩।৭৪।৪১৯**

(ক) কুমার, সদগোপ, মাল ও খয়রা। গ্রামে কুমার-পাড়া ও মালপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মৃৎশিল্প ব্যবসায়।

(গ) বাঁকুড়া রেলস্টেশনটি গ্রাম হইতে প্রায় নয় মাইল দূরে অবস্থিত এবং গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূর দিয়া মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের যথারীতি পূজা ও ভোগারতি হয় এবং সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ রথে স্থাপন করিয়া মাধবপুর হইতে ডুমুরিয়া গ্রাম পর্যন্ত শোভাযাত্রা সহকারে রথ টানা হয়। সাতদিন পরে মহাধুমধামের সহিত ঠাকুরের রথ পুনরায় মাধবপুর গ্রামে ফিরিয়া আসে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। রথযাত্রা এবং পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। ইহা প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও একটি মনসামন্দির আছে।

শ্রীদেবকুমার মুখোপাধ্যায়, গ্রামসেবক,
গ্রামঃ রতনপুর, বাঁকুড়া।

১০। **গ্রাম ঃ রতনপুর। ৩৩।৯০০·৬৭।২২৭।৯৮১**

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, গ্রহাচার্য, মেট্যা, মাল

ও ডোম। দাসপাড়া, বিশ্বাসপাড়া, মালপাড়া, মেট্যাপাড়া, ডোমপাড়া নামে গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, দিনমজুরী ও চাকুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া। গ্রামের অনতিদূর দিয়া নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি শিবমন্দির, অম্বিকাদেবীর মন্দির এবং সর্বেশ্বরীদেবীর ষষ্ঠকোণাকৃতি পাকা মন্দির ব্যতীত লক্ষ্মী ও কালীর মাটির ঘর, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রীপূজার দালানবাড়ী এবং মনসা ও দুইটি পঞ্চানন্দ আছে।

শ্রীরসময় দাস, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ রতনপুর,
বাঁকুড়া।

১১। গ্রাম ঃ জামজুড়ি। ৫২।২৭৭'৯২।৪৩।২১৭

(ক) ব্রাহ্মণ, সদগোপ, তাঁতী, কামার, নাপিত, ছুতার, বৈরাগী, গোয়ালা, বেনিয়া, গড়াই, লায়েক, ডোম, মাল, বাউরী, লোহার ও মেট্যা। গ্রামে মাল ও বাউরী সম্প্রদায়ের পৃথক পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ওন্দা। বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া মোটরবাসে পাঁচমুড়া গ্রাম দিয়া কৃষ্ণনগর অথবা পেঁচাড়া গ্রাম হইতে পশ্চিমে এক মাইল হাঁটিয়া গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। ইহা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীপ্রকৃতি রঞ্জন পাত্র, ছাত্র,
গ্রাম ও পোঃ জামজুড়ি,
বাঁকুড়া।

১২। গ্রাম ঃ আশনাশোল। ৬৬।১৩১'৩৬।১৩।১৫৮১

(ক) ব্রাহ্মণ, সদগোপ, কুমার, কামার, কায়স্থ, নাপিত, মাল, বাউরী, খয়রা ও মাঝি।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) বাঁকুড়া রেলস্টেশনে নামিয়া রাইপুর রাস্তায় বাসযোগে প্রায় চারি মাইল অতিক্রমের পর বেনজিয়া গ্রামে নামিয়া পূর্বদিকে প্রায় দুই মাইল কাঁচা রাস্তায় হাঁটিয়া গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। ইহা শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মধ্যস্থলে একটি চণ্ডীমণ্ডপ, দুইটি পঞ্চানন্দ ও পাঁচটি মনসা আছে।

শ্রীশীতল চন্দ্র ঘোষ, কৃষিজীবী,
গ্রাম ঃ আশনাশোল,
পোঃ পুনিশোল, বাঁকুড়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আশনাশোল গ্রামে আসনাসিনী নামে এক জাগ্রতা গ্রাম্য দেবী আছেন। আসনাসিনী দেবীর কোন মূর্তি নাই, ধানক্ষেতের মাঝে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর পাড়ে একত্রে কয়েকটি গাছের (কুঁচিলা ফলের গাছ) নীচে দেবীর প্রতীকস্বরূপ কয়েকটি মাটির হাতী-ঘোড়া রক্ষিত আছে। সাধারণের বিশ্বাস আসনাসিনী দেবীর পূজা করিলে সুবৃষ্টি হয় এবং দেবীর ঘট উলটাইয়া রাখিলে অতি বৃষ্টি বন্ধ হয়। নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের মধ্যে গ্রামবাসীর সুবিধামত যে-কোন দিনে দেবীর বার্ষিক জাঁতাল উৎসব পালন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ভোজন ও সাধারণের মধ্যে অন্নভোগ বিতরণ করা হয়। ইহা ব্যতীত অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি কালে দেবীর বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং স্থানীয় বন্দ্যোপাধ্যায় পদবীধারী উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণই আসনাসিনী দেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

গ্রামে একটি ভগ্নপ্রায় মন্দিরে স্থানীয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কুলদেবতা রাধাদামোদর শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, মালপাড়ায় মনসার নির্দিষ্ট স্থান এবং একটি শিবলিঙ্গ আছে। গ্রামে মনসা, দুর্গা, সরস্বতী ও শ্মশানকালীর পূজা হইয়া থাকে।

(শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য)

১৩। গ্রাম ঃ বেলিয়াড়া। ৭৬।৫১৫'৪৮।১৬৩।৮৩২

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাঝি, তিলি, কলু ও বাউরী। বৈষ্ণবপাড়া, মাঝিপাড়া, বাউরীপাড়া, গোঁসাইপাড়া প্রভৃতি নামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ভেদুয়াশোল হইতে অহল্যাবাঈ রোড দিয়া বিষ্ণুপুরগামী মোটরবাসে এই গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণসংক্রান্তিতে মনসাপূজা ও চাঁদরায়পূজা এবং চৈত্র মাসের ঊনত্রিশ তারিখ হইতে পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত একটি পাকা শিবমন্দির এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে মনসাদেবীর প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত আছে।

অতি প্রাচীনকালে এই গ্রামে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গৃহস্থদের বাস ছিল। কালক্রমে এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিতে থাকেন। ফলে "বে-নাড়া" অর্থাৎ বৌদ্ধ বর্জিত অঞ্চল বলিয়া পরিচিত হয়। পরে ইহা বালিয়াড়া হইতে বেলিয়াড়া নামে পরিচিত হইয়াছে।

পূর্বে এই গ্রামে 'বঙ্গভূষণ' (চট্টোপাধ্যায়) উপাধিধারী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল। শুনা যায় বার ভুঁইয়ার অন্যতম চাঁদরায় ইঁহাদের বঙ্গভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। মূল 'বঙ্গভূষণ' শাখার একাংশ ও চাঁদরায়ের নৌবাহিনীর একদল বিশ্বস্ত মাঝি ভাগ্য অন্বেষণের জন্য বিষ্ণুপুর মল্লভূমিতে আসিয়া বর্তমান অহল্যাবাঈ রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে 'বাঙ্গালমারা' (গ্রামটি এখনও বিদ্যমান) নামক স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। পরে দস্যুদের আক্রমণে ভীত হইয়া তাঁহারা বেলাড়া বা বেলিয়াড়া গ্রামে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। উক্ত বঙ্গভূষণগণ বর্তমানে চট্টোপাধ্যায় উপাধিই ব্যবহার করেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
গ্রাম: বেলিয়াড়া, পোঃ ভাদুল,
বাঁকুড়া।

১৪। গ্রাম : লোদনা। ৮৯।৭০৩'৩৮।৩৩২।১,৫৫৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, সদগোপ, কামার, কুমার, স্বর্ণকার, ছুতার, ময়রা, বণিক, ধোপা, জেলে, তাঁতী, হাড়ী, গণক, ভুঁইয়া, বাগ্দী, বাউরী, ডোম, লোহার ইত্যাদি। গোঁসাইপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, তাঁতীপাড়া, হাড়ীপাড়া, খয়রাপাড়া, গণকপাড়া, ভুঁইয়াপাড়া, বাগ্দীপাড়া, বাউরীপাড়া, ডোমপাড়া, লোহারপাড়া, কায়স্থপাড়া প্রভৃতি নামে গ্রামে মোট তেরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ভেদুয়াশোল। অহল্যাবাঈ রোড হইতে একটি কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে 'পাতালফোঁড়া' শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন ও বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্রমাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একচূড়া বিশিষ্ট একটি পাকা মন্দিরে 'পাতালফোঁড়া' শিব ও অপর একটি মন্দিরে গ্রাম্য দেবী লদাসিনীর মূর্তি সহ শীতলা, মনসা, বসন্তকুমারী, চণ্ডী, দুর্গা, রঘুনাথ, গোপাল, কালাচাঁদ, বিষ্ণু, জটাধারী প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। লদাসিনী সহ উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্য পূজা হয়। গ্রামের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে গ্রামের যাবতীয় পূজা-পার্বণের পূর্বে প্রথমেই লদাসিনীদেবীর পূজা দিতে হয়। ইহা ভিন্ন, গ্রামে ছয়টি শিব, চারটি শীতলা, বারটি মনসা, বোলতলাদিনী, কুদরাসিনী, কেলাকরাসিনী, বিষ্ণু, জটাধারী প্রভৃতি দেবদেবী আছে।

গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লদাসিনীর নামানুসারেই গ্রামের নাম 'লদাসিনী' অপভ্রংশে 'লোদনা' হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন দাস, গ্রামসেবক,
ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস, ওন্দা,
গ্রাম: চন্দ্রকোণা, পোঃ ওন্দা,
বাঁকুড়া।

১৫। গ্রাম : বীরসিংহপুর। ৯৭।৩৯১'৭১।১০৯।৫৪৬

(ক) ব্রাহ্মণ, মালাকার, তাম্বুলী, বাউরী, তাঁতী, মড়েলি ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও তাঁতশিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ভেদুয়াশোল হইতে হাঁটাপথেই গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে শায়খুল মোশায়েখ হজরত খাওয়াজা সৈয়দ মহিউদ্দিন নিরগিন শাহ পীর সাহেবের উরস্ অনুষ্ঠিত হয়। সংক্ষেপে ইঁহাকে নিরগিন সাহ পীর বলা হয়।

(ঙ) নিরগিন শাহ পীরের উরস্ উপলক্ষে মেলা। মাঘমাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় চারশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে নিরগিন শাহ পীর সাহেবের মাজার শরীফ আছে।

এককালে এই স্থানের রেশম কাপড়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল। বাঁকুড়া শহরে এবং কলিকাতায় বিশেষ করিয়া ভবানীপুর অঞ্চলে এখানকার রেশম কাপড় রপ্তানী হইত।

শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
গ্রাম: বেলিয়াড়া, পো: ভাদুল,
বাঁকুড়া।

১৬। গ্রাম: হরিহরপুর (মৌজা: পাহাড়পুর)। ১০৮।২৭৮·৩১।১০২।৪৮৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কুমার, জেলে, লোহার, বাউরী ও গড়াই।

(খ) কৃষিকার্য, মৎস্যশিকার ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ভেদুয়াশোল হইতে জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ২৬শে চৈত্র হইতে ২রা বৈশাখ পর্যন্ত সাড়ম্বরে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন। উৎসবের প্রথম দিন ভক্ত বা সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয়। প্রতিদিন যথারীতি যজ্ঞ ও পূজা, ৩০শে চৈত্র সর্বজনীন অন্নভোগ বিতরণ, ১লা বৈশাখ মধ্যাহ্নে লুচিভোগ এবং ২রা বৈশাখ রাত্রিকালে অন্নভোগ দিয়া শিবের পূজা হয়। সাধারণতঃ ষোড়শোপচারে পূজা, অর্থ বা স্বর্ণালঙ্কার শিবের নিকট মানত জানান হয়। বর্তমানে শ্রীমহাদেব মিশ্র নামে জনৈক সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ শিবের পূজারী।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে ছয়দিনব্যাপী। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দিরে হরিহর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত চণ্ডী, মনসা ও সীতারামের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাস, গ্রামসেবক,
গ্রাম: বেলিয়াড়া, পো: ভাদুল,
বাঁকুড়া।

১৭। গ্রাম: নিকুঞ্জপুর। ১১৫।৩০১·১৪।২২০১,২০৫

(ক) ব্রাহ্মণ, ছুতার, কুমার, গন্ধবণিক, নাপিত, মেট্যা, লোহার, গড়াই ও সুবর্ণবণিক। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন—বামুণপাড়া, ছুতারপাড়া, কুমারপাড়া, নাপিতপাড়া, লোহারপাড়া, মেট্যাপাড়া ও গড়াইপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, দিনমজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ওন্দা হইতে মাঠের উপর দিয়া পায়ে চলা পথে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও রাসযাত্রা উৎসব, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিনব্যাপী। রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে চারদিনব্যাপী। গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাগুলি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

(চ) গ্রামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির এবং দুর্গা ও কালী পূজার জন্য ইটের দেওয়াল ও টিনের ছাউনীযুক্ত আটচালা ঘর আছে। ইহার দেওয়াল গাত্র সুন্দর কারুকার্য খচিত। শ্যামসুন্দরজীউর একটি মন্দির আছে—মন্দিরটি নবনির্মিত। শ্যামসুন্দরের পুরাতন পরিত্যক্ত মন্দিরটি নিকটবর্তী দারকেশ্বর নদীর তীরে ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। গ্রামে পাঁচটি মনসার থান আছে।

শ্রীযতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
নিকুঞ্জপুর উচ্চ বিদ্যালয়,
পো: নিকুঞ্জপুর, বাঁকুড়া
ও
শ্রীসুভাষ চন্দ্র রায়, গ্রামসেবক,
২নং নিকুঞ্জপুর ইউনিয়ন,
গ্রাম: চৌকিমুড়া, পো: ওন্দা,
বাঁকুড়া।

১৮। গ্রাম: মুড়াকাটা। ১২২।৫৭০·৬২।১৩৫।৬৯৮

(ক) ব্রাহ্মণ, সদগোপ, কায়স্থ, তিলি, নাপিত, কামার, মোদক, খয়রা, জেলে, ছুতার, তাম্বুলী, বাউরী ও কলু। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, সদগোপপাড়া, কায়স্থপাড়া, তিলিপাড়া, খয়রাপাড়া, বাউরীপাড়া এবং জেলেপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ওন্দা। গ্রাম হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে অহল্যাবাঈ রোড দিয়া মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামে যাতায়াতের জন্য একটি কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে চব্বিশপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা ও জন্মাষ্টমী, ভাদ্র মাসে রাধাদামোদরজীউর ভোগ উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব এবং চৈত্র

মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কুদরাসিনী, ভৈরব মদামিসিনী, জাম বেদিয়াসিনী, বাগ্নরাসিনী ও ষষ্ঠীঠাকুরানী প্রভৃতি গ্রাম্য দেব-দেবীর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শিবের গাজন উপলক্ষে চৈত্রসংক্রান্তির দিন উৎসব প্রাঙ্গণে কয়েকটি খাবার, তেলেভাজা ইত্যাদির দোকান বসে। উৎসবে আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রায় ছয়-সাত শত নরনারীর সমাগম হয়।

(চ) গ্রামে কাঁচা দেওয়াল ও খড়ের ছাউনীযুক্ত একটি দেবালয়ে দুইটি শিবলিঙ্গ ও শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন একটি বিষ্ণুমন্দির, রাধাদামোদরজীউর মন্দির, হরিবাসরের একটি আটচালা ঘর, কালীর স্থান এবং মাটির হাতী-ঘোড়া রক্ষিত মনসাদেবীর একটি নির্দিষ্ট স্থান ও গ্রামদেবী কুদরাসিনীর একটি স্থান আছে।

শ্রীমিহিরপদ মণ্ডল, শিক্ষক,
মুড়াকাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

১৯। গ্রাম ঃ চন্দ্রকোনা। ১৪৯।৪৬৪·৫৪।১৩৮।৬৬৩

(ক) ব্রাহ্মণ, বারুজীবী, সদগোপ, বাগদী, মাঝি, লোহার, কামার, ধোপা, শুঁড়ী, বাউরী ও মালাকার। গ্রামে সদগোপপাড়া, মাঝিপাড়া, বাউরীপাড়া, বাগদীপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, দিনমজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ওন্দা হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন এবং ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে চব্বিশপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি বহু দিনের প্রাচীন।

প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি তিথিতে একযোগে কামাখ্যাদেবী ও শিবের পূজা করিয়া গাজন উৎসব আরম্ভ হয় এবং বৈশাখ মাসের পনর তারিখে উৎসব শেষ হয়। উৎসব উপলক্ষে মানসিক করিয়া অনেকে ভক্তব্রত গ্রহণ করেন এবং পক্ষকালব্যাপী মূল ভক্তের পরিচালনাধীনে শিব বন্দনা ও অন্যান্য আচারঅনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকেন। উৎসব সমাপ্তির দিন গ্রামস্থ অন্যান্য সকল দেবদেবীর একযোগে পূজা হইয়া থাকে এবং এই দিন সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়। শিবের নিকট ষোড়শোপচারে পূজা এবং কাপড়গামছা ও ঢাকের বাজনা মানত করা হয়।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। ফাল্গুন মাসে তিনদিন-ব্যাপী।

গাজনের মেলা। পনরই বৈশাখ মাত্র একদিনের জন্য। মেলা দুইটিই বহু দিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির এবং তৎসংলগ্ন একটি আটচালা আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে শিব ব্যতীত ভৈরব ও বেরাসিনী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহা ছাড়া, গ্রামে দুর্গা, লক্ষ্মী, চণ্ডী, মনসা, বঙ্গাসিনী প্রভৃতি দেবদেবী আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন দাস, গ্রামসেবক,
বুক ডেভেলপমেন্ট অফিস, ওন্দা,
গ্রাম : চন্দ্রকোণা, পো: ওন্দা,
বাঁকুড়া।

২০। গ্রাম ঃ অমরপুর। ১৬৫।২৩০·৬৯।৮৯।৫০৫

(ক) ব্রাহ্মণ, তিলি, কামার, বাউরী, মুচি, বৈরাগী ও খয়রা। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, তিলিপাড়া, বাউরীপাড়া, খয়রাপাড়া ও মুচিপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) প্রায় আট মাইল দূরে ওন্দা রেলস্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে পরম বৈষ্ণব ভগবানদাস বাবাজীর আবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসব এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা উপলক্ষে মনসাদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মনসা-পূজাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া স্থানীয় গ্রাম-বাসীগণ দাবী করেন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে চার-পাঁচ-দিনব্যাপী। ইহা প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন মেলা বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি মনসামন্দির এবং ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম আছে।

শ্রীভবেশ চন্দ্র ঘোষ, শিক্ষক,
অমরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পো: চিঙ্গানী,
বাঁকুড়া।

২১। গ্রাম ঃ গামিড্যা। ১৯২।৫৪৯·২৭।৯২।৪৩০

(ক) ব্রাহ্মণ, সদগোপ, কুমার, নাপিত, লোহার, বাউরী, ছুতার, কায়স্থ ও বৈরাগী। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ও মোটরবাস ষ্ট্যাণ্ড ওন্দা। গ্রামে যাতায়াতের রাস্তাটি আংশিক পাকা এবং আংশিক কাঁচা।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মী-পূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, বিষ্ণুবাণলিঙ্গ, শিব প্রভৃতি দেবতার নিত্য সেবা-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি বেশ প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। বহু কালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মনসামন্দির এবং ধাতু নির্মিত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীপরেশ নাথ গোস্বামী, প্রধান শিক্ষক,
মাজ্‌ডিহা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মাজ্‌ডিহা, বাঁকুড়া।

২২। গ্রাম ঃ মাজ্‌ডিহা। ১৯৪।৪৩৫°২৪।১৩৫।৬২১

(ক) ব্রাহ্মণ, সদগোপ, ডোম, কলু, কামার, ময়রা, নাপিত, ক্ষত্রিয়, ছুতার, মাঝি ও বাউরী। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, সদগোপপাড়া, বাউরীপাড়া, কামারপাড়া, ডোমপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ওন্দা। মাঠের উপর দিয়া পায়ে চলা পথ ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে বালুকেশ্বর শিবপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে পাঁচটি দুর্গাপূজা ও একটি লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে তিনটি কালীপূজা ও কার্তিক-পূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা ও জটামুড়ি দেবীর পূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, বৎসরের বিভিন্ন মাসে বালুকেশ্বর শিব, চণ্ডী, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীরও বাৎসরিক পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বালুকেশ্বর শিবপূজা উপলক্ষে মেলা। জ্যৈষ্ঠ শুক্লাপঞ্চমীর দিন হইতে ছয়দিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বালুকেশ্বর শিবমন্দির ব্যতীত আরও চারটি শিবমন্দির এবং জগদ্ধাত্রী ও মনসাপূজার জন্য দেবালয় আছে।

শ্রীপরেশ নাথ গোস্বামী, প্রধান শিক্ষক,
মাজ্‌ডিহা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মাজ্‌ডিহা, বাঁকুড়া।

২৩। গ্রাম ঃ বহুলাড়া। ২১১।২৭০°২৮।৯৫।৫০৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ, তিলি, কামার, কলু, ময়রা, বৈরাগী, লায়েক, লোহার, বাগদী, বাউরী, মুচি, তাঁতী, হাড়ী, ডোম, জেলে ও ছুতার।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে ওন্দা রেলস্টেশন হইতে ধা ধা গ্রাম হইয়া এই গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে পঞ্চরাত্রিব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন এবং দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দোলযাত্রা উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের এবং গাজন উৎসবটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দোলের মেলা। ফাল্গুন মাসে পাঁচদিনব্যাপী। ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

গাজনের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তির দুইদিন পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া চারদিনব্যাপী স্থায়ী হয়। প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে চারটি মনসা আছে। ইহা ভিন্ন, সিদ্ধেশ্বর, শিবের একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি পূর্ব ভারতের সুন্দরতম এবং প্রাচীনতম ইষ্টক মন্দির বলিয়া কথিত। ইহার উচ্চতা প্রায় ১২০ ফুট, বর্তমানে উহার উর্ধাংশের প্রায় ৩০ ফুট ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন যে, বর্ধমান জেলার দেউলিয়া গ্রামের ইঁটের তৈয়ারী মন্দিরের কিছুকাল পরেই বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিব-মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দির দুইটি বাংলার প্রাচীনতম মন্দির। তাঁহার মতে বহুলাড়ার মন্দিরটি দশম-একাদশ শতকীয়। বর্তমানে এই মন্দিরটি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত।

শ্রীপুলিন বিহারী দাস, গ্রামসেবক,
ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস, ওন্দা,
বাঁকুড়া।

২৪। গ্রাম ঃ চড়্‌ইকুড়। ২১৯।৪৩৭°৭৮।৬৪।৩৬১

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কায়স্থ, খয়রা, বাউরী ও সাঁওতাল। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, বাউরীপাড়া, সাঁওতালপাড়া, খয়রাপাড়া প্রভৃতি নামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রামসাগর। বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের অন্যান্য সময়ে বাঁকুড়া হইতে রামসাগর হইয়া সোনামুখী গ্রাম পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে। এই মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে নামকীর্তন মহোৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসের শুক্লানবমী তিথিতে রামনবমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রামনবমী উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। বৈশাখ মাসে পাঁচদিন-ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শালগ্রাম শিলা, ভৈরব, মনসা, জটাধারী, বাণেশ্বর শিব প্রভৃতি দেবদেবী আছে। তাহা ছাড়া, গ্রামে প্রায় পনর-ষোল ফুট উচ্চ কারুকার্যবিশিষ্ট পশ্চিমমুখী একটি রামমন্দির আছে।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শিক্ষক,
চড় ইকুঁড় প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ অযোধ্যা,
বাঁকুড়া।

২৫। গ্রাম ঃ দামোদরবাটী। ২২৮।২৩১·৭৫।১৭২।৯২৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তেলি, ভাট, বাউরী, গোয়ালা, বাগদী, চুনুরি, তাঁতী, ময়রা, খয়রা, মুচি, ডোম, পোদ্দার, ছুতার প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ওন্দায় নামিয়া মোটরবাসে অহল্যাবাঈ রোড দিয়া প্রায় সাড়ে তিন মাইল পথ অতিক্রমের পর গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় ধর্মরাজঠাকুরের পূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, গ্রামে বড়ামপূজা, টুসু উৎসব এবং অম্বিকাদেবীর বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জনশ্রুতি আছে যে, অম্বিকানগরের রাজা বিষ্ণুপুর মল্লরাজ বীর হাম্বিরের সহিত সন্ধি উপলক্ষে এই স্থানে সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ে মিলিত হইয়া দেবীর পূজা-অর্চনা করেন। তদবধি এই স্থানে অম্বিকাদেবীর পূজা চলিয়া আসিতেছে।

স্থানীয় অঞ্চলের প্রতিপত্তিশালী দামোদর চৌধুরী মহাশয় বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামাকালে নিম কাঠ নির্মিত একটি দুর্গামূর্তি পান এবং উক্ত মূর্তিটি স্থাপন করিয়া নিয়মিত পূজার আয়োজন করেন। চৌধুরী মহাশয় দুর্গাপূজার জন্য একটি পাকা মন্দির নির্মাণ করিবার বাসনা করিলে দেবী স্বপ্নে তাঁহাকে নিষেধ করেন এবং সেই কারণে অদ্যাপি একটি মাটির ঘরেই দুর্গাদেবীর পূজা হইতেছে।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন বহু-দিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে অম্বিকাদেবীর পাকা মন্দির এবং দুর্গাদেবীর মাটির ঘর আছে।

গ্রামের পূর্ব নাম ছিল মোহনপুর, পরবর্তীকালে স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী দামোদর চৌধুরী মহাশয়ের নামানুসারে গ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া "দামোদর বাটী" করা হয়।

শ্রীসুকুমার চৌধুরী, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ দামোদর বাটী,
বাঁকুড়া।

২৬। গ্রাম ঃ পুরুষোত্তমপুর (মৌজা ঃ দাতিনা পুরুষোত্তম পুর)। ২৩০।২৮২·৪৪।১১৪।৫৩২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, মেটে, লায়েক, পোদ্দার, মাঝি, নাপিত, কামার ও কলু।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) বিষ্ণুপুর অথবা রামসাগর রেলস্টেশন হইতে মাঠের উপর দিয়া পায়ে হাঁটা পথে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সর্বজনীন সরস্বতীপূজা হয়। পূজাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে সাতদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সরস্বতীপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীআব্দুল হামিদ খাঁ, গ্রামসেবক,
ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিস, ওন্দা,
পোঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

২৭। গ্রাম ঃ তেলিবেড়ীয়া। ২৩৮।১৫৯·৪৭।৭৪।৩৮৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, গোয়ালা, তাম্বুলী, মেটিয়া, মাঝি ও বাগদী। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রামসাগর। দামোদর-বাটী-তেলিবেড়িয়া এবং অহল্যাবাঈ রোডে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর রুটের মোটরবাসে করিয়াও গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে এই গ্রামে সাড়ম্বরে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি আশপাশের কয়েকটি গ্রামের সর্বজনীন উৎসব। গাজন উপলক্ষে অনেকে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া বঁড়শী দ্বারা জিহ্বা ও পিঠ ফোঁড়া, আগুনঝাঁপ ইত্যাদি নানারূপ কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া থাকেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে রাখাল বালকেরা মাঠে গরু চরাইতে গিয়া জঙ্গলের মধ্যে শিবমূর্তিটি পায়। তদবধি এই শিবের পূজা ও গাজন উৎসব চলিতেছে।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তির দিন। ইহা প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি অর্দ্ধ নির্মিত মন্দিরে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীএস, আর, চক্রবর্তী, গ্রামসেবক,
ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিস, ওন্দা,
বাঁকুড়া।

২৮। গ্রাম ঃ লাপুর। ২৪৬।২৬১°০৯।৩৫৫।১,৭৯২

(ক) ব্রাহ্মণ, তিলি, মাঝি ও বাউরী। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রামসাগর। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরগামী মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে এই গ্রামে মহাসমারোহের সহিত মনসাপূজা হয়। এই দিন গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে পৃথকভাবে মনসাপূজার পর গৃহস্থরা তাঁদের নিজ নিজ মনসামূর্তি লইয়া বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হন। সাপুর ও রামসাগর গ্রাম ব্যতীত আশেপাশের আরো ২৭টি গ্রামের অধিবাসী শোভাযাত্রার অনুগমন করেন। শোভাযাত্রার একটি প্রাচীন রীতি আছে। সিংহাটি মৌজার অন্তর্গত একটি নির্দিষ্ট স্থানে সর্বপ্রথম লাপুরের ঠাকুর গিয়া উপস্থিত হন ; অতঃপর রামসাগর ও সুরসাগরের ঠাকুর আসিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে পর শোভাযাত্রাটি গ্রাম পরিক্রমায় বাহির হন। উৎসবে মানত-কারীরা প্রচুর ুনা পোড়াইয়া থাকেন। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন উৎসব।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে দুইদিন। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের প্রায় প্রত্যেক গৃহে মনসা দেবীর মূর্তি ও স্থান আছে।

শ্রীএস, আর, চক্রবর্তী, গ্রামসেবক,
ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিস, ওন্দা,
পোঃ ওন্দা, বাঁকড়া।

২৯। গ্রাম ঃ রামসাগর। ২৪৮।২৬৩°৫৭।৯৫।৩৯৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, কামার, কুমার, ময়রা, বাগ্দী, তাম্বুলী, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, বৈশ্য, তেলি, গোয়ালা, নাপিত, ধোপা, বাউরী, মাঝি, খয়রা ও সাঁওতাল। গ্রামে নয়টি পাড়া আছে। যেমন— ব্রাহ্মণপাড়া, কায়স্থপাড়া, মাঝিপাড়া, খয়রাপাড়া, বাগদীপাড়া, তিলিপাড়া, সাঁওতালপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, দিনমজুরী, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামে একটি রেলস্টেশন আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের পঞ্চমী তিথিতে সাড়ম্বরে সর্বজনীন মনসাপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মনসাদেবীর পূজা দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অঞ্চলের গ্রামবাসীগণ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পূজাটি করেন। তবে মাঝি, বাগ্দী এবং বাউরী সম্প্রদায়ের লোকজন এই পূজায় সর্বাধিক সংখ্যায় যোগদান করেন। দেবীর পূজায় ব্যবহৃত বারি ভাণ্ডটি মৃত্তিকা নির্মিত ও সর্পশোভিত। পঞ্চমীর দিন সারাদিনব্যাপী ব্যক্তিবিশেষের পূজা অনুষ্ঠানের পর রাত্রিকালে সমস্ত ঠাকুর গ্রামের একটি নির্দিষ্ট স্থানে আনিয়া রাখা হয়। তারপর সর্বসম্প্রদায় মিলিত হইয়া নিজ নিজ ঠাকুরসহ শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন। প্রায় দশ-বার হাজার ভক্ত এই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিনে দেবীর পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভক্তরা নিরম্বু উপবাস পালন করেন। মানত-কারীগণ 'আগুন সন্ন্যাস' 'প্রণাম সেবা' খাটা প্রভৃতি কৃচ্ছ্র-সাধন অথবা অনেকে ছাগ বলি দিয়া মানত শোধ করেন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে দুইদিন-ব্যাপী। ইহা বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন শিবমন্দির এবং ভৈরব, কুদরা, মনসা, শিব, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবী আছে।

'রামসাগর' নামে একটি প্রাচীন দীঘি হইতে গ্রামের নাম রামসাগর হইয়াছে। শোনা যায় জনৈক বণিক

এই স্থানের শিবের নিকট মানত জানাইয়া মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে উক্ত দীঘিটি খনন করান।

শ্রীভাস্কর চন্দ্র গড়াই,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (বিষ্ণুপুর শাখা),
চকবাজার, বাঁকুড়া।

৩০। গ্রাম ঃ গোড়াসোল। ২৭৮।৩৭২.৪৩।১৭৪।৯০৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, তিলি, ক্ষত্রিয়, নাপিত, তাঁতী, খয়রা, বাউরী, ডোম, গোয়ালা ও কলু। গ্রামে বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী, কুটিরশিল্প ও চাকুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ওন্দা হইতে ষ্টেট রিলিফের একটি রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় গ্রামে প্রতিষ্ঠিত রাধারমণজীউর সাড়ম্বরে রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে ছয়দিন। ইহা প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন মেলা বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরে রাধারমণ বিগ্রহ এবং শ্রীমন্দিরে বংশীবদনজীউ, লক্ষ্মীজনার্দনজীউ, রঘুনাথজীউ প্রভৃতি গোস্বামীদিগের ও তাঁহাদের দৌহিত্রদিগের সেবিত বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত চারটি শিব, দুইটি ভৈরব, দুইটি মনসা ও একটি ধর্মরাজঠাকুর আছে।

গোড়াসোল গ্রামটি একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলিয়া পরিচিত। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে শ্রীনিবাস আচার্যের পৌত্র মুরলীধর ঠাকুর বিষ্ণুপুর মল্লভূমিতে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভূসম্পত্তি পাইয়া এই স্থানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। তদবধি এই স্থানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মুরলীধর ঠাকুরের বংশধরগণই এই গ্রামে গোস্বামী পরিবার নামে পরিচিত।

শ্রীসেখ দিদার আলি, গ্রামসেবক,
ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস, ওন্দা,
গ্রাম ও পোঃ চিঙ্গানী, বাঁকুড়া।

৩১। গ্রাম ঃ পতঙ্গপুর। ২৮৪।৩৯০.৮৭।৪৪।২৫৯

(ক) বৈরাগী, তিলি ও খয়রা। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে—তিলিপাড়া ও খয়রাপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা তিথিতে ধূমধামের সহিত মনসাপূজা হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে মনসাপূজার জন্য একটি মাটির ঘর ও তৎসংলগ্ন একটি আটচালা ব্যতীত আরো দুই-তিনটি মনসার স্থান আছে।

শ্রীদিবাকর পাল, প্রধান শিক্ষক,
পতঙ্গপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গোড়াসোল, বাঁকুড়া।

৩২। গ্রাম ঃ চান্দোবিলা। ২৮৫।৪৫৪.৫৪।৬৯।৩৭৬

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, বাউরী ও লায়েক।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে মোটরবাসে মৌলবেড়া পৌঁছাইয়া সেখান হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে একটি মাটির ঢিবির উপর কয়েকটি মাটির ঘোড়াসহ সর্প অঙ্কিত মনসার শলন মূর্তি স্থাপন করিয়া শ্রাবণ মাসে দুইদিনব্যাপী পূজা হয়। প্রথম দিন যথারীতি পূজার পর দেবীর 'ভরম' আসে। এই সময় ভক্তরা ঢাক-ঢোলের বাজনার তালে তালে পূজা প্রাঙ্গণে নৃত্য করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় দিন পূজার পর সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভক্তেরা মনসার নিকট 'প্রণাম সেবা', ধূনা পোড়ান, অর্ঘ, ঢাক, পাঁঠা বলি ইত্যাদি মানত করিয়া থাকেন। উৎসবটি সর্বজনীন। জনৈক ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায় পদবীধারী ব্রাহ্মণ মনসা পূজা করেন। ইহা ভিন্ন, গ্রামে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় গোপ ও যাদব সম্প্রদায় উৎসবটি পরিচালনা করেন। উল্লিখিত উৎসব দুইটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে দুইদিন। প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও মনসাপজার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীসরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম: নাকাইজুড়ি, পোঃ গোড়াসোল,
বাঁকুড়া।

৩৩। গ্রাম ঃ ছাওলিয়া।

(ক) ব্রাহ্মণ, তেলি, তাম্বুলী, ছত্রী, বৈরাগী ও খয়রা। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, খয়রাপাড়া এবং বৈষ্ণবপাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, দিনমজুরী, তাঁতশিল্প ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ওন্দা। রেলস্টেশন হইতে ষ্টেট রিলিফের রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়। তাহা ছাড়া, গ্রামের পাশ দিয়া নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করায় বাসযোগে গ্রামে পেঁছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমা হইতে তিনদিনব্যাপী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত রাধাদামোদরজীউর রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে বহু ভক্ত ও সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয় এবং আশপাশের সাতাশখানি গ্রামের ব্রাহ্মণদিগকে ভোজনে আপ্যায়িত ও দরিদ্রনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং স্থানীয় রায় পরিবার কর্তৃক প্রবর্তিত।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক পূর্ণিমা হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রাধাদামোদরজীউর একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের দ্বিতলে একটি শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীসেখ দিদার আলি, গ্রামসেবক,
ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস, ওন্দা,
পোঃ চিঙ্গানী, বাঁকুড়া।

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব

(নিরগিন শাহপীর)

বীরসিংহপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে সাড়ম্বরে নিরগিন শাহ পীরের উরস্ অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে পীরের একটি পবিত্র মাজার শরীফ আছে। নিরগিন শাহের প্রকৃত নাম শায়খুল মোশায়েখ হজরত খাওয়াজা সৈয়দ মহিউদ্দীন নিরগিন শাহ পীর। সংক্ষেপে বলা হয় নিরগিন শাহ পীর। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে তৎকালীন পাঁচ পীরের মধ্যে নিরগিন শাহ পীর একজন এবং ইনি বিষ্ণুপুরের কোরবান শাহ পীরের সমসাময়িক ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উল্লিখিত পাঁচ পীরের মধ্যে বিষ্ণুপুরের কোরবানতলায় কোরবান শাহের, শ্যামরায়ের বাজারে খড়িয়াল শাহের, বীরসিংহপুরে নিরগিন শাহের এবং শোকাবাঁধের উত্তরপাড়ায় অপর একজন পীরের মাজার শরীফ আছে।

উৎসব উপলক্ষে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার নরনারী মাজার শরীফে সমবেত হইয়া পীরের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁহার নিকট হাজত-পূজাদি দিয়া থাকেন। পরের দিন সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়। বর্তমান খাদেম কাজী মোহাম্মদ হোসেন শাহ। শোনা যায় পূর্বে জনৈক হিন্দু পীরের খাদেম ছিলেন

বীরসিংহপুরের শ্রীচিন্তমনি সেন, কোটালপুরের ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সামন্ত, সান্তোড় ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট শ্রীঅকিঞ্চন কুণ্ড মহাশয়দিগের প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় অন্যান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় কয়েক বৎসর হইল পীরের মাজার শরীফটি পুনর্নির্মিত হইয়াছে।

(ভগবানদাস)

অমরপুর গ্রামে একটি আশ্রমে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা ভগবানদাসের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভগবানদাস জাতিতে তিলি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি জনৈক বিধবা মহিলাকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করেন। এই অঞ্চলের তিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার বহু শিষ্য-শিষ্যা আছেন। উৎসবে বহু ভক্ত এবং প্রায় দুইশত বৈষ্ণব সাধু-সন্ন্যাসী যোগদান করেন এবং তিনদিনব্যাপী প্রত্যহ কীর্তন ও পালাগানের আসর বসে। নিকটবর্তী সগড়ডাঙ্গা গ্রামের আশ্রমবাসিনী মহিলা কীর্তনীয়ার দল প্রতি বৎসর কীর্তন গান করিয়া থাকেন। গ্রামবাসীর নিকট হইতে আদায়কৃত অর্থ, চাউল ও শাকসব্জী দ্বারা মহোৎসবের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

(শ্রীগৌরাঙ্গদেব)

বহুলাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব ও তদুপলক্ষে দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে

একটি মন্দিরে গৌরনিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসব উপলক্ষে উক্ত বিগ্রহের পাঁচদিনব্যাপী যথারীতি পূজা ও দেব দোল এবং প্রতিদিন মন্দিরে সমাগত অগণিত ভক্ত ও দর্শকদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসব সমাপ্তির দিন সন্ধ্যায় মন্দিরে সন্ধ্যারতির পর গৌরনিতাই বিগ্রহকে একটি গোশকটে স্থাপন করিয়া নানারূপ বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির করা হয়। বহু নরনারী এই শোভাযাত্রায় অনুগমন করেন এবং শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করিতে রাস্তার দুই পার্শ্বে অসংখ্য যাত্রীর ভীড় হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

লোদনা গ্রামে 'পাতালফোঁড়া শিব' নামে খ্যাত শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন ও বহুকালের প্রাচীন। গ্রামে শিবের একটি মন্দির আছে; মন্দিরটি একচূড়া বিশিষ্ট এবং সম্মুখে বারান্দাযুক্ত। জনশ্রুতি আছে, বিষ্ণুপুরের মহারাজা গোপাল চন্দ্র সিংহ শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেন এবং তদবধি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া শিবের নিত্য পূজা ও গাজন উৎসব পালন করা হইতেছে। গাজন উৎসব উপলক্ষে শিব ও গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লদাসিনীর পূজা করা হয়।

চৈত্র মাসের ১৫ই তারিখ শিবের মনুইভোগ (?) দিয়া গাজন উৎসব সূচিত হয় এবং সংক্রান্তি তিথি পর্যন্ত পক্ষকালব্যাপী যথারীতি পূজা ও উৎসব চলে। উৎসবের প্রথম দিনই 'ভক্ত্যা' গ্রহণ করা হয় এবং এই দিন পাটভক্ত্যারা ঢাক-ঢোলের বাদ্য সহকারে শিবের পাট উঠাইয়া থাকেন। পাতালফোঁড়া শিবের গাজন উপলক্ষে 'পাটভক্ত্যা', 'সন্ন্যাসী ভক্ত্যা' ও 'লাফরাভাঙ্গা ভক্ত্যা' নামে তিন শ্রেণীর ভক্ত গ্রহণ করা। মানসিক অনুসারে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যে কেহই এই ভক্তব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। পূজারী মানতকারীদের শিবগোত্রান্তরিত করিয়া ভক্তব্রত পালনের অধিকার দেন। ভক্ত ব্রত পালনকালে ভক্তদের সারাদিন উপবাস, সংযম ও শুদ্ধাচারে জীবনযাপন ও নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয়। যেমন, পাটভক্ত্যারা কাঠের পাটাতনের সহিত সংযুক্ত সূক্ষ্মাগ্র লৌহ শলাকার উপর শয়ন করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী ভক্ত্যারা মন্দির প্রাঙ্গণে জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়া খেলা দেখাইয়া থাকেন এবং লাফরাভাঙ্গা ভক্ত্যারা ধারাল অস্ত্রশস্ত্রের উপর নগ্নপদে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের ভক্তির পরীক্ষা দিয়া থাকেন। এই সকল আচার-অনুষ্ঠান কালে ভক্ত্যারা মুখে পাতালফোঁড়া শিবের ও বিষ্ণুপুরের গোপাল সিংহ মহারাজের জয়ধ্বনি দিয়া থাকেন। ১লা বৈশাখ উৎসব শেষ হয়। এই দিন সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ এবং ভক্ত্যা ভোজন করান হয়। উৎসব উপলক্ষে আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মিশ্র পদবীধারী জনৈক ব্রাহ্মণ শিবের পূজা করিয়া থাকেন।

(উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের সংবাদদাতা উল্লিখিত ভক্তদের 'পাটভক্তিয়া' 'সন্ন্যাসভক্তিয়া' ও 'লাফরাভাঙ্গা ভক্তিয়া' নামে উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমরা প্রচলিত অর্থে 'ভক্তিয়া' শব্দটি 'ভক্ত্যা'রূপে ব্যবহার করিয়াছি।)

বেলিয়াড়া গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ধূমধামের সহিত গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে ২৫শে চৈত্র 'পাট ভক্তিয়া' বা 'পাটভক্ত্যা' ২৬শে তারিখে 'রাজারভক্তিয়া' বা 'রাজারভক্ত্যা' এবং ২৮শে তারিখে 'সাজভক্তিয়া' বা 'সাজভক্ত্যা' এই তিন শ্রেণীর ভক্ত গ্রহণ করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত যে-কোন ব্যক্তিই গাজনে ভক্ত ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। ভক্তব্রত গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ক্ষৌরকর্ম সারিয়া মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলে পুরোহিত তাঁহাদের শিবগোত্রান্তরিত করিয়া গলায় একটি উত্তরীয় পরাইয়া দিয়া ভক্তব্রত পালনের অধিকার দেন। এই ব্রত পালনকালে ভক্ত্যারা হাতে একটি বেত্রদণ্ড রাখেন ও গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া শুদ্ধাচারে জীবনযাপন করেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই অঞ্চলে শিবের পূজারীকে 'পরীক্ষা' অপভ্রংশে 'পরিখা' বলা হয়। ভক্তব্রত গ্রহণকালে ঢাক-ঢোলের বাজনা হইয়া থাকে এবং ভক্ত্যারা মুখে শিবধ্বনি দিয়া থাকেন।

২৫শে তারিখে পাটভক্ত্যারা মন্দির হইতে শিবের পাট (লৌহ শলাকা বিদ্ধ একটি কাঠের পাটাতন বিশেষ) মস্তকে লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া 'নয়না' নামে একটি নির্দিষ্ট পুষ্করিণীতে স্নান করাইতে লইয়া যান। শিবের পাটকে স্নান করাইবার পূর্বে তৈলসিক্ত করা হয়। গ্রামের নির্দিষ্ট একটি কলু পরিবার পুরুষানুক্রমে ঐ তৈল সরবরাহ করিয়া থাকেন। পাট স্নানের পর পুনরায় পাটভক্ত্যারা পাটটিকে মাথায় করিয়া শোভাযাত্রা করিয়া মন্দিরে আসিলে শিবের যথারীতি পূজা আরম্ভ হয়।

২৮শে হইতে চৈত্রসংক্রান্তির দিন পর্যন্ত প্রতিদিন ভক্ত্যারা বাদ্যভাণ্ডসহকারে শোভাযাত্রা করিয়া উক্ত শিবের পাটকে লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন।

২৯শে চৈত্র 'গামিরকাটা' নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পাটভক্ত্যাগণ ঢাক-ঢোলের বাজনাসহ বর্তমানে গামির বৃক্ষের অভাবে একটি নির্দিষ্ট বেলগাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আনেন।

সংক্রান্তির দিন অতি প্রত্যূষে গ্রামের মনসাতলায় আগুন জ্বালাইয়া ভক্ত্যাগণ নগ্নপদে আগুনের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যান। এই অনুষ্ঠানের পর ভক্ত্যাগণ গ্রামবাসীর বাগান হইতে অন্যের অগোচরে নানারূপ ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া মন্দিরে আনিয়া 'পরিখার' নিকট জমা দেন।

এই দিন বৈকালে ভক্ত্যারা শিবের পাটসহ শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামের বৈষ্ণবপাড়ায় 'মায়ের পুকুর' নামে একটি পুষ্করিণীতে শিবের পাটটিকে স্নান করান এবং ঐ পুকুর পাড়েই পাটপূজা করেন। পূজান্তে ভক্ত্যারা উক্ত পাটসহ মন্দিরে ফিরিয়া আসিলে মানসিককারীরা মন্দিরে মানত শোধ করেন। মানসিক হিসাবে স্ত্রীলোকগণ মাথায় বা বুকে নূতন মাটির সরা করিয়া ধূনা পোড়াইয়া থাকেন; আবার কেহ কেহ মায়ের পুকুর হইতে গড়াগড়ি দিতে দিতে বা দণ্ডী খাটিয়া মন্দির পর্যন্ত আসেন। মানত শোধের পর সাড়ম্বরে শিবের পূজা শেষ হইলে 'কামিলা তোলা' নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে জনৈক পাটভক্ত্যা একটি কাস্তের অগ্রভাগে মশাল জ্বালাইয়া একটি পুষ্করিণীর জলে নামেন এবং অন্যান্য ভক্ত্যারা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ান। অতঃপর পাটভক্ত্যা ডুব দিয়া কুম্ভটি বারিপূর্ণ করেন এবং কুম্ভটিকে উপুড় করিয়া মাথায় স্থাপন করিলে পর অন্যান্য ভক্ত্যারা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া শিবমন্দিরে আনিয়া হাজির করেন। এই অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র অব্রাহ্মণ ভক্ত্যারাই যোগদান করেন।

১লা বৈশাখ বৈকালে শেষবারের মত ভক্ত্যারা শিবের পাটটিকে লইয়া বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন এবং এই দিন ভক্ত্যারা উত্তরীয় পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সংসার ধর্মপালন করেন। ১লা বৈশাখ শিবের পূজারী গাজনের ভক্ত্যাদিগকে অন্নভোজ দ্বারা আপ্যায়িত করেন। উৎসবটি প্রাচীন ও সর্বজনীন।

[বহুলাড়া গ্রামে সিদ্ধেশ্বর শিবের গাজন উৎসব সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

বহুলাড়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বর শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরে সুদূর অতীতকাল হইতে চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। সিদ্ধেশ্বর শিবের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কেবলমাত্র এই গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; সমগ্র বাঁকুড়া জেলা ব্যাপিয়া ইহা বিস্তৃত। পশ্চিমমুখী একটি সুবিশাল ইষ্টক নির্মিত মন্দিরের অভ্যন্তরে মেঝের সহিত সংযুক্ত উত্তরদিকে বিস্তৃত গৌরীপট্ট ভেদ করিয়া প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গ স্থাপিত। ইহাই সিদ্ধেশ্বর শিব নামে খ্যাত। গৌরীপট্টের উপর প্রোথিত একটি ত্রিশূল এবং দেওয়াল গাত্রে রক্ষিত লৌহ শলাকা বিদ্ধ 'পাট' ব্যতীত মন্দিরে প্রায় চার ফুট উচ্চ আরো তিনটি শিলামূর্তি আছে। উহার একটি উপবিষ্ট গণেশ মূর্তি, দ্বিতীয়টি শিরে সর্পছত্র ভূষিত দিগম্বর জৈনমূর্তি এবং তৃতীয়টি মহিষমর্দিনী মূর্তি। সিদ্ধেশ্বর শিবের সহিত উল্লিখিত ত্রি-মূর্তির নিত্য পূজাদি হইয়া থাকে। স্থানীয় লোক জৈনমূর্তিটিকে 'অনন্তদেব' এবং মহিষমর্দিনী মূর্তিটিকে 'সিদ্ধেশ্বরী দুর্গা' বলিয়া থাকেন। ইনি শিবের শক্তিরূপে দুর্গার ধ্যানে পূজিতা।

বাঁকুড়া তথা বাংলাদেশের এই প্রখ্যাত ও ঐতিহ্যমণ্ডিত সুপ্রাচীন মন্দিরের স্থাপত্য রীতি সম্পর্কে শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে বহুলাড়া গ্রাম সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—বাহুলাড়া-বোলাড়ার 'লাড়া' এবং আশপাশের কুলাড়া, বেলাড়া প্রভৃতির 'লাড়া' আর জৈনগ্রন্থের 'লাড়া' ও 'লাড়' দেশের শব্দসাদৃশ্য কাল্পনিক নয়। বাহুলাড়া গ্রাম বাংলার ইতিহাসের একাধিক যুগ উত্তীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। ইতিহাসের অনেক পর্বান্তরের চিহ্ন এখনও ঐ উচ্চ ভূমির গর্ভে লুকিয়ে আছে, সিদ্ধেশ্বরের মন্দির যার উপর প্রতিষ্ঠিত। চারিদিকের স্তূপগুলি বৌদ্ধদের স্তূপ বলেই মনে হয়, জৈনদেরও হতে পারে। জৈনরা যদিও স্তূপ-পূজা বিশেষ করতেন না, তবু কুষাণ যুগে মথুরায় জৈনধর্মীদের মধ্যে স্তূপ-পূজার প্রচলন ছিল দেখা যায়। বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরের এই প্রাঙ্গণটিতে আজ শিবের গাজনের অনুষ্ঠান হলেও একসময়

জৈন ও বৌদ্ধদের স্তূপার্চনাতেও সরগরম ছিল মনে হয়। তখনও সিদ্ধেশ্বরের মন্দির তৈয়ারী হয়নি, কেবল স্তূপবেষ্টিত উচ্চটিলার মত ছিল স্থানটি। তার অনেক পরে ঐ 'স্তূপ' শিখরাকারে দেউল ও দেবালয়ের উপর গড়ে উঠেছে—অষ্টম-নবম থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বরের দেউলটিও তখন তৈয়ারী হয়েছে জৈন ও বৌদ্ধরা বাংলাদেশ থেকে যখন প্রায় বিদায় নিয়েছেন। শৈব ও তান্ত্রিকরা, তখন আধিপত্য বিস্তার করেছেন। আজ পর্যন্ত তাঁদেরই আধিপত্য বেলিয়াড়ায় অক্ষুন্ন রয়েছে।

শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বাঁকুড়ার মন্দির' নামক প্রখ্যাত গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের প্রাচীনত্ব ও উহার স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার লিপিবদ্ধ তথ্যকে কোনরূপ বিকৃত বা অর্থহানি না করিয়া কেবল প্রয়োজনবোধে কোন কোন স্থানে সামান্য কিছু ভাষান্তর করিয়া উহার অংশবিশেষ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

"বাঁকুড়ার শিবমন্দিরগুলির মধ্যে বহুলাড়ার স্থান অতি উচ্চে। দেউল পর্যায়ে বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরটিই যে বাঁকুড়া জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির স্থাপত্যকীর্তি সে-বিষয়ে দ্বিমত নেই। বেগলার সাহেবের অভিমত,(আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া রিপোর্ট: অষ্টম খণ্ড) সর্ববৃহৎ না হলেও ইষ্টক নির্মিত এত সুন্দর মন্দির তিনি বাংলাদেশে কুত্রাপি দেখেননি। শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'হিষ্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অব দি ইণ্ডিয়ান পিপল্' সিরিজের 'দি স্ট্রাগল ফর এম্পায়ার' গ্রন্থে শ্রীসরসী কুমার সরস্বতী বলেছেন (পরিচ্ছেদ ২০: পৃ: ৬০৮-৯) মন্দিরটির শিখরদেশ অধুনা ভগ্ন এবং অলঙ্করণগুলিও জীর্ণ হয়েছে কালের কষাঘাতে। তবুও অঙ্গবিন্যাসের মনোহারিত্বে, আকৃতির রম্যতায় ও অলঙ্করণের বাহুল্যবর্জিত সরলতায় এই ইটের মন্দিরটিকে সামগ্রিকভাবে সর্বভারতীয় মন্দিরস্থাপত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যেতে পারে।

বহুলাড়া মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল আনুমানিকভিত্তিক। কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকায় এ-বিষয়ে নানা গবেষক নানা মত প্রকাশ করেছেন। কুমারস্বামীর ধারণায় এটি খ্রীষ্টীয় দশম শতকে নির্মিত। শ্রী কে, এন, দীক্ষিত স্থাপনাকালকে আরও দু'-এক শতাব্দী পিছিয়ে দেবার পক্ষপাতী। স্থাপত্য ও অলংকরণশৈলীর নজিরে শ্রীসরস্বতী সিদ্ধান্ত করেছেন, এটির নির্মাণকাল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে হওয়া অসঙ্গত নয়। পণ্ডিতজনের মতামতের এই পার্থক্য সত্ত্বেও বহুলাড়ার দেবালয়টি যে পাল-যুগের তাতে সন্দেহ নেই।"

মন্দিরসংলগ্ন ধ্বংসাবশেষ অপসারিত করিয়া যে সকল ছোট ছোট জৈন স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মন্দিরের গর্ভগৃহে রক্ষিত পার্শ্বনাথের মূর্তিটিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, রাঢ়দেশে জৈনধর্মের অন্তিমকাল তখন শৈবরা জৈন ধর্মমতকে উচ্ছেদ করে পূর্বতন কোন এক জৈন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপরে রাঢ়ের চিরকালের প্রতাপশালী দেবতা শিব সে-সময়ে নিজেকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমান মন্দিরটি হয়ত জৈন আমলে নির্মিত; ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু ধর্মের প্রভাবের কালে শিবপূজার জন্য পরবর্তী সময়ে নির্মিত পৃথক মন্দির নয়। যদিও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেহ করেন—মন্দিরটির স্থাপত্য-রীতি বিশ্লেষণ করেও আদিতে এটি জৈন না হিন্দু দেবালয় হিসাবে নির্মিত হয়েছিল সে বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা অসম্ভব। কেননা, ভারতীয় মন্দিরস্থাপত্যের ক্ষেত্রে জৈন, বৌদ্ধ বা হিন্দু-রীতি নামে পৃথক নির্মাণশৈলীর কখনই কোন অস্তিত্ব ছিল না। বহুলাড়ার মন্দিরটি 'নাগর'-রীতির উড়িষ্যায় বিকশিত আঞ্চলিক-শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত এক দেবসৌধ।

আশপাশের জমি থেকে প্রায় দশ ফুট উচ্চতার এক ঢিবির উপরে বহুলাড়ার বর্তমান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে মূল সৌধটির চতুর্দিকে আরও আটটি উপ-মন্দির ছিল। তা ছাড়া, ভোগ-মণ্ডপ ও সন্ন্যাসীদের বিশ্রামগৃহ প্রভৃতি পৃথক ইমারতও কয়েকটি ছিল বলে মনে হয়। এগুলি ও মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ঘিরে ইষ্টকনির্মিত যে দীর্ঘ প্রকার ছিল তা সবই ধূলিসাৎ হয়ে বর্তমান ঢিবিটির সৃষ্টি হয়েছে।

এ-সৌধটি উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যশৈলীর দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত। সেই রীতি অনুযায়ী মন্দিরের বাহিরের দেওয়ালে 'রথ-পগের' ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিম দিকে প্রবেশ-পথ থাকার দরুণ 'জাঙ্ঘ' অংশের আর তিন দেওয়ালের অলংকরণের জন্য কুলুঙ্গির ব্যবহার করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় 'রথ'গুলির গায়ে খোদিত কুলুঙ্গিগুলির শিখরে

মন্দিরাকৃতি ছোট ছোট অলংকরণ নিবদ্ধ হয়েছে। এই সজ্জাগুলি যে সাবেক মন্দিরের অনুকৃতি তাতে সন্দেহ নেই। বহুলাড়া মন্দিরের শীর্ষদেশ বর্তমানে ভগ্ন হলেও আদিতে দেবালয়টির পূর্ণ অবয়ব কিরূপ ছিল এই অলংকরণগুলি থেকে সে কথা সঠিকভাবে জানা যায়। 'জাঙ্ঘ' ও 'গণ্ডী' অংশের বিভাজক হিসাবে কয়েক প্রস্থ ইষ্টকনির্মিত কার্নিসের ব্যবহার করা হয়েছে এবং 'গণ্ডী' অংশের 'পগ' গুলির কিনারা তীক্ষ্ণ সমকোণ হিসাবে না রেখে রূপান্তরিত করা হয়েছে মোলায়েম গোলাকৃতিতে। অগণিত চৈত্য-অলিন্দ ফুল-লতাপাতার অনুকৃতি ও অন্যান্য সজ্জার ব্যবহারে 'গণ্ডী'র সর্বাংশে অতি সূক্ষ্ম ও ব্যাপক অলঙ্করণ বহুলাড়া মন্দিরের সর্বাধিক দর্শনীয় বিশেষত্ব। এগুলি সবই কারুকার্যযুক্ত ইটের সমন্বয়ে রচিত। আদিতে এই অলঙ্করণগুলি পাতলা পলস্তারা দিয়ে আবৃত ছিল। আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভের পূর্ব-প্রদেশের তৎকালীন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রী এইচ, পাণ্ডে তাঁর ১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে বলেছেন যে, উল্লিখিত অলঙ্করণগুলিকে আরও মনোরম করার জন্য একদা রঙেরও ব্যবহার হয়েছিল। বর্তমানে রঙিন প্রলেপের চিহ্নমাত্র নেই এবং পলস্তারার বিচ্যুতি নিচের পোড়ামাটির টালিগুলিকে অনাবৃত করেছে বহু স্থানে। 'টেরাকোটা'-সজ্জার এত ব্যাপক প্রয়োগ সত্ত্বেও, আশ্চর্যের বিষয়, বহুলাড়া মন্দিরে পোড়ামাটির মূর্তির বিশেষ ব্যবহার হয়নি। দেবালয়টির 'জাঙ্ঘ' অংশের দু'পাশে ও পিছনের দিকে যে-কুলুঙ্গিগুলি নিবদ্ধ আছে তার একটিতে সিংহের মস্তকযুক্ত এক বলশালী পুরুষ দুই হাতে দু'টি সিংহকে ও দুই পায়ে দু'টি হস্তীকে মর্দিত করছেন এ-রকম এক ভাস্কর্যের কথা শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মিডিভ্যাল স্কালপচার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মূর্তি-ভাস্কর্যে দীন হলেও অলংকরণের মনোহারিত্বে বহুলাড়ার দেবসৌধটির সঙ্গে তুলনীয় আর কোন মন্দির বাংলাদেশে আছে কিনা সন্দেহ। শুধু উৎকৃষ্ট অলংকরণই নয়, কিছু কিছু অঙ্গশিখরের ব্যবহারও দেবালয়টির রম্যতা বর্ধিত করেছে। এই অঙ্গশিখরগুলির জন্য শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এটিকে খাজুরাহোর মন্দিরগুলির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

এই প্রখ্যাত মন্দির সম্পর্কে শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয় তাঁহার 'ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক ১৯৫১, বাঁকুড়া' গ্রন্থে যে তথ্য-লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

Bahulara—A village in the Bankura sub-division, situated on the south bank of the Dhalkisor river, 12 miles south east of Bankura and 3 miles north of Onda. It contains a temple dedicated to Mahadeo Siddheswar, said to have been built by the Rajas of Bishnupur (but probably much older, being a Jain temple), which Beglar has described as the finest brick temple in the district, and the finest though not the largest brick temple that he had seen in Bengal. He gives the following account of it in the *Reports of the Archaeological Survey of India*, Vol. VIII.

"The temple is of brick, plastered ; the ornamentation is carefully cut in the brick, and the plaster made to correspond to it. There are, however, ornaments on the plaster alone, but none inconsistent with the brick ornamentation below. I conclude, therefore, that the plaster formed a part of the original design. The mouldings of the basement are to a great extent gone, but from fragments here and there that exist, a close approximation can be made to what it was ; some portions are, however, not recoverable. The present entrance is not the original old one, but is a modern accretion, behind which the real old doorway, with its tall, triangular opening of overlapping courses, is hidden. This old opening is still to be seen internally ; it consists of a rectangular opening, 41 courses of bricks in height, over which rises the triangular portion in a series of corbels, each 5 courses in depth ; the width of the opening is 4 feet 10 inches. There is no dividing still, and from the facade of the temple it is evident that the cell, with its attached portico in the thick-

ness of the wall itself, stood alone without ans adjuncts in front. There are, however, the remains of a *Mahamandapa*, which was added on in recent times ; but it is widely different in construction and in meterial to the old temple, and is probably not so old as the British rule in India. The object of worship inside is named Siddheswar, being a large *lingam*, apparently *in situ*. I conclude, therefore, that the temple was originally Saivic. Besides the *lingam* there are inside a naked Jain standing figure, a ten-armed female, and a Ganesa ; the Jain figure is clear proof of the existence of the Jain religion in these parts in old times, though I cannot point to the precise temple or spot which was devoted to this sect. The temple had subordinate temples disposed round it in the usal manner ; there were seven round the three sides and four corners and one in front, the last being most probably a temple to Nandi, the *vahana* of Siva. The whole group was enclosed within a square brick enclosure ; subordinate temples and walls are equally in ruins now, forming isolated and long mounds respectively." (p. lxiii)

সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণের বায়ুকোণে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ইঁটের স্তূপের মধ্যে একটি বৃক্ষের নীচে (স্থানীয় লোক ইহাকে বহেরকড়ি গাছ বলেন) 'খ্যান ভৈরব' নামে পরিচিত ভগ্ন গৌরীপট্টসহ একটি শিবলিঙ্গ এবং মন্দিরের পশ্চাৎভাগে অর্থাৎ পূর্বদিকে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে ইঁট দ্বারা বাঁধানো স্থানে গৌরীপট্টসহ মহেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রোথিত গৌরীপট্টহীন শিবলিঙ্গের ন্যায় দুইটি প্রস্তরের অগ্রভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামবাসীরা বলেন ইহারা মন্দিরের রক্ষী 'দুয়ারী' ও 'পূজারী'। ইহা ভিন্ন, আশপাশের কয়েকটি প্রাচীন পুষ্করিণীর মধ্যে মন্দিরের পূর্বদিকে 'দুইসতীনা পুকুর', অগ্নিকোণে 'বামনপুকুর', দক্ষিণদিকে 'হাটপুকুর', এবং পশ্চিমদিকে 'শালুকপুকুর' উল্লেখযোগ্য। দুইসতীনা পুকুর শ্বেতপদ্ম, হাটপুকুর রক্তপদ্ম এবং শালুক পুকুর কুমুদ ফুল অর্থাৎ শ্যামলা ফুল দ্বারা শোভিত ছিল এবং ঐ সকল পুষ্পাদি সিদ্ধেশ্বর শিবের পূজায় বিশেষ করিয়া গাজন উৎসবে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে কেবলমাত্র শালুক পুকুরটিতে কুমুদ ফুল শোভা পাইতেছে।

সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরটি আজ কালের প্রভাবে জীর্ণ। কেবল মন্দিরই নয় সিদ্ধেশ্বর শিবের প্রভাব আজ আর বোধ হয় তেমন করিয়া ভক্তের হৃদয়ে সাড়া জাগায় না, গাজন উৎসবের আজ আর সে সমারোহ নাই।

প্রতি বৎসর ২০শে চৈত্র হইতে সিদ্ধেশ্বর শিবের গাজন উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। এই দিন 'জাগরণ পর্ব' উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রথম ঢাকে কাটি পড়ে, ঢাকি ঢাক বাজাইয়া আর মুখে শিবের জয়ধ্বনি দিয়া গাজন উৎসবের কথা ঘোষণা করেন। এইদিন হইতেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় রাজার ভক্ত মন্দিরে মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়া যান, সঙ্গে ঢাকিরা ঢাক বাজান। বহুলাড়া গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে দ্বারকেশ্বর নদীর অপর পাড়ে উত্তরদিকে কুলিয়াড়া গ্রামের ডোমেরা বংশানুক্রমে সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দিরে ঢাক বাজাইয় যান।

উৎসব উপলক্ষে ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে চৈত্র ভক্ত বা সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয়। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ যে-কেহই ভক্তব্রত পালন করিতে পারেন। তবে উচ্চ শ্রেণী অপেক্ষা সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকজনদেরই অধিক ভক্তব্রত পালন করিতে দেখা যায়। ব্রত গ্রহণের পূর্ব দিন ভক্তদের একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া সংযম পালন করিতে হয়। ব্রত গ্রহণের দিন উপবাস থাকিয়া মন্দিরের পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ভক্তদের শিব গোত্রান্তরিত করিয়া সঙ্গে রাখিবার জন্য একটি নূতন গামছা, হাতে বেতের ছড়ি দিয়া গলায় মালার ন্যায় মন্ত্রপূত সুতার গুচ্ছ পরাইয়া দেন। ব্রত চলাকালীন সময়ে ভক্তরা দিনে একবেলা হবিষ্যান্ন এবং রাত্রে সামান্য কিছু ফলাদি আহার করিয়া শুদ্ধাচারে দিনযাপন করেন।

২৬শে চৈত্র প্রথম ভক্ত গ্রহণের দিন কেবলমাত্র চারজন ব্যক্তিকে ভক্তব্রত গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন 'পাটভক্ত' অর্থাৎ প্রধান ভক্ত এবং অপর দুইজন 'রাজারভক্ত'রূপে পরিচিত। এই চারজন ভক্তই

বংশানুক্রমে ভক্তব্রত পালন করিতেছেন। বর্তমানে সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীরতন ঘোষ ও শ্রীগোকুল চন্দ্র পান পাটভক্ত এবং শ্রীভেমু বাউরী ও শ্রীপ্রহ্লাদ বাউরী রাজারভক্তরূপে কার্য সম্পাদন করিতেছেন। ২৬শে তারিখে সারাদিন উপবাস থাকিয়া পাটভক্তদ্বয় সূর্যাস্তের পূর্বে মন্দির হইতে শলাকাবিদ্ধ পাট বাহির করিয়া নিকটবর্তী দ্বারকেশ্বর নদীতে এবং মন্দিরের দক্ষিণদিকে আধ মাইল দূরে হুড়হুড়িয়ার খালে ঢাক-ঢোলের বাজনাসহ পাটস্নান করাইতে যান। এই উভয় স্থানেই পুরোহিত উপস্থিত থাকেন। যথারীতি পাটস্নানের পর পাট দুইটিকে ঘাট হইতে মাথায় করিয়া রাজারভক্ত মন্দিরে আনিয়া রাখেন। ইহার পর উক্ত চারজন ভক্তকে শিব গোত্রান্তরিত করিয়া ভক্তব্রত পালনের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয় এবং মন্দিরে পাটপূজার পর সূর্যার্ঘ প্রদান করিয়া তাঁহারা উপবাস ভঙ্গ করেন।

২৭শে ও ২৮শে তারিখে অনুরূপভাবে যথারীতি পাট-স্নান, পাটপূজা ও শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে সর্বাধিক অর্থাৎ প্রায় একশত স্ত্রী-পুরুষ ভক্তব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ২৮শে 'নাচনভক্ত' নামে একদল ভক্ত গ্রহণ করা হয়। ইঁহারা উৎসবকালে নৃত্যগীত করিয়া থাকেন। এইদিন সকালে 'ফলকাটা' পর্ব উপলক্ষে ভক্তরা গ্রামবাসীর ক্ষেত-খামার হইতে ফল সংগ্রহে বাহির হন। যে-সকল গাছ হইতে ভক্তরা ফল সংগ্রহ করেন, সেই সকল গাছের পাতায় কিছু আবির রাখিয়া চিহ্ন দিয়া আসেন; বাগানের মালিক বুঝিতে পারেন গাছ হইতে গাজনের ভক্তরা ফল অপহরণ করিয়াছেন। অন্যান্য ভক্তরা যে-সময় ফল সংগ্রহে ব্যস্ত সেই সময় পাটভক্তদ্বয় নাচনভক্তদের সহিত ঢাক-ঢোল লইয়া নিকটবর্তী চাবড়া, মাকড়কোল, দামাসিনি, ভাদুলডাঙ্গা, হুগরা, গামিত্থা, চাঁদাইডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের কয়েকটি নির্দিষ্ট গৃহস্থের বাড়ী উপস্থিত হইয়া শিবের আশীর্বাদী ফুল বেলপাতা দিয়া আসেন; পরিবর্তে গৃহস্থেরা তাঁহাদের ছোলা, ফল ও সামান্য অর্থাদি দিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। অপরদিকে ভক্তগণ সংগৃহীত ফলগুলি লইয়া গ্রামের আশপাশের বিভিন্ন স্থানে যে-সকল গ্রাম্য দেবদেবী আছেন সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক স্থানে একটি করিয়া ফল রাখিয়া দেবদেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান এবং অবশিষ্ট ফলগুলি শিব মন্দিরে আনিয়া রাখেন। ইহার পর ভক্তরা মন্দির হইতে পাট লইয়া ঘাটে পাটস্নান করাইতে যান এবং মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করেন।

সন্ধ্যাকালে 'গামির স্নান' নামে একটি পর্ব উপলক্ষে গ্রামের একটি নির্দিষ্ট গামির গাছতলায় গম্ভীরা পূজা হইয়া থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সময় মন্দির হইতে ভক্তসহ পুরোহিতকে দৌড়াইয়া গামির গাছতলায় উপস্থিত হইতে হয়। গম্ভীরা পূজার পর পাটভক্তদ্বয় উক্ত গাছটিকে প্রদক্ষিণ করিয়া উহার ঈশান কোণ হইতে দুইটি শাখা ভাঙ্গিয়া মাথায় লইয়া মন্দিরা-ভ্যন্তরে মহিষমর্দিনী অর্থাৎ সিদ্ধেশ্বরী দুর্গার নিকট আনিয়া রাখেন। গামিরের শাখা ভাঙ্গিয়া আনিবার সময় অন্যান্য ভক্তরা পাটভক্তদ্বয়ের শিরে বেতের ছড়ি দ্বারা অনবরত আঘাত করিতে থাকেন।

রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় 'রানীভাট' নামে আর একটি পর্ব উপলক্ষে বাদ্যাদি সহ ভক্তরা গ্রামের গোস্বামীদিগের গৃহ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া নৃত্য-গীত করেন এবং রাজমান্য-স্বরূপ পাটভক্ত ও রাজারভক্ত গৃহস্বামীর কণ্ঠে মাল্যদান করেন। ইহা ব্যতীত এই সময় উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও মাল্যদান করা হয়। গোস্বামীগণ ভক্তদের জন্য সামান্য কিছু ফলাহারের ব্যবস্থা করেন ও ঢাকিদের সামান্য অর্থ বকশিস্ দেন। রাত্রিকালে মন্দিরে যথারীতি শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং উৎসব প্রাঙ্গণে যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

২৯শে চৈত্র সকাল হইতেই দলে দলে মানসিককারীরা নিজ নিজ মানত অনুসারে শিবমন্দির প্রাঙ্গণে দুই হাতে, মাথায় বা শায়িত অবস্থায় পেটের উপর নতুন মাটির সরা রাখিয়া অথবা শিশু সন্তান কোলে লইয়া ধুনা পোড়ান এবং শিবের নিকট পূজাদি দিয়া থাকেন। মধ্যাহ্নে মানসিক পূজাদি শেষ হইবার পর নদীর ঘাটে পাটস্নান ও পুরোহিত কর্তৃক পাটপূজার পর ভক্তরা সূর্যার্ঘ প্রদান করেন এবং পুরোহিত, উল্লিখিত গোস্বামীবাড়ীর গৃহস্বামী ও উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গলায় মাল্যদান করেন। ইহার পর পাটভক্ত শলাকাবিদ্ধ পাটের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের বুকের উপর পুরোহিত উপবেশন করিলে পর সেই অবস্থায় অন্যান্য ভক্তরা পাটসহ তাঁহাদের কাঁধে

তুলিয়া মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। মন্দিরাভ্যন্তরে পাট নামাইবার পূর্বে সাত বার মন্দির প্রদক্ষিণ করা হয়। ঘাট হইতে মন্দিরে আগমনকালে ভক্তরা পাটের উপর শায়িত পাটভক্তের মাথায় বেতের ছড়ি দ্বারা অনবরত আঘাত করিতে থাকেন। এই সময়ও অনেক মানতকারী ধুনা পুড়াইয়া থাকেন ও নদীর ঘাট হইতে দণ্ডী খাটিয়া মন্দির অবধি আসেন। রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় ভক্তরা মন্দির প্রাঙ্গণে ঢাক-ঢোলের তালে তালে নানাপ্রকার আনুষ্ঠানিক নৃত্য প্রদর্শন করেন। পরে যাত্রাভিনয় হয়।

মধ্যরাত্রিকালে গ্রামের উত্তরদিকে 'চেনাবাঁধি' নামক বাঁধের ধারে নির্দিষ্ট স্থানে দুইটি ঘটে পুরোহিত কর্তৃক কামাখ্যা দেবীর পূজা করিবার পর পাটভক্তদ্বয় ঘট দুইটি লইয়া নদীর জলে নামেন ও এক ডুবে উহা বারিপূর্ণ করিয়া অদ্ভুত কৌশলে উপুড় করিয়া মাথার উপর এমনভাবে স্থাপন করেন যাহাতে ঘটের জল বাহিরে না আসিতে পারে এবং সেই অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধেশ্বরী দুর্গা মূর্তির নিকট ঘট দুইটি স্থাপন করেন। ঘট আনিবার সময় পথে ভক্তরা ছড়ি দ্বারা ঘটের উপর আঘাত করিতে থাকেন। ইহাকে 'কামিলা তোলা' পর্ব বলা হয়।

অতঃপর 'বাণফুঁড়া' বা 'বাণকাটা' পর্ব উপলক্ষে ভোর রাত্রে রাজারভক্ত ও অন্যান্য সাধারণ ভক্তরা প্রায় ½" মোটা ও আট হাত লম্বা তীক্ষ্ণ লৌহ শলাকা কণ্ঠে, জিহ্বায়, পৃষ্ঠে অথবা বক্ষে ফুঁড়িয়া ঢাক-ঢোলের বাদ্যসহ নৃত্য করিতে করিতে নদীর ঘাট হইতে গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন এবং পরের দিন অর্থাৎ ৩০শে চৈত্র অপরাহ্নে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণের পর শিবের নিকট প্রণাম জানাইয়া শরীর হইতে বাণ খুলিয়া ফেলেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাণফুঁড়া উপলক্ষে ব্যবহৃত উক্ত লৌহ শলাকাগুলি মন্দিরে পুরোহিত দ্বারা শিবভক্ত বাণরাজার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া লওয়া হয় এবং জনৈক কামার শলাকাগুলি ভক্তদের শরীরে ফুঁড়িয়া দেন। বর্তমান ভেটিয়াড়া গ্রামের শ্রীনিমাই কর্মকার পুরুষানুক্রমে বাণফুঁড়ার কার্য করিতেছেন।

সায়াহ্নে 'দুইসতীনা পুকুর' হইতে চড়কগাছ তোলা হয়। প্রায় ২০।২৫ হাত লম্বা চড়কগাছটি সারা বৎসর ঐ পুকুরে নিমজ্জিত থাকে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়কগাছ তুলিয়া শিব মন্দিরের দক্ষিণ প্রাঙ্গণে গাছটি পুঁতিয়া যথারীতি পূজা করা হয়। চড়কগাছে উঠিবার পূর্বে ভক্তরা পুরোহিত, শ্রীনিমাই কর্মকার ও উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাল্যদান করেন এবং পাক্ খাবার কালে উপর হইতে শিবের আশীর্বাদী ফুল নিক্ষেপ করেন এবং ঐ ফুল সংগ্রহের জন্য নীচে অপেক্ষারত জনতার মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। বর্তমানে প্রায় ত্রিশ জন ভক্ত চড়ক গাছে পাক্ খাইয়া থাকেন।

মধ্যরাত্রে 'গাজন ঘর ঢোকান' নামে একটি পর্ব উপলক্ষে পাটভক্তদ্বয় 'দুইসতীনা পুকুর'-এর ঈশান কোণে একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে কাঁটাযুক্ত গাছের একটি শাখা লইয়া বাজনার তালে তালে নাচিতে নাচেতে মন্দিরে আসিয়া হাজির হন এবং মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যাইবার কালে মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তরদিকে উক্ত শাখাটি রাখিয়া যান। মন্দির প্রদক্ষিণ কালে পাটভক্তরা মুখে ছড়া কাটেন—

"লেগে যা ভেল লেগে যা,
শিবের গাজন ঘর ঢুকে যা।"

এই পর্বের পর অনেকে রোগমুক্তির আশায় মন্দিরে ধর্ণা দিয়া থাকেন। শোনা যায় কেহ কেহ শিবের প্রত্যাদেশিত ঔষধ পাইয়া আরোগ্যলাভ করিয়া থাকেন।

১লা বৈশাখ মধ্যাহ্নে ভক্তরা পাটস্নান করাইতে নদীর ঘাটে উপস্থিত হইয়া পাটটিকে এবং পুরোহিত মহাশয়ের পায়ে ও গায়ে তেল-হলুদ মাখাইয়া ও নিজেদের মাখিয়া স্নানাদি করেন। এই সময়ে ঘাটে ভক্তরা গলার উত্তরীয় ও বেতের ছড়ি ত্যাগ করিয়া ভক্তব্রত হইতে মুক্তিলাভ করেন।

এইদিন মধ্যাহ্নে শিবের নিকট নিবেদিত অন্নভোগ দ্বারা ভক্তদের ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। ইহাকে 'পাত্রভোগ' পর্ব বলে; এই পর্বের পর সিদ্ধেশ্বর শিবের গাজন উৎসবের সমাপ্তি হয়। উৎসব উপলক্ষে আশ-পাশের গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। বলা বাহুল্য পূর্বের তুলনায় সিদ্ধেশ্বর শিবের গাজন উৎসবের আড়ম্বর বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। আর্থিক অসঙ্গতিই ইহার মূল কারণ। উৎসবটি সর্বজনীন। ১৩৬২ সনে গঠিত একটি কমিটি গ্রামবাসীর

নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বর্তমানে গাজন উৎসব পরিচালনা করিতেছেন এবং উৎসবটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। সিদ্ধেশ্বর শিবের গাজন উপলক্ষে প্রতি বৎসর উৎসব প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে (বিস্তারিত বিবরণ মেলা-বিবরণী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে)।

সিদ্ধেশ্বর শিবের গাজন ব্যতীত প্রতি বৎসর শিব-চতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে রাত্রি চার প্রহরে চারবার যথারীতি পূজা, অষ্টম-প্রহরব্যাপী কীর্তন হয় এবং বহু ভক্ত মন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসর শারদীয়া দুর্গাপূজায়, আষাঢ় মাসের যে-কোন শনি-মঙ্গলবার, মাঘ মাসের মাকড়ী সপ্তমী তিথিতে ও মকর সংক্রান্তি তিথিতে মন্দিরে সিদ্ধেশ্বরী দুর্গার বিশেষ পূজা এবং মাঘ মাসের গণেশ চতুর্থী তিথিতে মন্দিরে রক্ষিত পূর্ব উল্লিখিত গণেশ মূর্তির পূজা হইয়া থাকে। স্থানীয় সাবর্ণ গোত্রীয় গাঙ্গুলী পদবীধারী ব্রাহ্মণ শিবমন্দিরে যাবতীয় পূজাদি করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপুর থানার অযোধ্যার জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায়গণ সিদ্ধেশ্বর শিবের নিত্যপূজাদির জন্য কিছু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন; বর্তমানে মাত্র চার বিঘা দেবোত্তর জমি আছে।

বহুলাড়া গ্রামে স্থানীয় গোস্বামীদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরে রাধাবিনোদজীউ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের দারুময় মূর্তি, গঙ্গোপাধ্যায়দিগের প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতু নির্মিত রাধাবল্লভ মূর্তি ব্যতীত পানপাড়ায় ও লায়েকপাড়ায় মনসার মৃন্ময় মূর্তি আছে। পানপাড়ার মনসাতলায় মনসার সহিত একটি প্রস্তর নির্মিত ছোট মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়; স্থানীয় লোকে ইহাকে গোবর্ধন বলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বহুলাড়া গ্রামের অন্তর্গত ছোট কেঁন্দুলি নামক স্থানে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে হুড়হুড়িয়া খালের ধারে একটি অশ্বত্থগাছের তলায় ঘট স্থাপন করিয়া কবি জয়দেবের স্মৃতিপূজা, পুণ্যস্নান, ভোগ বিতরণ ও আনন্দোৎসব করা হয়। স্থানীয় ঘোস (কায়স্থ) পরিবার উৎসবটি পরিচালনা করেন। এই একই দিনে ছোট কেঁন্দুলি গ্রামের পূর্বদিকে দামাসিনি মৌজার অন্তর্গত হুড়হুড়িয়া খালের ধারে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় কবি জয়দেবের উদ্দেশ্যে অনুরূপ পূজাদি হইয়া থাকে। ইহা বড় কেঁন্দুলির উৎসব নামে খ্যাত এবং দামাসিনি গ্রামের বক্সী পদবীধারী ছত্রিদের দ্বারা উৎসব পরিচালিত হয়। স্থানীয় গোস্বামীগণ পূজাদি করেন। উৎসব উপলক্ষে নামকীর্তন, অদ্বৈত ক্ষ্যাপা বামচারী কর্তৃক প্রতি বৎসর প্রায় চার-পাঁচশত বালক ভোজন করান হয় এবং বিবিধ জিনিসপত্রের অনেকগুলি দোকানপাট বসে। উৎসবটি প্রাচীন।

বিবিধ পূজা

(চাঁদরায়)

প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বেলিয়াড়া গ্রামে চাঁদরায় ঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে। ইনি বাংলাদেশের বার ভূঁইয়ার অন্যতম চাঁদরায় এবং এই গ্রামে চাঁদরায় ঠাকুর নামে লৌকিক দেবতারূপে পূজিত। এই পূজার প্রচলন সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, একদা চাঁদরায়ের নৌবাহিনীর কতিপয় মাঝি-মাল্লার ভাগ্যান্বেষণের জন্য বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী এই গ্রামে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন এবং তাঁহাদের মহান প্রভুর স্মৃতি স্মরণে পূজার আয়োজন করেন। তদবধি চাঁদরায়ের পূজা চলিয়া আসিতেছে। ইহা স্থানীয় মাঝি সম্প্রদায়ের নিজস্ব উৎসব। উৎসব উপলক্ষে একটি মাটির হস্তিমূর্তি স্থাপন করিয়া তাহার কণ্ঠে একটি পৈতা ঝুলাইয়া দিয়া পূজা করা হয়। ইহা চাঁদরায়ের প্রতীক স্বরূপ। পূজার স্থানে হস্তীমূর্তির চারিপাশে ছোটবড় আরো কয়েকটি মাটির ঘোড়া রাখা হয়। উৎসবটি দুইদিনব্যাপী স্থায়ী হয়। সংক্রান্তির পূর্বদিন ঘটস্থাপন এবং অপরাহ্ণে নদী হইতে 'বারি' অর্থাৎ জল আনিয়া উক্ত হাতি-ঘোড়ার মূর্তিগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া তেল-সিঁদুর দ্বারা রঞ্জিত করা হয়। তেল-সিঁদুর লেপন করিয়া মূর্তিগুলিকে পূজার স্থানে স্থাপন করিলে কয়েকজন ভক্তের উপর ভর হয়; ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তাঁহারা নানাপ্রকার দৈব ঔষধ এমন কি মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক কথা বলিয়া থাকেন।

সংক্রান্তির দিন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিকাল পর্যন্ত যথারীতি চাঁদরায়ের পূজা হইয়া থাকে। এইদিন বৈকালে মন্দির প্রাঙ্গণে একটি কৃত্রিম যুদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করা

হয়। ইহা পূজার অঙ্গস্বরূপ। উৎসবে বেলিয়াড়া গ্রামের মাঝি সম্প্রদায় ব্যতীত পার্শ্ববর্তী ধগেরা গ্রামের মাঝিরা যোগদান করেন। মাঝি সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি সেবায়েত নিযুক্ত আছেন। তবে চাঁদরায়ের পূজা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ দ্বারাই করান হয়। বর্তমানে এই জেলার হরিণাবালা গ্রামের (পোঃ তেলিবেড়িয়া) শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চাঁদরায়ের পূজা করিয়া থাকেন। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

পূজারী নিম্নলিখিত ধ্যানে চাঁদরায়ের পূজা করিয়া থাকেন :

চাঁদরায়ং সমাপন্নং যদকীর্তি সমাভূতে
যদা মাজ্জং সদা প্রাজ্ঞং চাঁদরায় সমন্বিতং
যদা কৃষ্ণা সমাভূত তব কীর্তি বিমৰ্জ্জিতঃ
চাঁদরায়ং নমস্ততে।
ইদং অর্ঘ্যং সমাভুক্ত চাঁদরায় সমাস্থিতং
ইদং কৃষ্ণ সমাভূতার্থেন যশকীর্তি সমাভূতং
তব কীর্তি বিমৰ্জ্জিতা ব্রাহ্মণস্য সুতাসুতং
তব পদাম্বুজেসদা
ভক্তিহীনং যদানরং মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তি-
হীনং চ মানব
তব পূজা যিনির্নিম্মতা চাঁদরায়ং নমস্ততে ॥

চাঁদরায়ের স্তোত্র

ইদং স্তোত্রং সমাস্থিতং চাঁদরায়ং নমস্ততে
ইদং স্তোত্রং সমাযুতং ব্রাহ্মণস্য নন্দনং সুতং
ইদং কৃষ্ণং সমাস্থিতং চাঁদরায়ং নমস্ততে
তবকীর্তিব্যাপী যঃ সং সর্বকর্ম বিপর্য্যতা
সমানিতং মহাবাহু ইদংকীন সমাস্তোত্রং
চাঁদরায় নমস্ততে।
তবচরণ প্রসাদেন যশকীর্তি সমাস্থিতং
ব্রাহ্মণস্য নন্দন তুমি অজ্ঞান যে নর আমি
নিজ গুণে কর কৃপা দয়া কর সর্বজনে
ব্রাহ্মণস্য পুত্রসুতং নমঃ চাঁদরায়ং
নমঃ চাঁদরায়ং দিবং সদাশীদং সদা
প্রক্ষং চাঁদরায়ং নমস্ততে
চাঁদরায়ং ব্রাহ্মণস্য নন্দন যগ্য তব
শ্রীচরণে প্রণম্যমহং।

(উল্লিখিত ধ্যানের মধ্যে অসঙ্গতি আছে ; তবু যেভাবে ধ্যানটি পাঠ করা হয় আমরা হুবহু সেইভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।)

মনসাপূজা

বেলিয়াড়া গ্রামে বন-জঙ্গল পরিপূর্ণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে মনসাদেবীর প্রতীকস্বরূপ একটি প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। অনেকে অনুমান করেন ইনি বৌদ্ধদিগের কোন দেবী ছিলেন। জনশ্রুতি আছে জনৈক কলু উক্ত মূর্তিটিকে আবিষ্কার করিয়া এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন এবং মনসাজ্ঞানে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। ইহা বহুকাল আগের ঘটনা। তদবধি মূর্তিটি মনসারূপে পূজিত হয় এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তি তিথিতে সাড়ম্বরে উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখনও উৎসবের সময় দেবীর অঙ্গ মার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সরিষার তৈল উক্ত কলু পরিবারই সরবরাহ করা হয় এবং মনসাদেবীর নিকট নিবেদিত অন্ন-ভোগের একটি অংশ তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিবার রীতি আছে।

বর্তমানে উৎসবটি গ্রামের সর্বসাধারণের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের দিন দেবীর অঙ্গে তৈল মাখাইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে একশত আট কলসী জল ঢালিয়া মনসার স্নানাভিষেক পর্বের পর যথারীতি পূজাপাঠ হইয়া থাকে। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণগণই মনসার পূজা ও অন্নভোগ রন্ধন করিয়া থাকেন। পূজান্তে দেবীর নিকট একটি পাঠা বলি দিয়া উহার মাংস গ্রামের প্রত্যেকের বাড়ী বিতরণ করা হয়। ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়। বেলিয়াড়া গ্রামের মনসা বিশেষ জাগ্রত বলিয়া বিশ্বাস। বার্ষিক উৎসব ব্যতীত দেশে অনাবৃষ্টি বা মহামারী দেখা দিলে সাড়ম্বরে মনসার নিকট পূজার আয়োজন করা হয়। পূর্বে সেবা-পূজার জন্য পুরোহিতের নামে কিছু দেবোত্তর ভূসম্পত্তি ছিল ; বর্তমানে উহা হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে।

অমরপুর গ্রামে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মনসাদেবীকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী মহাধুমধামের সহিত পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসব উপলক্ষে অনেকে ভক্তব্রত পালন করেন। ভক্তদের 'বারুতি' বলা হয়। বারুতিদিগকে পূজায় প্রথম দিন হইতে দ্বিতীয় দিনের পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস পালন করিতে হয়। দশহরা তিথির পূর্বদিন মধ্যরাত্রে বারুতিগণ বাদ্যভাণ্ডসহ দেবীর মূর্তিকে একটি নির্দিষ্ট পুষ্করিণীর ঘাটে আনিয়া স্নান করান এবং তাহার পর মূর্তিটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া ইঁহার বেশভূষা পরিবর্তন করা হয়। প্রথম দিন যথারীতি মনসার পূজা সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় দিন পূজা আরম্ভের পূর্বে বারুতিগণ মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভরে দণ্ডায়মান থাকেন। এই সময় বারুতিদের উপর দেবীর ভর হইলে পর একটি ছাগ বলি দিয়া মনসার পূজা আরম্ভ হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মনসাপূজার তিনদিন গ্রামবাসীগণ গ্রামের সীমানার বাহিরে কোথাও যাত্রা করেন না। বিশ্বাস এই নিয়মভঙ্গ করিলে দেবীর কোপে অমঙ্গল ঘটিবে। তৃতীয় দিনের পূজার পর ব্রাহ্মণ ভোজন ও সর্বসাধারণের মধ্যে অন্নভোগ বিতরণ করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায় পদবীধারী জনৈক ব্রাহ্মণ মনসাদেবীর নিত্য পূজা করিয়া থাকেন।

পতঙ্গপুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা তিথিতে দশহরা স্নান ও তদুপলক্ষে মনসার পূজা হইয়া থাকে। পূর্বদিন ঢাক-ঢোলের বাদ্য করিয়া মহাসমারোহে মনসার ঘট স্থাপন করা হয়, ইহাকে 'কামিলা' তোলা বলে। পরের দিন যথারীতি পূজা ও হোম যজ্ঞের পর পূজা প্রাঙ্গণের সম্মুখস্থ একটি আটচালায় মনসামঙ্গল গানের আসর বসে। বিকালে মনসামঙ্গল গান শেষ হইলে ভক্তগণ মনসার ঘট শিরে স্থাপন করিয়া ঢাক-ঢোলের বাজনার তালে তালে নৃত্যগীত করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন এবং এইরূপে সারারাত্রি অতিবাহিত করিয়া উৎসব প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলে মনসাদেবীর স্নানাভিষেক এবং ক্ষীরভোগ নিবেদনের পর উৎসব শেষ হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় সত্তর-আশি বৎসরের প্রাচীন। আশপাশের আগরা, নন্দনপুর, চাঁদাবিলা, গোহালতোড়, মহলবেড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে উৎসবে প্রায় চারিশত নরনারী যোগদান করেন এবং মনসার নিকট মানসিক পূজাদি দিয়া থাকেন। উৎসব উপলক্ষে সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং প্রতি বৎসর পূজা প্রাঙ্গণের আশপাশে কয়েকটি খাবারের ও পান-বিড়ির দোকানপাট বসে।

রাসযাত্রা

গোড়াসোল গ্রামে স্থানীয় গোস্বামীগণের প্রতিষ্ঠিত রাধারমণজীউ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে ধূমধামের সহিত তিনদিনব্যাপী রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরে কষ্টিপাথর নির্মিত কৃষ্ণমূর্তি এবং অষ্টধাতু নির্মিত রাধিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই যুগল মূর্তিই রাধারমণজীউ বিগ্রহ নামে খ্যাত এবং এই বিগ্রহদ্বয় বাঙলা দেশের প্রাচীনতম বিগ্রহমূর্তির অন্যতম বলিয়া গ্রামবাসী দাবী করেন। মন্দিরের সম্মুখে একটি আটচালা নাটমন্দির ভাণ্ডার ঘর ও ভোগ রন্ধন ঘর আছে। শোনা যায় প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গোস্বামীগণ রাধারমণজীউর রাসযাত্রা উৎসব শুরু করেন এবং অদ্যাবধি উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসব শুরু হইবার প্রায় দশদিন পূর্ব হইতে ইহার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। প্রস্তুতি পর্বে মন্দির সংস্কার, রাসমঞ্চ নির্মাণ, রাস্তাঘাট পরিষ্কার এবং অতিথি-অভ্যাগতের জন্য অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করা হয়। উৎসবের তিনদিন সাড়ম্বরে যথারীতি রাধারমণজীউর পূজা এবং সর্বজনীন ভোগ ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বাঁকুড়া জেলার নানাস্থান হইতে এবং বর্ধমান ও কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় পনের হাজার নরনারী এবং বহু বৈষ্ণব সাধু-সন্ন্যাসী আসেন। বর্তমানে ইহা এই অঞ্চলের একটি সর্বজনীন উৎসব বলিয়া বিবেচিত। রাধারমণজীউর নিত্য পূজা ও উৎবাদির জন্য বহু দেবোত্তর ভূসম্পত্তি ছিল। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর হইতে স্থানীয় গ্রামবাসীর অর্থানুকূল্যে ও সক্রিয় সহযোগিতায় উৎসবটি পরিচালিত হইতেছে।

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা
(নিরগিন শাহ পীর)

বীরসিংহপুর গ্রামে নিরগিন শাহ পীরের তিরোভাব উপলক্ষে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার পীরের সমাধি সংলগ্ন জমিতে ও দ্বারকেশ্বর নদীর চরাতে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন এবং দুইদিনব্যাপী স্থায়ী হয়।

বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে মেলায় প্রায় আড়াই হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। নিকটবর্তী স্থানের যাত্রীরা হাঁটিয়া এবং দূরবর্তী স্থানের যাত্রীরা ট্রেনে আসিয়া থাকেন। বিক্রেতারা বিষ্ণুপুর ও আশপাশের গ্রাম হইতে আসেন। মেলায় তেলেভাজা, ময়রা, মনিহারী এবং মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল ইত্যাদি জিনিসপত্রের চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। নিকটবর্তী হরিহরপুর গ্রামের কুমোরদের তৈয়ারী প্রসিদ্ধ মাটির জিনিসপত্র মেলায় বেশী আমদানী হইয়া থাকে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই; তবে উৎসব উপলক্ষে পীরের দরগাহের নিকট ভক্তি-মূলক গানের আসর বসে।

কালীপূজার মেলা

কল্যাণী গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির সংলগ্ন ষ্টেট রিলিফের রাস্তার পাশে প্রায় চার বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন মেলা।

স্থানীয় এবং পুনিশোল, রতনপুর, লোদনা, গৌরবাজার, জগদ্দলা, রাজগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন; তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ রাজগ্রাম, গৌরবাজার, বেড়্যা-খামার, পাইকা, বেলডাঙ্গরা প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির পনর-কুড়িটি দোকান বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য বাজী পোড়ান হয় ও রামপ্রসাদী গান এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। প্রায় দেড় হাজার দর্শক ও শ্রোতা আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

হীরাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে গ্রামের উত্তর প্রান্তে শিবমন্দির সংলগ্ন বটতলায় প্রায় দশ বিঘা জমির একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। ইহা গত দশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

পুনিশোল, কল্যাণী, রতনপুর, লোদনা, জগদ্দলা, চূড়ামণিপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন এবং বাঁকুড়া শহর হইতে প্রতি বৎসর মেলায় প্রায় দশ হাজার নরনারী এবং শতাধিক ব্যবসায়ী আসিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, শাকসব্জী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই, ছবি, কাপড়চোপড়, লোহার তৈয়ারী জিনিসপত্র এবং কারুশিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে আদায়ীকৃত অর্থে উৎসব ও মন্দির সংস্কারের ব্যয়ভার নির্বাহ করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক ও লটারীর দল আসে এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে। অধিকারীর নাম শ্রীঅবিনাশ পাত্র। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় তিন-চার হাজার নরনারী যোগদান করেন।

ভোলা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির প্রাঙ্গণে এবং নিকটবর্তী হাই স্কুলের মাঠে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। প্রধানতঃ বিকালের দিকে মেলায় লোকসমাগম হয়। ইহা প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

কল্যাণী, রতনপুর, পুনিশোল, লোদনা এবং সদর

থানার অন্তর্গত জগদল্লা ইউনিয়ন ও ইন্দপুর থানার অন্তর্গত গৌরবাজার ইউনিয়নের গ্রামসমূহ হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। ইহা ব্যতীত, বাঁকুড়া শহরাঞ্চল হইতে প্রায় শতাধিক যাত্রী আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বাঁকুড়া শহর হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। তাহা ছাড়া, স্থানীয় অঞ্চলের কয়েকজন ব্যবসায়ী মেলায় দোকান দেন। মেলায় প্রায় একশত দোকানপাট বসে এবং কুড়ি-পঁচিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, লাঙ্গলের ফাল, দা, কাস্তে, কোদাল, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, তাঁতের কাপড়, গামছা প্রভৃতি আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে চাঁদা হিসাবে যৎসামান্য অর্থ আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, সার্কাস ও লটারীর দল আসে এবং খেলাধূলা, রামায়ণগান বা ঝুমুরগানের আসর বসে। নিকটবর্তী নতুনগ্রাম হইতে রামায়ণগানের দল আসে। এই সকল আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানে প্রায় দুই হাজার দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

লোদনা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে পাতাল-ফোঁড়া শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় চারি বিঘা দেবোত্তর জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে।

পুনিশোল, আশনাসোল, মানখামার, মদরপুর, বিক্রমপুর বনমালীপুর, ভাটগ্রাম, অঙ্গদপুর, রায়েরগ্রাম, ধবনী প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা সমান।

স্থানীয় বিক্রেতাগণ ব্যতীত পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসর কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন, মনিহারী, ধামা-কুলা, মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি, তালপাতার পাখা প্রভৃতি আমদানী হয়। মোট প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে। অধিকারীর নাম শ্রীপূর্ণ চন্দ্র ভূঁই। পাঁচশত হইতে প্রায় এক হাজার নরনারী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

হরিহরপুর গ্রামে শিবের গাজন উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের ২৭শে তারিখ হইতে ছয়দিনব্যাপী শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম ও পুরুলিয়া জেলা হইতে মেলায় প্রত্যহ প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারী আসেন। নিকটবর্তী গ্রামের যাত্রীরা হাঁটিয়া এবং দূরবর্তী অঞ্চলের যাত্রীরা ট্রেন ও গরুর গাড়ী করিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। প্রায় সত্তরটি দোকানপাট বসে। উহাদের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা ইত্যাদির দোকানগুলি উল্লেখযোগ্য। বাঁকুড়া জেলার রায়পুর গ্রাম হইতে মেলায় প্রচুর বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও সার্কাসের দল আসে।

বগুলাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে সিদ্ধেশ্বর শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় সাত-আট বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় ওন্দা, লোদনা, চিঙ্গানী, তেলিবেড়িয়া, মাজডিহা, নিকুঞ্জপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে এবং মেদিনীপুর জেলা হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় বার হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, পাথরের থালা-বাটি মাটির হাঁড়ি-কলসী ও পুতুল, বই-ছবি, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র, ধামা-কুলা ইত্যাদির ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে এবং পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালা প্রধানতঃ ওন্দা গ্রাম ও বিষ্ণুপুর হইতে প্রতি বৎসর আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক

ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে। প্রায় সাত-আট হাজার নরনারী এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

দামোদরবাটী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে দেবোত্তর জমির উপর একমাসের জন্য মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম এবং বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রতিদিন প্রায় আট-নয়শত নরনারীর সমাগম হয়। তাঁহারা প্রধানতঃ মোটরবাস, ট্রেন ও রিক্সা করিয়া আসেন।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবার দ্রব্য, কাঠের পুতুল ও পাত্র, মাটির হাঁড়ি-কলসী, কাঁচ ও পাথরের বাসনপত্র, তাঁতের কাপড়, গামছা, তালপাতার পাখা, টোকা, ধামা-কুলা ইত্যাদি আমদানী হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন কয়েকজন ফেরিওয়ালাও আসেন। প্রতি বৎসর বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর হইতে বিক্রেতারা আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে। অধিকারীর নাম শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরী।

তেলিবেড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির দিন শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে গ্রামের রাস্তার দুই পার্শ্বে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম এবং বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। ট্রেন, মোটরবাস, গরুর গাড়ী এবং সাইকেলে করিয়া যাত্রীরা আসেন।

মেলায় ষাট-সত্তরটি দোকানপাট বসে এবং দশ-পনর জন ফেরিওয়ালা আসেন। নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে এবং বিষ্ণুপুর ও ওন্দা হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়ি-কুড়ি, খেলনা, পাথরের জিনিসপত্র প্রভৃতি মেলায় আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। কোন কোন বৎসর মেলায় নাগরদোলা ও সার্কাসের দল আসে।

দুর্গাপূজার মেলা

আশনাশোল গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গা-পূজা উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

পুনিশোল, লোদনা, কল্যাণী, বাঁকুড়া, জগদ্দলা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ প্রধানতঃ গরুর গাড়ী করিয়া আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বাঁকুড়া শহর হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, চা-পান-বিড়ি ইত্যাদির পনর-কুড়িটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য আতশ বাজি পোড়ান, কীর্তন ও শ্যামাসংগীত, যাত্রাভিনয় ও খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ-ছয়শত দর্শকের সমাবেশ হয়। স্থানীয় একটি পূজা কমিটি কর্তৃক উৎসব ও মেলা পরিচালিত হয়।

নিকুঞ্জপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেবীর আটচালা মন্দির সংলগ্ন স্থানীয় গ্রামবাসী শ্রীভবতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রায় এক বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

আশপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় প্রায় দুই হাজার নরনারী আসেন এবং ময়রা, মনিহারী, বাদামভাজা, চা-পান-বিড়ি প্রভৃতির পনর-কুড়িটি দোকান বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং থিয়েটার, কবিগান ও খেলাধূলার আয়োজন করা হয়।

(নিকুঞ্জপুর গ্রামে কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা এবং ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা উপলক্ষে যে-দুইটি মেলা বসে উহা উল্লিখিত দুর্গাপূজা মেলার অনুরূপ।)

দোলযাত্রার মেলা

বড়লাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা

উৎসব উপলক্ষে মহাপ্রভুর আটচালার চারিপাশে এবং অহল্যাবাঈ রোডের উভয় পার্শ্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও সাধারণের প্রায় দশ বিঘা জমির উপর পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

লোদনা, মাজডিহা, নিকুঞ্জপুর, নাকাইজুড়ি, কাটাবাড়ী, রামসাগর প্রভৃতি ইউনিয়নসমূহ হইতে এবং মেদিনীপুর জেলা হইতে প্রায় ত্রিশ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ রেলগাড়ী, মোটরবাস এবং গরুর গাড়ী করিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণের অধিকাংশই স্থানীয়; বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর হইতেও কিছু সংখ্যক বিক্রেতা আসেন। মেলায় প্রায় দেড়শত দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, কাঁচ, মাটি ও পাথরের তৈয়ারী বাসনকোসন, মনিহারী দ্রব্য, বই-ছবি, কৃষি যন্ত্রপাতি, তাঁতের কাপড়চোপড়, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতি আমদানী হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য মেলায় নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং কীর্তনগান এবং পালাগানের ব্যবস্থা করা হয়। কীর্তনগান ও পালাগানের দলগুলি স্থানীয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দশ হাজার নরনারী যোগদান করেন।

মনসাপূজার মেলা

অমরপুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা তিথিতে মনসাপূজা উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন জমির উপর চার-পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন মেলা বলিয়া দাবী করা হয়।

ছাগুলিয়া, বেনাগাড়ী, সামজোড়, চাইল্যা, বাইদ্ প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে প্রায় এক হাজার নরনারী আসেন। উহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় ময়রা, মনিহারী, পাথরের থালা-বাটি, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা-পুতুল, টোটকা ঔষধপত্র, ধামাকুলা, চা-পান-বিড়ি ইত্যাদির প্রায় ত্রিশটি দোকান বসে এবং আট-দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে।

মাজডিহা গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে গ্রাম্যদেবী মনসা এবং বালুকেশ্বরের একযোগে বার্ষিক পূজা উপলক্ষে মনসামন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় বার বিঘা জমির উপর ছয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

প্রধানতঃ মেলায় বিষ্ণুপুর, ওন্দা, কোষ্ঠিয়া, অযোধ্যা, পাঁচাল, সাস্তোড় প্রভৃতি অঞ্চল হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দৈনিক প্রায় আড়াই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। তাহা ছাড়া, অন্যান্য জেলা হইতেও কিছু সংখ্যক যাত্রীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সমাগত যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান। গরুর গাড়ী ও সাইকেল করিয়া বহু যাত্রী আসেন।

বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, অযোধ্যা, বেলিয়াতোড়, নিকুঞ্জপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। প্রধানতঃ মনিহারী ও মিষ্টান্নজাত খাবার দ্রব্য, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, ধামা-কুলা প্রভৃতি দ্রব্যাদির প্রায় একশত দোকান বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর ম্যাজিকের দল আসে।

লাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহারা তিথিতে মনসাপূজা উপলক্ষে স্থানীয় বাজারে এবং মনসামূর্তিসহ যে নির্দিষ্ট পথ দিয়া শোভাযাত্রা বাহির হয় সেই পথের দুই পাশে মেলার দোকানপাট বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং দুইদিন স্থায়ী হয়।

কাঁটাবাড়ী, রামসাগর, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় সাত-আট হাজার নরনারীর সমাগম হয়। পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা ট্রেনে, মোটরবাসে, গরুর গাড়ী এবং সাইকেল করিয়া আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, রাইপুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। প্রায় দেড়শত দোকানপাট বসে এবং পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, কাপড়-জামা, মাটির

হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা-পুতুল, ধামা-কুলা ইত্যাদি আমদানী হয়। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং মনসামঙ্গল গানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় ছয়-সাতশত নরনারীর সমাগম হয়।

রামসাগর গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের নিকট নীলডাঙ্গা নামক স্থানে স্কুল কমিটির প্রায় আট বিঘা জমির উপর দুইদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

মেলায় বিষ্ণুপুর, অযোধ্যা, রাধানগর, খামারবেড়ে, ওন্দা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় দশ-বার হাজার নরনারীর সমাগম হয়। দূরবর্তী অঞ্চলের যাত্রীরা সাইকেল ও গরুর গাড়ী করিয়া এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকেরা হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

বিষ্ণুপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া এবং স্থানীয় গ্রামের লোকেরা মেলায় দোকানপাট দেন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বই-ছবি ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই; তবে পূজা প্রাঙ্গণে রামায়ণগান ও মনসামঙ্গল গানের আসর বসে।

চান্দাবিলা গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন ব্যক্তিবিশেষের জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

বাকুইবাঁধ, মাকড়কেন্দা, পতঙ্গপুর, ভগবানবাটী, পুরুষোত্তমপুর, মহুড়বেড়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের পাঁচ-ছয়শত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারী যাত্রীর সংখ্যা বেশী দেখা যায়। অধিকাংশ যাত্রীই গরুর গাড়ী করিয়া আসেন।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বই-ছবি, ধামা-কুলা, দা, কোদাল ইত্যাদি জিনিসপত্রের পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে। জয়কাবাইদ, গোড়াশোল প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা মেলায় দোকান দেন।

মেলায় মনসামঙ্গলগান, কীর্তন, রামায়ণগান ও কবি-গানের আসর বসে। নিকটবর্তী নাকাইজুড়ি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর রামায়ণগানের দল আসে।

(চাঁদবিলা গ্রামে ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষে যে মেলা বসে তাহা উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ। শিবরাত্রি মেলাটিও প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।)

মহোৎসবের মেলা

চন্দ্রকোণা গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে চব্বিশপ্রহর-ব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমিতে এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে।

সদিষ্টা, ওন্দা, রতনপুর, টোল রঘুনাথনগর, গোপালপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা এবং প্রায় এক হাজার নরনারী আসেন।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, তালপাতার পাখা, টোকা, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা-পুতুল এবং বাঁশের তৈয়ারী নানাপ্রকার জিনিসপত্রের ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রগুলি ওন্দা, তেলনা, সদিষ্টা, গোপালপুর গ্রাম হইতে আমদানী হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য রামায়ণগান, কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

(প্রতি বৎসর ১৫ই বৈশাখ শিবের গাজন উপলক্ষে চন্দ্রকোণা গ্রামে যে মেলা বসে তাহা উল্লিখিত মহোৎসব মেলা বিবরণীর অনুরূপ।)

চড়ুইকুঁড় গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পূজা এবং অষ্টমপ্রহরব্যাপী অখণ্ড নামকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে। মেলাটি তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় সাত-আটশত নরনারীর সমাগম হয় এবং বিষ্ণুপুর, ওন্দা, অযোধ্যা প্রভৃতি

স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, লোহার বাসনপত্র, মনিহারী, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল, ধামা-কুলা, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে। উল্লিখিত অনুষ্ঠানে প্রায় দেড় হাজার শ্রোতা ও দর্শকের সমাগম হয়।

রথযাত্রার মেলা

মাধবপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে সাধারণের প্রায় দুই-তিন বিঘা জমির উপর রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে গরুর গাড়ীতে করিয়া এবং হাঁটিয়া বহু যাত্রী আসেন।

প্রধানতঃ বাঁকুড়া, রতনপুর, শালগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন, কাঁচের চুড়ি, মালা, বাঁশের বাঁশি, মাটির হাঁড়ি-কলসী, খেলনা-পুতুল, মনিহারী, বই-ছবি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদির প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে। মাটির ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রগুলি প্রধানতঃ কামারডিহা, মাধবপুর, নয়াদা প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে আমদানী হয়।

উৎসব উপলক্ষে কীর্তনগানের ব্যবস্থা করা হয়। মেলায় লটারী খেলার দল আসে। গ্রামেই কীর্তনের দল আছে।

রাসযাত্রার মেলা

দলদলী গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রাসমন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর জমিতে তিন-দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

নিকটবর্তী কল্যাণী, রতনপুর, পুনিশোল, গৌরবাজার, জগদ্দলা, আন্দারখোল প্রভৃতি ইউনিয়নসমূহ হইতে প্রায় আড়াই হাজার নরনারী এবং পুন্নাম, ঝাকতোড়, ক্ষীরপাই, সালকাপ প্রভৃতি দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আরও প্রায় তিন-চারশত নরনারী গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বাঁকুড়া শহরাঞ্চল, রাজগ্রাম, কুমিদ্যা, পাইকা, বেলডাঙ্গরা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির হাঁড়ি-কলসী, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়, হরিনাম সংকীর্তন ও বাজি পোড়ান হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে। অগণিত দর্শক এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

গোড়াশোল গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় রাধারমণজীউর রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন আটচালার চতুপার্শ্বে দেবোত্তর প্রায় সাত বিঘা জমিতে ছয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন থানা হইতে এবং মেদিনীপুর, বর্ধমান প্রভৃতি সীমান্তবর্তী জেলা হইতে মেলায় প্রায় বার-তের হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকজনেরা গরুর গাড়ী, সাইকেল-রিক্সা ও হাঁটিয়া এবং দূরবর্তী অঞ্চলের লোকজনেরা ট্রেন ও মোটরবাসে করিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় প্রায় একশত দোকান বসে এবং পঁচিশ-ত্রিশজন ফেরিওয়ালা দেখা যায়। প্রধানতঃ বিষ্ণুপুর, ওন্দা, পাঁচমুড়া প্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়ীরা দোকানপাট দেন। বিশেষ করিয়া বিষ্ণুপুর হইতে প্রচুর কাঁসার বাসনপত্র আমদানী হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন ময়রা, তেলেভাজা, বাদামভাজা, মনিহারী, লোহার বাসনপত্র, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, বই-ছবি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়ি-কলসী, খেলনা-পুতুল, তাঁতের কাপড়চোপড় ইত্যাদি আমদানী হইয়া থাকে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং কীর্তন, জলসা ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। কলিকাতা ও হুগলী হইতে পেশাদারী যাত্রার

দল আসে। আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানে প্রায় আট-দশ হাজার শ্রোতা ও দর্শকের সমাগম হয়।

ছাগুলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় রাধা-দামোদরজীউর রাস উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বে তিনদিনব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের আট-দশ মাইলের মধ্যবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে মেলায় সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, ধামা-কুলা, বই-ছবি, খেলনা পুতুল ইত্যাদির মাত্র পনর-ষোলটি দোকান বসে। বিক্রেতারা পাচমুড়া ও তালডাঙ্গরা গ্রাম হইতে আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং কীর্তন ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রার আসরে প্রায় দুই হাজার দর্শকের সমাগম হয়।

সরস্বতীপূজার মেলা

রতনপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী দ্রব্য, বই-ছবি, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদির পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং চারদিন স্থায়ী হয়। বিক্রেতারা প্রধানতঃ বাঁকুড়া শহর, বিষ্ণুপুর, হরিরামপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন।

রহড়াবাঁধ, রসিকনাগরপুর, ডুমরা, চূড়ামণিপুর, বাঁকুড়া শহর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় চারিশত যাত্রী প্রত্যহ মেলায় আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও লটারীর দল আসে এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে। ইহা ভিন্ন, কোন কোন বৎসর মেদিনীপুর হইতে পেশাদারী যাত্রার দল আসে। যাত্রার আসরে প্রায় আটশত দর্শকের সমাগম হয়।

জামজুড়ি গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে নয়-দশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলায় অনেকগুলি নাগরদোলার দল আসিত বলিয়া ইহা আশপাশের অঞ্চলে 'নাগরদোলার' মেলা নামে খ্যাত। এই মেলার প্রচলন সম্পর্কে জানা যায় যে, পূর্বে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে একটি প্রতিযোগিতামূলক খেলা হইত। একটি মসৃণ লম্বা বাঁশের অগ্রভাগে একটি নূতন গামছায় পাঁচসিকা পয়সা বাঁধিয়া উহাকে মাঠের মধ্যস্থলে পুঁতিয়া দেওয়া হইত এবং প্রতিযোগীদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ বাঁশ বাহিয়া গামছাটি নামাইয়া আনিতে পারিত, তাঁহাকে পুরস্কৃত করা হইত। এই প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আশপাশের গ্রাম হইতেও বহুলোকজন আসিতেন এবং তদুপলক্ষে এই স্থানে একটি মেলা বসিত। বর্তমানে উক্ত প্রতিযোগিতা-মূলক খেলাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এবং তৎপরিবর্তে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে মেলার প্রচলন করা হইয়াছে।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় তিন-চার হাজার নরনারী আসেন। ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বহু লোকজন আসেন।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, হাঁড়ি-কলসী, খেলনা-পুতুল, ফলমূল, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালা আসেন। ওন্দা, রামসাগর, খামারবেড়িয়া, রতনপুর, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থান ব্যতীত মেদিনীপুর হইতেও প্রতি বৎসর মেলায় ব্যবসায়ীরা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে আদায়কৃত অর্থের দ্বারা সরস্বতীপূজা হয়।

আমোদপ্রমোদ উপলক্ষে নাগরদোলা, ম্যাজিক ও লটারী খেলার দল আসে এবং লাঠিখেলা, মুরগীর লড়াই হয় ও মাদল বাজাইয়া সাঁওতালী মেয়েরা নৃত্য করিয়া থাকেন। সাঁওতালী নৃত্য দেখিতে বহু দর্শকের সমাগম হয়।

পুরুষোত্তমপুর গ্রামের সরস্বতীপূজার আটচালা সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর পূজার পূর্বদিন হইতে আরম্ভ করিয়া সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। তালডাঙ্গরা, সোনামুখী, পাত্রসায়ের প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় এক হাজার নরনারী গরুরগাড়ী ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। বিষ্ণুপুর, রামসাগর, তালডাঙ্গরা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় আঠার-কুড়িজন বিক্রেতা আসেন। অধিকাংশই মিষ্টান্নের দোকানপাট। উৎসবের কয়েকদিনব্যাপী যাত্রাগানের ব্যবস্থা করা হয়।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : জামথোল। ৮।৯৬৩.৯২।১৩৯।৬৯৯

(ক) সামন্ত, শুঁড়ি ও সাঁওতাল। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে। যেমন—সামন্তপাড়া, শুঁড়িপাড়া ও সাঁওতালপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ঝাঁটিপাহাড়ী হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাদেবীর পূজা, এবং প্রতি বৎসর ১লা মাঘ বাসুলীদেবীর বার্ষিক পূজা ও তদুপলক্ষে তিনদিনব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত হয়। বাসুলী দেবীর নিকট মানত হিসাবে পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর পৌষ মাসে সাঁওতালী সম্প্রদায়ের বাঁধনা পরব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বাসুলী পূজার মেলা। মাঘ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মনসাদেবীর নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত বাসুলী-দেবীর নির্দিষ্ট স্থানে বাসুলী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীভোলানাথ রায়, শিক্ষক,
গ্রাম : পেচাশিমূল, পোঃ শুশুনিয়া,
বাঁকুড়া।

২। গ্রাম : গোপালপুর (মৌজা : ধবনীগোপালপুর) ১৮।৭৩৫.০১।৯০।৪৮৭

(ক) সাঁওতাল, বাউরী, কুমার, কলু ও বৈদ্য। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে। যেমন—সাঁওতালপাড়া, বাউরী-পাড়া ও কুমারপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী ও মৃৎশিল্প ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন ঝাঁটিপাহাড়ী হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। ইহা ভিন্ন, গ্রামের পূর্ব সীমান্তের এক মাইল দূরে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব ব্যতীত স্থানীয় সাঁওতাল সম্প্রদায় আষাঢ় মাসে এরঃসিম বা আষাড়িয়াপূজা, ভাদ্র মাসে হাড়িয়ারসিম উৎসব, মাঘ মাসে মাঘীসিম উৎসব ও ফাল্গুন মাসে শালুইপূজা বা বাহা উৎসব পালন করেন। এরঃসিম ও হাড়িয়ারসিম উৎসব দুইটি কৃষি উৎসব। বিশ্বাস এরঃসিম পূজা করিলে ভাল ফসল পাওয়া যায় এবং হাড়িয়ারসিম পূজা করিলে ফসলের কোন অনিষ্ট হয় না।

স্থানীয় সাঁওতাল সম্প্রদায় সাধারণতঃ মাঘ মাসে গৃহাদি নির্মাণের জন্য জঙ্গলে কাঠ কাটিতে যান। বিশ্বাস মাঘীসিমপূজা করিলে জঙ্গলে কোন হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণের ভয় থাকে না। ফাল্গুন মাসে বাহা উৎসব উপলক্ষে সাঁওতালেরা মিলিতভাবে একটি শালগাছের নীচে শালুইপূজা করিয়া থাকেন। শালুইপূজা না করিয়া তাঁহারা কোন নূতন ফুল বা ফল স্পর্শ করেন না।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে পাঁচটি মনসাদেবীর স্থান আছে।

জনশ্রুতি আছে গ্রামটির পূর্ব নাম ছিল 'খিলবাইদ' এবং ইহা ছাতনা রাজ পরিবারের এলাকাধীন ছিল। একদা রাজপরিবারের জনৈক ব্যক্তি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত মরারডিহি গ্রামের জনৈক বৈদ্য ব্যাধি নিরাময়ে সমর্থ হন। এই কারণে তাঁহাকে নামমাত্র খাজনায় এই গ্রামটি ছাতনার রাজপরিবার বন্দোবস্ত দেন এবং উক্ত বৈদ্য পরিবার এই স্থানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। তাঁহাদের কুলদেবতা গোপাল বিগ্রহের নামানুসারে গ্রামটির নাম পরিবর্তন করিয়া গোপালপুর নামকরণ করা হয়।

শ্রীহরিপদ রজক, শিক্ষক,
গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ শালতোড়া, বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম : গোপিনাথডিহি। ২১২৭১.৬৩।৩৮।২১৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কামার, সামন্ত, গোয়ালা ও বাউরী। গ্রামে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৃথক পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী ও শিল্পকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ঝাঁন্টিপাহাড়ী হইতে একটি সুরকি ঢালা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনদিনব্যাপী। ইহা প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি সাধারণ দেবালয়ে কালী মূর্তি এবং অপর একটি পাকা মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, মনসাপূজার দুইটি স্থান আছে।

শ্রীকালাচাঁদ মোদক, প্রধান শিক্ষক,
গোপিনাথডিহি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৪। গ্রাম ঃ জিড়রা। ৩১।৮১৭.৪৮।১৯৪।১,০৯১

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গন্ধবণিক, পোদ্দার, কামার, বাউরী, শুঁড়ি, নাপিত, সরাক, মাল ও সাঁওতাল। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—বেনেপাড়া, শুঁড়িপাড়া, বাউরীপাড়া, সরাকপাড়া, সাঁওতালপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ঝাঁন্টিপাহাড়ী। বাঁকুড়া-পুরুলিয়াগামী অহল্যাবাঈ রোডের পড়াশা হইতে একটি রাস্তা বাহির হইয়া এই গ্রামের মধ্য দিয়া শুশুনিয়া পর্যন্ত গিয়াছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ১০ই বৈশাখ 'ক্ষুদেপাড়া' নামে খ্যাত শিবের পূজা, শ্রাবণসংক্রান্তিতে মনসাপূজা এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, জিতাষ্টমী, গদাইসেনা, সত্যনারায়ণ, বুড়াবুড়ি প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে। কালীপূজাটিই এই গ্রামের প্রধান উৎসব এবং ইহা প্রায় সাত-আটশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে দুইদিনব্যাপী। ইহা বহুদিনের প্রাচীন বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন কালীমন্দির, পাঁচটি মনসা এবং ক্ষুদেপাড়া শিবের কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত মূর্তি আছে। অনেকে অনুমান করেন আদিতে শিবমূর্তিটি কোন বৌদ্ধ দেবতা ছিলেন।

শ্রীঅতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
জিড়রা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ শুশুনিয়া, বাঁকুড়া।

৫। গ্রাম ঃ আড়াজুড়ী। ৩৭।৬৪১.৬৮।১১৭।৫৭৫

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গোয়ালা, কলু, বাউরী ও সাঁওতাল। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, বাউরীপাড়া, কলুপাড়া, সাঁওতালপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে ঝাঁন্টিপাহাড়ী রেলস্টেশন। বাঁকুড়া-পুরুলিয়াগামী মোটর বাসে অহল্যাবাঈ রোডের ভারপড়াশ্যা হইতে একটি কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া শুশুনিয়া পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তায় পড়াশ্যা হইতে দেড় মাইল দূরে গ্রামটি অবস্থিত।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং মাঘ মাসে বাসুলীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, ১লা মাঘ শিব, ভৈরব ও বড়পাহাড় নামে তিনটি দেবতার একযোগে পূজা করা হয়।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি প্রাচীন তেঁতুল গাছতলায় বাসুলীদেবীর শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবীর নিত্য পূজা হয়। মাঘ মাসে বার্ষিক উৎসবটি স্থানীয় ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত হইলেও সর্বসাধারণ ইহাতে যোগদান করেন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিনদিনব্যাপী।

(চ) গ্রামে বাসুলীদেবীর একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়, প্রধান শিক্ষক
আড়াজুড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৬। গ্রাম ঃ পৈঁচাসিমুল। ৬৮।১৬৬.৪৪।৩৯।২৭৯

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈরাগী, নাপিত, বাউরী ও গোয়ালা। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও দিনমজুরী।

(গ) রেলস্টেশন ছাতনা। বাঁকুড়া-শালতোড়া পাকা রাস্তাটির প্রায় ছয় মাইল উত্তরে গ্রামটি অবস্থিত। উক্ত রাস্তা দিয়া নিয়মিত মোটরবাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ৭ই ও ৮ই বৈশাখ গ্রামে চণ্ডীর গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। চণ্ডীর কোন মূর্তি নাই; একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে নির্দিষ্ট স্থান আছে। এইস্থানে ৭ই বৈশাখ মধ্যাহ্নে যথারীতি চণ্ডী পূজার পর সারা রাত্রিব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন এবং পরের দিন পায়সান্ন ভোগ দিয়া পূজা দেওয়া হয়। দেবীর পায়সান্ন সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন। শোনা যায় বহুকাল পূর্বে গ্রামে একবার কলেরা মহামারী-রূপে দেখা দিলে গ্রামবাসীগণ চণ্ডী পূজার আয়োজন করেন এবং তদবধি চণ্ডীপূজা হইতেছে।

(ঙ) চণ্ডীপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। তবে মধ্যে কয়েক বৎসর মেলাটি বন্ধ ছিল। গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর যাবত পুনরায় বসিতেছে।

(চ) চণ্ডীদেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীভোলানাথ রায়, শিক্ষক,
গ্রামঃ পেঁচাসিমুল,
পোঃ শুশুনিয়া,
বাঁকুড়া।

৭। গ্রাম ঃ লোহাগড়। ১৩৩।১,৫৫৭·৬১।১৫৩।৯৮৩

(ক) গড়াই, নাপিত, তাম্বুলী, বাউরী ও মাল।

গ্রামে গড়াইপাড়া, মালপাড়া ও তাম্বুলীপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) ছাতনা অথবা ঝাণ্টিপাহাড়ী রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন। ইহা ভিন্ন, বৈশাখ মাসে অক্ষয় কুমার গোস্বামী নামে জনৈক বৈষ্ণব ভক্তের তিরোভাব উৎসব পালন করা হয়।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। চৈত্র মাসে ছয়দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের প্রধানতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনের সমাগন হয়। দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় ত্রিশটি। উহার মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী এবং বাসনকোসনের দোকানই প্রধান।

(চ) গ্রামে মনসাদেবী ও ভৈরবের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

জানা যায় যে, ছাতনা রাজার রাজত্বকালে এই স্থানে একটি গড় নির্মিত হইয়াছিল, যাহার ধ্বংসাবশেষের কিছু চিহ্ন অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীবিভূপদ বক্সী, প্রধান শিক্ষক,
বেনাগড়িয়া লোহাগড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ছাতনা,
বাঁকুড়া।

৮। গ্রাম ঃ শুকুনিবাঁসা।১৪৪।৫০৮·৯৯।৯৬।৫২৫

(ক) তাম্বুলি, মাল, বাউরী, শুঁড়ি ও কলু। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে। যেমন—তাম্বুলিপাড়া, মালপাড়া, চাঁপাশোলপাড়া ও বাউরীপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও দিনমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ঝাণ্টিপাহাড়ী। দলপুর-মহেশানা রোডই গ্রামে যাইবার প্রধান পথ। ইহা ছাড়া, বাঁকুড়া-হাটগ্রাম ও বাঁকুড়া-পুরুলিয়া বাসরুটের পাশেই গ্রামটি অবস্থিত বলিয়া মোটরবাসেও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শেষার্ধে বা কোন কোন বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমার্ধে অষ্টম-প্রহর অথবা চব্বিশ প্রহরব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন, আষাঢ় মাসের ১১ই তারিখে বাসুলীপূজা, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা ও কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। হরিনাম সংকীর্তন উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে। বাসুলীপূজা ও মনসাপূজা প্রায় কশত এবৎসরের প্রাচীন। কালীপূজাটি মাত্র পঁয়ত্রিশ-বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি হরিমন্দির এবং বাসুলীদেবীর একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

এই গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত চেংগাকেন্দ গ্রামের কিছু সংখ্যক অধিবাসী প্রথম এই স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তখনই

গ্রামের নাম হয় শুকনিবাঁসা। ১৩৩১ সালে এই স্থানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া সুখনিবাস করেন।

শ্রীময়ূরাক্ষ কুণ্ডু, শিক্ষক,
গ্রামঃ শুকনিবাঁসা,
পোঃ ঝাণ্টিপাহাড়ী,
বাঁকুড়া।

৯। গ্রাম ঃ জামতড়া। ১৮০।৪৬১'৫৬।১২১।৬৪৫

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, তাঁতি, কলু, বৈষ্ণব, হাড়ী, ডোম, কামার, বাউড়ী, খয়রা, মেটে ও সাঁওতাল।

গ্রামে আটটি পাড়া আছে। যথা—তাঁতিপাড়া, ক্ষত্রিয়পাড়া, ডোমপাড়া, কুলপাড়া, হাড়ীপাড়া, খয়রাপাড়া, বাউরীপাড়া ও সাঁওতালপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, দিনমজুরী, তাঁতশিল্প, লৌহশিল্প ও কারুশিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ঝাঁণ্টিপাহাড়ী হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূর দিয়া মোটরবাস চলাচল করে। তাহা ছাড়া বর্ষাকালে নৌকাযোগে গ্রাম হইতে বাঁকুড়া শহরে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ২৬শে বৈশাখ স্থানীয় অঞ্চলে প্রচলিত কালো পাহাড় দেবতার গাজন উৎসব, আষাঢ় এবং অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে গ্রামের চারিকোণে অধিষ্ঠিত গ্রাম দেবতার পূজা, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসের ইন্দ্র দ্বাদশী তিথিতে 'ছাতা পরব' বা 'ইন্দ্‌ পরব' এবং সংক্রান্তি তিথিতে 'ভাদুপূজা', আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা,কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব এবং মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, স্থানীয় অঞ্চলের তাঁতি সম্প্রদায় কর্তৃক বিষ্ণুদেবের নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে দুর্গাপূজা ও রাসযাত্রা উৎসব প্রতি বৎসর আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন পাকা দুর্গামণ্ডপ ও রাসমঞ্চসহ একটি রাধামাধবজীউর মন্দির আছে। দুর্গামণ্ডপটি সুবৃহৎ এবং দক্ষিণমুখী। সম্মুখে বারান্দাসহ মণ্ডপটির পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে দুইটি ঘর এবং মধ্যস্থলে দেবীর বেদী প্রতিষ্ঠিত।

রাধামাধবজীউর মন্দিরটিও পাকা ও দক্ষিণমুখী। সম্মুখে বারান্দাসহ এই মন্দিরের রাধামাধবজীউ নামে খ্যাত শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরগাত্রে সুন্দর কারুকার্যখচিত। ইহার সম্মুখভাগে প্রায় চারি ফুট উচ্চ একটি পাকা তুলসী মঞ্চ আছে।

ছোটনাগপুরের মানভূম জেলায় একটি ঢলের উপর গ্রামটি অবস্থিত। জনবসতিশূন্য অসমান ও অনুর্বর স্থানকে স্থানীয় লোক 'তড়' বলেন; সম্ভবতঃ এই স্থানে কিছু জামগাছ থাকায় গ্রামটির নাম 'জামতড়া' হইয়াছে।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ কর, শিক্ষক,
গ্রামঃ আটুড়িবনা,
পোঃ ঝাণ্টিপাহাড়ী
বাঁকুড়া।

১০। গ্রাম ঃ একচালী (মৌজাঃ পাটজুরী আগয়া)। ১৭৭।৬৬২'৮০।৮২।৪২০

(ক) তাম্বুলি ও বাউরী।

(খ) কৃষিকার্য ও দিনমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ঝাঁণ্টিপাহাড়ী। বাঁকুড়া-মহেশপুর পাকা রাস্তা হইতে একটি কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, বাঁকুড়া-হাটগ্রাম এবং বাঁকুড়া-পুরুলিয়া বাসরুটে গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে রাধাগোবিন্দের পূজা ও চব্বিশ প্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব শ্রাবণ মাসে স্থানীয় বাউরী সম্প্রদায়ের কর্তৃক মনসাপূজা এবং তাম্বুলি সম্প্রদায় কর্তৃক বাসলীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(চ) গ্রামে আটচালা বিশিষ্ট একটি গৃহে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহা ছাড়া একটি মনসার স্থান আছে।

জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, এই গ্রামের বর্তমান অধিবাসীগণ বাঁকুড়া সদর থানার অন্তর্গত ধগড়্যা গ্রামের

অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা বসতি স্থাপনের এবং নানা প্রাচীন কীর্তি চিহ্নের নমুনা অদ্যাপি দেখা যায়। বাংলা ১২৯২ সনে ছাতনা ষ্টেটের জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে পাটজুরী আগয়া—মৌজার কতকাংশ বন্দোবস্ত লইয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থানীয় অঞ্চলের দুর্দান্ত সামন্তদের নিকট অত্যাচারিত হওয়ায় তাঁহারা এই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিছুকাল পরে জমিদার মহাশয় ধগড্যা নিবাসী রাজীব লোচন কর মহাশয়কে পুনরায় বন্দোবস্ত দেন। তিনি এই স্থানে আসিয়া একা এবং একটি একচালা গৃহ নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন এবং দুর্দান্ত সামন্তদিগকে দমন করেন। পরবর্তীকালে ক্রমে বহু লোকজন আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। কর মহাশয়ের নির্মিত একচালা গৃহকে কেন্দ্র করিয়াই খুব সম্ভবতঃ গ্রামের নাম রাখা হয় "একচালী।"

শ্রীঅতুল চন্দ্র কর, শিক্ষক,
গ্রাম : একচালী,
পোঃ ঝাঁটিপাহাড়ী,
বাঁকুড়া।

১১। গ্রাম : উপরডিহি। ২১৪।৩৭৮·১৩।৭১।৩৪৫

(ক) তাম্বুলী, ময়রা, সামন্ত, ছত্রি ও বাউরী। গ্রামে সামন্তপাড়া, ছত্রিপাড়া, বাউরীপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ঝাঁটিপাহাড়ী। পাকা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে স্থানীয় ছত্রি সম্প্রদায়ের মনসাপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে সর্বজনীন শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। এই ছোট মেলাটিতে কয়েকটি মনিহারী, ময়রা ও খেলনা-পুতুলের দোকান বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন।

(চ) গ্রামে মনসার স্থান আছে।

শ্রীঈশান চন্দ্র দত্ত, শিক্ষক,
গ্রামঃ উপরডিহি,
পোঃ ঝাঁটিপাহাড়ী,
বাঁকুড়া।

১২। গ্রাম : মস্তুমুড়া। ২১৭।১৯০·২১।৫৮।৩৩৭

(ক) ব্রাহ্মণ, ডোম, বাউরী, নাপিত, কুমার ও গড়াই। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের প্রায় সাত মাইল দূরে অবস্থিত ঝাঁটিপাহাড়ী রেলস্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। ইহা ভিন্ন, গ্রাম হইতে কোয়ার্টার মাইল দূরে সিমলা গ্রাম হইতে মোটরবাসে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অঞ্চলে শিব 'বিরিঞ্চি নারায়ণ' নামে পরিচিত। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় তিন শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

(চ) গ্রামে তিনটি মনসা আছে।

গ্রামে শিব মন্দির ও একটি বৈষ্ণব আখড়া ব্যতীত কালী, গিরিধারী, বাসুলী, বাগরাই ভৈরব প্রভৃতি দেবদেবীর স্থান আছে।

শ্রীঅম্বিকা চরণ কর, শিক্ষক,
গ্রাম : ছাতনা পাথার,
পোঃ কেঞ্জাকুড়া,
ও
ডিষ্ট্রিক্ট সোশ্যাল এডুকেশন অফিসার,
বাঁকুড়া।

১৩। গ্রাম : সিমলা। ২১৯।৪৬৫·৫১।১২২।৫৮০

(ক) গোয়ালা, তাম্বুলী, তাঁতী, ময়রা, বাউরী, কুমার, হাড়ী, ব্রাহ্মণ, মোদক ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ঝাঁটিপাহাড়ী। বাঁকুড়া-হাটগ্রাম রুটের মোটরবাস এই গ্রামের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবপূজা এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা হয়। গ্রামে তাঁতী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবত শিবপূজা এবং গোপ সম্প্রদায় কর্তৃক বহুকাল যাবত কালীপূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) শিবপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে দুইদিন। ইহা প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে দুইদিন। ইহা বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মনসার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীআদ্রি প্রসাদ দেঘরিয়া, প্রধান শিক্ষক,
নিমলা ২৯ নং প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কেঞ্জাকুড়া, বাঁকুড়া।

১৪। গ্রাম : মেট্যালা। ২৪৫।২৯৩।১১।৫২।২৯৮

(ক) ব্রাহ্মণ, তাম্বুলী, গোপ, বৈরাগী, বাউরী ও মাল।

গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যথা—ব্রাহ্মণপাড়া, তাম্বুলীপাড়া, গোপপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, বাউরীপাড়া ও মালপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, দিনমজুরী ও চাকুরি।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন ঝাঁন্টিপাহাড়ী ও ছাতনা। বাঁকুড়া-হাটগ্রাম বাস রুটে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন। মনসাপূজাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের এবং শিবপূজাটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) শিবপূজার মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি মনসাদেবী, মদনগোপালের মূর্তি, রাজরাজেশ্বরী দেবী, শালগ্রাম শিলা এবং দুইটি বাবাঠাকুর ব্যতীত গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের দুইটি শিবমন্দির আছে।

অতীতে গ্রামটির নাম ছিল মাতিয়ালা (উর্বরা জমি)। মাতিয়ালা অপভ্রংশে মাটিয়ালা—মেট্যালা হইয়াছে।

এই গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আগমন ও জনবসতি স্থাপন সম্পর্কে জানা যায় যে, একটি গোস্বামী পরিবারসহ তিলি সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েক ঘর লোক আসিয়া প্রথমে এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ পরে তিলি সম্প্রদায় জয়পুর থানায় উঠিয়া গিয়া বসতি স্থাপন করেন। এই গ্রামের তিলিরা বেশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইষ্টক ও পাথর নির্মিত ঘাটসহ কয়েকটি প্রাচীন পুষ্করিণী আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। তিলিদের সহিত আগত উক্ত গোস্বামী পরিবারের কোন পুত্র সন্তানাদি না থাকায় নিকটবর্তী ব্রজরাজপুর গ্রাম হইতে তাঁহাদের দৌহিত্র হারাধন গোস্বামী এই গ্রামে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন; তাঁহাদের সঙ্গে কয়েকঘর ব্রাহ্মণও এই গ্রামে আসেন। বর্তমানে এই গ্রামের তাম্বুলী সম্প্রদায় জিড়রা গ্রাম হইতে উঠিয়া আসেন। ইহা ভিন্ন, ছাতনার রাজাদের জায়গীর পাইয়া বর্তমান গোপসম্প্রদায় এখানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। ইঁহারা রাজবাড়ী ভাণ্ডারখানায় কাজ করিতেন বলিয়া ছাতনারাজ ইঁহাদিগকে 'ভাণ্ডারী' উপাধি দেন।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ মল্লিক, শিক্ষক,
গ্রাম : মেট্যালা, পোঃ কেঞ্জাকুড়া,
বাঁকুড়া।

আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক ছাতনা এবং ছাতনা থানার অন্তর্গত শুশুনিয়া, ঝাঁন্টিপাহাড়ী ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রামে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

ছাতনা

"চলহ বিয়াই ছাতনা
ছাতনাতে দেখে অ্যালম ছেলেক ডুডুম বাজনা।"

প্রাচীন সামন্তভূমের রাজধানী এই ছাতনা। পশ্চিম রাঢ়ের অন্তর্গত আদিবাসী অধ্যুষিত সামন্তভূমের ইতিহাস বহুকালের প্রাচীন। ইহার সীমান্তে ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত মানভূম ও ধলভূম অবস্থিত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে সামন্তভূমে একটি বৃহৎ জনপদ ও বিশিষ্ট সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

নাই; তবে ইহার সঠিক ইতিহাস অদ্যাপি অন্ধকার আচ্ছন্ন। সামন্তভূমের অন্তর্গত এবং ছাতনা হইতে প্রায় ছয় মাইল উত্তরে শুশুনিয়া পাহাড়ে চন্দ্রবর্মা নামে জনৈক নরপতির একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন উহা প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে খোদিত এবং বাংলা হরপের আদিরূপ ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কাহার কাহার মতে রাজা চন্দ্রবর্মা সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন এবং দিল্লীর কুতুব মিনারের নিকট প্রোথিত প্রসিদ্ধ মরিচাহীন লৌহ-স্তম্ভটি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভিন্ন, এই স্থানে বহু বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সামন্তভূমের ইতিহাস সম্বন্ধে আজ কেবলমাত্র অনুমান ও স্থানীয় অঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর ওপর নির্ভর করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই সকল জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীর মধ্যে নিহিত আছে সামন্তভূমের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস। আর এখানকার আর্য অনার্য ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত উৎসব-পার্বণে, আচার-অনুষ্ঠানে, মন্দিরে, লৌকিক দেবদেবীর মূর্তিতে, শিলাস্তম্ভে ছড়িয়ে আছে নানা উপাদান। ছাতনা থানার নানা স্থানে গ্রামদেবতারূপে বাসুলীদেবীরপূজা, মনসা, কড়রাসিনি, কেঁদুয়াসিনি, ধর্মরাজ, ভৈরব প্রভৃতি দেবীর পূজা হয়।

দুর্ধর্ষ সামন্তগণই সামন্তভূমের প্রতিষ্ঠাতা। কিংবদন্তী অনুসারে বলা হয় আদিতে ইঁহাদের মধ্যে শঙ্খ রায় নামে জনৈক ব্যক্তি সামন্তভূম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল বাহুল্যনগর। অনুমান করা হয় বাসুলীদেবীর নামানুসারেই এই স্থানের নাম বাহুল্যানগর হইয়াছিল। বর্তমান ছাতনার পূর্ব প্রান্তে বোলপুকুর নামক স্থানে তাঁহার রাজবাড়ী ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সীমান্তবর্তী পঞ্চকোটরাজ অত্যাচারী সামন্ত সর্দার অধ্যুষিত সামন্তভূমে ভবানী ঝরাইত নামে জনৈক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন বলিয়া শোনা যায়। তখন ব্রাহ্মণ শাসিত সামন্তভূমের রাজধানী ব্রাহ্মণ্যনগর নামে পরিচিত হয়, যাহা বর্তমানে 'বামনকুলী' নামে ছাতনার অন্তর্গত একটি ব্রাহ্মণ প্রধান পল্লীবিশেষ। ব্রাহ্মণ রাজা ঝরাইতের প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ী ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ আজিও বিদ্যমান। এই স্থানে 'গড়ের ডাং', 'ভাটবাড়ী' ইত্যাদি নামগুলি তাহারই স্মৃতিবাহক। ইহা ভিন্ন, বামনকুলীতে অনেকগুলি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে। উহাদের মধ্যে স্থানীয় দেওয়ান পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন ইষ্টক নির্মিত মন্দিরের অভ্যন্তরে একদিকে একটি বিষ্ণুমূর্তি ও অপরদিকে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরে নিত্যপূজা হয়। মন্দিরগাত্রে পোড়া মাটির দশবতার ও নৃত্যরত নারী-পুরুষের মূর্তি দ্বারা অলঙ্কৃত।

ব্রাহ্মণ রাজার রাজ্য পরিচালনার গুণে অত্যাচারী সামন্ত সর্দারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুলাংশে খর্ব হয় এবং তাঁহারা আশপাশের সীমান্ত অঞ্চলে আত্মগোপন করিয়া ব্রাহ্মণ রাজাকে ধ্বংস করিবার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতে থাকেন। সুযোগ উপস্থিত বুঝিয়া একদা বাঁকুড়া থানার অন্তর্গত মৌলবোনা শিবের গাজনে তাঁহাকে কৌশলে হত্যা করিয়া বারো জন সামন্ত সর্দার তাঁহার রাজ্য দখল করেন। এই বারো জন সর্দার পর্যায়ক্রমে বৎসরের বারো মাস রাজত্ব ভোগ করিতেন বলিয়া শোনা যায়। ইঁহাদের উপাস্য দেবী ছিলেন বাসুলী। কথিত আছে বাসুলীদেবীর অনুগ্রহলাভেই তাঁহারা ব্রাহ্মণ রাজাকে হত্যা করিয়া রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হন। আরো শোনা যায় যে, এই বারো জন সামন্ত সর্দারের একজন মাত্র পত্নী ছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে একটি মাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করে। উক্ত কন্যাকে তাঁহারা এই অঞ্চল দিয়া শ্রীক্ষেত্র তীর্থযাত্রী জনৈক রাজপুত যুবকের সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহার উপর রাজ্যের ভার অর্পণ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ছাতনার নিকটে ঝগড়াপুর নামে একটি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। কিংবদন্তী আছে এই স্থানে বারোটি উচ্চ ঢিপির উপর বসিয়া উক্ত বারো জন সামন্ত সর্দার তাঁহাদের বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করিতেন। উক্ত রাজপুত যুবক রাজ্যাধিকার পাওয়ায় সেই সময় হইতে সামন্তভূমে ক্ষত্রিয় রাজবংশে প্রতিষ্ঠা হয়। ইঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেও উপবীত ধারণ করেন না। এই সম্পর্কে বলা হয় যে, ক্ষত্রিয়বীর্যের পুত্ররা তপোনিরত জমদাগ্নিকে হত্যা করিলে তাঁহার পুত্র পরশুরাম পিতৃহত্যার প্রতিশোধে কাতবীর্যের পুত্র ও তাঁহাদের অনুগত ক্ষত্রিয়দের নির্বিচারে হত্যা করিয়া পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবার সংকল্প গ্রহণ করার

তৎকালে অনেক ক্ষত্রিয় ভীত হইয়া উপবীত ত্যাগ করেন। সামন্তভূমের ক্ষত্রিয় রাজপরিবারের পূর্বপুরুষগণ এই কারণেই উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। উক্ত রাজপুত ছাতনায় রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতেন এবং তিনি রাজ্যে বাসুলীদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ ছত্রিদের নগর ছত্রিনগর অপভ্রংশে ছাতনা হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। অপর পক্ষে কেহ কেহ বলেন এই অঞ্চলে পূর্বে বহু ছাতিম গাছের বন ছিল বলিয়া গ্রামের নাম ছাতনা হইয়াছে। সামন্তভূম তথা ছাতনা সম্পর্কে আজ লোকমুখে এইরূপ নানা কিংবদন্তী শোনা যায়।

বাঁকুড়া হইতে পশ্চিমে প্রায় আট মাইল দূরে ছাতনা অবস্থিত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ছাতনা একটি অঞ্চলের নাম, এই নামে বাঁকুড়া জেলায় কোন মৌজা নাই। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে এই স্থানে একটি রেলস্টেশন আছে। বাঁকুড়া শহর হইতে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া রোড দিয়া নিয়মিত মোটরবাস যাতায়াত করে। এই স্থানে বর্তমানে একটি থানা, ডাকঘর, উচ্চ বিদ্যালয় ও সিনেমা ঘর আছে। ছাতনার হাট-বাজারই এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এই স্থানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাম্বুলী, তিলি, কামার, কুমার, ভূমিজ, সামন্ত, কাঁসারি, কুমোর, গোয়ালা, নাপিত, ধোপা, মেটিয়া, মাঝি, বাউরী, বাগ্দী, ডোম, কড়া, মাল, কেওট, মুসলমান, সাঁওতাল এবং জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত মাড়োয়ারীদিগের বসবাস আছে।

গ্রামদেবী বাসুলী ছাতনার একমাত্র উল্লেখযোগ্য দেবী এবং এই অঞ্চলে সর্বত্র ইহার মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহার পূর্বে বাংলার অনন্য কবি চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখ করিতে হয়। বর্তমানকালে কবি চণ্ডীদাসের জন্যই ছাতনা বাঙালীর নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীদাসের কাব্যের সহিত আমরা পরিচিত হইলেও কবির ব্যক্তিগত পরিচয় আজও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। চণ্ডীদাসের কাব্যের ভনিতায় কবি সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে কবির পরিচয়ের বিশেষ আলোকপাত করে না। চণ্ডীদাসের পদাবলী নামে পরিচিত কাব্যগ্রন্থাদি হইতে ভাষা ও ভাবের তারতম্য পর্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন অতীতে দ্বিজচণ্ডীদাস, দীনচণ্ডীদাস, বড়ুচণ্ডীদাস নামে অন্তত তিনজন কবি ছিলেন। তাই কবির পরিচয় সম্পর্কে পণ্ডিতদিগের মধ্যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কোন কবি যে বীরভূম জেলার নান্নুরে বসবাস করিতেন এবং কোন কবি যে বাঁকুড়া জেলার ছাতনায় বাস করিতেন সে-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য আছে। তথাপি অনেকেই মনে করেন যে, বাসুলী উপাসক বড়ু চণ্ডীদাস ছাতনায় বসবাস করিতেন।

ছাতনার ক্ষত্রিয় রাজবংশের রাজা হামীরউত্তর রায়ের রাজত্বকালে চণ্ডীদাস ও তাঁহার ভ্রাতা দেবীদাস বাসুলী-দেবীর পূজারী নিযুক্ত হন বলিয়া শোনা যায়। বাসুলী-দেবীর কৃপায় চণ্ডীদাস পদাবলী কীর্তন রচনা করিয়া যশস্বী হন। ছাতনায় বাসুলীদেবীর আবির্ভাব ও পূজার প্রচলন সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, স্থানীয় হাটতলার নিকট বোলপুকুর নামে একটি পুষ্করিণীর পাড়ে দেবী শিলারূপে দীর্ঘ দিন পড়িয়াছিল। একদা ব্যবসা উপলক্ষে হাটে আগত কয়েকজন বেনিয়া উক্ত শিলার উপর মশলা পিষিয়া রন্ধনাদি করেন এবং শিলাটি তাহাদের কাজে লাগিবে ভাবিয়া এই স্থান ত্যাগকালে উহা নিজেদের গরুর গাড়ীতে তুলিয়া যাত্রা করেন। সেই রাত্রিতেই এক স্বপ্নাদেশে রাজা হামীরউত্তর জানিতে পারেন দেবী বাসুলী উক্ত শিলায় নিহিত আছেন এবং তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তিনি লোকজন দ্বারা বেনিয়াদের গাড়ী হইতে উক্ত শিলা উদ্ধার করিয়া আনেন এবং দেবীর প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। কিন্তু সমস্যা উপস্থিত হয়, দেবীর পূজারী নিয়োগে। বাসুলীদেবীর আদেশ চণ্ডীদাস তাঁহার পূজারী হইবেন। কিন্তু সেই সময় চণ্ডীদাস রজকিনী রামীর সহিত অবৈধ প্রণয়ের জন্য নিন্দিত দেশত্যাগী। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যভিচারী ব্যক্তিকে কিভাবে রাজা দেবীর পূজারী নিযুক্ত করিবেন! এই সমস্যার নিরসন স্বয়ং বাসুলী দেবীই করেন; "যেই রামী সেই আমি" বাসুলীদেবীর এইরূপ নির্দেশে চণ্ডীদাস দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাসুলীর পূজারী হইলেন। অদ্যাপি তাঁহার ভ্রাতা দেবীদাসের বংশধরগণই বাসুলীদেবীর পূজা করিতেছেন।

সাধারণের বিশ্বাস পূর্ব উল্লিখিত বোলপুকুরে স্নান করিলে অসুখ-বিসুখ হইতে আরোগ্যলাভ করা যায়। অদ্যাপি বহুলোক এই পুকুরে মানসিক করিয়া স্নান করেন এবং প্রতি বৎসর মাকরী সপ্তমী তিথিতে এই স্থানে একটি মেলা বসে। কিংবদন্তী আছে, বোলপুকুর এক সময় কথা বলিতে পারিত। বোলতা পুকুর হইতেই এই পুকুরের নাম বোলপুকুর হইয়াছে।

হাটতলার নিকট বাঁকুড়া-পুরুলিয়া রোডের ধারে চণ্ডীদাসের সাধনস্থল অবস্থিত বর্তমানে এই স্থানে ইষ্টক নির্মিত সম্মুখে দালানসহ সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি ঘরের অভ্যন্তরে সিমেন্ট বাঁধান বেদীর উপর একটি ভগ্ন প্রস্তর মূর্তিকে বাসুলীদেবীর প্রতীকরূপে নিত্যপূজা করা হয়। প্রস্তরখণ্ডটির মধ্যস্থলে প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি ব্যাসার্ধে একটি গর্ত আছে। তেল-সিন্দুর রঞ্জিত এই প্রস্তরখণ্ডে নিরাবরণ একটি নর ও একটি নারী মূর্তি খোদিত আছে বলিয়া মনে হয়। নরমূর্তিটি হস্ত ও মস্তকহীন। বাসুলী-দেবীরূপে এই মূর্তি পূজিত হইলেও ইহা যে কোন দেব-দেবীর মূর্তি নহে তাহা নিশ্চিতরূপেই বলা যায়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হামীরউত্তর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাসুলীমূর্তি এই স্থান হইতে অপসারিত করিয়া নিকটবর্তী ছুবরাজপুরের রাজবাড়ী সংলগ্ন একটি মন্দিরে স্থাপন করা হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের সাধনস্থলে প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত মন্দির ও ইহার সম্মুখস্থ গোলাকৃতি নাটমন্দিরটি অপ্রাচীন। স্থানীয় চণ্ডীদাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি কর্তৃক প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে নির্মিত। মন্দিরটির চারিপাশে প্রাচীন বৃক্ষাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন মন্দিরের পশ্চিম দিকে প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ এবং পূর্বদিকে বাসুলীপুকুর নামে একটি পুষ্করিণী আছে। মন্দির প্রাঙ্গণের নানা স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তর প্রোথিত আছে। বিশেষ করিয়া মন্দিরের সম্মুখে প্রোথিত দুইটি জোড়া প্রস্তর স্তম্ভ দেখিয়া মনে হয় ঐগুলি পূর্বে কোন মন্দির বা অট্টালিকার প্রবেশ দ্বারে সহিত সংযুক্ত ছিল। সম্মুখস্থ পুরুলিয়াগামী রাস্তার দক্ষিণ দিকে 'ধোপাপুকুর' নামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। বলা হয় এই পুষ্করিণীর পাড়েই চণ্ডীদাসের সহিত রজকিনী রামীর দেখা-সাক্ষাৎ হইত। ধোপাপুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি স্তূপ আছে; জনশ্রুতি ইহা চণ্ডীদাসের সমাধি।

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বেগলার সাহেব চণ্ডীদাসের সাধনস্থল পরিদর্শন করিয়া আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার রিপোর্টে, অষ্টম খণ্ডে একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। নিম্নে উহা উদ্ধৃত করা হইল—

"The principal remains consist of some temples and ruins within a brick enclosure; the enclosure and the brick temples that existed having long become mere mounds, while the laterite temples still stand. The bricks used are mostly inscribed, and the inscription gives a name which I read as Konaha Utara Raja, while the *pandits* read it as Hamira Utara Raja; the date at the end is the same in all, *viz.*, Saka 1476. There are 4 different varieties of the inscriptions, two engraved and two in relief; the bricks were clearly stamped while still soft and then burnt. Tradition identifies Chhatna with Vasuli or Vahuli Nagara. At Daksha's sacrifice, it is said, one of the limbs of Parvati fell here, which thence derived its name of Vasuli Nagara or Bahulya Nagara, a name mentioned by the old Bengali poet Chandi Das. Its present name Chhatna is derived from a grove of *Chatim* or *Chatni* trees, which existed here. The Rajas of the country were originally Brahmans and lived at Bahulya Nagara One of them would not worship Parvati under her form of Vasuli Devi, and her favour being withdrawn from him, he was killed by the Samantas (Saonts ?) Santals, who reigned a long time. At last, the people rose up and killed all the Saonts they could; one man only escaped by hiding in the house of a low caste potter (Kumhar). For this reason, to this day, the Saonts will eat and drink with the Kumhars.

To this man Vasuli Devi appeared in a dream, and encouraged him to try his forune, assuring him of success. The man was filled

with profound respect for her, and having undergone various fasts, etc., he gathered together 11 other Saonts and kept wandering in the jungles. One day, when very hungry, they met a woman with a basket of *kendus* on her head. She, pitying their condition, gave them one a piece from her basket; they asked for more, and she gave; but one of them impatiently snatched away one from her. However, the 12 Saonts were refreshed, and the woman was highly pleased. Calling them, she said—'go into the jungle and take 12 *kendu* saplings, and go and fight for your Raj; Vasuli Devi and I will restore your Raj.' They accordingly sallied out, killed the Raja, and obtanied possession of the kingdom again. These twelve ruled jointly; the man who had snatched the *kendu* fruit died first; the remaining eleven ruled by turns till, finding it too troublesome, they agreed to give the sole power to one of their number. The descendants of these men are present Samanta Rajas, who call themselves Chhatris.

The temple is ascribed to Hamira Uttara Raja and the legend about it is that Vasuli Devi one night appeared in a dream to the Raja, and said—'Behold, certain cartmen and *mahajans* are passing through your territory and are at this moment under a particular tree; they have with them a stone in which I have taken up my abode. Take it and set it up to be worshipped, for I am pleased with you, and will remain with you.' The Raja, accordingly sent men and stopped the *mahajans* and cartmen, and seized the stone in payment of ground rent for the ground they had occupied during the night. He then set it up in the temple which we now see."

Another version of these legends and a history of the family of the zemindars of Chhatna will be found in the article on Samantabhum.

There is a tank at Chhatna called Bolpokharia. Although small in area, it is deep, and its water never fails. It is believed to be very ancient; indeed, the family records of the zemindars of Chhatna refer to it as in existence before the reputed date of the foundation of their family (1403 A. D.). A quaint legend attaches to it. It is said that in the days when the Rajas of Chhatna were very powerful and the goddess Vasuli was very much revered, a girl about 8 years old asked a *sankhari*, *i.e.*, a woman selling shell bracelets, who was passing by the side of the tank, to give her some bracelets. The woman having enquired who would pay the price, she replied that her father was a certain Deghoria who worshipped Vasuli, and that he would pay her out of the money kept in the wall of his house. On this, the woman gave her the ornaments, and going to the Deghoria informed him of what had happened and asked for the price of the bracelets. The Deghoria, who had no daughter, was surprised, and his surprise became greater when he found money at the place mentioned. He then went with the woman to the Bolpokharia tank, and there to hands decorated with the shell bracelets appeared above the water."

(District Handbooks, 1951 Bankura, by A Mitra, p. lxvi—lxvii)

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের মধু শুক্লা সপ্তমী তিথিতে চণ্ডীদাস সাধনপীঠে বাসুলীদেবীর পূজা এবং সাড়ম্বরে কবি চণ্ডীদাসের জন্মোৎসব পালন করা হয়। তিনদিনব্যাপী এই উৎসবে যথারীতি পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও চব্বিশ প্রহরব্যাপী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বাউলগান এবং দরিদ্রনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। অষ্টমী তিথিতে একটি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়; এই সভায় বাঁকুড়া শহর ও কলিকাতা হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আসেন এবং কবির জীবনী, ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন।

উৎসবটি চণ্ডীদাস স্মৃতি রক্ষা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত এবং গত ত্রিশ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাতে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। এই সময় উৎসব প্রাঙ্গণে নানাপ্রকার জিনিসপত্রের অনেকগুলি দোকানপাট বসে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে হামারউত্তর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাসুলীদেবী বর্তমানে ভুবরাজপুরের একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। শোনা যায়, স্বপ্নাদেশ অনুসারে একদা ছতনার ক্ষত্রিয়রাজ সিংহদেওগণ চণ্ডীদাসের সাধনস্থল হইতে বাসুলী মূর্তি তুলিয়া আনিয়া রাজবাড়ীর নিকট মন্দির নির্মাণ করিয়া বাসুলী মূর্তি স্থাপন করেন এবং যথারীতি পূজার ব্যবস্থা কারন। বর্তমানে যে পঞ্চরত্ন মন্দিরে বাসুলীদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা ১৭৯৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ছাতনার রাজপরিবারের রানী আনন্দকুমারী কর্তৃক নির্মিত। মন্দিরটির নীচের দিক পাথর দ্বারা নির্মিত হইলে, উহার দেওয়াল গাত্রাদি ইষ্টক নির্মিত। প্রায় ৫″×৬″ পোড়ামাটির ইষ্টকের উপর খোদিত কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি দ্বারা পূর্বদিকের দেওয়াল গাত্র অলংকৃত। মন্দিরের পূব ও দক্ষিণ দিকে প্রবেশদ্বার এবং রক্ আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে একটি বেদীর উপর প্রায় দেড় ফুট উচ্চ শিলায় খোদিত বাসুলী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। দেবী দ্বিভূজা ইহার দক্ষিণ হস্তে কৃপাণ এবং বাম হস্তে একটি পাত্র ধৃত। দুই কর্ণে প্রস্তর খোদিত কুণ্ডল ঝুলিতেছে এবং শিরে রৌপ্য নির্মিত মুকুট শোভিত। দেবীর মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি এবং কিছুটা পুরুষোচিত ভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহা ভিন্ন বেদীর উপর একটি ছোট শিবলিঙ্গ ও একটি গোলাকার পাথর আছে।

মন্দির প্রাঙ্গণের চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত। মন্দিরের উত্তরদিকে ভোগরন্ধন ঘর, পূর্বদিকে একটি বৃহৎ ইন্দারা এবং দক্ষিণ দিকে একটি বকুল গাছের নীচে যূপকাষ্ঠ প্রোথিত আছে। গাছটির গোড়া ইটদ্বারা বাঁধানো। ১৯৬৪-৬৫ সালে মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্কার করিয়াছেন এবং ইহা অদ্যাপি বেশ সুগঠিত আছে।

বাসুলী মন্দির প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে জঙ্গলাবৃত স্থানে একটি গাছের নীচে দেবীর ভৈরবরূপে একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড আছে এবং একটি প্রাচীন বটগাছের নীচে মাকড়পাথর নির্মিত একটি পরিত্যক্ত ভগ্ন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাতনা রাজ পরিবার কতৃক নির্মিত বাসুলী দেবীর প্রাচীন মন্দির। উল্লিখিত পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মাণের পূর্বে বাসুলীদেবী এই মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমান মন্দিরটি প্রায় শত বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়।

মধ্যাহ্নে পোড়া মাছ, কড়াইয়ের (বিউলি) ডাল সহ সিদ্ধচালের ভাত ও ব্যঞ্জনাদি ভোগ দিয়া বাসুলী-দেবীর নিত্য পূজা হয়। শোনা যায় আবির্ভাব কালে দেবী ভোগ নিবেদনের এইরূপ নির্দেশই দিয়া ছিলেন। মন্দিরে মানত পূজাদি দিতে আশপাশের গ্রাম হইতে প্রতিদিনই লোকজন আসেন। বাসুলী দেবী জাগ্রত ঈশ্বরী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। দেবীর মহাত্ম্য সম্পর্কে নানারূপ অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। জনশ্রুতি আছে দেবী একবার নিঃসন্তান সেবায়েতের কন্যা পরিচয় দিয়া জনৈক শাঁখারীর নিকট হইতে শাঁখা পরিয়া ছিলেন এবং পরে সেবায়েতের প্রত্যয়ের জন্য একটি পুষ্করিনী হইতে জলের উপর শাঁখা সহ হাত উঠাইয়া দেখাইয়া ছিলেন। কেবল ছাতনায় নহে বাঁকুড়া জেলার নানা স্থানেই বাসুলী পূজার প্রচলন আছে।

নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাসুলী মন্দিরে দেবীর ভৈরবকে কেন্দ্র করিয়া গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা "রানীর গাজন" নামে খ্যাত। গাজন উপলক্ষে সাড়ম্বরে বাসুলী ও ভৈরবের পূজা ব্যতীত দশ-পনের জন ভক্ত প্রতি বৎসর সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১১ই জ্যৈষ্ঠ চড়ক পূজা হয়। দুইদিন ব্যাপী এই উৎসবে ছাতনা থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং নিকট-বর্তী রাস্তার দুইধারে খাবার, মনিহারী, শিল্প সামগ্রী প্রভৃতি জিনিসপত্রের অনেকগুলি দোকানপাট বসে। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলার দল আসে এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে সামন্তভূমের রাজধানী ছাতনায় ছড়াইয়া আছে নানা কিংবদন্তী, নানা লৌকিক দেবদেবী। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি কিংবদন্তী ও দেবদেবীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নে ছাতনা থানার অন্তর্গত

আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রামের পূজা-পাবণ ও তৎসংশ্লিষ্ট কিংবদন্তীর সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইল।

ছাতনার নিকটবর্তী লোহগড় গ্রাম সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, পঞ্চকোটরাজ কর্তৃক বিতাড়িত জনৈক রাজপুত্রকে ছত্রিনাধিপতি আশ্রয় দান করিয়া তাঁহার বাসস্থানের জন্য একটি নূতন গড় নির্মাণ করেন। এইস্থানে হাতিশালা, ঘোড়ামুলী নামে পরিচিত স্থানগুলি একদা উক্ত রাজকুমারের হাতি, ঘোড়া থাকিত বলিয়া গ্রামবাসীগণ উল্লেখ করেন এবং উক্ত নূতন গড় বা নয়াগড় বর্তমানে লোহাগড় নামে পরিচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। উক্ত গড়ের ভগ্নাবশেষ আজিও গ্রামে বিদ্যমান।

ছাতনার পশ্চিমদিকে আড়রা নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। শোনা যায়, এই স্থানে উক্ত রাজকুমারকে উপলক্ষ করিয়া পঞ্চকোট রাজের সহিত ছাতনার রাজার যুদ্ধ হয়। এই গ্রামে প্রাচীনকাল হইতে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন, এই গ্রামে ইষ্টক নির্মিত সুউচ্চ মিনার আছে; স্থানীয় লোক ইহাকে 'মাচান' বলেন। কেবলমাত্র আড়রা গ্রামেই নয়, ছাতনা থানার কামারকুলী গ্রামে, বাঁকুড়া শহরে, ওন্দা প্রভৃতি বাঁকুড়া জেলার নানাস্থানে ঐরূপ মাচান দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন জমি জরীপ কার্যের সুবিধার জন্য আবার কেহ বলেন বর্গীর হাঙ্গামাকালে শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য মল্লরাজগণ তাঁহাদের রাজ্য সীমানার ভিন্নস্থানে ঐ সকল সুউচ্চ মাচানগুলি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

ছাতনা-গৌরীপুরের মধ্যস্থলে বর্গীকাটার মাঠ নামে একটি স্থান আছে। শোনা যায়, এইস্থানে বর্গীদের সঙ্গে মল্লরাজদের তুমুল সংঘর্ষ হয় এবং সেই সংঘর্ষে বহু বর্গী নিহত হয়। কামারকুলী গ্রামের পূর্বপ্রান্তে ছাতনা-পুরুলিয়াগামী রাস্তার পাশে একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর পাড়ে প্রোথিত প্রায় তিন চার ফুট উচ্চ শিলায় খোদিত কয়েকটি যোদ্ধামূর্তি আছে। মূর্তিগুলির কাহার হাতে তীর ধনুক, কাহার হাতে ঢাল ও উন্মুক্ত অসি; কেহ একক, কাহারও বা সঙ্গে নারী মূর্তি আছে। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় এই মূর্তিগুলি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া মেগালিথিক কালচারের নিদর্শন বীরস্তম্ভ নাম দিয়াছেন। ছাতনা থানার অন্তর্গত জোড়হীড়া গ্রামেও বাস রাস্তার পাশেই এবং বাঁকুড়ার মোলেশ্বর শিবমন্দিরের নিকট এইরূপ বীরস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়।

কামারকুলী গ্রামে এককালে বহু কর্মকার দিগের বসবাস ছিল; এই কারণেই গ্রামের নাম কামারকুলী হয়। বর্তমানে গ্রামে কামারদের বাস নাই; মন্বন্তরের কারণে তাহারা এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে কামারপাড়ায় বাউরীদের বসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। বাউরীপাড়ায় ঝামাডাং নামে একটি স্থান আছে; পূর্বে কামারেরা তাঁহাদের লোহা পোড়ানর ঝামা এইস্থানে ফেলিতেন বলিয়া বিশ্বাস। এই গ্রামে রাস্তার ধারে বনজঙ্গলে আচ্ছাদিত একটি প্রাচীন ধর্মরাজ মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে। ঐ স্তূপের উপর একটি নিমগাছ উঠিয়াছে। বর্তমানে এই মন্দিরের ধর্মরাজের পূজা হয় না বটে; তবে আজিও গ্রামবাসীরা ভগ্ন মন্দিরের নিকট ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান। এই গ্রামেই স্থানীয় তাম্বুলীদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজের নির্দিষ্ট স্থান আছে। এখানে ধর্মরাজের পূজা হয়। গ্রামবাসীরা বলেন ইহা দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন স্থান। ধর্মরাজ মন্দির হইতে সামান্য কিছুদূরে একটি ছোট ইষ্টক নির্মিত মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবমন্দিরটি অপ্রাচীন এবং ইহার নিকট শিরীষ গাছের নীচে ভৈরবের নির্দিষ্ট স্থান আছে। ঐ স্থানে বাঁধানো বেদীর উপর কতকগুলি মাটির হাতী-ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় ঘোষাল পরিবার শিবের নিত্যপূজা করেন এবং প্রতি বৎসর বৈশাখী সংক্রান্তিতিথিতে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে এবং পুরুলিয়াগামী রাস্তার দুইধারে একটি মেলা বসে। মেলায় নানাবিধ জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি দোকানপাট বসে।

ছাতনা থানার অন্তর্গত প্রাচীন মণিহারা গ্রামের সহিত সামন্তভূম রাজাদের কাহিনী জড়িত আছে। ধর্মরাজপূজার জন্য গ্রামটি বিশেষ পরিচিত। ছাতনা হইতে শুশুনিয়া যাইবার পথে গুড়পুতা নামক গ্রামে বাগরাই সিং নামে গ্রাম্য দেবতার পূজা হয়। গুড়পুতা গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ। নিকটবর্তী থুমপাথর গ্রামে প্রায় সাড়ে তিন ফুট উচ্চ একটি প্রস্তরে গায়ে ঘোমটা দেওয়া নারীমূর্তি এবং

নারী মূর্তিটির দিকে আড়নয়নে চাহিয়া একটি পুরুষ মূর্তি খোদিত আছে। গ্রামে প্রোথিত এই শিলামূর্তিটিকে গ্রামবাসীগণ 'ভাস্থর বোয়াসিন' দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন। নিত্যপূজা ব্যতীত গ্রামে কলেরা বা বসন্ত দেখা দিলে জাঁকজমকের সহিত ভাস্থর বোয়াসিনর' পূজা দেওয়া হয়। স্থানীয় বাউরী সম্প্রদায় পূজা করেন। হাউসীবাদ নামক গ্রামে বাসুলী দেবীর নিত্যপূজা হয়। গ্রামবাসীরা বলেন কবি চণ্ডীদাস এই বাসুলী দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার নির্দেশ দিয়া যান।

ইহা ভিন্ন, ছাতনা থানার নানাস্থানে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাঁধনা পরব এবং টুসু, ভাদু ও মনসাপূজা হইয়া থাকে। সর্প ভীতির জন্য এই অঞ্চলে খুবই মনসাপূজার প্রচলন দেখা যায়। কালাপাথর গ্রামে মনসা পূজারী শ্রীভূগোল বাউরীর একটি 'জানঘর' আছে। ইনি এ অঞ্চলে ভূত-প্রেত ঝাড়া এবং সর্প দংশনের ওঝারূপে বিশেষ খ্যাত। ছাতনা থানার অন্তর্গত মনতুমড়া, ঝাঁটিপাহাড়ী ও শুশুনিয়া গ্রাম সম্পর্কে এই গ্রন্থের যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

শুশুনিয়া

ছাতনা থানার অন্তর্গত শুশুনিয়া একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম। ছাতনা শহর হইতে প্রায় ছয় মাইল উত্তরে শিশুনগ বা শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে গ্রামটি অবস্থিত। শুশুনিয়া পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় ১,৪৪০ ফুট। এই পাহাড়ের গায়ে চন্দ্রবর্মা নামক জনৈক নরপতির লিপি খোদিত আছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন ইহা প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে খোদিত এবং বাংলা হরপের আদিরূপ ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে চন্দ্রবর্মা বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হয় এবং শুশুনিয়া পাহাড়ের উপর সম্ভবত তাঁহার একটি গিরিদুর্গ ছিল। এইস্থানে দুইটি গুহা এবং অনেকগুলি বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন শিশুনগ হইতেই গ্রামের নাম শুশুনিয়া হইয়াছে।

বর্তমানে গ্রামে ব্রাহ্মণ, কামার, তাম্বুলী, তাঁতি, বৈরাগী, শুঁড়ি, সামন্ত, বাউড়ী, হাড়ি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বসবাস আছে। গ্রামবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য। তাহা ছাড়া এই গ্রামে বহু কামারের বসবাস আছে; তাঁহারা নানারূপ শিল্পকার্য দ্বারা জীবিকার্জন করেন। শুশুনিয়া হইতে প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে পারুলিয়া অনেকে পাথরের বাসনপত্র, শিলনোড়া ইত্যাদি নির্মাণ করেন। নিকটবর্তী রেলস্টেশন ছাতনা হইতে অথবা বাঁকুড়া শহর হইতে সরাসরি মোটরবাসে শুশুনিয়া যাতায়াত করা চলে।

শুশুনিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণীস্নান উপলক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা বাঁকুড়া জেলায় একটি অন্যতম উৎসব বলিয়া পরিচিত। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহু কালের প্রাচীন। এই উৎসব উপলক্ষে শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে একটি ঝরণা ধারায় প্রতি বৎসর প্রায় আট-দশ হাজার নরনারী পুণ্যস্নান করিয়া থাকেন। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং সীমান্তবর্তী মানভূম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বর্ধমান হইতে পুণ্যকামী যাত্রীরা আসেন। ইহা ভিন্ন, এই সময় কিছু সংখ্যক সাধু সন্ন্যাসীরও আগমন হয়। ইহাদের মধ্যে দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুদের সংখ্যাই বেশী। যাত্রীদের সুবিধার জন্য উৎসবকালে বাঁকুড়া শহর হইতে নিয়মিত মোটরবাস ব্যতীত অতিরিক্ত যান বাহনেরও ব্যবস্থা করা হয়।

চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী এই বারুণীস্নান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত ঝরণার সন্নিকটে কিঞ্চিৎ উপরে বেল গাছের নীচে প্রস্তরে খোদিত প্রায় ৫ফুট উচ্চ একটি শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রস্তরটি সম্পূর্ণ সিঁন্দুরলিপ্ত। উহার উপরিভাগে একটি সিংহমূর্তি খোদিত আছে বলিয়া অনুমিত হয়। ঐতিহাসিকগণের মতে উহা একটি বীরস্তম্ভ। তবে, সাধারণ লোক ইহাকে নৃসিংহদেব বিশ্বাসে পূজা করেন। ইহার পাশে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। পুণ্যার্থীগণ ঝরণার জলে স্নান সারিয়া নৃসিংহদেবের পূজা দিবার জন্য দলে দলে পাহাড়ে আরোহণ করেন এবং নৃসিংহদেবের পূজা দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বর্তমান পূজারী শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বিষ্ণু মন্ত্রে নৃসিংহদেবের পূজাদি করিয়া থাকেন। ভক্তেরা

সাধারণতঃ নৃসিংহদেবের নিকট ষোড়শোপচারে পূজা মানসিক করিয়া থাকেন।

ইহা ভিন্ন, গ্রামে চারিটি মনসার স্থান, ঈশ্বরী নামে এক গ্রামদেবী, গ্রামের উত্তর প্রান্তে মঙ্গলচণ্ডীর নির্দিষ্ট স্থান এবং স্বামী কৃষ্ণানন্দ প্রতিষ্ঠিত একটি আশ্রম আছে। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসা দেবীর বাৎসরিক পূজা এবং উল্লিখিত আশ্রমে স্বামী কৃষ্ণানন্দের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে আশ্রমে বহু সাধুসন্ত আসিয়া থাকেন।

বারুণীস্নান উপলক্ষে শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমির উপর চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং ইহাতে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, মানভূম প্রভৃতি জেলা হইতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় দশ হাজার নরনারী মেলায় আসেন। উৎসবকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের গৃহে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবে পূর্ণ থাকে। অবশ্য উৎসবের দিনই সর্বাপেক্ষা বেশী লোকসমাগম হয়। নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকজন অনেকে গরুর গাড়ী করিয়াও মেলা আসেন।

ছাতনা বাজারের ব্যবসায়ীরা ভিন্ন প্রতি বৎসর বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, রাণীগঞ্জ, পুরুলিয়া হইতে প্রতি বৎসরই মেলায় ব্যবসায়ীরা আসিয়া থাকেন। মেলায় প্রায় তিনশত দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেচাকেনা করেন। মেলায় প্রধানতঃ ছানার খাবার, মনিহারী ও বাসনপত্রের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ভিন্ন, কাপড়চোপড়, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, মাটি ও প্লাষ্টিকের খেলনা-পুতুল, হাঁড়ি-কলসী, ঔষধপত্র, বই-ছাপা ও স্থানীয় সাঁওতালদের তৈয়ারী বাঁশ ও বেতের নানাবিধ শিল্পসামগ্রী আমদানী হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে। কেহ কেহ জুয়া বা লটারী খেলিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন তিন রাত্রিব্যাপী যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় যাত্রাদল ব্যতীত কলিকাতা হইতে নামকরা পেশাদারী যাত্রাদল আসে। মেলায় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে আদায়কৃত খাজনার অর্থের দ্বারা আমোদপ্রমোদের আয়োজন করা হয়। যাত্রীদের জন্য পানীয় জল এবং মেলায় জনস্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকারী পুলিশ বাহিনী ব্যতীত স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দল তৎপরতা গ্রহণ করিয়া থাকেন। (তথ্য সংগ্রহের কাজে বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট স্যোসাল এডুকেশন অফিসার এবং স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীপূর্ণানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সহযোগিতা করিয়াছেন।)

ঝাঁণ্টি পাহাড়ী

ছাতনা থানার অন্তর্গত ঝাণ্টিপাহাড়ী একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। ঝাণ্টিপাহাড়ী ঠিক গ্রাম নয় বরং শহরই বলা চলে। পূর্ব রেলপথে এই স্থানে একটি রেলস্টেশন আছে; তাহা ছাড়া বাঁকুড়া শহর হইতে নিয়মিত মোটর-বাসও চলাচল করে। এই স্থানে হাটবাজার, উচ্চ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, লাইব্রেরী আছে; আর আছে অনেক-গুলি ধানকল। প্রাচীন বাসিন্দাদের মধ্যে আছেন ব্রাহ্মণ, বাউরী, মাল, কামার, তাম্বুলী প্রভৃতি সম্প্রদায়। স্থানীয় রক্ষিত পরিবার আদি বাসিন্দাদের মধ্যে অন্যতম। প্রধানতঃ কৃষিকার্য ও ব্যবসাই স্থানীয় জনসাধারণের মুখ্য উপজীবিকা। পূর্বে এই অঞ্চলে দুর্গম ঝাণ্টি বনে পরিপূর্ণ চিতাবাঘের আবাসস্থল ছিল; ইং ১৯০৮ সনে এই স্থানে একটি রেলস্টেশন প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রমেই এইখানে জন-বসতি গড়িয়া উঠে। ঝাণ্টি বন পরিষ্কার করিয়া গ্রামের পত্তন হয় বলিয়া ইহার নাম হয় ঝাণ্টিপাহাড়ী।

স্থানীয় বাজারের নিকট শ্রীনাথ রক্ষিত নামে জনৈক গ্রামবাসী একটি ছোট মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের ২৫শে ও ২৬শে তারিখে এই শিবকে কেন্দ্র করিয়া গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অসময়ে এই গাজন উৎসবের জন্য ইহা 'হুজুকে গাজন' অপভ্রংশে 'হুচুক গাজন' নামে খ্যাত। শ্রীনাথ কর্তৃক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনেকে আবার শ্রীনাথের গাজনও বলেন।

উৎসবটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন এবং সর্বজনীন। গত কয়েক বৎসর হইল স্থানীয় সবুজ সঙ্ঘের সদস্যগণ উৎসবটি পরিচালনা করিতেছেন। আশপাশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সাঁওতাল নর-নারী এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। এই স্থানের গাজন উৎসবের সাঁওতাল নাচ একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান।

শ্রীনাথের গাজন বা হুচুকে গাজন উপলক্ষে শিবমন্দিরের নিকটবর্তী ভারতীয় রেল বিভাগের বিস্তীর্ণ জমির উপর প্রতি বৎসর ২৫শে জ্যৈষ্ঠ একটি মেলা বসে। মেলাটি উৎসবের ন্যায়ই প্রাচীন।

ছাতনা থানার জামতড়া, চেনাবাড়ী, ঝুঁযেকা, ধবন, শালডিহা, মেট্যালা, শুশুনিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং বিষ্ণুপুর, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি, সিমলাপাল থানা এবং বর্ধমানের রাণীগঞ্জ ও আসানসোল থানা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দশ-বারো সহস্র নরনারী রেল, মোটরবাস ও গরুর গাড়ী করিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় সত্তর-আশীটি দোকানপাট বসে ও কুড়ি-পঁচিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। স্থানীয় অঞ্চল ব্যতীত বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, রাণীগঞ্জ, আদ্রা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর ব্যবসায়ীরা আসিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মেলায় 'ডাক' বা নিলাম করেন এবং 'ডাক' গ্রহণকারী ব্যক্তি ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করেন। ডাক হইতে আদায়কৃত অর্থের দ্বারা মন্দিরাদি সংস্কার এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হয়। মেলায় লাঙ্গল, জোয়াল, মই, কোদাল, কাস্তে প্রভৃতি কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি বেশী বিক্রয় হয়। ইহা ভিন্ন ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন, মনিহারী তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, খেলনা-পুতুল ও হাঁড়িকুড়ি, শাকসব্জী, মাছ-মাংস, খোল-করতাল, মাদল এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী নানারূপ শিল্পসামগ্রীর দোকান বসে। শেষোক্ত শিল্প সামগ্রীগুলি প্রতি বৎসর দাসপুর, ছাতনা, মৌলবনা, কেঞ্জাকুড়া প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

আমোদপ্রমোদের জন্য পশু-পক্ষী প্রদর্শনী, নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক প্রভৃতির দল আসে এবং কোন কোন বৎসর যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গত তিন-চার বৎসর পূর্বে মেলায় গণিকারা আসিতেন। ইহা ভিন্ন, মেলায় বহুলোক জুয়া খেলিয়া থাকেন। জুয়া দলের জন্য মেলায় প্রতি বৎসর 'ডাক' হয় এবং উহার দ্বারা আদায়ী কৃত অর্থে শারদীয়া দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়।

হুচুকে গাজন ব্যতীত ঝাঁন্টিপাহাড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উড়িষ্যা প্রদেশের হাৎবাবা নামে জনৈক মহান্ত এই স্থানে জগন্নাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জগন্নাথদেবের বর্তমান সুন্দর মন্দিরটি মাত্র বারো বৎসর হইল সাধারণের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহের নিত্যপূজা হয়। বর্তমানে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ কুণ্ড, শ্রীবাবুলাল ডালমিয়া প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পূজা ও উৎসব পরিচালনা করেন। পূর্বের কাঠের রথটি জীর্ণ হইয়া পড়িলে প্রায় বারো বৎসর পূর্বে লৌহ নির্মিত রথটি নির্মাণ করা হয়। আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন মন্দির হইতে রথ টানিয়া প্রায় এক মাইল দূরে ধরণী কুণ্ডু মহাশয়ের ধানকলের চাতালে রথটিকে রাখিয়া আসা হয় এবং উল্টোরথের দিন পুনরায় রথটিকে মন্দিরে আনা হয়। রথের দড়ি টানিতে প্রতি বৎসর প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে। রথযাত্রা উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে একটি ছোট মেলা বসে। মেলায় খাবার, মনিহারী দোকানের সহিত তালপাতার 'ঘুম', বাঁশের ছাতা, মাছ ধরা পলুই, মাদুর, মৃদঙ্গ ইত্যাদি দ্রব্যাদির কয়েকটি দোকান বসে। (শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ রক্ষিত)

উৎসব বিবরণী

আদিবাসী উৎসব (বাঁধনা পরব)

জামখোলা গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে স্থানীয় সাঁওতাল সম্প্রদায় মহাসমারোহের সহিত বাঁধনা পরব পালন করেন। উৎসবের কোন নির্দিষ্ট দিন নাই; গ্রামবাসীগণ নিজেদের সুবিধামত পৌষ মাসের যে কোন দিন উৎসব শুরু করেন এবং তিনদিনব্যাপী

উৎসব চলে। গ্রামের তিনটি প্রাচীন আমগাছের নীচে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন ঘট স্থাপন ও মারাংবুরু পূজার পর মানতের ছাগ বলি দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাকালে প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ী গিয়া পূজাদি করেন। তৃতীয়দিন 'গরুখুঁটা' নামে একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি গরু বা মহিষকে সুসজ্জিত করিয়া লোহার শিকল দ্বারা খুঁটার সহিত বাঁধেন এবং উক্ত গরু বা মহিষটিকে কেন্দ্র করিয়া চক্রাকারে সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষেরা নৃত্যগীত করেন। নৃত্যগীতে যোগদানকারীরা মদ্যপান করেন। এই উৎসব উপলক্ষে সাঁওতালেরা নূতন জামাকাপড় পরেন এবং প্রত্যেকের গৃহেই আত্মীয়-স্বজনে পরিপূর্ণ থাকে। এই সময় প্রত্যেকে নিজ নিজ আত্মীয়-বন্ধুদের ভালমন্দ খাদ্যদ্রব্য ও ঘরে তৈয়ারী হাড়িয়ার দ্বারা আপ্যায়ন করেন। চতুর্থ দিন সকালে একত্রে বসিয়া মদ্যপান ও নৃত্যগীতের পর উৎসব শেষ হয়।

কালীপূজা

জিড়রা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে সাড়ম্বরে সর্বজনীন কালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রামে একটি মন্দিরে দক্ষিণাকালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শোনা যায়, প্রায় সাত-আটশত বৎসর পূর্বে এই কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্বে ছাতনা রাজ পরিবার দেবীর নিত্যপূজা ও উৎসব পরিচালনা করিতেন; কিন্তু বর্তমানে তাঁহাদের অক্ষমতার জন্য স্থানীয় শ্রীমতিলাল সিংহ মহাশয় পূজাদি তত্ত্বাবধান করিতেছেন। জিড়রার কালী বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বরী বলিয়া সাধারণ লোকের বিশ্বাস।

উৎসবের পক্ষকাল পূর্ব হইতে ইহার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। কার্তিক মাসের অমাবস্যার পূর্বদিন গ্রামের প্রতিটি পরিবারে অন্ততঃ একজন লোক একবেলা নিরামিষ আহার্য গ্রহণ করিয়া 'বার' পালন করেন এবং অমাবস্যার দিন সারাদিন উপবাস থাকিয়া রাত্রিকালে দেবীর পূজার পর পুষ্পাঞ্জলী দিয়া উপবাস ভঙ্গ করেন। মন্দিরের দেবী দর্শন করিতে ও পূজা দিতে বিভিন্ন গ্রাম হইতে এই দিন বহু লোকজন আসেন। সাধারণত ষোড়শোপচারে পূজা ও ছাগ বলি দিয়া দেবীর পূজা দেওয়া হয়।

উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন ও সাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এমন কি বলির ছাগ মাংস ও মুণ্ডগুলি গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়।

গোপিনাথ ডিহি গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে একটি কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় প্রচলিত জনশ্রুতি আছে যে, এই গ্রামে এক সময়ে কলেরা মহামারী রূপে দেখা দিয়াছিল। গ্রামবাসীগণ এই মহামারীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় সমবেত ভাবে কালীপূজার আয়োজন করেন এবং পূজা সম্পন্নের পর গ্রামে মহামারীর প্রকোপ প্রশমিত হয়। তদবধি এই গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

পূজাটি একদিন হইলেও ইহাকে কেন্দ্র করিয়া আনন্দোৎসব আরও দুইদিনব্যাপী চলে। পূজার নির্দিষ্ট দিনের প্রায় দশ বার দিন পূর্ব হইতে পূজার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। প্রস্তুতি পর্বে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় অর্থাদি সংগ্রহ করা হয়। পূজার দিন ভক্তগণ সারাদিন উপবাস থাকিয়া সন্ধ্যাকালে স্নান সমাপনের পর পূজাস্থানে সমবেত হইতে থাকেন এবং মধ্যরাত্রি হইতে যথারীতি পূজা আরম্ভ হয় এবং পূজান্তে হোমের পর পশুবলি দেওয়া হয়। পরদিন প্রাতঃকালে সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ইহার পর আরও দুইদিন-ব্যাপী যাত্রাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকে। আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নর-নারী দেবী দর্শন করিতে ও মানসিক পূজাদি দিতে আসেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

মল্লমুড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে খুব ধুমধামের সহিত শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা 'বিরিঞ্চি নারায়ণের গাজন' নামে সমধিক পরিচিত।

অনুমান সামন্ত রাজগণ কর্তৃক স্থাপিত একটি অতি প্রাচীন মন্দিরের গর্ভগৃহে বিরিঞ্চি নারায়ণ নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। তবে শিবলিঙ্গ একটি নহে। উক্ত মন্দিরের পাশাপাশি পাঁচটি শিবলিঙ্গ আছে। উহার মধ্যস্থলের শিবলিঙ্গটি অন্যান্যগুলির তুলনায় কিঞ্চিৎ ভগ্ন। শিবলিঙ্গের উপর প্রস্তর নির্মিত ফণাযুক্ত সর্প

দেখিতে পাওয়া যায়। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই শিবলিঙ্গগুলি জলমগ্ন থাকেন। পূজারী ও ভক্তগণ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজা করেন।

প্রতি বৎসর সংক্রান্তি ও তাহার পূর্বদিন উক্ত শিবলিঙ্গ কেন্দ্র করিয়া এই স্থানে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে অনেকে ভক্তব্রত পালন করেন। চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিন গ্রামের একটি নির্দিষ্ট পুষ্করিণীর পাড়ে পাটপূজা ও মন্দিরে ঘট স্থাপন করা হয়। পুষ্করিণী পাড়ে পাটপূজার পর ভক্তদের মধ্যে শিবের নিকট উৎসর্গকৃত মাল্য বিতরণ করা হয় এবং লৌহশলাকাবিদ্ধ পাটের উপর পূজারীকে শয়ন করাইয়া ঢাক-ঢোলের বাজনাসহ ভক্তরা তাঁহাকে কাঁধে করিয়া মন্দিরে লইয়া আসেন। মন্দিরে আসিয়াই পূজারী অচৈতন্য হইয়া পড়েন; কিছুক্ষণ এইরূপ অবস্থা থাকিবার পর তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে; মন্দিরে পূজাপাঠ আরম্ভ হয়।

সংক্রান্তির দিন যথারীতি পূজা হয় এবং এইদিন মানতের পশু বলি হয়। তবে পশুগুলি শিবের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয় না; শিবের শক্তির উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া বলি দেওয়া হয়। এইদিন ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করা হয়। মণ্ডুড়া গ্রামে শিবের গাজন উপলক্ষে অগণিত নরনারীর সমাগম হয়; অহিন্দুরাও দর্শক হিসাবে আসেন; উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন না। এই স্থানটি তান্ত্রিক সাধনার প্রশস্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত; এই কারণে বৎসরের বিভিন্ন সময় সাধু-সন্ন্যাসীদের সমাগম হয়। বর্তমানে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীমথুরা নাথ দেঘরিয়া শিবের নিত্যপূজা করেন। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

মনসা পূজা

ধবনীগোপালপুর মৌজার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি স্থানীয় বাউরী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত হইলেও গ্রামবাসী সকলেই উৎসবে যোগদান করেন। পূজার নির্দিষ্ট দিনের প্রায় দশ-বারো দিন পূর্ব হইতে দেবীর প্রতিমা নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয় এবং সংক্রান্তির ঠিক পূর্বদিনে গ্রামের একটি নির্দিষ্ট পুষ্করিণীতে প্রতিমা লইয়া গিয়া স্নানাভিষেক পর্ব পালন করা হয় যাহা স্থানীয় অঞ্চলে 'জলাশয়' অনুষ্ঠান নামে পরিচিত। এইদিন একটি গোবরের মাড়ুলী (?) উপর একটি সুপারী দিয়া পুষ্করিণীকে নিমন্ত্রণ জানান হয়। যে সমস্ত লোকজনেরা মনসাদেবীর পূজায় অংশ গ্রহণ করেন, তাহারা এইদিনে নাপিত দ্বারা নখ কাটাইয়া পুষ্করিণীতে স্নান সমাপনের পর কিছু মিষ্টান্ন ভক্ষণ করেন এবং রাত্রিকালে নিরম্বু উপবাস পালন করেন। পরদিন অর্থাৎ সংক্রান্তির দিন পূজারীগণের মধ্য হইতে দুই-এক জন করিয়া এক একটি নূতন ভাঁড় লইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে উক্ত পুষ্করিণীতে যান এবং ভাঁড়গুলি জলপূর্ণ করিয়া দেবীর পূজাস্থানে ফিরিয়া আসেন। এই জলপূর্ণ ভাঁড়কে স্থানীয় অঞ্চলের লোকেরা "বারি ভাঁড়" বলিয়া থাকেন। "বারি ভাঁড়" অনুষ্ঠানের পর দেবীর পূজার শুভারম্ভ। এই পূজায় নির্দিষ্ট কোন পুরোহিত নাই। যে কোন গৃহস্থ পরিবার হইতে একজন উপবাসব্রত পালনকারী ভক্তকে দেবীর পূজা ও সেবাকার্য পরিচালনার জন্য ঐ দিনের জন্য পুরোহিত রূপে ধার্য করেন। পূজার দিন সারারাত্রিব্যাপী মাঝে মাঝে দুধ, চিড়া দ্বারা ভোগদান ছাড়া মনসা মঙ্গল গানের অনুষ্ঠান চলে। সংক্রান্তির দিন মানতের ছাগ বলি হয়। পয়লা ভাদ্র ভক্তগণ আত্মীয়-স্বজনকে নিজ নিজ গৃহে আমন্ত্রণ করেন এবং পরিতৃপ্তি সহকারে মিষ্টান্নাদি ভোজনের পর ঐদিন সন্ধ্যাকালে বাদ্যভাণ্ড সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহারা প্রতিমা বিসর্জন দিতে পূর্বোক্ত পুষ্করিণীতে যান। বিসর্জনের পর তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর পূজা উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

জিড়রা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের বহু নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় খাবার, মনিহারী, বাসনকোসন, পুতুল ইত্যাদির পনের-কুড়িটি দোকান ব্যতীত বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের আমদানী হয়। ব্যবসায়ীরা স্থানীয়। তবে ভিন্ন গ্রাম হইতে মাল, কোল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রগুলি আনেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তাহা ছাড়া মেলাস্থানে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নরনারীগণ নৃত্যগীত করিয়া থাকেন।

গোপীনাথ ডিহি গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে কালীপূজা উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় নয়-দশ বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ সিধাবাড়ী, শনপুরিয়া, জোড়হিড়া, পড়াসিয়া, ঝাঁন্টিপাহাড়ী, ধবন, ভেলানী, কুলাডাবর, আগুরিয়া, বাইদ, গোপালপুর, ঘোড়ামুরগা, তিয়াসী, খাড়বাড়, শালতোড়া, আড়ভিঙ্গা, লেদাপলাশ, সুবদা, লাপাহাড়ী, কেন্দামুড়া, উপরগড়া, তালবাড়িয়া, নামবাইদ, চৌবাটি, বেলবোইদ, গোগড়া, হোরকা, আদুড়ি প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দেড়-দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ প্রধানতঃ মোটরবাস ও গরুর গাড়ী করিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ শালতোড়া, শুশুনিয়া, ঝাঁন্টি-পাহাড়ী, বাঁকুড়া শহর, ছাতনা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। প্রায় আশি-নব্বইটি দোকান-পাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন প্রভৃতির দোকানই উল্লেখযোগ্য। তাঁহা ছাড়া খেলনা, বাঁশের তৈয়ারী ঝুড়ি, চুপড়ি, মাটির তৈয়ারী হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি দোকানপাটও বসে। শেষোক্ত দ্রব্যগুলি সাধারণতঃ ধবন ও রামপুর হইতে আমদানী হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, লটারী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। তাহা ছাড়া তিনদিনব্যাপী প্রত্যহ হরিনাম সংকীর্তন, কৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবনবৃত্তান্ত সমন্বিত কীর্তনগানের অনুষ্ঠান হয়। কীর্তন-গানের দলগুলি প্রধানতঃ শালতোড়া, মণিঝাড়া, গড়াবাড়ী, কেলহা, টিস্‌রা প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে আসে। অসংখ্য নরনারী এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

চড়ক-গাজন ও নীলপুজার মেলা

মস্তমুড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন বা বিরিঞ্চি নারায়ণের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় তিন চার বিঘা জমির উপর দুই-দিনের জন্য মেলা বসে। ইহা প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া স্থানীয় গ্রামবাসীগণের ধারনা।

জামতড়া, শালডিহা, চেনাবাড়ী, মেট্যালা, হাটগ্রাম প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের বিশেষ করিয়া হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রায় চারি হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ প্রধানতঃ হাঁটিয়াই মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বাঁকুড়া শহর, ছাতনা, ঝাঁন্টি-পাহাড়ী, কেঞ্জাকুড়া, হাটগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। মেলায় শতাধিক দোকানপাট বসে এবং প্রায় পনর-কুড়ি জন ফেরিওয়ালা আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী বাসন-কোসন, ধামাকুলা মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, পুতুল ব্যতীত কেঞ্জাকুড়া গ্রাম হইতে বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র আমদানী হয়। সেবায়েতগণ মেলার বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা সার্কাস, ম্যাজিকের দল আসে এবং রামায়ণগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় সাত আট শত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বাসুলীপুজার মেলা

জামখোলা গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ বাসুলীদেবী পূজা উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং ইহাতে আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারী আসেন। মেলায় প্রধানতঃ খাবার ও মনিহারী দ্রব্যাদির দশ-পনরটি দোকানপাট বসে; বিক্রেতারা স্থানীয়। মেলায় তিন-দিনব্যাপী সাঁওতালী নাচ হয়।

মহোৎসবের মেলা

লোহাগড় গ্রামে মহোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্র পূর্ণিমা হইতে ছয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন। পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম হইতে যাত্রী এবং বিক্রেতারা আসেন। মেলায় খাবার, মনিহারী, বাসনকোসন, খেলনা পুতুল ইত্যাদির প্রায় ত্রিশটি দোকান বসে।

রাসযাত্রার মেলা

জামতড়া গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রাসমঞ্চ সংলগ্ন প্রায় এক একর জমি ব্যাপিয়া পাঁচদিনব্যাপী মেলা বসে। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া স্থানীয় গ্রামবাসীগণের অনুমান।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী আড়রা, চেনাবাড়ী, মেট্যালা, শালডিহা প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে যাত্রীগণ আসেন। তাহা ছাড়া, বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়া হইতেও কিছুসংখ্যক যাত্রী আসেন। তাঁহাদের গড়পড়তা দৈনিক সংখ্যা প্রায় চার-পাঁচ হাজার। পুরুষ ও নারী যাত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ ঝাঁন্টিপাহাড়ী, কেঞ্জাকুড়া বাজার, হাটগ্রাম, চেনাবাড়ী প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় দোকানপাটের ও ফেরিওয়ালার সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় একশত পঞ্চাশ ও চল্লিশ। উহাদের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাঁসা, পিতল, পাথরের তৈয়ারী বাসনপত্র ও শিল্পজাত জিনিসপত্র, আদিবাসীগণের ব্যবহার্য নানাপ্রকার অলংকার, লোহা ও কাঁচের তৈয়ারী জিনিসপত্র, প্রসাধন দ্রব্যাদি, সস্তার বই-ছবি, তাঁতের কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী নানাপ্রকার সৌখীন জিনিসপত্র প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য।

আমোদপ্রমোদের জন্য কয়েকদিনব্যাপী যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তাহা ছাড়া বহু সাঁওতালী নারী পুরুষ মিলিত ভাবে নৃত্যগীত করেন। কোন কোন বৎসর কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আসে। অগণিত নরনারী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

শিবপূজার মেলা

মেট্যালা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবপূজা উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে একদিনের জন্য মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের বিশেষতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় সাত-আটশত নর-নারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের অধিকাংশই গরুর গাড়ী করিয়া আসেন।

মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, হাঁড়িকুড়ি, খেলনা প্রভৃতি দ্রব্যাদির প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালাও আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য মেলায় কোন কোন বৎসরে যাত্রাগানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে।

সিমলা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবপূজা উপলক্ষে শিবস্থানের নিকটবর্তী আমবাগানে দুইদিনব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

মন্ডমুড়া, খয়ড়াডিহি, চ্যামটাগড়া, সুবড়দা, কমলাপুর, শালচূড়া, ছাতাপাথর প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত দুই-তিনশত নর-নারীর সমাগম হয়। মেলায় ময়রা, মনিহারী, খেলনা-পুতুল ইত্যাদি দোকান-পাট বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয় এবং কুলাগড় গ্রাম হইতে পুতুল নাচের দল প্রতি বৎসর আসে।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : লালপুর বড়। ৯।৩৭০.৯৪।৯১।৫৮৪

(ক) মাহিষ্য, গোড়, মণ্ডল ও বাউরী। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রাণীগঞ্জ। বাঁকুড়া-মেজিয়া রাস্তার নন্দনপুর হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তি হইতে তিনদিনব্যাপী মনসাপূজা ও হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব হয়। স্থানীয় গোড়রা পূজাটি পরিচালনা করেন। মনসাপূজার প্রথম দিনে পূজা ও বলিদান, দ্বিতীয় দিনে পূজা ও হোম, এবং তৃতীয় দিনের পূজার পর সর্বজনীনভাবে প্রসাদ বিতরণ ও ব্রাহ্মণভোজন করান হয়।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) একটি পাকা ঘরে মনসাদেবী প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক,
লালপুর বড় প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম: লালপুর বড়
পোঃ শ্রীপাটপুকুরিয়া, বাঁকুড়া।

২। গ্রাম : নিত্যানন্দপুর। ২৪।৫৫৩.৬৯।২৮৭।১,৬৪৩

(ক) ব্রাহ্মণ, তাঁতী, কুমার, কামার, সৌমণ্ডল, তিলি, ধীবর, লোহার, হাঁড়ী, মুচি ও বাউরী।

গ্রামে এগারটি পাড়া আছে। যেমন—সৌমণ্ডল-পাড়া, কুমারপাড়া, তাঁতীপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দুর্গাপুর হইতে মোটরবাসযোগে শ্রীচন্দ্রপুর বাসস্টাণ্ডে নামিয়া গ্রামে পৌছান যায়। গ্রামে যাতায়াতের জন্য কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম কীর্তন মহোৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া গ্রামে বিষ্ণুদেবের নিত্যপূজা হয়, মহোৎসবটি গ্রামের সর্বজনীন উৎসব এবং বহুদিনের প্রাচীন।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

(চ) গ্রামে একটি ভৈরব মন্দির আছে। তাহা ছাড়া গ্রামে পাঁচটি শিব, তিনটি শীতলা এবং দশটি মনসা আছে।

এই গ্রামের আদি বাসিন্দাদের অন্যতম নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামানুসারে গ্রামের নাম নিত্যানন্দ-পুর হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

শ্রীবগলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম : নিত্যানন্দপুর,
পোঃ মালিয়াড়া, বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম : সুবির আড়া। ২৫।৮৫০.৭০।১৫১।১,০০৮

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, তিলি, গোয়ালা, নাপিত, ছুতার, তাঁতী, কামার, বাউরী, ডোম ও মুচি।

কামারপাড়া, ডোমপাড়া প্রভৃতি নামে গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও তাঁতশিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দুর্গাপুর। কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

ঝুলনযাত্রা উৎসবটি স্থানীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত হইলেও গ্রামের সর্বসাধারণ ইহাতে যোগদান করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্তি ব্যতীত উৎসব উপলক্ষে নানা দেবদেবীর মৃন্ময় মূর্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তিনদিনব্যাপী উৎসবের প্রথম দিন অধিবাস, দ্বিতীয় ও

তৃতীয় দিন যথারীতি পূজা ও রাত্রিকালে যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। শেষ দিনে সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবটি দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ঝুলনযাত্রার মেলা। শ্রাবণ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি মাত্র গত পনর বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) গ্রামে একটি পাকা বিষ্ণুমন্দির এবং মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনীযুক্ত একটি দুর্গামণ্ডপ আছে। তাহা ছাড়া গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, দুইটি বাবাঠাকুর, একটি শীতলা, দুইটি সরস্বতী, দশটি মনসা এবং একটি চণ্ডী আছে।

শ্রীশক্তিপদ চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক,
হুবির আড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মালিয়াড়া, বাঁকুড়া।

৪। গ্রাম ঃ বাঁকদহ। ২৭।২,৬৪৫.৮৫।২৩৩।১,২৯৬

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, তিলি, কামার, বেনে, কলু, তাঁতি, মুচি, ময়রা, ধীবর, বৈরাগী, ডোম ও নাপিত।

গ্রামে এগারটি পাড়া আছে। যথা—ব্রাহ্মণপাড়া, গোয়ালাপাড়া, তিলিপাড়া, কামারপাড়া, বেনেপাড়া, কলুপাড়া, তাঁতিপাড়া, মুচিপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, ধীবরপাড়া, ও নাপিতপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, শঙ্খশিল্প, তাঁতশিল্প ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী মোটর বাসস্টাণ্ড গঙ্গাজলঘাটি। গ্রামে যাতায়াতের জন্য একটি পাকা রাস্তা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিনাম সংকীর্তনের মহোৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসবটি বহুদিনের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়। তাহা ছাড়া প্রতি বৎসর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে একযোগে সমস্ত গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা হয় এবং সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ ও ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তিন-চারদিনব্যাপী। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলা, পনরটি মনসা, চারটি বাবাঠাকুরের এবং একটি ভৈরব ঠাকুরের স্থান আছে। তাহা ছাড়া গ্রামে দুইটি শিবমন্দির এবং একটি চণ্ডীমণ্ডপ আছে।

শ্রীনরেশ্বর কুণ্ডু, প্রধান শিক্ষক,
বাঁকদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়
পোঃ গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া।

৫। গ্রাম ঃ লটিয়াবনি। ৩০।২,৭৯২.২৮।২৫৭।১,৬৭৯

(ক) ব্রাহ্মণ, সৎচাষী, খয়রা, নাপিত, বেনে, কলু, শুঁড়ি, কামার ও সাঁওতাল।

গ্রামে দশটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, কলুপাড়া, কামারপাড়া, নাপিতপাড়া, খয়রাপাড়া, সাঁওতালপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রাণীগঞ্জ। বাঁকুড়া-রাণীগঞ্জ রোডে মোটরবাসযোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষ মাসে ভৈরব পূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব ও বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) ভৈরবপূজার মেলা। পৌষ মাসে সাতদিনব্যাপী।

বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) লটিয়াবনি বেশ বড় গ্রাম; প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে সীমান্তবর্তী শালডাঙ্গা গ্রামটি লটিয়াবনি গ্রামের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল এবং বর্তমানে ইহা লটিয়াবনির অন্তর্গত।

শ্রীশ্যামশঙ্কর মাঝি, প্রধান শিক্ষক,
ও
শ্রীঅশ্বিনী কুমার হাজরা, শিক্ষক,
লটিয়াবনি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া।

৬। গ্রাম ঃ বিশিণ্ডা। ৫৮।৯৭৩.৫৫।২৬২।১,৬৪১

(ক) ব্রাহ্মণ, তাঁতি, কামার, তিলি, কুমার, বাউরী, নাপিত ও চামার।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) বাঁকুড়া ও রাণীগঞ্জ রেলস্টেশন দুইটি গ্রাম হইতে যথাক্রমে প্রায় কুড়ি ও আঠার মাইল দূরে অবস্থিত। এই উভয় স্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে নামিয়া হাঁটা পথে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষ পার্বণ এবং ফাল্গুন মাসে নাচনচণ্ডীদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একটি পাহাড়ে 'নাচনচণ্ডী' দেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে; এই কারণে পাহাড়টিও স্থানীয় অঞ্চলে 'নাচনচণ্ডীর' পাহাড় নামে পরিচিত। চণ্ডীদেবী বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বরী বলিয়া গ্রামবাসীগণের বিশ্বাস। উৎসবকালে মানসিক পূজা দিবার জন্য বহু নরনারীর সমাবেশ হয়।

(ঙ) নাচনচণ্ডী পূজার মেলা। ফাল্গুন মাসে পাঁচদিন-ব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে মনসাদেবীর তিনটি স্থান আছে। উহাদের মধ্যে দুইটি বাউরী সম্প্রদায়ের এবং একটি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মনসা।

শ্রীশশাঙ্ক শেখর গোস্বামী, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বিশিণ্ডা,
বাঁকুড়া।

৭। গ্রাম : বেলবনি (মৌজাঃ বালিখুন)।
৬৩।৮-২৩.০০।৩৯।২৭৪

(ক) সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও জনমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ঝাঁন্টিপাহাড়ী। গ্রামে যাতায়াতের জন্য টেষ্ট রিলিফের রাস্তা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ১লা মাঘ তারিখে স্থানীয় সাঁওতাল সম্প্রদায় 'নাগরদোলা' নামে একটি উৎসব পালন করিয়া থাকেন। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং উৎসব উপলক্ষে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত একটি শিলাখণ্ডকে দেবীজ্ঞানে পূজাদি করা হয়। সাঁওতাল সম্প্রদায় হইতে কোন ব্যক্তি সারাদিন উপবাসী থাকিয়া পূজাদি করেন এবং অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে তাঁহাকে ফুটন্ত ঘি হইতে গুড়ের তৈয়ারী একপ্রকার পিঠা হাত দিয়া ছাঁকিয়া তুলিতে হয়। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন হাজার নরনারী উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন।

(ঙ) নাগরদোলার মেলা। পয়লা মাঘ একদিন। ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন মেলা বলিয়া জানা যায়।

(চ) গ্রামে প্রায় এক বিঘা জমি ব্যাপিয়া সাঁওতাল সম্প্রদায়ের পূজাদির জন্য একটি নির্দিষ্ট মাঠ আছে।

শ্রীনিয়তি কুমার চক্রবর্তী, শিক্ষক
বেলবনি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বিশিণ্ডা, বাঁকুড়া।

৮। গ্রাম : নূতন গ্রাম। ৭১।৩৪২.৭৪।১০৪।৫৮১

(ক) ব্রাহ্মণ, ময়রা, শুঁড়ি, নাপিত, কলু গোয়ালা ও বাউরী। ব্রাহ্মণপাড়া, নাপিতপাড়া, বাউরীপাড়া প্রভৃতি নামে গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, দিনমজুরী ও শিল্পকর্ম।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে ছাতনা রেলষ্টেশন এবং এক মাইল দূরে মোটরবাস স্ট্যাণ্ড চাঁদড়া।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসবটি প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন এবং ২৯শে চৈত্র হইতে শুরু হইয়া তিনদিন স্থায়ী হয়। উৎসব উপলক্ষে ভক্তব্রত পালন, দণ্ডীখাটা, সংনাচ, যাত্রাভিনয় ও সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মানত স্বরূপ কেহ কেহ পাঁঠা বলিও দিয়া থাকেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি সুপ্রাচীন মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মূর্তির প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির গাত্রে অপূর্ব সুন্দর পোড়ামাটির শিল্পকর্ম দর্শকের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লক্ষ্মীনারায়ণজীউর নিত্যপূজা হয়। ইহা ব্যতীত গ্রামে একটি দুর্গামণ্ডপ, 'পাতাল ফোঁড়া' শিব, দুইটি পঞ্চানন্দ ও দুইটি মনসার স্থান আছে।

শ্রীবংশীধর চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক,
ও
শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক,
নূতন গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ চাঁদড়া, বাঁকুড়া।

৯। গ্রাম : মেটাালা (মৌজাঃ কেশিয়াড়া)।
৮১।৪৪৬৯.১৪।৫৮৪।৩,২৪৮

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, নাপিত, জেলে, গোয়ালা, তিলি, ডোম, বাউরী ও পোদ্দার।

গ্রামে চারটি পাড়া আছে। যথা—রায়পাড়া, বামন-পাড়া, বাউরীপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য, দিনমজুরী ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন ছাতনা। গ্রামের প্রায় দুই মাইল দূর দিয়া মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের জন্য জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও পূর্ণিমা তিথিতে রাসযাত্রা উৎসব, ফাল্গুন মাসে দোল-যাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে রামনবমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় গ্রামবাসীগণের মতে উৎসবগুলি ১৬৯০ শকাব্দ হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী এবং রামনবমী উৎসব গ্রামের লক্ষ্মীনারায়ণজীউ মন্দিরেই অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গা পূজাটি ব্যক্তি বিশেষের। রাসযাত্রা উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে দুই-চারিটি খাদ্যদ্রব্যের দোকান বসে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি দুর্গা মন্দির এবং একটি লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর সুপ্রাচীন মন্দির আছে। শেষোক্ত মন্দিরটি ১৬৪০ শকাব্দে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এই মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ষাট ফুট এবং দৈর্ঘে ও প্রস্থে প্রায় চল্লিশ ফুট এবং পাঁচটি চূড়া বিশিষ্ট। গ্রাম হইতে প্রায় অর্ধ মাইল উত্তরে "রামকুটির" নামে একটি আশ্রম আছে।

কথিত আছে যে, বিষ্ণুপুর মহারাজ বর্গীর আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুস্থানী সৈন্য নিয়োগ করেন। এই সময় এই গ্রামের পূর্বতন জমিদার ৺তিলক চন্দ্র সিংহ রায় মহারাজের সৈন্য বিভাগে যোগদান করিয়া মৈনপুর হইতে বাঙ্গলায় আসেন এবং কিছুদিনের মধ্যে সৈন্য বিভাগে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়া সেনাপতি পদে উন্নীত হন। ইহার কিছুকাল পর বিষ্ণুপুর মহারাজ তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম সীমানা সুরক্ষিত করিবার জন্য তাঁহাকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করিয়া এই স্থানে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। অনতিকালের মধ্যেই তিনি স্থানীয় অঞ্চলের জমিদাররূপে মান্য হন। হিন্দুস্থানীগণ উক্ত জমিদারকে মাটিওয়ালা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অর্থাৎ যিনি মাটি বা ভূসম্পত্তির মালিক তিনিই মাটিওয়ালা। পরবর্তীকালে এই 'মাটিওয়ালা' শব্দটি 'মেট্যালা'-য় পরিণত হইয়াছে।

শ্রীভোলা নাথ সিংহ, শিক্ষক,
মেট্যালা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কেশিয়াড়া, বাঁকুড়া

১০। গ্রাম ঃ কেশিয়াড়া। ৮১।৪,৪৬৯'১৪।৫৮৪। ৩,২৪৮

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, তাম্বুলী, কুমার, গন্ধবণিক, তিলি, রজক, গোপ, ডোম, ময়রা ও বাউরী।

ব্রাহ্মণপাড়া, ক্ষত্রিয়পাড়া, বাউরীপাড়া নামে গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া। ভৈরবপুর-ছাতনা রোড গ্রামে যাইবার প্রধান পথ। নিকটবর্তী মোটরস্ট্যাণ্ড অমরকানন।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ২৫শে চৈত্র হইতে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত শিবের গাজন উৎসব পালিত হয়। উৎসবটি প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয় এবং উৎসব উপলক্ষে যথারীতি পূজা, অন্নভোগ বিতরণ ও আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আটদিন-ব্যাপী। ইহা প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দিরে কাশীনাথ নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীসদানন্দ দেঘরিয়া, কৃষিকার্য,
গ্রাম ও পোঃ কেশিয়াড়া, বাঁকুড়া।

১১। গ্রাম ঃ ভক্তাবান্দ। ৮৬।১,২৯৪'০৪।২০১।১,০৮৪

(ক) ব্রাহ্মণ, নাপিত, বেনে, ডোম, বাউরী, ছুতার, বাগ্‌দী, ছত্রি (ক্ষত্রিয়) ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও কুটীরশিল্প।

(গ) গ্রামের দক্ষিণ দিকে প্রায় আট মাইল দূরে ছাতনা রেলস্টেশন অবস্থিত। তাহা ছাড়া বাঁকুড়া হইতে মোটরবাস যোগে বিহারজুড়ি চুচুড়ী মোড় পর্য্যন্ত যাইবার পর প্রায় তিন মাইল হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত রক্ষাকালী বাৎসরিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অমাবস্যার প্রায় পনের দিন পূর্ব হইতে উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয় এবং প্রত্যহ মন্দিরে ঢাক-ঢোল ও সানাই বাজাইয়া দেবীর পূজা আরম্ভ হয়। অমাবস্যার দিন রাত্রিকালে যথারীতি পূজার পর মানতের পাঁঠা বলি হয়। তাহা ছাড়া অনেকে মানত করিয়া দণ্ডী খাটেন এবং অর্থ, অলঙ্কার ও ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া মানত শোধ করেন। উৎসবটি প্রায় চৌষট্টি বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে আশপাশের গ্রাম হইতে লোকজন আসিয়া থাকেন। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বট্টব্যাল পদবীধারী ব্রাহ্মণ দেবীর পূজাদি করিয়া থাকেন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় চৌষট্টি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রক্ষাকালীর একটি মন্দির ছাড়া তিনটি মনসা এবং একটি শিবস্থান আছে।

এই গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি বাঁধ আছে। স্থানীয় জনৈক শিবভক্ত ব্যক্তি এই বাঁধের জলে নিমজ্জিত শিবলিঙ্গ আবিস্কার করিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া শোনা যায়। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই গ্রামের নাম "ভক্তাবান্দ" হইয়াছে।

শ্রীভবতোষ বট্টব্যাল, প্রধান শিক্ষক,
বন আশুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়,
গ্রাম: ভক্তাবান্দ,
পোঃ কেশিয়াড়া, বাঁকুড়া।

১২। গ্রামঃ নবগ্রাম। ১১৩।১,৩৬৫·৮৯।১৮৬।১,০৪৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কুমার, নাপিত, কলু, তাঁতী, গোয়ালা, ক্ষত্রিয়, লোহার, কায়স্থ, গন্ধবণিক, শুঁড়ি, বাউরী, মুচি ও সাঁওতাল।

গ্রামে গোয়ালাপাড়া, ক্ষত্রিয়পাড়া, শুঁড়িপাড়া, বাউরীপাড়া, সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় নয় মাইল দূরে বেনেতোড় রেলস্টেশন অবস্থিত। গঙ্গাজলঘাটি-ফুলবেড়ে রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়। তাহা ছাড়া, বাঁকুড়া-দুর্গাপুর, বাঁকুড়া-জগন্নাথপুর, বাঁকুড়া-রাঙ্গামাটি প্রভৃতি রুটের মোটরবাসগুলি এই গ্রামের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গন্ধেশ্বরী পূজা ও শিবের গাজন উৎসব এবং তৎসহ ভৈরব ও পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পূজা, শ্রাবণ মাসে ও ভাদ্র মাসে গ্রামের দুইটি স্থানে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে একটি প্রতিমায় ও তিনটি ঘটে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা, পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষ পার্বণ এবং মকর সংক্রান্তিতে টুসু উৎসব, পয়লা মাঘ "এখান শিকার" নামে একটি উৎসব (আহেরিয়া উৎসবের অনুকরণে) এবং মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শিবের গাজন উপলক্ষে অনেকে ভক্ত ব্রত গ্রহণ এবং মানত করিয়া দণ্ডী-খাটা, ধূনাপোড়ান ইত্যাদি পর্ব পালন করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে উৎসব প্রাঙ্গণে পেশাদারী দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন গ্রামে একটি শেওড়া গাছের নীচে প্রোথিত একটি শিলাখণ্ডকে পঞ্চানন্দ জ্ঞানে এবং একটি প্রাচীন অস্পষ্ট শিলামূর্তিকে ভৈরব ঠাকুর জ্ঞানে চিড়া ও দুধের নৈবেদ্য দিয়া পূজা করা হয়। পঞ্চানন্দ ও ভৈরবের নিকট প্রধানতঃ মাটির হাতী ঘোড়া এবং পাঁঠা বলি মানত জানানো এবং উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ উভয় দেবতার পূজা করেন।

প্রতি বৎসর ধান কাটার সময় পাথরাবুড়ি নামে একটি দেবীর পূজা করা হয়। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণেই পূজা করিয়া থাকেন এবং পূজান্তে সর্বজনীন অন্নভোগ বিতরণ করা হয়।

গ্রামের বাউরী সম্প্রদায় বাঘরায়সিনী, কুঁকড়াসিনী, মোজরাবুড়ি, মহাদানা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। গ্রামে একটি হরিতকী গাছের নীচে রক্ষিত একটি প্রস্তর খণ্ডকে বাঘরায়সিনী দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয়। উল্লিখিত দেবদেবীর নিকট মুরগী বলি দেওয়া হয়। বাঘরায়সিনীদেবীর নিকট পূর্বে শূকর বলি দেওয়া হইত।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি বাংলা ১৩১৬ সনে নির্মিত। আদিতে

একটি উন্মুক্তস্থানে শিবলিঙ্গের পূজা হইত, পরে সেইস্থানে একটি মাটির ঘর নির্মাণ করা হয়। ঐ ঘর জীর্ণ হইয়া পড়িলে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়।

পাশাপাশি অবস্থিত ভৈরবপুর, নবগ্রাম ও গোপালপুর নামে তিনটি ক্ষুদ্র গ্রাম সংযুক্ত হইয়া বর্তমানে নবগ্রাম নামে পরিচিত হইয়াছে। জনশ্রুতি আছে পূর্বে এইস্থানে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামছিল। উড়িষ্যা হইতে কালাপাহাড় এই অঞ্চল দিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছেন শুনিয়া গ্রামবাসীগণ আতঙ্কে ও ভয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। এখনও গ্রামের নানাস্থানে প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীভূতনাথ ভট্টাচার্য, শিক্ষক,
গ্রাম : নবগ্রাম,
পোঃ কাপিষ্টা, বাঁকুড়া।

১৩। গ্রাম : পীড়রাবনি।১৪৯।৭১২·২২।২৫৮।১,২৪৩

(ক) ব্রাহ্মণ, গোস্বামী, মাহিষ্য, মহান্ত, নাপিত, কামার, কুমার, ছুতার, ডোম, মুচি, শুঁড়ি, কলু ও পোদ্দার।

ব্রাহ্মণপাড়া, পোদ্দারপাড়া, মণ্ডলপাড়া, দাসপাড়া, শীটপাড়া, ভুইপাড়া, ডোমপাড়া, কলুপাড়া, শুঁড়িপাড়া, বাউরীপাড়া, ও মেলাপাড়া নামে গ্রামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন এবং মোটরবাস ষ্ট্যাণ্ড বেলবনি। একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ সংক্রান্তিতে স্থানীয় বেনিয়া সম্প্রদায়ের গন্ধেশ্বরী পূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে দশহরার স্নান ও মনসা পূজা, আষাঢ় মাসে চব্বিশপ্রহরব্যাপী মহোৎসব, ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব, ভাদ্রসংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পূজা এবং ৩০শে ভাদ্র ও ১লা আশ্বিন এই দুইদিন মনসা পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, (একটি ব্যক্তি বিশেষের ও একটি সর্বজনীন) কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব, পূর্ণিমায় রাস উৎসব এবং কার্তিক সংক্রান্তিতে কার্তিকপূজা, পৌষ মাসে পৌষ পার্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত ইং ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ইহাদের মধ্যে গাজন উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের এবং বিশ্বকর্মা পূজাটি মাত্র পনের-ষোল বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, অন্যান্য উৎসবগুলি মোটামুটি ভাবে প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন বলা যায়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে নদীতে স্নান ও তদুপলক্ষে মনসা পূজা করা হয়। অবশ্য মনসার কোন মূর্তি নির্মাণ করা হয় না। তবে ভাদ্র সংক্রান্তিতিথিতে গ্রামের তেঁতুলিয়া ডাঙ্গা নামক একটি নির্দিষ্ট স্থানে মনসার মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজা, হোম, ব্রাহ্মণ ভোজন, সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ, মনসামঙ্গল গান এবং পরের দিন শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। মনসার নিকট পাঠা, ইক্ষু, শশা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয় এবং ষোড়শোপচারে পূজা, শাঁখা, সিন্দুর, নোয়া প্রভৃতি মানত জানান হয়। প্রতি গৃহেই গোবরের বেড়ি দিয়া তুলসীমঞ্চে মনসাপূজা করা হয় এবং কলেকড়া নামক একপ্রকার ফল বলি দিয়া উহার টুকরা প্রত্যেকেই খাইয়া থাকেন।

প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে গ্রামে বিষ্ণুমন্দিরে জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের সর্বসাধারণই উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবের দিন ভক্তরা সারাদিন উপবাস থাকিয়া দিবাশেষে বনভ্রমণে বাহির হন এবং সন্ধ্যায় স্নান সারিয়া মন্দিরে আসিয়া যথারীতি পূজাপাঠ করেন। পরের দিন নন্দোৎসব উপলক্ষে গ্রামের মন্দিরে মন্দিরে ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন গাহিয়া থাকেন এবং দধি ও হরিদ্রা মিশ্রিত করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে ছড়ান।

কোজাগরী পূর্ণিমায় গ্রামের চারিটি স্থলে সাধারণের ব্যয়ে চারটি প্রতিমা নির্মাণ করিয়া এবং গৃহস্থরা গৃহে গৃহে ঘট স্থাপন করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীপূজার দিন ভক্তদের চিড়া, নারিকেল ভক্ষন, অক্ষক্রীড়া ও রাত্রি জাগরণ করিবার রীতি আছে। উৎসব উপলক্ষে কোন কোন বৎসর যাত্রাভিনয় ও বাউল গানের আয়োজন করা হয়। ইহা ভিন্ন চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষে

কোন বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করা হয়। কার্তিক পূর্ণিমায় রাধারানী, রাধারমণ বিগ্রহ ও দধিবামন নামে খ্যাত শালগ্রাম শিলাকে রাসমঞ্চে স্থাপন করিয়া তিনদিনব্যাপী কীর্তনগান ও সাড়ম্বরে রাসযাত্রা উৎসব পালন করা হয়। উৎসবটি ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক পরিচালিত হইলেও সর্বসাধারণ ইহাতে যোগদান করিয়া থাকেন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র-বৈশাখে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একচূড়া বিশিষ্ট একটি পাকা মন্দিরে চন্দ্রশেখর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ, একটি শিবমণ্ডপ, দধিবামন (শালগ্রাম শিলা) রাধারানী ও রাধারমণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত মন্দির, রাসমঞ্চ, বিষ্ণুমন্দির ব্যতীত রঘুনাথ, দামোদর বিগ্রহ এবং শিবমন্দিরের পাশে পঞ্চানন্দের স্থান ও গ্রামের উত্তর প্রান্তে একটি পুষ্করিণীর পাড়ে বৃক্ষের নীচে ভৈরবের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

পূর্বে এইস্থানে বহু পিড়রা নামক এক জাতীয় বন্য বৃক্ষ ছিল; যাহার কিছু কিছু আজিও দেখা যায়। সম্ভবতঃ সেই কারণে গ্রামের নাম "পীড়রাবনি" হইয়াছে।

শ্রীকরালী চরণ দেবশর্মা, প্রধান শিক্ষক,
পীড়রাবনি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ছাতার কানালী, বাঁকুড়া।

১৪। গ্রাম ঃ ভট্টপাড়া (মৌজাঃ রণীয়াড়া)।
১৬৪।৫৪৩।৮৮।৮৭।৪৩৭

(ক) ব্রাহ্মণ, ছত্রী, নাপিত, মালাকার, বাউরী, লোহার, কোটাল, ডোম ও মুচি।

মল্লপাড়া, মালীপাড়া, নাপিতপাড়া, হাজরাপাড়া প্রভৃতি নামে গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী, কুটিরশিল্প ও মৎস্য ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বেলিয়াতোড় হইতে হাঁটিয়া অথবা দুর্গাপুর রোড দিয়া মোটরবাসে মেটেপাড়ায় নামিয়া সেথান হইতে প্রায় এক মাইল হাঁটিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে মদনমোহন ঠাকুরের পৌষালী উৎসব। উৎসবটি বীরভূমের কেন্দুলী উৎসবের ন্যায় খ্যাতি আছে এবং ইহা প্রায় তিন শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মদনমোহনঠাকুরের পৌষালী উৎসব উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মদনমোহনঠাকুরের একটি প্রস্তর নির্মিত মন্দির এবং ত্রৈলক্যতারিণী, ধর্মরাজ ও মনসার মূর্তি আছে। ত্রৈলক্যতারিণী দেবীর প্রস্তর মূর্তিটির নাসিকাগ্র ভগ্ন। এই কারণে ইনি স্থানীয় অঞ্চলে খাঁদারানী বলিয়া পরিচিত। অনুমান করা হয় বর্গীর হাঙ্গামাকালে মূর্তিটি ঐরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

কথিত আছে মোগল শাসকের অত্যাচারে ভীত হইয়া মধ্যপ্রদেশ নিবাসী শীতলমল্ল নামে জনৈক ভূস্বামী প্রায় বারো হাজার সৈন্য সামন্ত লইয়া এই স্থানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। তিনি দুধ কোড়র নামে খ্যাত এক জাগ্রত মদনমোহন বিগ্রহও সঙ্গে আনেন। বারো হাজার সৈন্যের বসবাস ছিল বলিয়া এই অঞ্চলটি বার হাজারী পরগণা নামে পরিচিত হয়। উক্ত ভূস্বামী বর্গীর অত্যাচার হইতে স্থানীয় জনসাধারণকে রক্ষা করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়াও শোনা যায়। গ্রামে সুন্দর কারুকার্যখচিত কয়েকটি প্রস্তর নির্মিত প্রাচীন মন্দির এবং 'রাজগুরু' ও 'চকচকে' নামে দুইটি প্রাচীন পুষ্করিণী উক্ত ভূস্বামীর কীর্তির বলিয়া অনুমান করা হয়।

এই স্থানে উক্ত সৈন্য শিবির থাকায় ইহা রণ-আড্ডা নামে পরিচয় হয় এবং রণ আড্ডা—রণ আড়া—রনড়্ড়া—রণেড়া এবং পরিশেষে রণীয়াড়া নামে খ্যাত হয় বলিয়া অনুমান করা হয়।

শ্রীরথেন্দ্র মোহন ঘোষ, গ্রামসেবক,
ও
শ্রীরামামৃত ভট্টাচার্য, প্রধান শিক্ষক
ভট্টপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ঃ ভট্টপাড়া,
পোঃ বেলিয়াতোড়া, বাঁকুড়া।

গঙ্গাজলঘাটি থানার তপবন আশ্রম সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

বাঁকুড়া শহর হইতে পীচ ঢালা যে পাকা রাস্তাটি গঙ্গাজলঘাটির অভিমুখে গিয়াছে তাহার পাশে কোঁড় ও কাপিষ্টা মৌজার সীমান্তে দাঁড়াইয়াছে কোঁড় পাহাড়। বাঁকুড়া শহর হইতে কোঁড় পাহাড়ের দূরত্ব প্রায় তের মাইল এবং বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর শহর হইতে প্রায় পঁচিশ মাইল। এই উভয় শহর হইতে মোটরবাসে এই স্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়। পাহাড়াটি উত্তর দিকে সম্পূর্ণ খাড়াভাবে প্রায় ৪০০ ফুট উঠিয়া ক্রমেই দক্ষিণদিকে ঢালু হইয়া ধীরে ধীরে প্রায় ৩০০ ফুট নামিয়া গিয়াছে। উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত এই পাহাড়টি দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ ফুট। ইহার পাদদেশ দিয়া একটি ক্ষীণকায় জলস্রোত প্রবাহিত। ১৩২৯ সনের কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত ইহা জনমানবহীন আগাছা পরিপূর্ণ একটি নেড়া পাহাড়রূপে পরিচিত ছিল। স্থানীয় সর্দারগণ পাহাড়টির স্বত্বাধিকারী ছিলেন। অদূরে মাত্র এক মাইলের মধ্যে অমরকানন গ্রাম। যাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করিয়াছিলেন।—

এর দক্ষিণে শালি নদী কুল কুল বয়
কুলে তার শালি তরু ফুলে ফুল ময়,
প্রহরী মোদের ভাই পুরবী পাহাড়,
শুশুনিয়া আগুলিয়া পশ্চিমী দ্বার,
ওড়ে উত্তরে উত্তরী কানন বীথার
দূরে ক্ষণে ক্ষণে হাতছানি দেয় তালিবন—

গঙ্গাজলঘাটি জাতীয় পাঠশালাকে কেন্দ্র করিয়া ১৩৩০ বঙ্গাব্দে মাজরাঙ্গা জঙ্গলে পরিপূর্ণ এইস্থানে স্থানীয় কংগ্রেসী নেতা গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ ও তাঁহার সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল অমরকানন আশ্রম ও বিদ্যালয়। শ্রীসিংহ মহাশয়ের সহকর্মী ও দেশসেবক ৺অমর নাথ চট্টোপাধ্যায়ে নাম অনুসারে এই স্থানটি নামকরণ করা হয় অমরকানন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী এই আশ্রমের অন্তর্গত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের তিরোধানের পর তাঁহার পুণ্য স্মৃতি উদ্দেশ্যে অমরকাননের উক্ত পাঠশালাটি রূপান্তরিত হয় দেশবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়রূপে। এই আশ্রম ও বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া মাজরাঙ্গা জঙ্গলে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম।

স্বদেশী যুগে এই আশ্রম ও বিদ্যালয়টি ইংরাজ শাসকের কোপানল হইতে অব্যাহতি পায় নাই। কারণ সরকারী রেকর্ডে আছে—"Amarkanan is a hot bed of revolution." সে আর এক ইতিহাস। সে সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলাই বোধহয় যথেষ্ট হইবে যে, এই আশ্রমে মহাত্মা গান্ধী, কবি নজরুল ইসলাম, নেতাজী সুভাসচন্দ্র, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু দেশ বরেণ্য নেতা পদার্পণ করিয়াছেন।

বর্তমানে ফল ও ফুলগাছে শোভিত প্রায় ২০ বিঘা জমি জুড়িয়া অমরকানন আশ্রম অবস্থিত। আশ্রমের এলাকার মধ্যে একটি সমতল ছাদ বিশিষ্ট পাকা ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি স্থাপিত আছে। এই মন্দিরে যথারীতি নিত্য ভোগপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর ধূমধামের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব পালন করা হয়। উৎসবে প্রায় আট দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং রাত্রিকালে বাউলগান, কবিগান ইত্যাদির আসর বসে। ইহা ছাড়া জন্মাষ্টমী ও সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

কোঁড় পাহাড়ের কথা এবার আসা যাক। বাংলা ১৩২৯ সনের কিছুকাল আগেকার কথা হুগলী জেলার উত্তমাশ্রমের মহিমানন্দজী নামে জনৈক সাধক কোঁড় পাহাড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশে মুগ্ধ হইয়া এই স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করেন এবং তদনুসারে সর্দারদিগের দান গ্রহণ করিয়া এই নির্জন পাহাড়ে কয়েকটি কুড়ে ঘর নির্মাণ করিয়া আশ্রমের সূচনা করেন। স্থানীয় লোক যাহাকে কোঁড় পাহাড় বলিত আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নূতন নামাকরণ হইল তপবন পাহাড়। প্রসঙ্গত উত্তমাশ্রমের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। স্বামী উত্তমানন্দ নামে জনৈক সাধক বাংলা ১৩১৮ সনে হুগলী

জেলার ডুমুরদহে উত্তমাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমের শাখারূপে পরে মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই গ্রামে ধ্রুবমন্দির এবং হুগলী জেলার মগরায় করুণাময়ী সিদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহারা শঙ্করাচার্যের দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত গিরি সম্প্রদায়। বাংলাদেশের নানাস্থানে ইঁহাদের শিষ্য-সেবক আছেন।

বাংলা ১৩২৯ সনে এক দারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগে তপবন আশ্রমের ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সেই সময় উত্তমাশ্রমের স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী তপবন আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন একটি কিশোরী পাহাড়ের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তিনি ঐ কিশোরীকে ধরিবার জন্য সারা পাহাড়ে ছোটাছুটি করিয়া অবশেষে পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ধরা পড়িয়া উক্ত কিশোরী বিজ্ঞানানন্দজীকে বলিলেন—ওরে আমায় ছেড়ে দে আমি এখানেই থাকব। এই স্বপ্ন দর্শনের পর বিজ্ঞানানন্দজী তপবন আশ্রমে মাতৃ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া মনস্থির করেন।

ইহার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। বাংলা ১৩৬০ সনে বিজ্ঞানানন্দজী তপবন আশ্রমের আচার্য পদে অভিষিক্ত হইয়া বাঁকুড়ায় আসেন এবং আশ্রম সংস্কার করান। বাংলা ১৩৬১ সনে স্বপ্নদর্শন অনুযায়ী কাশীধাম হইতে শ্বেত প্রস্তর নির্মিত সিংহবাহিনী অষ্টভুজা মূর্তি নির্মাণ করাইয়া আনা হয় এবং ১৭ই ভাদ্র তারিখে আশ্রমে এই মাতৃ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইনি পার্বতীদেবী নামে খ্যাত। ১৩৬৩ সনে তপবন পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় স্থপতি শ্রীকৃষ্ণপদ মিত্র মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে একটি মন্দির নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয় এবং ১৩৬৭ সনের শিবচতুর্দশী তিথিতে উক্ত নব নির্মিত মন্দিরে সমারোহের সহিত পার্বতীদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে প্রায় চল্লিশ হাজার নরনারী যোগদান করেন।

পার্বতী দেবীর মন্দিরটি ইষ্টক নির্মিত এবং পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট। ইহার চারিপাশ ঘিরিয়া বারান্দা আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে একটি বেদীর উপর প্রায় দেড় ফুট উচ্চ পার্বতীদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বেদীর নীচে একটি তাম্রঘট ও প্রস্তর নির্মিত কামধেনু সহ একটি শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরের মেঝে শ্বেত প্রস্তর মণ্ডিত এবং বাহিরের বারান্দা মোজাইক করা। মন্দিরাভ্যন্তরের দেওয়াল গাত্র মেঝে হইতে প্রায় তিন ফুট পর্যন্ত রঙিন ফুলকাটা উজ্জ্বল টালি দ্বারা শ্রীমণ্ডিত।

মন্দিরের পিছনে একটি নবীন অক্ষয় বটের নীচে দুইটি শিবলিঙ্গ এবং ইহার পাশে একটি ছোট ঘর আছে। আশ্রমবাসী সাধকেরা এই নির্জন ঘরে বসিয়া মৌনব্রতাদি পালন করেন। মন্দির প্রাঙ্গণের চারিদিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্ঠিত। মন্দির নির্মাণ কার্যে অদ্যাবধি প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। পরিকল্পনা মত মন্দির নির্মাণ ও আশ্রম সংস্কার করিতে আরো প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন বলিয়া জানা যায়।

মন্দির হইতে প্রায় তিনশত ফুট নীচে পাহাড়ের কিছু অংশ সমতল করিয়া আশ্রমবাসীদের জন্য কয়েকটি ঘর, ভোগঘর, একটি গ্রন্থাগার এবং পানীয় জলের জন্য একটি ৯৬ ফুট গভীর বৃহৎ ইঁদারা আছে। আশ্রমে বৎসরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। ইহার মধ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বার্ষিক উৎসবই উল্লেখযোগ্য। এইদিন নানাস্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারীর সমাগম হয় এবং সারাদিনব্যাপী যথারীতি পার্বতীদেবীর পূজা, হোম-যজ্ঞ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা হইয়া থাকে। বর্তমান আশ্রমাচার্য অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

উৎসব বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

পীড়রাবনি গ্রামে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রশেখর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মূলত চৈত্র মাসের শেষ দিনই উৎসব পালন করা হয়। তবে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে উৎসবের প্রস্তুতি সুরু হয়। ২৪শে চৈত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গাজনের ঘট স্থাপন করা হয়।

কিংবদন্তী আছে, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে স্থানীয় বেরাদের সার তৈয়ারী করিবার ডোবা হইতে সার তুলিবার কালে একটি প্রস্তর মজুরদের কোদালের আঘাত লাগিয়া রক্তপাত হইতে দেখা যায়। ইহার পরই গ্রামের মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত মণ্ডল পরিবারের জনৈক ব্যক্তির প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, ঐস্থানে মন্দির নির্মাণ করিয়া শিব পূজার আয়োজন করিতে হইবে. তদনুসারে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তদবধি শিবের নিত্যপূজা ও চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উৎসব পালিত হইতেছে।

গাজন উপলক্ষে ২৮শে চৈত্র স্ত্রী-পুরুষ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সন্ন্যাস বা ভক্ত গ্রহণ করা হয়। সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তিরা ক্ষৌরকর্ম সারিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া মন্দিরে আসিয়া হাজির হইলে ধামাতকর্ণী তাঁহাদিগকে শিব গোত্রান্তরিত করিয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য ভক্তদের কুশ ও সূতার গুচ্ছ মালার ন্যায় গলায় পরাইয়া দেন। এইদিন হইতে তাঁহারা শিব ভক্তরূপে পরিচিত হইয়া নানারূপ আচার-অনুষ্ঠানের অধিকার পান এবং গাজন উৎসব চলাকালীন নিষ্ঠার সহিত সংযম পালন করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীরূপে স্বীকৃতিলাভের পর ভক্তরা দেবদেবীর আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য গ্রাম পরিক্রমায় বাহির হইয়া যান এবং গ্রামের বিভিন্ন দেবদেবীর স্থানে প্রণাম জানাইয়া আসেন। প্রতি বৎসর শতাধিক নরনারী সন্ন্যাস বা ভক্ত ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্তদের পরিচালনার জন্য একজন মূল ভক্ত থাকেন। ইঁহাকে ধামাতকর্ণী বলা হয়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ ধামাতকর্ণী হইতে পারেন না।

অপরাহ্ণে গ্রামের সীমান্তে একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে ধামাতকর্ণীকে কাঁধে লইয়া ঢাক-ঢোলের বাজনাসহ নৃত্য করিতে করিতে ভক্তরা মন্দির আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে কাঁধ হইতে নামাইয়া পদধূলি গ্রহণ করেন। ইহাকে 'মহামিলন' পর্ব বলা হয়।

সন্ধ্যার পূর্বে ভক্তগণ ঢাকঢোলসহ বানেশ্বরকে (লৌহ শলকা বিদ্ধ কাঠের পাটাতন) একটি নির্দিষ্ট পুষ্করিণীতে স্নান করাইতে লইয়া যান এবং পাট স্নানের পর মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভক্তরা সারিবদ্ধভাবে শিব মণ্ডপে উপবেশন করেন এবং ধামাতকর্ণী দুই পাশে দুইজন ভক্তের হাত ধরিয়া উপবেশনরত ভক্তদের কাঁধের উপর দিয়া হাঁটিয়া যান। ইহাকে 'জাঙ্গাল' পর্ব বলা হয়।

এই দিন গভীর রাত্রে পুরোহিত কেবলমাত্র পাটভক্ত ও ধামাতকর্ণীকে সঙ্গে লইয়া সকলের অলক্ষ্যে উক্ত পুষ্করিণীর পাড়ে ঘট স্থাপন করিয়া আদ্যশক্তি অর্থাৎ কামিণ্যা পূজা করেন এবং পূজান্তে ঘটটিকে পাটভক্তের মাথায় উপুড় করিয়া বসাইয়া (এমনভাবে বসান হয় যাহাতে ঘটের জল না বাহির হইতে পারে) শিব মন্দিরে আনিয়া স্থাপন করেন। ইহা কামিণ্যা পর্ব এবং মন্দিরে ঘট স্থাপনের পর ঘন্টার ধ্বনি করিয়া সাধারণকে কামিণ্যা উত্থানের কথা ঘোষণা করা হয়। ইহার পর ঢাক-ঢোলের বাদ্যসহ সকল ভক্তগণ গ্রাম প্রদক্ষিণে করিয়া মন্দিরে ফিরিয়া আসেন। এই দিন সারারাত্রিব্যাপী মন্দির প্রাঙ্গণে রামায়ণ গানের আসর বসে।

২৯শে চৈত্র গাজন উপলক্ষে সর্বাপেক্ষা আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এইদিন অপরাহ্ণে বানেশ্বরসহ শিবলিঙ্গকে মাথায় করিয়া ভক্তরা বাজনার তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে উক্ত পুষ্করিণী আসিয়া মিলিত হন এবং এইস্থানে যথারীতি পূজার পর বাণেশ্বর পাটের উপর পাটভক্ত শয়ন করেন এবং ধামাতকর্ণী তাঁহার বুকের উপর দিয়া হাঁটিয়া যান। এই অনুষ্ঠানের পর পাটভক্তকে বাণেশ্বর পাটের উপর শয়ন করাইয়া ঐ অবস্থায় পাটটিকে কাঁধে লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন। এই শোভা-যাত্রার সহিত অন্যান্য ভক্তরাও নানারূপ আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকেন। যেমন, একটি কাঠের পাঠাতনে দুইটি ধারাল অস্ত্র রাখিয়া তাহার উপর দুইজন ভক্ত দাঁড়াইয়া থাকেন এবং অন্যান্য ভক্তরা তাঁহাদের বহন করিরা শোভাযাত্রার অনুসরণ করেন। ইহাকে চৌদাল বলা হয়। ইহা ভিন্ন, গোশকটের উপর কাঠের ফ্রেম তৈয়ারী করিয়া উহাতে ভক্তরা পা উপরদিক ও মাথা নীচের দিকে করিয়া দোল খাইতে থাকেন ; তাঁহাদের মাথার নীচে পাত্রে রক্ষিত আগুন থাকে এবং মাঝে মাঝে অন্যান্য ভক্তরা ঐ অগ্নি কুণ্ডে ধূনা নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ইহাকে হিন্দোল পর্ব বলা হয়। মানতকারী শতাধিক মহিলারা মাথার উপর নূতন মাটির সরা রাখিয়া তাহাতে ধূনা পুড়াইয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ উক্ত পুষ্করিণী হইতে স্নান সারিয়া

গড়াইতে গড়াইতে অথবা দণ্ডী খাটিয়া শোভাযাত্রার অনুসরণ করেন। এই শোভাযাত্রার বহু দর্শকের সমাগম হয়। এইরূপে গ্রাম পরিক্রমা করিয়া ভক্তরা মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহা ভিন্ন, বহুলোক মানত করিয়া শরীরের নানা স্থানে লৌহ শলকা বিদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে শোভাযাত্রার অনুসরণ করিয়া থাকেন। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর লোকজনই শরীরের শলকা বিদ্ধ করেন। এই দিন সারারাত্রিব্যাপী মন্দিরে নীলপূজাদি হইয়া থাকে।

৩০শে চৈত্র অর্থাৎ সংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে সন্ন্যাসব্রতীগণ মন্দির প্রাঙ্গণে জলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়া নগ্ন পায়ে হাঁটিয়া যান এবং অপরাহ্নে গ্রামের 'চড়কডাঙ্গা' নামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে চড়ক গাছ স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসব্রতীরা পাক্ খান। এই অনুষ্ঠানে প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকজনদেরই যোগদান করিতে দেখা যায়। রাত্রিকালে কলিকাতার পেশাদারী দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

উৎসবটি সর্বজনীন এবং ইহাতে আশপাশের গ্রাম হইতে গ্রাম দশ বারো হাজার নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে। দেবোত্তর জমির আয় হইতে এবং সর্বসাধারণের প্রাপ্ত সাহায্যের দ্বারা শিবের নিত্যপূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মদনমোহনজীউর বার্ষিক পূজা বা পৌষালী উৎসব—

রণীয়াড়া গ্রামে শালিনদীর উত্তর তীরে প্রস্তর নির্মিত একটি সুন্দর মন্দিরে মদনমোহনজীউ নামে খ্যাত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথি হইতে সংক্রান্তি তিথি পর্যন্ত সাড়ম্বরে মদনমোহনজীউর বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ।কে পৌষালী উৎসব বলা হয়। আবার স্থানীয় অঞ্চলে ইহা কেন্দুলীর মেলা নামেও পরিচিত।

মদনমোহনজীউ বিশেষ জাগ্রত বিগ্রহ বলিয়া বিশ্বাস। ইহার সম্পর্কে এই অঞ্চলে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। গ্রাম বিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মধ্যপ্রদেশ নিবাসী শীতলমল্ল নামে জনৈক ভূস্বামী 'দুধ কোঙর' নামে এক রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ (বর্তমান মদনমোহনজীউ) আনিয়া এই স্থানে স্থাপন করেন। একদা বিষ্ণুপুর রাজ বীরসিংহের সহিত শীতলমল্লের সংঘর্ষ হয় এবং বীর সিংহ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া দুধ কোঙর বা মদন মোহন বিগ্রহ বিষ্ণুপুরে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি মদনমোহন সারা বৎসর বিষ্ণুপুরেই থাকিতেন। কেবল মাত্র মকর সংক্রান্তি তিথিতে মদনমোহনজীউকে এই গ্রামে আনিয়া সারামাসব্যাপী পূজা ও উৎসব পালন করা হইত। কেহ কেহ বলেন রণীয়াড়া গ্রামে মদনমোহনজীউর মন্দিরটিও শীতলমল্ল কর্তৃক নির্মিত। যদিও মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, ইহা বিষ্ণুপুর রাজ বীর সিংহ কর্তৃক ৯৭৬ মল্লাব্দে নির্মিত। শিলালিপিটি নিম্নরূপ :

যট্পর্বত গ্রহমিতে গত মল্লবর্ষে শ্রীবীরসিংহনৃপতি
প্রবল প্রতাপে শ্রীরাধিকা মদনমোহন তৃপ্তি কামদতে
শিলারচিত মন্দিরাদরে।

আরো শোনা যায় যে, মল্লরাজদের সময় জগন্নাথ হাজরা নামে জনৈক ব্রাহ্মণ মদনমোহনদেবের পুরোহিত ছিলেন। সেইসময়, একবার মদনমোহন জীউ অপহৃত হন। এই অপহরণের জন্য পুরোহিতকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তৎকালীন মল্লরাজ আদেশ দেন যে যদি তিনি তিনদিনের মধ্যে মন্দিরে বিগ্রহ ফিরাইয়া আনিতে না পারেন তবে তাঁহার জীবন দণ্ড দেওয়া হইবে। দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত পুরোহিত ভীত ও কাতর হইয়া মদনমোহনজীউরই শরণাপন্ন হইয়া দিবারাত্র কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার আকুতিতে কাতর হইয়া মদনমোহনজীউ প্রত্যাদেশে জানান যে, তিনি সেনপাহাড়ী হইতে যথাসময়ে মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। কথিত আছে, সেনপাহাড়ীর অভিরাম সেন নামে জনৈক ভক্তের গৃহ হইতে মদনমোহনজীউ পুনরায় মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হন। মদনমোহন বিগ্রহের পদতলে অভিরাম সেন এর নাম খোদিত আছে বলিয়া জানা যায়।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে গদাডিহি গ্রামের ক্ষুদিরাম গোস্বামী প্রাচীন নথিপত্র হইতে জানিতে পারেন যে, মদনমোহনজীউ রণীয়াড়া গ্রামের সর্বসাধারণের বিগ্রহ। তদনুসারে তিনি মদনমোহন বিগ্রহ রণীয়াড়া গ্রামে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বিষ্ণুপুরের রাজ গুরু পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা করেন। অবশেষে কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে মদন-

মোহন বিগ্রহ সর্বসাধারণের বিগ্রহরূপে রণীয়াড়া গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এই গ্রামেই মদনমোহনজীউ প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং নিত্য সেবাপূজা ও বার্ষিক উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে।

পৌষালী উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন যথারীতি পূজা এবং সোয়া-পাঁচ সের চালের অন্নভোগ নিবেদন করা হয়। ইহা ব্যতীত প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র নারায়ণ ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। মকর সংক্রান্তির দিন শালিনদীর উত্তর তীরস্থ মন্দির হইতে মহাসমারোহে মদনমোহন বিগ্রহকে নদীর দক্ষিণ তীরে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় উৎসব ও মেলা শেষ হইলে পুনরায় মন্দিরে আনিয়া স্থাপন করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় সাড়ে তিন হইতে চারশত বৎসরের প্রাচীন। উৎসবে আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের বহু নরনারী যোগদান করেন এবং কিছু কিছু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়।

মহোৎসব

পীড়রাবনি গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের মধ্যে সুবিধামত যে-কোন একটি দিন স্থির করিয়া পাঁচদিন-ব্যাপী সাড়ম্বরে অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে শিবমণ্ডপে রঙিন কাগজ দ্বারা মঞ্চ নির্মাণ করা হয় এবং মঞ্চের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ সহ ষড়ভুজ গৌরাঙ্গদেবের মৃন্ময় মূর্তি স্থাপন করিয়া প্রতিদিন নিয়মিত চারবার পূজাদি হয় ও তাহার সহিত নাম অখণ্ড নাম কীর্তন চলিতে থাকে। আশপাশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রখ্যাত কীর্তনীয়ার দল নামগান করিতে আসেন। ষষ্ঠ দিনে মধ্যাহ্নে ধূলট উৎসবের পর সমবেত কীর্তনীয়ার দল অন্যান্য ভক্তসহ গ্রাম পরিক্রমায় বাহির হন। বৈকালে মহাপ্রভুর ভোগারতির পর উৎসব শেষ হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কিছুকাল পূর্বে পৌরানিক কাহিনী ও সামাজিক ব্যঙ্গ-তামাসা অবলম্বনে নানারূপ মাটির পুতুল নির্মাণ করিয়া কীর্তনীয়া দলের গ্রাম পরিক্রমার রাস্তার দুইধারে সাজাইয়া রাখা হইত।

উৎসবটি সর্বজনীন ও প্রাচীন। উৎসবে আশপাশের গ্রাম হইতে বহু লোকজন যোগদান করেন এবং উৎসব প্রাঙ্গণে ময়রা, মনিহারী, পান-বিড়ি ইত্যাদির কয়েকটি দোকানপাট বসে।

মেলা বিবরণী

আদিবাসী উৎসব উপলক্ষে মেলা
(নাগরদোলা মেলা)

বেলবনি গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নাগরদোলার উৎসব উপলক্ষে সোধন মাঝি নামে জনৈক গ্রামবাসীর পুকুর পাড়ে প্রায় চারি-পাঁচ বিঘা জমির উপর মেলা বসে। ইহা স্থানীয় অঞ্চলে 'নাগরদোলা মেলা' নামে পরিচিত। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রধানতঃ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চারি হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান।

ময়রা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বই-ছবি ইত্যাদির ত্রিশ-পয়ত্রিশটি দোকান বসে এবং দশ-বারোজন ফেরিওয়ালা আসে। ব্যবসায়ীরা স্থানীয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ প্রমোদের জন্য সাঁওতালী নাচ-গান ও খেলা-ধূলার ব্যবস্থা করা হয়।

কালীপূজার মেলা

ভক্তাবান্দ গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রক্ষাকালী পূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তিনদিন-ব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চৌষট্টি বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং ময়রা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, পান-বিড়ি ইত্যাদির প্রায় কুড়িটি দোকানপাট বসে।

মেলা উপলক্ষে যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়।

বাঁকুড়া চক্‌বাজার ও কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রার দল আসে।

চড়ক-গাজন ও নীলপূজার মেলা

কেশিয়াড়া গ্রামে শিবের গাজন উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আটদিনব্যাপী শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় পাঁচ বিঘা জমিতে একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারী যাত্রীর সংখ্যা অধিক। অধিকাংশ যাত্রীই পদব্রজে মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ গঙ্গাজলঘাটি, রানীগঞ্জ, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, তেলেভাজা ও মাটির হাঁড়ি-কলসী, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির পঞ্চাশ ষাটটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীনিমাই চন্দ্র সিং। ইহা ভিন্ন, ভিন্ন গ্রাম হইতেও যাত্রাদল আসে।

পীড়রাবনি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তি হইতে চারিদিনব্যাপী শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে গ্রামের একটি পুষ্করিণীর পাড়ে ও তৎসংলগ্ন ফাঁকা মাঠে মেলাটি বসে। উক্ত জমির কিয়দংশ দেবোত্তর এবং কিয়দংশ গ্রামবাসীর। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন মেলা।

পীড়রাবনি, কাপিস্টা, নড়রা, বেলিয়াতোড় প্রভৃতি ইউনিয়ন এবং বাঁকুড়া, কেঞ্জাকুড়া, মেজিয়া, বড়জোড়া প্রভৃতি থানার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় দশ-বার হাজার নরনারীর মেলায় সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান।

স্থানীয় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ছাড়া শালতোড়া, তেঁতুলডাঙ্গা, বেলিয়াতোড়, কাঙগাল, সামন্তমারা প্রভৃতি স্থান হইতে বিভিন্ন পণ্যাদি লইয়া বিক্রেতাগণ আসেন। মেলায় প্রায় ষাট-পয়ষট্টি দোকানপাট ব্যতীত প্রায় পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালা আসেন। উহাদের মধ্যে ময়রা, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়ের দোকানই উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া, বই-ছবি, মাটির হাড়ি কুঁড়ি, খেলনা, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, কাঠের তৈয়ারী খেলনা ও আসবাবপত্র প্রভৃতি দেকানপাটও বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ প্রমোদের জন্য রামায়ণগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রাদল সাধারণতঃ মেদিনীপুর এবং কলিকাতা হইতে আসে। তাহা ছাড়া, কোন কোন বৎসর নাগরদোলা আসে।

চণ্ডীপূজার মেলা

বিশিণ্ডা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একটি পাহাড়ের উপর চণ্ডীদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবী বিশেষ জাগ্রতা বলিয়া গ্রামবাসীদের বিশ্বাস। প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় বহু ভক্ত দেবীর পূজা দিবার জন্য এবং মানত আদায় করিবার জন্য পাহাড়ে আরোহন করেন। গত আট বৎসর যাবত পাহাড়ের পাদদেশে পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসিতেছে।

লছমনপুর, গঙ্গাজলঘাটি, শালতোড়া, ছাতনা, মেজিয়া প্রভৃতি ইউনিয়নসমূহ হইতে হিন্দু ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চার হাজার যাত্রী প্রত্যহ মেলায় আসেন। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। স্থানীয় অঞ্চল ব্যতীত গঙ্গাজলঘাটি, রাণীগঞ্জ, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে ব্যবসায়ীরা আসেন। মেলায় বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট ভিন্ন চার-পাঁচজন ফেরিওয়ালা আসেন। উহাদের মধ্যে ময়রা ও মনিহারী দোকানই উল্লেখযোগ্য। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ প্রমোদের জন্য দুই-তিনটি নাগরদোলা এবং কীর্তনগান ও যাত্রাগান প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। প্রধানতঃ পুরুলিয়ার গোঁসাই ও শালতোড়ার রঙ্গলাল দাসের কীর্ত্তনের দল আসে।

ঝুলনযাত্রার মেলা

হরিব আড়া গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রা উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রায় দুই

বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী মেলা বসে। মেলার জমির কিছু অংশ জেলা স্কুল বোর্ডের এবং কিছু অংশ স্থানীয় গ্রামবাসীর। মেলাটি মাত্র গত পনর বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

স্থানীয় গ্রামবাসী ভিন্ন বড়শাল, লাটিয়াবনি ও নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত অধিকাংশ গ্রামসমূহ হইতে প্রত্যহ গড়ে প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই অধিক।

মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদির কুড়ি-পচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, খেলাধুলা এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। অধিকারী শ্রীদিবাকর দাস। যাত্রানুষ্ঠানে প্রায় দেড় হইতে দুই হাজার নরনারীর সমাবেশ হয়।

বাসন্তীপূজার মেলা

লাটিয়াবনি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় দুই তিন বিঘা জমির উপর চারিদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। প্রায় শতাধিক বৎসরের এই প্রাচীন মেলায় নিত্যানন্দপুর, গঙ্গাজলঘাটি, বড়শাল প্রভৃতি ইউনিয়ন সমূহ হইতে প্রায় দুই-তিন হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। খাবার, মনিহারী, খেলনা-পুতুল, চা-পান-বিড়ি ইত্যাদির প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ প্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে। ইহা ভিন্ন, কীর্তন, রামায়ণগান ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। কেহ কেহ মেলায় জুয়া খেলিয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: লাটিয়াবনি গ্রামে পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত ভৈরব পূজার মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

মদনমোহনজীউর পৌষালী উৎসবের মেলা

রণীয়াড়া গ্রামে মদনমোহনজীউর বার্ষিক উৎসব অর্থাৎ পৌষালী উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন হইতে চারিদিনব্যাপী শালিনদীর দক্ষিণ তীরে দেবোত্তর প্রায় আট বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি সাড়ে তিন শত হইতে চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম ব্যতীত সোনামুখী, বড়জোড়া, খাড়ারী, বেলিয়াতোড়, কাপিস্টা এমনকি আসানসোল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় আট হাজার নরনারীর সমাগম হয়। ইহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারী যাত্রীর সংখ্যা বেশী। প্রধানতঃ মোটর-বাস এবং গরুর-গাড়ীযোগে যাত্রীরা মেলায় আসেন।

প্রধানতঃ বাঁকুড়া শহর, বেলিয়াতোড়, গঙ্গাজলঘাটি, বিষ্ণুপুর এবং আসানসোল, বর্ধমান, নদীয়া ও কলিকাতা হইতে প্রায় প্রতি বৎসর ব্যবসায়ীরা আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, মাদুর, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, শঙ্খ ও পাথরের তৈয়ারী জিনিসপত্র, বই-ছবি, মাটির খেলনা-পুতুল, কবিরাজী ঔষধপত্র এবং চা-পান-বিড়ি প্রভৃতির শতাধিক দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং কবিগান, কীর্তন ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে। যাত্রাভিনয় প্রত্যক্ষ করিতে প্রায় দুই-তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মনসাপূজার মেলা

লালপুর বড় গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তি হইতে চারদিনব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাতে খাবার, মনিহারী, বই ছবি ইত্যাদির মাত্র দশ-পনেরটি দোকানপাট বসে।

আমোদ প্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। প্রধানতঃ বীরভূম ও বর্ধমান হইতে কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের দল আনা হয়।

মহোৎসবের মেলা

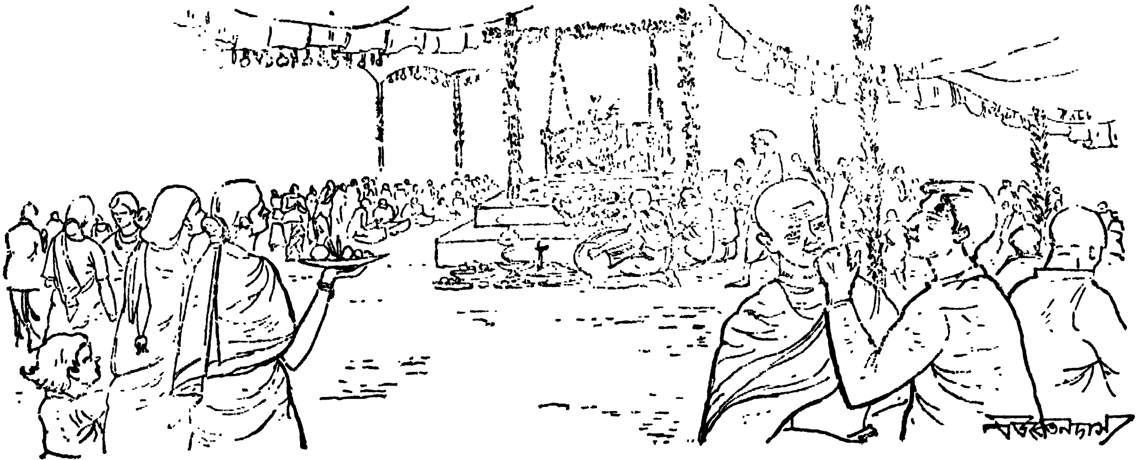
নিত্যানন্দপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরি নাম সংকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে দেবোত্তর

জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। প্রধানতঃ বিকালের দিকেই মেলায় লোকসমাগম হয়। মেলাটি বহু দিনের প্রাচীন। আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে পদব্রজে মেলায় প্রায় চারিশত লোকজন আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন, বই-ছবি, মনিহারী ইত্যাদি দ্রব্যের কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়, তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় যাত্রাদল ব্যতীত কোন কোন বৎসর কলিকাতা হইতে পেশাদারী দল আসে।

বাঁকদাহ গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় চণ্ডীমণ্ডপ সংলগ্ন জমিতে একটি মেলা বসে। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা "বড় মেলা" নামে পরিচিত। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের নিত্যানন্দপুর, কাপিষ্ঠা, গঙ্গাজলঘাটি, সাহারজোড়া, হৃদলপুর, সারাঙ্গপুর, রাধুর বাঈদ, জামগড়ী, নবগ্রাম, লালপুর বড় প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে উৎসব উপলক্ষে প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। ময়রা, মনিহারী, বই-ছবি, পুতুল ইত্যাদির দশ-বারোটি দোকান বসে।



থানা ঃ বড়জোড়া

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ নপাড়া ৩।৯৮৩।৯৬।১৬৬।৮৫৩

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, বাগ্দী, বাউরী, ডোম, জেলে ও তাঁতি। গ্রামে নয়টি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, বৈরাগীপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, তাঁতিপাড়া, বাগ্দীপাড়া, ডোমপাড়া, জেলেপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দুর্গাপুর হইতে কাঁচা রাস্তায় এবং নৌকা পথে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের শুক্লাপক্ষের তৃতীয়া তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চমী তিথি পর্যন্ত সাড়ম্বরে ভৈরব ঠাকুরের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিনেই প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন নরনারী ভক্তব্রত গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিনে ঠাকুরের যথারীতি পূজা ও হোমের পর প্রসাদ বিতরন ও সবর্জনীন ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। মানতকারীগণ মানত হিসাবে টাকা ও গহনা দিয়া থাকেন। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ভৈরব ঠাকুরের গাজন মেলা। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে চারিদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে খড়ের ছাউনীযুক্ত দুর্গামণ্ডপ ব্যতীত একটি শিব, পাঁচটি মনসা এবং একটি পঞ্চানন্দ আছে।

জনশ্রুতি আছে, গ্রামটি নয়টি পাড়া লইয়া গঠিত বলিয়া গ্রামের নাম 'নয় পাড়া' বা নপাড়া হইয়াছে।

শ্রীহীরালাল অগস্ত্য, শিক্ষক,
গ্রাম : মালিয়াপাড়া,
বাঁকুড়া।

২। গ্রাম ঃ মালিয়াড়া। ৫।২,৫৬৭।৯২।১,০৪৬।৫,৮৮৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কনৌজ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বাগ্দী, ময়রা, বাউরী, জেলে, কামার, গন্ধবণিক, স্যাকরা, শুঁড়ি, ধোপা, ছুতার, ডোম, মুচি, হাড়ী, গোয়ালা ও বারুই। গ্রামে আঠারোটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, কায়স্থপাড়া, কামারপাড়া, ছুতারপাড়া, বারুইপাড়া, গোয়ালাপাড়া, ধোপাপাড়া, শুঁড়িপাড়া, জেলেপাড়া, স্যাকরাপাড়া, বাগ্দীপাড়া, বাউরীপাড়া, মুচিপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দুর্গাপুর হইতে মোটর বাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গ্রামের দুইস্থানে একযোগে চণ্ডীদেবীর গাজন উৎসব যথাক্রমে বাগ্দী ও জেলে সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। ইহা ব্যতীত, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে দুইদিন-ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামণ্ডপ ও একটি মনসামন্দির ব্যতীত দুইটি শীতলা, কুড়িটি মনসা এবং উনিশটি পঞ্চানন্দের স্থান আছে।

শোনা যায়, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে এই স্থানটি গভীর বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ হিংস্র জীবজন্তুর আবাসস্থল ছিল। এই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা বা আদিবাসিন্দা 'আকুড়্যাগণ' যখন বিষ্ণুপুর রাজার নিকট হইতে এই বন্দোবস্ত লইয়া এই স্থানে বসবাসের জন্য আসেন, সেই সময় বনজঙ্গল পরিষ্কার করিবার সময় তাঁহারা পাষাণময়ী একটি কালীমূর্তি দেখিতে পান। সম্ভবতঃ ইহা কোন ডাকাত দলের আরাধ্য দেবী ছিলেন। পরবর্তীকালে কান্যকুব্জ হইতে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ আসিয়া আকুড়্যাগণকে এইস্থান হইতে তাড়াইয়া আশ পাশের আরও কিছু জমিজমা বিষ্ণুপুর রাজার নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়া এখানে বসবাস শুরু করেন।

তাঁহারাই একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া উক্ত কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার মিত্র, শিক্ষক,
মালিয়াড়া রাসময়ী বালিকা বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ মালিয়াড়া, বাঁকুড়া।
ও
শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
মালিয়াড়া পরীক্ষাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

Maliara—A village in the north of the head-quarters subdivision, situated a few miles south of the Damodar, 5 miles west of Borjora. It contains a charitable dispensary and the residence of one of the leading zemindars of the district.

The family traces its descent back to Deo Adharya, who accompanied Man Singh, the well-known Hindu general of the Emperor Akbar, to Orissa, but instead of returing to his country with Man Singh, setted at Maliara. Having subdued the robbers and dacoits who at that time ravaged the country under the leadership of 12 chieftains ; he cleared away jungle, and brought the land under cultivation. Eventually, he received a settlement of *taluk* Maliara from the Nawab of Murshidabad, together with the title of Raja ; and after his death his descendants continued to hold it on payment of the fixed revenue to the Nawab. According to the family records, the third of the line had a feud with the Raja of Bishnupur, in the couse of which he has treacherously killed after several battles, and his son Gopal Das Adharya was forced to pay revenue to the Raja of Bishnupur. But the Bishnupur Raj family declared that he was killed in open battle, after Bir Singh of Bishnupur had been forced to invade his territory in consequence of his oppression of the people. However, this may be, it appears that his descendants continued to pay revenue to the Rajas of Bishnupur ; and at the time of the decennial settlement, Jai Singh received the settlement of his zemindari at the hands of the British Government.

(District Census Handbook, Bankura, 1951 by A. Mitra, p. lxviii)

৩। গ্রাম : মেট্যালী। ১৩।১,৫৫০·২৬।২৫৮।১,৪৫৮

(ক) ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয়, কামার, কুমার, নাপিত, ছুতার, বেনে, তাঁতি, মাহিষ্য, জেলে, গোয়ালা, বাগদী, বাউরী ও মুচি। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দুর্গাপুর হইতে দুর্গাপুর ব্যারেজ রোড ধরিয়া মোটরবাসে প্রতাপপুর হইয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজ ঠাকুরের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) ধর্মরাজের গাজন উপলক্ষে মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিনব্যাপী। ইহা প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন মেলা বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজ, কালারাজ ও হংসরাজ ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির ভিন্ন দুইটি পঞ্চানন্দ এবং পাঁচটি মনসা আছে।

বলা হয়, গ্রামের মাটি এঁটেলযুক্ত বলিয়া গ্রামের নাম 'এ্যাটেলী, অপভ্রংশে 'মেট্যালী' হইয়াছে।

শ্রীগৌরীশংকর সোম, সভাপতি,
মেট্যালী জনসেবা সঙ্ঘ,
বাঁকুড়া।

৪। গ্রাম : নূতনগ্রাম। ১৪।৯৬৬·০৬।১০৪।৮৯৩

(ক) ব্রাহ্মণ, তিলি, খয়রা, নাপিত, বাউরী, বেনে, গোয়ালা ও ডোম। গ্রামে বাউরীপাড়া, গোয়ালাপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলিয়াতোড় হইতে বিড়রাগামী বাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিনাম সংকীর্তন

মহোৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা এবং কার্তিক পূর্ণিমায় গোপালজীউর বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন।

এই মেলা উপলক্ষে সাঁকসাড়, কান্নাপুর, কোচ-কুন্তন প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রধানতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় শত নরনারীর সমাগম হয় এবং ময়রা, তেলেভাজা, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির কয়েকটি দোকানপাট বসে।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে পিতল নির্মিত গোপাল-জীউর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীকানাই লাল রায়, শিক্ষক,
গ্রাম : সাঁকসাড়া,
পোঃ রামহরিপুর, বাঁকুড়া।

৫। গ্রাম : খাঁড়ারী। ৪০৮৭১৩০৩।২৭০।১,২০৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কামার, কুমার, ডোম, বাগ্দী, বাউরী, ময়রা, মুচি, ধোপা, নাপিত, বেনে, ছুতার, কলু, গোয়ালা ও জেলে। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলিয়াতোড় হইতে হইতে অথবা দুর্গাপুর রেলস্টেশন হইতে দুর্গাপুর ব্যারেজ রোড দিয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজের গাজন, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে বুড়া শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিব ও ধর্মরাজের গাজন উৎসব প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। বৈশাখ মাসে দশদিনব্যাপী।

ধর্মরাজের গাজন মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিন-দিনব্যাপী।

শিবের গাজন মেলা। চৈত্র মাসে পাঁচদিন-ব্যাপী। শেষোক্ত মেলা দুইটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মধ্যস্থলে একটি মন্দিরে শ্বেত প্রস্তর নির্মিত একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত গ্রামে পাঁচটি মনসামন্দির আছে।

কিংবদন্তী আছে, আদিতে এই গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে জনৈক কালীর সাধক নির্জনে তাঁহার সাধন-ভজন করিতেন। কিন্তু কিছু দুষ্কৃতিকারী অহিন্দু প্রায়ই তাঁহার সাধন-ভজনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিত। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি একদা কালীর খাঁড়া (খড়্গ) লইয়া দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান এবং তাদের সমূলে বিনাশ করেন। এই কারণে নাকি গ্রামের নাম 'খাঁড়ারী' হইয়াছে।

শ্রীমানবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম : খাঁড়ারী, পোঃ মুক্তাতোড়,
বাঁকুড়া।

৬। গ্রাম : বড়জোড়া। ৪৬।১,৭৯০৯৩।৭৬৭।৩,৮০৩

(ক) ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয়, গন্ধবণিক, তাঁতী, স্বর্ণকার কামার, বৈরাগী, গোয়ালা, রজক, শুঁড়ি, জেলে, মাল, বাগ্দী, বাউরী, হাড়ী, ডোম ও মুসলমান। গ্রামটিতে গোয়ালাপাড়া, মালপাড়া, পোদ্দারপাড়া প্রভৃতি নামে আঠারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কুটীরশিল্প, চাকুরি, ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দুর্গাপুর হইতে মোটর-বাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে দুইদিনব্যাপী শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা চৈত্র মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিবলিঙ্গসহ একটি শিবমন্দির ব্যতীত বারোটি মনসা এবং দুইটি পঞ্চানন্দ আছে।

শ্রীঅনাদি নাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
বড়জোড়া প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ বড়জোড়া, বাঁকুড়া।

৭। গ্রাম : কৃষ্ণনগর। ৫২।১,০৯৫০২।৩৩৬।১,৭০১

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, নাপিত, গোয়ালা, গড়াই, ডোম, বাগ্দী ও বাউড়ী। গ্রামে ডোমপাড়া, বাগ্দীপাড়া, গোয়ালাপাড়া, পালপাড়া, ভুঁইপাড়া, বাউড়ীপাড়া প্রভৃতি নামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরি।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দুর্গাপুর হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে তিনদিনব্যাপী রঙ্কিণীদেবীর পূজা ও বারুণী স্নান অনুষ্ঠিত হয়।

শোনাযায়, প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে স্থানীয় ভূস্বামী বদিপাল নামে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া নিকটবর্তী দামোদর নদীর তীরে রঙ্কিণীদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিত্যপূজাদির জন্য কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। তদবধি রঙ্কিণীপূজা ও বারুণী স্নান পর্ব পালন করা হইতেছে। বর্তমানে স্থানীয় গ্রামবাসীদের লইয়া গঠিত একটি পূজা কমিটি কর্তৃক দেবীর বাৎসরিক উৎসব ও পূজাদি হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী রঙ্কিণীদেবীর পূজা, হরিনাম সংকীর্তন ও সর্বসাধারণের মধ্যে দেবীর অন্নভোগ বিতরণ করা হয় এবং অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসেন।

(ঙ) রঙ্কিণীপূজা তথা বারুণীর স্নানের মেলা চৈত্র মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দামোদর নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত রঙ্কিণীদেবী শিলামূর্তি ব্যতীত তিনটি মনসা, একটি ভৈরব, একটি কালী এবং একটি দুর্গা আছে।

শ্রীগৌর মোহন নায়ক, প্রধান শিক্ষক,
কৃষ্ণনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৮। গ্রাম : তাজপুর। ৫৬।১,৩৭২.৮৯। ৮৬।৯০৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, বৈশ্য, সদ্‌গোপ, গন্ধবণিক, সোমণ্ডল, বাগ্দী, বাউরী, ডোম, নাপিত ও মুসলমান। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, বৈশ্যপাড়া, বাউরীপাড়া, বেনেপাড়া, সোমণ্ডলপাড়া, বাগ্দীপাড়া, নাপিতপাড়া, ডোমপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে পনরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দুর্গাপুর। খয়া—বড়জোড়া কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়। বর্ষাকালে দামোদর নদীতে নৌকা করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে চারিটি দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে দশ-এগার দিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং কারুকার্য মণ্ডিত একটি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় গোপালজীউর মন্দির আছে। শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ইহা ব্যতীত, একটি শীতলা, চৌদ্দটি মনসা এবং একটি পঞ্চানন্দ এবং বাঁকুড়ারায় নামে খ্যাত ধর্মরাজ ও কালিরায় নামে দেবতার শিলামূর্তি আছে। শেষোক্ত শিলামূর্তি দুইটিতে বৌদ্ধ শিল্পকলার প্রভাব দেখা যায়।

শ্রীশশাঙ্ক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
তাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পলাশডাঙ্গা, বাঁকুড়া।

৯। নিরিশা। ১১৭।৪১৪.৯৫।১২৭।৬৬৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, ক্ষত্রিয়, মহন্ত, আকুড়্যা, তিলি, ময়রা, গোয়ালা, নাপিত, ছুতার, বাউরী, চামার, ডোম ও মেটে। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, ক্ষত্রিয়পাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, তিলিপাড়া, আকুড়্যাপাড়া, বাউরীপাড়া, চামারপাড়া, মেটেপাড়া প্রভৃতি নামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলিয়াতোড়। ইহা ব্যতীত দুর্গাপুর রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ভুবনেশ্বর নামে খ্যাত শিবের গাজন উৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে গঙ্গাপূজা ও পুণ্যস্নান, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে মহোৎসব, দামোদরচন্দ্রেরপূজা এবং শ্রীধরচন্দ্রেরপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও রাসযাত্রা উৎসব এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা

উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) শিবের গাজনের মেলা। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে দুই তিনদিনব্যাপী।

দশহরার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন।

দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন।

কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে দুই-একদিন।

মেলাগুলি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে প্রস্তর নির্মিত একটি প্রাচীন শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গসহ এবং অপর একটি মন্দিরে 'বড়কালী', 'মেজকালী' ও 'ছোটকালী' নামে পরিচিত তিনটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে একটি মনসা এবং একটি পঞ্চানন্দঠাকুর আছে।

শ্রীগুরুদাস মুখোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক
নিরিশা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।

১০। গ্রাম ঃ নবাসন।১৫০।২০৮·৫২।৪৩।২২২

(ক) কায়স্থ, সদ্‌গোপ, বাউরী, লোহার ও খয়রা। গ্রামটিতে কায়স্থপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, বাউরীপাড়া, লোহারপাড়া ও খয়রাপাড়া নামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বৃন্দাবনপুর হইতে বাঁকুড়া-বর্ধমান রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা, পৌষ মাসে ভৈরবঠাকুরের বাৎসরিক পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ এবং তিনটি মনসা আছে।

শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ বৃন্দাবনপুর, পোঃ ঃ ছান্দার,
বাঁকুড়া

১১। গ্রাম ঃ বৃন্দাবনপুর।১৭৪।২২৫·৪৯।১৪৩।৫৯৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বাউরী, কুমার, ছুতার, সদ্‌গোপ, তাঁতি ও লোহার। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, বাউরীপাড়া, কুমারপাড়া, ছুতারপাড়া, মাঝিপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামে একটি রেলস্টেশন আছে। বাঁকুড়া-বর্ধমান রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ ও একটি মনসা আছে। প্রবাদ আছে, শিবলিঙ্গটি 'ক্ষুদিরায়' নামে পরিচিত।

জনশ্রুতি আছে যে, বহুকাল পূর্বে জনবসতি গড়িয়া উঠিবার পূর্বে এইস্থানে কয়েকটি জলাশয়, উচ্চ ঢিপি এবং বৃক্ষলতাদি দ্বারা সুশোভিত স্থানটি বিশেষ মনোরম পরিবেশ ছিল এবং সেইসময় মাত্র কয়েকটি 'গোপ' পরিবারের বাস ছিল। বৃন্দাবনধামের মদনমোহন-জীউর সেবায়েত পরিবারের জনৈক ব্যক্তি দৈবক্রমে এই গ্রামে আসিয়া উপনীত হন এবং জনৈক গোপ পরিবারে আতিথ্য লাভ করিয়া কিছুকাল বসবাস করেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন প্রাক্কালে কয়েকজন গোপ বালাকে বৃন্দাবনবাসিনী করিবার অভিপ্রায়ে সঙ্গে লইয়া যান এবং নিজের স্মৃতি রক্ষার্থে এই গ্রামের নাম 'বৃন্দাবনপুর' করেন। বিষ্ণুপুররাজ তাঁহার এইরূপ নামকরনে আপত্তি করেন কিন্তু বৃন্দাবনধামের সেবায়েত বিষ্ণুপুর রাজাদের নিকট গ্রামখানি ভিক্ষা স্বরূপ প্রার্থনা করায়, রাজা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং গ্রামখানি 'বৃন্দাবনপুর' নামেই পরিচিত হয়।

শ্রীসত্য কিঙ্কর মালি, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ সাগরকাটা,
পোঃ বেলিয়াতোড়,
বাঁকুড়া।

১২। গ্রাম ঃ গোঁসাইপুর। ১৭৭।৩৩৯·৫৪।৬০।২১৬

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, কুমার, গন্ধবণিক, গোয়ালা, নাপিত, কলু, বাউরী ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া,

নাপিতপাড়া, কলুপাড়া, বাউরীপাড়া, সদ্গোপপাড়া, কুমারপাড়া, গন্ধবণিকপাড়া, গোয়ালপাড়া, সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি নামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বৃন্দাবনপুর হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা ও ঝুলনযাত্রা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও রাধাগোবিন্দজীউর রাসযাত্রা উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে গঙ্গাধর নামে খ্যাত শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সময় চারিদিনব্যাপী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরময়ী ভবানীদেবীর পূজা হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। বৈশাখ মাসে চারিদিন-ব্যাপী।

রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে।

গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে তিনদিনব্যাপী। প্রথমোক্ত মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং রাধাগোবিন্দজীউর দালানযুক্ত রাসমঞ্চ ব্যতীত ভবানী ও ভৈরবের প্রস্তরময় মূর্তি এবং তিনটি পঞ্চানন্দ, দুইটি মনসা, একটি কালী, রাধাগোবিন্দ, গোপাল, দামোদর প্রভৃতি দেবদেবী এবং ভগ্নপ্রায় কয়েকটি প্রাচীন মন্দির আছে।

জনশ্রুতি আছে, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে শুকদেব গোস্বামী নামে জনৈক নিষ্ঠাবান গোস্বামী ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপুর মহারাজের নিকট হইতে এইস্থানে কিছু ভূসম্পত্তি দানসূত্রে পাইয়া পরিবার পরিজনসহ এখানে আসিয়া প্রথমে বসতি স্থাপন করেন এবং ক্রমে আশপাশের অঞ্চল হইতে লোকজন আসিয়া এই স্থানে বসবাস শুরু করে। এইভাবে গ্রামটি গড়িয়া উঠিলে পর "গোস্বামীপুর" নামে পরিচিত হয়। গোস্বামীপুর পরে "গোঁসাইপুর" হইয়াছে।

শ্রীঅনিল বরন নায়েক, প্রধান শিক্ষক,
গোস্বামীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : বেলুট, পোঃ জগন্নাথপুর,
বাঁকুড়া।

১৩। গ্রাম : জগন্নাথপুর। ১৮-১।৮-৭০-২৬।২৪১।১,২৫৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, নাপিত, গন্ধবণিক, মালাকার, কামার, ময়রা, ধীবর, হাড়ী, কলু, ডোম, বাগ্দী, মুচি, বাউরী, পোদ্দার, গোয়ালা ও সৌমণ্ডল। গ্রামটিতে পনরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বৃন্দাবনপুর। মোটর-বাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব এবং রত্নেশ্বরজীউ নামে খ্যাত শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে চারি-পাঁচদিন-ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি সুউচ্চ প্রস্তরনির্মিত শিবমন্দির অভ্যন্তরে গহ্বরের মধ্যে অনাদিলিঙ্গ শিব ও একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। ইহা রত্নেশ্বর শিবেরমন্দির বলিয়া পরিচিত। ইহার সম্মুখভাগে একটি সুগভীর পুষ্করিণী আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক সময় এই মন্দিরটি পরিদর্শন করিয়া ইহাকে প্রায় দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীন মন্দির বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। ইহা ব্যতীত, গ্রামে তিনটি পঞ্চানন্দ, পাঁচটি মনসা, ভৈরব, ধর্মরাজ, শ্রীধর, মহাবীর, বসন্তকুমারী প্রভৃতি দেবদেবী আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক,
ও
শ্রীশক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, তহশীলদার,
গ্রাম ও পোঃ জগন্নাথপুর,
বাঁকুড়া

Jagannathpur—A village in the Borjora police station about five miles south-east of Borjora. There is a large stone temple dedicated to Ratneswar Siva. Local people believe the five faced *Lingam* was not installed by any human being but came up from the earth all by itself. The scholars think that the temple is at least two hundred years old. (p. 49)

Laterite temple of Ratneswar Siva. Apparently remodelled, the lower section extending out no all four sides, above which the shikhara emerges with a second set of mouldings, beyond which it is cut off short and crowned with a Midnapore type *ghanta*. No further decoration. Sunken linga in worship. (p. 157)

(District Census Handbook, Bankura, 1961, by B. Ray)

১৪। গ্রাম : ভৈরবপুর। ১৯১।১৫০'৬৬।৩৯।২১৬

(ক) ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয়, বাগ্দী, বাউরী, ডোম, ময়রা, গোয়ালা ও নাপিত। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, বাউরীপাড়া, ঘোষপাড়া, বাগ্দীপাড়া প্রভৃতি নামে এগারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমুজরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দুর্গাপুর এবং বাসষ্ট্যাণ্ড বড়জোড়া

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে চব্বিশপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসা-পূজা ও ভৈরবপূজা এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

গ্রামে একটি মন্দিরে জরৎকারুমুণি, বেহুলা ও লখিন্দর মূর্তি সহ মনসার শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্রাবণ মাসের পূজায় মানত হিসাবে দেবীর নিকট ছাগ বলি দেওয়া হয়। উৎসবটি ব্যক্তি-বিশেষের হইলেও সর্বসাধারণ ইহাতে যোগদান করিয়া থাকেন।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিন-দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ইষ্টক নির্মিত একটি মনসামন্দির ও একটি ভৈরবমন্দির ব্যতীত পাঁচটি মনসা আছে।

জনশ্রুতি আছে, গ্রামের রায়বংশীয় জনৈক ব্যক্তি নিকটবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ স্থান হইতে একটি শিশুসন্তানকে উদ্ধার করেন এবং সন্তানতুল্য তাহাকে লালনপালন করেন। শিশুটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাহার হাতে একটি পাষাণময় ভৈরবমূর্তি দিয়া যান। খুব সম্ভবতঃ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের নাম 'ভৈরবপুর' হইয়াছে।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বড়জোড়া,
বাঁকুড়া।

Ghut Gerya—A big village in Borjora police station. Blacksmithy and cutlery manufacture are the principal village industries of this place. It has a splendid stone temple about 40 feet in height and biult in Orissan style. There is no deity in the temple at present. The temple is protected by the Archaeological Survey of India. (p. 149)

Comparatively small shrine of laterite and sandstone, quite isolated and abandoned amidst paddy fields. Typical Orissan style with late curvature to the shikhara, surmounted by leaping lions on all four sides and small amlaka with finian. The most interesting feature is the decorated entrance, carved either side and above the archway in style usually associated with terracottas. The subject matter includes musicians, Radha Krishna couples, dikpalas, and Vishnu-anantasayin. The temple is set on a low octagonal base. It may well be no earlier than the 18th century, but is unique of its kind. Similiar sandstone carvings have also been recovered

from a ruined nava-ratna temple in nearby Maliara. (p. 157)

Pakhanna—(Pokharan, Pokharna or Pushkarna) A populous village in Borjora police station. It is said that this village was once the capital city of king Chandravarmana of the 4th century A. D.; to quote Shri K. N. Dikshit (Annual Report of Archaeological Survey of India, 1927-28) —'At a distance of less than 25 miles (40·3 kms) to the north-east of Susunia is an ancient village named Pokharan on the south bank of the river Damodar. It is still a considerably large village and its antiquity is attested by the fact that the houses in several quarters of the village are built on the top of mounds, formed by the ruined heaps of older habitations...In the western extremity of the village, exists a large mound called the 'Rajgarh' strewn over with broken bricks, pottery pieces and other antiquities. Several architectural stones are to be seen in the village...There are several small tanks in the vicinity of a large tank (*pokhar* or *pushkara*) in the west of the village and the name Pokharan or Pushkarana must doubtless be ultimately due to the presence of such a tank in ancient times. It is likely that the place dates back from the early Gupta period and can thus be considered to be the Pushkarana of the Susunia inscription, the capital of king Chandravarman (son of Simhavarman), the extent of whose dominions may have been more or less coterminous with the ancient Radha country of south-west Bengal.'

The recent excavations in this place have yeilded punch-marked coins, cost copper coins, early pottery, beads and terracotta figurines, one of which dancing model *Yaksha* of the first century B. C. The jewellery and the headdress are fashioned of the typical Sunga manner.

About one and a half century ago Raja Ram tanu Ray, a cousin of Raja Rammohan Ray settled here after marrying a daughter of local Mukherjee zamindar family and erected a palace and excavated several fine tanks. (p. 151)

(District Census Handbook, Bankura, 1961 by B. Ray)

[বেলিয়াতোড় গ্রামে ধর্মরাজের গাজন উৎসব ও সাহারজোড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

বেলিয়াতোড়

বড়জোড়া থানার অন্তর্গত বেলিয়াতোড় (মৌজাঃ ১৩০) একটি প্রাচীন এবং বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। দুর্গাপুর-বাঁকুড়া রাস্তার ধারেই গ্রামটি অবস্থিত বলিয়া সর্বদা মোটরবাসে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা আছে। বেলিয়াতোড় বেশ বড় গ্রাম। এই গ্রামের প্রাচীন জমিদার স্থানীয় কায়স্থ রায় পরিবার। ইঁহারা যশোহরের মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশধর বলিয়া কথিত এবং বিষ্ণুপুর রাজের দেওয়ান রূপে এই স্থানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। এই রায় পরিবারেই শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীযামিনী রঞ্জন রায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। রায়দের সমসাময়িক কালে স্থানীয় নিয়োগী পরিবারে লোকজনেরা এই স্থানে আসেন। ইঁহারা বিষ্ণুপুর রাজের দেওয়ান ছিলেন। তবে প্রাচীন বাসিন্দাদের মধ্যে তাম্বুলি সম্প্রদায়ই প্রধান। বলা হয়, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে বর্গীর ভয়ে ইহারা বর্ধমান জেলা হইতে উঠিয়া আসিয়া দামোদর নদীর তীরবর্তী এই স্থানে প্রথম বসতি স্থাপনের জন্য নির্বাচন করেন। বর্তমানে গ্রামটি কায়স্থ প্রধান। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণ, তাম্বুলি, নাপিত, সুবর্ণবণিক, কর্মকার, ছত্রী (ক্ষত্রিয়), শুঁড়ি, কলু (গড়াই), মোদক, লোহার, বাউড়ী, পটিদার (চিত্রকর), ডোম, মুচি, ধোপা. ছুতার, কেওট (ধীবর) ও

বৈষ্ণবদিগের বসবাস আছে। শুনা যায়, বালি পরিপূর্ণ এই স্থানটি একদা বালি অপসরণ করিয়া বসতি স্থাপিত হয় বলিয়া গ্রামটি বালিয়াতোড় বা বেলিয়াতোড় নামে পরিচিত হয়। গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে এই জনশ্রুতি কতদূর সত্য সেকথা সঠিকভাবে বলা না গেলেও এই গ্রামের মাটিতে মিহি সাদা বালুকার ভাগ যে কিঞ্চিৎ বেশী তাহা স্বচক্ষেই দেখা যায়। চাকুরী, ব্যবসায় ও কৃষিকার্যই গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা।

বেলিয়াতোড় গ্রামের উৎসব পার্বণাদির মধ্যে ধর্মরাজের গাজনই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঁকুড়া জেলায় যে-কয়টি গ্রামে অদ্যাপি ধুমধামের সহিত ধর্মরাজের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বেলিয়াতোড়ের ধর্মরাজের গাজন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বিশেষ করিয়া ধর্মরাজের গাজনে আচরনীয় বিভিন্ন রীতিনীতি, যাহা নানা কারণে বর্তমানকালে দ্রুত অবলুপ্ত হইতেছে, বেলিয়াতোড় গ্রামে ধর্মরাজের গাজন উপলক্ষে তাহা প্রায় অবিকলভাবেই পালন করিতে দেখা যায়। ব্রতধারী গাজন সন্ন্যাসীরা কৃচ্ছ সাধনের নিমিত্তে যেরূপ নির্মম ক্লেশ স্বীকার ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন তাহা অন্যত্র এতো নিখুঁতভাবে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গে ধর্মরাজের গাজন সম্পর্কে অনুসন্ধানকারী গবেষকগণ বেলিয়াতোড়ের গাজন প্রত্যক্ষ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই কারণে ইহার প্রতিদিনকার পূজাদির খুঁটিনাটি ধারাবাহিক বিবরণ বা উৎসবের বহিরাঙ্গের আড়ম্বর অপেক্ষা কয়েকটি বিশেষ আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইল।

বেলিয়াতোড় গ্রামে ধর্মরাজের গাজনের উৎসবের প্রচলন সম্পর্কে শুনা যায় যে, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে স্থানীয় তাম্বুলী পরিবারের জনৈক ব্যক্তি (বর্তমান শ্রীপ্রহ্লাদ পাল মহাশয়ের পিতামহ) নিকটবর্তী দামোদর নদীর তীর হইতে একটি গোলাকৃতি পাথর কুড়াইয়া পান। তিনি ঐ পাথরটিকে ব্যবসায়ে ওজন কার্যে ব্যবহার করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু তিনি অচিরেই ঐ পাথরটির এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, দাঁড়ি-পাল্লায় যে-পরিমাণের মাল দেওয়া হউক না কেন উহা ঐ পাথরের ওজনের সমতুল্য হয়। কৌতূহলবশতঃ তিনি পাথরটিকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বাড়ীতে পূজার জন্য গচ্ছিত রাখেন। উক্ত পুরোহিত এক স্বপ্নাদেশে জানিতে পারেন যে, ঐ শিলা সামান্য শিলা মাত্র নহে—উহা ধর্মরাজ শিলা। কিন্তু পুরোহিত ধর্মরাজের নিত্যসেবা পূজার ব্যয়ভার বহন করিতে অক্ষমতা জানাইলে উহার পূজা-পার্বণাদির ভার গ্রামে সর্বসাধারণ গ্রহণ করেন এবং গ্রামের মধ্যস্থলে একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দির নির্মাণ করিয়া উহাতে ধর্মরাজ শিলাটিকে প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মরাজের মন্দিরটি পূর্বমুখী এবং সম্মুখভাগে দালানযুক্ত সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি প্রকোষ্ঠ মাত্র। মন্দিরের সম্মুখেই একটি পাকা নাট্‌মন্দির আছে। সব শেষ বাংলা ১৩৪৪ সনে মন্দিরটির সংস্কার কার্য সাধিত হইয়াছে। এই মন্দিরাভ্যন্তরে গোলাকৃতি ধর্মরাজ শিলা প্রতিষ্ঠিত। উহা উপরিভাগে মোম দ্বারা সংযুক্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত দুইটি চক্ষু তারকা দেখিতে পাওয়া যায়।

জনসাধারণ ধর্মরাজের ভার গ্রহণ করিবার পর উহার নিত্যসেবা পূজা ও পার্বণাদির জন্য এক সামাজিক প্রথার প্রচলন করেন এবং অদ্যাবধি সেই প্রথানুসারেই ধর্মরাজের পূজা-পার্বণাদি পরিচালিত হইতেছে। সামাজিক প্রথাগুলি নিম্নরূপ :

(১) বেলিয়াতোড় গ্রামটি পূব তরফ্ ও পশ্চিম তরফ্ এই দুইটি পল্লীতে বিভক্ত এবং পালাক্রমে এক বৎসর পূর্ব তরফ ও এক বৎসর পশ্চিম তরফ্ ধর্মরাজের গাজন উৎসব পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। পরিচালকেরা সুষ্ঠুভাবে উৎসব পরিচালনা, ধর্মরাজের ভক্ত সংগ্রহ করিয়া দেওয়া এবং উৎসব উপলক্ষে প্রয়োজনীয় চৌদোলা ইত্যাদি দিতে বাধ্য থাকেন।

(২) গ্রামে জমিদার রায় পরিবার হইতে একজন ভক্ত-ব্রত গ্রহণ করেন। ইনি 'রাজার ভক্ত' নামে সম্মানিত। এবং গাজনের ভক্তদিগের মধ্যে ইঁহার স্থান সর্বাগ্রে। ইনি গাজন পরিচালন করিবেন।

(৩) গ্রামে কেবলমাত্র একজন ব্যবসায়ীকে সারা বৎসর পাইকারী পান বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয় এবং তিনি ১ টাকার পান বিক্রয় করিয়া মাত্র চার আনা লাভ করিতে পারিবেন এবং ঐ চার আনা হইতে ৭ পয়সা ধর্মরাজপূজার জন্য দিবেন, ২ পয়সা মাল আনা ও ৭ পয়সা

নিজে পাইবেন। ধর্মরাজ পূজা কমিটি প্রতি বৎসর পান ব্যবসায়ী স্থির করিয়া দিয়া থাকেন।

(৪) গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ব্যতীত নবশাক সম্প্রদায়-ভুক্ত প্রতি বাড়ী হইতে ধর্মরাজপূজার জন্য দুই আনা করিয়া দিবেন এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ পরিবারগণ প্রয়োজনীয় চাউল ও পূজার বিবিধ উপাচার দিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন, গ্রামের কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবারের নিকট ✓০ হইতে ॥০ আনা মাথট আদায় করা হয়। ধর্মরাজের নামে উৎসর্গকৃত কিছু দেবোত্তর জমির আয় হইতে পূজা-পার্বনাদির ব্যয় বহন করা হয়।

পুরোহিত বর্গ:

(১) উৎসবের কয়দিন ব্যতীত সারা বৎসর ধর্মরাজের নিত্য-পূজা করেন স্থানীয় চট্টোপাধ্যায় পরিবার। ইঁহারা বেতনভোগী। ইহা ব্যতীত, প্রতিদিন মন্দিরে দক্ষিণা বাবদ যে অর্থাদি পাওয়া যায় তাহা নিত্য পূজারী পাইয়া থাকেন এবং তৎসহ ভোগের অংশ পান। বর্তমান পূজারী শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়। ইঁহারা বংশানুক্রমে ধর্মরাজের পুরোহিতের কাজ করিতেছেন।

(২) ব্রাহ্মণডিহি গ্রাম নিবাসী মুখোপাধ্যায় পরিবার বংশানুক্রমে গাজন উৎসবের পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। (যেমন, উৎসবকালে ধর্মরাজপূজা, পাট স্নানাভিষেক পূজা, ধর্মরাজ শিলাকে উৎসবকালে মূল মন্দির হইতে নাট্ মন্দিরে আনয়ন ইত্যাদি করনীয়।) ইহারাও বেতন-ভোগী। বর্তমান গাজন উৎসবের পুরোহিত শ্রীবিজয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

(৩) উৎসব উপলক্ষে ধর্মরাজের ঘট স্থাপনের জন্য স্থানীয় চক্রবর্তী পরিবার বংশানুক্রমে পৌরহিত্য করিতে-ছেন। ইঁহার দায়িত্ব উৎসবের ঘট স্থাপন, ধর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান, দুধ-চিড়া ভোগ প্রস্তুত করা এবং অন্যান্য গ্রাম হইতে ঠাকুর আনয়ন ও বিদায় দেওয়া। ইঁহারাও বেতনভোগী। বর্তমান ঘট স্থাপন করেন পুরোহিত শ্রীজলধর চক্রবর্তী।

প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি (রথযাত্রার পরে যে পূর্ণিমা পড়ে) হইতে তিনদিনব্যাপী সাড়ম্বরে ধর্মরাজের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রথের দিন গাজন উৎসবের ঘট স্থাপন করিয়া উৎসবের শুভ সূচনা করা হয়। এইদিন ঘট স্থাপন পুরোহিত গ্রামের মহাদানা ধর্ম-শিলাকে, স্বরূপনারায়ন ধর্মশিলাকে ও স্থানীয় জমিদার রায়দের বাড়ীতে লক্ষ্মীদেবীকে ধর্মরাজ উৎসবের নিমন্ত্রন জানাইয়া আসেন। রায়বাড়ীর লক্ষ্মীর কোন মূর্তি নাই; একটি রেকাবে ধান দিয়া তাহার উপর লক্ষ্মীঝাপি রাখা হয়। মহাদানা একটি শিলাখণ্ড বিশেষ এবং স্থানীয় বাউরী সম্প্রদায়ের ঠাকুর। গ্রামেই একটি ছোট মন্দিরে ইঁহার নিত্যপূজা হয়। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি পাকা মন্দিরে স্বরূপনারায়ন শিলার নিত্যপূজা হয়—ইনি সাধারণের দেবতা। গ্রাম্যদেবতাদের এই আমন্ত্রণ জানাইবার প্রথাকে 'সমাজবন্ধ' অনুষ্ঠান বলা হয়।

উল্টোরথের দিন পাটভক্ত নির্বাচন ও পাট কামান হয়। কেবলমাত্র গ্রামের কামার, কুমার অথবা তাম্বুলী সম্প্রদায় হইতে পাটভক্ত নির্বাচন করা হয়। পাটভক্ত গ্রহণের পর পাট কামান হয়। অর্থাৎ ধর্মরাজের পাটে (লৌহ শলকা-বিদ্ধ কাঠের পাটাতন বিশেষ) প্রতি বৎসর একটি মাত্র নুতন শলকা বিদ্ধ করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মরাজের পাট হইতে মরিচা ধরিয়া অনেক শলকা খসিয়া যাইলেও অদ্যাপি উহাতে অসংখ্য শলকা দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় একটি নির্দিষ্ট কর্মকার পরিবার বংশানুক্রমে পাট কামানের কাজ করিয়া থাকেন। বর্তমানে শ্রীবৈদ্যনাথ কর্মকার এই কাজ করিতেছেন। পাট কামানের পর পাটভক্ত উহাকে মাথায় লইয়া ঢাক-ঢোলের বাদ্যসহ গ্রামের তাঁতিপুকুরে, পরের দিন গ্রামের 'মাদারপুকুর' নামে একটি পুষ্করিণীতে এবং তৃতীয় দিন গ্রামের নিকটবর্তী 'লালবাঁধ' নামক পুষ্করিণীতে পাট স্নান করাইয়া লইয়া যান। এইদিন প্রাচীন রীতি অনুসারে গ্রাম প্রদক্ষিণের পথে রায়বাড়ী, মিত্রবাড়ী ও নিয়োগীদের বাড়ীতে পাট লইয়া যাওয়া হয় এবং এইদিনই গাজনের সন্ন্যাসী বা ভক্ত নির্বাচন করা হয়। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যে-কেহই স্বেচ্ছায় মানসিক করিয়া ভক্তব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। নির্বাচিত ভক্তরা এইদিন হইতে উৎসব শেষ না হওয়া অবধি প্রতিদিন একবেলা নিরামিষ হবিষান্ন গ্রহণ ও সংযম পালন করিয়া থাকেন।

চতুর্থ দিনে নির্বাচিত ভক্তদের দেবগোত্রান্তরিত করিয়া গলায় উত্তরীয় পরাইয়া দেওয়া হয় এবং "রাজাভেটা" নামে একটি পর্ব পালন করা হয়। এই পর্ব উপলক্ষে ছোট

রায়বাড়ীতে (স্থানীয় রায় পরিবার বড়, মেজ ও ছোট এই তিন তরফে বিভক্ত) পাট লইয়া গিয়া ধর্মরাজ পাট পূজা করা হয়। রায়বাড়ীতে পাট পূজার পর পাটভক্ত পাটটিকে মাথায় লইয়া অন্যান্য ভক্তদের সহিত আশপাশের নূতনগ্রাম, মাধবপুর, আড়বেতাল, কুলবেড়িয়া, নিরিশা প্রভৃতি গ্রামে যান এবং ঐ সকল গ্রামে গ্রামবাসীরা পাট পূজা দিয়া থাকেন। বিকালে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলে পর পাটভক্ত পাটটিকে গ্রামের হীরাপুকুরে স্নান করাইয়া ধর্মরাজ মন্দিরে আনিয়া স্থাপন করেন।

পূর্ণিমা তিথি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মূল গাজন উৎসব সুরু হয়। ঘট স্থাপনের পুরোহিত এইদিন মহাদানাঠাকুর ও স্বরূপনারায়ন ঠাকুরকে তাঁহাদের মন্দির হইতে ঢাক-ঢোলের বাজনসহ ধর্মরাজের নাট্‌মন্দিরে আনিয়া স্থাপন করেন এবং উৎসবের কয়দিন ধর্মরাজঠাকুরের সহিত ভক্ত বিগ্রহদ্বয়ের পূজাদি হইয়া থাকে। এইদিন অপরাহ্নে তাঁতিপুকুরে পাট স্নানের উদ্দেশ্যে ধূমধামের সহিত ধর্মরাজের মন্দির হইতে গাজন সন্ন্যাসীদের একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। নির্দ্ধারিত রীতি অনুসারে শোভাযাত্রার অগ্রভাগে আদি তাম্বুলী বাড়ীর (অর্থাৎ যাঁহারা দামোদর নদীর তীরে ধর্মরাজশিলা পাইয়াছিলেন) জনৈক ভক্তের মাথায় ধর্মরাজের পাট, তাঁহার পশ্চাতে পাটভক্তের মাথায় যাত্রাকলসী (অর্থাৎ যে মাটির কলসীতে বিগত সারা বৎসর মন্দিরে ধর্মরাজের পূজাদি হইয়াছিল) থাকে এবং অন্যান্য ভক্তরা বেতের ছড়ি দিয়া যাত্রাকলসী-টিকে বেষ্টন করিয়া রাখেন। ইঁহাদের পশ্চাতে চাকা লাগান বৃহদাকার কাঠের ঘোড়ার উপর যথাক্রমে ধর্মরাজের নিত্য পূজারী ধর্মরাজশিলা লইয়া, ঘট স্থাপনের পুরোহিত স্বরূপনারায়নশিলা লইয়া এবং সাগরকাটা গ্রাম নিবাসী চক্রবর্তীরা মহাদানাশিলা লইয়া বসেন। এখানে উল্লেখ যে, পূর্বে এই গ্রাম নিবাসী বিরাজ চক্রবর্তী মহাশয়েরা বংশানুক্রমে মহাদানাশিলা লইয়া ঘোড়ায় বসিতেন। বর্তমানে চক্রবর্তীরা তাঁহাদের দৌহিত্রবংশ। এইরূপ সারিবদ্ধ হইয়া শোভাযাত্রা সহকারে ভক্তরা উক্ত ঘোড়াগুলিকে টানিয়া মন্দির হইতে প্রায় ½ মাইল দূরে তাঁতিপুকুরে উপস্থিত হন। সাধারণ দর্শকেরা এই শোভাযাত্রার অনুগমন করেন। উক্ত বৃহদাকার কাঠের ঘোড়াগুলি মানতকারীরা তৈয়ারী করাইয়া দেন। তাঁতিপুকুরের ঘাটে উপস্থিত হইয়া প্রথমে পাট স্নান হয়। পাট স্নানের পর পাট হইতে যে জল ঝরিয়া পড়ে অগণিত স্ত্রীলোক মনস্কামনা জানাইয়া ঐ জল নিজেদের মাথার দেন।

পাট স্নানের পর যাত্রাকলসী বিসর্জন দিয়া আর একটি নূতন মাটির কলসীতে জল পূর্ণ করা হয় এবং ঐ কলসী সারা বৎসর ধর্মরাজের মন্দিরে থাকে। স্নানাভিষেকের পর রাত্রি প্রায় সাড়ে তিন ঘটিকা পর্যন্ত উক্ত বিগ্রহাদি তাঁতি-পুকুরের পাড়ে স্থাপন করিয়া ভক্তরা কয়েকটি আচার অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকেন। এই সকল আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রথমেই ঠাকুরের নিকট ভোগ নিবেদন করা হয়। রায়বাড়ীর তিন তরফ হইতে ধর্মরাজের ভোগ আসে ; তবে উহার মধ্যে সর্বাগ্রে ছোট তরফের (বর্তমানে শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র রায়) ভোগ নিবেদন করা হয়। ভোগ নিবেদনের পর ভক্তরা বর্তমান বৎসরের পরিচালকমণ্ডলী ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ মাল্যদান করেন। পরে ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নানারূপ দণ্ড খাটিয়া থাকেন। যেমন গড়ান ভক্ত ভূমিপৃষ্ঠে গড়াইয়া, দণ্ডসেবা ভক্ত একবার উঠিয়া ও একবার বসিয়া এইরূপে অগ্রসর হইয়া ঘাট হইতে মূল মন্দির পর্যন্ত দণ্ড খাটেন। এইরূপ দণ্ড খাটিবার পর ভক্তরা তাঁতিপুকুরে স্নান করিয়া উপবাস ভঙ্গ করেন। ইহার পর মানসিককারীরা কেহ মাথায়, কেহ হাতে নূতন সরা রাখিয়া মানসিক অনুসারে ধূনা পোড়াইয়া থাকেন।

মানসিকে ধূনা পোড়ানর পর ভক্তদের বান ফোঁড়া পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বান ফোঁড়া পর্ব উপলক্ষে উপবাসী 'হাউসী ভক্তরা' পৃষ্ঠে, বক্ষে, জিহ্বায়, হাতে, পায়ে প্রভৃতি শরীরের নানাস্থানে 'কালবুদ' শলকা বিদ্ধ করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া নৃত্য-গীত করেন। একটি বাঁশ খণ্ডের অগ্রভাগকে ৮।১০ ভাগে চিরিয়া উহার প্রত্যেকটিতে লোহার তৈয়ারী সুক্ষ্ম শলকা গাঁথিয়া ঐ শলকাগুলি হাউসী ভক্তদের শরীরে নানা স্থানে বিদ্ধ করা হয়।

লোহারবান ভক্তদের দেহের মধ্যে একটি দীর্ঘ লোহার শিক্ প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় এবং ঐ অবস্থায় ভক্তরা মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত করিয়া থাকেন।

নলীবান—ভক্তরা বক্ষ পিঞ্জরের উভয় পার্শ্বে দুইটি

কঞ্চি ফুঁড়িয়া দেওয়া হয় এবং ঐ কঞ্চির মধ্য দিয়া সুতা প্রবেশ করাইয়া দুইজন ব্যক্তি ধরিয়া থাকেন এবং ঐ অবস্থা ভক্তরা দৌড়াইতে দৌড়াইতে মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হন।

ঢেকিবান—এক একজন ভক্তের দুই উরুদের মধ্য দিয়া একটি লোহার শিক্ ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। শিকের মধ্যস্থলে ঢেকি ন্যায় কাঠ লাগান থাকে। ঐ অবস্থায় ভক্ত নিজেই (যাঁহার উরুদের মধ্যে শিক্ প্রবেশ করান হইয়াছে) ঐ কাঠটিকে ঢেকি ন্যায় একবার উপরে উঠান ও একবার নীচে নামান।

হিন্দোলবান—একটি চতুষ্কোন কাঠের ফ্রেমের উপর দিকের কাঠটিকে পা দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া নীচের দিকে মাথা ঝুলাইয়া ভক্তরা দোল খাইতে থাকেন। নীচে একটি পাত্রে অঙ্গারে ধূনা পোড়ান হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঢেকিবান ও হিন্দোলবান গ্রহণকারী ভক্তদের পরপর কয়েকটি গরুরগাড়ীতে করিয়া শোভাযাত্রার সহিত লইয়া যাওয়া হয়। গরুরগাড়ীগুলি অন্যান্য ভক্তরা টানিয়া লইয়া যান।

লড়কিবান—একটি বাঁশের অগ্রভাগে সুতায় ৮।১০টি বঁড়শি বাঁধিয়া ভক্তব্রত গ্রহণকারী ৮।১০টি বালকের শরীরে ফুঁড়িয়া দেওয়া হয় এবং অপর একজন বাঁশটিকে ধরিয়া রাখেন। ঐ অবস্থায় উক্ত বালক ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে শোভাযাত্রার সহিত মন্দিরে আসেন।

দশমুখী অগ্নিবান—একটি কাঠের ফ্রেমের মধ্যে ভক্তকে দাঁড় করাইয়া পশ্চাতে মেরুদণ্ডের সহিত আটটি ও বক্ষ পিঞ্জরের উভয় পার্শ্বে দুইটি লোহার শিক্ গাঁথিয়া ঐ দশটি শিকের অগ্রভাগে জড়ান তৈলসিক্ত কাপড়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়। অন্যান্য ভক্তরা পাশ হইতে মাঝে মাঝে ঐ অগ্নির মধ্যে ধূনা নিক্ষেপ করিতে থাকেন এবং ঐ অবস্থা নৃত্য করিতে করিতে ভক্তরা মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হন। বানফোঁড়া ব্যতীত কোন কোন ভক্ত আবার জলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়া নগ্ন পদে হাঁটিয়া যান।

ভক্তদের দেহে বান ফুঁড়িয়া দিবার জন্য গ্রামের ধীবর সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি নির্দিষ্ট আছেন। তাঁহাকে ভোগের প্রসাদ ব্যতীত এক সের পরিমান জিলাপী দেওয়া হয়।

শেষ রাত্রে তাঁতিপুকুরের ঘাট হইতে পুনরায় কাঠের ঘোড়ার পিঠে বসাইয়া উল্লিখিত বিগ্রহাদিকে শোভাযাত্রা করিয়া মন্দিরে ফিরাইয়া আনা হয়। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ভাড়া করা চতুর্দোলা ভক্তরা থাকেন। মন্দির যাত্রা পথে শোভাযাত্রা থামাইয়া গৃহস্থেরা নিজ নিজ বাড়ীর সম্মুখে খেচুর, ঘি, চিনি, কর্পূর, এলাচ দ্বারা প্রস্তুত ভোগ অথবা লুচি, মালপোয়া, পায়সান্ন দিয়া ধর্মরাজের নিকট ভোগপূজা নিবেদন করেন। এইরূপে মন্দিরে শোভাযাত্রা আসিয়া উপস্থিত হইতে প্রায় সকাল ৭টা বাজিয়া যায়। ইহার পর মন্দির ঘরের বাহিরে পঞ্চগব্য দ্বারা ঠাকুর শুদ্ধিকরণ ও যজ্ঞের পর ধর্মরাজ বিগ্রহ মন্দিরের মধ্যে স্থাপন করা হইলে মানসিককারীরা মাটির সরায় করিয়া ধূনা পোড়ান, মন্দিরে ষোড়শোপচারে পূজা দেন এবং সারাদিনব্যাপী মন্দিরে হোম, ভোগপূজাদি চলিতে থাকে। এই সময় ভক্ত ব্রতীরা স্নান সারিয়া সিক্তবস্ত্রে মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিলে পর তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে উত্তরীয় খুলিয়া বাহুতে বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহাদিগকে 'কড়কড়িয়া' ভোগ ও 'কামলে জল' খাইতে দেওয়া হয়। কড়কড়িয়া ভোগ অর্থাৎ চাল-কড়াই ভাজা। গ্রামে আদি তাম্বুলী পরিবার এই ভোগ ধর্মরাজের নিকট নিবেদন করিয়া থাকেন। কামলে জল অর্থাৎ পাটভক্ত আগের দিন ভোর রাত্রে সবার অলক্ষ্যে একটি নূতন মাটির হাঁড়িতে করিয়া শ্মশান-ঘাট হইতে জল তুলিয়া উহার সহিত নিমপাতা, গুড় ও দুধ মিশ্রিত করিয়া মন্দিরে আনিয়া রাখেন। ধর্মরাজের প্রসাদ গ্রহণের পর ভক্তরা সিক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেকে একটি করিয়া মন্দিরে ঘৃত প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া যান।

বিকালে চড়ক পূজা উপলক্ষে ধর্মরাজ শিলাকে মূল মন্দির হইতে নাট্ মন্দিরে আনিয়া স্থাপন করা হয় এবং এই স্থানে ছোট রায়দিগের প্রদত্ত একটি নির্দিষ্ট ভোগ নিবেদনের পর মানসিকারীরা একের পর এক ভোগ নিবেদন করিয়া থাকেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত এইরূপ ভোগ নিবেদনের পালা চলিতে থাকে। মানত স্বরূপ অনেকে অর্থ, সোনা-রূপা, তৈজসপত্র, বস্ত্র, কাঠের ঘোড়া ইত্যাদি দিয়া থাকেন। বৎসরের অন্য সময় মানত করিয়া

ধর্মরাজের নিকট পশু-পক্ষী বলি দেওয়া চলে। কেবলমাত্র উৎসবের কয়দিন মানত হিসাবে কোনরূপ পশু-পক্ষী বলি দেওয়া নিষিদ্ধ; এই দিন চড়কগাছ পূজা হয়; তবে কিছুকাল পূর্বে এক দুর্ঘটনার জন্য বর্তমানে চড়কগাছে পাক্ খাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে মন্দিরে ধর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং বিকালে খিচুড়ী ভোগ নিবেদন করিয়া ভক্ত, পুরোহিত, পরিচালকমণ্ডলী ও সর্বসাধারণের মধ্যে উহা বিতরণ করা হয়। খিচুড়ী প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় চাল-ডাল, শাকসব্জী ইত্যাদি সাধারণ গ্রামবাসী নিজ নিজ সাধ্যানুসারে দিয়া থাকেন।

চতুর্থ দিনে ধর্মরাজের দুধ-চিড়া ও পরমান্ন ভোগ নিবেদন করিয়া পরে উহা নির্দিষ্ট ৮১টি পরিবারে এবং সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা পর স্বরূপনারায়ণ ও মহাদান বিগ্রহ বিদায় দিবার পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

ধর্মরাজের গাজন উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে ও গ্রামের রাস্তার দুইধারে (রাধাবাজার এলাকায়) দুইদিনের জন্য একটি মেলা বসে। আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় আট সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং মনিহারী, ময়রা-তেলেভাজা, বাসনকোসন, তৈয়ারী জামাকাপড়, বই-ছবি, শিল্পসামগ্রী ও পান-বিড়ি ইত্যাদি শতাধিক দোকানপাট বসে। সোনামুখী, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক ও ছোট সার্কাসের দল আসে।

বেলিয়াতোড় গ্রামে ধর্মরাজের মন্দিরের নিকটেই একটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের আরো কয়েকটি সুন্দর প্রাচীন মন্দির আছে। স্থানীয় তাম্বুলীদিগের বাড়ীতে একটি বড় পঞ্চরত্ন মন্দিরে তাঁহাদের গৃহদেবতা দামোদর-জীউ প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরটি বাংলা ১৩৫৯ সনে সংস্কার করা হইয়াছে স্থানীয় রায়দিগের কুলদেবতা গোকুলচাঁদ-জীউকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা ও রাসযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। রায়দিগের নির্মিত একটি রাসমঞ্চ আছে। রাসের সময় গোকুলচাঁদজীউকে এই রাসমঞ্চে স্থাপন করিয়া উৎসবাদি পালন করা হয়। স্থানীয় চক্রবর্তীদিগের আটচালা গঠনের একটি শিবমন্দির ব্যতীত গোপালমন্দিরে প্রতি বৎসর দোলযাত্রা উৎসব হয়। ইহা ছাড়া, প্রতি বৎসর নয়-দশটি শারদীয় দুর্গাপূজা, সাধারণের একটি দেবালয় মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া কালীপূজা, কার্তিকপূজা, অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় গণেশজননীপূজা এবং শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা হইয়া থাকে। মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং নিত্যপূজা হয়।

সাহারজোড়া

বড়জোড়া থানার অন্তর্গত সাহারজোড়া একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল দূর দিয়া দুর্গাপুর-বাঁকুড়া রুটের মোটরবাস যাতায়াত করে। বাস হইতে নামিয়া শালবনের মধ্য দিয়া একটি কাঁচা রাস্তা ধরিয়া এই গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

সিং উপাধিধারী ক্ষত্রিয়রা গ্রামের প্রাচীন জমিদার। গ্রামটি সৌমগুপ, গোয়ালা ও ছত্রি প্রধান। ইহা ব্যতীত, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, ছুতার, কামার, কুমার, গন্ধবণিক, গোরাই, মালাকার, জেলে, ধোপা, নাপিত, বাগদী, লোহার, ভুঁইয়া, আকুড়াডোম এবং মাত্র তিন ঘর বাউরী পরিবারের বসবাস আছে। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, ছত্রিপাড়া, কর্মকার-পাড়া, মণ্ডলপাড়া, মালাকারপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়ায় বিভক্ত।

সাহারজোড়া গ্রামের প্রাচীন মন্দিরাদির মধ্যে মহামায়া, মদনমোহন, নন্দলালজীউ ও কালাচাঁদের মন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতীতে এই সকল মন্দিরাদিতে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে ঢাক-ঢোল-সানাই ও রাজসিক পূজা-পার্বণাদিতে প্রায় সারা বৎসরই মুখরিত হইয়া থাকিত। আজিও উৎসব-পার্বণাদি হয় তবে পূর্বের সেই আড়ম্বর আর নাই। সাধারণ গ্রামবাসী বিশেষ করিয়া স্থানীয় জমিদারদের আর্থিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের পূর্ব আড়ম্বরও লুপ্ত হইয়াছে। আজিও উৎসব হয়—কেবল প্রাচীন রীতি

রক্ষার্থেই উৎসব। মন্দিরের নহবতখানা ভাঙ্গিয়া পড়িলেও আজিও হয়ত সানাই বাজে। তবে সে সানাইয়ের সুর বড় বে-সুরো। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে আজ আর মন্দির প্রাঙ্গণ সেইদিনকার মত আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে না। আজ বিগ্রহ সেবাইতের নিকট গলগ্রহ মাত্র।

গ্রামের মধ্যস্থলে চারিদিকে সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত প্রাঙ্গণে পূর্বমুখী পাশাপাশি দুইটি মন্দির অবস্থিত। ইহার একটি মহামায়ার মন্দির অপরটি মদনমোহনজীউর মন্দির। দুইটি মন্দিরই মাকড়া পাথর দ্বারা নির্মিত এবং মাঝারি গঠনের। মহামায়ার মন্দিরটি চারচালা গঠনের। মন্দিরের চারিপাশে ঘোরান খোলা বারান্দা এবং মন্দিরে চূড়ায় পদ্ম-আমলক-ঘট ও ধ্বজা প্রতিষ্ঠিত। সম্মুখেই মন্দিরের বারান্দায় উঠিবার সিঁড়ি। সিঁড়ির দুইপাশে বারান্দার উপর দুইটি শিলা স্তম্ভ প্রথিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে দেওয়ালগাত্রে একটি কুলঙ্গির মধ্যে কাষ্ঠাসনের উপর প্রায় ৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য কৃষ্ণ প্রস্তরে খোদিত চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনিই মহামায়া দেবী। দেবীর চক্ষুদ্বয় কৃত্রিম এবং বক্ষের উপর দিয়া ওড়নার ন্যায় বস্ত্র বিলম্বিত। চারিহস্তে চারিটি আয়ুধ আছে, তবে উহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যায় না। একটি হস্ত কিঞ্চিৎ ভগ্ন।

মহামায়া মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে মদনমোহনজীউর এক-চূড়া বিশিষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চারিদিকে ঘোরান বারান্দা এবং ইহার চূড়ায় পদ্ম, আমলক, ঘট ও বিষ্ণু ধ্বজা স্থাপিত। মন্দিরাভ্যন্তরে মদনমোহনের পিতল নির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহা ব্যতীত, মন্দিরে নাড়ুগোপাল ও নারায়ন শিলা আছে। মদনমোহন মন্দিরের বাহিরের দিকে দক্ষিণ পার্শ্বের দেওয়ালগাত্রে প্রাচীন দুর্বোধ্য ভাষায় একটি শিলা-লিপি গ্রথিত আছে। অদ্যাবধি ইহার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মহামায়া ও মদন-মোহনজীউর প্রাচীন মন্দির দুইটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইলে বাঁকুড়া জেলার বেলরুই গ্রাম নিবাসী রাধাগোবিন্দ রায় মহাশয় বাংলা ১৩১২ সনে বর্তমান মন্দির দুইটি পুনর্নির্মাণ এবং প্রাচীন নাট্‌মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে উল্লিখিত মন্দির দ্বয়ের সম্মুখস্থ বর্তমান নাট্‌মন্দিরটি সাহারজোড়া গ্রাম নিবাসী চারুবালা দেবী ৩১শে আষাঢ় ১৩৭৫ সনে নির্মাণ করিয়া দেন। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশদ্বারের উপর দ্বিতল নহবত-খানাটি বর্তমানে ভগ্নপ্রাপ্ত। মহামায়া মন্দিরের পশ্চাতে মাকড়া পাথর নির্মিত সুউচ্চ চারচালা তুলসীমঞ্চ আছে এবং ইহার নিকটেই মাকড়া পাথর নির্মিত কোন একটি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবত পূর্বে উহাই মহামায়ার মন্দির ছিল। মহামায়া ও মদনমোহন-জীউর প্রাচীন মন্দিরাদি স্থানীয় জমিদার সিং পরিবার কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।

মহামায়া দেবীর নিত্য অন্নভোগ দ্বারা পূজা এবং প্রতি বৎসর শারদীয়া বিজয়া দশমী তিথিতে ধুমধামের সহিত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চণ্ডীর ধ্যানে দেবীর পূজা হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে হোম যজ্ঞ, ছাগ বলি, প্রসাদ বিতরণ ও ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারী দেবীর নিকট মানসিক পূজা দিতে আসেন। মানসিক হিসাবে সাধারণতঃ ষোড়শোপচারে পূজা, ছাগ বলি, অর্থ, বস্ত্র, শাঁখা ইত্যাদি দেওয়া হয়। পূর্বে বিজয়া দশমীর দিন মহামায়ার নিকট মহিষ বলি দেওয়া হইত। ১৩৬২ সনেও মহিষ বলি হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। বিজয়া দশমীর দিন পূজা প্রাঙ্গণে কয়েকটি দোকানপাট বসে। বর্তমানে বাৎস্য গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্রীবাসুদেব দেঘরিয়া ও শ্রীশ্যামাপদ দেঘরিয়া পালাক্রমে দেবীর পূজাদি করিয়া থাকেন। আদি পূজারী বংশের গদাধর দেঘরিয়া (প্রায় দুই পুরুষ আগে) অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে বর্তমান বাসুদেব দেঘরিয়া পরিবার দেবীপূজার ভার পান। পূর্বে স্থানীয় জমিদার সিংগণ মহামায়া ও মদনমোহনের নিত্যপূজা ও উৎসবাদি পরিচালনা করিতেন। বর্তমান গ্রামবাসী ও সর্বসাধারণ পূজা-পার্বণাদি পরিচালনা করেন।

গ্রামে নন্দলালজীউ ও কালাচাঁদজীউর মন্দির, টিনের চালাযুক্ত মাটির ঘরে শিব এবং মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে। নন্দলালজীউর মন্দিরটি মাকড়া পাথর দ্বারা নির্মিত চারচালা গঠনের। প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় নন্দলালজীউর দোল-যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কালাচাঁদজীউর মন্দিরটি ইট ও পাথর দ্বারা নির্মিত। অষ্টকোনাকৃতি নবরত্ন বিশিষ্ট উচ্চ

রাসমঞ্চ আছে। পূর্বে ধূমধামের সহিত কালাচাঁদজীউর রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। বর্তমানে রাস উৎসব বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইহা ভিন্ন, গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে মৃন্ময় প্রতিমা নির্মাণ করিয়া কালীপূজা এবং আশ্বিন মাসে ঘটে ও পটে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। মহামায়ার অবস্থান হেতু এই গ্রামে দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণ করা হয় না।

উৎসব বিবরণী

নিরিশা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে সাড়ম্বরে বামাকালীর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রামে একটি মন্দিরে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসবটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন।

এই গ্রামে দেবীর পূজা প্রচলন সম্পর্কে শোনা যায় যে, মোহন আকুড়্যা নামে জনৈক ব্যক্তি কালী সাধনা করিতেন। তাঁহার সাধনায় তুষ্ট হইয়া একদা দেবী মানবী মূর্তি ধরিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন এবং তাঁহার নিকট নিত্যপূজা যাচ্ঞা করেন। কিন্তু দেবীর নিত্যপূজা করিবার মত সামর্থ উক্ত সাধকের না থাকায় বেলিয়াতোড় গ্রামের সূত্রধর সম্প্রদায়কে মূর্তি গড়িবার, স্থানীয় জমিদারদিগকে পূজার মিষ্টান্নাদি দিবার, রামনগরের নাপিত সম্প্রদায়কে বলির পাঠা দিবার, রণীয়াড়া গ্রামের মালাকারদের ডাকের সাজ দিবার, রামপুর মাজনামুড়া গ্রামের খয়রাদের মন্দির নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় শাল খুঁটি দিবার, ওলাসাপুর গ্রামের ডোমদিগকে ঢাক বাজাইবার এবং নিরিশা গ্রামের ডোমদিগকে নৈবেদ্য ডালি দিবার স্বপ্নাদেশ হয়। অদ্যবধি উল্লিখিত পরিবারের লোকজনেরা দেবীর পূজার ব্যয়ভার বহন করিতেছেন।

দেবীর নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথি হইতে চারিদিনব্যাপী সাড়ম্বরে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অমাবস্যার দিন দেবী মূর্তিকে দোলায় স্থাপন করিয়া স্থানীয় একটি পুকুরে স্নানাভিষেক উৎসব পালন করা হয়। রাত্রিকালে আকুড়্যা জাতির নিজস্ব রীতি অনুযায়ী পূজার পর রাত্রিশেষে দেবীর উদ্দেশ্যে একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। প্রতিপদ তিথি হইতে প্রত্যহ যথারীতি দেবীর পূজার পর বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যাবধি মানতের ছাগ বলি হয়। উৎসবের কয়েকদিন দেবীর প্রতিমা মন্দির হইতে পূজা-মণ্ডপে স্থাপন করিয়া পূজা করা হয় এবং উৎসবান্তে দেবীর মূর্তি মন্দিরে রাখিয়া সারা বৎসর নিত্যপূজা হয়। উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ মন্দির প্রাঙ্গণে কবিগানের আসর বসে। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে কবিয়ালগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

মেট্যালী গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া সাতদিনব্যাপী ধর্মরাজঠাকুরের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া স্থানীয় গ্রামবাসীরা দাবী করেন। ইহা স্থানীয় কুম্ভকার সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত হইলেও সর্বসাধারণে ইহাতে যোগদান করিয়া থাকেন। শোনা যায়, আদিতে কুম্ভকাররা একটি খালে মাছ ধরিবার জন্য জাল ফেলিলে ধর্মরাজ, কালারাজ ও হংসরাজ নামে তিনটি ধর্মশিলা উঠে। তদবধি ঐ তিনটি শিলাকে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কুম্ভকার সম্প্রদায় পূজার্চ্চনা করিতেছেন।

উৎসবের প্রস্তুতি বৈশাখী পূর্ণিমার প্রায় চারিদিন পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন অপরাহ্নে গাজনের শোভাযাত্রা বাহির হয়। কাষ্ঠনির্মিত দেবাসনে ধর্মরাজ ও তাঁহার সঙ্গী কালারাজ ও হংসরাজকে স্থাপন করিয়া দামোদর নদীর দক্ষিণ তীরে স্নানাভিষেকের জন্য লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় স্নানাভিষেক পূজাদির পর রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকায় পুনরায় মন্দিরে আনিয়া আধসের আতপ চাউল, একসের মুড়কী এবং মিষ্টান্ন যোগে ধর্মরাজের পূজা সম্পন্ন হয়। পূজান্তে উক্ত মিষ্টান্নাদি গ্রামের প্রতিটি গৃহে প্রসাদ হিসাবে বিতরণ করা হয়। পরের দিন অপরাহ্নে 'চড়ক' উপলক্ষে ধর্মরাজকে কয়েক ঘণ্টার জন্য চড়কতলায় আনিয়া

স্থাপন করা হয় এবং উৎসবান্তে মন্দিরে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। ভক্তগণ পিঠে বান ফুঁড়িয়া চড়ক গাছে পাক খাইয়া থাকেন। এইদিন মধ্যাহ্নে ধর্মরাজের পূজার পর মানতের পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। চড়কের পরদিন সন্ন্যাসব্রতী এবং দরিদ্রনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। এই উৎসবে আশপাশের গ্রাম হইতে কয়েক সহস্র নরনারী সমাগম হয়। বহুলোক মন্দিরে মানত পূজাদি দিয়া থাকেন।

খাঁড়ারী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তি তিথি হইতে ৪ঠা বৈশাখ পর্যন্ত ধুমধামের সহিত শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা বুড়া মহাদেবের গাজন নামে খ্যাত। উৎসবটি সর্বজনীন ও প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন। শোনা যায়, বুড়া মহাদেবের অনুগ্রহে হাঁপানী রোগের উপশম হয়। এই কারণে স্থানীয় অঞ্চলে খাঁড়ারী গ্রামে বুড়া মহাদেবের বিশেষ খ্যাতি আছে।

চৈত্র সংক্রান্তি হইতে পাঁচদিনব্যাপী যথারীতি শিব পূজা ও হোম-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন, সন্ন্যাসব্রতধারীগণ পাট স্নান, আনুষ্ঠানিক নৃত্যগীত, পাট লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ এবং 'বান ফোঁড়া', 'আগুণ ঝাপ' ইত্যাদি নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া থাকেন। ১লা বৈশাখ উৎসব উপলক্ষে 'লক্ষণভোজ' নামে একটি ভোজন-পর্বে সন্ন্যাসব্রতীসহ আরো প্রায় বারোশত নরনারী ভোজন করিয়া থাকেন। পাট লইয়া সন্ন্যাসব্রতীগণ যখন গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন তখন গ্রামবাসীগণ তাঁহাদিগকে অর্থ, চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়া থাকেন। ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য এক সাথে রন্ধন করিয়া শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। ইহাই 'লক্ষণভোজ' নামে খ্যাত। ইহা ভিন্ন, উৎসব পরিসমাপ্তির দিন একটি সবজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। একদা বিষ্ণুপুরের রাজারা এই উৎসব উপলক্ষে অর্থাদি সাহায্য করিতেন।

বড়জোড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে তিনদিনব্যাপী মহাধুমধামের সহিত সর্বজনীন শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শোনা যায়, প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে এই গ্রামের প্যারীলাল পোদ্দার নামে জনৈক ব্যক্তির একটি গাভী প্রতিদিন সবার অলক্ষ্যে গ্রামের পার্শ্ববর্তী গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইলে তাহার দুগ্ধাধার হইতে আপনি দুগ্ধ ঝরিয়া পড়িত। এই কথা জানাজানি হইবার পর ঐ স্থান খনন করিয়া শিবলিঙ্গ উদ্ধার করা হয় এবং গ্রামবাসীর চেষ্টায় একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া উক্ত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তদবধি শিবের নিত্যপূজা ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া গ্রামবাসীগণ দাবী করেন।

গাজন উৎসবের প্রস্তুতি প্রায় পনরদিন পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়। প্রস্তুতি পর্বে সর্বসাধারণকে লইয়া একটি পূজা কমিটি গঠিত হয় এবং তাঁহারা বিগত বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব করিয়া আসন্ন উৎসবের কর্মসূচী প্রস্তুত করেন। এইদিন হইতে মন্দির সংস্কার ও উৎসবের বিবিধ প্রস্তুতি আরম্ভ হয় এবং প্রত্যহ মন্দিরে রামায়নগান, কথকতা ও ধর্মমূলক আলোচনা হয়।

চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিন প্রায় সত্তর-আশীজন নরনারী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং মন্দিরে তাঁহাদের শিব-গোত্রান্তরিত করিবার পর ঢাক-ঢোলের বাজনাসহ শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহারা পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে ভৈরব আনিতে যান। রাত্রিকালে শিব ও ভৈরবের পূজা হয়।

পরের দিন অর্থাৎ সংক্রান্তি তিথিতে প্রাতঃকালে শলকাযুক্ত শিবের পাটকে মাথায় লইয়া সন্ন্যাসব্রতীরা নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন এবং সন্ধ্যার পূর্বে পাট লইয়া মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ধ্যার পর সন্ন্যাসব্রতী সহ প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার গ্রামবাসী ঢাক-ঢোল বাজাইয়া ধুমধামের সহিত নিকটবর্তী একটি পুষ্করিণীতে পাটস্নান করাইতে লইয়া যান। পাট-স্নান প্রত্যক্ষ করিতে উক্ত পুষ্করিণীর পাড় ঘিরিয়া বহু ভক্ত নরনারী ভীড় করিয়া দাঁড়ান। দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য সারা পুষ্করিণীর পাড় ঘিরিয়া 'ডে-লাইট' বা 'হ্যাজাক বাতি' জ্বালিয়া দেওয়া হয়। পাটস্নানের পর মন্দির প্রত্যাবর্তনের পথে পূণ্যলাভের জন্য শত শত নরনারী পাট স্পর্শ করিয়া মন্দিরে আসেন। ইহার পর মন্দিরে

পাট আনিয়া উপস্থিত করিলে পাটের উপর প্রধান ভক্ত (পাট ভক্ত) উক্ত শলকাযুক্ত পাটের উপর চিত হইয়া শুইয়া পড়েন এবং তাঁহার বুকের উপর পুরোহিত উঠিয়া দাঁড়ান। ঐ অবস্থায় অন্যান্য সন্ন্যাসব্রতীরা পাটটি-কে কাঁধে লইয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন এবং প্রায় রাত্রি দেড় ঘটিকায় মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। তাহার পর মন্দিরে যথারীতি শিবপূজা ও সন্ন্যাসব্রতীদের জিহ্বা প্রভৃতি শরীরের নানা স্থানে বান ফোঁড়া হয়। বান ফোঁড়া অনুষ্ঠানকালে মন্দির প্রাঙ্গণে বহু টাকার আতসবাজী পোড়ান হয়। এই সময় মন্দির প্রাঙ্গণে অগণিত লোকজনের সমাগম হয়। এই-দিন ভোর রাত্রিকালে সন্ন্যাসব্রতীগণ 'আগুন সন্ন্যাস' পর্ব পালন করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সন্ন্যাসব্রতীগণ গ্রামে শ্মশান হইতে দগ্ধ কাষ্ঠ আনিয়া শিবমন্দিরের সম্মুখে অঙ্গার প্রজ্বলিত করেন এবং তাহার পর ঐ প্রজ্বলিত অঙ্গারের মধ্য দিয়া নগ্নপদে তাঁহারা একের পর এক হাঁটিয়া যান। পরের দিন উৎসব শেষে একটি সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়।

মানসিককারীরা শিবের নিকট ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া মানসিক শোধ করিয়া থাকেন এবং বহুলোক মানত করিয়া চৈত্র সংক্রান্তি তিথিতে শিবমন্দির প্রাঙ্গণে ধুনা পোড়াইয়া থাকেন।

নিরিশা গ্রামে একটি মন্দিরে ভুবনেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ ও পঞ্চানন্দের পাষাণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। জনশ্রুতি প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে মহেশ মণ্ডল নামে জনৈক গ্রামবাসী এই শিবমন্দির নির্মাণ করিয়া ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন ও নিত্যপূজাদির ব্যবস্থা করেন। উক্ত মন্দিরের বহির্ভাগে একটি পাষাণময় বৃষ মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

ভুবনেশ্বর শিবকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামবাসীর সুবিধামত প্রতি বৎসর বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে যে-কোন দিন গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন এবং এখনও বেশ সমারোহের সহিত উৎসব পালিত হয়। অসময়ে এই গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া স্থানীয় অঞ্চলে ইহা "ভুবনেশ্বরের অকাল গাজন" নামে খ্যাত।

উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর অনেকে ভক্ত সন্ন্যাসব্রত পালন করিয়া থাকেন। ব্রতধারীরা উৎসবের দিন স্নান ও ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করিয়া মন্দিরের পুরোহিতের নিকট হইতে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং উৎসবের কয়দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে অন্যান্য ভক্তসহ পাটভক্ত সারাদিন উপবাস থাকিয়া মাথায় শিবের পাট লইয়া নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। গ্রাম প্রদক্ষিণ কালে তাঁহারা মুখে ধ্বনি দেন "জয়বাবা বিশ্বনাথ ভুবনেশ্বর নাথমণি পার্বতী মহাদেবের জয়।" সঙ্গের বাদ্যকারগণও থাকেন। গ্রাম প্রদক্ষিণকালে ভক্তরা প্রতিটি গৃহস্থের বাড়ী উপস্থিত হইলে গৃহস্থরা পাট পূজা করেন এবং ভক্তদের ভিজা ছোলা ও গুড় দ্বারা জলপানে আপ্যায়িত করেন এবং কিছু ফলমূল দান করেন। সন্ধ্যার পূর্বে ভক্তরা শিবের পাট লইয়া গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। রাত্রিকালে ভক্তরা মাথায় ঘট ও শিবের ঘোড়া লইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্যগীত করেন।

পরের দিন 'রাজাখাটা' অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিবের পাট-কে তেল সিঁন্দুর মাখাইয়া এবং ফুলের মালা সজ্জিত করাইয়া নিকটবর্তী একটি সায়রে পাট স্নান করাইতে লইয়া যান। পাট স্নানাদির পর মন্দিরে প্রত্যাবর্তনের পথে অনেকে সায়র হইতে দণ্ডী খাটিয়া মন্দির অবধি আসেন। মন্দিরে প্রত্যাবর্তনের পর শিবের পূজারী ব্রাহ্মণ পাতি টগরের মালা সজ্জিত হইয়া উক্ত শলকাযুক্ত পাটের উপর দাঁড়ান এবং পাট ভক্ত শুইয়া পড়েন এবং ঐ অবস্থা অন্যান্য ভক্তরা পাটটিকে কাঁধে তুলিয়া বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন। এই প্রদক্ষিণকালে বহু নরনারী পাটের নীচে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া তাঁহাদের মনস্কামনা জানাইয়া শিবের নিকট মানসিক জানাইয়া থাকেন। এইরূপে কয়েকটি গ্রাম প্রদক্ষিণের পর ভক্তরা পাট লইয়া শিবমন্দিরে ফিরিয়া আসেন। পরে যথারীতি শিবের পূজা ও ভক্তদের শরীরে বান ফোঁড়া পর্ব পালিত হয়।

পরের দিন সকাল হইতে যথারীতি শিবপূজা এবং ভক্তদের অগ্নি ঝাপ পর্ব পালনের পর গাজন উৎসবে সমাপ্তি

হয়। উৎসবের চার-পাচদিন পরে শিবের নিকট পায়সান্ন নিবেদন করিয়া 'মন্নুই ভোগ' দেওয়া হয় এবং ঐ ভোগ সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরন করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং এই উৎসবে আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের লোকজন যোগদান করিয়া থাকেন।

জগন্নাথপুর গ্রামে প্রখ্যাত রত্নেশ্বরজীউ শিবমন্দিরে প্রতি বৎসর ২৭শে চৈত্র হইতে সংক্রান্তি তিথি পর্যন্ত মহাধুমধামের সহিত গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রত্নেশ্বর শিবমন্দিরটি সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

রত্নেশ্বর শিবের গাজন উৎসবের প্রস্তুতি উৎসবের প্রায় পক্ষকাল পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়। ২৬শে চৈত্র তারিখে দলে দলে নরনারী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দুধর্মাবলম্বী যে-কোন সম্প্রদায়ের লোকজনই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। ২৬শে হইতে উৎসবের শেষদিন পর্যন্ত সন্ন্যাসব্রতীরা প্রত্যহ সারাদিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যাকালে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন এবং এই কয়দিন শুদ্ধাচারে দিনযাপন করেন।

২৭শে চৈত্র পাটভক্ত অন্যান্য ভক্ত সহ মন্দির হইতে শিবের পাট লইয়া নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন এবং ফিরিয়া আসিয়া উক্ত পাটটিকে জনৈক কর্মকারের বাড়ীতে লইয়া গিয়া উহার উপর 'জলুই' পিটাইয়া আনেন। পরে পুনরায় শোভাযাত্রা করিয়া ভক্তরা পাটটিকে 'ধারবাঁধ নামক একটি পুষ্করিণীতে লইয়া যান এবং তথা পাটস্নান ও পূজাদির পর মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। এই অনুষ্ঠানকে স্থানীয় লোকেরা 'মোদভাঙ্গা' বলেন।

২৮শে চৈত্র দুপুরে গাজন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আশপাশের প্রায় দশ-বারোটি গ্রামের শিবমন্দির হইতে ঢাক-ঢোলের বাজনা সহ দশ-বারোটি শিবের পাট আসিয়া রত্নেশ্বর শিবমন্দিরে উপস্থিত হন এবং পরে সকলে মিলিয়া শোভাযাত্রা করিয়া আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন। এই শোভাযাত্রার সহিত ঢাক-ঢোল, সন্ন্যাসব্রতী ব্যতীত রামায়ণগানের দলও অনুসরণ করেন। রামায়ণগানের দলকে ধুতি, গামছা ও অর্থাদি দিয়া সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

পরের দিন 'রাতের গাজন' পর্ব উপলক্ষে সন্ন্যাস-ব্রতীরা নিজেদের শরীরের নানাস্থানে শলকা বিদ্ধ করিয়া সেই অবস্থায় ঢাক-ঢোলের তালে তালে নৃত্যগীত করিতে করিতে হাতে মশাল জ্বালাইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন এবং 'আগুন ঝাপ' পর্ব পালন করেন। শেষ রাত্রে মন্দির প্রাঙ্গণে বহু টাকার আতসবাজী পোড়ান হইয়া থাকে। সারারাত্রিব্যাপী এই সকল অনুষ্ঠানাদি প্রত্যক্ষ করিতে বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় পনর-ষোল হাজার নরনারীর সমাগম হয়। সংক্রান্তির দিন চড়কপূজার পর সন্ন্যাসব্রতীগণ শরীরে বান ফুঁড়িয়া চড়কগাছে পাক খাইয়া থাকেন। এইদিন রাত্রিতে রত্নেশ্বর শিবমন্দিরে হোম-যজ্ঞ হইয়া থাকে। হোম-যজ্ঞের পর শিবের নিকট ভোগ নিবেদন করা হয়।

১লা বৈশাখ শিবযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং যজ্ঞের পর প্রায় ৫ মন চাউলের অন্নভোগ নিবেদন করিয়া উহা সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। স্থানীয় একটি কমিটি কর্তৃক রত্নেশ্বর শিবের গাজন উৎসব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

ভৈরবপূজা

ভৈরবপুর গ্রামে ভৈরবপূজাটি শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন শুরু হয় এবং পয়লা ভাদ্র শেষ হয়। উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ভৈরবের মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করা হয়। উৎসবের প্রথম দিনে সন্ধ্যাকালে স্নানাভিষেক পর্ব উপলক্ষে ভৈরব মূর্তিটিকে চতুর্দোলায় চাপাইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামের পূর্ব প্রান্তস্থিত একটি পুষ্করণীতে লইয়া যাওয়া হয়। উক্ত পুষ্করিণীর ঘাটে স্নানাভিষেক পূজা সম্পন্ন করিবার পর মূল মন্দিরে ফিরিবার সময় বিগত বৎসরের প্রতিমাটিকে গ্রামের একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয় এবং পরের দিন মূর্তিটিকে বিসর্জন দেওয়া হয়। মন্দিরে প্রত্যাবর্তনের পর অনেকে মনস্কামনা পূরণের জন্য মন্দিরে ধর্ণা দেন। তৎপর ধূপধুনা প্রজ্বলিত করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে নূতন প্রতিমার পূজা এবং ভৈরবের উদ্দেশ্যে একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। পূজার প্রথম দিনে মানতকারীগণ বহু সংখ্যক ছাগ বলি দেন এবং বলির মাংস প্রসাদ হিসাবে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা

হয়। মানতকারীগণের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ মনস্কামনা জানাইয়া ঠাকুরের মাথায় ফুল চাপান। শোনা যায়, ভৈরবঠাকুরের নিকট ধর্ণা দিয়া ও মানত জানাইয়া অনেকের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এইদিনই সম্বৎসরব্যাপী নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত পুরাতন প্রতিমাটিকে মহাসমারোহে বিসর্জন করা হয়। বর্ষাকালে প্রতিকূল আবহাওয়ায় এবং রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত থাকা সত্ত্বেও আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় চারিশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে ভৈরবের গাজন উৎসব উপলক্ষে নপাড়া গ্রামে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে নির্দিষ্ট স্থানের চারিপাশে প্রায় আড়াই বিঘা জমির উপর চারিদিন ধরিয়া মেল বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং সাধারণতঃ বিকাল হইতে লোকজনের সমাগম ও বেচাকেনা হয়।

মালিয়া, ঘুটগড়িয়া, বড়জোড়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতিদিন মেলায় প্রায় সাড়ে তিনশত যাত্রী আসেন এবং ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন, খেলনা-পুতুল প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রায় প্রতি বৎসরই মালিয়াড়া, দুর্গাপুর, বড়জোড়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ প্রমোদের জন্য কবিগান হয় এবং স্থানীয় যুবকেরা থিয়েটার করিয়া থাকেন।

খাঁড়ারী গ্রামে প্রতি বৎসর বুড়া মহাদেবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন দশ-বারো বিঘা জমির উপর চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচদিনব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া গ্রামবাসীরা অনুমান করেন।

সাধারণতঃ মালিয়াড়া, বড়জোড়া, মদারডিহা, বেলিয়াতোড়, কাপিষ্ঠা প্রভৃতি ইউনিয়ন সমূহ হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। ইহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বেশী। যাত্রীরা প্রধানতঃ মোটরবাস ও গরুরগাড়ী করিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বীরভূম জেলার রামপুরহাট, বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ও বিষ্ণুপুর এবং পুরুলিয়া জেলার ঝালদা শহর হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকানপাট বসে এবং অনেক ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী লাঠি-ছড়ি, ধামা-কুলো প্রভৃতি জিনিসপত্র, মাটির খেলনা পুতুল, ছাতা, মাদুর, কলা ইত্যাদি আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে আদায়কৃত অর্থের দ্বারা উৎসবের ব্যয়ভার নির্বাহ করা হয়।

আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলার দল আসে এবং যাত্রাভিনয় ও বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় যুবকেরা যাত্রাভিনয় করিয়া থাকেন। এই অনুষ্ঠানে অগণিত নরনারীর সমাবেশ হইতে দেখা যায়।

বড়জোড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির উপর দুইদিনের জন্য মেলা বসে। মেলার জমি আংশিক দেবোত্তর এবং আংশিক স্থানীয় গ্রামবাসীর। ইহা প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন মেলা।

পখন্না, হাট আশুড়িয়া, মালিয়াড়া, ঘুটগড়িয়া, খাঁড়ারী বেলিয়াতোড় প্রভৃতি অঞ্চল হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার নরনারীর প্রধানতঃ মোটরবাস ও গরুরগাড়ী করিয়া এবং অনেকে হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

ময়রা, মনিহারী, তেলেভাজা, বই-ছবি, খেলনা-পুতুল এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের মাত্র পনের-কুড়িটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় অঞ্চলের

লোকজন। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় নাগরদোলার দল আসে এবং পালাগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে; কোন কোন বৎসর অবশ্য কলিকাতা হইতে পেশাদারী দলও আসে। আমোদ প্রমোদের এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় আড়াই হাজার দর্শকের সমাগম হয়।

জগন্নাথপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রত্নেশ্বর নামে খ্যাত শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে ঠাকুরমন্দির সংলগ্ন প্রায় পনর-কুড়ি বিঘা দেবোত্তর জমির উপর চারি-পাঁচ-দিনব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত বহু গাম হইতে এবং সীমান্তবর্তী বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা সমূহ হইতে প্রতি বৎসর প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় পনর-ষোল হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ মোটরবাস, সাইকেল, রিক্সা, গরুরগাড়ী করিয়া এবং অনেকে হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বাঁকুড়া শহর, সোনামুখী, পানাগড়, রানীগঞ্জ, ঝালদা, মেদিনীপুর, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান সমূহ হইতে প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে বং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। উহাদের মধ্যে মিষ্টান্ন এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যা বেশী। তাহা ছাড়া, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়-চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুল, চা-পান সরবত প্রভৃতি দোকানপাটও বসে। গাজন উৎসব কমিটি মেলায় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করেন এবং আদায়কৃত অর্থে উৎসবের ব্যয়ভার নির্বাহ করা হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং জলসা ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। প্রায় প্রতি বৎসরই কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আসে।

মেট্যালী গ্রামে প্রায় প্রতি বৎসর ধর্মরাজের গাজন উৎসব উপলক্ষে বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া দুইদিনব্যাপী দামোদর নদীর তীরে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয় এবং সাধারণতঃ বিকালের দিকেই মেলায় লোকসমাগম ও বেচাকেনা হয়।

মালিয়াড়া, ঘুটগড়িয়া, মেজিয়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বশ্রেণীর প্রায় চারি-পাঁচ হাজার নরনারী গরুরগাড়ী ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

ময়রা, মনিহারী, খেলনা-পুতুল প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশটি দোকান বসে। প্রতাপপুর মালিয়াড়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই বিক্রেতারা আসেন।

মেলায় প্রতি বৎসর যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামেই দুইটি যাত্রাদল আছে। যাত্রা দেখিতে প্রায় তিন হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

মালিয়াড়া গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রায় পনর কাঠা দেবোত্তর জমির উপর দুইদিনের জন্য মেলা বসে এবং প্রতিদিন বিকালের দিকে মেলায় লোকসমাগম হয়।

পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় চারি-পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়। তাঁহাদের মধ্যে বাউরী ও বাগ্দী সম্প্রদায়ের লোকজনই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়। মেলায় প্রায় পনরটি মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই ছবি, কাপড়চোপড় এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের পনের-কুড়িটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়। তাহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ প্রমোদের জন্য জলসা ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে।

মহোৎসবের মেলা

গোঁসাইপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন উৎসব উপলক্ষে প্রায় এক বিঘা জমির উপর চারিদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুই শত

বৎসরের প্রাচীন এবং সাধারণতঃ বিকালের দিকেই মেলায় লোকসমাগম হয়।

খাড়রী, গদারডিহি, বৃন্দাবনপুর, ছান্দার প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন শত নরনারীর সমাগম হয়।

বেলিয়াতোড়, জগন্নাথপুর, বৃন্দাবনপুর প্রভৃতি স্থান সমূহ হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। উহাদের মধ্যে মনিহারী, মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতিই মেলায় আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ প্রমোদের জন্য কবিগান, রামায়ণগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গোঁসাইপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত রাসযাত্রার মেলা ও গাজনের মেলা উল্লিখিত মহোৎসবের মেলার অনুরূপ।

ভৈরবপুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে চব্বিশপ্রহর-ব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে প্রায় এক বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বিকালের দিকে মেলায় লোকসমাগম ও বেচাকেনা হয়।

বড়জোড়া, জমাসার গ্রাম, মালপুর, ব্রাহ্মণডিহা, মানগ্রাম, রাজমাধবপুর, হরিনাগড়্যা, কমলা, কোটগ্রাম, সাঁয়েরগ্রাম, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি গ্রাম হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিদিন প্রায় সাত শত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ হাঁটিয়াই মেলায় আসেন।

ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, খেলনা-পুতুল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্রে পঞ্চাশ ষাটটি দোকান বসে। বিক্রেতারা বড়জোড়া ও আশপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন।

আমোদ প্রমোদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা ও কবিগানের আয়োজন করা হয়।

শীতলাপূজার মেলা

তাজপুর গ্রামে শীতলা পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে প্রায় দশদিনব্যাপী সাধারণের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

রাজমাধবপুর, বড়জোড়া, পখন্না, পুড়াকোন্দা, রাজপ্রসাদপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় দেড় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। অধিকাংশ যাত্রী হাঁটিয়াই মেলায় আসেন।

মেলায় খাবার, মনিহারী, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির মাত্র পনের-ষোলটি দোকান বসে। বিক্রেতারা সকলেই স্থানীয়।

আমোদ প্রমোদের জন্য উৎসব প্রাঙ্গণে কীর্তন, রামায়ণ-গান এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়।

বারুনী স্নান

কৃষ্ণনগর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে রঙ্কিনীপূজা ও বারুনী স্নান উপলক্ষে দামোদর নদী কূলবর্তী প্রায় দুই বিঘা জমির উপর তিনদিন-ব্যাপী মেলা বসে। ইহা 'রঙ্কিনীদেবীর মেলা' নামেও পরিচিত। ইহা প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

পখন্না, হাট আগুড়িয়া, ঘুটগোড়িয়া, মালিয়াড়া, গদারডিহি, সাহারজোড়া প্রভৃতি ইউনিয়ন এবং বর্ধমান, হইতে সর্বশ্রেণীর প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। মেলায় প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং আট-দশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। উহাদের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন, মনিহারী, তাঁতের কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, পান-বিড়ি, সরবত, শাকসব্জী প্রভৃতি জিনিসপত্রের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ প্রমোদের জন্য মেলায় নাগরদোলা, ম্যাজিকের দল আসে এবং কীর্তনগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই কীর্তনগানের দল আছে, ম্যাজিক দলটি রানীগঞ্জ হইতে আসে।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ মেজিয়া। ৩৭।২,০৮২.২৬।৪৭৫।২ ৬৪১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে, বেনে, তাম্বুলী, ছুতার, স্যাকরা, মুচি, হাঁড়ী, ডোম, বাগ্দী, বাউরী, কলু, পশ্চিমা মাড়োয়ারী ও মুসলমান।

গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, কায়স্থপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, কুমারপাড়া, তাঁতিপাড়া, ছুতারপাড়া, মুচিপাড়া, হাড়ীপাড়া, বাগ্দীপাড়া, জেলেপাড়া, বাউরীপাড়া, কলুপাড়া ও মুসলমানপাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রানীগঞ্জ হইতে মেদিনীপুর-গামী মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গণেশপূজা ও বৌদ্ধ-পূর্ণিমা উৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজপূজা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা, পৌষ সংক্রান্তিতে মকর স্নানযাত্রা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাচদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

মকর স্নানযাত্রার মেলা। পৌষ মাসে একদিন।

(চ) গ্রামে দুইটি ধর্মরাজের মন্দির আছে। উহার একটির সহিত নাটমন্দির সংযুক্ত।

শ্রীঅনিল বরণ ভুঁই, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ মেজিয়া,
বাঁকুড়া।

"বাঁকুড়া জেলার উত্তর সীমার শেষগ্রাম মেজিয়া বাঁকুড়া হইতে মোটরবাস যোগে যাওয়া যায়। ইহা দামোদর নদের দক্ষিণতীরে অবস্থিত। .... মেজিয়ার অনতিদূরস্থ ভুলুই নামক গ্রামে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে কবি জগৎরাম ও রামপ্রসাদ রায় জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদ জগৎরাম রায়ের পুত্র। ইঁহারা পিতাপুত্রে মিলিয়া "অদ্ভুত অষ্টকাণ্ড রামায়ণ" নামে পরিচিত এক রামায়ণ রচনা করেন। এই রামায়ণে সীতা কর্তৃক সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধের বৃত্তান্ত আছে। রামপ্রসাদ রায় "দুর্গা পঞ্চরাত্র" ও "কৃষ্ণলীলামৃত" নামে অপর দুইখানি গ্রন্থও রচনা করেন।"

(বাংলায় ভ্রমণ : ১ম খণ্ড : পৃঃ ১৫৫)

২। গ্রাম ঃ রামচন্দ্রপুর। ৬৫।১,৯০১.৫৮।২৬০।১,৮৭১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, বাউরী, গোয়ালা, ডোম, ধোপা, কলু, তেলি, জেলে, তাঁতি, মুচি, বণিক, সদগোপ ও খয়রা। গ্রামে বৈদ্যপাড়া, গোয়ালাপাড়া, বাউরীপাড়া, ডোমপাড়া, তেলিপাড়া ও খয়রাপাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন অণ্ডাল জংশন হইতে নন্দনপুর-নাগরডাঙ্গা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে শ্যামচাঁদজীউর জন্মাষ্টমী, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

রাসযাত্রা উৎসবটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

শিবের গাজন উৎসবটি সাড়ম্বরে সাতদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের কয়েকদিন যথারীতি পূজা ও ভোগ এবং শেষদিন সর্বজনীন ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। এই শিবের গাজনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, উৎসবের পঞ্চম-দিবস রাত্রিকালে সদ্য আনীত দলশেওলার উপর একটি মাটির পাত্রে রক্ষিত কিছু পরিমাণ দুগ্ধ রাখিয়া শিবমন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তৎপর মন্দির হইতে প্রায় ত্রিশ-পয়ত্রিশ হাত দূরে সজ্জিত শালকাষ্ঠে আগুন জ্বালাইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকে ততক্ষণ

পর্যন্ত ভক্তরা দল বাঁধিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। অগ্নি নির্বাপিত হইলে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিবার পর দেখা যায় যে, উক্ত মাটির পাত্রের দুগ্ধ আপনি উথলাইয়া পড়িয়াছে। গ্রামবাসীগণের বিশ্বাস, পাত্রের দুগ্ধ যেদিকে বেশী পরিমাণে উথলাইয়া পড়িবে সেই দিকে সেই বৎসর বেশী বৃষ্টিপাত হইবে। গাজনের এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু নরনারীর সমাগম হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রাসমন্দিরসহ শ্যামচাঁদজীউর মন্দির এবং একটি শিবমন্দির আছে। শ্যামচাঁদজীউর মন্দির প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। ইহা ব্যতীত, গ্রামে মনসা ও শীতলা ঠাকুর আছে।

শ্রীরণেন্দ্র কুমার পট্টনায়ক, প্রধান শিক্ষক,
ও
শ্রীনির্মল কুমার পট্টনায়ক, সহকারী শিক্ষক,
গ্রাম : রামচন্দ্রপুর, পোঃ শ্রীপাট পুরুলিয়া
বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম ঃ বানজোড়া। ৭৩।১,৯১১.৪১।১৭৬।৯৮০

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, গোয়ালা, তিলি, কলু, বেনে, মুচি ও বাউরী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ওয়ারিয়া হইতে মালিয়াড়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, ফাল্গুন মাসে রাধামাধবজীউর দোলযাত্রা উৎসব ও হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন। মেলায় কয়েকটি মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকান বসে এবং রাত্রিকালে থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে রাধামাধবজীউ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ছাড়া, গ্রামে মনসা ও শীতলা ঠাকুর আছে।

শ্রীমদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক'
বানজোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

উৎসব বিবরণী

রাসযাত্রা উৎসব

রামচন্দ্রপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমা হইতে তিনদিনব্যাপী ধূমধামের সহিত শ্যামচাঁদজীউর রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ণিমার দিন প্রত্যুষে শ্যামচাঁদজীউর যুগল বিগ্রহ সাড়ম্বরে শোভাযাত্রা সহকারে মূল মন্দির হইতে রাস মন্দিরে আনিয়া স্থাপন করা হয় এবং তথায় যথারীতি পূজা ও হরিনাম সংকীর্তন ও রাত্রিকালে যাত্রাভিনয় হয়। পরের দিন প্রত্যুষে পুনরায় শোভাযাত্রা করিয়া শ্যামচাঁদ-জীউর বিগ্রহ মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। মন্দিরে পূজাদির পর সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্যামচাঁদের শোভাযাত্রায় প্রায় আড়াই সহস্র নরনারী যোগদান করেন। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা "ঠাকুর বিজয়া" মিছিল নামে পরিচিত।

শোনা যায়, শ্যামচাঁদজীউর প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর পট্টনায়ক পঞ্চকোটাধিপতির দেওয়ান ছিলেন। তিনি পঞ্চকোটের মহারাজার সহিত পুরীধাম হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে বিষ্ণুপুরের মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং বিদায়কালে বিষ্ণুপুরের মহারাজার নিকট হইতে শ্যামচাঁদজীউ ও শ্রীরাধিকা বিগ্রহ নিয়া আসেন। পঞ্চকোটের মহারাজা রামচন্দ্রপুর গ্রামটি ঠাকুরের সেবা, পূজা ও পার্বণাদির ব্যয়ভার নির্বাহকল্পে আনুমানিক ১১৪৪ বঙ্গাব্দে উৎসর্গ করতঃ তাঁহাকে দেওয়ানী কার্য হইতে ইস্তাফা দিয়া ঠাকুর সেবার কার্যে নিযুক্ত করেন। ইহার পর রামেশ্বর পট্টনায়ক ও তাঁহার বংশধরগণ আদি বাসস্থান পুরুলিয়া জেলার মানভূমের অন্তর্গত মুরাড্ডী গ্রাম ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রপুর গ্রামে বসবাস স্থাপন করেন এবং শ্যামচাঁদের মন্দির নির্মাণ করিয়া নিত্যসেবাপূজার ব্যবস্থা করেন।

পলাশী যুদ্ধের পর ঠাকুরের দেবোত্তর স্বত্তের মধ্যে পাছে কোন বিপত্তির সৃষ্টি হয় এই আশঙ্কায় ১১৬৪ সনের ২২শে মাঘ পঞ্চকোটের মহারাজা একখানি 'লাখেরাজ' দেবোত্তরের সনন্দ পত্র দেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিবার পর ১১৭৮ বঙ্গাব্দে বীরভুমের Supervision of Revenue এর Alexender Higginson সাহেবের দস্তখতি ও মঞ্জুরী "তেরীজ বাজে জমীন" নামক ফর্দে মৌজাটি ঠাকুরের দেবোত্তর সম্পত্তি স্বরূপ স্বীকার করেন। উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি সনদে এই গ্রামটির পূর্বসীমা "বর্গীয়া সড়ান" নামে লিপিবদ্ধ আছে। এইস্থান দিয়া বর্গীগণ নদী পার হইয়া বর্দ্ধমান জেলায় যাতায়াত করিত বলিয়া রাস্তাটির নামও 'বর্গীয়া সড়ান' হয় এবং ঠাকুরের দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবার পূর্বেই এই নামকরন হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

ধর্মরাজপূজা

মেজিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শোনা যায়, ধর্মরাজ শিলাটি একদা গরুর বাথান হইতে পাওয়া যায় বলিয়া স্থানীয় অঞ্চলে ইহা বাথানিয়া উৎসব নামেও পরিচিত।

এই সম্পর্কে একটি কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী শোনা যায়। কথিত আছে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে এই গ্রাম নিবাসী বেচারাম দেওয়াসী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নামে দুই বন্ধু তীর্থযাত্রায় বাহির হইলে পথে বেচারাম স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া একটি গরুর বাথান হইতে গোলাকার চাকতির মত একটি শিলা পান এবং ঐ শিলা তাঁহারা গ্রামে আনিয়া মন্দির নির্মাণ করিয়া ধর্মরাজরূপে পূজার ব্যবস্থা করেন। বেচারাম ধর্মরাজের সেবাইত হন এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ধর্মরাজের পূজারী নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ধর্মরাজের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্র গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে প্রতিদিন লোকজন ধর্মরাজের পূজাদি দিতে আসিয়া থাকেন এবং তাহাতে বেশ অর্থ সমাগম হইতে থাকে। ফলে চক্রবর্তী মহাশয় লোভের বশবর্তী হইয়া ধর্মরাজকে নিজ বাটিতে লইয়া গিয়া মন্দির নির্মাণ করিয়া পূজাদি করিতে থাকেন। ইহার ফলে দুই বন্ধুর মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং সেই বিবাদ জেলা শাসক পর্যন্ত যায়। কিন্তু পরে দৈবাদেশে বেচারামই ধর্মরাজপূজার অধিকার পান। শূদ্রের নিকট পরাজিত হইয়া ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথ খুবই ব্যথিত হন। ইহাতে করুণাপরবশ হইয়া ধর্মরাজ পুনরায় এক স্বপ্নাদেশে বিশ্বনাথকে তাঁহার পূজারী নিযুক্ত করেন। তদাবধি ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয় সম্প্রদায়ই পৃথকভাবে দুই মন্দিরে ধর্মরাজের উৎসবাদি করিয়া থাকেন।

মেলা বিবরণী

মকরস্নানের মেলা

মেজিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে মকরস্নান উপলক্ষে দামোদর নদীর উভয় পার্শ্বের বিস্তীর্ণ তটভূমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে।

মেলায় স্থানীয় এবং তারাপুর, জেমুয়া, পার্ব্বতীপুর, ভুলুই, ভাড়া, বিশিঙা, কাটাবাইছ, ডাংমেজিয়া, কুশতোড়, বেনাবাইছ প্রভৃতি স্থান হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় সাত-আট সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী, মোটরগাড়ী, সাইকেল রিক্সা এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলার যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান।

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বর্দ্ধমান জেলার রানীগঞ্জ শহর ও বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া, গঙ্গাজলঘাটি, খাগড়া, প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, ঔষধপত্র, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্যান্য নানাবিধ জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক ও নাগরদোলার দল আসে এবং কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়। অনেকে লটারী খেলিয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—মেজিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত ধর্মরাজপূজার মেলাটি উল্লিখিত মকরস্নানের মেলার অনুরূপ।

রাসযাত্রার মেলা

রামচন্দ্রপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় শ্যামচাঁদজীউর রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রাসমন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা দেবোত্তর জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

মেজিয়া, অৰ্দ্ধগ্রাম, বানজোড়া, কুস্তোড় প্রভৃতি গ্রাম ব্যতীত বর্দ্ধমান জেলার অণ্ডাল ও রানীগঞ্জ হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় তিন সহস্র নরনারী প্রধানতঃ মোটরবাস ও গরুরগাড়ী করিয়া মেলায় আসেন। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বর্দ্ধমান জেলার অণ্ডাল ও রানীগঞ্জ হইতে প্রায় প্রতি বৎসর ময়রা ও মনিহারী দ্রব্যাদি লইয়া মেলায় আসেন। মেলায় প্রায় পঁচিশটি দোকানপাট ব্যতীত পাঁচ-ছয় জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, মনিহারী ব্যতীত অন্যান্য নানা প্রকার জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা খাজনা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য জলসা, কীর্তনগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন বৎসর কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আসে। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় তিন সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রামঃ তিলুড়ি ।৬।৮২৫.৪৫।৫২৮।৩,২৮৮

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, তিলি, ধোপা, ছুতার, সুবর্ণবণিক, নাপিত, কলু, ময়রা, ছত্রী, বাউরী, কামার ও মাড়োয়ারী। গ্রামে নয়টি পাড়া আছে। যথা—ব্রাহ্মণপাড়া, বৈদ্যপাড়া, কলুপাড়া, বাউরীপাড়া, ময়রাপাড়া, পোদ্দারপাড়া, তিলিপাড়া, ছুতারপাড়া ও ধোপাপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মধুকুণ্ডা হইতে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা ও ঝুলনযাত্রা, ভাদ্র মাসে বিশ্বকর্মাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও রাসযাত্রা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা, রামনবমী উৎসব ও চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত বৎসরে বিভিন্ন সময়ে গ্রাম্যদেবদেবীগণের পূজা হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

উড়েশ্বরীর মেলা। চৈত্র মাসে একদিন।

চড়কের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে একদিন।

(চ) গ্রামে চারিটি দুর্গামণ্ডপ ও একটি হরিমন্দির আছে। গ্রামে একটি প্রাচীন বটগাছের নীচে উড়েশ্বরী দেবী নামে পরিচিত একটি শিলামূর্তি এবং গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব কোণে ইষ্টক নির্মিত শিবমূর্তি এবং কেন্দ্রস্থলে একটি পাকা চত্বরের উপর প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধমূর্তি ও নটরাজ মূর্তি সহ অন্যান্য নানা দেবদেবীর প্রায় কুড়িটি মূর্তি আছে। গ্রামবাসীগণ বৎসরের বিভিন্ন সময়ে গ্রাম্যদেবদেবীর পূজাদি দিয়া থাকেন।

উপরোক্ত দেবদেবী ব্যতীত, গ্রামে কুড়িটি পঞ্চানন্দ, পাঁচটি শীতলা, পনরটি মনসা, একটি রাধামাধব, একটি রঘুনাথজীউ, একটি দামোদরজীউ, একটি শ্রীধরজীউ, সাতটি গণেশজননী, একটি সরস্বতী, একটি কৃষ্ণ এবং ব্যক্তি বিশেষের গৃহে নিমকাষ্ঠ নির্মিত একটি জগন্নাথ মূর্তি আছে।

জনশ্রুতি আছে, গ্রামের আদি বাসিন্দা ছিলেন 'তিলি' সম্প্রদায়েরা এবং এই কারণে গ্রামের নাম হয় 'তিলিডিহি'। তিলিডিহি অপভ্রংশ 'তিলুড়ি' হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
তিলুড়ি কৃষ্ণময়ী উচ্চ বিদ্যালয়,
ও
শ্রীনরেন্দ্র নাথ চোড়, গ্রাম সেবক,
গ্রামঃ ও পোঃ তিলুড়ি, বাঁকুড়া।

২। গ্রামঃ উদয়পুর ।১১।১,৩৪৭.৬৩।১৫৭।৯৮৩

(ক) বৈদ্য, মাল, বাউরী, নাপিত, গরাই, তাঁতি ও সাঁওতাল। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন—বৈদ্যপাড়া, বাউরীপাড়া, সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মধুকুণ্ডা হইতে বাঁকুড়া-তিলুড়ি পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাঁধনা পরব, অগ্রহায়ণ মাসে নাগরদোলা উৎসব, পৌষ মাসে শালুইহলা এবং মাঘীপূর্ণিমা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

প্রতি বৎসর সাধারণতঃ দুর্গাপূজার পর বাঁধনা পরব অনুষ্ঠিত হয়। বাঁধনা পরব উপলক্ষে ছাগ ও মোরগ বলি দিয়া মারাংবুরু দেবতার পূজা দেওয়া হয়।

প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে একটি নাগরদোলাকে পুষ্পপত্রে সজ্জিত করিয়া ছাগ ও মোরক বলি দিয়া ধূমধামের সহিত পূজা করা। আদিবাসীগণ নাগরদোলাকে নিজেদের রক্ষা-কর্তা দেবতারূপে পূজা করিয়া থাকেন।

প্রতি বৎসর পৌষ মাসে সংক্রামক ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্থানীয় সাঁওতাল সম্প্রদায় 'শালই হলা'

দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। পূজায় ছাগ ও মোরগ বলি দেওয়া হয় এবং পূজান্তে রীতি অনুসারে মদ্যপান করা হয়। মাঘীপূর্ণিমার পূজাটি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের এবং শালুইচলা পূজার অনুরূপভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বাঁধনা পরবের মেলা। কার্তিক মাসে একমাস-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মারাংবুরু, জাহের-বুরু, মড়েকু, গোঁসাই এবং প্রভৃতি দেবদেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীমেজুলাল মুর্মু,
গ্রাম: উদয়পুর, পোঃ তিলুড়ি,
বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম: বেহারী।৬৪।৬৭৩'৭২।৪৮।৩২৪

(ক) ব্রাহ্মণ, বাউরী ও সাঁওতাল।

গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, বাউরীপাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মধুকুণ্ডা হইতে ইচুড়ী রুটের মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে বিহারীনাথ শিবের শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা আঞ্চলিক সর্বজনীন উৎসব এবং বহুকাল যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বিহারীনাথের, ভৈরবনাথের ও শিবের মন্দির ব্যতীত বিন্দুবাসিনী, অনন্তদেব, বুদ্ধদেব ও ভৈরবনাথ প্রভৃতি দেবদেবী আছে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে একটি ছোট মন্দিরে কয়েকটি গ্রাম্য দেবদেবীর সহিত রঘুনাথদেবের পদচিহ্ন খোদিত একটি প্রস্তর ফলক রক্ষিত আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পার্শ্ববর্তী পগারবাড়ী গ্রামে 'শিবগঙ্গা' নামে একটি পবিত্র পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণীর জল দিয়া স্থানীয় অঞ্চলে দেবদেবীর পূজা ও ভোগ রন্ধনাদি হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, নবজাত শিশুদের প্রথম মস্তক মুণ্ডন করিয়া এই পুষ্করিণীর জল দিয়া স্নান করান হয়। শোনা যায়, পূর্বে বিহারীনাথ পর্বত হইতে প্রবাহিত একটি ঝরণার জল আসিয়া এই পুষ্করিণীতে পড়িত। বর্তমানে ঐ ঝরণা ধারা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীফণি ভূষণ পাল, গ্রামসেবক,
ও
শ্রীদেবীপ্রসাদ ঠাকুর, কৃষিজীবি,
গ্রাম ও পোঃ বামুনতোড়,
বাঁকুড়া।

Biharinath—It is a forest-clad hill, about 1,449 feet high in the police station of Saltora. In ancient times it was a famous Saiva centre. In the remote past it was also probbly a seat of Jainism, as is suggested by a stone image of Parsvanath reclining against one of the walls of the present temple. Later on, it became the centre of Bishnu worship and there is a twelve-armed stone image apparently of Bishnu. There is also a *Lingam* in the modern brick structure in the northern slopes of the hill.

(District Census Handbook, Bankura, 1961 by B. Ray, p. 143)

৪। গ্রাম: মটুকবনি। ৬৭।৫২৫'৬৯।২০৬।১,১১২

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, বেনিয়া, কামার, কুমার, কলু, তাঁতি, নাপিত, ধোপা, গোয়ালা ও বাউরী। গ্রামে নামোপাড়া, উপরপাড়া, কামারপাড়া, নাপিতপাড়া, বাউরীপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, ব্যবসায় ও কুটির শিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মধুকুণ্ডা। তাহা ছাড়া, শালতোড়া-কাস্তোড় রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, প্রতি বৎসর আষাঢ় সংক্রান্তিতে ও মকর

সংক্রান্তিতে 'মটুকবনী বুড়ি' নামক গ্রাম্যদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি জীর্ণ কালীমন্দির ও মটুকবনী বুড়ি নামে গ্রাম্যদেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে। ইহা ছাড়া, সাধারণের একটি মাটির ঘরে বিভিন্ন গ্রাম্যদেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীভবতারণ গাঙ্গুলী, প্রধান শিক্ষক,
মেজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়,
পোঃ মেজিয়া,
বাঁকুড়া।

৫। গ্রাম : ঢেকিয়া। ৮১।৬৭৩৪।১৭৫।৯২৬

(ক) ব্রাহ্মণ, তাঁতি, বাগ্দী, নাপিত, গন্ধবণিক, কামার, কলু, সরাক ও বাউরী। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন বাগ্দীপাড়, নাপিতপাড়া, তাঁতিপাড়া, বাউরীপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রানীগঞ্জ হইতে তেঁতুল-টুকরী-ঢেকিয়া পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায় এবং বাঁকুড়া হইতে ঢেকিয়া গ্রাম পর্যন্ত নিয়মিত মোটর-বাস চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বরুণেশ্বর শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের (সহস্র বৎসরের ?) প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দিরে বরুণেশ্বর নামে খ্যাত অনাদিলিঙ্গ শিব ব্যতীত ভৈরবরাজ, বিরিঞ্চি নারায়ণ, হর-পার্বতী, বনখণ্ডি শিব, মনসা, শীতলা, চণ্ডী, দুর্গা, কালী, মঙ্গলা প্রভৃতি দেবদেবী আছে।

বরুনেশ্বর শিবমন্দিরটি স্থানীয় জনৈক তাঁতি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শোনা যায়। এই অনাদিলিঙ্গের আবির্ভাব সম্পর্কে গাভী কর্তৃক অন্যের অলক্ষ্যে শিবলিঙ্গের শিরোপরি দুগ্ধদান ইত্যাদি বহুল প্রচলিত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

শ্রীঅচিন্ত্য নাথ মণ্ডল, গ্রামসেবক,
ঢেকিয়া ইউনিয়ন,
বাঁকুড়া।

৬। গ্রাম : পাবড়া। ৮৬।২,০৫০৫১।৫০৫।৩,২৪১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কামার, তাম্বুলী, নাপিত, সরাক, স্বাকরা, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, শুঁড়ি, ধোপা, গোয়ালা, কলু, জেলে, হাড়ি, বাউরী, মুচি, ডোম ও তাঁতি। গ্রামে কুড়িটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) পূর্ব ভারতীয় রেলপথের রানীগঞ্জ রেলস্টেশন হইতে দামোদর নদী পার হইয়া মেজিয়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে চব্বিশপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে শিব, ধর্মরাজ ও চণ্ডীর গাজন উৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও রাধাবিনোদ ঠাকুরের রাসযাত্রা উৎসব, মাঘী পূর্ণিমায় হরিনাম সংকীর্তন উৎসব এবং শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে হর-পার্বতী একাসনে উপবিষ্ট একটি বৃহৎ শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে মোট সাতটি পঞ্চানন্দ এবং চারিটি বাবাঠাকুর আছে।

আদিতে গ্রাম পত্তন কালে এই স্থানে হাড়ি ও শুঁড়ি সম্প্রদায় বসবাস করিতেন। বর্তমানে অবশ্য বিভিন্ন সম্প্রদায় বসবাস করিতেছেন এবং গ্রামে একটি ডাকঘর, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দুইটি ডাক্তারখানা আছে। শঙ্খ, কাষ্ঠ, কাঁসা-পিতলের বাসনকোসন, তাঁতের কাপড়, প্রতিমা নির্মাণ প্রভৃতি কয়েকটি শিল্পের জন্য গ্রামটি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শ্রীসুধীর চন্দ্র দত্ত, চিকিৎসা,
গ্রাম ও পোঃ পাবড়া,
বাঁকুড়া।

৭। গ্রাম : ছাতাপাথর। ১১৯।৬০৬৬৪।৪৯।৩৬৫

(ক) গোয়ালা, তিলি ও সাঁওতাল। গ্রামে পাচটি পাড়া আছে। যেমন—গোয়ালাপাড়া, তিলিপাড়া, সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রানীগঞ্জ। গ্রামের পার্শ্ব দিয়া মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) স্থানীয় সাঁওতাল সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে আবগিপূজা, পৌষ মাসে সহরায়পূজা, মাঘ মাসে মাঘাসিনপূজা এবং ফাল্গুন মাসে বাহা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) শিবতলার মেলা। পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি বাংলা ১৩২৮ সন হইতে বসিতেছে।

(চ) ×

শ্রীরঞ্জীবন মণ্ডী,
গ্রাম : ছাতাপাথর,
বাঁকুড়া।

৮। গ্রাম: বারকোনা।১৫১।১,১৬৯০।২৪৯।১,৩৬১

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, তাম্বুলী, বৈরাগী, ছুতার, তাঁতি, খয়রা, গোয়ালা, বাউরী, মুচি, ময়রা, ডোম, কলু ও সরাক।

গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, সরাকপাড়া, তাম্বুলীপাড়া ও বাউরীপাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) বাঁকুড়া রেলস্টেশন হইতে ছাতনা-মেজিয়া রুটের মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, বৎসরের বিভিন্ন সময়ে শীতলাপূজা হইয়া থাকে। উৎসবগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীদুর্গাদাস দত্ত, প্রধান শিক্ষক,
গ্রাম : বারকোনা, পোঃ চাঁদড়া,
বাঁকুড়া।

মেলা বিবরণী

আদিবাসী উৎসবের মেলা
(বাঁধনা পরব)

উদয়পুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে বাঁধনা পরব উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে খোলা জায়গায় প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একমাসব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রধানতঃ প্রত্যহ গড়ে পাঁচ-ছয় শত নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ তিলুড়ি, শালতোড়া প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, তেলেভাজা, পান-বিড়ি, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা-পুতুল ইত্যাদি জিনিসপত্র আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, গানবাজনা ও সাঁওতালী নাচের ব্যবস্থা করা হয় পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সাঁওতালী নরনারীগণ দল বাঁধিয়া আসিয়া মেলার নৃত্যগীতে যোগদান করেন। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় সহস্রাধিক দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

ঢেকিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বরুণেশ্বর শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় তিন সহস্র নরনারী মেলায় আসেন।

পাবড়া, শুশুনিয়া, কান্ডুড়ী প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে বিক্রেতাগণ আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের মোট পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান ব্যতীত অন্যান্য নানাপ্রকার

দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, যাত্রাভিনয় এবং সাঁওতালী নাচের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় এক সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

পাবড়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

ঢেকিয়া, শালতোড়া, বামুনতোড়, সালমা, কুস্থোড়, অর্দ্ধগ্রাম, মেজিয়া, গোগড়া ও রাণ্ড়ী প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ রানীগঞ্জ হইতে আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। মিষ্টান্ন, ধামাকুলা প্রভৃতি অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলার দল আসে এবং প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা, রামায়ণগান, কবিগান ও সাঁওতালী নাচের ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে জুয়া খেলিয়া থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

রথযাত্রার মেলা

তিলুড়ি গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের ফুটবল খেলার মাঠে প্রায় পনর বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চার হাজার নরনারী মোটরবাস, গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণ বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম ছাড়া বর্ধমান জেলার আসানসোল হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য আমদানী হয়।

আমোদ প্রমোদের জন্য সত্যপীরেরগান, মনসামঙ্গল-গান, কবিগান, বাইনাচ, ঝুমুরগান, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই ঝুমুরগান ও যাত্রার দল আছে। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দুই সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—তিলুড়ি গ্রামে চৈত্র মাসে উড়েশ্বরীর মেলাটি এবং চড়কের মেলাটি উল্লিখিত রথযাত্রার মেলার অনুরূপ।

শিবরাত্রির মেলা

বেহারী গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে বিহারীনাথ শিবের শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে 'বিহারীনাথ' নামক পর্বতের পাদদেশে প্রায় চারি-পাঁচ বিঘা জমির উপর চারিদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা বহুকালের প্রাচীন।

বাঁকুড়া জেলার তিলুড়ি, ঢেকিয়া, পাবড়া, সালমা, বামুনতোড়, শালতোড়া, বর্ধমান জেলার আসানসোল ও বার্ণপুর, পুরুলিয়া জেলার সাঁতুড়ী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় দেড় সহস্র নরনারী মেলায় আসেন।

মেলায় প্রধানতঃ বর্ধমান জেলা হইতে প্রায় প্রতি বৎসর ময়রার দোকান আসে। পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালা ছাড়া বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। তন্মধ্যে ময়রা ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, বাউল-সঙ্গীত এবং পালাকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। বাউল-সঙ্গীত ও পালাকীর্তন গানের দল প্রধানতঃ শালতোড়া হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসে। এই সকল অনুষ্ঠানে দেড় হইতে দুই সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ ধানারাঙ্গী। ৮।১,২২২.১৭।১২৬।৯০০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহাতো, হাড়ী, কামার, ডোম, নাপিত, মুচি, ধোপা, গোয়ালা, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামে মাঝিপাড়া, ডোমপাড়া, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি নামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও তাঁতশিল্প ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত পূজা-পার্বণগুলি সর্বজনীন এবং বহুদিনের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তি তিথিতে প্রায় এক বিঘা জমিতে একদিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে। মেলায় আশপাশ হইতে মাহাতো, হাড়ী, কামার, মাঝি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রায় দুই শতাধিক লোকজন আসেন এবং খাবার, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকানপাট বসে এবং আমোদ প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হয়। স্থানীয় লোকেরা এই মেলাটিকে প্রায় আটশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করেন।

(চ) গ্রামে একটি বাবাঠাকুর ও সাতটি মনসা আছে।

শ্রীসুধাকর মাহাতো, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ ধানারাঙ্গী,
পোঃ মলিয়ান, বাঁকুড়া।

২। গ্রাম ঃ পাখুরিয়া। ১৮।৪১৪.০৯।৯৪।৫২১

(ক) ব্রাহ্মণ, ভূমিজ, গোয়ালা, ময়রা, কলু, বাউরী ও মুসলমান। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, গোয়ালপাড়া, ভূমিজপাড়া এবং বাউরীপাড়া নামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে মলিয়ান রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং ইহা মাত্র বার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি মাত্র বার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। নন্দা, শালুইপাহাড়ী, কেন্দুয়া, খয়েরকুন্দী, মলিয়ান, পচুনাড়া, ব্রাহ্মণডিহা প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিনশত নরনারী আসেন এবং খাবার, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির দশ-বারোটি দোকান বসে। আমোদ প্রমোদের জন্য ছৌ-নাচের ব্যবস্থা করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি কাঁঠাল গাছের নীচে শিবের নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত একটি বাবাঠাকুর, দুইটি মনসা এবং একটি গ্রাম্যদেবতা আছে।

শ্রীশ্যামাপদ মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
গ্রাম ঃ ঝরিয়াকাটা,
পোঃ মলিয়ান, বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম ঃ ঝাপানডিহি। ৪৮।৩৩০.৪৪।৭২।৪৮৫

(ক) বাউরী ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে মলিয়ান রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন ব্যতীত ফাল্গুন মাসে শালই দুতলা নামে এক গ্রাম্যদেবতার পূজা ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাঁধনা পরব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে তিনদিন-ব্যাপী।

গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলা দুইটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ ও মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীকৃপাসিন্ধু মহান্ত, প্রধান শিক্ষক,
ঝাপানডিহি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৪। গ্রাম : কেন্দুয়া। ৪৯।২৮৫.৩৩।৬৬।৩২৫

(ক) ভূমিজ, জেলে, কামার, তাঁতি, হাড়ী ও শুঁড়ি। গ্রামটিতে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে মলিয়ান রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয়শত নরনারী মেলায় আসেন এবং ময়রা, মনিহারী, খেলনা-পুতুল ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে।

(চ) ×

শ্রীধরণীধর চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ মাশিয়াড়া, বাঁকুড়া।

৫। গ্রাম : হিড়বান্ধ। ৭৬।৪৪৪.৬৭।১৪৭।৮৮৭

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, ময়রা, নাপিত, তাম্বুলী, কলু, ডোম, বাউরী, জেলে, কামার, ভূমিজ, সাঁওতাল ও মুসলমান। বামনপাড়া, সাঁওতালপাড়া, বাউরীপাড়া, ডোমপাড়া, ভূমিজপাড়া, কলুপাড়া, কায়স্থপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে খাতড়া-মালিয়ান পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

শিবের গাজন। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও দুর্গামণ্ডপ ব্যতীত একটি বাবাঠাকুর, একটি শীতলা, তিনটি মনসা এবং দুইটি গ্রামদেবতা আছে।

জনশ্রুতি আছে যে, এই অঞ্চলের বড় বড় ধানের ক্ষেতকে স্থানীয় লোকেরা "হিড়" বলিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ বহু "হিড়" এবং বাঁধ-এর প্রাধান্যহেতু গ্রামটির নাম 'হিড়বান্ধ' হইয়াছে।

শ্রীনবীন চন্দ্র মহাপাত্র, প্রধান শিক্ষক,
হিড়বান্ধ হাই স্কুল,
গ্রাম ও পোঃ হিড়বান্ধ,
বাঁকুড়া।

৬। গ্রামঃ চাঁপাশোল। ৭৮।৭২০.২১।১০০।৭৩০

(ক) ব্রাহ্মণ, নাপিত, কলু, আহির গোপ ও বাউরী। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া ও বাউরীপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে খাতড়া-মলিয়ান রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী, আশ্বিন মাসে জিতাষ্টমী এবং চৈত্র মাসে রামনবমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির এবং অপর একটি পাকা মন্দিরে রঘুনাথজীউয়ের শিলাময় মূর্তি এবং জানকীরামজীউ, রামগোপালজীউ, যদুগোপালজীউর ধাতুময়মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ছাড়া, মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে। রঘুনাথজীউ মন্দিরটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। শোনা যায় ইহা স্থানীয় জমিদার স্বরূপনারায়ণ পাইন মহাশয়ের আমলে নির্মিত। জনশ্রুতি আছে,

স্বরূপনারায়ণ পাইন খাতড়ার ক্ষত্রিয় জমিদারের নিকট হইতে এই মৌজাটি বন্দোবস্ত লইয়া এই স্থানের বনজঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া বাস ও চাষের উপযোগী করেন। তিনি আল দিয়া 'শোল' জমি তৈয়ারী করেন। স্বরূপনারায়ণের আদি বংশধরগণ দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত।

শ্রীঅধর চন্দ্র পাইন, প্রধান শিক্ষক,
চাপাশোল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ হিড়বান্ধ, বাঁকুড়া।

৭। গ্রাম ঃ দুবরাজপুর। ১৮৭।১৬৮'৯৪।৫৪।২৬৪

(ক) সদগোপ, বাউরী ও গড়োই। গ্রামটিতে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে খাতড়া-মলিয়ান রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন এবং ইহাতে আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং বিবিধ দ্রব্য সামগ্রীর প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে।

(চ) গ্রামে দুইটি মনসার স্থান আছে।

জনশ্রুতি আছে, খাতড়ার ক্ষত্রিয় রাজা সুকুমার শাহাজাদা দেব এই গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের নামকরণী হয় "দুবরাজপুর"।

শ্রীঅনিল বরণ মণ্ডল, শিক্ষক,
দুবরাজপুর, বাঁকুড়া।

৮। গ্রাম ঃ খাতড়া। ১৯২।৩৯৯'৩৪।
(শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, তাম্বুলী, তিলি, ধোপা, ছুতার, কৈবর্ত, বেনে, বাউরী, ময়রা, হাড়ী, নাপিত, কামার, কলু, মাঝি ও মুসলমান। গ্রামে আঠারোটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে ইন্দ্রোৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) ইন্দ্রোৎসবের মেলা। ভাদ্র মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গোপালজীউ, শ্যামসুন্দরজীউ এবং শীতলার মন্দির ব্যতীত মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

জনশ্রুতি আছে যে, অতি পুরাকালে গ্রামের নিকটবর্তী মশক পাহাড় হইতে জনৈক জটাধারী শিবভক্ত সাধু প্রতি বৎসর খাতড়ার রাজাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য আসিতেন এবং তাঁহার জটার মধ্য হইতে একটি স্বর্ণ মোহর বাহির করিয়া রাজাকে দিতেন। কোন এক বৎসর রাজা লোভের বশবর্তী হইয়া উক্ত সাধুর জটা কাটিয়া দিয়াছিলেন এবং তদাবধি স্থানটি 'জটা কাটার দেশ' নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে স্থানটি খাতড়া নামে পরিবর্তিত হয়।

শ্রীরেবতী মোহন মুখার্জী, প্রধান শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ খাতড়া, বাঁকুড়া।

৯। গ্রাম ঃ পরকুল। ২১৭।৩০৭'৭৭।৪৯।২৭১

(ক) কুরমি ক্ষত্রিয়, তাঁতি ও কলু।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষ-পার্বণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) পৌষপার্বণের মেলা। পৌষ সংক্রান্তি হইতে চারিদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবলিঙ্গটি প্রাচীন।

শ্রীমতিলাল রায়,
খাতড়া, বাঁকুড়া।

১০। গ্রাম ঃ বেনা। ২৩৬।৫০৬'৩৯।৭৮।৫১৫

(ক) ব্রাহ্মণ, নাপিত, কামার ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কাঁসার শিল্প ও মজুরী।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে খাতড়া-বাঁকুড়া রুটের অথবা আড়কামা-দহলা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, পৌষ মাসে পৌষ-পার্বণ এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীআনন্দ বল্লভ পাত্র, প্রধান শিক্ষক,
বেনা বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ঃ বেনা, পোঃ কেশিয়া,
বাঁকুড়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বেনা গ্রামের নিকটবর্তী সিমলা (মৌজা নং ১২৩) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। এই সম্পর্কে বিশদ বিবরণী "মেলা বিবরণী" অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা হইল।)

১১। গ্রাম : দহলা। ২৫০।১,১৯৪'৯২।২০০।১,১৮৮

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, বৈরাগী, কামার, কুমার, বাউরী, ভূমিজ ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে জোড়সা-খাতড়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবের গাজন, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) গাজনের মেলা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দামোদরজীউ মন্দির ব্যতীত একটি মাটির ঘরে শিব-দুর্গার মূর্তি এবং পাঁচটি মনসার স্থান আছে।

শ্রীত্রিপুরারী পাণ্ডা, শিক্ষক,
বলারডি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ খাতড়া, বাঁকুড়া।

১২। গ্রাম ঃ গোপালপুর। ২৭৩।২৫৭'১৮।৪৮।২৫৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, নাপিত, শুঁড়ি, বাগাল, বেনিয়া, পোদ্দার, ভূমিজ, বাউরী ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে বৈশ্যপাড়া, সাঁওতালপাড়া, বাউরীপাড়া, বাগালপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া ও কলুপাড়া নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে মোটরবাসে করিয়া সরাসরি এই গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি মাত্র পনর বৎসর আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও করগেটের ছাউনীযুক্ত একটি দুর্গামণ্ডপ ব্যতীত দুইটি মনসার স্থান আছে।

শ্রীনলিন চন্দ্র মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মলিয়ান,
বাঁকুড়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : শ্রীনলিনী চন্দ্র মণ্ডল মহাশয় ফতেপুর (মৌজা নং ১০) গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে 'ছাতা পরব' উপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি মেলার বিশদ বিবরণী আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। উহা 'মেলা বিবরণী' অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।

মেলা বিবরণী

ইন্দ্রোৎসবের মেলা

খাতড়া গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে ইন্দ্রোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় দেওয়ানী আদালতের সম্মুখস্থিত প্রায় পঁচিশ বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন।

খাতড়া থানার অন্তর্গত প্রায় সবগুলি গ্রাম এবং রানিবাঁধ থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহ হইতে হিন্দু-মুসলমান-সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রায় বার সহস্র নরনারী প্রধানতঃ গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ খাতড়া থানা এবং রানিবাঁধ থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, হাঁড়ি-কলসী, খেলনা-পুতুল ইত্যাদি বিবিধ জিনিসপত্রের তিন শতাধিক দোকানপাট বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিকের দল আসে। ইহা ব্যতীত, সাঁওতালী নাচ হয় এবং অনেকে জুয়া ও লটারী খেলিয়া থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ-ছয় সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

দহলা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণে প্রায় দুই-তিন বিঘা জমির উপর মাত্র একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি গত প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবত বসিতেছে।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। ময়রা মনিহারী, বাসনকোসন, লোহার জিনিসপত্র, ধামাকুলা প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে।

ছাতা পরবের মেলা

ফতেপুর (মৌজা নং ১০) গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে ছাতা পরব উপলক্ষে পাকা রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আশি বৎসরের প্রাচীন।

লছিপুর, গোপালপুর, ধানারাঙ্গী, চাঁদড়া, শালুই পাহাড়ী, পায়রাচালী, বাসনা, নন্দা প্রভৃতি গ্রামসমূহ এবং পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত মানবাজার হইতে সব সম্প্রদায়ের প্রায় তিন সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, তেলেভাজা, বই-ছবি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের বহু দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ মানবাজার, মলিয়ান, মাসিয়াড়া, খাতড়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলার দল প্রায় প্রতি বৎসরই আসে।

দুর্গাপূজার মেলা

হিড়বান্ধ গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে দেবোত্তর জমির উপর তিনদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী খাতড়া, সুপুর, মলিয়াড়া, মলিয়ান, ভোজদা প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ভূমিজ, বাউরী, সাঁওতাল ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বহু নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, কারুশিল্পজাত দ্রব্যাদির দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হিড়বান্ধ গ্রামে অনুষ্ঠিত গাজন মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

পৌষ-পার্বণের মেলা

পরকুল গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি হইতে পৌষ পার্বণ উৎসব উপলক্ষে কংসাবতী নদীর তীরবর্তী প্রায় একশত বিঘা জমির উপর চারিদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী মোটরগাড়ী, গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। ময়রা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতির প্রায় এক সহস্র দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য হরিনাম সংকীর্তন, রামায়ণ পাঠ, সার্কাস, ম্যাজিক প্রদর্শনী, নাগরদোলা, লটারী, ঝাণ্ডা খেলা নামে এক প্রকার ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং জুয়া খেলা হয়। এই অনুষ্ঠানগুলিতে প্রায় পাঁচ সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

মনসাপূজার মেলা

ঝাপানডিহি গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে প্রায় তিন-চারি বিঘা জমির উপর তিন-চারিদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

স্থানীয় গ্রামবাসী ভিন্ন মালিয়ান এবং হিড়বান্ধ হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় শত নরনারী সাধারণতঃ মোটরবাসে ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বই ছবি, কাপড়চোপড়, লোহার কড়াই-বালতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র ব্যতীত মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি, খেলনা প্রভৃতির দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

আমোদ প্রমোদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা, ও জলসা ব্যতীত নাগরদোলা ও সার্কাসের দল আসে এবং অনেকে লটারী খেলিয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ঝাপানডিহি গ্রামে অনুষ্ঠিত গাজনের মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

মহোৎসবের মেলা

চাঁপাশোল গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মহোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় রঘুনাথমন্দির সংলগ্ন প্রায় দশ কাঠা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী মলিয়ান, হিড়বান্ধ, বহড়ামুড়ি প্রভৃতি ইউনিয়ন সমূহের অন্তর্গত গ্রামগুলি হইতে প্রায় পাঁচ-ছয়শত নরনারী সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিকের দল আসে এবং লটারী, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা ও যাত্রাভিনয় হয়।

সরস্বতীপূজার মেলা

সিমলা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী ব্যতীত রাজগ্রাম, রাইপুর, অম্বিকানগর প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে আরও প্রায় এক সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী, সাইকেল এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, দা-কুড়ুল, ধামা-কুলা, মাটির পুতুল, হাড়িকুড়ি প্রভৃতির প্রায় একশত দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, জলসা ব্যতীত জুয়া ও লটারী খেলা হয়।

গোপালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র পনর বৎসর যাবত বসিতেছে।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী মালিয়ান, মলিয়াড়া, জোড়দা, ব্রাহ্মণডিহা, হিড়বান্ধ প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহ

ও মানবাজার হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় পনর শত নরনারী প্রধানতঃ সাইকেল, মোটরগাড়ী, গরুরগাড়ী প্রভৃতি করিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, কাপড় চোপড়, দা-কুড়ুল, ধানারাঙ্গী, লছিপুর, বারমেল্যা গ্রাম হইতে বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদির প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ মানবাজার ও মলিয়ান হইতে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য যাত্রা, নাগরদোলা, সার্কাস, জলসা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় এক সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।



থানা ঃ ইঁদপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ হাটগ্রাম। ১৭।৩৬৫.৩০।৩৫০।২,৪৯৫

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শাঁখারী, তাম্বুলী, নাপিত, সর্দার, বাউরী, হাড়ী, ডোম, কৈবর্ত, কলু ও লোহার। গ্রামটিতে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, শঙ্খশিল্প ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে ঝাঁটিপাহাড়ী রুটের মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে ভাদুপূজা ও বিশ্বকর্মাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে পাঁচদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি মন্দিরে দুর্গা, কালী, মনসা, বিশ্বকর্মা, শিব, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার্চনা হয়। ইহা ব্যতীত, গ্রামে শীতলা, বাবাঠাকুর ও মনসা আছে।

শ্রীহারাধন কুণ্ডু, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ হাটগ্রাম, বাঁকুড়া।

২। গ্রাম ঃ সাতামী। ১৯।৫৬৪.৮২।১৩১।৬৪৯

(ক) ব্রাহ্মণ, ভূমিজ, ক্ষত্রিয়, বাউরী, মাল, ধোপা, নাপিত ও শুঁড়ি। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, বাউরীপাড়া, রায়পাড়া ও সর্দারপাড়া নামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে হাটগ্রাম রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন এবং শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীকেবল চন্দ্র মুদিব, প্রধান শিক্ষক,
রাধানগর সাতামী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম ঃ খট্‌গ্রাম। ৬৩।১৪২.১৩।৭৭।৫৩২

(ক) ব্রাহ্মণ, বাউরী, ভূমিজ ও মুসলমান। গ্রামটিতে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে হাটগ্রাম-গামী মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র-বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন এবং ইহাতে প্রায় তিনশত নরনারী আসেন। খাবার, মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্যের পনর-কুড়িটি দোকান বসে।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির এবং কালী ও মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীশরৎ চন্দ্র পাঠক, প্রধান শিক্ষক,
খট্‌গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জিয়ড়দা, বাঁকুড়া।

৪। গ্রাম ঃ জিয়ড়দা। ১০৫।৫৪৯.৫৮।৯৪।৫৬৪

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কলু, বাগদী, ডোম, বাউরী, নাপিত, তাম্বুলী ও শুঁড়ি। গ্রামটিতে বামনপাড়া, বাউরী-পাড়া, শুঁড়িপাড়া, ডোমপাড়া ও বাগদীপাড়া প্রভৃতি নামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও রাসযাত্রা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি মাত্র দুই বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে পনর-কুড়িটি দোকান বসে এবং আমোদ-প্রমোদের জন্য সাঁওতালী নাচ ও ছৌ-নাচ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

(চ) ×

শ্রীআনন্দ মোহন মুখোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
জিয়ড়দা প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৫। গ্রাম : ব্রজরাজপুর। ১৭৫।৫১১.৬৪।১৩২।৬৭৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, সদ্গোপ, শুঁড়ি, ডোম, বাউরী, হাড়ী ও কলু। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, সদ্গোপপাড়া, হাড়ীপাড়া, ডোমপাড়া, বাউরীপাড়া, কলুপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে খাতড়া রুটের মোটর-বাসে ডাঙ্গারামপুর হইয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে শ্যামসুন্দর-জীউর রাসযাত্রা ও ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি স্থানীয় গোস্বামীগণের দ্বারা সাড়ম্বরে পরিচালিত হয় এবং ব্যক্তিবিশেষের উৎসব হইলেও সর্বসাধারণ ইহাতে যোগদান করেন।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিনব্যাপী। দুইটি মেলাই প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি শ্যামসুন্দরজীউর মন্দির ও একটি রাসমঞ্চ আছে। জনশ্রুতি আছে, অন্যূন চারিশত বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ ভক্ত শ্রীমদ্দাস গদাধর বংশোদ্ভব শ্রীমথুরানন্দ গোস্বামী এই অঞ্চলে আসিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্যামসুন্দরজীউ ও শ্রীমতি রাধারাণীর বিগ্রহ আনিয়া সেবা-প্রকাশ করেন। শ্যামসুন্দরজীউর নিত্য সেবাপূজার জন্য খাতড়ার রাজপরিবার কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। এই গ্রামে বৃন্দাবনের শ্যামসুন্দরজীউর প্রতিষ্ঠার জন্য এই গ্রামের নাম 'ব্রজরাজপুর'।

শ্রীবঙ্কেশ্বর মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম : শাঁকড়া, পোঃ : ভেড়ুয়াশোল,
বাঁকুড়া।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক আটবাইচণ্ডী গ্রামে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদির নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

আটবাইচণ্ডী

গ্রামের নাম আটবাইচণ্ডী। ইন্দপুর থানার অন্তর্গত একটি অতি সাধারণ গ্রাম। বাঁকুড়া হইতে মোটরবাসে আসিয়া প্রায় ছয় মাইল কাঁচা রাস্তা হাঁটিয়া গ্রামে পৌঁছান যায়। বর্ষাকালে এই রাস্তা একেবারেই দুর্গম। গ্রামে দুই ঘর ব্রাহ্মণ ব্যতীত প্রামানিক, কর্মকার, তাম্বুলী, তাঁতি, কলু (গরাই), বৈরাগী, বেনে, মাঝি ও মালেদের বাস। মাঝিরাই গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ। মাঝিপাড়া, নবশাকপাড়া ও মালপাড়া নামে গ্রামে চারিটি পাড়া আছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি বৃক্ষের নীচে প্রতিষ্ঠিত সাধারণের দেবী চণ্ডীর নামানুসারেই গ্রামের নাম 'আটবাইচণ্ডী' বলা হয়। দেবীর আটটি বাহু, তাই গ্রামের নাম আটবাইচণ্ডী। কিন্তু স্পষ্টতই দেখা যায় দেবীর দশটি বাহু। তবু কেন যে আট বাহু বলা হয় তাহাই আশ্চর্য।

গ্রামে পূর্বমুখী একটি সমতল ছাদ বিশিষ্ট অতি জীর্ণ ঘরে গোলাকার প্রস্তর বেদীর উপর বৃহদাকার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবলিঙ্গটিকে বেষ্টন করিয়া পৃথকভাবে গৌরীপট্ট স্থাপিত। শিবমন্দিরটি ৭০।৭৫ বৎসর পূর্বে

নির্মিত এবং মন্দিরাভ্যন্তরে উক্ত শিবলিঙ্গ ভিন্ন প্রায় এক হাত উচ্চ শিলায় খোদিত একটি চতুর্ভুজ মূর্তি (বিষ্ণু ?) আছে। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে গ্রামের একটি পুকুর খননকালে মূর্তিটি পাওয়া যায়। শিবমন্দির ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শুনা যায় যে, প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বর্তমান যে স্থানে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত সেই স্থানে বনজঙ্গলময় একটি উচ্চ টিপি ছিল। আটবাইচণ্ডী গ্রাম হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে মৌকুড়ি গ্রাম নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত ভূমিজ ও অটল দাস একযোগে স্বপ্নাদৃষ্ট হইয়া ঐ টিপির মধ্য হইতে শিবলিঙ্গ উদ্ধার করেন। ইহার পর প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবত একটি চালাঘর নির্মাণ করিয়া শিবের নিত্যপূজাদি এবং বৈশাখী সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব চলিতে থাকে। পরে বর্তমান মন্দির ঘরটি নির্মাণ করা হয়। শিবমন্দিরের আশপাশে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডাদি দৃষ্টে মনে হয় পূর্বে এই স্থানে একটি মন্দির ছিল। কোন কারণবশতঃ ঐ মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া শিবলিঙ্গটি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে। শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হইবার পর অক্ষয় কুমার গাঁয়েন শিবের পুরোহিত নিযুক্ত হন। ইঁহাদের পদবী চট্টোপাধ্যায় এবং নিজদিগকে কাশ্যপ গোত্রীয় বলিয়া দাবী করেন। এই অঞ্চলে অক্ষয়বাবুর রামায়ণ গানের খ্যাতি ছিল; এই কারণে তাঁহার উপাধি হয় গাঁয়েন। বর্তমান পূজারী তাঁহার পুত্র শ্রীনিমাই চরণ গাঁয়েন।

প্রতি বৎসর গাজন উৎসব উপলক্ষে শতাধিক নরনারী ভক্ত বা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দু জাতির যে-কেহই ভক্ত হইতে পারেন। ২৮শে বৈশাখ ভক্ত কামান হয়। অর্থাৎ ভক্তব্রতীরা ক্ষৌরকর্ম সারিয়া সন্ন্যাসব্রতের সংকল্প গ্রহণ করেন। ২৯শে সন্ন্যাসব্রতীদের শিবগোত্রান্তরিত করিয়া গলায় উত্তরীয় পরাইয়া দেওয়া হয়। মহিলা সন্ন্যাসীকে বারুতি বলে। সাতসগড়িয়া গ্রাম নিবাসী কর্মকারেরা বংশানুক্রমে শিবের পাটভক্ত হইয়া থাকেন। বর্তমান পাটভক্ত শ্রীফকির কর্মকার। ২৯শে গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে সাহেববাঁধ জোড়াপুকুরে এবং ৩০শে ইন্দ্রজিৎ জোড়পুকুরে ভক্তরা পাটভক্তকে শলকাবিদ্ধ পাটের উপর শয়ন করাইয়া ঢাক-ঢোলের বাজনাসহ শোভাযাত্রা করিয়া পাটস্নান করাইতে লইয়া যান। পাটস্নান যাত্রার পূর্বে মন্দিরের নিকট একটি গাছের নীচে ভৈরবের নির্দিষ্ট স্থানে, বাসুলীতলায় ও আটবাইচণ্ডী তলায় তিনবার করিয়া ভক্তরা প্রদক্ষিণ করেন। ৩০শে শিবমন্দিরে যথারীতি পূজা ও হোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন মানসিককারীরা এবং বারুতিরা দুই হাতে, মস্তকে, বক্ষের উপর নূতন সরা রাখিয়া ধূনা পুড়াইয়া থাকেন। গাজন উৎসব উপলক্ষে এই গ্রামে বানফোঁড়া বা চড়কপূজা হয় না। মন্দিরের সম্মুখে সাধারণের ধান জমিতে মেলা বসে। মানবাজার, রাইপুর, খাতড়া, ছাতনা, ঝাঁটিপাহাড়ী, বিষ্ণুপুর হইতে প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারী আসেন এবং বাঁকুড়া হইতে মনিহারী, রাজগ্রাম হইতে ময়রার দোকান, শুশুনিয়া হইতে পাথরের জিনিসপত্র; বেবড়াদা, গুণ্যাত, ব্রজরাজপুর, আড়ালাল, রত্নপুর হইতে বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলো-ঝাড়ু, পাখা, ঝাঁটার কাঠি ইত্যাদি আমদানী হয়। ইহা ভিন্ন, মেলায় শাকসব্জী, কাঁসার-বাসন, লোহার তৈয়ারী কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়ি-কলসী, খেলনা-পুতুল প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রীর দোকানপাট বসে। বিক্রেতাদের নিকট আদায়কৃত অর্থের দ্বারা শিবের নিত্যপূজাদি হইয়া থাকে। আমোদ-প্রমোদের জন্য রামায়নগান ও নাগরদোলা আসে।

শিবমন্দির ব্যতীত গ্রামে মাকড়া পাথর নির্মিত প্রাচীন এবং পরিত্যক্ত একটি মন্দির আছে। ইহা বাসুলীদেবীর মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরটি পূর্বমুখী; ইহার উপরের ছাদ সম্পূর্ণ ধসিয়া পড়িয়াছে এবং চারিদিকের দেওয়াল গাত্রে ফাটলের সৃষ্টি হইয়াছে। মন্দিরের এই দুরাবস্থা সম্পর্কে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, অতি প্রাচীনকালে বাসুলীদেবী যথেচ্ছারে নর শিশু ধরিয়া ভক্ষণ করিতেন। ইহাতে ভীত হইয়া গ্রামবাসীগণ দেবীর নিকট প্রতিদিন একটি করিয়া নর শিশু উপঢৌকন দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে একদিন এক বিধবা ব্রাহ্মণীর একমাত্র পুত্রের পালা পড়িল। ব্রাহ্মণীর পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া একটি রাখাল বালক স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণীর পুত্রের পরিবর্তে নিজেই দেবীর নিকট গিয়া উপস্থিত হন। দেবী তাহাকে ভক্ষণে উদ্যত হইলে

বালকটি তাঁহাকে এক মুঠা লোহার ছোলা দিয়া বলেন যে, প্রথমে তিনি যদি ছোলাগুলি চর্ব্বণ করিতে সক্ষম হন তবেই তাহাকে ভক্ষণ করিতে পারিবেন। ঐ লোহার ছোলাগুলি চর্ব্বণ করিতে গিয়া দেবীর দন্ত ভগ্ন হয় এবং যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করিয়া তিনি মন্দিরের ছাদ ভাঙ্গিয়া পলায়ন করেন। কথিত আছে, আটবাইচণ্ডী গ্রামে মন্দির ত্যাগ করিয়া তিনি একটি শিলারূপে বহুকাল ছাতনার বোলপুকুর নামক পুষ্করিণীতে নিহিত ছিলেন। পরে ছাতনার রাজা হামীরউত্তর ছাতনায় বাসুলীমন্দির নির্মাণ করিয়া কবি চণ্ডীদাসকে তাহার পুরোহিত নিযুক্ত করেন। (এই সম্পর্কে বিশদ বিবরণ 'ছাতনা' পৃঃ ৬৩ দ্রষ্টব্য)

এই গ্রামের শেষ সীমান্তে একটি প্রাচীন কুসুম গাছ ও দুইটি কুচিলা গাছের নীচে দেবী আটবাইচণ্ডীর প্রস্তর নির্মিত একটি মূর্তি স্থাপিত আছে। ইনি গ্রামের সাধারণের দেবী। এই গাছগুলির সন্নিকটে মাকড়া পাথরের স্তূপ দৃষ্টে মনে হয় যে, অতীত কালে এই স্থানে একটি মন্দির ছিল। আটবাইচণ্ডীর মূর্তিটি অতি ভয়ংকর দর্শন এবং এইরূপ মূর্তি সচরাচর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি যন্ত্রশিলার উপর উপুড় হইয়া শায়িত পুরুষ মূর্তি এবং তাহার উপর দেবী দশভুজা নটরাজের ভঙ্গীতে হাঁটু ভাঙ্গিয়া দণ্ডায়মান। ইঁহার চক্ষুদ্বয় কোঠরাগত এবং বক্ষদেশ কঙ্কালসার (বস্তুতঃ ইহা একটি নরকঙ্কাল বিশেষ)। বামদিকের পাঁচটি হস্তের মধ্যে সর্বনিম্ন হস্তে নরমুণ্ডধৃত, উপরের দ্বিতীয় হস্তে বরাভয় মুদ্রা, তৃতীয় হস্তধৃত একটি দণ্ডের অগ্রভাগে নর করোটি আছে এবং দণ্ডটি দেবী মস্তক ছাড়াইয়া উর্ধে উঠিয়াছে। চতুর্থ হস্তটি সোজা কনুই মুড়িয়া বক্ষস্থলে স্থাপিত এবং মুষ্টিবদ্ধ হস্তের কেবলমাত্র উন্মুক্ত কণিষ্ঠ অঙ্গুলীটি দেবী স্বয়ং দংশন করিয়া আছেন। পঞ্চম হস্তে একটি উন্মুক্ত তরবারি শিরোপরি উদ্ধত। দক্ষিণদিকের পাঁচটি হস্তের মধ্যে সর্বনিম্ন হস্তে মুদ্রা, দ্বিতীয় হস্তে কৃপাণ, তৃতীয় হস্তস্থিত একটি পাত্র বক্ষস্থলে স্থাপিত, চতুর্থ হস্তে ডমরু এবং পঞ্চম হস্তে একটি উন্মুক্ত তরবারি বামদিকের পঞ্চম হস্তের ন্যায়ই শিরোপরি উদ্ধত। দেবীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া যোদ্ধার ন্যায় একটি চওড়া পট্টির সহিত সংযুক্ত ছোরা, কণ্ঠের নরমুণ্ডমালা ও রুদ্রাক্ষের (?) মালা হাঁটু অবধি প্রলম্বিত। কর্ণের দোলায়িত কুণ্ডল, কপাল বেষ্টন করিয়া নরমুণ্ডমালা, মাথার উপর চূড়া করিয়া বাঁধা কেশের মধ্যস্থলে একটি নরকরোটি। শিলার চারিপাশে গদার ন্যায় দণ্ড হস্তে দ্বারপালরূপে চারিটি নরমূর্তি খোদিত। শিলাটি দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন ফুট এবং প্রস্থে দুই ফুট। বিকটদর্শন হইলেও শিলাটি অপূর্ব্ব সুন্দরভাবে খোদিত এবং ইহার শিল্পকর্মও প্রসংশনীয়। এই বিকট দর্শন ভয়ংকরী মূর্তি চণ্ডীদেবীরূপে পূজিত এবং ইনি আটবাই চণ্ডী নামে খ্যাত। যদিও স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাওয়া যায় দেবীর দশটি বাহু। কেবলমাত্র ফুল-বেলপাতা দিয়া দেবীর নিত্যপূজা হয় এবং প্রতি মাসে একদিন পায়েসান্ন দিয়া দেবীর ভোগ এবং প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ দেবীর নির্দিষ্ট স্থানে গ্রামবাসীরা এখান উৎসব পালন করিয়া থাকেন। পূর্বে মানসিক হিসাবে দেবীর নিকট বহু পশু বলি হইত। পুরোহিত শ্রীনিমাই চন্দ্র গাঁয়েন মহাশয়ের নিকট জানা যায় যে, নিম্নলিখিত ধ্যানে তিনি দেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

বন্দুক বন্দুকা ভাসাং পঞ্চমুণ্ডাদিভাসিনীম্।
স্ফুরচ্চন্দ্র কলারত্নম মুকুটম্ মুণ্ডমালিনীম্॥

ইহা ব্যতীত, গ্রামের জোড়াপুকুরের নিকট একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি গোলাকৃতি প্রস্তর খণ্ড আছে। ইনি 'সাত বাউনি' নামে খ্যাত। প্রতি মাসের পূর্ণিমায় খিচুড়ি, গুড়, দুধ ও ঘৃত দিয়া গ্রামবাসীরা দেবীর পূজা দিয়া থাকেন এবং শারদীয়া দুর্গাপূজায় সময় যোড়শোপাচারে দেবীর পূজা হয়। দেবীর ধ্যান :—

ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ ররিকুলভয়দাং মৌলিবর্দ্ধেন্দু-
রেখাং।
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ
বহন্তিং ত্রিনেত্রং॥
সিংহ স্কন্ধাদি রূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলাম তেজসাং পূরয়ন্তিম্।
ধ্যায়েৎ দুর্গাং ত্রিদশ পরিবৃতাং সেবিতাং
সিদ্ধিকাময়ীৎ॥

গ্রামে নাট্‌মণ্ডপ সহ খড়ের চালাযুক্ত একটি দেবালয় আছে। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া এই ঘরে পূজা হয়। ইহা ভিন্ন, শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যে গ্রামবাসী সুযোগ-সুবিধামত একটি

দিনে মনসাপূজা করিয়া থাকেন এবং মকর সংক্রান্তিতে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব হয়। গ্রামের সীমান্তে নির্দিষ্ট স্থানে একটি পাথর খণ্ড আছে। ইনি কালোসোনা দেবতা; প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে সুবৃষ্টির জন্য এবং মাঘ মাসে এখান উৎসব উপলক্ষে কালোসোনার পূজা দেওয়া হয়।

মেলা বিবরণী

দুর্গাপূজার মেলা

হাটগ্রাম গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

পায়রাচালী, শালুনী, সাতামী এবং বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী মোটরবাসে ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদির প্রায় একশত দোকান বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়।

প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা ব্যতীত নাগরদোলার দল আসে এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। ইহা ছাড়া, অনেকে জুয়া খেলিয়া থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় আটশত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

মনসাপূজার মেলা

সাতামী গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে উন্মুক্ত স্থানে প্রায় চারি বিঘা জমির উপর দুই দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চারি সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, লাঙল-জোয়াল, ধামাকুলা, মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি, খেলনা প্রভৃতি জিনিসপত্র ব্যতীত কাঁচের চুড়ি, শাঁখা ও শঙ্খজাত দ্রব্যাদির মোট চল্লিশটি দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য সার্কাস ও নাগরদোলার দল আসে এবং ছৌ-নাচ হয়। অনেকে জুয়া খেলেন। ছৌ নাচের দলটি হাটগ্রাম হইতে আসে। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় তিন-চারি সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

রাসযাত্রার মেলা

ব্রজরাজপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে শ্যামসুন্দরজীউর মন্দির ও রাসমঞ্চ সংলগ্ন প্রায় দশ-বার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

ব্রজরাজপুর, গৌড়বাজার, ভেতুয়াশোল, রঘুনাথপুর এবং তালডাঙ্গরা থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে প্রধানতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রায় দেড় সহস্র নরনারী সাইকেল, মোটরবাস, গরুরগাড়ী এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই- ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা ইত্যাদির দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, যাত্রাগান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এই গ্রামে অনুষ্ঠিত দোলযাত্রার মেলাটি উল্লিখিত রাসযাত্রার মেলার অনুরূপ।

থানা : রানিবাঁধ

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : নারকেলি। ১১।৩৭৯।১৬।৯৫।৪৮৩

(ক) সর্দার, কুমার ও মণ্ডল। গ্রামে একটি মাত্র পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে গোড়াবাড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রায় কুড়ি বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি গত প্রায় কুড়ি বৎসর যাবত বসিয়া আসিতেছে।

(চ) গ্রামে একটি খড়ের ঘরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীগৌর গোপাল সাহা, চাকুরী,
গ্রাম ও পো : বড়িড, বাঁকুড়া।

২। গ্রাম : পরেশনাথ। ১৬।২৪২।১০।৩৭।২২৯

(ক) ঘেড়া ও বাগদী। গ্রামে একটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে গোড়াবাড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষ-পাবণ উৎসব এবং ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি গত প্রায় কুড়ি-বাইশ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে নয়দিনব্যাপী। মেলাটি গত প্রায় কুড়ি-বাইশ বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পরেশনাথের মন্দির নামে পরিচিত এবং এই কারণে গ্রামের নামও পরেশনাথ হইয়াছে। শোনা যায়, সেন বংশীয় জনৈক ভূস্বামী পার্শ্ববর্তী গ্রামে আসিয়া একটি গড় নির্মাণ করিয়া বসবাস স্থাপন করেন। এই কারণে উহা বর্তমানে 'সারেঙ্গাগড়' গ্রাম নামে খ্যাত। সারেঙ্গাগড়ে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত বহু মূর্তি ও বিগ্রহ এবং গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পরেশনাথ গ্রামের শিব মন্দিরটি সেনবংশীয় রাজাদের কীর্তি বলিয়া অনেকের অনুমান।

শ্রীগৌর গোপাল সাহা, চাকুরী,
গ্রাম ও পো : বড়িড, বাঁকুড়া।

Paresnath—Situated on the north bank of Kumari river about $4\frac{1}{2}$ miles north-west of Ranibandah, it is an ancient site of rare antiquity. Its nearness to Manbhum district influenced to a great extent to the doctrines of Jainism, which was later on replaced by Hinduism. Seven Jain stone figures including a large image of Paresnath were discovered from this place. The site is under the protection of Archaeological Survey of India."

(District Census Handbook, Bankura, 1961, by B. Ray, p. 151)

৩। গ্রাম : বড়িড। ২৬।৪৫১।৯৯।১০৮।৫৮৪

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কামার, বাগাল, লোহার, বাউরী, ভূমিজ, তাঁতি, সদ্গোপ, বৈদ্য, ধোপা, ময়রা, নাপিত, মাহাতো, কৈবর্ত, দেশোয়ালী, মাঝি, তেলি, মুচি, হাড়ী ও কলু। গ্রামটিতে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে গোড়াবাড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। ইহা ব্যতীত, অম্বিকানগর গ্রামের মধ্য দিয়া কংসাবতী ও কুমারী নদী পার হইয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র-বৈশাখ মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে চারিটি বিষ্ণুমন্দির এবং পাঁচটি শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত পঞ্চানন বুড়াবাবাজীউর মন্দির আছে। ইহা ব্যতীত, স্থানীয় রাজবাটি সংলগ্ন স্থানে স্পর্শমণিবাবা, দুর্গা, গনেশ প্রভৃতি দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়, কৃষিকার্য,
গ্রাম ও পোঃ বড়িড়, বাঁকুড়া।

৪। **গ্রাম : ঘোলকুড়ি। ২৭।৪৯৭·৭৫।৬৮।৩৭৯**

(ক) গোয়ালা, সর্দার, শবর, মাঝি, কুর্মি ও মুসলমান। গ্রামটির চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে অম্বিকানগর-ধানাড়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে স্থানীয় গোয়ালা সম্প্রদায় গ্রামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া শিবের নিত্যপূজা ও গাজন উৎসবের প্রচলন করেন।

(ঙ) গাজনের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মেটে ঘরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীগোবর্দ্ধন লাল মণ্ডল, কৃষিকার্য,
গ্রাম : গোলকুড়ি, পোঃ বুড়িড়, বাঁকুড়া।

৫। **গ্রাম : রুদড়া। ৩৮।১,৪৩৯·৯৬।২৭৯।১,৩৯৫**

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ডোম, তিলি, বাগ্দী, কামার, হাড়ী, মণ্ডল, নাপিত, মুচি ও সর্দার। গ্রামটিতে তিলিপাড়া, মণ্ডলপাড়া, বাগ্দীপাড়া, হাড়ীপাড়া প্রভৃতি নামে সাত-আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে গোড়াবাড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে রুদ্রদেব নামে পরিচিত শিবের গাজন উৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসা-পূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ও হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

দোল পূর্ণিমায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মূর্তির পূজা হয় এবং নয়দিনব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে মহাপ্রভুর দৈনিক আটবার করিয়া ভোগপূজা, আরতি এবং ভক্তগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবের শেষদিনে একশত আটটি মালসা ভোগ নিবেদন করিয়া সমবেত বৈষ্ণবগণকে চাউল ও অর্থ বিদায়ী দেওয়া হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং অন্নসত্রের ব্যবস্থা থাকে।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে রুদ্রদেব শিবের প্রস্তরময় লিঙ্গমূর্তিটি খড়ের ছাউনীযুক্ত একটি দেবালয়ে স্থাপিত আছে। ইহা ব্যতীত মহাপ্রভুর মৃন্ময়মূর্তি এবং তিন-চারিটি মনসা বিগ্রহ আছে।

গ্রামে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন রুদ্রদেব শিবের নামানুসারে গ্রামের নাম 'রুদড়া' হইয়াছে।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম : রুদড়া, পোঃ অম্বিকানগর,
শ্রীপঞ্চানন মাহাতো, শিক্ষক,
গ্রাম : কেশরা, পোঃ অম্বিকারনগর,
শ্রীদুঃখিতরাম সাও, প্রধান শিক্ষক,
রুদড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
শ্রীএস. সি, ভৌমিক, স্যানিটারী ইন্স্পেক্টর,
রানিবাঁধ হেলথ সেণ্টার, বাঁকুড়া।

৬। **গ্রাম : শিমূলী (মৌজাঃ জয়নগর)।
৪৭।৬৭·১৭।৯৫।৫৩১**

(ক) মাহাতো, সর্দার, নাপিত, কামার, হাড়ী ও মুসলমান।

গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে গোড়াবাড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামের সীমান্তবর্তী কংসাবতী নদীর তীরে স্থানীয় মাহাতো সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ২১শে তারিখে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে প্রস্তর নির্মিত বহু প্রাচীন একটি শিবমন্দির আছে।

শ্রীএস, সি, ভৌমিক, স্যানিটারী ইন্সপেক্টার,
রানিবাঁধ হেল্থ সেন্টার,
বাঁকুড়া।

৭। গ্রাম : **মহেশপুর**। ৫২।২৫২'৭১।৫৫।৩১৩

(ক) মাহাতো ও সর্দার। গ্রামটিতে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে গোড়াবাড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১৫ই ও ১৬ই বৈশাখ শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিনের জন্য। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে খড়ের ছাউনীযুক্ত একটি দেবালয়ে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীএস, সি, ভৌমিক, স্যানিটারী ইন্সপেক্টার,
রানিবাঁধ হেল্থ সেন্টার,
বাঁকুড়া।

৮। গ্রাম : **দেউলি**। ৫৩।২৮৪'৫৪।১০৫।৪৭৫

(ক) তাম্বুলী, কুর্মি ক্ষত্রিয়, বৈরাগী, কলু, কামার, তাঁতি, দেশোয়ালী ও মাঝি। গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে কালিসেন্না রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবপূজা এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শিবপূজাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের এবং কালীপূজাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। ইহা ব্যতীত, প্রায় প্রতি বৎসর দুটি লক্ষ্মীপূজা, একটি মনসাপূজা, শীতলাপূজা এবং গ্রাম্যদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শিবপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে প্রস্তর নির্মিত একটি প্রাচীন জীর্ণ শিব মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্তমানে উহার শিখরটি বসিয়া পড়ায় মন্দিরের উপর খড়ের চালা দিয়া আচ্ছাদন দেওয়া হইয়াছে। অনেকে বলেন, গ্রামে শিবের দেউল থাকায় গ্রামের নাম 'দেউলী' হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত, প্রধান শিক্ষক,
দেউলি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : দেউলি, পোঃ অম্বিকানগর,
বাঁকুড়া।

৯। গ্রাম : **শুশুনিয়া**। ৫৮।৩২২'৯৮।৩৭।১৮৬

(ক) ভূমিজ, তাম্বুলী, দেশোয়ালী মাঝি ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে দিগারপাড়া ও বামনপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে বাঁকুড়া-রানিবাঁধ পাকা রাস্তায় কালিসেন্না রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা এবং মাঘ মাসে বামনিসিনীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত পূজাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) বামনিসিনীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রাম প্রস্তর নির্মিত একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্বংসস্তূপ দেখিয়া

মন্দিরটি যে বৃহৎ ছিল তাহা অনুমান করা যায়। ইহা বামনিসিনীমন্দির নামে খ্যাত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত, প্রধান শিক্ষক,
দেউলি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : দেউলি, পোঃ অম্বিকানগর,
বাঁকুড়া।

১০। গ্রাম : বেঠুয়ালা। ৭২।৯৩৫·৪১।১২৮।৭৩৪

(ক) সর্দার, খেইরা, কামার, শুঁড়ি, কুমার ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রানিবাঁধ হইতে পশ্চিমে চারি-পাচ মাইল দূরে বেঠুয়ালা রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক ও শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি মাত্র পাঁচ-সাত বৎসর হইল শুরু হইয়াছে।

(ঙ) শিবের গাজন মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। সম্প্রতি শুরু হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম : রুদড়া, পো : অম্বিকানগর,
বাঁকুড়া।

১১। গ্রাম : ভুরকুড়া। ৭৬।৫১১·৩২।৩৩।১৮৯

(ক) ভুমিজ ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে বাঁকুড়া-রানিবাঁধ পাকা রাস্তায় কালিসেন্না রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, মাঘ মাসে বামনিসিনীপূজা ব্যতীত আদিবাসী সম্প্রদায় কর্তৃক গেরাম বা 'গ্রাম্যদেবতার' পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বামনিসিনীপূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই স্থানে বামনিসিনীর কোন মূর্তি নাই। বামনিসিনী পাহাড়ের প্রায় ছয়শত ফুট উচ্চে স্থাপিত দুইটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডকে দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয়। মানত স্বরূপ মিষ্টান্ন দিয়া পূজা এবং পায়রা, হাঁস, পাঁঠা প্রভৃতি পশু-পক্ষী বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) বামনিসিনীপূজার মেলা। মাঘ মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) বামনিসিনী নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীঅবনী প্রসাদ বাগচী, গ্রামসেবক,
গ্রাম : বীরখান, পোঃ রানিবাঁধ,
বাঁকুড়া।

১২। গ্রাম : রাজাকাটা।
১১১।১০৬৫·৮৯।২৫১।১,৩৮৫

(ক) গন্ধবণিক, শুঁড়ি, ভুমিজ, হাড়ী, কামার, তাঁতি, মাহালী ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে বাঁকুড়া-রানিবাঁধ পাকা রাস্তায় কালিসেন্না রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজার পর আদিবাসী সম্প্রদায় 'বাঁধনা পরব' এবং মাঘ মাসে 'জন সিং' পূজা করিয়া থাকেন। পূজা দুইটি বহুকালের প্রাচীন।

বাঁধনা পরব উপলক্ষে গরু ও মহিষ একটি খুটায় বাঁধিয়া ঢাক ঢোলের বাজনায় তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া আমোদ প্রমোদ করা হয়। জন সিং পরব উপলক্ষে মোরগ লড়াই একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। মোরগ লড়াই দেখিতে আশপাশের গ্রাম হইতে বহু নরনারীর সমাগম হয়।

(ঙ) বাঁধনা পরবের মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং ময়রা, মনিহারীর প্রভৃতি খাবার জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকানপাট বসে। মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, লাঠিখেলা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

(চ) গ্রামে জন সিং ঠাকুরের নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত শীতলা এবং মনসা আছে।

শ্রীঅবিনাশ সরেন, শিক্ষক,
গ্রাম : দাঁড়কেড়ি, বাঁকুড়া।

১৩। গ্রাম : রাউতারা। ১২৯।১,০২৭.৬২।১৫১।৭৯২

(ক) বৈরাগী, কুর্মি, গন্ধবণিক, মুচি, বাউরী, শুঁড়ি, কামার, শবর, ধোপা, ডোম ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে মাহাতোপাড়া, সাঁওতালপাড়া, শুঁড়িপাড়া, বেণ্যাপাড়া, ডোমপাড়া, ভেলাইডাঙ্গা, ভক্তারডাঙ্গা, খেড়্যাপাড়া, শালপেটরা প্রভৃতি নামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি গত ১২৯৪ সন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে চার-দিনব্যাপী। মেলাটি গত ১২৯৪ সন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে টিনের ছাউনীযুক্ত ব্যক্তিবিশেষের একটি পাকা মন্দির ব্যতীত পঞ্চানন ও শিবলিঙ্গ আছে।

এই গ্রামের 'অড়হর' নামক পুষ্করিণী হইতে কয়েকটি প্রাচীন তামার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাগুলি সম্রাট কণিষ্কের আমলের বলিয়া অনেকের অনুমান।

স্থানীয় অঞ্চলে 'অরা' অর্থে গৃহ বলা হয়। শোনা যায় আদিতে মাঝি সম্প্রদায়ভুক্ত রাউতেরা এইস্থানে বসবাস স্থাপন করেন। 'রাউত অরা' অপভ্রংশে রাউতারা হইয়াছে এইরূপে অনেকে অনুমান করেন।

শ্রীরামনারায়ণ চৌধুরী, চাকুরি,
ও
শ্রীকুলদা প্রসাদ মহাপাত্র, প্রধান শিক্ষক,
রাউতারা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পো : ঝিলিমিলি, বাঁকুড়া।

১৪। গ্রাম : বাঁশডিহা। ১৩০।৮৬১.৯৭।১৯০।৯৯৯

(ক) বৈরাগী, ভূমিজ, কুমার, কামার, মুচি, ডোম, বেনে, কুলু ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে বৈরাগীপাড়া, কলুপাড়া, কুমারপাড়া, সর্দারপাড়া, সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি নামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া। বাঁকুড়া হইতে মোটরবাসে ঝিলমিল নামিয়া সেখান হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১২ই জ্যৈষ্ঠ শিবপূজা এবং ১লা মাঘ পাহাড়ীসিনীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা দুইটি প্রাচীন এবং গ্রামের 'ভূমিজ' সম্প্রদায়ভুক্ত সর্দারগণই করিয়া থাকেন। পাহাড়ীসিনীর নিকট মানত জানাইয়া পায়রা, মুরগী ও ছাগ্ বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) শিবপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি চালাঘরে দেবদেবীর পূজাদি হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে পাঁচটি শিবলিঙ্গ আছে।

গ্রামে সীমান্তবর্তী একটি নির্জন স্থানে একটি প্রাচীন বট গাছ আছে। এইস্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারের প্রস্তর খোদিত কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণের বিশ্বাস, পূর্বে এই স্থানে কোন ডাকাত দলের আড্ডা ছিল।

শ্রীঅনিল বরণ মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম : বাঁশডিহা, পো : ঝিলিমিলি,
বাঁকুড়া।

১৫। গ্রাম : বুড়িশাল। ১৫১।৪৯৮.১২।২৫।১৬২

(ক) মাহাতো ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে গোড়াবাড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে আদিবাসী সম্প্রদায়ের 'সহরায়পূজা' ও 'গারামপূজা' এবং ফাল্গুন

ও চৈত্রের মধ্যভাগে 'বাহাপূজা' অনুষ্ঠিত হয়। পূজা ও উৎসবগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) বাহাপূজার মেলা। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। মেলায় প্রায় ছয়-সাতশত নরনারীর সমাগম হয়।

(চ) গ্রামের প্রান্তে একটি শাল বন আছে। আদিবাসী সম্প্রদায় এই শালবনের মধ্যেই তাঁহাদের পূজা-পাবণ পালন করেন।

শ্রীনবগোপাল মণ্ডী, শিক্ষক,
চক্রপাথর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ অম্বিকানগর, বাঁকুড়া।

উৎসব বিবরণী

বামনিসিনীপূজা

শুকলা গ্রামে বামনিসিনী পূজার প্রচলন সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে প্রায় দুই মাইল দূরে ভুরকুড়া গ্রাম। এই গ্রামে প্রায় ছয়শত ফুট উচ্চ একটি পাহাড়ের শিখরে বামনিসিনী দেবীর একটি অতি প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত বৃহৎ মন্দির আছে। বর্তমানে উহা জীর্ণ হইয়া ভগ্নপ্রাপ্ত। মন্দিরটি যে কতকাল পূর্বে কাহার দ্বারা নির্মিত তাহা আজ সঠিক ভাবে বলা যায় না। ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরে পিতল নির্মিত অশ্ববাহিনী বামনিসিনীদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবীর মস্তকোপরি পিতল নির্মিত ছত্র শোভিত। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে শুকলা গ্রাম নিবাসী দেবীর পূজারী বা দেঘরিয়া ঠাকুরদিগর মন্দিরে পূজা শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে তাঁহার হঠাৎ স্মরণ হয় যে, প্রতিদিনের মত দেবীর খড়্গটি তিনি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এই কারণে তিনি পুনরায় মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলে দেবী মানবীরূপে তাঁহাকে দর্শন দেন এবং নির্দেশ দেন যে, দেবীর খড়্গ যথাসময়ে যথাস্থানে পাওয়া যাইবে। ঐ খড়্গ যে স্থানে পাওয়া যাইবে সেই স্থানে যেন দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা করা হয়। খড়্গটি পূজকের গৃহের অনতিদূরে পাওয়া যায় এবং সেই স্থানেই মন্দির নির্মাণ করিয়া দেবীর যথারীতি পূজা ও সেবাকার্য চলিতে থাকে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী ভুরকুড়া মৌজা নিবাসী সর্দার এবং ভূমিজ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বামনিসিনী পাহাড়ের উপরিস্থিত মন্দিরেই পূজা দিয়া থাকেন।

প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ এখান যাত্রা তিথিতে সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত ঢাক-ঢোলের বাদ্যসহ সাড়ম্বরে দেবীর যথারীতি পূজা, আরতি এবং দেবীর উদ্দেশ্যে মানতের পশুবলি অনুষ্ঠিত হয়। মানত হিসাবে চিড়া-মুড়কী, মণ্ডা-মিঠাই, পেঁড়া প্রভৃতি মিষ্টান্ন এবং হাঁস, পায়রা পাঁঠা প্রভৃতি পশুপক্ষী বলি দেওয়া হয়। পশু বলির জন্য মন্দিরের সম্মুখে 'যুপকাষ্ঠ' আছে। পূজার প্রধান সেবায়েত বা ভক্তগণ 'দিগার' পদবীধারি এবং ভূমিজ সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহারা বংশানুক্রমে দেবীর পূজা পরিচালনা করিতেছেন। পূজান্তে সমাগত নরনারীর মধ্যে সর্বজনীনভাবে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূজাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

নারকোলি গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে আমবাগানের মধ্যে প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র কুড়ি বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। আশপাশের অম্বিকানগর, গোড়াবাড়ী প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় চারিশত নরনারী আসেন। ময়রা, মনিহারী, বাসন-কোসন, খেলনা-পুতুল, বই-ছবি ইত্যাদির প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে। মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য ছৌ-নাচ ও হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়।

বড়িড গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক-পূজা উপলক্ষে বুড়াবাবাজীউরমন্দির সংলগ্ন প্রায় আট নয় বিঘা জমির উপর দুইদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

অম্বিকানগর ও রুদড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রাম ব্যতীত পুরুলিয়া জেলা হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চারি-পাঁচ সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়-চোপড়, কবিরাজী ঔষধপত্র, কাঠের তৈয়ারী আসবাবপত্র ধামা-কুলা প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ পিঁড়রা, ধাঙ্গীকড়ি, নারকোলি, চিয়াদা, সরেসডাঙ্গা, বসন্তপুর, অম্বিকানগর, রুদড়া, মুদিহার, চড়িচেড়া, মুকুন্দপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য ছৌ-নাচের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঘোলকুড়ি গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে গ্রামের সীমান্তে পাকা রাস্তার পার্শ্বে "মোল বাগান" নামক একটি স্থানে প্রায় চারি বিঘা জমি ব্যাপিয়া একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

অম্বিকানগর, রুদড়া এবং সীমান্তবর্তী পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় আট-নয়শত নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, ধামা-কুলা ব্যতীত অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিসপত্রের ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বুড়ি ইউনিয়ন হইতে আসেন।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর ছৌ-নাচ ও কাঠিনাচের আয়োজন করা হয়। প্রধানতঃ বাঁকুড়া জেলার বড়িড গ্রাম হইতে এবং পুরুলিয়া জেলার দাধ্‌কডি গ্রাম হইতে ছৌ-নাচের দল আসিয়া থাকে।

রুদড়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় দশ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

রুদড়া, বুড়ি, অম্বিকানগর, রাজাকাটা এবং পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত জামাতোড়িয়া হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদির প্রায় একশত দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা অম্বিকানগর, বড়িড, খাতড়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ও ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় ও জুয়া খেলা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—রুদড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত সরস্বতী-পূজার মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

শিমলী গ্রামের সীমান্তবর্তী কংসাবতী নদীর তীরে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে দুইদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং ইহাতে বড়িড, অম্বিকানগর, রুদড়া, রাজাকোটা প্রভৃতি আশপাশের গ্রাম হইতে সাত-আটশত নরনারী আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল ইত্যাদির প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে। আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলার দল আসে এবং অনেকে জুয়া খেলেন।

মহেশপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের ১৫ই ও ১৬ই তারিখে শিবের গাজন উপলক্ষে প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে এবং ইহাতে আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, মাটির খেলনা-পুতুল, বই-ছবি, ধামা-কুলো ইত্যাদির প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা আশপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন। আমোদ প্রমোদের জন্য নাগর-

দোলার দল আসে এবং অনেকে জুয়া খেলিয়া থাকেন। মেলাটি প্রাচীন।

বামনিসিনীপূজার মেলা

ভুরকুড়া গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে বামনিসিনীপূজা উপলক্ষে বামনিসিনী পাহাড়ের পাদদেশে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

রুদড়া, অম্বিকানগর, রানিবাঁধ, রাজাকাটা, হলুদ-কানালী, বড়্ডি, রাউতড়া, খাতড়া, গোড়াবাড়ী, গ্রাম হইতে এবং পুরুলিয়ার মানবাজার হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দশসহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের প্রায় ষাটটি দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ রানিবাঁধ, খাতড়া, রাজাকাটা প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানটি প্রায় পাঁচ-ছয়টি কীর্তনীয়ার দল দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

শুশুনিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে বামনিসিনীপূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই-আড়াই বিঘা দেবোত্তর জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত দেউলি, বাগশাদা, বিক্রমডিং, কালিসেন্না, কেন্দাপাথর, শুশুনিগোড়া, বুদখিলা, ভুরকুড়া, রানিবাঁধ, আটাশালা, তামাঘুন, বেঠোলা, পলাশবনী, বুড়িশাল, রুদড়া, রাধানগর, চিরকুনকাশালী, ডাবরি, অম্বিকানগর প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় ছয়-সাতশত নরনারী গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, দা-কোদাল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী নানাপ্রকার জিনিসপত্রের প্রায় সত্তর-আশিটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ অম্বিকানগর, দেউলি, চিরকুনকাশালী, রুদড়া, রানিবাঁধ, শ্রীদামশোলডিহি প্রভৃতি গ্রাম সমূহ হইতে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক ব্যতীত খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয়।

শিবরাত্রির মেলা

পরেশনাথ গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন চৈত্র মাসে শিব-রাত্রি উৎসব উপলক্ষে গ্রাম পার্শ্বস্থিত কুমারী নদীর তীরে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই একর জমির উপর নয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত প্রায় কুড়ি-বাইশ বৎসর যাবত বসিতেছে।

রুদড়া ও অম্বিকানগর ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রাম ব্যতীত পুরুলিয়ার মানবাজার হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন; যাত্রীগণের মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাধিক্য লক্ষনীয়। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী নানাপ্রকার জিনিসপত্র প্রভৃতির দোকানপাট বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ অম্বিকানগর, রুদড়া, বড়্ডি প্রভৃতি গ্রাম ব্যতীত পুরুলিয়ার মানবাজার হইতে আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য হরিনাম সংকীর্তন ও লটারী খেলা ব্যতীত জুয়াও খেলা হয়।

দেউলি গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবপূজা উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই-আড়াই বিঘা দেবোত্তর জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

রুদড়া, রানিবাঁধ, অম্বিকানগর, রাজাকাটা প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চারি-পাঁচশত নরনারী প্রধানতঃ গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। মাটির হাঁড়িকুড়ি-পুতুল-খেলনা, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতি প্রধানতঃ রানিবাঁধ, রুদড়া ও অম্বিকানগর হইতে আসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ অম্বিকানগর, চিরকুনকানালী, রুদড়া,

রানিবাঁধ, শুকলা, বুদখিলা প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, খেলাধুলা ব্যতীত ছৌ-নাচ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

বাঁশডিহা গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবপূজা উপলক্ষে পূজা মণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় চারি-পাঁচ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হইতে সাঁওতাল ভূমিজ, বৈরাগী, কামার, কুমার, কলু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রায় সাত-আটশত নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বই-ছবি, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা, পান-বিড়ি প্রভৃতির প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য চড়কগাছ ঘুরাইবার সময় বহু দর্শকের সমাগম হয়।

সরস্বতীপূজার মেলা

রাউৎরা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে গ্রামের মন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর জমির উপর চারিদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত বাংলা ১২৯৪ সন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

স্থানীয় গ্রামাঞ্চল ব্যতীত বাড়িকুল, হলুদকানালী ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রাম এবং পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চারিসহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী ব্যতীত পান-বিড়ি প্রভৃতির প্রায় চল্লিশটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য থিয়েটার অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় দুইসহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক অম্বিকানগরের পূজা-পার্বণাদি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

অম্বিকানগর

বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ থানার অন্তর্গত অম্বিকানগর একটি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ইহা কংসাবতী (কাসাই) নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে গোড়াবাড়ী রুটের মোটরবাসে এই গ্রামে পৌছান যায়। অতীতে ইহা যে একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল তাহা গ্রামের নামের সহিত সংযুক্ত নগর শব্দটি হইতেই বুঝা যায়। অম্বিকানগরের নিকটবর্তী 'সেনেরগড়' নামক স্থানে বহু প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন দৃষ্টে প্রত্নতাত্তিকগণ অনুমান করেন সুদূর অতীতকালে এই অঞ্চল বাংলার সেনরাজাদের অধীন ছিল।

রাজস্থানের ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজা জগন্নাথ দেও-র পৌত্র (?) অনন্তধবল দেও এই স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিলে বর্তমান অম্বিকানগরের প্রকৃত সমৃদ্ধির ইতিহাস শুরু হয়। অনন্তধবল দেও কর্তৃক রাজধানী স্থাপনের পূর্বে এই স্থান 'আমাই নগর' নামে খ্যাত ছিল বলিয়া শোনা যায়। প্রাচীন নথীপত্রে অম্বিকানগর কেবলমাত্র একটি গ্রাম নহে—একটি পরগনারূপে পরিচিত ছিল। জনশ্রুতি আছে অনন্তধবল দেও এক স্বপ্নাদেশ অনুসারে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটি হইতে এক পাষাণময়ী দেবী মূর্তি আনিয়া এই স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা পূর্বক নিত্যপূজাদির ব্যবস্থা করেন। ইনিই দেবী অম্বিকা নামে পরিচিত এবং এই দেবীর নামানুসারেই গ্রামের নাম অম্বিকানগর হয়। শোনা

যায়, জয়রামবাটির যে-স্থান হইতে অম্বিকাদেবীর মূর্তি তুলিয়া আনা হইয়াছিল সেই শূন্য পবিত্র স্থানে অদ্যাপি অম্বিকাদেবীর পূজাদি হইয়া থাকে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে অম্বিকানগরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা অনন্তধবল দেও রাজপুত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইঁহাদের আদি বাসস্থান রাজস্থানের ঢোলপুরে। জগন্নাথ দেও-র রাজস্থানের ঢোলপুর হইতে বঙ্গদেশে আগমন ও জমিদারী প্রাপ্তি সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, একদা তিনি শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম হইতে তীর্থ সারিয়া ফিরিবার পথে কটকের নবাবের দরবারে উপস্থিত হন। তাঁহার সুদর্শন কান্তি, রাজকীয় আড়ম্বর ও প্রত্যুৎপন্নমতিতার জন্য নবাব তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে শাহাজাদা বলিয়া সম্বোধন করেন। সুচতুর জগন্নাথ দেও তাঁহার 'শাহাজাদা' উপাধি সার্থক করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ নবাবের নিকট প্রার্থনা জানান। তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া নবাব তাঁহার নিজ সৈন্যবাহিনী হইতে কিছু সুশিক্ষিত সৈন্য দিয়া নিজের ক্ষমতা বলে তাঁহাকে শাহাজাদা উপাধি সার্থক করিতে পরামর্শ দেন। জগন্নাথ দেও ঐ সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী লইয়া মল্লভূমের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত ধলভূমে আসিয়া উপস্থিত হন। তৎকালে ধলভূমে চিন্তামণি ধোপা রাজত্ব করিতেছিলেন। শোনা যায়, তাঁহার রাজধানী ছিল বাঁকুড়া জেলার বর্তমান খাতড়া থানার অন্তর্গত ভোজদা গ্রামে। জগন্নাথ দেও চিন্তামণির রাজ্য আক্রমণ করেন এবং সহজেই তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ধলভূম অধিকার করিয়া লন। ধলভূমের রাজা হইয়া তিনি ইন্দপুর-খাতড়ার সীমান্তে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং কুলদেবতা রামচন্দ্রজীউর নামানুসারে রাজধানীর নামকরন করেন রামচন্দ্রপুর। পরে রামচন্দ্রপুর হইতে খাতড়া থানার অন্তর্গত সুপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। ধোপা রাজাকে পরাস্ত করিয়া জগন্নাথ দেও ধলভূমের অধিকার প্রাপ্ত হন বলিয়া 'ধবল' উপাধি ধারণ করেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, অনেকে অনুমান করেন ধোপা রাজার রাজ্য বলিয়া এই অঞ্চল ধোপাভূম বা ধলভূম নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে এখনও ধান-চাউল মাপিবার 'পাই'-কে সাধারণ লোক "চিন্তামণির পাই" (৮০ তোলায়) বলিয়া থাকেন।

অপর পক্ষে জগন্নাথ দেও-র ধবল উপাধি ধারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, হিন্দী 'আলাহ খণ্ডে' লিখিত আছে, যে-ব্যক্তি আপনাকে এবং আপন সেনাদলকে রক্ষা করিতে পারেন ও শত্রুপক্ষকে হনন করিতে সক্ষম তাঁহাকে 'যোদ্ধা' বলে। ঐ ব্যক্তি পাঁচ হাতীর বল ধারণ করেন। যে-ব্যক্তি যোদ্ধাকে রক্ষা করেন এবং আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন তাঁহাকে 'শূর' বলে—তাঁহার দশ হাতীর বল। যে-ব্যক্তি শূরকে রক্ষা ও আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম তাঁহাকে সামন্ত বলে—তাঁহার বিশ হাতীর বল। যে-ব্যক্তি সামন্তকে ও আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম তাঁহাকে ধবল বলে—তাঁহার চল্লিশ হাতীর বল। যে-ব্যক্তি ধবলকে রক্ষা ও আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম তাঁহাকে সবল বলে—তাঁহার আশী হাতির বল। শোনা যায়, মহারাজ পৃথ্বীরাজের উপাধি সবল ছিল।

পরবর্তীকালে এই রাজ পরিবারের দুই উত্তরাধিকারী দুই ভ্রাতা টেকচাঁদ ও খড়্গেশ্বর ধবল দেও-র মধ্যে কে রাজ্যাধিকার পাইবেন এই বিবাদ লইয়া ইঁহাদের রাজত্ব দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। নাবালক অবস্থায় ইঁহাদের পিতা পরলোক গমন করিলে অম্বিকানগরের বৈদ্যবংশীয় পাত্র পরিবার উভয় ভ্রাতাকে নিজপুত্ররূপে লালন-পালন করেন। এই বিবাদে প্রধান কারণ টেকচাঁদ ছোটরানীর পুত্র কিন্তু বয়সে জ্যেষ্ঠ। অপরপক্ষে খড়্গেশ্বর পট্টমহিষীর পুত্র কিন্তু বয়সে কনিষ্ঠ। রাজবাড়ীর কুলগুরু বর্তমান ইঁদপুর থানার অন্তর্গত ব্রজরাজপুরের গোস্বামীদিগের মধ্যস্থতায় জ্যেষ্ঠ টেকচাঁদ পেলেন রাজ্যের ৯½ অংশ ও শ্যামসুন্দরজীউর সেবাপূজার ভার। কনিষ্ঠ খড়্গেশ্বর পাইলেন রাজ্যের ৬½ অংশ, পবিত্র দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ, ক্ষত্রিয় গৌরব জাতীয় তলোয়ার ও কালাচাঁদজীউর বিগ্রহ। পারিবারিক বিবাদ মীমাংসার পুরস্কার স্বরূপ উভয় ভ্রাতা তাঁহাদের নিজ নিজ অংশ হইতে দুই পয়সা হিসাবে জমিদারীর এক আনা অংশ কুলগুরু গোস্বামীদিগকে দান করেন। মূলতঃ এই রাজ্য সীমানা মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত তিনভাগে বিভক্ত হইয়া যায়—(১) মধ্যে সুপুর এবং দুইধারে অম্বিকানগর পরগনা; (২) অম্বিকানগর পরগনার শিলাবতী নদীর তীর হইতে ছাতনা রাজ্য সীমান্ত পর্যন্ত ইঁদপুর থানা, সমগ্র রানিবাঁধ থানা এবং

খাতড়া থানার কিয়দংশ ; (৩) খাতড়া, সিমলাপাল ও ইঁদপুর থানার কিয়দংশ লইয়া একটি ভূখণ্ড।

রাজ্য সীমানা বিভক্ত হইবার পর টেকচাঁদ দেও সুপুর হইতে খাতড়ায় এবং খড়্গেশ্বর দেও অম্বিকানগরের প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণে রুদড়া গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। খড়্গেশ্বরের পুত্র অনন্তধবল দেও অম্বিকানগরে রাজধানী স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন স্থান হইতে ছত্রিশ জাতির লোকজন আনিয়া রাজধানীতে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তদবধি খড়্গেশ্বরের বংশধরগণই বংশ পরাম্পরায় অম্বিকানগরের জমিদারীর ভোগ-দখল করিতেছেন। এই বংশধারাটি সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তাহা এইরূপ—অনন্তধবলের পুত্র গোপীনাথ ধবল, গোপীনাথের পুত্র জগজীবনরামের দুইপুত্র নিমাইচাঁদ ও নীলমণি। নিমাইচাঁদের পুত্র গৌড়েরধ্বজ ; ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। নীলমণির পুত্র রাইচরণ ও তাঁহার পুত্র কালাচাঁদ। কালাচাঁদ অপুত্রক ; বর্তমানে তাঁহার দুই কন্যা আছেন।

নিমাইচাঁদের আমলে অনাদায়ী খাজনার দায়ে অম্বিকানগরের জমিদারী কলিকাতার সুরেন্দ্র মোহন ঠাকুর ক্রয় করিয়া লন। পরে এই জমিদারী কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের নিকট হইতে ভাগলপুরের চন্দ্রশেখর এবং চন্দ্রশেখরের নিকট হইতে দ্বারভাঙ্গার মহারাজ ক্রয় করেন।

রাইচরণ তৎকালে স্বদেশী আন্দোলনকারী এনার্কিষ্ট পার্টির অনুরক্ত পৃষ্টপোষক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। এমনকি অম্বিকানগর রাজবাড়ীতে গোপনে এনার্কিষ্ট পার্টির কাজ-কর্মও চলিত। এই কারণে তিনি ইংরেজ সরকারের কোপানলে পড়েন এবং সরকার অম্বিকানগর রাজবাড়ীর কামান-বন্দুকাদি আগ্নেয় অস্ত্রসস্ত্র বাজায়াপ্ত করেন।

এইভাবে অম্বিকানগর রাজপরিবারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অম্বিকানগরের গৌরব ও সমৃদ্ধি অস্তমিত হয়। ১৩০৫ সনে কংসাবতীর এক প্রলয়ঙ্করী বন্যায় অম্বিকানগর পরগনার দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই বৃহৎ গ্রামটি ছিন্নভিন্ন হইয়া বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কালের প্রভাবে আজ সবই হৃতশ্রী, সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। অম্বিকানগর আজ একটি অতি সাধারণ গ্রামে পরিণত হইয়াছে। অতীতের স্মৃতি স্বরূপ এখানে-সেখানে কয়েকটি প্রাচীন জীর্ণ মন্দির, রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ, ভগ্ন অট্টালিকাদি এবং কালচাঁদসায়র, শ্যামচাঁদসায়র, গোপালসায়র প্রভৃতি নামে কয়েকটি দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষের পিছনদিকে কংসাবতী ও কুমারী নদীর সংযোগস্থল এবং তিনপাশ ঘিরিয়া অশ্বখুরাকৃতি পরিখা। মজিয়া যাওয়া ঐ পরিখার বক্ষেই উল্লিখিত সায়রগুলি অবস্থিত। অনন্তধবল দেও তাঁহার রাজধানী স্থাপনকালে যে ছত্রিশ জাতির বসতি স্থাপন করাইয়াছিলেন অদ্যাপি তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, স্বর্ণবণিক, কাংসবণিক, তিলি, ময়রা, কামার, কুমার, নাপিত, জেলে, ধোপা, ডোম, হাড়ী, বাউরী, বাগ্দী, মালাকার, বাগল, আহিরী গোপ, মুচি, মুসলমান প্রভৃতি অম্বিকানগরে বসবাস করিতেছেন। গ্রামে রাজাপাড়া, ময়রাপাড়া, পোদ্দারপাড়া, বাউরীপাড়া, ধোপাপাড়া, জেলেপাড়া, কুমারপাড়া ডোমপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি প্রাচীন পাড়া আছে। গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য ও ব্যবসায়। আর অতীতের বহু ঘটনার নীরব সাক্ষী কংসাবতী নদী আজিও অম্বিকানগরের সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত। কংসাবতীর বাঁধ দেওয়া হইতেছে ; কংসাবতী হয়ত আবার নবীন জলধারায় ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিবে ; কিন্তু অম্বিকানগর আর কোনদিন তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে কি না তাহা কে বলিবে।

অম্বিকানগরের প্রধান আরাধ্যদেবী অম্বিকা। বর্তমানে সমতল ছাদ বিশিষ্ট পূর্বমুখী ইষ্টক নির্মিত একটি বড় পাকা মন্দিরে অম্বিকা দেবীর শীলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি অপ্রাচীন, এখনও ইহার নির্মাণ কার্য চলিতেছে। এই মন্দিরের চারিপাশে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত প্রস্তরাদি এবং মন্দিরের সুউচ্চ ভিত্তিতে ব্যবহৃত প্রস্তরাদি দৃষ্টে মনে হয় আদিতে এই স্থানে অম্বিকাদেবীর প্রস্তর নির্মিত একটি বড় মন্দির ছিল। ঐ মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে এই স্থানে একটি খড়ের ঘরে কিছুকাল দেবীর পূজাদি চলে। পরে রাইচরণ ধবল দেও একটি ছোট পাকা মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। বর্তমান মন্দিরটি গ্রামবাসী সর্বসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতায় নির্মিত।

মন্দিরাভ্যন্তরে প্রায় চার হাত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দণ্ডায়মান অম্বিকাদেবীর শিলামূর্তিটির গঠন ভঙ্গী অস্বাভাবিক ধরনের বস্ত্র পরিহিতা দেবীর কেবলমাত্র মুখমণ্ডল এবং হাঁটুর নীচে হইতে পদযুগলদ্বয় সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়। দেবীর সমগ্র মুখমণ্ডল সিন্দুর লিপ্ত, চক্ষুর পরিবর্তে দুইটি গোলাকৃতি কোঠর এবং নাসিকাটি স্তূপের ন্যায়। ইহাই দেবী অম্বিকার মূর্তি। ইহা ভিন্ন, এই মন্দিরের একটি শিলায় খোদিত চারিটি মূর্তি এবং মানতকারীদের প্রদত্ত অনেকগুলি মাটির হাতিঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তর খোদিত উক্ত চারিটি মূর্তির উপর দীর্ঘদিন তেল-সিন্দুরের প্রলেপ পড়ায় উহাদের প্রকৃত রূপ বুঝিতে পারা যায় না। দেবীর প্রতিদিন অন্নভোগ দ্বারা সেবাপূজা হইয়া থাকে এবং আশ্বিন মাসে শারদীয়া নবমী তিথিতে সাড়ম্বরে পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন দেবীর নিকট মানতস্বরূপ উৎসর্গকৃত প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি ছাগ বলি হইয়া থাকে এবং বহু নরনারীর সমাগম হয়। অম্বিকানগর রাজ পরিবার কর্তৃক প্রদত্ত দেবোত্তর ভূ-সম্পত্তির আয় হইতে দেবীর নিত্যপূজাদি হইয়া থাকে। বর্তমানে স্থানীয় চক্রবর্তী পদবীধারী (শ্রীঅনাদি চক্রবর্তী) ব্রাহ্মণ পরিবার দেবীর পূজাদি করিয়া থাকেন। আদিতে মুখটি পদবীধারী ব্রাহ্মণগণ (অম্বিকানগর রাজপরিবার কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি দেও) দেবীর পূজারী ছিলেন। বর্তমান চক্রবর্তীগণ ইঁহাদের দৌহিত্র বংশ।

অম্বিকাদেবীর মন্দিরের পশ্চাৎভাগে মাকড়া পাথর দ্বারা নির্মিত মাঝারি গঠনের একটি প্রাচীন জীর্ণ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটি এতই জীর্ণ যে, যে-কোন সময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া একটি দুর্ঘটনা ঘটাইতে পারে। বর্তমানে ইহা শিবমন্দিররূপে পরিচিত হইলেও আদিতে ইহা শিবমন্দির ছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হয়। চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরটির চারিদিকের ভিত্ ও দেওয়াল প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হইলেও ইহার অভ্যন্তরের মেঝে প্রস্তর কেন একখণ্ড ইঁটেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। মাটির মেঝের উপর প্রোথিত গৌরপট্টহীন একটি শিবলিঙ্গের অগ্রভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় আদিতে এই মন্দিরে অন্য কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই বিগ্রহকে উৎখ্যাত করিয়া পরবর্তীকালে শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হইয়াছে। মনে হয় বিগ্রহ উৎখাতকালেই মন্দিরের অভ্যন্তরের মেঝের এইরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই মন্দিরের দেওয়াল গাত্রে হেলান দিয়া প্রায় আড়াই হাত উচ্চ শিলায় খোদিত একটি অপূর্ব সুন্দর দিগম্বর জৈন ঋষভনাথের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মাসনের উপর দণ্ডায়মান এই দিগম্বর মূর্তি শিরোপরি ছত্র বিরাজ করিতেছে। পদ্মাসনের ঠিক নীচেই উপবিষ্ট বৃষ মূর্তি, উহার উভয় পার্শ্বে দুইটি সিংহ মূর্তি এবং সিংহ মূর্তি দুইটির ঠিক উপরেই মূল দিগম্বর মূর্তির প্রায় হাঁটু অবধি উচ্চ বস্ত্র পরিহিত দুইটি নরমূর্তি ব্যতীত শিলাটির দুই পার্শ্বের সীমান্ত দিয়া উপর হইতে নীচে এক জোড়া করিয়া উভয় পার্শ্বে ছয়-ছয় মোট বার জোড়া ক্ষুদ্র দিগম্বর মূর্তি খোদিত আছে। দিগম্বর মূর্তিটি তেল-সিন্দুর লিপ্ত। সন্দেহ হয় ইনিই কি আদিতে এই মন্দিরের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন? তারপর একদিন ধর্মের গোঁড়ামিতে শৈবের দেবতা শিব আসিয়া তাঁহার স্থান দখল করিয়াছেন। কিন্তু ঋষভনাথ নিজের স্থান ছাড়িয়া দিতে রাজী না বলিয়া কি আজিও মন্দিরের একপাশে দাঁড়াইয়া আছেন? অথবা অন্য কোন স্থান হইতে তুলিয়া আনিয়া এই দিগম্বর মূর্তিটিকে মন্দিরে স্থাপন করা হইয়াছে? বর্তমান এই মন্দির অম্বিকাদেবীর ভৈরবমন্দির নামে খ্যাত। কিন্তু দেবীর পূজারীকে সবিশেষভাবে প্রশ্ন করিয়াও সঠিক জানিতে পারা যায় নাই দেবীর ভৈরবরূপে তিনি নির্দিষ্ট কোন মূর্তিটি পূজা করেন। তাঁহার মতে উভয় মূর্তিই মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন; সুতরাং তিনি উভয় মূর্তিকেই দেবীর ভৈরব জ্ঞানে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন।

অম্বিকাদেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বৃক্ষের নীচে প্রায় সাড়ে তিন হাত উচ্চ প্রস্তরে খোদিত একটি বীরমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্তি সম্প্রসারিত হাঁটুভাঙ্গা অবস্থায় দণ্ডায়মান মূর্তিটির সম্মুখে প্রসারিত বাম হস্তে ঢাল এবং দক্ষিণ হস্তে উদ্যত কৃপান। ইহার পিছনে দণ্ডায়মান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি মনুষ্য মূর্তির হস্তে একটি দীর্ঘ লাঠি এবং শিলাস্তম্ভের উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র মনুষ্য মূর্তি খোদিত আছে। এই বীরমূর্তিটিকে 'কালুরায়' দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়। পূজারী জাতিতে ডোম।

'কালুরায়' মূর্তির পাশেই প্রায় দুই হাত লম্বা শিলায় খোদিত একটি ভগ্ন বিষ্ণু মূর্তিকে ষষ্ঠীরূপে পূজা করা হয়। ইহার পাশে একটি কারুকার্য খচিত শিলা রক্ষিত আছে। দেখিয়া মনে হয়, ইহা কোন অট্টালিকা বা মন্দির গাত্রের সহিত সংযুক্ত ছিল।

গ্রামে পশ্চিমদিকে সাবিত্রীদেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে। শোনা যায়, অম্বিকানগরের রাজারা অম্বিকাদেবীর পূজা দিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন এবং ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রী-দেবীর পূজা দিতেন। বর্তমানে কেবলমাত্র শারদীয়া নবমীতিথিতে ও সাবিত্রী চতুর্দ্দশী তিথিতে পশু বলি দিয়া সাবিত্রীদেবী পূজা হয়। নিত্যপূজাদি হয় না।

অম্বিকানগর রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ সংলগ্ন একটি মাঝারি গঠনের মন্দিরে কালাচাঁদ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ কষ্টি পাথর ও শ্রীরাধিকা অষ্টধাতু নির্মিত। ইহা ভিন্ন, এই মন্দিরে শ্যামচাঁদ নামে শিলাময় শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ, পিতল ও প্রস্তর নির্মিত দুইটি গোপাল মূর্তি এবং রাজ পরিবারের কুলদেবতা রামচন্দ্র শিলা আছে। মন্দিরে উক্ত বিগ্রহাদির নিত্যপূজা হয় এবং কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা ও ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কালাচাঁদের রাসমঞ্চটি বর্তমানে ভগ্নদশা প্রাপ্ত।

ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর শারদীয়া তিথিতে রাজবাড়ী সংলগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজার সময় কালাচাঁদ মন্দির হইতে সাড়ম্বরে রাজপরিবারের রামচন্দ্র শিলাটিকে চণ্ডীমণ্ডপে আনা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, কুলপ্রথা অনুসারে রাজবাড়ীর যাবতীয় পূজাদিতে রামচন্দ্র সাক্ষীরূপে উপস্থিত থাকেন। তবে দুর্গার নিকট পশুবলির সময় রামচন্দ্র শিলাটিকে স্থানান্তরিত করা হয়।

অম্বিকানগর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর দুইদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি স্থানীয় রাজবংশের দ্বারা প্রবর্তিত এবং বহুকালের প্রাচীন।

স্থানীয় অঞ্চলের লোকজন ব্যতীত রুদড়া, বড্ডি, রাজাকাটা, গোড়াবাড়ী প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্যান্য জিনিসপত্রের দোকানপাট সমেত প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ রুদড়া, রাজাকটা, বড্ডি, গোড়াগাড়ী প্রভৃতি স্থানগুলি হইতেই আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য থিয়েটার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে।

পূর্বে দুর্গাপূজায় খুব ধুমধাম হইত এবং বৃহৎ মেলা বসিত। দুর্গাপূজা ও অম্বিকাপূজা উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী সাঁওতালী নৃত্যের আয়োজন করা হইত।

অম্বিকানগর গ্রামে 'ইন্দকুঁড়ি' নামে পরিচিত নির্দিষ্ট স্থানে পূর্বে রাজপরিবার কর্তৃক সাড়ম্বরে ইন্দপরব অনুষ্ঠিত হইত। অম্বিকানগরের ইন্দপরব দেখিতে বহু লোকজনের সমাগম হইত। বর্তমান এই উৎসব বন্ধ হইয়া গেলেও তাহার ক্ষীণ স্মৃতি স্বরূপ রাজবাড়ীর রাজস্ব আয়-ব্যায়ের নূতন খাতা পত্তন উপলক্ষে প্রতি বৎসর সোনার ছত্র উত্তলন করিয়া ইন্দ্রাভিষেক ও হোম-যজ্ঞ হইয়া থাকে। রাজপরিবারের কুলপুরোহিত রাজাদিগের যাবতীয় পূজাদি করিয়া থাকেন। ইঁহারা চট্টোপাধ্যায় পদবীধারী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের আদিবাস বর্ধমান জেলার কালনা থানায়।

উল্লিখিত উৎসবাদি ব্যতীত গ্রামে শীতলা, মনসা ও কালীপূজা হইয়া থাকে। শীতলার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

থানা ঃ রাইপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ ভাঙ্গাদেউলী। ২০।৪০১·২০।২৭।১৩০

(ক) মাহাতো ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে বিক্রমপুর ভায়া সারেঙ্গা বাঁকুড়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) স্থানীয় আদিবাসী কর্তৃক প্রতি বৎসর মাঘ মাসে 'গেরামপূজা' এবং চৈত্র মাসে শালুইপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গেরামপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি বৃক্ষের নীচে সাধারণ দেবদেবীর স্থান আছে।

শ্রীসত্য ভূষণ মিশ্র, প্রধান শিক্ষক,
ভাঙ্গাদেউলী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পো: ভাবনী, বাঁকুড়া।

২। গ্রাম ঃ সোনাগাড়া।
৮৩।১,৯৯৭·৬৬।২০৪।১,২৭৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, শুড়ি, বাউরী, হাড়ী, ডোম, গন্ধবনিক, মাহাতো, কোড়া ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে মোটরবাস যোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে চারিদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীচাঁদবদন মাহাতো, প্রধান শিক্ষক,
গ্রাম: সোনাগাড়া, বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম ঃ কদমাগড়। ৯১।৮০৫·২৫।১৪১।৭১০

(ক) গন্ধবনিক, কুর্মি ক্ষত্রিয়, সোমগুল, খয়রা, ধোপা, কামার, ডোম ও মুসলমান। গ্রামটিতে খয়রাপাড়া, কুর্মিপাড়া, বেনেপাড়া, শুঁড়িপাড়া, ডোমপাড়া প্রভৃতি নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে বাঁকুড়া-রানিবাঁধ রুটের মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা এবং মাঘ মাসে গ্রাম্যদেবতা গোরাচাঁদ ঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শিবপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি গত বাংলা ১৩৬৫ সন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী মুড়কুম, কাঠগুড়া, পুখুরিয়া, ঢেঙ্গা আম, ধোবাকচা, চালকীগড়া, বাঁশরথ, সগড়ভাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে প্রায় চারি-পাঁচ শত নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মাত্র পনর-ষোলটি দোকান বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য হরিনাম সংকীর্তন ও ছৌ-নাচ ব্যবস্থা থাকে।

(চ) গ্রামে গোরাচাঁদঠাকুর এবং মনসার পৃথক পৃথক স্থান আছে।

শ্রীদুর্গাচরণ মাহাতো, শিক্ষক
গ্রাম: কদমাগড়, পো: রানিবাঁধ,
বাঁকুড়া।

৪। গ্রাম ঃ জগন্নাথপুর। ১৫১।১৫৮·৪৩।১৪।৮৯

(ক) ব্রাহ্মণ, তাঁতি, ভূমিজ, বাগাল ও সদগোপ। গ্রামটিতে বাগালপাড়া ও তাঁতিপাড়া নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে ফুলকুসমা রুটের মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে সর্বজনীন মনসাপূজা এবং কার্তিক মাসে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাঁধনা পরব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বাঁধনা পরবের মেলা কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে খড়ের ছাউনীযুক্ত সাধারণের একটি দেবালয় আছে। ইহা ব্যতীত, একটি মনসা, একটি শীতলা এবং গ্রাম্যদেবতার নির্দিষ্ট স্থান আছে। গ্রাম্য-দেবতার মূর্তির প্রকৃত স্বরূপ সঠিক বোঝা যায় না।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ভাণ্ডারী, শিক্ষক,
গ্রাম : ভাঙ্গরসই, পো : ফুলকুসুমা
বাঁকুড়া।

৫। গ্রাম : ধবনী। ১৯৫।৩৮৭·২৮।৬৫।৩২৮

(ক) কায়স্থ, গোয়ালা, বাগাল, মাল, হাড়ী, কুমার, কামার, লোহার ও সাঁওতাল। গ্রামে কায়স্থপাড়া, গোয়ালাপাড়া, বাগালপাড়া, মালপাড়া, হাড়ীপাড়া, কুমারপাড়া, কামারপাড়া, লোহারপাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে সারেঙ্গা-বাঁকুড়া, সারেঙ্গা-চন্দ্রকোণা, সারেঙ্গা-মেদিনীপুর, সারেঙ্গা-ঘাটাল প্রভৃতি রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং একটি কালীমন্দির ব্যতীত মনসা আছে। জনশ্রুতি আছে, 'ধ' নামক একপ্রকার বন্য গাছের প্রাচুর্যহেতু স্থানটির নাম 'ধ-বন' বা 'ধবনী' হইয়াছে।

শ্রীমহীতোষ গিরি, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ সারেঙ্গা,
বাঁকুড়া।

৬। গ্রাম : সারেঙ্গা। ২২৩।৬৬৯·৪৩।৫৪০।২।৫৫০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, গন্ধবনিক, তাম্বুলী, নাপিত, গোড়, কুমার, কামার, বৈদ্য, লোহার, বাগাল, বাউরী, ডোম, খ্রীষ্টান ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে নামপাড়া, কাশীবন, হালদারপাড়া, বাগালপাড়া, কুমারপাড়া, গোবিন্দপুর, সোনারডাঙ্গা প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে বাঁকুড়া, গড়বেতা, মেদিনীপুর, ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা রোড প্রভৃতি মোটরবাস যোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ২৫শে বৈশাখ হইতে ৫ই জ্যৈষ্ঠ উমাকান্ত নামে খ্যাত শিবের আবাল গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনীযুক্ত আটচালা বিশিষ্ট ঘরে উমাকান্ত নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, দুইটি শীতলা, তিনটি মনসা, লখন মাঝি, সাদমবঙ্গা, বড়ামবুড়ি, ধুল্যাবুড়ি, বলদাবুড়ি, শ্মশানকালী, বাঁশিসিনী, বাগুতবীর প্রভৃতি দেব-দেবী আছে। জনশ্রুতি আছে, 'সারগা' নামক জনৈক সাঁওতালের নামানুসারে গ্রামের নাম 'সারেঙ্গা' হইয়াছে।

শ্রীনবকিশোর কর, শিক্ষক,
সারেঙ্গা মহাত্মাজী স্মৃতি বিদ্যাপীঠ,
বাঁকুড়া।

৭। গ্রাম : রামচন্দ্রপুর (মৌজা : মগ্‌রা)।
২৪৭।৫৫৫·৮৫।১১১।৫০৫

(ক) তাঁতি, তাম্বুলী, খয়রা ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে তাঁতিপাড়া, তাম্বুলীপাড়া, খয়রাপাড়া ও সাঁওতালীপাড়া নামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গিধ্‌নি হইতে ফুলকুসুমা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন।

(ঙ) মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি গত পঁচিশ বৎসর যাবত শুরু হইয়াছে এবং প্রতি বৎসর প্রায় দুইশত নরনারীর সমাগম হয়।

(চ) গ্রামে গ্রাম্যদেবতার একটি স্থান আছে।

শ্রীবিভূতি ভূষণ মিশ্র, চাকুরী,
গ্রাম : রামচন্দ্রপুর, পো : ফুলকুসমা,
বাঁকুড়া।

৮। গ্রাম : রসপাল। ২৪৯।৭৮৫·৬৩৮।১২০।৫৭৬

(ক) ক্ষত্রিয়, দণ্ডমাঝি, কলু, হাড়ী, মুচি, গড়াই, দেশয়ালী ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী গিধ্নি রেলস্টেশন হইতে ফুলকুসমা-কুইনাপাল রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র-বৈশাখ মাসে শিবের চড়ক ও গাজন উৎসব এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা ও উৎসবগুলি রসপাল রাজাদের নিজস্ব উৎসব এবং প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। জনশ্রুতি আছে, বহুকাল পূর্বে এই স্থানে দুর্গাপূজার সময় নরবলি হইত।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রতি সোমবার। মেলাটি প্রাচীন।

দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে রসপাল রাজবাটীর নিকটে রাজপরিবারের কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মন্দির, অনাদিলিঙ্গ শিবমন্দির এবং একটি দুর্গামণ্ডপ আছে।

শ্রীত্রিলোচন রায়, প্রধান শিক্ষক,
রসপাল প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঁকুড়া।

৯। গ্রাম : ধানাড়া। ২৭৯।৪২০·৩১।১৫৫।৮৯৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, সদ্গোপ, তাম্বুলী, তাঁতি, লোহার, কামার, কুলু ও বাউরী। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, ঘোষপাড়া, তাঁতিপাড়া, মণ্ডলপাড়া, মাঝিপাড়া, বাউরীপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী চন্দ্রকোণা রোড রেলস্টেশন হইতে বিক্রমপুর-বাঁকুড়া ভায়া সারেঙ্গা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করিতে পারা যায়। ইহা ব্যতীত, বিক্রমপুর-ধানাড়া রুটের মোটরবাসে আসিয়া সদরঘাট কংসাবতী নদী হইতে খেয়া পার হইয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের মনসাপূজাটি একত্রিশ পুতুল পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি বর্তমানে সর্বজনীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মন্দিরটির গাত্রে বৌদ্ধযুগীয় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ভগ্নাদশাগ্রস্থ উক্ত মন্দিরটির বর্তমানে সংস্কার কার্য সাধিত হইয়াছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম : ধানাড়া, পো: পেঁচকলা,
বাঁকুড়া।

১০। গ্রাম : হর্যাকী (মৌজা : বিক্রমপুর)। ২৮৩।৩৭৮·০৯।৯৬।৮১৮

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, ভূঁইয়া, তাম্বুলী, কামার, কুমার, ধীবর, বাউরী, লোহার, রাজপুত ও নাপিত।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও ব্যবসা।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে জেলা-বোর্ডের কাঁচা রাস্তায় একটি মাত্র মোটরবাস দিনে দুইবার সকাল-সন্ধ্যায় যাতায়াত করে। ঐ বাসেই গ্রামে যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র-বৈশাখ মাসে বৈদ্যনাথ নামে খ্যাত শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে কংসাবতী নদীর তীরে বৈদ্যনাথ

শিবলিঙ্গটি আবিষ্কৃত হয়। শিবপূজার প্রচলন সম্পর্কে গাভী কর্তৃক অন্যের অলক্ষ্যে শিবের মস্তকে দুগ্ধদান ইত্যাদি বহুল প্রচলিত কিংবদন্তী শোনা যায়। তদবধি বৈদ্যনাথ শিবের নিত্যপূজাদি হইতেছে। গাজন উৎসবটি অবশ্য পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। ইহা ব্যতীত, গ্রামে নবরাত্রি-ব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব হয়। এই উৎসবটি বজরংদাস নামে জনৈক সাধু প্রচলন করেন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি গত প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বৈদ্যনাথ শিবের নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত একটি করিয়া শীতলা, মনসা এবং চণ্ডী আছে।

শ্রীরাসবিহারী কর, শিক্ষক,
পেঁচাকলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পেঁচাকলা, বাঁকুড়া।

১১। গ্রাম : পেঁচাকলা। ২৯৮।৩৫১·১৪।১৩২।৬৯১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, সদ্গোপ, তাঁতি, নাপিত, তাম্বুলী, মাঝি ও বাউরী। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, সদ্গোপ-পাড়া, তাঁতিপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, তাম্বুলীপাড়া, নাপিতপাড়া, মাঝিপাড়া, বাউরীপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে সারেঙ্গা-বিক্রমপুর রুটের মোটরবাসে বিক্রমপুর পৌছাইয়া গ্রামে হাঁটিয়া যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দোলযাত্রা উৎসবটি প্রায় ষাট বৎসরের এবং অপর দুইটি উৎসব প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে দুইদিনের জন্য। মেলাটি গত প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবত বসিতেছে।

সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে চারিদিন ব্যাপী।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে দামোদরজীউ শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীরাসবিহারী কর, শিক্ষক,
পেঁচাকলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পেঁচাকলা, বাঁকুড়া।

১২। গ্রাম : ফুলকুসমা। ৩১৩।৪৯৭·২৬।৩৮৩।২,০৭৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, কামার, ছুতার, বাউরী, তিলি, ক্ষত্রিয়, হাড়ী, মাঝি, গন্ধবনিক, তাম্বুলী, শুঁড়ি, ডোম, মুচি, রাজোয়ার, সদ্গোপ, সর্দার, মাল, গোয়ালা, রজক ও নাপিত। গ্রামটিতে সাহুপাড়া, কামার-পাড়া, ছুতারপাড়া, বাউরীপাড়া, মাঝিপাড়া, বাবুপাড়া, হাড়ীপাড়া, শুঁড়িপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গিধ্নি হইতে গিধ্নি-শিলদা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ মাসে এখান উৎসব উপলক্ষে গ্রাম্যদেবতার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পৌষসংক্রান্তির দিন হইতে সাধারণতঃ উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। পূজার দিন সকাল হইতে বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে পূজা-সম্পন্নের পর মানতকারীগণ 'আগুন সন্ন্যাসব্রত' পালন আরম্ভ হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) এখান উৎসবের মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বন-জঙ্গল ঘেরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে 'কালামহাধন' নামে এক গ্রাম্যদেবতা আছে। মূর্তিটির গঠনভঙ্গী একটু অদ্ভুত। শিলা নির্মিত এই মূর্তিটির মুখাবয়ব মনুষ্যাকৃতি হইলেও দেহভঙ্গী ব্যাঘ্রের ন্যায়। ইঁহার চক্ষু দুইটি ধাতু নির্মিত। ইহা ছাড়া, গ্রামে বুড়াশিব ও বাবাঠাকুর আছে।

শ্রীপশুপতি সাহু, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ ফুলকুসমা, বাঁকুড়া।

১৩। গ্রাম : শালবনি। ৩৪২।২৪০·৭৮।৬৫।৩২৭

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, মাঝি, কলু ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে মাঝিপাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে গড়গড্যা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। ইহা ব্যতীত, নৌকা করিয়াও গ্রামে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা উৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে ভৈরবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের একটি বৃক্ষেরতলায় প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মাটির হাতী, ঘোড়াকে ভৈরব জ্ঞানে পূজা করা হয়। ভৈরবপূজাটি প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

(ঙ) ভৈরবপূজার মেলা। মাঘ মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীমদন মোহন মণ্ডল, শিক্ষক,
পো: পেঁচাকলা, বাঁকুড়া।

১৪। গ্রাম : গড়গড্যা। ৩৪৯।৪২২·৬৩।৯১।৯২৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, খয়রা, লোহার, মাঝি ও দণ্ডমাঝি। গ্রামে বসুপাড়া, মাঝিপাড়া, ফৌজদারপাড়া, ঘোষপাড়া প্রভৃতি নামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে বাঁকুড়া-ব্রাহ্মণডিহা ভায়া গড়গড্যা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সম্প্রতিকালের।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে আট-দিনব্যাপী।

কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে তিন-দিনব্যাপী।

সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে তিন-দিনব্যাপী। মেলাগুলি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, শীতলা ও ভৈরব আছে। ইহা ব্যতীত, ব্যক্তি বিশেষের গৃহে ধাতুময় রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীপ্রভাস রঞ্জন গোস্বামী, প্রধান শিক্ষক,
গড়গড্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঁকুড়া।

১৫। গ্রাম : বাইশপাতড়া। ৩৬৭।১৩০·৫৬।৬৮।৩৫৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, নাপিত ও জেলে। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া ও জেলেপাড়া নামে পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন চন্দ্রকোণা রোড হইতে গড়গড্যা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা এবং রামনবমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রামনবমীর মেলা। চৈত্র মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় আশী-পঁচাশী বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের গৃহে একটি পিতলের রামচন্দ্র মূর্তি ব্যতীত খড়ের ছাউনীযুক্ত সাধারণের একটি মন্দিরে মনসা, পাহাড়ীসিনী, গৌরনিতাই, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক,
বাইশপাতড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পো: গড়গড্যা, বাঁকুড়া।

Raipur—A village in the extreme south of the Bankura subdivision, situated close to the southern bank of the Kasai River, 36 miles south of Bankura. It contains a sub-registry office, police thana and charitable dispensary. It was for many generations the headquarters of an influential family of zemindars. Tradition relates that the founder of the family was a Chauhan Rajput, who came from Rajputana during the reign of Mughal emperors, subdued the surrounding

country, and assumed the title of Sikhar Raja. The family founded by him continued in this part of the district and forms the subject of several traditions. The last Raja of the family, having lost his principal general, Miran Shaha, in a battle with the Marathas, committed suicide by jumping, with his wife and children, into a tank called Sikharsayar. This is a large deep tank to the south of on old fortification called Sikhargarh which is said to have contained the residence of Sikhar Raja: ruins of buildings and temples are still to be found within it. On the western bank of the tank lies the tomb of Miran Shaha; he is regarded as a saint, and vows are still offered at his tomb. It is said that, after the death of the last Sikhar Raja, his *purohit* or spiritual guide succeeded him and lived at the village of Gurapara near Raipur, but eventually the estate passed to Fateh Singh, a younger brother of Raja Krishna Singh of Bishnupur, who had been driven away from Bishnupur, and taken shelter with the Raja of Barabhum. He overcame the last Raja of the family of the Sikhar Raja's *purohit*, settled at Raipur, and was granted a *sanad* by the Nawab of Murshidabad, when he passed through this part of the country on his way to Orissa.

Near Raipur there is a tank, called Sankharia, on the bank of which is a shrine of the goddess Mahamaya. A legend is told about the tank similar to that already mentioned in the article on Chhatna. The goddess, it is said, assumed the form of a girl and obtained a pair of bracelets from a *sankhari* or seller of conch shell ornaments. Next day a Brahman saw the miraculous vision of a pair of hands, with these bracelets on the wrists, uplifted above the water of the tank. That might he dreamt that the goddess appeared to him and told him to go early in the morning to the tank, where he would find a piece of stone, on which her image would appear. The Brahman did so, and having found the stone, installed it on the bank of the tank as the representation of the goddess Mahamaya. The Raja of Raipur then built a shrine for her, and made grants of rent free lands for the maintenance of her worship.

The celebrated painter, Jamini Roy, has a plausible theory of history of Rajput chieftains in the district. It is that in the middle ages Rajputs used to frequent this route to visit Puri. It was nothing unusual to take ill on the way. The main party would wait for a couple of days and if during this period the patient did not get well enough to resume his journey, he was left behind. In nine cases out of ten probably the patient left alone died, but the tenth man, when he recovered, true to his Rajput blood, would get together a following and carve a kingdom for himself.

(District Census Handbook, 1961, Bankura by B Ray, p. 151—152)

[বাঁকুড়া জেলার মটগোদা গ্রামে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

মটগোদা

মটগোদা গ্রামটি জেলা শহর বাঁকুড়া হইতে প্রায় ৪২ মাইল এবং রাইপুর থানার প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বাঁকুড়া শহর হইতে সরাসরি মোটরবাসে অথবা মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা বা চন্দ্রকোণা রোড রেলস্টেশন হইতেও মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করিতে পারা যায়। বাঁকুড়া শহর হইতে মটগোদা যাতায়াতের রাস্তাটি পিচ্ ঢালা পাকা রাস্তা। ইহা ভিন্ন, গ্রাম হইতে কয়েক মাইলের মধ্যেই কাঁসাই ও শিলাই নদী প্রবাহিত।

মটগোদা গ্রামটি প্রাচীন। তবে বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলা চলে না। সাধারণ নিম্ন ও মধ্যবিত্তর লোকজন গ্রামে বসবাস করেন। ১৯৬১ সনের জনগণনা অনুসারে গ্রামটির আয়তন ৮১৭·২৮ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ২,২৫৫। জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, বহুকাল পূর্বে এই গ্রামে গদাধর নামে জনৈক সাধক এই স্থানে একটি মঠ স্থাপন করিয়া সাধন-ভজন করিতেন। যদিও উক্ত মঠ বা বিগ্রহাদির কোন চিহ্নমাত্র আজ এই গ্রামের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি লোকে বলে মঠ গদাধর —মঠগদা এইরূপে অপভ্রংশ হইয়া গ্রামের নাম মটগোদা হইয়াছে। গ্রামে 'দেয়াতলা' নামে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। অনেকে অনুমান করেন 'দেবতাতলা' অপভ্রংশে 'দেয়াতলা' হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ এই স্থানেই কোনকালে সাধক গদাধরের উক্ত মঠটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অথবা কালের প্রভাবে জীর্ণ হইয়া উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। সে কত কাল আগের কথা? পাঁচ-ছয় শত বৎসর পূর্বে কি? গ্রামে মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস আছে। ইঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কর্মকার ও স্বর্ণকারদের সংখ্যাই অধিক। উৎকলবাসী অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পরিবারও এই স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন।

গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য। মটগোদা গ্রামের কর্মকারেরা কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেন এবং কয়েকটি পরিবারের লোকজনেরা পাথরের থালা-বাটি-গেলাস তৈয়ারী করেন। প্রধানতঃ ঝন্টিপাহাড়ী ও রানিবাঁধ থানার ভগড়া হইতে তাঁহারা প্রয়োজনীয় পাথর সংগ্রহ করিয়া থাকেন। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি ডাকঘর আছে। মাসের প্রতি শনিবার হাট বসে।

গ্রামের পশ্চিম দিকে বিস্তীর্ণ বনভূমি পশ্চিমবঙ্গের সীমানা অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যা প্রদেশের ময়ূরভঞ্জে গিয়া মিলিয়াছে। ইহা পশ্চিমবঙ্গ বন বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত এবং এই বনভূমি শাল, পিয়াশাল (মুর্গা), অর্জুন, ক্যাণ (আবলুস), গামার, চকোলদা, সতসার, চল্লা, রহোড়, পড়াসী, খ-কাঠ (গাড়ী নির্মাণের জন্য ব্যবহার হয়), লোহাজাংলা, আসন, খয়ের, লোধ (মাজন ও সাধু-সন্ন্যাসীদের বস্কলের জন্য ব্যবহৃত হয়) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান বৃক্ষাদিতে সমাকীর্ণ। এই গভীর অরণ্যে চিতা বাঘ, ভাল্লুক, হায়না, হাতী, খরগোস, কুই (বুনো কুকুর বিশেষ), হরিণ, চন্দনা, ময়ূর প্রভৃতি পশু-পক্ষীর অবাধ বিচরণ স্থান ছিল। এই অরণ্যের কাঠ ও অরণ্যাশ্রয়ী পশু-পক্ষীর প্রচুর বেচাকেনা হইত। কয়েক বৎসর পূর্বেও লক্ষাধিক টাকার কাঠ বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়। বর্তমানে বন-জঙ্গল উচ্ছেদ করিয়া চাষোপযোগী জমি প্রস্তুত করা হইতেছে; ফলে, বন জঙ্গলের সহিত উল্লিখিত পশু-পক্ষীও ক্রমেই অদৃশ্য হইয়াছে।

মঠগোদা গ্রামের অন্যতম প্রধান উৎসব ধর্মরাজ ঠাকুরের বাৎসরিক পূজা। গ্রামের মধ্যস্থলে চারিদিকে বারান্দাযুক্ত সমতল ছাদ বিশিষ্ট ইষ্টক নির্মিত একটি মন্দিরে স্বরূপরায় নামে খ্যাত ধর্মরাজ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং দক্ষিণ ব্যতীত ইহার পশ্চিমদিকেও একটি প্রবেশ দ্বার আছে। মন্দিরে কোন জানালাদি না থাকায় ইহার অভ্যন্তর ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। মন্দিরের সহিত সংযুক্ত একটি নাট্ মন্দির আছে।

এই গ্রামে স্বরূপরায় ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজার প্রচলন সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি আছে। সেই জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে নিকটবর্তী শ্যামসুন্দরপুর গ্রামে তুঙ্গবংশীয় রাজাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন। শোনা যায়, তুঙ্গবংশীয় রাজাদের আদি নিবাস ছিল গণ্ডকী নদীর তীরে। একদা ইঁহাদের জনৈক আদি পুরুষ শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তম দর্শনে আসিলে জগন্নাথদেবের অনুকম্পায় পুরীর রাজা হন। এই বংশের গঙ্গাধরের পুত্র নকুরতুঙ্গ প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে জগন্নাথদেবের নির্দেশে বাঁকুড়া জেলার বর্তমান রাইপুর থানার অন্তর্গত ভাঙ্গর সাহি গ্রামে জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং পরে নিকটবর্তী টিকারপুর গ্রামে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। বর্তমানে ঐ স্থান বেল টিকরী নামে পরিচিত। নকুরতুঙ্গ এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন বলিয়া বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ অঞ্চল তুঙ্গভূম নামে খ্যাত হয়। নকুরতুঙ্গের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণ দেওর আমলে পারিবারিক বিবাদ-বিসংবাদে ইঁহাদের রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ফলে, লক্ষ্মীনারায়ণ শ্যামসুন্দর পুরে এবং তাঁহার ভ্রাতা মুকুন্দ নারায়ণ ফুলকুসমা রাজধানী

স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে, অনাদায়ী খাজনার দায়ে ঐ ভূসম্পত্তি কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের নিকট হস্তান্তরিত হইয়া যায় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দ্বারভাঙ্গা মহারাজা উক্ত জমিদারী ক্রয় করেন।

প্রায় ২২৫ বৎসর পূর্বে শ্যামসুন্দরপুরে রাজা সুন্দরনারায়ণ দেও স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বর্তমান মন্দিরে উত্তর দিকে ভগবানবাঁধ পুষ্করিণী হইতে স্বরূপনারায়ণ ধর্মরাজ শিলা ও একটি তাম্রপাত্রে খোদিত পূজা-পদ্ধতি উদ্ধার করিয়া ধর্মরাজের পূজার প্রচলন করেন। ধর্মরাজের স্বপ্নাদেশ অনুসারেই লালগড়ের ধীবর পরিবারে শ্রীনাথ পণ্ডিত ধর্মরাজের প্রথম পূজারী নিযুক্ত হন। ধর্মরাজের নিত্য-পূজাদি জন্য শ্যামসুন্দরপুরের রাজারা কিছু ভূ-সম্পত্তি দান করেন। তদবধি ধর্মরাজ ঠাকুরের নিত্যপূজাদি চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব উল্লিখিত ধর্মরাজ মন্দিরটি প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্বে নির্মিত। মূল মন্দিরের সহিত সংযুক্ত নাটমন্দিরটি ঝাড়গ্রামের রাজারা নির্মাণ করাইয়া দেন এবং পরে স্থানীয় মুক্তিবাবু উহার সংস্কার করান।

মন্দিরাভ্যন্তরে পাশাপাশি দুইটি মঞ্চের মধ্যে স্বরূপ-নারায়ণ ধর্মরাজ শিলা সহ বাঁকুড়ারায়, ক্ষুদিরায় ও বেচারায় নামে ধর্মরাজ শিলা প্রতিষ্ঠিত আছেন। উল্লিখিত ধর্মরাজ মূর্তিগুলি কচ্ছপাকৃতি। স্বরূপনারায়ণের তুলনায় অন্যান্য মূর্তিগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি। ইহা ভিন্ন,মন্দিরে স্বরূপনারায়ণের দক্ষিণদিকে প্রায় আড়াই ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট প্রস্তর নির্মিত সর্বমঙ্গলা দেবীর দণ্ডায়মান মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবী ত্রিনয়নী এবং বস্ত্র পরিহিতা। ঘোমটার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র দেবীর মুখমণ্ডলটুকু সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার নিকটে প্রায় ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্য প্রস্তরে খোদিত ত্রিনয়নী চতুর্ভুজা এক দেবী মূর্তি আছেন—ইনি ষড়চক্রবাসিনী দেবী নামে খ্যাত। স্বরূপনারায়ণের আসনের বামপার্শ্বে সর্বমঙ্গলা দেবী মূর্তির অনুরূপ প্রায় আড়াই ফুট উচ্চ প্রস্তর নির্মিত একটি দেবী মূর্তিকে কালীর ধ্যানে পূজাকরা হয়। তাহা ছাড়া, মন্দিরে কয়েকটি মাটির হাতী-ঘোড়া আছে। ইহারা দেবীর ভৈরবরূপে পূজিত। মন্দিরাভ্যন্তরে কেবলমাত্র দুইটি ঘৃতপ্রদীপ ব্যতীত অন্য কোনরূপ বাতির ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকায় ইহার অভ্যন্তর ভাগ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মটগোদার ধর্মরাজ বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শেষ শনিবার সাড়ম্বরে ধর্মরাজঠাকুরের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং সীমান্তবর্তী বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা হইতে বহু ভক্ত নর-নারী ধর্মরাজের নিকট মানসিক পূজাদি দিতে আসেন। মানতস্বরূপ অর্থ বস্ত্র-অলঙ্কার, সোনা-রূপার চক্ষু ও খড়ম এবং ষোড়শোপচারে পূজা দেওয়া হয়। ধর্মরাজের উদ্দেশে কোনরূপ পশু পক্ষী বলি দেওয়া নিষিদ্ধ। তবে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত সর্বমঙ্গলা বা কালীর উদ্দেশে পাঁঠা বলি দেওয়ার কোন বাঁধা নাই। উৎসবের দিন ধর্মরাজের মন্দিরে যথারীতি পূজা ও হোম-যজ্ঞ হইয়া থাকে। বর্তমান পূজারী শ্রীরাসবিহারী পণ্ডিত অশীতিপর বৃদ্ধ। ইনি আদি পূজারী শ্রীনাথ পণ্ডিতের প্রপৌত্র।

ধর্মরাজের উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শেষ শনিবার হইতে সপ্তাহব্যাপী সাধারণের প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমি জুড়িয়া একটি বৃহৎ মেলা বসে। ইহা বাঁকুড়া জেলার একটি উল্লেখযোগ্য মেলা এবং দক্ষিণ বাঁকুড়ার সর্ব বৃহৎ মেলা বলিয়া দাবী করা হয়। শনিবার এই মেলা বসে বলিয়া এই অঞ্চলে ইহা শনিমেলা নামে পরিচিত।

মেলায় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা হইতে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার নরনারী প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই মেলায় প্রতি বৎসর বহু সাঁওতাল নরনারী আসিয়া থাকেন। পূর্বে মেলায় সাঁওতালী নৃত্য একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল। কয়েক বৎসর হইল তাঁহারা এইরূপ নৃত্য-গীত বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। মেলায় প্রায় চারিশত দোকানপাট বসে। উহার মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও হোটেল জাতীয় খাবার দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ছাড়া, কৃষি ও কারীগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, মনিহারী দ্রব্যাদি, কাঁসা, এ্যালুমিনিয়াম ও লোহার তৈজসপত্র, পাথরে শিল-নোড়া ও বাসনপত্র,

মাটির কলসী, পুতুল ও প্লাষ্টিকের খেলনা, শঙ্খ, শাঁখা, শাঁখের আংটি, তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদ, জুতা, ট্রাঙ্ক-বাক্স, মাছ ধরা জাল, শাকশব্জী, পোনামাছ ও শুঁটকী মাছ, বেনে ও মুদি দোকান, বই-ছবি, বাঁশের বাঁশি ও বাঁশের তৈয়ারী শিল্প সামগ্রী, চুড়ি, তুলসীর মালা, বৃন্দাবনী শাড়ী, স্থানীয় তৈয়ারী শনের দড়ি ইত্যাদির দোকানপাট বসে। পূর্বে এই মেলায় অনেক টাকা পশু-পক্ষী ক্রয় বিক্রয় হইত। বর্তমানে কেবল মাত্র টিয়া পাখী বিক্রয় হইতে দেখা যায়। মেলায় কয়েকটি ফটো তোলার দোকান উল্কি আঁকার দোকান বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা আসে ও সাঁওতালী যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই বৎসর (১৯৭০) হুগলী জেলার রাধানগর ও মেদিনীপুর হইতে সাঁওতালী যাত্রার দল আসিয়া ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই বৎসর লোকজন ও দোকানপাটের সংখ্যা অনেক কম।

মেলা বিবরণী

আদিবাসী উৎসব উপলক্ষে মেলা
(বাঁধনা পরব)

জগন্নাথপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উৎসবের পরের দিন আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাঁধনা পরব উপলক্ষে গ্রামের উত্তর প্রান্তে উন্মুক্ত মাঠে প্রায় আট বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

সাতপাট্টা, মণ্ডলকুলী, ছেমুশণ্যা, লালবাঁধ, চাকা-মুড়ালী, গড়গড়্যা, আমবাড়ী, উজামল্লা প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের সহস্রাধিক নরনারী সাইকেল ও গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, ধামা-কুলা, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য গরু ও মহিষের লড়াই, লাঠি-খেলা ও জুয়া খেলা হয়।

এথান উৎসবের মেলা

ফুলকুসমা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এথান উৎসব উপলক্ষে গ্রাম্য দেবতার নির্দিষ্ট স্থান সংলগ্ন প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত মটগোদা, শ্যামসুন্দরপুর, বারিকুল, মেলেড়া, মণ্ডলকুলি এবং মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শিলদা, ভেলাইডিহা, খামার প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় সহস্র নরনারী মোটর-গাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, মাটিরবাসন ও খেলনা, বই-ছবি, তাঁত ও মিলের কাপড়চোপড়, লোহার কোদাল-গাঁইতি-হাতা ইত্যাদির দোকানপত্র ব্যতীত ফুলকুসমা ও পাথরা গ্রামের বাঁশের ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ শ্যাম-সুন্দরপুর, মণ্ডলকুলি এবং স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দা। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নানাপ্রকার কীর্তনগান ও কবিগানের আসর বসে। গ্রামেই কীর্তনগানের দল আছে; অধিকারী—শ্রীচণ্ডী চরণ দাস। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় এক সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়। ইহা ব্যতীত, প্রতিযোগিতামূলক লাঠি খেলা ও ভেড়ার লড়াই হয় এবং অনেকে লটারী খেলেন।

চড়ক-গাজন ও নীলপূজার মেলা

হর‍্যাকী গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গাজন উৎসব উপলক্ষে কংসাবতী নদীর তীরবর্তী বৈদ্যনাথ শিবের স্থান সংলগ্ন জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা

বসে। মেলাটি গত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বিক্রমপুর, সারেঙ্গা, ধানাড়া, গড়গড্যা প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসন-কোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, দা-কোদাল, ধামা-কুলা, মাটির হাঁড়ি-খেলনা প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় কুড়িটি দোকানপাট বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়; তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

রসপাল গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র-বৈশাখ মাসে চড়ক ও গাজন উৎসব উপলক্ষে সপ্তাহে প্রতি সোমবার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে প্রতিদিন অপরাহ্নের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-সাত শত নরনারী সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসন-কোসন, নানাপ্রকার ফুল-ফল, শাকসব্জী, মাছ-মাংস, হাঁড়ি কলসী, ধামা-কুলা, ধান-চাউল, আলু প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাচনী নাচ, ভগতা, রঁজা ফোড়া প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

সারেঙ্গা গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে উমাকান্ত নামে খ্যাত শিবের আবাল গাজন উপলক্ষে প্রায় নয় বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী বিক্রমপুর, রাইপুর, গোয়ালবাড়ী প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়-চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ আশপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং রামায়ণগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানগুলিতে প্রায় সহস্রাধিক দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

রসপাল গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে চণ্ডীমণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় দশ-বার বিঘা জমির উপর পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

নিকটবর্তী ফুলকুসমা, শ্যামসুন্দরপুর, নেপাড়া, মটগোদা, মণ্ডলকুলি, বারিফুল প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় বারশত নরনারী গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী নানাপ্রকার জিনিসপত্র, মাটির খেলনা প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা সকলেই প্রায় স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাচনী নাচ, কাঠি নাচ, যাত্রাগান প্রভৃতি অনুষ্ঠান ব্যতীত জুয়া খেলাও হয়। রসপালের রাজপরিবারের নিজস্ব যাত্রাদল ও নাচনী নাচের দল আছে।

ভৈরবপূজার মেলা

শালবনি গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ভৈরবপূজা উপলক্ষে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন ধানাড়া, গড়গড্যা, বিক্রম-পুর, ঢেকো প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, ধামা-কুলা, বই-ছবি ইত্যাদির প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য অনেকে জুয়া বা লটারী খেলিয়া থাকেন।

মনসাপূজার মেলা

পেঁচাকলা গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে গ্রামে মনসাতলার সম্মুখস্থ রাস্তার উভয়পার্শ্বে প্রায় দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-সাতশত নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের মাত্র পনের-ষোলটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। অনেকে জুয়া ও লটারী খেলিয়া থাকেন। যাত্রাভিনয় দেখিতে প্রায় তিন-চারি সহস্র দর্শকের সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ [পেঁচাকলা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজার মেলা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রার মেলা উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।]

ধানাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন জমিতে সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

রাইপুর থানার অন্তর্গত অধিকাংশ গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের বহু নরনারী গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ সারেঙ্গা, মাজুরিয়া, বিক্রমপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। অধিকারী শ্রীরঘুনাথ মণ্ডল, গ্রাম ঃ ধানাড়া, পোঃ পেঁচাকলা, বাঁকুড়া।

রথযাত্রার মেলা

গড়গড়্যা গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত ধানাড়া, বিক্রমপুর, সারেঙ্গা প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দেড় সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, দা-কোদাল, ধামা-কুলা, মাটির হাঁড়িকুড়ি-খেলনা ইত্যাদির কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ সারেঙ্গা, বিক্রমপুর, ধানাড়া প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য বালকসংগীত, কীর্তন, থিয়েটার, যাত্রাগান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় এক সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ গড়গড়্যা গ্রামে অনুষ্ঠিত কালীপূজার মেলা এবং সরস্বতীপূজার মেলা উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

রামনবমীর মেলা

বাইশপাতড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রামনবমী উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আশি-পঁচাশি বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী মাজুরিয়া, ব্রাহ্মণডিহা, সীতারামপুর, গড়গড়্যা, ধানাড়া, বিক্রমপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা, মাটির খেলনা-পুতুল ইত্যাদির দোকানপাট বসে। মেলার বিক্রেতারা প্রধানতঃ বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদর জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে। ইহা ব্যতীত, প্রতিযোগিতামূলক লাঠি খেলা, জুয়া ও লটারী খেলা এবং যাত্রাভিনয় হয়। আমোদ-

প্রমোদের অনুষ্ঠানে প্রায় দেড় সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

সরস্বতীপূজার মেলা

সোনাগাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির উপর চারিদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় অঞ্চল ব্যতীত ছন্দার, শ্যামসুন্দরপুর, রাইপুর, কানালী প্রভৃতি ইউনিয়নগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়াই মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, হাঁড়ি-কুড়ি, ধামা-কুলা, মাটির পুতুল প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় দশ-বারটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় অঞ্চলের লোকজন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নানাপ্রকার ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ-ছয়শত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।



থানা ঃ সিমলাপাল

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ পুখুরিয়া। ১০।৫৭৯'৫৯।১৫৩।৬৫৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বাউরী, লোহার, নাপিত, সদ্গোপ, তাম্বুলী ও কর্মকার। গ্রামটিতে উপরপাড়া, নামপাড়া, বাউরীপাড়া, লোহারপাড়া, নাপিতপাড়া প্রভৃতি নামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও বাসনশিল্প।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব, পৌষ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রায় যাট বৎসরের প্রাচীন। ইহা ব্যতীত, 'মড়গড়ের থান' নামে পরিচিত একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তি তিথিতে এই অঞ্চলে আদিবাসী সম্প্রদায় একটি উৎসব পালন করিয়া থাকেন। উৎসবের দিন দূর দূরান্ত হইতে আদি সম্প্রদায়ভুক্ত বহু নরনারী এই স্থানে মানত পূজাদি দিতে আসেন। মানত হিসাবে প্রধানতঃ শূকর বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। পৌষ মাসে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় যাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি মন্দিরে দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে এবং 'মড়গড়ের থান' নামক একটি নির্দিষ্ট থান আছে।

শ্রীমৃগাঙ্ক শেখর সিংহ মহাপাত্র, শিক্ষক,
পুখুরিয়া বাঈদ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঁকুড়া।

২। গ্রাম ঃ কুকড়াখোঁদর। ১৮।৩২১'০৬।৯৬।৪৯৯

(ক) গন্ধবনিক, মাহাতো, সর্দার, লোহার, তাঁতি ও সাঁওতাল। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে গড়বেতা-সিমলাপাল রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে শ্রীধরজীউপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং এই উৎসব উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে ময়রা, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকানপাট বসে এবং রাত্রিকালে যাত্রাভিনয় হয়।

(চ) গ্রামে ব্রহ্মচারীঠাকুরের একটি স্থান আছে।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ মল্লিক, শিক্ষক,
কুকড়াখোঁদর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম ঃ পার্শলা।২৮।৪৯৯'৮৬।২২১।১,১৪৮

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কামার, কুমার, গন্ধবনিক, তাঁতি, সদ্গোপ, নাপিত, কলু, শুড়ি, খয়রা, লোহার, বাউরী, ধোপা, ডোম ও ভূমিজ। গ্রামটিতে বামনপাড়া, শুঁড়িপাড়া, খয়রাপাড়া, নাপিতপাড়া, সদ্গোপপাড়া, ধোপাপাড়া, ডোমপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড় হইতে খাতড়া-জড়িয়া ভায়া লক্ষ্মীসাগর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে শিমূলসিনীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা গ্রামের দুই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়; একটি মৃত্তিকা-প্রতিমা এবং অপরটি পট-প্রতিমা।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারিদিনব্যাপী।
শিমূলসিনীপূজার মেলা। মাঘ মাসে। মেলা দুইটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে প্রস্তর নির্মিত একটি চণ্ডীমণ্ডপ আছে।

শ্রীকেনারাম কর্মকার, প্রধান শিক্ষক,
পার্শলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পো ঃ লক্ষ্মীসাগর, বাঁকুড়া।

৪। গ্রাম : বনকাটা। ৩১।২৮৩৫০।১০০।৫৫৩

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গোয়ালা, কলু, লোহার, খয়রা, বাউরী ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে বামনপাড়া, লোহারপাড়া, ষষ্ঠীপাড়া, বাউরীপাড়া, ভদ্‌ভদিডাঙ্গা প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও চাকুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে খাতড়া-বাঁকুড়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা এবং মাঘ মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি ব্যক্তি-বিশেষের হইলেও সর্বসাধারণ ইহাতে যোগদান করিতে পারেন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিনের জন্য। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। ইহাতে প্রায় চারি-পাঁচশত নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন এবং ময়রা ও মনিহারীর দশটি-পনরটি দোকান বসে।

(চ) গ্রামে খড়ের ছাউনীযুক্ত দুইটি দেবালয়ে কালী ও মনসা আছে।

শ্রীধনঞ্জয় সিংহ মহাপাত্র, শিক্ষক,
বনকাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ লক্ষ্মীসাগর, বাঁকুড়া।

৫। গ্রাম : মাচাতোড়া। ১১১।২৮২৪৬।৫৮।২৯৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কুমার, মাঝি ও শুঁড়ি। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, কুমারপাড়া, মাঝিপাড়া ও রবিপাড়া নামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও তাঁতশিল্প।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে লক্ষ্মীসাগর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন ও বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং একটি রাধা-দামোদরজীউ মন্দির আছে।

শ্রীরামগোপাল সিংহরায়, শিক্ষক,
গ্রাম : মাচাতোড়া,
পোঃ লক্ষ্মীসাগর, বাঁকুড়া।

৬। গ্রাম : সুশুনিয়া। ১১৪।৪৮১৩৩।১৫।৮২

(ক) গোপ ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে একটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে সিমলাপাল রুটের মোটর বাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা আঞ্চলিক সর্বজনীন উৎসব এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে চারিদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বেহুলা-লখিন্দরের স্থান আছে।

শ্রীঅনুকূল বিশুই, শিক্ষক,
গ্রাম : সুশুনিয়া,
পোঃ লক্ষ্মীসাগর, বাঁকুড়া।

৭। গ্রাম : জামিরডিহা। ১৩৫।৭৫৮৩২।৪৫।২২৯

(ক) সাঁওতাল। গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে সিমলাপাল রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ আদিবাসী সম্প্রদায়ের 'নাগরদোলা' নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নাগরদোলা উৎসব উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে মাটির হাতি-ঘোড়া (ছলন মূর্তি) স্থাপন করিয়া চাঁদ-মালা, ধূপ, তেল, সিন্দুর, মেথী, কস্তুরী, আমলা, হলুদ, নূতন কাপড়-গামছা এবং চিড়া, দুধ, ঘি, গুড়, দধি প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা পূজা সম্পন্ন হয়। উৎসবটি গ্রাম

তিনশত বৎসরের প্রাচীন। ইহা এখান পূজা নামেও পরিচিত।

(ঙ) নাগরদোলার মেলা। মাঘ মাসে একদিনের জন্য। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি চাল্‌তা এবং মহুল গাছের নীচে বিভিন্ন দেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দে, শিক্ষক,
গ্রাম: জামিরডিহা, বাঁকুড়া।

৮। গ্রাম: দুবরাজপুর।

১৬৮।১,৯৮১২৮।২৩২।১,৩০১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, গন্ধবণিক, শুঁড়ি, কামার, কুমার, ডোম, মাল, মাঝি, করেঙ্গা, ধোপা, কলু ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, গন্ধবণিক-পাড়া, কুমারপাড়া, শুঁড়িপাড়া, ডোমপাড়া, মালপাড়া, করেঙ্গাপাড়া, মাঝিপাড়া, ধোপাপাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে এগারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে গড়বেতা-সিমলাপাল রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং মাসে মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে ছয়দিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি শিবমন্দির ব্যতীত মাটির দেওয়াল ও করগেটের ছাউনীবিশিষ্ট একটি চণ্ডীমণ্ডপ আছে।

শ্রীগৌর চন্দ্র কুম্ভকার, শিক্ষক,
দুবরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঁকুড়া।

৯। গ্রাম: চাঁদপুর। ১৭২।৩৩৬১২।৯২।৫৭৬

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, শুঁড়ি, কলু, বেনে, তাম্বুলী, কামার, বাউরী, মাল ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে সাঁওতাল-পাড়া, গোয়ালপাড়া, শুঁড়িপাড়া, বেনেপাড়া, কলুপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, কামারপাড়া, বাউরীপাড়া, মালপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে গড়বেতা সিমলাপাল রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে একদিনের জন্য। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দেব-দেবীর একটি সাধারণ মন্দির ব্যতীত একটি শীতলা, তিনটি মনসা, একটি ধর্মরাজ এবং অজ্ঞাত নামা একটি গ্রাম্যদেবতা আছে।

শ্রীচণ্ডী চরণ সাহা, শিক্ষক,
চাঁদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দুবরাজপুর,
বাঁকুড়া।

Simlapal—A village in the Bankura subdivision, situated 24 miles south of Bankura. It is the headquarters of an old family of zemindars who trace back their descent to one Sripati Mahapatra. According to the account given in the article on Tungbhum (compiled from information furnished by former zemindars of Syamsundarpur and Phulkusma), Sripati Mahapatra was the spiritual guide and general of Nakur Tung and was given a grant of *pargana* Simlapal when the latter conquered Tungbhum. But the Simlapal family state that Sripati Mahapatra came from Bir-Ramchandrapur in Cuttack to Simlapal, while on a pilgrimage, and conquered the surrounding country, now known as *parganas* Simlapal and Bhalaidiha. At first, the whole zemindari was called *pargana* Simlapal, but after the death of the seventh Raja, Chiranjib Sing Chaudhuri, it was divided, as in the case of the zemindaris of Supur and

Ambikanagar, Syamsundarpur and Phulkusma, between two brothers, Lakshman Singh Chaudhuri and Laskar Singh Chaudhuri. The elder brother got a 10-annas share, now called *pargana* Simlapal, and the younger brother a 6-annas share, now called *pargana* Bhalaidiha. The heads of both families, who are Utkal Brahmans by caste, are generally called Rajas and bear the appellation of Singh Chaudhuri; other members of the family are called Mahapatras. (p. 153)

Stone temple of Balaram in low-towered *atchala* style, built by the Raja of Simlapal in 1584 *sakabda* (c. 1662 A. D.). The temple has been renovated to a certain extent and garishly coloured; and additional verandah on Italianate pillars has been built on to the facade. A number of images in dark grey stone have been incorporated in the walls of the inner porch : Rama and Sita enthroned, Krishna between gopis, and vaisnava dwarapals in typical late mediaeval style (as of teracottas), also a large Parsvanath, a smaller Tirthankar, an two Ambikas; two more Jaina images have been built high into the east exterior wall. Wooden painted Balaram and Krishna under daily worship, together with 17 salagram silas, 8 Gopals, Rama, Lakshman and Hanuman, a tiny Radha-Krishna, Subhadra, Ganesa, and a tiny white linga. (p. 161)

(Districtt Census Handbook, Bankura, 1961 by B. Ray)

মেলা বিবরণী

আদিবাসী উৎসব উপলক্ষে মেলা
(নাগরদোলার উৎসব)

জামিরডিহা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে নাগরদোলা উৎসব উপলক্ষে প্রায় আট বিঘা দেবোত্তর জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় গ্রাম ব্যতীত পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় ময়রা, মনিহারী, লোহার তৈয়ারী জিনিসপত্র, ধামা-কুলা, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ পাঁচমুড়া, পাথরী, মুকুন্দপুর, বাঁশঝোপা প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সাঁওতালী নাচের অনুষ্ঠান হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

মাচাতোড়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন আমবাগানে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

স্থানীয় গ্রাম ব্যতীত পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বই-ছবি, ধামা-কুলা প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা বাবদ আদায়কৃত অর্থ শিবের গাজন উৎসবে ব্যয় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক লাঠি খেলা এবং 'সাঁওতালী নৃত্য' প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

যুবরাজপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্নস্থানে ছয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

স্থানীয় অঞ্চলের লোকজন ব্যতীত মণ্ডলগ্রাম, সিমলাপাল, বিক্রমপুর, লক্ষ্মীসাগর, মাচাতোড়া, পাঁচমুড়া প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের

প্রায় তিন সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, কাঁসার বাসনপত্র, মিল ও তাঁতের ধুতি-শাড়ী, কাস্তে-নিড়ানী, হাঁড়ি-কলসী, ধামা-কুলা প্রভৃতি দ্রব্যাদির প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ মটগোদা, সিমলাপাল, আমলাগুলি, রেংটা, ফতেসিংপুর, খাগড়া, খয়েরগেড়্যা প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে প্রতি বৎসর আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নানাবিধ খেলাধূলা এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুষ্ঠানগুলিতে প্রায় দুই-তিন সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

মনসাপূজার মেলা

চাঁদপুর গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে প্রায় সাত বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত সিমলাপাল, বিক্রমপুর মণ্ডলগ্রাম, পার্শলা প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের, প্রায় দুই সহস্র নরনারী প্রধানতঃ সাইকেল ও গরুরগাড়ী এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা প্রভৃতির দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ গড়বেতা এবং সিমলাপাল হইতে প্রতি বৎসর আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য থিয়েটার এবং লটারী ও জুয়া খেলা হয়।

সুশুনিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে প্রায় চৌদ্দ-পনর বিঘা জমির উপর চারিদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের বহু নরনারী মোটরগাড়ী ও গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি,, ধামা-কুলা প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে। মেলার বিক্রেতাগণ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ঝাণ্ডা-খেলার দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়।

মহোৎসবের মেলা

পুখুরিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষে গ্রামে সাধারণের একটি মন্দির সংলগ্ন প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর পাঁচদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত লক্ষ্মীসাগর, দুবরাজপুর, বিক্রমপুর প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চারি সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, তামা-পিতলের বাসনকোসন, ধামা-কুলা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র প্রভৃতির প্রায় পচিশটি দোকানপাট বসে বিক্রেতারা আশপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, লটারী, বালক সংগীত, পাতিনাচ, যাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ব্যতীত জুয়া খেলা হয়।

শিমূলসিনীপূজার মেলা

পার্শলা গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ শিমূলসিনীপূজা উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণ সংলগ্ন প্রায় দুই-তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় সাত-আটশত নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, ধামা-কুলা প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় পচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: [পার্শলা গ্রামে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজায় মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।]

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ বিবড়দা। ৬।১,৩৭৫.১৬।৪৮৯।২,৫৯০

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, বৈরাগী, তাঁতি, কুমার, কামার, সুবর্ণ বণিক, গন্ধবনিক, জেলে, লায়েক, বাউরী, ডোম, মুচি, শুঁড়ি, মালাকার, করেঙ্গা, মোদক, নাপিত ও কলু। গ্রামটিতে নামপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, খাঁপাড়া, জেলেপাড়া, বাউরীপাড়া, ময়রাপাড়া, পোদ্দারপাড়া, বেনেপাড়া, লায়েকপাড়া, কুমারপাড়া, তাঁতিপাড়া, মুচিপাড়া প্রভৃতি নামে তেরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে লক্ষ্মীসাগর রুটের মোটরবাসে ভাত্যা নামিয়া টেষ্ট রিলিফের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব ও গন্ধেশ্বরীপূজা, আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী উৎসব ও রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন।
কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন।
গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে চারিদিনব্যাপী।

(চ) গ্রামে তিনটি শিবমন্দির ব্যতীত চারিটি মনসা আছে।

শ্রীঅনিল বরণ গড়াই, প্রধান শিক্ষক,
গ্রাম ও পো : বিবড়দা, বাঁকুড়া।

২। গ্রাম ঃ খালগ্রাম। ১১।৮৭৭.৮৭।১১৪।৫৯৬

(ক) ব্রাহ্মণ, মাঝি, ক্ষত্রিয়, ডোম, নাপিত ও বাউরী। গ্রামটিতে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে লক্ষ্মীসাগর রুটের মোটরবাসে অথবা দোলকুণ্ডায় নামিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে শ্যামাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি গ্রামের গোস্বামী সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রত্নেশ্বর শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ ও বিষ্ণুদি পঞ্চদেবতা আছেন। ইহা ব্যতীত, গ্রামের উত্তরপ্রান্তে জয়পাণ্ডা নদীতীরবর্তী একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে ভৈরবেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
শ্যামসুন্দরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পো: বিবড়দা, বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম ঃ কামারডিহা। ১২।১৬৪.৩৪।৭০।৩৬৪

(ক) সদ্গোপ, কুমার, কামার ও মাল। গ্রামটিতে কুমারপাড়া ও ভুঁইপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে হাড়মাসড়া-পাথরভাঙ্গা রুটের মোটরবাসে পেত্যাকানা নামিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি গ্রামের ভুঁইদিগের নিজস্ব এবং মাত্র গত দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে একদিন।
লক্ষ্মীপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন।
মেলা দুইটিতে গড়ে প্রায় চারি-পাচশত নরনারী আসেন এবং কয়েকটি ময়রা ও মনিহারীর দোকান বসে।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনীযুক্ত একটি দেবালয়ে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীসাগর চন্দ্র দে, প্রধান শিক্ষক,
কামারডিহা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পো: বিবড়দা, বাঁকুড়া।

৪। গ্রাম : হাড়মাসড়া। ২৮।৮০৪'৭৪।৩২৬।১,৫৮২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, লোহার, বাউরী, ধীবর, রজক, গন্ধবনিক ও মুসলমান। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, বৈশ্যপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, সামন্তপাড়া, লোহারপাড়া, কৈবর্তপাড়া, পোদ্দারপাড়া, বাউরীপাড়া এবং মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে হাড়মাসড়া ভায়া রতনপুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গন্ধেশ্বরীপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা ও কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা, পৌষ মাসে পৌষ-পার্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) পৌষ-পার্বণের মেলা। পৌষ মাসে একদিন।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি মন্দির ও দেবদেবীর স্থান আছে।

শ্রীবিভূতি ভূষণ পাত্র, প্রাধান শিক্ষক,
হাড়মাসড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ও
শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক
গ্রাম ও পোঃ হাড়মাসড়া, বাঁকুড়া।

[হাড়মাসড়া গ্রামে বিগ্রহহীন প্রস্তর নির্মিত একটি প্রাচীন মন্দির আছে। শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে এই মন্দির সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন তাহার অংশ বিশেষ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

'বাঁকুড়া জেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য দেউল তালডাঙ্গার থানার হাড়মাসড়া গ্রামে অবস্থিত। শিলাবতী নদীর অদূরে গ্রামটির অবস্থিতি থেকে মনে হয় বাঁকুড়া জেলার অব্যবহিত পশ্চিমে একদা-কেন্দ্রীভূত জৈনধর্ম শিলাবতী-বাহিত হয়ে হাড়মাসড়াতে একটি ধর্মকেন্দ্র স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীকালে, মানভূম-ছোটনাগপুর অঞ্চলে উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যশৈলী যখন অল্পাধিক অনুসৃত হয় তখন তার প্রভাব হয়ত বিস্তৃত হয় অদূরবর্তী হাড়মাসড়ায়। আলোচ্য প্রস্তরনির্মিত দেউলটি সেই প্রভাবের ফলশ্রুতি। উড়িষ্যা-শৈলীর যে-রূপটি মানভূম এলাকায় একদা সমাদৃত হয়েছিল হাড়মাসড়ার সৌধটি তার অন্যতম নিদর্শন। মন্দিরটি খুবই ছোট; চল্লিশ ফুট উচ্চও হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু 'পঞ্চ-রথের' ব্যবহারে, আমলকের বিন্যাসে, জাড্য এবং গণ্ডীর গঠন-প্রকরণে মানভূম-বাহিত উড়িষ্যা-শৈলীর ছাপ অতিশয় স্পষ্ট। 'রথ-পগ'গুলির অসমান প্রস্থ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক 'রথ-পগ'গুলি মধ্যবর্তী 'রথ-পগ' দু'টির তুলনায় অনেক বেশী চওড়া। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় পাথরের টুকরোগুলির মধ্যে কোন রকম গাঁথনি বা 'মর্টার' ব্যবহার করা হয়নি; সেগুলিকে পর পর সাজিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র। পাথরের বাইরের জোড়ের মুখ পরস্পরের সংলগ্ন রেখে ভিতরে খাঁজ কেটে গাঁথনির ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে। হাড়মাসড়ার দেউলটির বয়সের কথা চিন্তা করে, এখানেও সে-রকম কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। সৌধটি সম্পূর্ণরূপে ভাস্কর্য-বিরহিত। ভাস্কর্যের নজিরে, ঘুটগেড়িয়ার দেউলটিকে কৃষ্ণ-মন্দির বলে অনুমান করা যেমন সহজ এখানে তা নয়। তবে দেউলটির অদূরে একটি জৈন তীর্থঙ্কর-মূর্তি এখনও রক্ষিত আছে দেখে কেউ কেউ অনুমান করেন এটি হয়ত এককালে জৈন-দেবালয় ছিল। শ্রী কে. এন. দীক্ষিত এই তীর্থঙ্কর মূর্তিটি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। মূর্তিটি নাগছত্র-বিশিষ্ট দিগম্বর পার্শ্বনাথের এবং উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফুট। কালের প্রকোপে এটির জীর্ণ দশার জন্য, বিশেষত নাসিকা ভগ্ন হওয়ায়, স্থানীয়

জনসাধারণ একে 'খাঁদুরাণীর মূর্তি' বলে অভিহিত করে থাকেন।

গঠন-প্রকরণের দিক থেকে বরাকরের ১নং ও ২নং মন্দির দু'টির সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্য এমন অনুমান খুবই সঙ্গত মনে হয় যে হাড়মাসড়ার দেউলটি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্বের নয়। সেক্ষেত্রে নির্মাণের সময়ে দেউলটি জৈন-দেবালয় হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা সে-বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। কেননা, ষোড়শ শতাব্দীতে বাঁকুড়া জেলায় জৈনধর্মের কিছুমাত্র প্রভাব অবশিষ্ট ছিল না। এমনও হতে পারে পার্শ্বনাথ-মূর্তিটি পূর্বতন কোন জৈন ধর্মকেন্দ্রের স্মারক যদিও একথা নিতান্ত অনুমানসাপেক্ষ যেহেতু প্রাচীনতর কোন জৈন কেন্দ্রের এককালীন অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য পূর্বতন কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান কালের হাড়মাসড়ায় বিদ্যমান নেই। বর্তমানে দেউলটিতে কোন বিগ্রহ নেই; ভাস্কর্যের অভাবে কোন্ ধর্মোপাসনার জন্য এটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেকথা সঠিক-ভাবে নির্ণয় করা শক্ত। তবে বয়সের বিচারে, এ-দেউলটি যে হিন্দু-মন্দিররূপেই নির্মিত হয়েছিল এ-অনুমান একেবারে অযৌক্তিক না হতে পারে।

বাঁকুড়া জেলার প্রস্তর নির্মিত দেউলগুলির মধ্যে হাড়মাসড়ার মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও এই মূল্যবান সৌধটি বর্তমানে যারপরনাই অনাদৃত। পাথরের দেওয়ালে অনেকগুলি বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে; মন্দিরের দেওয়াল ও গণ্ডীর শীর্ষ থেকেও কিছু প্রস্তর খণ্ড গড়িয়ে পড়েছে নীচে; মন্দিরের গা ঘেঁষে বড় বড় গাছ গজিয়েছে অনেকগুলি। গ্রামবাসীরাও এটির রক্ষণাবেক্ষণে উদাসীন মনে হয়। অবহেলার ফলে এই সুন্দর পুরাকীর্তিটি আরও ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(পৃঃ ১৪৯-১৫১)

৫। গ্রাম : তালডাঙ্গরা।৮১।২২৪·০৭।১৫৫।৮২০

(ক) ব্রাহ্মণ, সদগোপ, তাম্বুলী, ময়রা, নায়েক, শুঁড়ি, মাঝি, কুমার, কামার ও বাউরী। গ্রামটিতে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন ওন্দা অথবা বাঁকুড়া হইতে মোটর-বাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং পৌষ মাসে পৌষ-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) নাগরদোলার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কয়েকটি মনসা মন্দির এবং শীতলার স্থান আছে।

শ্রীরাধহরি ভূঁই, প্রধান শিক্ষক,
তালডাঙ্গরা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৬। গ্রাম : ফুলমতী।৮৫।৬৩০·৯৫।২২১।১,২০৩

(ক) সদগোপ, বৈরাগী, ময়রা, কলু, মেট্যা, লোহার, মাল ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে ঘোষপাড়া, পাত্রপাড়া, মণ্ডলপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, গরাইপাড়া, মেট্যাপাড়া, ময়রা-পাড়া, সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি নামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাঁকুড়া হইতে মোটরবাসে তালডাঙ্গরা নামিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা এবং ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি প্রাচীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি দেবালয়ে মনসার মূর্তি ব্যতীত ছয়টি মনসার স্থান আছে।

শ্রীফকির চন্দ্র ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
ফুলমতী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ তালডাঙ্গরা, বাঁকুড়া।

৭। গ্রাম : বাঁশকোপা।১০০।৭৫১·৭৪।১৬৫।৯৫৩

(ক) গোপ, তিলি, ময়রা, লোহার, মাঝি ও বাউরী। গ্রামটিতে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর বা পিয়ারডোবা হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা এবং মাঘ মাসে নাগরদোলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) নাগরদোলার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি পনর-ষোল বৎসর যাবত বসিতেছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় এক সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। প্রধানতঃ ময়রা, মনিহারীর প্রভৃতি জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকানপাট বসে। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা এবং রামায়ণ গানের দল আসে।

(চ) গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের একটি শিবমন্দির এবং সাধারণের একটি মনসামন্দির আছে।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
বাঁশকোপা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৮। গ্রাম : পাঁচমুড়া।১০৪।৭৩২·১৫।২৯৪।১,৬১২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, মোদক, তিলি, ময়রা, বাগদী, নাপিত, ডোম, তাঁতি, তাম্বুলী, গন্ধবনিক, কামার ও কুমার। গ্রামটিতে নামোপাড়া, মাঝিপাড়া, কুমারপাড়া, তিলিপাড়া, বিতপাড়া, ডোমপাড়া প্রভৃতি নামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, তাঁত শিল্প, মৃৎ শিল্প এবং ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর অথবা পিয়ারডোবা হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন, জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পূজা ও মহোৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও কেন্দুবিল্বের স্মৃতি উদ্‌যাপন উৎসব এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ও অষ্টমপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলির মধ্যে দুর্গাপূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) শিবের গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। ইহা গত প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারিদিন-ব্যাপী। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মহোৎসবের মেলা। মাঘ মাসে চারিদিনব্যাপী এবং ফাল্গুন মাসে একদিনের জন্য বসে। এই মেলা দুইটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ব্যতীত দুইটি মনসা, লায়েকসিনী নামে খ্যাত একটি গ্রাম্যদেবী এবং একটি বিষ্ণুমন্দিরে গোপীনাথজীউ নামে খ্যাত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পাঁচমুড়া গ্রামের কুমারদের তৈয়ারী মাটির জিনিসপত্র বিশেষ করিয়া মাটির হাতি-ঘোড়ার বিশেষ খ্যাতি আছে। ইহা বাঁকুড়ার হাতি-ঘোড়া নামে পরিচিত।

শ্রীরঘুনাথ দাশ, শিক্ষক,
পাঁচমুড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৯। গ্রাম : সোণাঝোড়।১৩৩।১,৯৭০·০৭।১২৮।৮২৫

(ক) গোপ, লোহার, লায়েক, মাঝি, সায়র, তাম্বুলী ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে মণ্ডলপাড়া, ঘোষপাড়া, পাত্রপাড়া, লায়েকপাড়া, লোহারপাড়া, মাঝিপাড়া, তাম্বুলীপাড়া, সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন পিয়ারডোবা হইতে তালডাঙ্গরা দুধেখালি রুটের মোটরবাসে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব এবং শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মহোৎবের মেলা। বৈশাখ মাসে।

মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে। মেলা দুইটি প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীরাধাগোবিন্দ মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম : সোণাঝোড়,
পোঃ পাঁচমুড়া, বাঁকুড়া।

১০। গ্রাম : ঘোলা (মৌজা : সাবরাকোণ)। ১৪০।৬১৩·৮৩।২০৮।১,১৮৭

(ক) ব্রাহ্মণ, তিলি, লায়েক, লোহার, কলু, নাপিত ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে তিলিপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া,

লোহারপাড়া, কলুপাড়া, লায়েকপাড়া, নাপিতপাড়া, সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন পিয়ারডোবা হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি বিষ্ণুমন্দির ব্যতীত ভৈরব, শীতলা, চণ্ডী, মনসা এবং ঘোলাসিনী নামক একটি গ্রাম্যদেবতা আছে।

শ্রীকালীপদ সীট, প্রধান শিক্ষক,
ঘোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সাবরাকোণ, বাঁকুড়া।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সাবরাকোণ গ্রামে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণজীউর উৎসব সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

সাবরাকোণ

সাবরাকোণ গ্রামটি বিষ্ণুপুর শহর হইতে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। নিকটবর্তী রেলস্টেশন পিয়ারডোবার দূরত্ব প্রায় ৩ মাইল। জেলা শহর বাঁকুড়া হইতে তালডাঙ্গরাগামী মোটরবাসে আমডাঙ্গা নামিয়া ধানক্ষেতের মধ্য দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। বর্ষাকালে এই পথ দিয়া গ্রামে যাতায়াত বেশ কষ্টসাধ্য। গ্রামটি প্রাচীন। ১৯৬১ সনের জনগণনা অনুসারে গ্রামটির এলাকা ৬১৩'৮৩ বর্গমাইল এবং মোট ২০৮টি পরিবারের বসবাস আছে। গ্রামে ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, জেলে, বৈরাগী, ডোম ও মালদের বসবাস আছে। ইহাদের মধ্যে সংখ্যায় জেলে সম্প্রদায়ই অধিক।

সাবরাকোণ গ্রামে মাকড়া পাথর নির্মিত একটি প্রাচীন মন্দিরে বিখ্যাত ডেঙ্গোরামকৃষ্ণজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। চারিদিকে ইষ্টক নির্মিত সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মন্দিরটি স্থাপিত। উত্তর দিকের একটি দ্বার দিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। ইহা ব্যতীত, ইহার পশ্চিমদিকেও একটি প্রবেশদ্বার এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে থামওয়ালা বারান্দা সংযুক্ত। পশ্চিমদিকের বারান্দার দেওয়াল গাত্রে গ্রথিত একটি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ৯৪৩ মল্লাব্দে বিষ্ণুপুর রাজ বীরসিংহ কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত। মন্দিরটি আটচালা গঠনে নির্মিত এবং অদ্যাপি বেশ সুগঠিত আছে। মন্দিরের চূড়ায় শতদল পদ্ম, আমলক, কলসী ও বিষ্ণু ধ্বজা প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থ বেশী। মন্দির-প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে টিনের চালাযুক্ত নাটমন্দির এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ভোগরন্ধন ঘর এবং পশ্চিমদিকে একটি উচ্চ তুলসীমঞ্চ আছে। মন্দির প্রাঙ্গণের বাহিরে উত্তর-পূর্ব কোণে অষ্টকোণাকৃতি রাসমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন রাসমঞ্চটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে বর্তমান রাসমঞ্চটি মাত্র ৩০ বৎসর পূর্বে নির্মাণ করা হয়। মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত পুরন্দর নদী হইতে একটি খাল বাহির হইয়া একদা মন্দিরটিকে দ্বীপের ন্যায় বেষ্টন করিয়া থাকিত। বর্তমানে খালটি মজিয়া গিয়াছে এবং উহার শুষ্ক খাদে চাষ-আবাদ হইতেছে।

মন্দিরাভ্যন্তরে পদ্মাসনের উপর ত্রিভঙ্গভঙ্গীমায় দণ্ডায়মান প্রায় ৮" উচ্চতা বিশিষ্ট কালো কষ্ঠি পাথর নির্মিত অপূর্ব সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনিই রামকৃষ্ণ জীউ নামে খ্যাত। রামকৃষ্ণজীউ একক, সঙ্গে রাধিকা মূর্তি নাই। এই কারণে সাধারণ লোক ইহাঁকে ডেঙ্গো-রামকৃষ্ণ বলেন। শ্রীঅমিয় কুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে সাবরাকোণ গ্রামের রামকৃষ্ণ মূর্তি বাঁকুড়া জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূর্তি ভাস্কর্যের পরিচায়ক। এই মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, সপ্তদশ

শতাব্দীর মধ্যভাগে পুরন্দর নদীর তীরবর্তী অরণ্যময় এই অঞ্চলে পশ্চিম ভারতের জনৈক সন্ন্যাসী এক নির্জন কুটিরে তাঁর আরাধ্য বিগ্রহ কৃষ্ণ ও বলরামের সেবা-পূজা করিতেন। শোনা যায়, উক্ত সন্ন্যাসী ভিক্ষার জন্য গ্রামান্তরে বাহির হইলে প্রতিদিন বিগ্রহ দুইটি বালকের বেশ ধারণ করিয়া কুটির প্রাঙ্গণে খেলাধূলা করিত। একদা পথচারী জনৈক গোয়ালাকে ঐ বালকদ্বয় একটি আম দিয়া বিষ্ণুপুরের রাজার নিকট পৌছাইয়া দিতে অনুরোধ করে। সেই সময় বিষ্ণুপুরে রাজা বীরসিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজা ঐ গোয়ালার নিকট হইতে অসময়ে আম পাইয়া কৌতুহলবশতঃ উক্ত বালকদ্বয়কে দেখিবার জন্য সন্ন্যাসীর কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়া গোয়ালার বর্ণনানুযায়ী তিনি উক্ত বালকদ্বয়ের কোন সন্ধান করিতে পারেন না। রাজা বীরসিংহের নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সন্ন্যাসী বুঝিতে পারেন ইহা তাঁহার জাগ্রত বিগ্রহের লীলা। রাজা বীরসিংহ এই ঘটনায় অভিভূত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে ঐ বিগ্রহদ্বয় দান করিবার জন্য সন্ন্যাসীর নিকট প্রার্থনা জানান। রাজার আকুতিতে দয়াপরবশ হইয়া সন্ন্যাসী তাঁহার একটি বিগ্রহ রাজাকে দান করিয়া এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। রাজা বীরসিংহ সাবরাকোণ গ্রামে পূর্ব উল্লিখিত মন্দির নির্মাণ করিয়া উক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিত্য সেবা-পূজার জন্য বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। কিন্তু সন্ন্যাসী তাঁহার বিগ্রহ দুইটির মধ্যে কৃষ্ণ অথবা বলরাম কোন মূর্তিটি দান করিয়াছিলেন সে-সম্পর্কে সঠিক স্মরণ করিতে না পারিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠানকালে বিগ্রহের নামকরণ করেন রামকৃষ্ণ। তদবধি এই মন্দিরে রামকৃষ্ণজীউর নিত্য সেবা-পূজা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে। জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদের পর বাংলা ১৩৬২ সনে বিষ্ণুপুরের রাজা রামকৃষ্ণ বিগ্রহ রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত করেন; কিন্তু সাবরাকোণ গ্রামের জনসাধারণের দাবী উপেক্ষা করিতে না পারিয়া পুনরায় বাংলা ১৩৬৫ সনে রামকৃষ্ণ বিগ্রহকে তাঁহার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে গ্রামের সর্বসাধারণ রামকৃষ্ণজীউর সেবা-পূজার ভার বহন করিতেছেন। স্থানীয় চক্রবর্তী পদবীধারী রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বংশানুক্রমে রামকৃষ্ণজীউর নিত্য পূজাদি করিতেছেন। ইহা ভিন্ন, বাজনাদার, মালাকার ও ঝাড়ুদার আছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির সময়ও উৎসবকালে বাজনাদার বাদ্য বাজাইয়া থাকেন। ইঁহারাও বংশানুক্রমে মন্দিরের সেবায় নিযুক্ত আছেন।

প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় রামকৃষ্ণজীউর রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে তিনদিন প্রত্যহ প্রাতঃকালে রামকৃষ্ণ বিগ্রহকে মন্দির হইতে আনিয়া রাসমঞ্চে স্থাপন করা হয় এবং সারাদিন যথারীতি পূজা ও সন্ধ্যারতির পর পুনরায় মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। বলাবাহুল্য পূর্বের তুলনায় উৎসবের ধুমধাম কিছুই নাই বলিলে চলে।

উৎসব উপলক্ষে রাসমঞ্চের সন্নিকটে মাঠে ও পুরন্দর নদীর তীরে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলায় আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার নর-নারীর সমাগম হয় এবং গড়বেতা, কোতুলপুর, বিষ্ণুপুর, তালডাঙরা প্রভৃতি স্থান হইতে ব্যবসায়ীরা আসেন। ময়রা, মনিহারী, এ্যালুমিনিয়াম ও লোহার বাসনপত্র, কাপড়চোপড়, মাটির ও প্ল্যাষ্টিকের খেলনা-পুতুল, মাদুর ও জুতার দোকান, কৃষি যন্ত্রপাতি, বেনে মসলা এবং চা-পান-বিড়ি ইত্যাদি দোকানপাট বসে আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, পুতুলনাচ, ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে এবং পেশাদারী দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হয়।

ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর দোলযাত্রা উৎসব এবং প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রামকৃষ্ণজীউ বিগ্রহকে বাদ্যাদি সহ ধুমধামের সহিত পাল্কীতে বহন করিয়া পুরন্দর নদীর পশ্চিম পাড়ে প্রায় অর্ধমাইল দূরে মুড়াকাটি গ্রামে লইয়া গিয়া আটদিনব্যাপী রথযাত্রা উৎসব পালন করা হয়। উৎসবের আটদিন রামকৃষ্ণ বিগ্রহ মুড়াকাটি গ্রামে সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি মন্দির ঘরে স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা ও উৎসব পালন করা হয় এবং একটি কাষ্ঠ নির্মিত রথে স্থাপন করিয়া রথটানা হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে মুড়াকাটি গ্রামে উৎসব প্রাঙ্গণে আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

পাঁচমুড়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে প্রায় দুই বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত মণ্ডলগ্রাম, সিমলাপাল, ফুলমতী, সাতমৌলী প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের মোট প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ মণ্ডলগ্রাম, সিমলাপাল, ফুলমতী, সাতমৌলী প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দুই সহস্র দর্শক ও শ্রোতারা যোগদান করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পাঁচমুড়া গ্রামে আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার মেলা ও মাঘ মাসে অনুষ্ঠিত মহোৎসবের মেলা উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

খালগ্রাম গ্রামে প্রতি বৎসর ২২শে এবং ২৩শে বৈশাখ গাজন উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মধ্যে নদীতীরবর্তী ভৈরবেশ্বরের নির্দিষ্ট স্থান সংলগ্ন জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত ইঁদপুর থানার অন্তর্গত গৌরবাজার ইউনিয়ন, ওন্দা থানার অন্তর্গত রতনপুর ইউনিয়ন এবং তালডাঙ্গরা থানার অন্তর্গত কয়েকটি ইউনিয়ন হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতির প্রায় ত্রিশ-বত্রিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য মুরগী ও ভেড়ার লড়াই, সাঁওতালী নাচ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, অনেকে জুয়া খেলিয়া থাকেন।

পৌষ-পার্বণের মেলা

হাড়মাসড়া গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পৌষ-পার্বণ উপলক্ষে প্রায় পনর বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি স্থানীয় অঞ্চলে 'নাগরদোলার মেলা' নামে সমধিক পরিচিত।

স্থানীয় গ্রাম ব্যতীত খালগ্রাম, বিবড়দা, তালডাঙ্গরা, বৈদ্যনাথপুর, খাতড়া, সুপুর, সিমলাপাল প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় ছয় সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি-খেলনা প্রভৃতির শতাধিক দোকান বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বিবড়দা, সিমলাপাল, বারমেলা, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, লটারী, সাঁওতালী নাচ প্রভৃতি অনুষ্ঠান ব্যতীত অনেকে জুয়া খেলিয়া থাকেন।

তালডাঙ্গরা গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পৌষ-পার্বণ উৎসব উপলক্ষে জনৈক গ্রামবাসীর প্রায় দশ-বার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চারি-পাঁচ সহস্র নরনারী প্রধানতঃ গরুর-গাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, বাসনকোসন, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সাঁওতালী নাচ প্রভৃতির অনুষ্ঠান ব্যতীত জুয়া খেলা হয়।

মহোৎসবের মেলা

সোণাঝোড় গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে চব্বিশ-প্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

স্থানীয় গ্রাম ব্যতীত পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয়শত নরনারী সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়-চোপড়, হাঁড়িকুড়ি, হাতপাখা প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ কনিয়ারী, মুড়াকাটি, মামড়া, পাঁচমুড়া, শালতোড়া প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কীর্তনগান এবং যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় সাত-আটশত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—সোণাঝোড় গ্রামে অনুষ্ঠিত মনসা-পূজার মেলাটি উল্লিখিত মহোৎসবের মেলার অনুরূপ।

ঘোলা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মহোৎসব উপলক্ষে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

স্থানীয় গ্রাম ব্যতীত পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় দেড় সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, কাপড়চোপড় ইত্যাদি জিনিসপত্রের মাত্র দশ-পনরটি দোকান বসে। বিক্রেতারা শালতোড়া, সাতমৌলী, আমডাঙ্গরা প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কোনপ্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মনসাপূজার মেলা

ফুলমতী গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে পূজাস্থান সংলগ্ন প্রায় দশ কাঠা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

স্থানীয় গ্রামবাসী ব্যতীত পারুল্যা, কড়রা, ছয়আড়ি মাসাৎখাল, বলরামপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইত সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, চা-পান-বিড়ির ইত্যাদির প্রায় পনর কুড়িটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ তালডাঙ্গরা, পাঁচমুড়া, মাসাৎখাল প্রভৃতি গ্রাম-সমূহ হইতে আসেন। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে। যাত্রা দেখিতে প্রায় সাতশত দর্শকের সমাগম হয়।

রথযাত্রার মেলা

বিবড়দা গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে গ্রামের মধ্যে পাকা রাস্তার উভয় পার্শ্বের প্রায় পনর বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র সাত বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী খালগ্রাম, তাল-ডাঙ্গরা, হাড়মাসড়া প্রভৃতি ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রধানতঃ গরুরগাড়ী, সাইকেল এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বই-ছবি প্রভৃতি জিনিসপত্রের কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ হাড়মাসড়া, চাঁদকুড়ি, কোলি, বেলডাঙ্গরা, ভাগাবন্দ, পাইকা, মহদা প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ঢাস্তিখেলা ও 'সং নাচ' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—বিবড়দা গ্রামে কার্তিক মাসে কালী-পূজার মেলাটি এবং চৈত্র সংক্রান্তির মেলাটি উল্লিখিত রথযাত্রার মেলার অনুরূপ; তবে মেলা দুইটিতে প্রায় আড়াই সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

থানা ঃ বিষ্ণুপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ তুড়্‌কী সীতারামপুর।
৪২।৫১৭·৪১।২৩৫।১,১৪২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাম্বুলী, বেনে, কামার, শুঁড়ি, ময়রা, লোহার, বাউরী, মুচি, মাড়োয়ারী, মুসলমান ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে পি, ডব্লিউ, ডি'র পাকা রাস্তা দিয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রামনবমী উৎসব মহা-আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রামনবমীর মেলা। চৈত্র মাসে।

(চ) গ্রামে একটি শ্রীমন্দির, একটি মহাবীরমন্দির, একটি হরিমন্দির এবং জনৈক সাধকের একটি সমাধিমন্দির আছে।

শ্রীসাগর স্বামীজি,
হরিজন সেবক সঙ্ঘ,
হরি তপোবন আশ্রম,
তুড়্‌কী সীতারামপুর, বাঁকুড়া।

২। গ্রাম ঃ মড়ার। ৬১।১,৭৫৭·১৮।৫৬৮।২,৮৭৪

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোপ, গন্ধবনিক ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর নামিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর দশহরা উৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী উৎসব, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব, পৌষ মাসে ভৈরবপূজা, মাঘ মাসে বড়ামঠাকুরের পূজা ও সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ ও মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) পৌষসংক্রান্তির মেলা। পৌষ মাসে চারিদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। মহরমের মেলা। তিনদিন।

(চ) গ্রামে চারিটি মনসা আছে।

শ্রীকামাখ্যা চরণ ঘোষ, শিক্ষক,
মড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম ঃ বাঁকাদহ। ৭১।১,৬৬১·৪৮।২৫১।১,৩১৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, তিলি, তাম্বুলী, ময়রা, তাঁতি, করেঙ্গা, কুমার, কামার, বাগ্‌দী, শুঁড়ি, কলু, ডোম ও মুচি। গ্রামটিতে শুঁড়িপাড়া, তিলিপাড়া, বাগ্‌দীপাড়া, কামারপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, তাম্বুলীপাড়া, করেঙ্গাপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পিয়ারডোবা হইতে অহল্যাবাঈ রোড দিয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে চারিটি কালীপূজা ও রাসযাত্রা উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে শীতলাপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি প্রায় একশত বৎসরে প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি বিষ্ণু মন্দির ও একটি ভগ্নদশাগ্রস্থ চণ্ডীমণ্ডপ ব্যতীত ছয়টি পঞ্চানন্দ, একটি শীতলা, চারিটি মনসা, তিনটি শিব, একটি গৌর-নিতাই বিগ্রহ এবং কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তি আছে।

শ্রীমতিলাল মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ ছোট বাঁকাদহ, বাঁকুড়া।

৪। গ্রাম ঃ চাঁচর। ৮১।৪৪৮·০১।৯৯।৪৯৯

(ক) ব্রাহ্মণ, তিলি, লায়েক, বাউরী ও নাপিত। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, তিলিপাড়া, লায়েকপাড়া, বাউরী-

পাড়া, নাপিতপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পিয়ারডোবা হইতে টেষ্ট রিলিফের দ্বারা নির্মিত পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি বহুকালের (এক সহস্র বৎসর?) প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারিদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি ভগ্নদশাগ্রস্থ চণ্ডীমণ্ডপ ব্যতীত একটি ভৈরব, শিব, শীতলা, মনসা, দুইটি কালী এবং দুইটি বিষ্ণুশিলা ও চাঁচমিনী, ক্ষিরাইমিনী নামে গ্রাম্য-দেবীর প্রস্তরমূর্তি আছে।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শিক্ষক,
গ্রাম: চাঁচর, পো: ছোট বাঁকাদহ, বাঁকুড়া।

৫। গ্রাম: পচাডহরা। ৯০৷৭১৩.২০৷৬৩৷৬৩৷৩২৭

(ক) গোয়ালা, তাম্বুলী ও লায়েক।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে জেলা বোর্ডের পাকা রাস্তায় বাঁকাদহ-জয়রামবাটী রুটের মোটর-বাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পৌষসংক্রান্তি উৎসব এবং মাঘ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি স্থানীয় অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) পৌষসংক্রান্তির মেলা। পৌষ মাসে তিন-দিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মধ্যে একটি বটবৃক্ষ নীচে শীতলা ও মনসার যথাক্রমে পাষাণমূর্তি ও মাটির হাতি-ঘোড়া প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীবিশ্ববন্ধু ভূষণ, শিক্ষক,
গ্রাম: পচাডহারা, পো: মাগুয়া, বাঁকুড়া।

৬। গ্রাম: অযোধ্যা। ১০২৷৫০৮.০৪৷৪১৮৷২,১০১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বনিক, তিলি, কামার, তাঁতি, ধোপা, নাপিত, মুচি, মেটে, বাগ্দী, খয়রা ও বাউরী। গ্রামটিতে নামপাড়া, মাঝপাড়া, উপরপাড়া, কামারপাড়া, তিলিপাড়া প্রভৃতি নামে পাচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রামসাগর হইতে অহল্যা-বাঈ রোড দিয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা উৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় তিন-শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দশহরার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে।

রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে তিন-চারি-দিনব্যাপী। মেলা দুইটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন এবং গড়ে প্রায় দশ-বারো সহস্র নরনারী মেলায় আসেন।

(চ) গ্রামে দ্বাদশটি শিবমন্দির ব্যতীত একটি মনসা-মন্দির, একটি রাসমঞ্চ এবং কারুকার্যবিশিষ্ট একটি গিরি-গোবর্ধন মন্দির আছে। গ্রামের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ প্রস্তর নির্মিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। মন্দিরগাত্রে খোদিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইহা মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিংবদন্তী আছে, 'কালাপাহাড়' কর্তৃক মন্দিরটি কলুষিত হয় বলিয়া ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মল্লভূমের বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী রাজারা শ্রীবৃন্দাবনের অনুকরণে মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরের চারিপাশে মন্দিরাদি এবং রাধানগর, অবন্তিকা, মথুরা, দ্বারিকা, অযোধ্যা প্রভৃতি গ্রামের নামকরণ করেন। তদনুসারেই এই গ্রামটির নাম অযোধ্যা হয়।

শ্রীগোবিন্দ চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যতীর্থ, শিক্ষক,
গ্রাম ও পো: অযোধ্যা, বাঁকুড়া।

Ajodhya— A village in Bishnupur police station, situated on the north bank of the Dwarakeswar river, 7 miles north-west of

Bishnupur town. It is an ancient village and was at one time famous as a centre of Sanskritic studies. A large number of old Sanskrit manuscripts recoverd from this village have been kept in the Bishnupur Branch of Bangiya Sahitya Parishad. The chief industry of the village is that of bellmetal. 53 artisan families are reported to be engaged in 25 different workshops of the bellmetal industry. At the time of East India Company there was an indigo factory here. The village contains the residence of one of the leading zamindars of the district, whose ancestors built the temple of Radha Damodar, 12 Siva temples, an enormous *Rashmancha* which is one of the biggest of of its kind in the district. The family claimed its descent of Bhattanarayan, belived to be one of the five Brahmins brought from *Kanyakubja* by the legendary king of Adi Sur.

(District Census Handbook, Bankura, 1961 by B. Ray, p. 141)

৭। গ্রাম : জয়কৃষ্ণপুর। ১১২।৬৩৮·২৫।২২৩।১,১২৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, গন্ধবনিক, তাঁতি, ছুতার, কুমার, কামার, বাগ্দী, খয়রা, লোহার, মেটে, বাউরী, কলু, ডোম, নাপিত, মুচি ও হাঁড়ী। গ্রামটি অনেকগুলি পাড়ায় বিভক্ত। যথা—পোদ্দারপাড়া, কুণ্ডুপাড়া, আচার্যপাড়া, মেটেপাড়া, খয়রাপাড়া, খাঁপাড়া, মণ্ডলপাড়া, বিশ্বাসপাড়া, লোহারপাড়া, চাটুজ্যেপাড়া, ডোমপাড়া, বাউরীপাড়া, রায়পাড়া, মুখুজ্যেপাড়া, বাঁড়ুজ্যেপাড়া, ছুতারপাড়া, বাগ্দীপাড়া, কুমারপাড়া, কায়েতপাড়া, গ্রহাচার্য্যপাড়া, ভট্টাচার্যপাড়া প্রভৃতি। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গ্রামের কামারপাড়া, তেওয়ারীপাড়া ও চক্রবর্তীপাড়া, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এবং মণ্ডলপাড়াটি বাংলা ১৩২৯ সনের বন্যায় সম্পূর্ণ জনবসতি শূন্য হইয়া গিয়াছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কাষ্ঠশিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রামসাগর হইতে হাঁটাপথে অথবা বিষ্ণুপুর রেলস্টেশন হইতে সোনামুখী-পানাগড় রাস্তায় গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে পঞ্চরাত্রি উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও রাসযাত্রা উৎসব, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব ও রামনবমী উৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, গ্রামের গোস্বামী সম্প্রদায় কর্তৃক জীতাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) পঞ্চরাত্রির মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাঁচ-ছয়দিনব্যাপী। মেলাটিতে প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। ইহাতে কয়েকটি ময়রা, মনিহারী, সরবত, চা-পান প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকান বসে। মেলায় আমোদপ্রমোদের হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন শিবমন্দির এবং একটি শিলাখণ্ডে খোদিত মনসার মূর্তি আছে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বিশ্বাস, শিক্ষক,
গ্রাম : জয়কৃষ্ণপুর, বাকুড়া।

৮। গ্রাম : রাধানগর। ১৩২।১,৯২২·৯০।৫০০।২,৫১২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, গোয়ালা, তাঁতি, নাপিত, কামার, ছুতার, তাম্বুলী, কলু, ধোপা, সৌমণ্ডল, পোদ্দার, মোদক, বাগ্দী, বাউরী, লোহার, ডোম, খয়রা, মুচি ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে চট্টোপাধ্যায়পাড়া, শর্মাপাড়া, ঝারিমুন্যাপাড়া, ঠাকুরপাড়া, ভট্টাচার্যপাড়া, বাগ্দীপাড়া, বাউরীপাড়া, লোহারপাড়া, ডোমপাড়া, বিশ্বাসপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে বারোটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে বিষ্ণুপুর-পানাগড় রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে গঙ্গাধর শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। জনশ্রুতি আছে যে, গ্রামের আদিবাসিন্দা চাঁড়াল সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গ্রামের একটি স্থানের মাটি খুঁড়িয়া একটি শিবলিঙ্গ উদ্ধার

করেন। ইনিই গঙ্গাধর শিব নামে খ্যাত। যে-স্থানে শিবলিঙ্গটি পাওয়া যায় সেই স্থানেই মন্দির নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি বৎসর অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ঘটস্থাপন করিয়া উৎসব আরম্ভ হয় এবং মাসব্যাপী চলে। উৎসব উপলক্ষে ভক্তরা বান ফুঁড়িয়া থাকেন।

(ঙ) গাজনের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পঞ্চাশ ফুট উচ্চ প্রস্তরময় একটি শিবমন্দির ব্যতীত বারোটি ভৈরব, একটি মনসা, একটি বড়াম, একটি শীতলা ও আরো অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্তি আছে।

শ্রীশ্যামদাস বিশ্বাস,
সভাপতি রাধানগর ইউনিয়ন বোর্ড,
বাঁকুড়া।

৯। গ্রাম : ভড়া।১৫৮।১,৮৭০·৬৭।৩৬৯।১,৬৩৭

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, গোয়ালা, তিলি, তাঁতি, ছুতার, তাম্বুলী, কামার, কুমার, ডোম, বাগ্দী, কাহার, মেটে, মুচি ও বাউরী। গ্রামটিতে মণ্ডলপাড়া, চক্রবর্তী-পাড়া, তিলিপাড়া, গোয়ালাপাড়া, মুখুটিপাড়া, লোহার-পাড়,, বাউরীপাড়া, মেটেপাড়া, ডোমপাড়া, বাগ্দীপাড়া প্রভৃতি নামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজের রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা ও উৎসবগুলি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজের শিলামূর্তিসহ টিনের ছাউনী-যুক্ত এবং সম্মুখভাগে পাকা চাঁদনীযুক্ত একটি মন্দির ব্যতীত সাতটি মনসা আছে।

শ্রীমদনমোহন চক্রবর্তী, শিক্ষক,
ভড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

[বিষ্ণুপুরে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

বিষ্ণুপুর

বিষ্ণুপুর কলিকাতা হইতে প্রায় ২০১ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। সাউথ-ইষ্টার্ণ রেলপথে বিষ্ণুপুরেই একটি রেল-স্টেশন আছে। কলিকাতা হইতে দুর্গাপুর হইয়া সরাসরি মোটরবাসেও এইস্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়। ইহা বাঁকুড়া জেলার মহকুমা শহর ও প্রাচীন রাজ্যের রাজধানী। রঘুনাথ বা আদিমল্ল মল্লভূম রাজ্য ও মল্লরাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও সাঁওতাল পরগণা জেলার কতকাংশ এবং ছোট নাগপুরের অধিত্যকা ভূমির কতকাংশ লইয়া মল্লভূম রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। প্রবাদ, সপ্তম শতাব্দীতে তীর্থকামী জনৈক ক্ষত্রিয় রাজার মহিষী বৃন্দাবন হইতে শ্রীক্ষেত্রের পথে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্রটি স্থানীয় কোন গৃহস্থ কর্তৃক লালিত পালিত হয়। বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালকের দেহে ক্ষত্রোচিত বলবীর্য্যের বিকাশ ঘটিতে থাকে এবং সে মল্লক্রীড়ায় অপরাজেয় হইয়া উঠে। এই বালকই উত্তরকালে আদিমল্ল বা রঘুনাথ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। রঘুনাথ স্বীয় পরাক্রমবলে বহু সামন্ত রাজা ও সর্দারকে পরাস্ত করিয়া এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যই মল্লভূম নামে খ্যাত। ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে মল্লাব্দ গণনা করা হয়। মল্লভূমের প্রথম রাজধানী ছিল প্রদ্যুম্নপুরে। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রঘুনাথ মল্লের উনবিংশ বংশধর জগৎমল্ল বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই সময় হইতেই বিষ্ণুপুরের প্রকৃতি ইতিহাস শুরু হয় এবং ক্রমেই জনমানসে বিষ্ণুপুর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

বহু শতাব্দী ধরিয়া মল্লরাজগণ বাংলার পশ্চিম সীমান্তে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমান যুগেও বহুকাল ধরিয়া বিস্তৃত ভূখণ্ডে বিষ্ণুপুরের রাজারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। জগৎমল্লের পর রামমল্লের সময়ে সেনাবাহিনীর রণনৈপুণ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। শিবসিংহ মল্লের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরে ললিত কলার বিশেষতঃ সঙ্গীত সাধনার বিকাশ ঘটে। সঙ্গীতার্য যদুভট্ট, রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী বিষ্ণুপুরের অধিবাসী ছিলেন। সঙ্গীত জগতে 'বিষ্ণুপুর ঘরোয়ানা' ভারতের সর্বত্র সম্মানিত। ধারীমল্লের পুত্র বীর হাম্বীরের সময়ে মল্লভূমরাজ্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। তিনি সেনাবাহিনীর ও দুর্গের পুনর্গঠন করেন এবং তাঁহারই সময়ে মল্লভূমে বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তৃতি ঘটে। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব সোলেমান কররানীর পুত্র দাযুদ খাঁ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু বীর হাম্বীরের হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে। দুর্গের পূর্বদ্বারে মৃত নবাব সৈন্যের এত শবদেহ জমিয়াছিল যে উহা "মুণ্ডমালাঘাট" নামে আখ্যাত হয়।

মল্লভূমে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণব মহান্তগণ বৃন্দাবন হইতে গোস্বামীগণের গ্রন্থসমূহ পেটিকার মধ্যে করিয়া গো-শকটে মল্লভূম রাজ্যের মধ্য দিয়া গৌড়ে লইয়া আসিতেছিলেন। রাজ জ্যোতিষীর গণনামত পেটিকাগুলির মধ্যে ধনরত্ন আছে মনে করিয়া বীর হাম্বীর তাঁহার লোকজন দিয়া উহা লুণ্ঠন করিয়া আনান। পুঁথিগুলির উদ্ধারের আশায় শ্রীনিবাস আচার্য্য রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সৌম্যমূর্তি দর্শন এবং ভগবদ্ভক্তি ও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া রাজা বীর হাম্বীর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বীর হাম্বীরের বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণ মল্লভূমের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়। অনেকেই বোধ হয় জানেন, কলিকাতার বাগবাজারে যে মদনমোহন ঠাকুর আছেন, তিনি বিষ্ণুপুর রাজবংশের কুলদেবতা। মল্লরাজ চৈতন্যসিংহ ইংরেজ আদালতে মোকদ্দমার খরচ সংগ্রহের জন্য এই বিগ্রহটিকে বাগবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী গোকুল মিত্রের নিকট বন্ধক রাখেন। বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যবাসী প্রত্যেককেই প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক হরিনাম জপ করিতে হইবে, ইহা যে না করিবে সে শাস্তি পাইবে। এই কার্য্যকে লোকে "গোপাল সিংহের বেগার" আখ্যা দিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মারাট্টা বা বর্গীর উপর্য্যুপরি আক্রমণে ও গৃহবিবাদের ফলে মল্লরাজ্যের পতন হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মল্লভূম বর্দ্ধমানের মহারাজার নিকট বিক্রীত হয়।

বিষ্ণুপুরে বহু প্রাচীন কীর্তি আছে। উহাদের মধ্যে প্রাচীন দুর্গের গড়খাই, পাথর দরজা ও বীর দরজা নামক প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গদ্বার, প্রসিদ্ধ "দলমর্দ্দন" বা "দলমাদল" কামান, মল্লেশ্বর, মদনগোপাল, মদনমোহন, কালাচাঁদ, শ্যামরায় ও রাধাশ্যামের মন্দির, জোড়বাংলা, রাসমঞ্চ, পঞ্চরত্ন মন্দির ; লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, কতুনাবাঁধ ও কালিন্দী-বাঁধ প্রভৃতি নামধেয় বাঁধ বা প্রকাণ্ড জলাশয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। বস্তুতঃ বিষ্ণুপুর প্রাচীন বঙ্গের সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র।

বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত দলমাদল কামানটির দৈর্ঘ্য ১২ ফুট ৫½ ইঞ্চি ও পরিধি ১১½ ইঞ্চি। গঠনে ইহা বিজাপুরের সুপ্রসিদ্ধ কামান "মালিক-ই-ময়দান"-এর অনুরূপ। ইহা এরূপ লৌহের দ্বারা প্রস্তুত যে আজ পর্য্যন্ত ইহার কোথাও একটু মরিচা ধরে নাই। ইহাতে স্বতঃই দিল্লীর প্রসিদ্ধ প্রাচীন ও মরিচাবিহীন লৌহস্তম্ভের কথা মনে হয়। বর্তমানে এই কামানটি সরকারের রক্ষিত কীর্তির অন্তর্গত। ইহার গায়ে ফার্সিতে একটি লিপি খোদিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই কামানটি প্রস্তুত করিতে একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা লাগিয়াছিল। প্রবাদ যে, মারাট্টা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিত ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিলে রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং মদনমোহনদেব দলমাদল কামান দাগিয়া শত্রুসৈন্যকে দূরীভূত করিয়াছিলেন।

মদনমোহন ও জোড়বাংলা মন্দিরের গাত্রে ইষ্টকের উপর যে সকল দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ আছে তাহা শিল্পসমাজে বিশেষ সমৃদ্ধ। জোড়বাংলার গাত্রে একটি সুন্দর নৌ-যুদ্ধের চিত্র আছে। উহা যবদ্বীপের প্রসিদ্ধ বোরোবুদুর মন্দির গাত্রের চিত্রাবলীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

লালবাঁধ পুষ্করিণী সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ বরদার বিদ্রোহী রাজা শোভা সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লুণ্ঠিত সামগ্রীর সহিত লালবাঈ নামে এক অতি সুন্দরী মুসলমান রমণীকে লইয়া আসেন। লালবাঈ-এর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া রাজা তাঁহার জন্য একটি স্বতন্ত্র মহল নির্মাণ করাইয়া দেন এবং একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার নামানুসারে "লালবাঁধ" নাম রাখেন। লালবাঈ-এর অনুরোধে রাজা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিতে মনস্থ করিলে প্রধানা মহিষী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া মন্ত্রী গোপাল সিংহ প্রভৃতির সহায়তায় তাঁহাকে কৌশলে হত্যা করান। লালবাঈকে লালবাঁধে ডুবাইয়া মারা হয়। অতঃপর প্রধানা মহিষী রাজার চিতায় আরোহণ করিয়া "সতী" হন। সেইজন্য লোকে তাঁহাকে "পতিঘাতিনী সতী" নামে অভিহিত করে। লালবাঈ রাজ্যশুদ্ধ লোক সমেত রাজাকে যে স্থানে মুসলমানী খানা খাওয়াইবার আয়োজন করিয়াছিলেন উহা আজিও "ভোজনতলা" নামে পরিচিত।

বিষ্ণুপুরের শাঁখার জিনিস, তুলসীর মালা, রেশমের শাড়ী, পাট ও তসরের কাপড়, পিতল কাঁসার বাসন এবং তামাক বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বিষ্ণুপুরের প্রায় দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত ময়নাপুর নামক গ্রামে রাঢ়ে ধর্মপূজার প্রবর্তক রমাই পণ্ডিত "যাত্রাসিদ্ধি রায়" নামে এক ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। ময়নাপুরের প্রায় ৭ মাইল উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদের ধারে চাঁপাওয়ালা নামে যে ঘাট দৃষ্ট হয় উহা ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত মহামুনি দুর্ব্বাসা, নারদ, কপিল প্রভৃতির তপস্যার স্থান এবং গুপ্তবারাণসী বলিয়া বর্ণিত "চাপায়ের ঘাট"। রাজা রঘুনাথ মল্লের রাজত্বকালে কবি রমাই পণ্ডিত ধর্ম পূজার মাহাত্ম্যসূচক প্রসিদ্ধ কাব্য "শূণ্যপুরাণ" রচনা করেন।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজরা ছিলেন শক্তির পূজারী, শাক্ত। পূর্ব উল্লিখিত বিখ্যাত বৈষ্ণব পুঁথি 'মণি মঞ্জুষা' নামক গ্রন্থ অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মল্লরাজ বীর হাম্বীর বৈষ্ণব শিরোমণি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগ্রহ লাভ করেন এবং সপরিবারে শ্রীনিবাস আচার্য্যর নিকট দীক্ষালাভ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। বীর হাম্বীরের কাল হইতে তাঁহার পরবর্তী রাজারা রাজধানী বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বহু সুন্দর সুন্দর মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৃন্দাবনের অনুকরণে যমুনা বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ, শ্যামবাঁধ, লালবাঁধ প্রভৃতি নামে অনেকগুলি বৃহৎ জলাশয় খনন করান। এমন কি বিষ্ণুপুরের আশপাশে মথুরা, বন্দাবনপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি নামে কয়েকটি গ্রামের নামকরণ করেন। এই কারণে বিষ্ণুপুর গুপ্ত বৃন্দাবন নামে খ্যাত হয়।

মল্লরাজদের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বৃন্দাবন শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার স্থাপত্য শিল্পের গৌরব এই সকল মূর্তি ও মন্দিরাদি কালের প্রভাবে, অযত্নে আজ ক্ষত-বিক্ষত, জীর্ণ বা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। একদা এই সকল মন্দির প্রাঙ্গণ বৎসরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পূজা-পার্বণ কেন্দ্র করিয়া লোকসমাগমে, নিত্য-পূজার ধূপ-দীপে, ভোগারতির শঙ্খ-ঘণ্টা ও বাদ্য ধ্বনিতে উৎসব আনন্দে মুখরিত থাকিত। পোড়ামাটির অলঙ্করণে অলংকৃত এই সকল অপূর্ব সুন্দর মন্দিরগুলির অধিকাংশই আজ বিগ্রহহীন, পরিত্যক্ত। ঐ সকল প্রাচীন মন্দিরাদির মধ্যে আজিও যে দুই-একটি মন্দিরে কোনক্রমে নিত্যপূজা হইতেছে তন্মধ্যে বুড়া রাধাশ্যামজীউ মন্দির একটি। মন্দিরটি রাজবাড়ীর সন্নিকটস্থ চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা ১০৬৪ মল্লাব্দে (১৭৫৮ খৃঃ) মল্লরাজ চৈতন সিংহ ইহা নির্মাণ করান। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ দ্বারের উপর দ্বিতলে নহবৎখানা এবং প্রাঙ্গণের একধারে একটি বাঁধান বেদীর উপর ইষ্টক নির্মিত অষ্টকোনাকৃতি সুন্দর তুলসীমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। মূল মন্দিরটি মাকড়া পাথর দ্বারা নির্মিত এবং বাংলা চারচালা রীতিতে গঠিত। ইহার গম্বুজাকৃতি রত্ন শিখরটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দক্ষিণমুখী মন্দিরটির দেওয়াল গাত্রে এবং সম্মুখস্থ বারান্দার গায়ে অনন্ত শয্যায় শায়িত বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও গণেশাদি দেবতা, হাতী, ঘোড়া, মহিষ, হরিণ ইত্যাদি পশুপক্ষী ও নরনারী প্রভৃতি পোড়ামাটির মূর্তির দ্বারা সুন্দরভাবে অলংকৃত।

মন্দিরাভ্যন্তরে একটি বেদীর উপর দক্ষিণমুখী দারু নির্মিত দণ্ডায়মান গৌর-নিতাই বিগ্রহ এবং দেওয়াল গাত্রে

খোদিত জগাই-মাধাই মূর্তি ব্যতীত পূর্বমুখী পদ্মাসনের উপর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান কষ্টি পাথর নির্মিত প্রায় আড়াই ফুট উচ্চ রাধাশ্যাম বিগ্রহ, রাধিকাহীন গোকুলচাঁদ ও শ্যামচাঁদ বিগ্রহ (উভয় মূর্তিই প্রায় এক ফুট উচ্চ) কষ্টি পাথর নির্মিত তিনটি নাড়ুগোপাল মূর্তি, প্রায় এক ফুট উচ্চ প্রস্তর খোদিত বিষ্ণুমূর্তি, অদ্বৈতাচার্য্যের মূর্তি ও কয়েকটি শালগ্রাম এবং দক্ষিণমুখী কষ্টি পাথর নির্মিত একটি পৃথক আসনে যুগলকিশোর, শ্যামরায়, রাধাগোবিন্দ, রসিকরায়, নন্দলাল, কালাচাঁদ প্রভৃতি নামে খ্যাত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ এবং দারুময় জগন্নাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল মূর্তিগুলি বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়ার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেবাপূজার ব্যায়ভার লাঘবের জন্য একত্রে বুড়ো রাধাশ্যাম মন্দিরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহগুলির সহিত পূজিত অষ্টধাতু নির্মিত রাধিকা মূর্তিগুলি অপহরণের ভয়ে রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে এবং তথায় পৃথকভাবে রাধিকা মূর্তিগুলির নিত্যপূজাদি হইয়া থাকে। বুড়ো রাধাশ্যাম মন্দির নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর দোলপূর্ণিমায় গৌর-নিতাই বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া মহোৎসব এবং রাধাশ্যাম বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর চৈত্র পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বলাবাহুল্য উৎসব নামে মাত্র। রাসযাত্রা উপলক্ষে পূর্বে মন্দির প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসিত।

বিষ্ণুপুরের মদনমোহন বিগ্রহ বিষ্ণুপুরবাসীর নিকট এক ঐতিহাসিক বিগ্রহ। কাহার কাহার মতে বীর হাম্বীর মতান্তরে দুর্জন সিংহ বৃষভানুপুর গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে বলপূর্বক বিখ্যাত মদনমোহন বিগ্রহ আনিয়া বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠা করেন। বৃষভানুপুর গ্রাম হইতে মদন-মোহন বিগ্রহ আনয়ন সে এক বিস্তারিত কাহিনী। সে যাই হউক, মদনমোহনজীউর মন্দিরটি যে দুর্জন সিংহ নির্মাণ করান সে বিষয়ে কোন দ্বিমতের অবকাশ নাই। মন্দিরটি নির্মিত হয় ১০০০ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে।

চারিদিকে সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে মদনমোহন মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। উত্তর দিকের একটি প্রবেশদ্বার দিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে যাতায়াত করা হয়। প্রবেশদ্বারে উপরে ছাদ দোচালা বিশিষ্ট ছিল; বর্তমানে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মদনমোহন মন্দিরটি দক্ষিণমুখী ও সম্মুখে বারান্দাবিশিষ্ট। বিষ্ণুপুরের ইষ্টক নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে মদনমোহনজীউর মন্দিরটিই অন্যতম বলিয়া বিবেচিত। মন্দিরটির দেওয়াল গাত্রে সুন্দর পোড়ামাটির শিল্প দ্বারা সমৃদ্ধ। ইহার উচ্চ ভিতের চারিদিক ঘিরিয়া হংস সারি, বাদ্য ও নৃত্যরত মূর্তি, রামায়ণ কাহিনী, দশাবতার ও ড্রাগন মূর্তি দ্বারা অলংকৃত। মন্দিরগাত্রে প্রতিষ্ঠাফলক গ্রথিত আছে। ইহার সম্মুখে দোচালা গঠনে সুবৃহৎ পাকা নাট্ মন্দিরটির উপরে চালাগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নাট্ মন্দিরটির দেওয়াল গাত্রেও পোড়ামাটির কাজ আছে। ইহা ছাড়া, পূর্বদিকে একটি ভগ্ন ভোগ রন্ধন ঘর দেখিতে পাওয়া যায়।

মদনমোহনজীউর মন্দিরে আজ আর মদনমোহন বিগ্রহ নাই। বৃষভানুপুর গ্রাম হইতে যে বিগ্রহকে বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া মহাপ্রতাপান্বিত মল্লরাজ একদিন অপহরণের অপবাদ বিনা দ্বিধায় মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরবাসী আপামর জনসাধারণকে দুর্দ্ধর্ষ মারাঠা আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে অচল বিগ্রহ একদিন সচল হইয়া দলমাদল কামান দাগিয়া শত্রু ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ছিলেন বলিয়া বিশ্বাস, সেই বিষ্ণুপুর নয়নমণি মদনমোহন মহারাজ চৈতন্য সিংহের ঋণের দায়ে আর একদিন বিষ্ণুপুর ছাড়িয়া চিরতরে কলিকাতার বাগবাজারের গোকুল মিত্রের বাড়ী গিয়া উঠিয়াছিলেন। আজ তাঁহার পরিচয় বিষ্ণুপুরের মদনমোহন নয়, বাগবাজারের মদনমোহন। তাঁহার শূন্য দেবালয়ে আজ প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতু নির্মিত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি।

মদনমোহন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত উক্ত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের নিত্যপূজা হয়। ইহা ছাড়া, প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ রাধাশ্যামজীউর মন্দির হইতে নিতাই-গৌর বিগ্রহ আনিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে একটি নির্দিষ্ট বেদীর উপর স্থাপন করিয়া পক্ষরাত্রিব্যাপী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বিষ্ণুপুরের একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব মৃন্ময়ীদেবী নামে খ্যাত মহিষমর্দিনী দুর্গাপূজা। এই উৎসব মল্লরাজগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। এই মৃন্ময়ীদেবী এক জাগ্রতা ঈশ্বরী বলিয়া

সাধারণের বিশ্বাস। মৃন্ময়ীদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শোনা যায় যে, বিষ্ণুপুর রাজবংশের অষ্টাদশ পুরুষ গতে ঊনবিংশ রাজা জগৎমল্ল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে মল্লভূমের আদি রাজধানী প্রদ্যুম্নপুর হইতে একদা শিকারে বাহির হইয়া একাকী পথভ্রষ্ট অবস্থায় এক গভীর অরণ্যে উপস্থিত হন এবং এই গভীর অরণ্যে এক অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি ভগবতীর দর্শন পান। তাঁহারই নির্দেশে মল্লরাজ যেস্থানে দেবীর দর্শন পাইয়াছিলেন সেইস্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া মহিষমর্দিনী দুর্গার মৃন্ময়মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এইস্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া আনেন। এই মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠাকাল ৯৯৭ খৃষ্টাব্দ, ৩০৩ মল্লাব্দ বাংলা ৪০৪ সন। সেই সময় হইতেই অদ্যাবধি মৃন্ময়ীদেবীর নিত্যপূজা ও শারদীয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণে দক্ষিণমুখী বিশাল দুর্গামণ্ডপটি অবস্থিত। মণ্ডপের মধ্যস্থলে মহিষমর্দিনী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মুখস্থিত দেওয়ালগাত্রে কার্তিক-গণেশ আদি দেবতা আছেন। দেবীমূর্তিটি প্রায় সাড়ে চার ফুট উচ্চ। ইনিই মৃন্ময়ী দেবী নামে খ্যাত। দুর্গামণ্ডপটি ইষ্টক নির্মিত হইলেও ইহার নীচেকার মেঝে অবশ্য কাঁচা। প্রায় নয় শত বৎসরের প্রাচীন এই মূর্তিটি কেবল ১৩০৫ ও ১৩৫৭ সনে রং পরিবর্তন করা হইয়াছে। ১৩৫৭ সনে বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সক্রিয় চেষ্টায় দুর্গামণ্ডপের সংস্কার সাধিত হয়। মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে দুর্গামণ্ডপটি সম্মুখে একটি কেলি কদম, একটি প্রাচীন বট ও একটি আকড় গাছ আছে। গাছগুলির গোড়া বেষ্টন করিয়া ইট দ্বারা বাঁধানো।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আদিতে জগৎমল্ল মৃন্ময়ীদেবীর যে শ্রীমন্দির নির্মাণ করেন তাহা বর্তমানের তুলনায় আয়তনে অনেক ছোট ছিল। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মল্লরাজ রামকৃষ্ণ সিংহদেব মৃন্ময়ীদেবীর এইরূপ বিশাল মন্দির নির্মাণ করান।

মৃন্ময়ী দেবীর শারদীয়া উৎসব মল্লরাজ পরিবার কর্তৃক পরিচালিত হইলেও সর্বসাধারণ ইহাতে যোগদান করিয়া থাকেন। পূর্বে উৎসব উপলক্ষে মহাধূমধাম হইত। বর্তমানে এই উৎসব আড়ম্বরশূন্য হইয়া পড়িলেও, চারদিনব্যাপী উৎসবে আশপাশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু নরনারী প্রতিমা দর্শন করিতে ও পূজাদি দিতে আসেন।

মৃন্ময়ী দেবীর শারদীয়া উৎসবের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বড় ঠাকুরুন, মেজ ঠাকুরুন ও ছোট ঠাকুরুনের পটে আঁকা মূর্তি পূজা। প্রতি বৎসর জীতাষ্টমীর পরের দিন নবমী তিথিতে একটি পটে আঁকা দেবী মূর্তির উপর একটি খড়্গ রাখিয়া যথারীতি বড় ঠাকুরুন পূজা হইয়া থাকে এবং এইদিন হইতে বিজয় দশমী তিথি পর্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত ঐপট পূজা হইয়া থাকে। শারদীয়া চতুর্থী তিথিতে মেজ ঠাকুরুণ ও সপ্তমী তিথিতে ছোট ঠাকুরুনের অনুরূপ পটে অঙ্কিত মূর্তি পূজা হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ষষ্ঠী তিথি পর্যন্ত উক্ত তিন দেবীর দুর্গামণ্ডপের বাহিরের বারন্দায় স্থাপন করিয়া পূজা করা হয়। সপ্তমী তিথিতে গোপাল সায়রের ঘাটে এবং দুর্গা মণ্ডপের বাহিরের বারন্দায় পূজার পর খড়্গ সহ ঐ তিনটি পটকে দুর্গা-মণ্ডপের মধ্যে স্থাপন করিয়া চারদিনব্যাপী মৃন্ময়ী দেবীর সহিত সাড়ম্বরে পূজাদি করা হয় এবং বিজয়া দশমীর দিন এই তিনটি পটকে বিসর্জন দেওয়া হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে মৃন্ময়ী দেবীর মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় না; উহার নিত্যপূজা। প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজা উপলক্ষে নূতন কাপড়ের উপর নির্দিষ্ট শিল্পী দিয়া পটগুলি অঙ্কণ করান হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিষ্ণুপুর গড়ের সংলগ্ন মূর্চ্ছার পাহাড়ের উপর স্থাপিত কামানের তোপধ্বনি শুনিয়া ও অগ্নিশিখা দর্শন করিয়া মল্লভূমের অধিবাসীরা শারদীয়া মহাপূজার মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণ পালন করিয়া থাকেন। ইহা এক প্রাচীন রীতি এবং স্থানীয় অঞ্চলের লোকজন ইহাকে 'মল্লের-রা' বলিয়া থাকেন। বিষ্ণুপুর হইতে প্রায় আট মাইল দূরে তীরবঁক গ্রামের মহাদণ্ড উপাধিধারী মাডড়-রা বংশানুক্রমে মহানবমী তিথিতে উক্ত কামানে অগ্নি সংযোগ করিয়া থাকেন। শোনাযায় একবার মাডড়-রা নবমী তিথিতে কামানে অগ্নি সংযোগ করিতে অস্বীকার করিলে দেবী স্বয়ং পাগলীর বেশ ধারণ করিয়া জনৈক মহাদণ্ডকে কামানে অগ্নিসংযোগ করিতে আদেশ করেন।

পূর্বে মৃন্ময়ী দেবীর নিকট পশুবলি এমন কি নরবলিও

দেওয়া হইত ; কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজ পরিবার বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিবার পর হইতে দেবীর নিকট জীব হত্যা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

মৃন্ময়ী দেবীর শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান খচ্চরবাহিনীর পূজা। শারদীয়া মহানবমীর গভীর রাত্রে দুর্গামণ্ডপে মহামারীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী খচ্চরবাহিনীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দেবী পটে আঁকা মূর্তি সারা বৎসর বিষ্ণুপুর রাজ অন্তঃপুরে অতি গোপনে রক্ষিত থাকে। এই মূর্তি বিষ্ণুপুরের মহারাজা ও তাঁহাদের কুল পুরোহিত ব্যতীত অন্য কাহারও দর্শন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কথিত আছে অন্য কেহ ঐ মূর্তি দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য। প্রতিদিন রাজবাড়ীতে খচ্চর বাহিনী দেবীর পূজা হয়। কেবলমাত্র শারদীয়া নবমী তিথির রাত্রে দেবীর পট রাজবাড়ী হইতে মৃন্ময়ী দেবীর পূজামণ্ডপে আনিয়া পিছন দিক হইতে যথারীতি পূজার পর ঐ রাত্রেই পুনরায় রাজবাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

খচ্চরবাহিনী পূজা সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, একদা নিশুতি রাত্রে মল্লরাজ বীর হাম্বীর লক্ষ্য করেন যে, জনৈক রমণী খচ্চরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দুর্গের বাহিরে চলিয়া যাইতেছেন। মল্লরাজ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দুর্গের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিলেও তিনি রাজাদেশ উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া রাজা একের পর এক তাঁহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে থাকেন ; কিন্তু তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে তাঁহার নিক্ষেপিত প্রতিটি তীর ঐ নারী অবলীলাক্রমে খাইয়া ফেলিতেছে। এইরূপ ঘটনায় বিচলিত হইয়া তিনি তাঁহার আরাদ্ধ মৃন্ময়ী দেবী নাম স্মরণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেবী মূর্তি অদৃশ্য হইয়া যায় এবং তাহার পরিবর্তে এক দৈব বানীতে রাজা জানিতে পারেন যে, দেবী মৃন্ময়ী মহামারীর মূর্তি ধারণ করিয়া দুর্গের বাহিরে চলিয়াছেন। তদবধি শারদীয়া মহাষ্টমীতে খচ্চরবাহিনীর পূজা হইতেছে। শোনাযায়, সেইসময় হইতে অদ্যাবধি বিষ্ণুপুর কেল্লার মধ্যে কখন মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয় নাই।

মৃন্ময়ী দেবীর পূজা উপলক্ষে 'রাবণ বধ' নামে একটি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্ব উপলক্ষে অনেকে মুখে মুখোস আঁটিয়া শ্রীরামচন্দ্রের বান্ধব হনুমান, সুগ্রীব, জাম্বুবান, বিভীষণ ইত্যাদি বেশ ধারণ করিয়া বাদ্যভাণ্ডসহ নাচ-গান করিয়া বেড়ান। নবমীর দিন ইন্দ্রজিৎ বধ, কুম্ভকর্ণ বধ, ও দশমীর দিন দশানন রাবণের এক বিশাল মূর্তি নির্মাণ করিয়া রাত্রিকালে রঘুনাথজীউর মন্দিরের সম্মুখে রাবণবধ পর্ব পালন করা হয়। এই পর্ব প্রত্যক্ষ করিতে অগণিত নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে।

বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারের আর একটি বিশিষ্ট উৎসব ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিতে ইন্দ্রপূজা বা ইন্দ্র পরব। শোনা যায়, ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিতে আদিমল্ল রঘুনাথ রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং এবং এই দিন হইতেই মল্লাব্দ গণনা করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ১লা ভাদ্র তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে নিকটবর্তী বনভূমি হইতে একটি শাল বৃক্ষকে ছেদন করিয়া আনা হয়। ইহাকে ইন্দ্ কাঠ বলে। ইন্দ্ কাঠটিকে বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী 'ইন্দ্তলা' নামক নির্দিষ্ট স্থানে পুঁতিয়া ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিতে সাড়ম্বরে পূজা ও উৎসব পালন করা হয়। উৎসবে পৌরাহিত্য করেন মহাপাত্র উপাধিধারী বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারের কুল পুরোহিত। উৎসবের দিন তিনি রাজবাড়ী হইতে রাজাদিগের কুল দেবতা অনন্তদেব শালগ্রাম শিলা লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপরিবারের লোকজনসহ শোভাযাত্রা করিয়া উৎসব প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় সাঁওতাল সর্দারের বিষ্ণুপুর রাজ হলুদরংয়ের পাগড়ী ও কিছু অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। পূর্বে মল্লভূমের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সাঁওতাল নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়া নৃত্যগীত করিতেন। বলাবাহুল্য ইন্দ্র পরবের পূর্ব আড়ম্বর পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

বিষ্ণুপুর ভট্টপাড়ায় একটি প্রাচীন মন্দিরে মল্লেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি মল্লরাজ বীর হাম্বীর কর্তৃক ১৬২২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। একটি চতুষ্কোণ গৃহের উপর অষ্টকোণাকৃতি এক শিখর বিশিষ্ট মন্দিরটি মাকড়া পাথর দ্বারা নির্মিত। মন্দির প্রবেশদ্বারের উপর একটি পাথরের হস্তী ও শিলালিপি আছে। মন্দিরাভ্যন্তরের মেঝের উপর স্থাপিত উত্তরদিকে বিস্তৃত গৌরীপট্ট বেষ্টিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনি

মল্লেশ্বর শিব নামে খ্যাত। মন্দিরের পিছনদিকে বৃহৎ নহবৎখানা আছে।

মল্লেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে জলপূর্ণ একটি বাঁধানো চৌবাচ্চার মধ্যে জলেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ নিহিত আছে। ইহা ভিন্ন, এই স্থানে দুইটি ছোট ঘরে দুইটি শিবলিঙ্গ এবং একটি সুগঠিত দুর্গামণ্ডপ আছে। মল্লেশ্বর ও জলেশ্বর শিবের নিত্যপূজা হয়। পূর্বে খুব ধুমধামের সহিত গাজন উৎসব হইত; বর্তমানে মল্লেশ্বর শিবের গাজন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বিষ্ণুপুর গোপালগঞ্জ মহল্লায় বুড়োশিবের মন্দিরে এবং বোলতলা পাকড়া পাড়ায় ধুমধামের সহিত শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে বিষ্ণুপুরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে মাধবগঞ্জ হইতে পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট একটি বৃহৎ পিতলের রথে মদনগোপাল-জীউর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া এবং কৃষ্ণগঞ্জ হইতে অনুরূপ একটি পিতলের রথে লালজীউ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া রথ টানা হয়। এই রথ দুইটি বৃহদাকারের জন্য কেবলমাত্র রথতলা প্রাঙ্গণের মধ্যেই রথ টানা সীমাবদ্ধ থাকে।

ইহা ভিন্ন, বাহাদুরগঞ্জ মহল্লা হইতে পোকাবাঁধ পর্যন্ত স্থানীয় চৌধুরীদের একটি রথ টানা হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে প্রায় দশ সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং একটি মেলা বসে।

প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে বিষ্ণুপুর শহরে প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে এবং সাধারণের মন্দিরে ধুমধামের সহিত মনসা পূজা ও ঝাপান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট এই যে, উৎসবকালে বাঁকুড়ার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু গুনীন্ ও সাপের ওঝা শোভাযাত্রা সহকারে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া নানারূপ বিষধর সর্পের খেলা দেখাইয়া থাকে। শোভাযাত্রাকালে কেহ চতুর্দোলায় চড়িয়া, কেহ গরুরগাড়ীর উপর বসিয়া, কেহ চাকা লাগান কাঠের ঘোড়া বা বাঘের পিঠে চড়িয়া আবার কেহবা মোটরবাসের ছাদে চড়িয়া, হাতে, মাথায়, গলায় বিষধর সর্প বেষ্টন করিয়া নানারূপ সাপের খেলা দেখাইয়া থাকেন। এই শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করিতে বহু নরনারীর সমাগম হয়।

প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে স্থানীয় বাউরী সম্প্রদায় বড়ামপূজা করিয়া থাকেন। বড়ামপূজা উপলক্ষে একটি নির্দিষ্ট স্থানে মাটির বেদীর উপর বড় বড় মাটির হাতি ঘোড়া স্থাপন করিয়া বড়াম দেবতার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বড়ামপূজার জন্য কিছু দেবোত্তর জমিও আছে।

মদনমোহন মন্দিরের নিকট বুড়াধর্মরাজ মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর জীমূতবাহন পূজা অনুষ্ঠিত হয়। জীমূতবাহনের পূজারী পণ্ডিত উপাধিধারী আচার্য ব্রাহ্মণ। জীমূতবাহনের নিকট উচ্চ বর্ণের হিন্দু এমন কি ব্রাহ্মণেরাও পূজাদি দিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন, শহরে বিভিন্ন পল্লীতেও জীমূতবাহন পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পূজাস্থানে একটি বড় গাছের ডাল পুঁতিয়া তাহার নীচে শিয়াল ও শকুনের ছোট মৃন্ময় মূর্তি রাখিয়া রাত্রি চারি প্রহরে চারিবার পূজা হয়। এই সকল পল্লীতে উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণেরা পূজা করিয়া থাকেন। ভিজান মটরকড়াই, শশা, ঝিঙা, পাটালী, মুড়কি ইত্যাদি নৈবেদ্য দিয়া সাধারণতঃ জীমূতবাহনের পূজা দেওয়া হয়।

ভাদ্র মাসে মন্থন ষষ্ঠী তিথিতে গৃহস্থরা নিজ নিজ গৃহের ঘোল মন্থনের দণ্ডটিকে নিকটবর্তী কোন পুকুরপাড়ে পুঁতিয়া বিভিন্ন পল্লীতে গৃহস্থেরা পূজা করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুর লালবাঁধের নিকট সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি মন্দিরে একটি বেলগাছতলায় সর্বমঙ্গলা দেবীর দ্বিভুজা মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বেলগাছটি শাখা-প্রশাখা মন্দিরের ছাদ ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। মন্দিরের অপর একটি ঘরে একটি ছোট শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। সর্বমঙ্গলাদেবীর নিত্যপূজা হয়। সর্বমঙ্গলা মন্দিরের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত।

বিষ্ণুপুরের স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায় অতি প্রাচীন কাল হইতে মহাধুমধামের সহিত মহরম পর্ব পালন করিয়া আসিতেছেন। মহরম পর্ব উপলক্ষে প্রতি বৎসর তাজিয়াসহ শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই শোভাযাত্রা শহরের নানা পথ পরিভ্রমণ করিয়া বিষ্ণুপুর রাজদরবার প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এইস্থানে মহারাজকে লাঠিখেলা, ছোরা খেলা ও তাজিয়া প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। বিষ্ণুপুরের রাজারা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধানকে পুরস্কার দান করিয়া সম্মানিত করেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাপি এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। বিষ্ণুপুর শেখ-পাড়ায় একটি মসজিদ এবং কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লায় একটি ঈদ্‌গা আছে।

ইহা ভিন্ন, বিষ্ণুপুর শহরের বিভিন্ন মহল্লায় কয়েকটি পীরের দরগা আছে। তন্মধ্যে বাহাদুরগঞ্জ মহল্লায় কুরমান সাহেব পীরের দরগাটি প্রাচীন ও বিশেষ প্রসিদ্ধ। শোনা যায়, বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে কুরমান সাহেব জীবিত ছিলেন এবং রাজদরবারে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে নানারূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। মহারাজ বীর হাম্বীরের যত্নে বাহাদুরগঞ্জ মহল্লায় কুরমান সাহেব পীরের দরগাহটি নির্মিত হয়। অদ্যাপি এই দরগায় পীরের উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় হাজত পূজাদি দিয়া থাকেন। প্রধানতঃ গৃহপালিত পশু-পক্ষীর অসুখ-বিসুখ, গাছপালার ফলধারণ ইত্যাদির জন্য পীরের দরগায় মানত জানান হয়। পীরের নিকট গাঁজার কল্কে, পাটালী গুড়, দুধ ও সিন্নি মানত করা হয়।

বাউড়ীপাড়ায় কুলুপুকুরের নিকট ঘোড়ালীপীরের, ও কৃষ্ণবাঁধের নিকট সত্যপীরের আস্তানা আছে। তাহা ছাড়া, হাজরাপাড়ায় একটি বটগাছের নীচে সত্যপীরের প্রতীক স্বরূপ কয়েকটি মাটির হাতী-ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

ছোট বাঁকাদহ গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে গ্রামের বিষ্ণুমন্দির সংলগ্ন স্থানে দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় গ্রাম ব্যতীত ছোট বাঁকাদহ, বেলশুনিয়া প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দেড় সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, খেলনা, চা-পান-বিড়ি প্রভৃতির জিনিসপত্র আমদানী হয় এবং দশ-পনর জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ বিষ্ণুপুর ও গড়বেতা হইতে প্রতি বৎসর আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় চারি-পাঁচশত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

রাধানগর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে গঙ্গাধর শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে গ্রামে যাতায়াতের প্রধান রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রায় দশ বিঘা জমির উপর পাঁচদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত লায়েকবাঁধ, উড়া, উলিয়াড়া, দ্বারিজ, অযোধ্যা, পাচাল, মাণিকবাজার, বিষ্ণুপুর শহর প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তের সহস্র নরনারী মোটরগাড়ী, গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, লাঙ্গল-জোয়াল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতির প্রায় দুইশত দোকান বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে এবং রামায়ণগান ও যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় এক সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

চাঁচর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে চণ্ডীমণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর চারিদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় এক সহস্র বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত বাঁকাদহ, মাড়ার, বেলশুনিয়া প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী মোটরবাস ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, দা-কুড়ুল, মাটির খেলনা-পুতুল ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকান ব্যতীত পাঁচ-সাতজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা বাঁকাদহ, বিষ্ণুপুর, পাঁচমুড়া প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট কোন প্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্ম তিনদিনব্যাপী গড়ে প্রত্যহ প্রায় এক সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

পৌষসংক্রান্তির মেলা

পচাডহরা গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পৌষসংক্রান্তি উৎসব উপলক্ষে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

কুচিয়াকোল, মাগুরা, শিবেরডাঙ্গা, ভেদো, বেনেবাঁদী প্রভৃতি গ্রামগুলি হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় সাতশত নর-নারীর সমাগম হয়। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, কাঠের আসবাবপত্র, মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি ইত্যাদি জিনিসপত্রের দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ আশপাশের গ্রাম হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্ম যাত্রা, কবিগান, কীর্তন-গান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে।

মড়ার গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পৌষসংক্রান্তি উৎসব উপলক্ষে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর চারিদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত বাঁকদহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চারি-পাঁচশত নরনারী প্রধানতঃ গরুরগাড়ী ও মোটরবাসে করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা ও মনিহারীর কয়েকটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রা এবং কবিগানের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মড়ার গ্রামে অনুষ্ঠিত মহরমের মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

রামনবমীর মেলা

তুড়্‌কী সীতারামপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রামনবমী উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত বিষ্ণুপুর শহর, মড়ার, কাঁটা-বাড়ী, সাতমৌলী, রামসাগর, বাঁকাদহ, বেলশুনিয়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় নয়-দশ সহস্র নরনারী মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, গরুরগাড়ী, রিক্সা ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, মাটি ও কাঠের খেলনা, মাদুর প্রভৃতির জিনিসপত্রের প্রায় দুইশত দোকান বসে। মেলার বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্ম নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকে।

রথযাত্রার মেলা

ভড়া গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তে প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর দুইদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, বাসনকোসন, মনিহারী, বই-ছবি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি-খেলনা প্রভৃতির প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য রামায়ণগানের ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় তিনশত শ্রোতার সমাগম হয়।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ রাউৎখণ্ড।১৭।১,০২৫·১৬।৩৫৫।১,৮২৫

(ক) ব্রাহ্মণ, একাদশ তিলি, কায়স্থ, সদ্গোপ, কামার, মোদক, গন্ধবনিক, নাপিত, ছুতার, বাগ্দী, ডোম, মুচি, ময়রা, স্যাকরা, তাঁতি, জেলে ও মুসলমান। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, একাদশ তিলিপাড়া, কায়স্থপাড়া, সদ্গোপপাড়া, কামারপাড়া, তাঁতিপাড়া, জেলেপাড়া, বাগ্দীপাড়া, ময়রাপাড়া, ডোমপাড়া, মুচিপাড়া, স্যাকরা-পাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে তেইশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) কুম্ভস্থল বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে জেলাবোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসাপূজা। উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে নাট্ মন্দির সহ একটি মনসা মন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে মনসার শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহা ব্যতীত, গ্রামে তিনটি শীতলা আছে।

শ্রীহরিপদ সামন্ত, প্রধান শিক্ষক,
রাউৎখণ্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ভগলাদিঘী, বাঁকুড়া।

২। গ্রাম ঃ রাজগ্রাম।৩৪।৪৮৭·১৯।২৩০।১,২৫২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, সদ্গোপ, মুচি, মাঝি ও হাড়ি। গ্রামটিতে বোসপাড়া, ঘোষপাড়া, মুচিপাড়া, হাড়ীপাড়া প্রভৃতি নামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে জয়রামবাটী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীমোহিনী মোহন মোদক, শিক্ষক,
রাজগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রাজগ্রাম, বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম ঃ সলদা।৩৫।১,২৫৪·৮৯।৪৫৭।২,৪১৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, বৈদ্য, ডোম, বাগ্দী, সদ্গোপ, কলু, ধোপা, কামার, কুমার, নাপিত, ময়রা, জেলে, বাউরী, তাঁতি ও মুচি। গ্রামটিতে বাউরীপাড়া, রায়পাড়া, বাগ্দীপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, কায়স্থপাড়া, সদ্গোপ-পাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে সলদা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ শনি-মঙ্গল-বার রক্ষাকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উইঢিবির নিকট মাটির হাতী-ঘোড়া ও মূর্তি স্থাপন করিয়া পাঁচদিনব্যাপী যথারীতি পূজা এবং শেষ দিনে হরিনাম সংকীর্তন ও ধুলট উৎসব হয়। বাউরী সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি রক্ষাকালী পূজা করিয়া থাকেন। ঘট আনিবার সময় ঘাট হইতে পথের মধ্যে বহু ভক্ত ও মানতকারী স্নান করিয়া পথের উপরই পড়িয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, যাহাদের মানত সিদ্ধ হইবে কেবলমাত্র তাহাদের উপরই ঘটের জল পড়িয়া থাকে। পূজার শেষে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রক্ষাকালীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে সাতদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) একটি কুসুম বৃক্ষের নীচে রক্ষাকালীর নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত চল্লিশটি শিব এবং উনত্রিশটি মনসা আছে।

শ্রীঅনিল বরণ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ সলদা, বাঁকুড়া।

৪। গ্রাম ঃ জয়পুর।৩৬।৫৭৪'৩৪।২৪৬।১,১১০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, লোহার, তাঁতি, সুবর্ণবনিক, বাউরী, মেটে, তাম্বুলী, কলু, শুড়ি, কামার, ধোপা ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে অহল্যাবাঈ রোডে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব ও শিবের গাজন, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, কার্তিকপূজা এবং রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাস উৎসবটি স্থানীয় সুবর্ণবনিক সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত হইলেও সর্বসাধারণ ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে পাঁচদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির এবং একটি বিষ্ণু-মন্দির ব্যতীত বাবাঠাকুর, মনসা এবং শীতলা আছে।

শ্রীহরিসাধন সামন্ত, প্রধান শিক্ষক,
জয়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৫। গ্রাম ঃ গোকুলনগর।৪৩।১৫৮'৫৬।৫৫।২৬৫

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, সদ্‌গোপ, বাগ্দী, কুমার, মুচি ও বাউরী। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, বাগ্দীপাড়া, ডোমপাড়া, কুমারপাড়া, মুচিপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, বাউরী-পাড়া, গোয়ালাপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে সলদাগামী মোটর-বাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন, এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে চব্বিশপ্রহর নামকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসবটি প্রতি বারো বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় চারি-পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে পাঁচদিন।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমায় দোলযাত্রার মেলায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় পনর-কুড়ি হাজার নরনারী গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া মেলায় আসেন।

(চ) গ্রামে প্রস্তর নির্মিত শিবমন্দির এবং তৎ-সম্মুখস্থিত নাটমন্দির ব্যতীত দুইটি মনসা আছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখা।

৬। গ্রাম ঃ ফুটকরা (মৌজা ঃ চামট)।
৪৫।১৭৮'০৭।৬৮।৩৬৫

(ক) ব্রাহ্মণ, তিলি, মাঝি, বাগ্দী, মাহুর ও কামার।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে কোতুলপুর রুটের মোটরবাসে রাজগ্রামে নামিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসাপূজা ও হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব এবং পৌষ মাসে লক্ষ্মীপূজা হয়। ইহা ছাড়া, গ্রামে ভৈরবপূজা ও বেলবনীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মনসাপূজাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মহোৎসবের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে নয়দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে খড়ের ছাউনীযুক্ত একটি বিষ্ণুমন্দির ব্যতীত দুইটি মনসা ও ভৈরব ঠাকুর আছে। মনসারূপে পূজিত শিলামূর্তিটি কোন বৌদ্ধদেবী বলিয়া অনুমান করা হয়।

শ্রীঅমর শঙ্কর ভট্টাচার্য, শিক্ষক,
লেগো হাই স্কুল, বাঁকুড়া।

৭। গ্রাম ঃ দিগপাড়।৫৬।৩৬৮'৮৬।১৫৭।১০৩

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, একাদশ তিলি, মাঝি, বাগ্দী, নাপিত, কুমার, মহাদণ্ড, কলু ও ডোম। গ্রামটিতে বামুনপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, সামুইপাড়া, পানপাড়া, নন্দীপাড়া, মদ্যাপাড়া, কোলেপাড়া, কুমারপাড়া, কলুপাড়া, মাদড়পাড়া, ঘোষপাড়া, বাগ্দীপাড়া, ডোমপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরি।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে অহল্যাবাঈ রোড দিয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, প্রতি দশ-বারো বৎসর অন্তর ধর্মঠাকুর শঙ্কাসুরের গাজন আড়ম্বরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে তিন-চারিদিন-ব্যাপী।

কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিনের জন্য। গাজনের মেলাটি প্রায় দুইশত এবং কালীপূজার মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে প্রস্তর নির্মিত একটি শিবমন্দির, মনসামন্দির ও কালীমন্দির ব্যতীত পাঁচটি বিষ্ণুমন্দির আছে। বিষ্ণুমন্দিরগুলির মধ্যে চারিটি প্রস্তর নির্মিত এবং একটি ইষ্টক নির্মিত। ইহা ব্যতীত; গ্রামে ব্যক্তি বিশেষের দুইটি শিবমন্দির এবং আটটি মনসা আছে।

শ্রীরামকিশোর মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ দিগপাড়,
বাঁকুড়া।

৮। গ্রাম ঃ কুচিয়াকোল।৪৮।৭৮৯'৮৪।৪৮০।২,২৬১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, একাদশ তিলি, সদ্‌গোপ, বাউরী, বাগ্দী, হাড়ি, লায়েক, বারুজীবি, জেলে, ছুতার, তাম্বুলী, ডোম, মুচি, শুঁড়ি, গোয়ালা, কামার, নাপিত, কলু, তাঁতি ও মালাকার। গ্রামটিতে বাজারপাড়া, সেনাপতিপাড়া, উত্তরপাড়া, ভুষণপাড়া, বাউরীপাড়া, জেলেপাড়া, মোড়লপাড়া, লাবুপাড়া, বাগ্দীপাড়া, গোয়ালাপাড়া ইত্যাদি নামে চৌদ্দটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে জয়পুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রাধাবিনোদজীউর রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন। বিষ্ণুপুরের স্বনামধন্য রাজা গোপাল সিংহ স্থানীয় ভগবত বিদ্যাভূষণকে রাধাবিনোদজীউ বিগ্রহ এবং তৎসহ কিছু ভূসম্পত্তি দান করিয়া তাঁহাকে কুচিয়াকোল গ্রামে বসবাস করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদাবধি তাঁহাদের বংশানুক্রমে রাধাবিনোদজীউর নিত্যপূজা ও উৎসব পরিচালনা করিতেছেন। রথযাত্রা উপলক্ষে প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চ লৌহ নির্মিত একটি রথে রাধাবিনোদজীউর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া রথের দড়ি টানা হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে প্রস্তর নির্মিত একটি মন্দিরে রাধাবিনোদজীউর যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, পাঁচটি শিব, একটি শীতলা ও চারিটি মনসা আছে।

শ্রীপ্রভাকর ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
সাগরডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কুচিয়াকোল, বাঁকুড়া।

৯। গ্রাম ঃ গোপালনগর।৭৬।১,২৪৮'১৫।২৬৪।১,৩০০

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, একাদশ তিলি, ধীবর, লোহার, বাউরী, নমঃশূদ্র, ময়রা, মেটিয়া ও তাঁতি। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, মালপাড়া, জেলেপাড়া, বাউরীপাড়া, তেলীপাড়া ও তাঁতিপাড়া প্রভৃতি নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে প্রস্তর নির্মিত একটি প্রাচীন মন্দিরে কালাচাঁদজীউ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের প্রস্তরময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীরাধাবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়, চাকুরী,
গ্রাম ও পোঃ গোপালনগর,
বাঁকুড়া।

১০। গ্রাম : শ্যামনগর।৮৪।৩২৫'৪১।৮০৬।৫৫৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, গন্ধবণিক, তাম্বুলী, ময়রা, একাদশতিলি, ছুতার, কামার, কুমার, বৈরাগী, শুঁড়ি, লোহার, মেটে, বাউরী ও ডোম। গ্রামটিতে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে কোতলপুর রুটের মোটরবাসে মাচানতলা নামিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। ফাল্গুন মাসে দুই-তিনদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে নিতাই-গৌর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গ্রামে প্রস্তর নির্মিত একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার দেওয়াল গাত্রে সুন্দর কারুকার্য-খচিত আছে।

শ্রীদুর্গাপদ পাঁজা, প্রধানশিক্ষক,
শ্যামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : হিরাপুর, পোঃ সলদা,
বাঁকুড়া।

১১। গ্রাম : গেলিয়া।১১০।৩৫২'৭৪।২১৬।১,০৮৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, তিলি, কামার, বাগ্দী, হাড়ী, ডোম, ছুতার, তাঁতি, কলু, ধোপা, জেলে, নাপিত, চণ্ডাল, মুচি, লোহার, গোয়ালা ও ছত্রিক্ষত্রিয়। গ্রামটিতে বৈষ্ণবপাড়া, উত্তরপাড়া, চৌধুরীপাড়া, দেওয়ানপাড়া, খাঁপাড়া, হাড়ীপাড়া, ডোমপাড়া ইত্যাদি নামে মোট দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর এবং মোটরবাস ষ্ট্যাণ্ড গেলিয়া-বটতলা হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গণেশপূজা, শিবের গাজন, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা উৎসব, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে বিশ্বকর্মা-পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা ও কালীপূজা এবং রাসযাত্রা উৎসব, পৌষ মাসে রক্ষাকালীপূজা, শীতলাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব, চব্বিশ প্রহর হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব ও নবকুঞ্জ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দশহরার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে ছয়-সাতদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ইষ্টক নির্মিত সুন্দর রাসমণ্ডপসহ গোপীনাথজীউমন্দির দুইটি দুর্গামণ্ডপ, একটি বিষ্ণুমন্দির, একটি মনসামন্দির, একটি শিবমন্দির, একটি শীতলামন্দির, একটি রঘুনাথমন্দির এবং একটি শান্তিনাথমন্দির আছে।

শ্রীপ্রভাকর দে, প্রধান শিক্ষক,
দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গেলিয়া, বাঁকুড়া।

১২। গ্রাম : দামদীঘি। ১১৩।৩৩০'১৬।৭৮।৩০৭

(ক) ব্রাহ্মণ, একাদশতিলি, বাগ্দী, বাউরী ও মুচি। গ্রামটিতে পূর্বপাড়া ও পশ্চিমপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর এবং বাসষ্ট্যাণ্ড দামদীঘি হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন উৎসব।

(ঙ) দশহরার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

প্রধান শিক্ষক,
দাসদীঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গেলিয়া, বাঁকুড়া।

১৩। গ্রাম : উত্তরবাড়। ১২৭।১,৬৪৭·৫৬।৩৭৭।১,৮৫৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গন্ধবণিক, সদ্গোপ, কামার, কুমার, নাপিত, জেলে, বারুই, ছুতার, গোয়ালা, বাগ্দী, মাঝি, হাড়ী, মুচি, কলু ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে অনেকগুলি পাড়া আছে। যথা—মণ্ডলপাড়া, নিয়োগীপাড়া, পরামাণিকপাড়া, চৌধুরীপাড়া, বাগ্দীপাড়া, ছুতারপাড়া, বারুইপাড়া, জেলেপাড়া, ঘোষপাড়া, সাঁওতালপাড়া, মুচিপাড়া, নাপিতপাড়া, মাঝিপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে জয়রামবাটী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের শারদীয়া তিথিতে ঝগড়াভঞ্জনী নামে এক গ্রাম্য দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ঝগড়াভঞ্জনীদেবীর পূজা দুর্গাপূজার অনুরূপ। পূজাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) ঝগড়াভঞ্জনীপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে প্রস্তর নির্মিত উত্তরমুখী একটি প্রাচীন মন্দিরে ঝগড়াভঞ্জনীদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার সন্নিকটেই একটি শিবমন্দির আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে একটি শীতলা ও তিনটি মনসা আছে।

শ্রীহরিশংকর দে, প্রধান শিক্ষক,
উত্তরবাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বৈতল, বাঁকুড়া।

১৪। গ্রাম : দক্ষিণবাড়। ১৩৪।১,৩০০·৬৯।৩৭৯। ১,৯৪৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্গোপ, কামার, ময়রা, গোয়ালা, জেলে, তাম্বুলী, বাগ্দী, মাঝি, ডোম, হাড়ী, মুচি, মেটে ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে একত্রিশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে জয়রামবাটী রুটের মোটরবাসে বাঁকাদহ নামিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বাঁকারায় নামে খ্যাত শিবের গাজন, জ্যৈষ্ঠ মাসে শীতলাপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা ও উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ইষ্টক নির্মিত সম্মুখে বাঁধান চত্বরযুক্ত দক্ষিণমুখী একটি মন্দিরে বাঁকারায় নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, দুইটি পঞ্চানন্দ, দুইটি শীতলা এবং বারোটি মনসা আছে।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র রায়, প্রধান শিক্ষক,
বৈতল জুনিয়র হাইস্কুল সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

১৫। গ্রাম : রোহিলাকোন। ১৩৫।১৯১·১৫।১১৫। ৬৯২

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, লায়েক, কামার, কুমার, কলু, নাপিত ও তাঁতি। গ্রামটিতে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে জয়রামবাটী রুটের মোটরবাসে বাঁকাদহ নামিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা উৎসব উপলক্ষে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) দশহরার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন।

শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিন। মেলা দুইটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির ব্যতীত বিষ্ণু, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুরের কাঁচা মন্দির আছে।

শ্রীমহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
ধাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঁকুড়া।

উৎসব বিবরণী

ঝগড়াভঞ্জনীপূজা

উত্তরবাড় গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের শারদীয়া তিথিতে সাড়ম্বরে ঝগড়াভঞ্জনী নামে এক গ্রাম্য দেবীর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রস্তর নির্মিত উত্তরমুখী একটি প্রাচীন মন্দিরে ঝগড়াভঞ্জনীদেবী নামে খ্যাত শিলায় খোদিত দশভুজা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নিত্যপূজা ব্যতীত শারদীয়া সপ্তমী তিথি হইতে বিজয় দশমী তিথি পর্যন্ত চারিদিনব্যাপী চণ্ডীর ধ্যানে ঝগড়াভঞ্জনীদেবীর পূজা হয়। উৎসব উপলক্ষে আশপাশের গ্রাম হইতে বহু নরনারী মন্দিরে মানসিক পূজাদি দিতে আসেন। মানসিক করিয়া অনেকে দেবীর উদ্দেশ্যে ছাগ বলি দেন। বিজয়া দশমীর দিন মন্দির প্রাঙ্গণে 'কাদামাটি' খেলা হয়। এই পর্ব উপলক্ষে সাতটি পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া মন্দির প্রাঙ্গণ কর্দমাক্ত করিয়া নরনারী নির্বিশেষে কাদামাটি খেলিয়া থাকেন। উৎসবটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। এই প্রসঙ্গে কিংবদন্তী আছে যে, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে বিষ্ণুপুরের মল্ল বংশী জনৈক রাজা ঘাটালের নিকটবর্তী বেতবরদা নামক স্থান অধিকারের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলে বনমধ্যে একটি জলাশয়ে ক্রীড়ারত এক কৃষ্ণবর্ণ বালিকা দেখিতে পান; কৌতুহলবশতঃ তিনি উক্ত জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে হঠাৎ বালিকা অদৃশ্য হয় এবং তৎপরিবর্তে সেখানে একটি দশভুজা শিলামূর্তি দেখিতে পান। যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিবার পথে তিনি এইস্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া উক্ত দশভুজা মূর্তি স্থাপন করিয়া নিত্যপূজাদির ব্যবস্থা করেন। ইনি ঝগড়াভঞ্জনীদেবী নামে খ্যাত। শারদীয়া সপ্তমী তিথিতে তিনি ঐ মূর্তি দর্শন পান বলিয়া প্রতি বৎসর এই দিনেই দেবীর বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং দেবীর জলক্রীড়া স্মরণে অদ্যাপি কাদামাটি খেলা হইয়া থাকে।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

সলদা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রক্ষাকালীপূজা উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী রাউৎখণ্ড, শ্যামনগর, গেলিয়া প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী, পাল্কী এবং মোটরবাসে করিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়-জামা, ঝুড়ি-চুপড়ী এবং অন্যান্য নানাবিধ জিনিসপত্রের প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকানপাট বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, নাগরদোলার দল আসে এবং লেটোনাচ, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা, কবিগান, তর্জা ও যাত্রাভিনয় হয়। অনেকে জুয়া খেলিয়া থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় চারি সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

দিগপাড় গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির

উপর তিন-চারিদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত কুচিয়াকোল ও ময়নাপুর গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিনশত নরনারী সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, সতরঞ্চি এবং বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা নিকটবর্তী গ্রাম হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলার দল আসে এবং লাঠিখেলা, কুস্তি প্রতিযোগিতা ও যাত্রাভিনয় হয়। অনেকে জুয়া খেলিয়া থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় চারি-পাঁচশত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : দিগপাড় গ্রাম প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত কালীপুজার মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

দক্ষিণবাড় গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বাঁকারায় শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। সাধারণতঃ ময়রা, বাসনকোসন, মনিহারী, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, চা-পান-বিড়ি ইত্যাদির প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকান ব্যতীত চারি-পাঁচজন ফেরিওয়ালা আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য লাঠিখেলা, ধুনাখেলা, নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং লাঠিখেলা ও যাত্রাভিনয় হয়। অনেকে জুয়া ও লটারী খেলিয়া থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দেড় সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

ঝগড়াভঞ্জনীপূজার মেলা

উত্তরবাড় গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে ঝগড়া-ভঞ্জনীপূজা উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী জগন্নাথপুর, ময়নাপুর, গোপীনাথপুর প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামসমূহ হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী প্রধানতঃ গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। ময়রা, বাসনকোসন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা-চ্যাঙ্গারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকান ব্যতীত দশ-পনরজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ দক্ষিণবাড়, ময়নাপুর ও কোতুলপুর হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না। অনেকে মেলায় জুয়া ও লটারী খেলিয়া থাকেন।

মনসাপূজার মেলা

রোহিলাকোন গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা উৎসব উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী উত্তরবাড়, দক্ষিণবাড়, কসবা, মুরলীগঞ্জ, হাতবাড়ি, যাদবনগর, কৃষ্ণগঞ্জ, বাঁধাটি, শিলাকোন, কোন্দা, কুমকুমী, আমলাশোল, কল্লাইয়া, গোপীনাথপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে এমন কি মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার অন্তর্গত অনেক গ্রাম হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক নরনারী মোটরবাসে, গরুর-গাড়ীতে এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, জামা-কাপড়, কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোনপ্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। অনেকে লটারী খেলেন। যাত্রানুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ-সাত শত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : রোহিলাকোন গ্রামে অনুষ্ঠিত ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির মেলা উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

দাসদীঘি গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী শুকজোড়া, গেলিয়া, টানাদীঘি, সাঁইতাড়া প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের বহু নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, সস্তার বই-ছবি, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা-চ্যাঙ্গারী, মাটির পুতুল প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য লাঠিখেলা হয় এবং অনেকে লটারী খেলিয়া থাকেন।

গেলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থিত রাস্তার উভয় পার্শ্বে ছয়-সাত দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী মির্জাপুর, রাউৎখণ্ড, হেড়িয়া, সলদা প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে হিন্দু-মুসলমান-সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় শত নরনারী গরুর-গাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, কবিরাজী ঔষধ-পত্র, রেডিমেড জামা-কাপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় ও জুয়া খেলা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় চারি-পাঁচ শত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

রাউৎখণ্ড গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসাপূজা উপলক্ষে গ্রামের বাজারে এবং মন্দির সংলগ্ন জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী হেড়িয়া, শ্যামনগর, সলদা প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় চারি শত নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, চা-পান-বিড়ি প্রভৃতি জিনিস-পত্রের প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ জয়পুর ও ভগলদিঘী গ্রাম হইতে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

ফুটকরা গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসাপূজা উপলক্ষে প্রায় এক বিঘা দেবোত্তর জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ছয়শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

রাজগ্রাম, লবাসন, হাতগেড়িয়া, চামট, সুপুর, কুচিয়াকোল, সলদা প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্গত অধিকাংশ গ্রামসমূহ হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় সহস্রাধিক নরনারী সাধারণত গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, এ্যালুমিনিয়মের বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশের তৈয়ারী নানাবিধ জিনিসপত্র, চা-পান-বিড়ি প্রভৃতির প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা আশপাশের গ্রামসমূহ হইতে আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রা-ভিনয় ব্যতীত লটারী এবং জুয়া খেলা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ফুটকরা গ্রামে অনুষ্ঠিত মহোৎসবের মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

মহোৎসবের মেলা

শ্যামনগর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে মহোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় হরিবাসর সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর দুই-তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী রুইসহর, চ্যাংডবা, গোপালনগর, পদুমপুর, রাউৎখণ্ড, সলদা প্রভৃতি গ্রাম-সমূহ হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক নরনারী প্রধানতঃ গরুরগাড়ী, সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন,

ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদির কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ বিষ্ণুপুর, জয়পুর, চ্যাংড়া প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা আসে এবং কবিগান, পুতুলনাচ, ছবিনাচ, যাত্রাভিনয় ব্যতীত জুয়া ও লটারী খেলা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচশত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

দোলযাত্রার মেলা

গোপালনগর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী শ্যামনগর, জয়গড়িয়া, হামার, রণজিৎতলা, বিক্রমপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের দুই-তিনশত নরনারী সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের মাত্র পনর-কুড়িটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নানারূপ প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

রথযাত্রার মেলা

কুচিয়াকোল গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রাধাকান্তজীউর রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রথটানার নির্দিষ্ট পথের উভয়পার্শ্বে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিন-শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় স্থানীয় লোকজন ব্যতীত বিষ্ণুপুর, ময়নাপুর, জয়পুর ও সলদা প্রভৃতি স্থান হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় পনর সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। এবং ময়রা, বাসনকোসন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা, মাটির পুতুল প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী ময়নাপুরের অধিবাসী। তাহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং খেলাধূলা, কীর্তনগান, জলসা ও যাত্রাভিনয় হয়। অনেকে জুয়া খেলিয়া থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

রাজগ্রাম গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে দুইদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের বহু নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বই-ছবি, ধামা-কুলা এবং অন্যান্য নানাবিধ জিনিসপত্রের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা আসে এবং বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

রাসযাত্রার মেলা

জয়পুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় গ্রামবাসীর প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত সলদা, কুচিয়াখোল রাউৎখণ্ড প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামসমূহ হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় চারি সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় প্রধানতঃ ময়রা, মনিহারীর প্রভৃতি জিনিসপত্রের কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। যাত্রাগানের দলগুলি সাধারণতঃ কলিকাতা, রামজীবনপুর এবং গড়বেতা হইতে আসে।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : মির্জাপুর। ৫৪।৮৯৫৩১।৪৭৩।২,৪৯৮

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, একাদশতিলি, ডোম, নাপিত, বাগ্দী, কলু ও মহন্ত। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, সদ্গোপপাড়া, তিলিপাড়া, ডোমপাড়া, নাপিতপাড়া, বাগ্দীপাড়া, কলুপাড়া এবং মহন্তপাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে রায়বাঘিনী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে পাঁচদিনব্যাপী।
দশহরার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে দুইদিন। মেলাগুলি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি শীতলা ও দুইটি মনসা আছে। ইহা ব্যতীত একটি প্রাচীন শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীক্ষুদিরাম মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম : মির্জাপুর, পোঃ জোত জয়রামপুর,
বাঁকুড়া।

২। গ্রাম : রায়বাঘিনী (মৌজা : মির্জাপুর)। ৫৪।৮৯৫৩১।৪৭৩।২,৪৯৮

(ক) ব্রাহ্মণ, বাউরী, গোয়ালা, মাঝি, মহন্ত, সাহা, ময়রা, ছুতার, সুবর্ণবণিক, শঙ্খবণিক, তাম্বুলী, কামার, তাঁতি, বাগ্দী, ডোম ও মুচি। গ্রামটিতে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, শঙ্খশিল্প, তাঁতশিল্প ও বাসনশিল্প।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে রায়বাঘিনী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে তিনদিনব্যাপী। শতাধিক বৎসরের প্রাচীন মেলা।
দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে পাঁচদিনব্যাপী।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, পাঁচটি বাবাঠাকুর, দুইটি শীতলা, ছয়টি মনসা, একটি রামেশ্বর নামে খ্যাত শিব এবং একটি পঞ্চানন্দ আছে।

শ্রী শ্রীপতিচরণ বিশ্বাস, চাকুরি,
গ্রাম : রায়বাঘিনী, পোঃ জোত জয়রামপুর,
ও
শ্রীনেপাল চন্দ্র ভাণ্ডারী, কৃষিকার্য,
গ্রাম : বড়্যাড়িয়া, পোঃ জোত জয়রামপুর,
বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম : কোতুলপুর ৮৮।১,৩৯৫ ৭৫।৪৬৪।২,৪৯৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বেনে, তিলি, সদ্গোপ, সুবর্ণ বণিক, ময়রা, বাগ্দী, হাড়ী, ডোম, মুচি ও মুসলমান। গ্রামে বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে অহল্যাবাঈ রোডের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন এবং কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, গ্রামে বাগ্দী সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তির গৃহে প্রতিষ্ঠিত যাত্রাসিদ্ধি ধর্মরাজ ঠাকুরের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে অন্নভোগ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে পনরদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন একটি শিবমন্দির এবং ইষ্টক নির্মিত প্রাচীন একটি রাসমন্দির ব্যতীত একটি শীতলা ও চারিটি মনসা আছে। জনশ্রুতি আছে, এই স্থানে গড় মান্দারণের ভূঁইয়া রাজা বীরেন্দ্র

সিংহের সহিত পাঠান সর্দার কতুল খাঁ যুদ্ধ হয় এবং গুপ্ত ঘাতকের হস্তে কতুল খাঁ নিহত হন। তাঁহারই নামানুসারে গ্রামটির নাম 'কোতুলপুর' হইয়াছে।

। কুমার কুণ্ডু, চাকুরি,
গ্রাম : গোলাপটি, পোঃ কৃষ্ণনগর নদীয়া,
ও
শ্রীকালাসোনা চক্রবর্তী, শিক্ষক
গ্রাম ও পোঃ কোতুলপুর, বাঁকুড়া।

৪। গ্রাম : কারকবেড়িয়া।৯১।০৮৫'০২।২১৯।১,১৪৮

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ ও মুচি। গ্রামটিতে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে অহল্যাবাঈ রোড দিয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং গত প্রায় বিশ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলায় সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী আসেন এবং কয়েকটি দোকানপাট বসে। মেলায় লটারী খেলার দল আসে।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ব্যতীত শীতলা আছে।

শ্রীনন্দ দুলাল পালাধি, শিক্ষক,
গ্রাম : গাংচিয়া, বাঁকুড়া।

৫। গ্রাম : সিহাস।১০০।৪৮২'৩৪।২১৯।১,২৭১

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, গন্ধবণিক, কামার, মোদক, ছুতার, কৈবর্ত, বাগ্দী, মাঝি, লায়েক, খয়রা, হাড়ী, মুচি ও ডোম। গ্রামে মুচিপাড়া, চক্রবর্তীপাড়া, মণ্ডলপাড়া, ঘোষালপাড়া, বাগ্দীপাড়া, ব্যাধপাড়া, সরকারপাড়া, চন্দ্রপাড়া, ঘোষপাড়া, কৈবর্তপাড়া, কামারপাড়া, বেনেপাড়া, মাঝিপাড়া, চৌধুরীপাড়া, লায়েকপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে বনমুখা বাসষ্ট্যাণ্ডে নামিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা ১২৮৭ সনে গ্রামে মহামারী নিবারণের জন্য গ্রামবাসীগণ চব্বিশ প্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসবের প্রচলন করেন। তদবধি প্রতি বৎসর গ্রামে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসব দুইটি প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে তিনদিন। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

মহোৎসবের মেলা মাঘ মাসে চারিদিন।

(চ) গ্রামে ব্যক্তি বিশেষের একটি মন্দিরে বংশীধারী-জীউ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এবং কচ্ছপাকৃতি শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, অষ্টধাতু নির্মিত শীতলা, একটি মনসা, একটি যোগিনী, একটি নবগ্রহ, একটি জরাসুর, দুইটি রাধামাধব এবং দুইটি শ্যামসুন্দর ও বারোটি শালগ্রাম শিলা আছে।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ রায় প্রতিহার, শিক্ষক,
গ্রাম : সিহাস, পোঃ কোতুলপুর, বাঁকুড়া।

৬। গ্রাম : বড়পুকুর (মৌজা : লাউগ্রাল)।
১০৩।১,৮২২'৩১।৫৩৩।১,৮৭৮

(ক) সদ্‌গোপ।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনীযুক্ত একটি বিষ্ণুমণ্ডপ ব্যতীত একটি গুড়গুড়ি পঞ্চানন্দ এবং মনসা আছে।

গ্রামের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর চারিপাশে লোকবসতি গড়িয়া উঠায় সম্ভবতঃ গ্রামের নাম "বড় পুকুর" হইয়াছে।

শ্রীরামকানাই মুখোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
বড় পুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কোতুলপুর, বাঁকুড়া।

৭। গ্রাম ঃ কোয়ালপাড়া।১২০।৬০৯·১৩।২০৫।৯৯৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কায়স্থ, তিলি, সদ্‌গোপ, কলু, মাঝি, বাগ্দী, হাড়ী, মুচি, গোয়ালা, জেলে ও মুসলমান। গ্রামে কুড়িটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর। তাজপুর রুটের মোটর-বাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা ও গাজন, জ্যৈষ্ঠ মাসে কালীপূজা ও দশহরা তিথিতে মনসা পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, পৌষ মাসে বাঁকুড়ারায় ধর্মরাজের বাৎসরিক পূজা ও অন্নসত্র উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির, দুর্গামণ্ডপ এবং একটি শীতলামন্দির ব্যতীত দুইটি পঞ্চানন্দ, একটি বাবাঠাকুর, দুইটি শীতলা এবং তিনটি মনসা আছে।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
দেওপাড়া চম্পামণি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দেওপাড়া, বাঁকুড়া।

৮। গ্রাম ঃ দেশড়া।১৩২।২,৯২৭·২৫।৫৬৪।৩,০৫৫

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, একাদশ তিলি, বর্গক্ষত্রিয়, মুচি, দুলে, হাড়ী, তাঁতি, কামার, কুমার ও নাপিত। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, তিলিপাড়া, বর্গক্ষত্রিয়-পাড়া, মুচিপাড়া, দুলেপাড়া, হাড়ীপাড়া, তাঁতিপাড়া, কামারপাড়া, কুমারপাড়া ও নাপিতপাড়া নামে এগারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে তাজপুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব এবং পৌষ সংক্রান্তিতে যাত্রাসিদ্ধিজীউর ভোগ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন। ইহাতে প্রায় চারি-পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, একটি মনসা এবং বাইশটি শীতলা এবং দুইটি শিব আছে।

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র রায়,
দেশড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দেশড়া, বাঁকুড়া।

৯। গ্রাম ঃ বালিঠা।১৪৪।১,৮৪১·৮৯।৪৬০।২,৪৬১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, কামার, কুমার, বাগ্দী, মাঝি, মুচি, ডোম, স্বর্ণকার, নাপিত, ভূমিজ ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা উৎসব, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, ভাদ্র মাসে বিশ্বকর্মাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা, মাঘ মাসে মকরস্নান এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) দশহরার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে সাতদিনব্যাপী।
মকরস্নানের মেলা। মাঘ মাসে চারদিনব্যাপী। শেষোক্ত মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বসন্তচণ্ডীমন্দির, রঘুনাথ ও রাধাদামোদর মন্দির এবং শিবমন্দির ব্যতীত মনসা, শীতলা ও কালী আছে।

শ্রীনন্দলাল পাল, প্রধান শিক্ষক,
বালিঠা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বালিঠা, বাঁকুড়া।

১০। গ্রাম ঃ জেগো।১৪৫।১,৫৮৭·৭৭।৫১১।২,৬৫৩

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, একাদশ তিলি, কামার, কুমার, ছুতার, মালাকার, নাপিত, স্বর্ণকার, কলু, গোয়ালা, বাগ্দী, দুলে, ডোম, তাঁতি, জেলে, সাঁওতাল, লায়েক, ময়রা ও মুচি। গ্রামে দুলেপাড়া, বাগ্দীপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরী।

(গ) রেলস্টেশন বিষ্ণুপুর হইতে গেলিয়া-কয়াপাট রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে রক্ষাকালী-পূজা ও গাজন উৎসব এবং মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে। মেলাটি প্রায় একশত পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল এবং টিনের ছাউনী বিশিষ্ট সাধারণের একটি মন্দির ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দ, একটি শীতলা, একটি বাবাঠাকুর এবং ছয়টি মনসা আছে।

শ্রীমদনমোহন কোলে, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ লেগো, বাঁকুড়া।

১১। গ্রাম : রামডিহা।১৫০।২৫৮·৫১।১০২।৪৬৬

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, কুমার, কামার, তাম্বুলি নাপিত, ডোম। গ্রামটিতে পশ্চিমপাড়া, কামারপাড়া, বাজারপাড়া ও পূর্বপাড়া নামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) বিষ্ণুপুর অথবা পিয়ারডোবা রেলস্টেশন হইতে বিষ্ণুপুর-জয়রামবাটী ভায়া বাঁকাদহ রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব ও হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসাপূজা এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে তিন-চারিদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ এবং ব্যক্তি বিশেষের গৃহে অষ্টধাতু নির্মিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, দুইটি মনসা ও একটি শীতলা আছে।

শ্রীকৃষ্ণগতি রায়, প্রধান শিক্ষক,
রামডিহা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বৈতল, বাঁকুড়া।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

কোয়ালপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে স্থানীয় কালীমন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই-তিন বিঘা জমির উপর সাতদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী কোতুলপুর, বালিঘা, নিহড়, গোপীনাথপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নরনারী প্রধানতঃ গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের মাত্র দশ-বারোটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং সাধারণতঃ প্রতি বৎসর রামজীবনপুর ও শোলা গ্রাম হইতে যাত্রাদল আসে।

মির্জাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে প্রায় চারি-পাঁচ বিঘা দেবোত্তর জমির উপর পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

নিকটবর্তী সাঁইতাড়া, রায়বাঘিনী, ধরমপুর, বাটায়ার পুরাঝোড়া, হয়ে, ডেহুয়াবনী, বড়গোড় প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দেড় সহস্র নরনারী প্রধানতঃ মোটরবাস, গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ কোতুলপুর, বিষ্ণুপুর, ব্রাহ্মণাহরি, রায়বাঘিনী, বালুবাটী, সাঁইতাড়া,

মুড়াকাটা প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, শাঁখা প্রভৃতি নানাবিধ জিনিসপত্রের প্রায় সত্তর-আশিটি দোকান বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা আসে এবং সং নাচ ও গানের আসর বসে। প্রায় পাঁচশত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: মির্জাপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত দশহরার মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

লেগো গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গাজন উপলক্ষে প্রায় এক বিঘা জমির উপর পক্ষকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় বারশত নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা, মাটির পুতুল, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদির প্রায় পনর-কুড়িটি দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কোতুলপুর এবং ময়নাপুর হইতে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং রামায়ণ গান, ধর্মপুরাণ গান ও যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় সাত-আটশত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

রামডিহা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রায় পাঁচ-সাত বিঘা জমির উপর তিন-চারিদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী গোপীনাথপুর, বৈতল, লেগো প্রভৃতি ইউনিয়নগুলির অন্তর্গত গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় সহস্র নরনারী মোটরবাস ও গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, বাসনকোসন, মনিহারী, বই-ছবি, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, কাপড়চোপড়, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, পান-বিড়ি প্রভৃতির প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা আশপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং লাঠি খেলা ও যাত্রাভিনয় হয়। অনেকে জুয়া খেলেন। যাত্রা দেখিতে প্রায় তিন-চারিশত লোকের সমাগম হয়।

মনসাপূজার মেলা

বড়পুকুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসাপূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

কোতুলপুর, মদনমোহনপুর, বামুনারী, খটনগর, লেগো, গোপাতা প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, বাসনকোসন, মনিহারী, মাটির খেলনা-পুতুল প্রভৃতির দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সাপুড়েরা সাপখেলা দেখাইয়া থাকেন ও লাঠি খেলার দল আসে।

দশহরা মেলা

বালিঠা গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে পুণ্যস্নান উপলক্ষে প্রায় পনর-ষোল বিঘা জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে প্রতিদিন গড়ে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, মাটির হাঁড়িকুড়ি-খেলনা প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় ষাটটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং কবিগান, হরিনামসংকীর্তন ও লটারী খেলা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বালিঠা গ্রামে অনুষ্ঠিত মকরস্নানের মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

রথযাত্রার মেলা

সিহাস গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রথতলায় প্রায় এক একর জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, বাসনকোসন, মনিহারী, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র এবং আম-কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের মোট প্রায় ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কীর্তনগান ও বাউলগান অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সিহাস গ্রামে অনুষ্ঠিত মহোৎসবের মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

মির্জাপুর মৌজার অন্তর্গত রায়বাঘিনী গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে অহল্যাবাঈ রোডের পার্শ্ববর্তী স্থানে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন মদনমোহনচক, লেগো, গেলিয়া প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের দুই সহস্রাধিক নরনারী প্রধানতঃ মোটরগাড়ী ও গরুরগাড়ী করিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, বাসনকোসন, মনিহারী, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, শাঁখার জিনিসপত্রের ইত্যাদির প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি দোকান বসে এবং আম-কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের আমদানী হয়। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও সার্কাসের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। প্রায় দুই সহস্র দর্শক ও শ্রোতা এই সকল অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—রায়বাঘিনী গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত দোলযাত্রার মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

রাসযাত্রার মেলা

কোতুলপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীর তীরবর্তী প্রায় পনর-ষোল বিঘা জমির উপর পক্ষকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের লাউগ্রাম, মদনমোহনপুর, সিহাস, মির্জাপুর, গোপীনাথপুর প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী ও মোটরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা, পুতুল প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় শতাধিক দোকান বসে। ইহা ব্যতীত, বহু ফেরিওয়ালা মেলা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেচাকেনা করেন। তাঁহারা বিষ্ণুপুর শহর, মেদিনীপুর শহর এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং বাউলগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়।

থানা : সোনামুখী

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : ধুলাই। ১৪।৫৮৯ ৪৫।২৩৮।১,১৯৪

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, গোয়ালা, রামাইত, বাগ্দী, ডোম, পরামাণিক, গরাই, বাউরী, মুচি ও তাম্বুলী। গ্রামে এগারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন সোনামুখী হইতে বিষ্ণুপুর-পানাগড় রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনের জন্য। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং একটি হরিমন্দির ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দ এবং তিনটি মনসা আছে।

শ্রীবিজয় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম : শিরোমণিপুর,
পোঃ : গোপীকান্তপুর,
বাঁকুড়া।

২। গ্রাম : বীরচন্দ্রপুর। ১৭।৫০৭ ৯৮।১৩১।৭৮৮

(ক) ব্রাহ্মণে, সদ্গোপ, কামার বাগ্দী ও লোহার। গ্রামটিতে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন সোনামুখী হইতে দুর্গাপুর ব্যারেজ দিয়া অথবা পানাগড় স্টেশন হইতে দামোদর নদী পার হইয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে চব্বিশপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা হয়।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মহাপ্রভুমন্দির ব্যতীত একটি শিব, একটি ষষ্ঠী, একটি পঞ্চানন্দ, একটি ভৈরব, একটি বিশ্ববাসিনী, চারিটি মনসা এবং রক্ষাকালী আছে।

জনশ্রুতি আছে। মল্লরাজবংশের জনৈক রাজা বীরচাঁদ গোস্বামী নামক এক ব্রাহ্মণকে এই মৌজাটি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নামানুসারে গ্রামের নাম "বীরচন্দ্রপুর" হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম : বীরচন্দ্রপুর, পোঃ : ডিপাড়া,
বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম : পলশড়া। ৫১।২৮১৬০।১১১।৬৫৩

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সদ্গোপ, বাউরী ও বাগ্দী। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, ছত্রীপাড়া ও বাউরীপাড়া নামে পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন হামিরহাটি হইতে মেটো পথে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও একটি শীতলা মন্দির আছে।

শ্রীসনৎ কুমার ভট্টাচার্য, কৃষিজীবি,
গ্রাম : পলশড়া, পোঃ : সোনামুখী,
বাঁকুড়া।

৪। গ্রাম : রামপুর। ৬৫।৩৭৪·০৫।২১১।৯১০

(ক) ছত্রীব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, বাউরী, বাগ্দী, হাড়ী, ময়রা ও ডোম। গ্রামটিতে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন হামিরহাটি হইতে বাঁকুড়া-পাত্রসায়ের রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনের জন্য। মেলাটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি বটগাছের নীচে ধর্মরাজের নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত একটি শীতলা এবং একটি মনসা আছে।

শ্রীসুখেন্দু ভট্টাচার্য, গ্রামসেবক,
রপটগঞ্জ, বাঁকুড়া।

৫। গ্রাম: নাহিরাবাঁধ মোহনপুর (মৌজা: রাধামোহনপুর)। ১১০।৩৯১ ৫৫।৪৭৭।১,৫৩৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, কামার, স্বর্ণবণিক, নাপিত, তাম্বুলী, বাগ্দী, মুচি, বাউরী, জেলে, গোয়ালা, মেটে, ডোম ও মুসলমান। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) রেলস্টেশন সোনামুখী হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমায় বৌদ্ধজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা ১৩২৯ সনে নিকটবর্তী দামোদর নদীর গর্ভ হইতে একটি বুদ্ধদেবের মূর্তিটি পাওয়া যায়। তদবধি উক্ত মূর্তিটি গ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্বজনীন উৎসব পালন করা হইতেছে।

(ঙ) বৌদ্ধ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে মেলা। মাঘ মাসে দশদিনব্যাপী। মেলাটি গত প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধদেবের মূর্তি ব্যতীত পাঁচটি পঞ্চানন্দ, দুইটি বাবাঠাকুর এবং দশটি মনসা আছে।

শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত, গ্রামসেবক,
গ্রাম: নাহিরাবাঁধ মোহনপুর, পোঃ নবাসন,
বাঁকুড়া।

৬। গ্রাম: দেরিয়াপুর (মৌজা: নিশ্চিন্তপুর)। ১২৪।৭২২.১৪।১৪১।৮১৩

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কায়স্থ, সদ্গোপ, বাগ্দী, বাউরী, কলু, কুমার, কোড়া, খয়রা, বেনে ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন ধানসিমলা হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে দশ-বারোদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং চারিটি মনসা আছে।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র, গ্রামসেবক,
সোনামুখী ব্লক, বাঁকুড়া।

৭। গ্রাম: ধানসিমলা।১৫১।২,৩৮৩.৪৬।৪৮৬।২,৪৮৬

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বাগ্দী, কুমার, কামার, নাপিত, লোহার, কলু, বাউরী, শুঁড়ি ও মুচি। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, বাগ্দীপাড়া, লোহারপাড়া, শুঁড়িপাড়া, কামারপাড়া, বাউরীপাড়া ও মুচিপাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ধানসিমলা হইতে বর্ধমান-বাঁকুড়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গম্বুজাকৃতি একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, তিনটি মনসা এবং একটি পঞ্চানন্দ আছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, গ্রামসেবক,
ধানসিমলা ডেভেলপ মেন্ট অফিস,
বাঁকুড়া।

৮। গ্রাম : পাঁচাল।১৬৪।৮৬৩'৭৬।৪৪২।১,৯৬৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোস্বামী, তাম্বূলী, তিলি, নাপিত, কামার, গোয়ালা, ডোম, তাঁতি, খয়রা, বাউরী ও বাগ্দী। গ্রামে উল্লিখিত প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। বাঁকুড়া-বেনেতোড় রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। ইহা ব্যতীত, ওন্দা, রামসাগর ও বিষ্ণুপুর রেলস্টেশন হইতেও গ্রামে যাতায়াত করা সম্ভব।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা ও রত্নেশ্বর শিবের গাজন, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রত্নেশ্বর শিবের মন্দির ব্যতীত সীতারাম জীউ'র স্থান আছে।

জনশ্রুতি আছে যে, বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের আমলে গ্রামের আদি বাসিন্দা মিশ্রবাবুদের জনৈক পূর্বপুরুষ কানপুরের নিকটবর্তী বসোয়ারা রঞ্জিৎপুরা নামক স্থান হইতে পুরী যাইবার পথে বিষ্ণুপুরে আসিলে বিষ্ণুপুরের রাজা তাঁহাকে রাজ সরকারের কাজে নিয়োগ করেন এবং রাজা গোপাল সিং উক্ত ব্রাহ্মণকে পাচাল গ্রামখানি দান করেন। গ্রামের শিবমন্দিরটি তাঁহাদেরই নির্মিত।

শ্রীরামকিঙ্কর মিশ্র, কৃষিজীবি,
গ্রাম ও পোঃ: পাচাল,
বাঁকুড়া।

[রত্নেশ্বর শিব সম্বন্ধে বিশেষ নিবন্ধ গ্রন্থের ২০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।]

৯। গ্রাম : নারায়ণসুন্দরী। ১৮৫।২৭১'৭৫।৭০।৩৩১

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, খয়রা, গোয়ালা, তাম্বূলী ও অগ্রদানী। গ্রামটিতে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন সোনামুখী হইতে মেঠো পথে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে খড়ের ছাউনীযুক্ত একটি মাটির দেবালয় আছে।

শ্রীসুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, চাকুরি,
গ্রাম ও পোঃ মাণিকবাজার,
বাঁকুড়া।

Sonamukhi— A town in the Bishnupur Subdivision, situated 21 miles north of Bishnupur and 11 miles south of Panagarh railway station. It was constituated a municipality in 1886, the area within municipal limits being 4 square miles The town contains a High English school, sub-registry office, charitable dispensary, and inspection bungalow, and is the headquarters of a police thana ; there is also a High school opened in 1887 in commemoration of the Jubilee of Queen Victoria.

Formerly a large factory of the East India Company was established here, and numbers of weavers were employed in cotton spinning and cloth-making. One of the earliest notices of Sonamukhi occurs in the records of the Board of Revenue, and consists of a complaint made by the Company's Commercial Resident stationed there regarding obstrution to trade by the Raja of Burdwan, upon which an officer was deputed to make an enquiry, and the Raja was forbidden to interfere in any way with the commercial business of the Company's factories. The introduction of English piece-goods led to the withdrawal of the Company from this trade, for the local products were not able to compete with imported European articles. Formerly also

the town contained an indigo factory and a Munsif's court.

At present silk weaving, pottery making and the manufacture of shellac are the principal industries of the place. The industry last named was till 60 years ago large and prosperous, and there were several lac factories established by the local merchants in the Ranchi district, to which artisans were sent from Sonamukhi. The town itself contains a temple called Girigobardhan. There are numerous tanks, the biggest of which in the centre of the town is known simply as the *Sayar*. There is also a shrine dedicated to a local saint named Manohar, which is a place of pilgrimage visited by many Vaishnavas. A large gathering of Vaishnavas takes place annually and lasts three days, commencing on Sriramnavami day, *i.e.*, generally in the month of Chaitra.

The legend about the saint is as follows. There was a very devout Brahman, named Sriram Das Adhikari, at Sonamukhi. One day, when he was worshipping his god Syamsundar, the beauty of a milkmaid caused his thoughts to wander, and ashamed of his weakness he cut off his genitals and died. This Brahman left a son and a daughter, both of whom were minors. Two days after his death, a Vaishnava came to the temple of Syamsundar and stated that he had been sent by the deceased Adhikari, who was going to Brindaban, to look after his children and the god Syamsundar. This Vaishnava was Manohar Das. He brought up the children and married the daughter to a Brahman, whose descendants became afterwards priests (*sebaits*) of the deified saint. Manohar performed many miracles, cured incurable diseases, and after his death became the deity of the Tantis (weavers) of Sonamukhi, who then formed the bulk of the population of the town. The Tantis set apart a small portion of their income for the maintenance of the shrine and for the celebration of an annual festival, besides gifts at the marriage of girls and other donations. A pair of the wooden sandals are placed over the tomb, and are worshiped by the votaries.

Tradition says that the town owes its name to a goddess Sonamukhi (the golden-faced), the nose of whose image was broken off by the famous Muhammadan iconoclast Kalapahar."

(District Handbooks, Bankura, 1951 by A Mitra, p. lxx)

[বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার অন্তর্গত পাঁচাল একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পণ্ডিত শ্রীযুত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের অনুরোধে সবিশেষ যত্ন সহকারে পাঁচাল গ্রামের প্রখ্যাত রত্নেশ্বর শিবপূজা সম্পর্কে যে বিস্তারিত তথ্য-বিবরণী প্রেরণ করিয়াছেন নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল।]

"হাতী ঠেলা ধান চাল।
তবে জানবে পাঁচাল॥"

এই প্রবাদ বাক্যটি দ্বারা জানা যায়, পূর্বে পাচাল গ্রামের মাঠে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইত। আজ ও হয়। বরঞ্চ স্বাধীনোত্তর ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় জলের পাম্প বসানোতে অনেক জমিতে আখ, আলু, কলাই ইত্যাদি রবিশস্য ভালোই হইতেছে। তবে এইদিক দিয়া তো ক্যানেল যায় নাই। সে কারণে উপযুক্ত পরিমাণ জলের জন্য চাষীকে মেঘের পানে তাকাইয়া থাকিতে হয়। তাহারা বলে ইন্দ্রদেবের দয়া না হইলে প্রচুর বৃষ্টি হইবে না এবং বৃষ্টি না হইলে পরিপূর্ণভাবে ধান্য উৎপন্ন হইবে না।

বাঁকুড়া শহর হইতে বাইশ মাইল পূর্বদিকে, দুর্গাপুর শহর হইতে বাইশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, সোনামুখী

শহর হইতে দশ মাইল দক্ষিণে এবং বিষ্ণুপুর শহর হইতে বারো মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে এই গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের পূর্বে লোখেগোল, দক্ষিণে অর্জুনপুর, বোঢ্যা ও ভাগাবাঁদ, উত্তরে আড়োলকলা এবং পশ্চিমে শাল জঙ্গল অবস্থিত। ইহা বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার সোনামুখী থানার অধীন।

বিষ্ণুপুর যাইতে হইলে দারকেশ্বর নদ ও বিড়াই নদী পার হইতে হয়। এই বিড়াই নদীর তীরেই বিষ্ণুপুর শহর অবস্থিত। ইহা বহুকাল ধরিয়া মল্লরাজাদের রাজধানী ছিল। পাচাল গ্রাম বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের অধীন ছিল।

প্রচলিত ছড়া আছে,

"লায়েক মিশির বাউরী বাঁদর।
তিনদিকে তার বেড়া কাঁদর॥
পশ্চিমতে শালের বন।
এরই মাঝে নন্দন কানন॥"

এই ছড়াটিও সীমানা নির্ধারণ এবং বাসিন্দার বিষয়ে প্রচলিত আছে। ছোট্ট গ্রাম। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়া বড় নালা বা জোড় বহিয়া গিয়াছে। বর্ষায় জলপ্লাবিত থাকে। অন্য সময়ে শুকনো থাকে। গ্রামের পশ্চিম দিকে শালগাছের বিরাট জঙ্গল এখনও আছে। তবে তাহা গ্রাম হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। গ্রাম ও জঙ্গলের মাঝখানে ডাঙা বা ডিহি হইয়া গিয়াছে। সেখানে কোন গাছপালা নাই। চাষবাস লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিত বলিয়া গ্রামবাসীরা নিজের গ্রামকে 'নন্দন কানন' বলিয়া গৌরব অনুভব করিত।

আগেকার বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের (বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে) খড়্গপুর-গোমো শাখার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর স্টেশন হইতে বারো মাইল, রামসাগর স্টেশন হইতে নয় মাইল এবং ওন্দাগ্রাম স্টেশন হইতে দশমাইল দূরে এই গ্রাম অবস্থিত। কিন্তু পথের সুবিধা নাই বলিয়া এই সকল পথে লোক চলাচল কম হয়। তবে বাঁকুড়া স্টেশন হইতে বর্ধমান জেলার রায়না পর্যন্ত যে বি. ডি. আর. (বাঁকুড়া দামোদর রিভার্ রেলওয়ে) এর ছোট লাইনের গাড়ী চলে তাহার অন্তর্গত ছাঁদার হল্ট স্টেশন হইতে পাচাল গ্রামের দূরত্ব প্রায় ছয় মাইল। এইটিই নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন। বাঁকুড়ার দিকে ইহার পূর্ববর্তী স্টেশন বেলিয়াতোড়। ছাঁদার হল্ট হইতে তিন মাইল পশ্চিমে। অধিকাংশ লোক এখানেই নামে। সব রকমের দোকান আছে। যাত্রীর পক্ষে কোন অসুবিধা হয় না। তাহা ছাড়া, বাঁকুড়া-পাচাল, বাঁকুড়া-দুর্গাপুর, বাঁকুড়া-সোনামুখী বাসপথের কেন্দ্রস্থলও বটে। আজকাল প্রচুর সাইকেল-রিকশায়ও হইয়াছে। বাস-স্ট্যাণ্ড হইতে বা বেলিয়াতোড় স্টেশন হইতে অনেকে সাইকেল-রিকশায় পাচাল গিয়া থাকে।

ছাঁদার-রাধানগর রোড ভায়া পাচাল রাস্তা প্রস্তুত হইলে দুর্গাপুর স্টেশন হইতে পাচাল হইয়া সরাসরি বাস বিষ্ণুপুর পর্যন্ত চলিতে পারিবে এবং পাচাল একটি ব্যবসায়িক কেন্দ্রস্থল হইবে ও তাহার আকর্ষণ আরও বাড়িবে।

গ্রামে একটি ডাকঘর আছে। আগে মধ্য বাংলা ও ছাত্রবৃত্তি স্কুল ছিল। ছাত্রবৃত্তি পাশ করিলে পণ্ডিত হইতে পারিত। বাবুদের চেষ্টায় ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়টি মিডিল ইংলিশ স্কুল পরিণত হয়। তখন বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন—তাঁহারই নামানুসারে পাচাল বি. দে. মাইনর স্কুল নামে অভিহিত হয়। এখন সর্বসাধারণের চেষ্টায় পাচাল হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। প্রাইমারী স্কুল ও জুনিয়ার বেসিক স্কুল আছে। মাঝারি ধরণের একটি হাসপাতালও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রাম হইতে বাঁকুড়া পর্যন্ত একটি বাস যাতায়াত করে। রাস্তা নির্মিত হইলে দুর্গাপুর হইতে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত বাস চলিবে ও গ্রামবাসীর প্রভূত উপকার হইবে।

পাচাল গ্রামের উত্তরদিকে 'পর্শা' নামক একটি বৃহৎ পুষ্করিণী এবং দক্ষিণদিকে মাঠের মধ্যে কিছুদূরে 'কমলা' নামে আর একটি পুষ্করিণী আছে। কাকচক্ষুর মতো নির্মল জল। অধিকাংশ গ্রামবাসীর পানীয় ও স্নানের জল হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। আগে গ্রামে দুচারটি পাতকুয়া ছিল, এখন ঘরে ঘরে পাতকুয়া হইয়াছে। শিবতলায় একটি ইঁদারা হইয়াছে। তবুও বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বা খরার সময়ে জলাভাব দেখা যায়।

এই পর্শা হইতে কমলা পর্যন্ত গ্রামের মাঝখান দিয়া

এখন গ্রামের প্রধান রাস্তাটি গিয়াছে। এই রাস্তার দুধারে মুদিখানা, মনোহারী, চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান ও ডাকঘর অবস্থিত। এই রাস্তার পশ্চিম ধারে শালের জঙ্গল ছিল। তখন এইসব দোকানপসার, ডাকঘর ইত্যাদি কিছুই ছিল না। এইস্থান বর্ধমান মহারাজের জঙ্গলমহল জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত এবং রতনপুর মৌজা নামে অভিহিত। ক্রমশঃ জঙ্গলের উচ্ছেদ হইয়া এখন প্রায় এক মাইল পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে এবং রতনপুর পাঁচালের সহিত মিশিয়া গিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ছড়ায় বলা হইয়াছে—নায়েক, মিশির, বাউরী, বাঁদর। এখানে হনুমান এর স্থলে বাঁদর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আগে শাল জঙ্গল ও গ্রামের বাগানে প্রচুর হনুমান ছিল। এখন তাহা লোপ পাইয়াছে।

বাউরী : অন্ত্যজ জাতি। ইহারা পূর্বে সংখ্যায় বেশী ছিল। এখন মাঝামাঝি। শূকর মাংস খায়। শূকর পোষে। জনমজুর খাটে। কৃষিকার্য প্রধান উপজীবিকা।

মিশির : মিশ্রপদবীধারী রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এখন পাঁচাল গ্রামে রাঢ়ীশ্রেণীর মিশ্র উপাধিধারী ব্রাহ্মণ নাই; কান্যকুব্জ শ্রেণীর মিশ্র আছে।

রাঢ়ীশ্রেণীর মিশ্রবংশের শেষ পুরুষ কালিপদ মিশ্র। তাঁহার দুই কন্যা ছিল—সাবিত্রী ও গায়ত্রী। পুত্র ছিল না। প্রচুর ধান-জমি ছিল। কিংবদন্তী আছে, উক্ত পর্শা নামক পুষ্করিণী এই কালিপদ মিশ্রই কাটাইয়াছিলেন এবং প্রতিষ্ঠার সময় পুকুরের মধ্যস্থলে গাছ-কাঠ না পুঁতিয়া মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সেই মন্দির আজ পাঁকের তলায় চাপা পড়িয়াছে।

হুগলী জেলার হালিশহর হইতে বর্তমান বাঁড়ুজ্যেদের পূর্বপুরুষ গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনাইয়া সাবিত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া এবং বর্ধমান জেলা হইতে বর্তমান চাটুজ্যেদের পূর্বপুরুষ মনিরাম চট্টোপাধ্যায়কে আনাইয়া তাহার সহিত গায়ত্রীর বিবাহ দিয়া তাঁহাদের ঘর জামাতা করিয়া রাখেন এবং নিজের বিষয়আশয় দুই কন্যাকে সমভাগে ভাগ করিয়া দেন। এই গোবিন্দ ও মনিরামের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল।

লায়েক : চলিত কথায় লায়েক বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি হইল নায়ক (Leader)। এই নায়ক উপাধিধারী ব্রাহ্মণরাই পাঁচালের আদিবাসিন্দা ছিল। এখন ইহাদের কতক ঐ নায়ক উপাধি বজায় রাখিয়াছে, কতক চট্টোপাধ্যায় উপাধি গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের পূর্বপুরুষ বিষ্ণুপুর রাজের অধীনে সৈনিকের কাজ করিত।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন বীর হাম্বির বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। এই পাঁচাল গ্রাম তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। চাটুজ্যেপাড়া, বাঁড়ুজ্যেপাড়া, লায়েক-পাড়া, বাউরীপাড়া লইয়া গ্রামের স্থিতি ছিল। পরে একে একে খয়রা, বাগ্দী, ডোম ইত্যাদি অন্যান্য জাতির লোক আসিয়া বসতি স্থাপন করে। তিলি, তামলি, তাঁতি, ময়রা, কামার, কুমোর ইত্যাদি নবশাখার শ্রেণী আসিয়া বসবাস করে। শুঁড়ি, মুচি, ধোপা, কলু, ছুতোর ইত্যাদিও পরে আসে।

পূর্বে চার-পাঁচটি পাড়া, শতখানেক ঘর, বাসিন্দার সংখ্যা শ'তিনেক ছিল। আজ গ্রাম বড় হইয়াছে। অনেক পাড়ায় বিভক্ত হইয়াছে। লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় তিন হাজার।

উল্লিখিত চট্টোপাধ্যায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ তাহাদের দৌহিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণকে আনিয়া বসাইয়াছে আবার ঐ বাঁড়ুজ্যেরাও তাহাদের দৌহিত্র চাটুজ্যেদের আনিয়া বসাইয়াছে। ফলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জমির পরিমাণ বাড়ে নাই। আগে হাতী ঠেলা ধান চালের প্রবাদ বাক্য থাকিলেও সেই জমি শরিকে শরিকে ভাগাভাগি হইয়া খণ্ডাংশে পরিণত হইয়াছে। পরিণামে জমির আয় হইতে কাহারও ব্যয় সংকুলান হয় না। প্রায় প্রতি ঘরের ছেলেকেই চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। যাহারা চাকুরী করে না তাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত হীন। যদি সরকারের প্রচেষ্টায় ট্রাক্টার দ্বারা জমি চাষ করানো হয়, তবে ফসল বেশী উৎপন্ন হইতে পারে।

ইংরাজ শাসনের পূর্বে মল্লরাজাদের অধীনে পাঁচাল গ্রাম তাঁহাদের জমিদারীর অন্তর্গত থাকার সময়েই বর্তমান পাঁচাল গ্রামের কান্যকুব্জ শ্রেণীর মিশ্রপদবীধারী ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ ভবানী প্রসাদ মিশ্র বিষ্ণুপুর রাজের অধীনে

বক্সীগিরি কাজ করিতেন এবং রাজা বাহাদুর তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া পাঁচাল গ্রামের জমিদারী তাহাকে দান করেন। পরে ভবানী প্রসাদ সস্ত্রীক পাঁচাল গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। ইংরাজ আমলে পাঁচাল গ্রাম কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং জমিদার হিসাবে মিশ্রদিগকে 'বাবু' সম্বোধন করা হয়। আজ স্বাধীনোত্তর ভারতে জমিদারী প্রথার লোপ হইলেও এখনও ঐ মিশ্ররা ও তাহাদের দৌহিত্র তেওয়ারী ও বাজপেয়ী পদবীধারী ব্রাহ্মণরা 'বাবু' আখ্যাই পাইয়া আসিতেছে। এক ঘর বাবু এখন পঁচিশ-ত্রিশ ঘরে পরিণত হইয়াছে। জমিদারী লোপ পাওয়ার ফলে আর্থিক অবস্থারও অবনতি ঘটিয়াছে। যাহাদের ছেলেরা চাকুরীবাকরী করিয়া অর্থার্জন করে তাহারাই অপেক্ষাকৃত সুখে থাকে।

গ্রামে এখন ধোপা ও কুমোর নাই। শোনা যায় তাহাদের উপর অত্যাচার হওয়ায় তাহারা পার্শ্ববর্তী গ্রামে বসতিস্থাপন করিয়াছে। অন্যেরা বলে মহামারী কলেরার সময় ঐ দুই বংশ শেষ হইয়া গিয়াছে।

আগেকার কৌলিন্যপ্রথার কঠোরতা এখন কমিয়া গিয়াছে। আচার্য শ্রেণীর দৈবজ্ঞ অর্থাৎ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হইত, এখন তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। তাহারাও ভট্টাচার্য পদবী ধারণ করিতেছে। তাহা ছাড়া, দুই এক ঘর ব্রাহ্মণ অসবর্ণ বিবাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতেছে। পল্লীগ্রামে ইহা ভবিষ্যৎ উন্নতির লক্ষণ সূচনা করে। অস্পৃশ্যতাও অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। একেবারে দূর হইলে সর্বাংশে উন্নতি হইবে বলা যায়।

রতনপুর মৌজা গভীর শালবনে ঢাকা। বর্ধমান-মহারাজের জঙ্গলমহলের অন্তর্গত পূর্বে বলা হইয়াছে। চাটুজ্যে বংশের আদিপুরুষ মনিরাম চট্টোপাধ্যায় ও বাঁড়ুজ্যে বংশের পূর্বপুরুষ গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। একদিন দুইজনে বনের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে একটি মোটা শালগাছ পছন্দ করিল এবং বাড়ী হইতে কুড়ুল আনিয়া নিজেরাই গাছ কাটিতে লাগিল। গাছ কাটা হইবার পরে চটাং করিয়া পাথরের শব্দ হইল। কুড়ুল ভাঙিয়া গেল। দুজনে ভয় পাইয়া বাড়ী ফিরিল। রাত্রে রত্নেশ্বর মহাদেবের স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হইল—তোরা ভয় পাস্ না—এই জায়গা পরিষ্কার কর্ ও আমার পূজার ব্যবস্থা কর্।

আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। দুই বন্ধু নিকটবর্তী খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিল। দেখিল গোলাকার কালো রঙের পাথরের পাতালফোঁড় আদি শিবমূর্তি; কুড়ুলের ঘায়ে এক পাশের খানিকটা উড়িয়া গিয়াছে। দুজনেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। পঞ্চগব্য, হোম ইত্যাদি দ্বারা যথারীতি অভিষেক করিল এবং পাঁচাল গ্রামের বাসিন্দাদের কল্যাণের জন্যই যেন রত্নেশ্বর মহাদেব আভির্ভূত হইলেন। ক্রমে ক্রমে জঙ্গল পরিষ্কার হইতে থাকে। লোকের বসতি বাড়ে। দুই বন্ধু পরম আনন্দে রত্নেশ্বর মহাদেবের পূজা করিয়া চলে। বিষ্ণুপুরের রাজা যখন বীর হাম্বির, তখন রত্নেশ্বর মহাদেবের আবির্ভাব ঘটে। রতনপুর মৌজার অন্তর্গত বলিয়া শিবের নাম রত্নেশ্বর বলিয়া প্রচলিত হয়।

তিন বৎসর পরে হিমাচল প্রদেশ হইতে এক সাধু আসেন। তাঁহার নাম জানা যায় না। তবে তিনি শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি বিভিন্নস্থানের লোকের নিকট হইতে চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া মন্দির নির্মাণ করান। পাথরের গাঁথনী। সামনে একটি আটচালা সেই সাধুই করাইয়া দেন।

বর্ধমান মহারাজের নিকট হইতে পাঁচালের জমিদার রতনপুর মৌজার পত্তনী লইল এবং সেই সূত্রে রত্নেশ্বর মহাদেবের মালিকানা পাইল। নিত্যসেবার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু ঐ চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে দুইজন সেবাইত রহিয়া গেল। আজও এক মাস চাটুজ্যেরা ও এক মাস বাঁড়ুজ্যেরা পালা করিয়া শিবের ভোগ-পূজা চালাইয়া আসিতেছে। তবে বাবুরা নিত্যপূজা ও শীতল বরাবর চালাইয়া যায়।

রত্নেশ্বর মহাদেব সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। ইঁহার নামে কোন দেবোত্তর সম্পত্তি নাই। বাবুরাও দেয় নাই, চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যেরাও নয়। তাছাড়া এই রত্নেশ্বর মহাদেবেরই আদেশ অনুসারে ইঁহাকে কোন স্ত্রীলোক স্পর্শ করিতে পায় না, এমন কি স্ত্রী-স্পর্শিত জলে এঁর পূজা ভোগাদি হয় না বা হইবার উপায় নাই।

তারকেশ্বরের মতো এখানেও লোকে ধর্না দেয়

দুঃসাধ্য ব্যাধি নিবারণের উদ্দেশ্যে। এখানে কিছু পার্থক্য আছে। তারকেশ্বরের ওখানে যাহারা ধর্না দেয় তাহারা বাবার স্নানজল যতবার ইচ্ছা পান করিতে পারে, কিন্তু এখানে ভুল করিয়াও জল পান করা চলে না—নির্জলা উপবাসী থাকিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিন-দিনের মধ্যেই তাহারা প্রত্যাদেশ পাইয়া থাকে। নিজের মুখ ঢাকা দিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে শুইয়া বা বসিয়া থাকে। ধর্নার সময়ে কাহাকেও মুখ দেখানো বা কাহারও মুখ দেখা নিষেধ।

শুক্লপক্ষের সোম বা শুক্রবার শিবপূজার পক্ষে প্রশস্ত দিন। ঐ দুদিন সাধারণ পূজার্থীর ভিড় হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, গ্রামে প্রতি সপ্তাহে দুদিন—সোম এবং শুক্রবারে হাট বসে। কাজেই কৃষ্ণপক্ষেও পূজার্থীরা পূজা দেয়। এমনিতে প্রত্যেক দিন তো পূজা হইয়া থাকে। হাটুইরা সাধারণতঃ কাঁচা তরকারী এবং কুমোরেরা হাঁড়ি খোলা কলসী বিক্রয় করিতে আসে। ঐদিন জেলেরা মাছও আনে বিক্রয়ের জন্য।

এই রত্নেশ্বর মহাদেবের গাজন বিখ্যাত। যাতায়াতের সুবিধা থাকিলে কলিকাতা বা দূরবর্তী স্থানের লোক আসিতে পারিত এবং শিবমহিমা আরও জাহির হইত।

দিনের বেলায় ফুল, বেলপাতা, আপত চাল, মিষ্টি পূজার উপকরণ। অন্নভোগের ব্যবস্থা নাই। রাত্রে দুধ, চিঁড়া বা মিষ্টি দিয়া শীতল দেওয়া হয়। ইহা নিত্যকার ব্যাস্থা।

ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ মাসের প্রথম দিন পর্যন্ত এই এক মাস প্রত্যহ শিবের পায়েস ভোগ হয়। ইহাকে মহুই ভোগ বলে। এটা অবশ্যই করিতে হইবে। বৎসরের অন্য দিনে যে কেহ ইচ্ছা করিলে শিবের মহুই ভোগ দিতে পারে। এক বৎসর চাটুজ্যেরা অন্য বৎসর বাঁড়ুজ্যেরা এইভাবে পালা করিয়া মহুই ভোগ দিয়া থাকে। সেই সেই বৎসরে তাহারা গাজনের ভারও গ্রহণ করে।

রত্নেশ্বর শিবপূজার জন্য গ্রামের জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। ইহাকে মাথট আদায় বলে। ইহার জন্য নির্দিষ্ট হিসাবের খাতা থাকে এবং গ্রাম্য মোড়লরা খরচের বাজেট অনুযায়ী মাথটের মোট পরিমাণ নির্ণয় করে। গৃহস্থের আয়ের অনুপাতে মাথট ধার্য করা হয়। ঐ মহুই ভোগের খরচ ব্যক্তিগত। ইহার সহিত মাথটের সম্পর্ক নাই। মাথটের টাকা দিয়া মন্দিরে মশালের ব্যবস্থা, যাত্রার খরচ ও ভোক্ত্যাদের দেয় কোন কোন খরচ চালানো হয়।

প্রতি বৎসর চৈত্রমাসের পনেরোই ঢাকে কাঠি পড়ে। চলতি কথায় ইহাকে 'ঢাকে খড়ি' বলে। অর্থাৎ যে ডোমের উপর ভার দেওয়া থাকে, সে শিবতলায় সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া খানিকক্ষণ ঢাক বাজাইয়া যায়। তাহার সঙ্গে একজন ছেলে একটা কাঁসি বাজায়। গ্রামের ছেলেরা সন্ধ্যার আগে থেকে জড় হয়। ঢাক বাজিতে থাকিলে তাহারা নাচিতে থাকে। গৃহস্থ বুঝিতে পারে—গাজন আসিয়া পড়িল—আর দেরী নাই। শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় বাঙ্গালী গৃহস্থের বাড়ীতে ছেলে মেয়েরা সকলেই যেমন নতুন পোষাক পায়, সেইরূপ এই গ্রাম ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে ছেলেমেয়েরা গাজনের সময় নূতন পোষাক পাইয়া থাকে। দূর-দূরান্তর হইতে প্রবাসী চাকুরের দল, বন্ধু ও আত্মীয়-কুটুম্ব গাজনের সময় আসিয়া জড় হয় ও প্রতি ঘরে যেন আনন্দের হাট বসিয়া যায়।

চৈত্র মাস সাধারণতঃ ত্রিশ বা একত্রিশ দিনে হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে শেষের আটদিন গাজন। শিবের ভক্তকে অপভ্রংশে ভোক্ত্যা বলে। এই ভোক্ত্যারা সাধারণতঃ বেশীর ভাগ অন্ত্যজ জাতির মধ্য থেকেই হইয়া থাকে। আবার ব্রাহ্মণ-নবশাখও বাদ যায় না। এক কথায় রত্নেশ্বর শিবের মাহাত্ম্য এমনিই বস্তু যে, সেই গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত শিবের ভোক্ত্যা হইবার বেলায় আব্রাহ্মণচণ্ডাল সকলেই এক—এখানে শ্রেণীভেদ নাই ব্রাহ্মণও অব্রাহ্মণ ভোক্ত্যাদিগকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকে। যখন ধামাৎকল্প (গাজনের সময় ঐ গাজন কয়দিনের জন্য আগে হইতে বংশ পরম্পরায় নির্দ্ধারিত পুরোহিত) মন্ত্র পাঠ করাইয়া সকল ভোক্ত্যাকে একাত্ম করিয়া দেন—আত্মগোত্র পরিত্যজ্য শিবগোত্র প্রবর্ত্ততে—অর্থাৎ এই এক সপ্তাহের জন্য ভোক্ত্যামাত্রেরই শিবগোত্র—সে বামুনই হোক আর বাউরীই হোক। ভোক্ত্যাদের নিয়ম বড় কড়া। স্ত্রী-সংস্পর্শ ও মাদক দ্রব্য বর্জিতভাবে এই কয়দিন থাকিতে হয়। চব্বিশঘণ্টার মধ্যে একবার মাত্র

হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতে পারে। রাত্রিতে ফলমূল-দুধ খাইতে পারে। জল পানেও বাধা নাই।

শেষের চারদিনের আগে যে শনি বা মঙ্গলবার পড়ে, সেইদিনে 'কামলে ওঠা' হয়। মা দুর্গার আগমনকে 'কাম্‌লে ওঠা' বা 'কামিখ্যে ওঠা' বলে (কমলা হইতে কাম্‌লে এবং কামাখ্যা হইতে কামিখ্যে প্রচলিত মনে হয়)। ঐ দিন শিবের আটচালায় যাত্রাগান করাইতেই হয়। যাত্রা অভাবে রামায়ণ গানও হওয়া চাই। না হইলে গ্রামের অমঙ্গল হইবে বলিয়া গ্রামবাসীদের ধারণা।

শিবের মন্দির হইতে পর্শা পুষ্করিণীর দূরত্ব সিকি মাইল। কাঁকরে ভরা পথ। শিবের আটচালায় যাত্রাগান চলিতেছে। রাত্রি দুটোর সময় ধামাৎকন্ত্রির নির্দেশে গুপ্তভাবে একে একে জন কয়েক ভোক্ত্যা পর্শা পুকুরের দিকে চলিল। কেহ জানিতে পারিল না। সকলে যাত্রাগান শোনায় মত্ত আছে। সেখানে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘাটের উপর পূজার সরঞ্জাম। ঘাট হইতে কিছুদূরে ডোমের দল বাজনা লইয়া লুকাইয়া আছে। ইঙ্গিত পাইলেই বাজাইবে। যথারীতি মা দুর্গার আবাহন করিয়া পূজা হইল। তারপর যে ব্যক্তি সারাদিন নিরম্বু উপবাস করিয়া আছে (জাতিতে সে কায়স্থ)— তাহারই মাথার উপর কাম্‌লে ঘট আসিবে—সে জলের মধ্যে মাটির ঘট ছাড়িয়া দিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল ও ডুব দিল। ধীরে ধীরে ঘট তাহার মাথায় উঠিল উপুড় হইয়া। সে অজ্ঞান হইয়া গেল। পার্শ্ববর্তী দুইজন সাহায্যকারী ব্রাহ্মণ সেই অবস্থায় (ঘট তাহার মাথাতেই রহিল) দুই হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিল এবং ধীরে ধীরে শিবমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইঙ্গিত পাইয়া ডোমেরা জোরে ঢাক বাজাইতে লাগিল। এই পথের মধ্যস্থলে ডোমদের চণ্ডী-মায়ের মন্দির। ঐ অজ্ঞান লোকটির পর্শা পুকুরের দিকে আকর্ষণ থাকে এই চণ্ডীমন্দির পর্যন্ত, পরে চণ্ডীতলা পার হইলে সে ছুটিয়া শিবমন্দিরের দিকে ধাবিত হয়। তখন তাহাকে ধরিয়া রাখা দায়। এদিকে আটচালার নিকটবর্তী হইলে লোকে মশালের আলো দেখিতে পায়, ঢাকের বাজনা শুনিতে পায় —বুঝিতে পারে মা আসছেন। তখন যে যাত্রাগানের যে অংশই অভিনীত হোক তাহা ত্যাগ করিয়া সেই যাত্রাদলের গায়ককে দিয়া মায়ের আগমনী গান একটা গাওয়ানো হয়। এদিকে শিব মন্দিরের বারান্দায় সিঁড়ির নিকট আগে হইতে ধামাৎকন্ত্রি অর্থাৎ শিবের সেই পুরোহিত দাঁড়াইয়া থাকে। সে ভোক্ত্যার মাথা হইতে কাম্‌লের ঘটটা সোজা করিয়া শিবঘরের ভিতর নিয়া গিয়া একটি বিঁড়ার উপর বসায় এবং দরজাটি বন্ধ করিয়া দেয়। পাঁচ মিনিট পরে দরজা খুলিয়া দিলে প্রথমে গ্রামের জমিদার, পরে চাটুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, লায়েক এবং শেষে নবশাখদের প্রতিনিধি শিবের বারান্দায় উঠিয়া কাম্‌লে ঘটের জল দর্শন করে। যে বৎসর ঘট পরিপূর্ণ দেখা যায় সেই বৎসর সামনের বর্ষায় প্রচুর বৃষ্টি হয়, ধান ভালো জন্মে—গ্রামের লোক সুখে থাকে। কিন্তু যে বৎসর ঐ ঘটের জল আধ আঙ্গুল বা এক আঙ্গুল কম থাকে সে বৎসর গ্রামের ক্ষতি হয় এই ধারণা আজও চলিয়া আসিতেছে। আগমনী গান শেষ হওয়ার পর যথারীতি যাত্রা চলে। সকলে চুপ করিয়া স্বস্থানে বসিয়া গান শোনে। গান ভাঙিলে বাড়ী চলিয়া যায়। চৈত্রমাসের শেষের চারদিন প্রধান গাজনের অনুষ্ঠান : গামীরকাটা, রাজাভাঁটা, দাদুরঘাটা ও চড়ক। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হইল।

গামীরকাটা :—মন্দির হইতে এক মাইল দূরে বনগাঁ গ্রামে চাটুজ্যেদের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দিরের সন্নিকটে গামীর নামে এক প্রকার গাছ আছে। রত্নেশ্বর শিবের মন্দির হইতে ভোক্ত্যারা মুখে উচ্চস্বরে শিবের ধ্বনি দিতে দিতে ঢাকের বাজনার সাথে সাথে বনগাঁয়ের সেই গামীর গাছের উদ্দেশে হাঁটিতে থাকে। গ্রামের ছেলে, বুড়ো, যুবা— অনেকেই সঙ্গে যায়। তাহারা মুখে বলে-'এ-এ-র ত্‌নে শ্‌শ্ব র নাথ মুনি মহা—দেব্‌'। দেব্‌ শব্দের উপর খুব জোর দেয়। ঐরূপ অন্যান্য শিবের নাম ও করে, যেমন 'তারকেশ্বর নাথ মুনি মহাদেব' 'একতেশ্বর নাথমুনি মহাদেব্‌' 'বিশ্বশ্বর নাথ মুনি মহাদেব্‌' ইত্যাদি। একজন ভোক্ত্যার হাতে একটি দা বা কাটারী এবং অন্যান্য ভোক্ত্যাদের হাতে একগাছা করিয়া বেতের ছড়ি থাকে। গামীর গাছের নিকট পৌছিয়া গাছটিকে বেষ্টন করিয়া বেতের ছড়ি দিয়া মিনিট কয়েক আঘাত করে এবং পরে

দা বা কাটারী দিয়া একটি ডাল কাটিয়া লয়। পরে শিব মন্দিরের দিকে ফিরিয়া আসিতে থাকে। ঐ ডালের ক্ষুদ্রতম অংশ ভোক্তাদের নিকট হইতে ছেলেরা বা যুবকেরা চাহিয়া লয় এবং পরস্পরের হাতে লইয়া 'গামীর' পাতায় অর্থাৎ তাহারা এই যে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইল সারাজীবন তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং কেহ কাহারও নাম ধরিয়া ডাকিবে না। ভোক্ত্যারা সারাদিন উপবাসী থাকে। তাহারা শিবমন্দিরে ফিরিয়া আসিয়া শিবকে প্রণাম করে এবং বাড়ী গিয়া জল খায়।

রাজভাঁটা: গামীরকাটার পরদিন রাজাভাঁটা হয়। জমিদার বা ধনী অর্থে রাজা শব্দ প্রযুক্ত হয়। ভোক্ত্যারা সারাদিন উপবাসী থাকিয়া প্রায় সন্ধ্যার একটু আগে সকলে জমিদারদের আটচালার কাছে জড় হয়। জমিদার অর্থাৎ বাবুদের রামচন্দ্রের দালান আছে। ঠাকুর দালানে রামচন্দ্র শিলা প্রতিষ্ঠিত, তারই সামনে বাবুদের আটচালা। ভোক্ত্যারা জড় হইয়া সারি দিয়া ভোজ খাইবার মতো বসিয়া পড়ে। তাহাদের সামনে শালপাতা দেওয়া হয়। বাবুদের বাড়ীর যুবকেরা কোমরে গামছা বাঁধিয়া তাহাদের পাতায় ভিজা ছোলা এবং গুড় পরিবেশন করে। ভোক্ত্যার সারাদিন উপবাসী থাকার পর পেট ভরিয়া গুড়ছোলা খায় কিন্তু তাহাদের পেটের অসুখ করে না। জমিদারী লোপ পাইলেও আজও এই ভোক্ত্যদের গুড়ছোলা খাওয়ানো সমানেই বজায় আছে। গাজনের মেলায় যে সমস্ত দোকান আসে, তাহাদের নিকট হইতে 'তোলা' বা 'ট্যাক্স্' আদায় করিয়া সেই টাকা দিয়া এই গুড় ও ছোলা বোনে। আগে এক হাজার ভোক্ত্যা হইত। এখন তাহা কমিতে কমিতে তিন-চার শ'য়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তোলা বা ট্যাক্স হইতে খরচ সংকুলান হয় না। বাবুরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা করিয়া বাকীটা পূরণ করে।

ভোক্ত্যারা নিজ নিজ গৃহে গিয়া বিশ্রাম করে। পরে রাত্রি আটটা-নয়টার সময় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ভোক্ত্যারা পার্শ্ববর্তী গ্রামে রাজাভাঁটিতে যায়। গ্রামেও কাহারাও কাহারও বাড়ীতে দশটি, পনেরোটি, পঁচিশটি, একশটি ভোক্ত্যাকে জল খাওয়ানোর নিমন্ত্রন থাকে। তাহারা সেই সেই বাড়ীতে গিয়া গুড়-ছোলা ফলমূল খাইয়া থাকে।

ঐদিনে সকাল হওয়া পর্যন্ত যাত্রাগান হওয়া চাই। সে কারণ রাত্রি প্রায় এগারো-বারোটায় গান আরম্ভ হয়। ভোক্ত্যারা ভিন্ন গ্রাম হইতে রাজাভাঁটি সারিয়া ফিরিয়া আসিলে যাত্রাগান ভাঙে।

পরদিন কেহ বারো ঘণ্টার জন্য, কেহ চব্বিশ ঘণ্টার জন্য, কেহ বা ছত্রিশ ঘণ্টার জন্য যে নিরম্বু উপবাসী থাকিবে, তাহারই পূরণের জন্য রাজাভাঁটার দিনে যেন আকণ্ঠ গুড়-ছোলা পেটের মধ্যে চালান করে।

দাদুরঘাটা বা রাতগাজন ও বানফোঁড়া: রাজাভাঁটার পরদিন দাদুরঘাটা বা রাতগাজন। সারারাত্রিব্যাপী উৎসব চলে। লোকে শিবমন্দির হইতে পর্শা পুকুর পর্যন্ত রাস্তায় অনবরত যাতায়াত করে। এদিনের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। প্রায় একশত ভোক্ত্যা জিহ্বাতে বান ফোঁড়ে। আট হাত লম্বা মাঝারি শিকের মতো লোহার রড বেলা দুটোর সময় প্রথমতঃ শিবের গায়ে ঠেকাইয়া রত্নেশ্বরের পূজা করিবার অনুমতি লওয়া হয়। পরে বৈকাল চারটার সময় সমস্ত ভোক্ত্যা পর্শা পুকুরের পশ্চিম পাড়ে গিয়া নিজ নিজ গামছা পাতিয়া তাহাতে শিবের উদ্দেশে বেলপাতা ও কালাফুল দিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া পূজা করে। পুরোহিত অর্থাৎ ধামাৎকল্পি এককোণে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পাঠ করাইয়া থাকে। পূজা শেষ হইলে ভোক্ত্যারা নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যায়। যাহারা বান ফুঁড়িবে না, তাহারা জল খায়। আর যাহারা বান ফুঁড়িবে তাহারা নিরম্বু উপবাসী থাকে। পাঁচাল গ্রামেরই কর্মকার ও তাহার কুটুম্বস্থানীয় লোক এই বান ফোঁড় করে। একটি ইস্পাত নির্মিত এক ইঞ্চি লম্বা ঠুলি বানের একধারে পরাইয়া দেওয়া হয় এবং গব্য ঘৃত দিয়া জিহ্বা মালিশ করিয়া পরে একহাতে জিহ্বা টানিয়া বাহির করিয়া ঐ বান দাঁড়করানো অবস্থায় ফোঁড়া হয়। ফোঁড়া হইয়া গেলে ভোক্ত্যা দাড়াইয়া পড়ে। বানটির দুধারে দুজন লোক ধরিয়া থাকে। যে ভোক্ত্যা বান ফুঁড়িবে, তাহার পরনে নতুন সাড়ী মেয়েদের ঘাঘ্‌রার মতো করিয়া পরা থাকিবে। কানে, গলায়, হাতে মেয়েদের মতো গহনা থাকিবে। হাতে একটি নতুন

গামছা থাকিবে। জিহ্বা দিয়া বান কামড়াইয়া থাকিবে। তাহাতে যে লালা গড়াইবে তাহাই ঐ গামছা দিয়া মুছিতে থাকিবে। জিহ্বা নরম জায়গা। পায়ে একটা সামান্য কাঁটা ফুটিলে সহ্য করা যায় না। আর এই জানালার শিকের মতো লোহার বান জিবে ফোঁড়া হইবে। নিজ চক্ষুতে না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত। তবুও ভোক্ত্যা সর্বদা প্রফুল্ল থাকিবে। সে যে নিরম্বু উপবাসী আছে, তাহার জিহ্বা যে ফোঁড়া হইয়াছে, ইহা যেন তাহার মনেই থাকে না। রাত্রি দশটা-এগারোটায় বানফোঁড় আরম্ভ হইবে। এক এক দলে তিনজন, চারজন বা পাঁচজন ভোক্ত্যা ও একটি ঢাকের বাজনা ও একটি কাঁসি সঙ্গে নিয়া ঐ বাজনার সঙ্গে ঐ বানফোঁড়া অবস্থায় নাচিতে নাচিতে শিবমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। নাচিতে নাচিতে ক্লান্ত হইলে রাস্তার মাঝে উবু হইয়া বসিয়া বিশ্রাম করিবে। প্রতিটি বানের দুধারে যে দুজন লোক ধরিয়া আছে, তাহারা অতিশয় ধৈর্য ও সতর্কতার সহিত উহাদের সঙ্গে সঙ্গে আগাইবে, পিছাইবে, দাঁড়াইবে বা বসিবে। যতক্ষণ বান না খোলা হইবে তাহাদের একভাবে ধরিয়া থাকিতে হইবে। সকলের বান খুলিয়া লইতে বেলা আটটা বাজিয়া যায়। বান খোলা হইলে পর পুরোহিত সেই পূজাকরা কালাফুলের পাতা জিহ্বাতে টিপিয়া দিবে। অমনি জিব জুড়িয়া যাইবে। একটা দিন তাহারা তরল খাদ্য গ্রহণ করিবে অর্থাৎ দুধ, বার্লি, পালো ইত্যাদি পান করিবে। পরদিন হইতে যথারীতি ভাতমুড়ি খাইতে পারে। কোন অসুবিধা হইবে না। নিজ চক্ষুতে না দেখিলে ইহার গুরুত্ব বোঝা যায় না। এই বৈজ্ঞানিক যুগে আপাতদৃষ্টিতে ইহা আসুরিক মনে হইবে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক। সমস্ত বাবা রত্নেশ্বরের মহিমা।

প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি: বাংলা ১৩২১ সন। বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন খাস ইংরেজ লালমুখ কুক্ সাহেব। আমার বয়স তখন দশ। এখন চৌষট্টি। কাজেই চুয়ান্ন বৎসর আগের কথা। হঠাৎ বানফোঁড়ার দিন সন্ধ্যাবেলায় ঘোড়ায় চড়িয়া কুক্ সাহেব পাঁচাল গ্রামে আসিয়া হাজির হন। আসিয়াই বানফোঁড়া বন্ধ করিবার আদেশ জারী করিলেন। নিজে রাত্রি আটটা হইতে সমানভাবে শিবমন্দির হইতে পর্শা পুকুর পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়িয়া টহল দিতে থাকেন। এদিকে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। ভোক্ত্যারা মন্দিরের নিকট সমস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। গ্রামবাসীরা সকলে সেই কান্নায় যোগ দেয়। রাত্রি প্রায় তখন দুটো। শিবমন্দিরের নিকট যোয়ান কুক্ সাহেব হঠাৎ তাঁহার ঘোড়া থেকে মাটির উপর পড়িয়া গেলেন। মুখ দিয়া ওয়াক্ শব্দ—ঝলকে ঝলকে রক্ত বমি-ডাক্তার, ডাক্তার বলিয়া চীৎকার করিয়া সাহেব কাঁদিতে থাকিলেন। গ্রামের জমিদার এবং বাঁকুড়ার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট যদুপতি মিশ্র অর্থাৎ যদুবাবু ছুটিয়া আসিলেন। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন-সাহেব, ইহার চিকিৎসা নাই—তুমি রত্নেশ্বর মহাদেবের নিকট তোমার অপরাধ স্বীকার কর। ধামাৎকল্পি, আমাদের কাকা-জ্যেঠারা অর্থাৎ শিবের সেবাইত সকলেই একবাক্যে ডাক্তারের কথার সমর্থন করিলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাহেব বলিল—"If Shiva is a living thing, I confess my crime." (যদি শিব জীবিত বস্তু হয়, আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি) সঙ্গে সঙ্গে রক্তপড়া বন্ধ হইল। বমির ভাবও চলিয়া গেল। সাহেবও অবাক্ তাহার জীবনে এমন unscientific (অবৈজ্ঞানিক) ব্যাপার কল্পনারও অতীত, সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পকেট হইতে দুশো টাকার দুখানি নোট বাহির করিয়া রত্নেশ্বর শিবের পূজার জন্য ধামাৎকল্পির হাতে দিলেন। একটি সার্টিফিকেট লিখিয়া যদুবাবুর হাতে দিলেন—কেহ যেন এই রত্নেশ্বর শিবের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে। তাঁহার সই করা কাগজ বহুদিন যদুবাবুর বাড়ীতে ছিল। পরে তাঁহাদের ঘরে আগুন লাগার সময় অন্যান্য জিনিস-পত্রের সঙ্গে ঐ কাগজখানাও পুড়িয়া যায়। সাহেব নিজমুখে বানফোঁড়ার আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য সে বৎসর ফোঁড় খুলিতে বেলা দুপুর হইয়াছিল। শুধু তাই নয়—ঐ বানফোঁড় অবস্থায় নাচিতে নাচিতে পথে আসার সময় যদি কোন ভোক্ত্যা ভুল করিয়াও নিজ স্ত্রী, শালিকা বা অন্য প্রেমিকার সহিত চোখের ইসারা করে, তবে বান খুলিয়া নিবার পর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় অর্থাৎ মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতে থাকে।

সকলের সামনে নিজ মুখে দোষ স্বীকার করা মাত্র রক্তপড়া বন্ধ হয়। এখনও ইহা আছে। যদি কাহারও মনে কিছুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয়, তিনি গাজনের সময় আসিয়া নিজ চক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন।

অষ্টাঙ্গবান: একজন বা দুজন ভোক্ত্যা অষ্টাঙ্গবান ফোঁড়ে। এই বানগুলি ছাতার শিকের মতো এবং দেড় হাত লম্বা। জিহ্বাতে, দুই গালে, দুই বুকে, দুই পিঠে এবং পেটে—এই আট জায়গায় আটটি বান ফোঁড়া হয়। ভোক্ত্যা সকলের শেষে অষ্টাঙ্গবান ফোঁড়া অবস্থায় পর্শা হইতে ঢাকের বাজনার সাথে শিবমন্দিরে যায় এবং বান ফোঁড়ার অনুষ্ঠান শেষ হইয়া যায়।

এই ভোক্ত্যাদের মধ্যেই দশ-পনেরোজন পিঠে চড়কের কাঁটা ফোঁড়ে। তাহারা ছত্রিশ ঘণ্টা নিরম্বু উপবাসী থাকে। চড়ক শেষ হইলে তবে তাহারা জল খাইতে পায়।

দণ্ডী খাটা: এই বানফোঁড়ার দিনে ভোর পাঁচটা হইতে বেলা আটটা পর্যন্ত এবং বৈকাল ছয়টা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ভোক্ত্যারা দণ্ডী খাটে। ইহা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পর্শা পুকুরে স্নান করিয়া রত্নেশ্বর শিবেরমন্দির পর্যন্ত পুকুরঘাট হইতে সমস্ত পথটাই তাহাদের নিজ শরীর দ্বারা মাপিতে হয়। তাহারা দাঁড়াইয়া বলে—এ রত্নেশ্বর না-থ-মু-নি ম-হা দে এএক—পরে সামনের দিকে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ে—সামনের দিকে দুই হাত ছড়াইয়া দিয়া ধুলার উপর দাগ কাটে। পরে অগ্রসর হইয়া সেই দাগের উপর দাঁড়ায়। কোন কোন ভোক্ত্যার বাড়ীর ছেলেরা ছড়ি দিয়া দাগ কাটিয়া দেয়। ভোক্ত্যা আবার ঠিক একইভাবে মুখে শিবের ধ্বনি দিয়া সেইভাবে দাগ কাটিতে কাটিতে মন্দিরের নিকট উপস্থিত হয়। তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া হাঁপাইতে থাকে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর একটু সুস্থবোধ হইলে আবার পর্শায় গিয়া স্নান করে এবং বাড়ী গিয়া জল খায়। যাহারা সকালে দণ্ডী খাটে—তাহাদের কষ্ট আরও বেশী। কারণ দণ্ডী খাটিলে পর জোর পিপাস পাইবে। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বে তাহারা জল গ্রহণ করিতে পারিবে না।

নীলের উপবাস ও ধুনো পোড়ানো: ঐদিন প্রতিটি গৃহস্থের অন্ততঃ একজন স্ত্রীলোক নীলের উপবাস করে অর্থাৎ নীলষষ্ঠীর পূজা দিয়া ধুনো পোড়াইয়া তবে জল খাইতে পায়।

ইহা না দেখিলে অনুমান করা শক্ত। মেয়েরা সাধারণতঃ সারাদিন উপবাসী থাকে। পরে ধুনো পোড়ায়। ধুনো পোড়ানোর জন্য চাই—কিছু ধুনো—একটি মাটির খোলা আর কলে পেষাই করা আখের ছোব্ড়া শুক্‌নো। স্নান করিয়া আসিয়া শিবের বারান্দায় ও আটচালায় মেয়েরা চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ে। বুকের উপর ও পেটের উপর গামছার বিড়া পাকাইয়া তাহার উপর খোলাটি বসানো হয়। খোলার ভিতর শুক্‌নো ছোব্ড়া দেয়া হয়। আগুন ধরাইয়া শিবের নাম ডাকিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাতে ধুনো ছিটাইয়া দেয়। পুরুত বা সেবাইত বংশের ছেলেরাই ধুনো পোড়াইয়া দেয়। মেয়েরাও মনে মনে রত্নেশ্বর মহাদেবকে ডাকে। মিনিট পাঁচেক পরে উঠিয়া পড়ে। শিবের পূজা দিয়া ঘরে গিয়া জল খায়। কাহারও কাহারও ঘাট হইতে ধুনো পোড়াইবার মানসিক করা থাকে। সেখানেও পর্শার ঘাট হইতে একজন ব্রাহ্মণ তাহার সহিত দুই হাতের দুইটি খোলায় এবং মাথার উপর পিঁড়া বসানো একটি খোলায় ধুনো ছিটাইতে ছিটাইতে মন্দির পর্যন্ত আসে। পরে শুইয়া পড়ে। বিশ্রামের পর পূজা দিয়া বাড়ী গিয়া জল খায়। ঘণ্টা দুই ধরিয়া ধুনো পোড়ানোর কাজ চলে। বামুনের মেয়ে এবং বাউরী-বাগ্দী-ডোমের মেয়ে একই সঙ্গে একই ভাবে ধুনো পোড়ায়। এই রত্নেশ্বর শিবের এখানে আভিজাত্য বলে না—বামুন শুদ্দুর সকল শ্রেণীর মানুষই এক বা সমান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

লাপ্রীভাঙ্গা বা আগুন ঝাঁপ: রাতগাজনের পরদিন অর্থাৎ চড়কের দিনে বেলা দশটায় এই অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়। একটা জায়গায় মণ পাঁচেক শুক্‌নো তেঁতুলকাঠ স্তূপীকৃত করিয়া তাহাতে আগুন দিয়া জ্বালানো হয় এবং বাতাস সঞ্চালিত করিয়া উহাকে জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত করা হয়। অঙ্গার প্রায় এক কোমর সমান উচ্চ হয়। আগুন গন্‌গন্ করিতে থাকে।

যাহাদের মানসিক থাকে, সেই ভোক্ত্যারা পঞ্চাশ হাত দূরবর্তী স্থান হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া ঐ আগুনের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়ে। তাহাদের কোমর পর্যন্ত অঙ্গারে

ডুবিয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ ওপাশে লাফাইয়া পড়ে। মুখে সর্বদাই রত্নেশ্বর মহাদেবের ধ্বনি দিতে থাকে। আশ্চর্য এই যে উহাদের কাপড়ে আগুন ধরে না —পায়ে ফোস্কা হয় না—ইহা নিজ চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত। ইহারা সংখ্যায় দশ-পনেরো জন হইয়া থাকে।

আগুন সন্ন্যাস: একহাত চওড়া আধহাত গভীর পাঁচ হাত লম্বা খাই খোঁড়া হয়। তাহার মধ্যে তিন চার থাক জলন্ত কয়লা। ঐ খাইয়ের দুই প্রান্তে সামান্য গর্ত মত থাকে। তাহাতে কলাপাতার উপর দুধ ঢালিয়া দেওয়া হয়। ভোক্তাদের কোমরে হাত দিয়া একজন লোক ধরিয়া ঐ জলন্ত আগুনের উপর হাঁটিয়া লইয়া যায় —পরে তাহারা দুধের উপর পা দেয়। এইরূপ এক এক বান ভোক্তা চার-পাঁচটা খাইয়ের উপর হাঁটে। ইহাদেরও পায়ে ফোস্কা পড়ে না। ইহার সংখ্যায় পাঁচ-সাত জন হইয়া থাকে।

গাজনের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন বেলা দুপুরের পর রত্নেশ্বর শিবেরপূজা করিয়া অনুমতি লওয়া হয়। (এই অনুমতি লওয়া সম্বন্ধে পূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়ে হয়েছে। এর অর্থ জানা প্রয়োজন। শিবের মাথার বেলপাতার ভিতরে একটি বিশিষ্ট ফুল, যেমন—গেঁদা, অপরাজিতা, বেল, টগর ইত্যাদি। যে কোন একটি ফুল ভরিয়া দিয়া রত্নেশ্বরকে ডাকা হয়। ঐ ফুলটি বহুক্ষণ শিবকে ডাকার পর এমন কি কাঁদার পর নিজ হইতে পড়িয়া যায়। ফুলের উপরের বেলপাতা যেমন ছিল তেমনই থাকে। এই ফুল পড়া বা ফুল কাড়ানোকে অনুমতি লওয়া বলে। ইহা শুধু শিবের পক্ষেই নহে, যে কোন দেবতার অনুমতি পাইতে হইলে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়)। বেলা তিনটের সময় শিবের মন্দিরের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে পূর্বোক্ত কর্মকার ভোক্ত্যার পিঠে অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে বাঁকানো লোহার শিক ফোঁড় করে। রক্ত বাহির হয় না। একটা গামছাকে পাকাইয়া দড়ির মতো করিয়া দুই কাঁটার ফাঁক দিয়া বুক বেড়িয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়—যাহাতে চড়ক গাছে ঘুরিবার সময় পিঠ ছিঁড়িয়া ভোক্ত্যা মাটির উপর পড়িয়া না যায়। দশ-বারো জন ভোক্ত্যার মানসিক থাকে। ইহারা পূর্বরাত্রিতে জিহ্বাতে বানও ফুঁড়িয়াছে এবং ছত্রিশ ঘণ্টা নিরম্বু উপবাসী আছে। পিঠে ফোঁড় হবার পর একজন লোক ভোক্ত্যাকে নিজের কাঁধের উপর চাপাইয়া অদূরবর্তী চড়ক গাছের নিকট নিয়া যায়। চড়ক গাছ কুড়ি হাত উচ্চ পুরণো শালের মাজকাঠ, লোহার মতো শক্ত। সারা বৎসর পুকুরের জলে ডোবানো থাকে। চড়কের দিন পুকুর হইতে তুলিয়া গাড়ী করিয়া বহিয়া আনিয়া সোজা করিয়া পোঁতা হয়। চড়কের মাথায় স্ফুরণচর্কীর মতো খড়খড়ি লাগানো হয়। তাহাতে দুইটা বাঁশ জড়াইয়া বাঁধা হয় ও বাঁশের দুই প্রান্তে মোটা দড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ভোক্ত্যার পিঠে ফোঁড়া লোহার কাঁটার সঙ্গে যে দড়ি লাগানো থাকে, তাহা ঐ ঝুলানো দড়ির একধারে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অপরধারে একজন বা দুজন দড়ি ধরিয়া ঝুলিতে থাকে। তাহাতে এই ভোক্ত্যা উপরে উঠিয়া যায় এবং ঘুরিতে থাকে। আঁচলে রত্নেশ্বর শিবের পূজো করা বিল্বপত্র থাকে। সেই ভোক্ত্যা ঘুরিবার সময় আঁচল থেকে মুঠো মুঠো করিয়া বেলপাতা ছড়ায়। দর্শকরা কল্যাণকর মনে করিয়া ঐ বেলপাতা সাগ্রহে সংগ্রহ করে। চার, পাঁচ বা সাত পাক ঘোরানো হইলে তাহাকে নামাইয়া লওয়া হয়। সে পুনরায় কাঁধে চাপিয়া শিবমন্দিরের সন্নিধানে গেলে পিঠ থেকে কাঁটা খুলিয়া লওয়া হয়। পরে শিবকে প্রণাম করিয়া বাড়ী গিয়া উপবাস ভঙ্গ করে। এই চড়ক গাছের বাঁশ বাঁধা, দড়ি বাঁধা, ভোক্ত্যাকে ঘোরানো গ্রামের সূত্রধর অর্থাৎ ছুতোরদের উপর ভার থাকে। যেমন রাতগাজনের দিনে মশাল তৈরি করা ও ভোক্ত্যাদের জিহ্বাতে বান ফোঁড়ার দায়িত্ব গ্রামের কর্মকার অর্থাৎ কামারের উপর দেওয়া থাকে। এই নিয়ম আজ পর্যন্ত একইভাবে চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক ভোক্ত্যার সহিত একটি ঢাকের বাজনা থাকে। পার্শ্ববর্তী দশখানা গ্রামের লোক এই চড়ক দেখিতে ভাঙিয়া পড়ে। চড়ক শেষ হইতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। গাজনও শেষ হয়। রাত্রি আটটার সময় কামলের ঘটের জল একটি পিতলের গামলায় ঢালা হয়। সামান্য পরিমাণ জল গ্রামের সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করা হয়। এই জল শিশু-যুবা-বৃদ্ধ-নারী—সকলেই পবিত্রজ্ঞানে নিজের মুখে চরণামৃতরূপে গ্রহণ করিয়া

থাকে। ঐ দিন রাত্রিতে গান বাজনা সমস্ত বন্ধ থাকে। সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

পরেশমণি: পর্শা পুকুরের উত্তর পাড়ে তেঁতুল গাছ আছে। সেইখানেই মাটির হাতি বা ঘোড়া ইত্যাদি ধর্মরাজের মতো প্রতীক আছে। প্রয়োজনবোধে শনি বা মঙ্গলবারে গ্রামের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া পরেশমণি বা মা দুর্গার ভোগ দেওয়া হয়। কিন্তু কখন? যখন বৃষ্টি হইতেছে না—বৃষ্টির অভাবে ধানের গাছ মরিয়া যাইতেছে, তখনই এই পরেশমণির ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। খট্‌খটে রৌদ্রের মধ্যে গ্রামের ছেলেরা মায়ের প্রসাদ খাইতে যায় এবং বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী আসে। ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা। শোনা গল্প নয়।

তবে কখনও কখনও ইহারও ব্যতিক্রম ঘটে। ভোগ দেওয়া হইল, কিন্তু বৃষ্টি হইল না। তখন গ্রামবাসী আরও বৃহত্তর খরচের জন্য প্রস্তুত হয়। শিবের স্নানজল বাহির হইবার জন্য মন্দিরে একটি ছিদ্র থাকে। তাহা কাপড় দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ যুবকেরা কোমর বাঁধিয়া ইঁদারা হইতে কলসী কলসী জল তুলিয়া রত্নেশ্বর শিবের উপর ঢালিতে থাকে। শিব ডুবিয়া গেলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শিবের বারান্দায় পূজা ও হোমের যোগাড় করা থাকে। বিশিষ্টভাবে পূজা ও হোম হয়। কোথা হইতে মেঘ আসে—বৃষ্টি হয় চাষীর দল আনন্দে নাচিতে থাকে। তখন সেই নালার ছিদ্রটি খুলিয়া জল বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং বাবার কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়। এ প্রক্রিয়া খুব কম ঘটে।

হাটবাজার: প্রতি সপ্তাহে দুইদিন—সোমবার ও শুক্রবার হাট বসে। পাঁচ মাইল দূরবর্তী পাত্‌লাপুর গ্রাম হইতে হাটুরেরা মাথায় করিয়া কাঁচা তরকারী বেচিতে আসে। বিক্রী ভালোই হয়। গ্রামে যখন মনোহারী দোকান ছিল না, তখন রাধানগর হইতে প্রত্যেক হাটবারে একজন লোক মনোহারী দ্রব্য লইয়া বিক্রী করিতে আসিত। দুই মাইল দূরবর্তী লায়েকবাঁদ গ্রাম হইতে কুমাররা মাটির বাসন-হাঁড়ি, খোলা, কলসী, সরা, তাওয়া, খুরি, গেলাস ইত্যাদি বিক্রয় করিতে আসে।

গাজনের সময় এক সপ্তাহ ধরিয়া প্রতিদিন হাটুরেরা সব্‌জী বিক্রয় করিতে আসে। কুমারেরাও হাড়ী ইত্যাদি নিয়ে আসে। তা ছাড়া একপক্ষব্যাপী মেলা বসে। বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, বাঁকুড়া থেকে ভালো ভালো মিষ্টির দোকান, বিষ্ণুপুর থেকে কাঁসার বাসনের দোকান, শুশুনিয়া থেকে পাথরের থালা, বাটি, রেকাবী, গেলাস ইত্যাদি বিক্রয় করিতে আসে। ম্যাজিক, নাগরদোলা ইত্যাদিও আসে। ছোট-বড় বহু মনোহারী দোকান আসে।

রাতগাজন ও চড়কের দিনে বহু লোকের সমাবেশ ঘটে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল সকলেই আসে। বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। আগে চড়কের দিনে সাঁওতাল নাচ হইত। দলে দলে সাঁওতাল স্ত্রীলোকেরা হাতের মধ্যে হাত দিয়া চক্রাকারে নৃত্য করিত। পুরুষেরা মাঝখানে বড় বড় মাদল লইয়া বাজাইত। এখন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে মেলা দেখিবার জন্য বহু সাঁওতাল আসে। সাঁওতাল স্ত্রীলোকেরা তাহাদের মোটা মোটা রূপোর মল, চুড়ি, বাউটি ইত্যাদি গহনা ক্রয় করিয়া থাকে। বিষ্ণুপুর হইতে বহু শাঁখারী শাঁখা বিক্রয় করিতে আসে। গাজনের পর বৈশাখ মাসের পাঁচ-ছয় তারিখ পর্যন্ত মনোহারী দোকান, বাসনের দোকান, লোহার দোকান মজুত থাকে। সকল সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীরা রত্নেশ্বর শিবের মেলায় আসিয়া দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

গাজনের বৈশিষ্ট্য: রত্নেশ্বর শিবের গাজনের প্রধান লক্ষ্য অস্পৃশ্যতা বর্জন, আভিজাত্য নাশ, সাম্যবোধ, শান্তির ভাব আনয়ন। আজ তো বাংলায় অস্পৃশ্যতা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু সেই গোঁড়া ব্রাহ্মণদের যুগেও হিন্দুর সমস্তশ্রেণী একভাবে গলায় শিবসূত্র ধারণ করিয়া শিবগোত্র গ্রহণ করিয়া সকলে একাত্ম হইয়া যাইত। এমন সাম্যভাবের লক্ষণ কোথাও নাই। সরকারের প্রচেষ্টায় পাঁচাল হইয়া দুর্গাপুর-বিষ্ণুপুর রোডের প্রসার ঘটিলে অর্থাৎ কলিকাতার সহিত যোগাযোগ সহজতর হইলে রত্নেশ্বর মহাদেবের আকর্ষণ আরও বাড়িবে।

উপসংহার: গাজনের সময় শান্তিরক্ষার জন্য সোনামুখী থানা হইতে পুলিশ আসে। তাহারাও গাজন দেখিতে পায় অথচ কিছুই করিতে হয় না। কারণ রত্নেশ্বরের কৃপায় কখনও শান্তিভঙ্গ হয় না।

সোনামুখী হেল্‌থ্‌ সেণ্টার হইতে প্রতি বৎসর একজন স্যানিটারী ইন্‌স্‌পেক্টর ও তাহার আরদালী আসে। তাহারাও গাজনের মেলা দেখে। কেহ যদি খারাপ বা দূষিত তেল ব্যবহার করে, তবে জোর করিয়া ঐ দূষিত তেলেভাজা ফেলিয়া দেওয়া হয়।

অন্যান্য উৎসব: পার্শ্ববর্তী গ্রামে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রতিষ্ঠা করা শিবের গাজন হয়। ইহাকে আবাল গাজন বলে। এই উপলক্ষে যাত্রাগান হইয়া থাকে। মেলা বসে না।

জ্যৈষ্ঠমাসে ধর্মরাজের পূজা হয়। এখন তাহা শিবপূজায় পরিণত হইয়াছে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ধুম করিয়া মনসার পূজা হইয়া থাকে। শ্রাবণ সংক্রান্তিকে মাখল বলে। ঐ দিন মনসার সম্মুখে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। মাটির হাতি-ঘোড়া ইত্যাদিকে মনসার প্রতীকরূপে গণ্য করা হয়। মনসার কোন মাটির মূর্তি গড়া হয় না। মনসাপূজার দিন সন্ধ্যাবেলায় যাহাদের ঘরে পূজা-- তাহাদের ছেলেপিলেরা মাথায় ঐ হাতি, ঘোড়া, বারি বা ঘট ইত্যাদি লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। তাহাদের সঙ্গে ঢাকের বাজনা থাকে। ভাদ্র মাসে প্রতি ঘরে ভাদুপূজা হইয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলায় ভাদুপূজার খুব ধুম। ভাদুর গানের পুস্তিকা পাওয়া যায়। কুমারী কন্যারা সেই বই দেখিয়া গান করে। বড়োরাও উৎসাহ দিয়া থাকে।

আশ্বিন মাসে শারদীয়া দুর্গার পূজা হয়। বাঁড়ুজ্যে ও চাটুজ্যেদের দুটি পৃথক প্রতিমা নির্মিত হয়। নিজ নিজ পুরোহিত পূজা করায়। ডোমের ঢাকের বাজনা কাঁসি ও সানাই ষষ্ঠির দিন হইতে একাদশীর দিন পর্যন্ত থাকে।

স্বাধীনোত্তর ভারতে আজ কুড়ি বৎসর ধরিয়া রত্নেশ্বর মহাদেবের আটচালায় একটি সর্বজনীন দুর্গা প্রতিমা হয়। অব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সমস্ত শ্রেণীর লোকেই খুশীমনে একসঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকে।

বিজয়ার দিন সন্ধ্যাবেলায় ধুম করিয়া পর্ণাপুকুরে দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন হয়। কার্তিক মাসে শ্যামাপূজা হয়। অগ্রহায়ণ মাসে ইতু পূজা হয়। পৌষ মাসে টুসু পূজা হয়। মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা হয়। ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে ঘেঁটুপূজা হয়। বাঙ্গালীর বারোমাসে তেরো পার্বণ ঠিক বজায় থাকে।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

ধূলাই গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে দেবোত্তর জমির উপর তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

ডিহিপাড়া, পিয়ারবেড়া, নবাসন প্রভৃতি ইউনিয়নসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা ও খেলনা-পুতুলর কয়েকটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। মেলা উপলক্ষে যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে।

পলশড়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর জমির উপর তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় গ্রাম ব্যতীত, ধূলাই, হামিরহাটি, পিয়ারবেড়া প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, ধামা-কুলা প্রভৃতির দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কীর্তন গানের ব্যবস্থা করা হয়।

ধানসিমলা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় ছয় বিঘা দেবোত্তর জমির উপর তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় শতাধিক বৎসর প্রাচীন।

আশপাশের নবাসন, হামিরহাটি, মাণিকবাজার প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় আড়াই সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। ময়রা, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে এবং আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় তিন সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

রামপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজের গাজন উপলক্ষে ধর্মরাজতলায় প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

নিকটবর্তী পিয়ারবেড়া ও মোচডিহি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী প্রধানতঃ গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, ধামা-কুলা প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কলিকাতার পেশাদারী দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হয়। অনেকে জুয়া খেলিয়া থাকেন। যাত্রাভিনয় দেখিতে দুই সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

পাঁচাল গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় আড়াই বিঘা জমির উপর তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মনিহারী, বাসনকোসন, ধামা-কুলা প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলার দল আসে ও যাত্রাভিনয় হয়।

নিশ্চিন্তপুর মৌজার অন্তর্গত দেরিয়াপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর দশ-বারোদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত সোনামুখী, পাত্রসায়র এবং নারায়ণপুর হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির দোকানপাট বসে।

মনসাপূজার মেলা

নারায়ণসুন্দরী গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসামন্দির সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমির উপর দুইদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী মহেশপুর, গাংতোড়া, ব্রজনাথপুর, মাচতোড়া, পাথরমাড়া, বীরচন্দ্রপুর, লাথেক বাঁধ প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় ছয়-সাতশত নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় প্রধানতঃ ময়রা ও মনিহারীর দোকান বসে এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা এবং কৃষ্ণযাত্রার দল আসে। ইহাতে প্রায় তিন-চারশত দর্শক বা শ্রোতার সমাগম হয়।

মহোৎসবের মেলা

বীরচন্দ্রপুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে চব্বিশপ্রহর-ব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষে মহাপ্রভুর মন্দির সংলগ্ন জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, পান-বিড়ি প্রভৃতি কয়েকটি দোকান বসে। মেলায় শালতোড়া গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসর কীর্তনীয়ার দল আসে।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ দেউলপাড়া।২।১,৫৭০ ৬৬।১০৩।৬১০

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা ও বাগ্দী। গ্রামটিতে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাত্রসায়র হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি হইতে দেউলেশ্বর নামে খ্যাত শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) দেওয়াল গাত্রে সুন্দর কারুকার্য খচিত ইষ্টক নির্মিত একটি প্রাচীন মন্দিরে দেউলেশ্বর নামে খ্যাত স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ আছে। ইহা ব্যতীত, দুইটি ভৈরব ও একটি মনসা আছে।

শ্রী এ. করিম, চাকুরী
গ্রাম ঃ গাঁপাড়া, পোঃ নারায়ণপুর,
শ্রীনবনীরদ মালাকার, প্রধান শিক্ষক,
কমলাসায়র প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ নারায়ণপুর,
বাঁকুড়া।

২। গ্রাম ঃ নারায়ণপুর।৭।১১৬ ৬৪।১৪৫।৭১৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, সদ্গোপ, কামার, ছুতার, মালি, তাম্বুলী, উগ্রক্ষত্রিয়, লোহার, ডোম, মুচি, বাগ্দী, গরাই ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন ধপড়িয়া হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে নারায়ণেশ্বর শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের শিবের নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দ, চারিটি মনসা, একটি ধর্মরাজ, একটি চাঁদরায় এবং একটি শীতলা আছে।

শ্রীসরল কুমার চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ নারায়ণপুর, বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম ঃ বেন্দা।৩৯।১৭৪.২৫।৩০।১৩৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কায়স্থ, রাজপুত ক্ষত্রিয়, মুচি, বাগ্দী, লোহার, গন্ধবণিক, কামার ও তাম্বুলী।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন পাত্রসায়র হইতে বাঁকুড়া রুটের মোটরবাসে বেন্দা নামিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। ইহা ব্যতীত, নৌকা করিয়া গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং পৌষ মাসে জয়দেব কেন্দুলীর মকরস্নান স্মরণে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মকরস্নানের মেলা। পৌষসংক্রান্তি হইতে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ গোস্বামী, কৃষিজীবি,
গ্রাম ও পোঃ হাটকৃষ্ণনগর,
বাঁকুড়া।

৪। গ্রাম ঃ বেলুট।৫৯।৫৮৫.৭৩।৩০৭।১,৫৮৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, বৈরাগী, কায়স্থ, সদ্গোপ, কামার, কুমার, তিলি, মুচি, হাড়ী, ডোম, বারুজীবি, বাগ্দী, মেটে, ধোপা, কৈবর্ত ও শুঁড়ি। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, কুমার-

পাড়া, বৈষ্ণপাড়া, বারুজীবিপাড়া, হাড়ীপাড়া, মুচিপাড়া ও বাগদী পাড়া নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন পাত্রসায়র হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবপূজা, কার্তিক মাসে রাধারমণজীউয়ের রাসযাত্রা উৎসব। পৌষ মাসে কেন্দুলীর উৎসব স্মরণে উৎসব, মাঘ মাসে সাধক পাগল হরনাথের আবির্ভাব উৎসব এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন ও প্রাচীন।

(ঙ) সাধক হরনাথের আবির্ভাবের মেলা। মাঘ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি গত প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

গ্রামে নাট্ মন্দিরসহ একটি শিবমন্দিরে বিল্বেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, রাধারমণজীউমন্দির ও রাসমঞ্চ এবং সাধক পাগলা হরনাথের একটি আশ্রম আছে।

(চ) প্রসংগত উল্লেখ করা যায়, গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে চন্দ্রদীপ ও ঠাকুরাণী নামে দুইটি ঢিবি আছে। জনশ্রুতি আছে, চন্দ্রদীপ নামক স্থানটি চাঁদ সদাগরের স্মৃতি জড়িত।

শ্রীশ্যামসুন্দর পাল, প্রধান শিক্ষক,
বেলুট জুনিয়র হাই স্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বেলুট, বাঁকুড়া।

৫। গ্রাম : শালখাড়া।৬৪।৭৪৭ ৭৬।১৫০।৭৯৯

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, বাগদী, নাপিত ও ডোম। গ্রামটিতে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন পাত্রসায়র হইতে রসুলপুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ২রা হইতে ৯ই পর্যন্ত মহাড়ম্বরে চণ্ডীর ধ্যানে মাতঙ্গীদেবীর বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবকালে অনেকে মানসিক করিয়া ছাগ বলি দিয়া থাকেন এবং প্রায় পাঁচ মন দুধের পায়সান্ন নিবেদন করিয়া সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উৎসব উপলক্ষে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু লোকজন আসিয়া থাকেন।

মাতঙ্গীদেবী বিশেষ জাগ্রতা ঈশ্বরী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কিংবদন্তী আছে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে একটি গাভী অন্যের অলক্ষ্যে গ্রামে সীমান্তবর্তী গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া মাতঙ্গীদেবীর শিলার উপর দুগ্ধ দান করিয়া আসিত। পরে এক স্বপ্নাদেশ অনুসারে মাতঙ্গীদেবীর মূর্তি আবিষ্কার করিয়া যথারীতি নিত্যপূজা ও বৎসরিক উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। ইনি গ্রামের সাধারণের দেবী।

(ঙ) মাতঙ্গীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে দুইদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মাতঙ্গী মন্দির ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দ, একটি মনসা এবং একটি শীতলা আছে।

শ্রীকিঙ্কর চন্দ্র মণ্ডল কৃষিজীবি,
শ্রীধরনীধর মণ্ডল, কবিরাজী,
গ্রাম : শালখাড়া, পোঃ বেলুট,
বাঁকুড়া।

৬। গ্রাম : সুখসায়র (মৌজা : পাটীত ডোমমহল)। ৮০।১,২৯১`৩৯।৩৮৬।১,৯৫৭

(ক) কায়স্থ ও বাগদী। গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বেতুড় অথবা বদকুমকুল হইতে গ্রামে যাওয়া যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা এবং মহানবমীর দিন হইতে যোগাত্যা নামে পরিচিতা শীতলার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত পূজাটিতে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। পূজাগুলি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) যোগাত্যাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে আটদিন-ব্যাপী। মেলাটি গত প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ এবং যোগাদ্যার প্রাচীন শিলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র সরকার, প্রধান শিক্ষক,
শ্রীচণ্ডী চরণ দত্ত, কৃষিজীবি,
গ্রাম : সুখদায়ের, পোঃ বিউর,
বাঁকুড়া।

৭। গ্রাম : বালসী পূর্বপাড়া।৮৪।৭১৪ ২৮।১৬০।৭৮৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, বাগ্দী, বাউরী, ছুতার, তিলি, কৈবর্ত, উগ্রক্ষত্রিয়, কামার, হাড়ী, পোদ্দার ও মালাকর। গ্রামটিতে পনরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরি ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন পাত্রসায়র হইতে বাঁকুড়া-বালসী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে লক্ষ্মীনারায়ণজীউয়ের রথযাত্রা উৎসব ও মকর সংক্রান্তি উৎসব এবং চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ মাসের কয়েকদিনব্যাপী বাণেশ্বর শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিনের জন্য।
রথযাত্রার মেলা। মাঘ মাসে পাঁচদিন।
মকর সংক্রান্তির মেলা। মাঘ মাসে একদিন।
মেলাগুলি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির এবং একটি গম্বুজাকৃতি লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ব্যতীত একটি শীতলা ও পাঁচটি মনসা আছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র পাল, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বালসী পূর্বপাড়া,
বাঁকুড়া।

৮। গ্রাম : জামকুড়ি ।৯৮।২,৪০৯ ০১।২৩৪।১,১৮৪

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, পরামাণিক, বণিক, রজক, বাগ্দী, লোহার, ধীবর ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মজুরি।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাত্রসায়র হইতে জেলা বোর্ডের রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রায় সওয়া দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে বারদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দির অষ্টধাতু নির্মিত রাজরাজেশ্বরী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, তেরটি শিব, চারিটি মনসা আছে।

শ্রীশিবরাম সিংহ দেব, কৃষিজীবি,
গ্রাম : জামকুড়ি, পোঃ বাঁকিশোল,
বাঁকুড়া।

৯। গ্রাম : বীরসিংহ ।১০৫।৬৪৮ ২১।৬৩৮।৩,০৮৯

(ক) ব্রাহ্মণ, গন্ধবণিক, তাঁতি, কলু, গোয়ালা, ধোবা বাগ্দী, লোহার, বাউরি, মুচি, ছুতার ও কামার। গ্রামটিতে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কুটিরশিল্প।

(গ) রেলস্টেশন ধনসিমলা হইতে বাঁকুড়া-পাত্রসায়র রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শ্রীঅভিরাম গোপালের আবির্ভাব ও শ্রীশ্রীবসুধা জাহ্নবীর মহোৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবের গাজন উৎসব এবং আষাঢ় মাসে রথ-যাত্রা উৎসব ব্যতীত শ্রীমাণিকদাস বাবাজীর তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীঅভিরাম গোস্বামী ও মাণিকদাস বাবাজীর উৎসব স্থানীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় কর্তৃক আয়োজিত হইলেও গ্রামে সর্বসাধারণ ইহাতে যোগদান করিয়া থাকেন।

(ঙ) গাজনের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি ভগ্নপ্রায় নাটমন্দির ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দ, একটি বাবাঠাকুর, একটি শীতলা এবং কয়েকটি মনসা আছে।

শ্রীরাধামোহন খাঁ, অঞ্চল প্রধান,
বীরসিংহ অঞ্চল পঞ্চায়েত,
পোঃ বনবীর সিংহা, বাঁকুড়া।

১০। গ্রাম : সালনা ।১১৪।১৬৯·১০।৫৭।৩৪৬

(ক) ব্রাহ্মণ, তিলি, মাহিষ্য ও বাগ্দী। গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাত্রসায়র হইতে জয়পুর-পানাগড়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামবাসীর সুবিধা মত একটি দিনে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত।

(ঙ) গাজনের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একপক্ষকাল-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির আছে।

শ্রীগোবিন্দ আশ, শিক্ষক,
গ্রাম : তালসাগড়া, পোঃ বাঁকিশাল,
বাঁকুড়া।

[পাত্রসায়র শহরাঞ্চলে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণাদি সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

পাত্রসায়র

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত পাত্রসায়র একটি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। অবশ্য বর্তমানে ইহা নন্-মিউনিসিপ্যাল শহররূপে পরিগণিত। এই স্থানে একটি থানা ও ডাকঘর আছে এবং ১৯৬১ সনের জনগণনা অনুসারে ইহার মোট আয়তন ৮·৭৩ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৬,৫৮২। বি. ডি. রেলপথে এইস্থানেই একটি রেলস্টেশন আছে। ইহা ভিন্ন, বাঁকুড়া বা বর্ধমান হইতে সরাসরি মোটরবাসে পাত্রসায়র যাতায়াত করা যায়। গ্রামে স্বর্ণকার, তাঁতি, কামার, গন্ধবণিক ও শাঁখারীর সংখ্যা বেশী। ইহা ব্যতীত, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কুম্ভকার, রাজপুত ক্ষত্রিয়, গোয়ালা, মেটে, মল্ল, লোহার, হাড়ী, বাগ্দী, ডোম, মুচি এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের বসবাস আছে। কৃষিকার্য ও ব্যবসা গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, পাত্রসায়র নিবাসী শিল্পীদের তৈয়ারী রাং-তামার গ্লাস-বাটি ইত্যাদি তৈজসপত্রের বিশেষ সুখ্যাতি আছে। গৌড়ীয় মঠের আদি প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় অতুল প্রসাদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের উত্তরপাড়ায় একটি গৌড়ীয় মঠ এবং সেনপুকুর, পদ্মপুকুর, ভান্নারদীঘি নামে কয়েকটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে।

পাত্রসায়ারর উল্লেখযোগ্য উৎসব কালঞ্জয় শিবের গাজন। কিংবদন্তী আছে, অতীতে কালঞ্জয় শিবলিঙ্গ গভীর বেতবনের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন এবং একটি গাভী সবার অলক্ষ্যে ঐ বেতবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শিবলিঙ্গের নিকট দাঁড়াইলে উহার দুগ্ধাধার হইতে শিবলিঙ্গের মস্তকে আপনা আপনি দুগ্ধ ঝরিয়া পড়িত। পরে মল্লরাজ চৈতন্য সিং স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এইস্থানে একটি শিবমন্দির নির্মাণ করিয়া দেন ও শিবের নিত্যপূজাদির ব্যবস্থা করেন। কালঞ্জয় শিবমন্দিরটি ইষ্টক নির্মিত, ষট্কোণাকৃতি এবং এক চূড়া বিশিষ্ট। মাঝারি আকারের সুগঠিত এই মন্দিরের চারিপাশে বারান্দাযুক্ত। বারান্দাটি অবশ্য মূল মন্দির নির্মাণের বহু পরে স্থানীয় জনৈক গ্রামবাসী কর্তৃক নির্মিত। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ পাকা নাটমন্দির এবং পূর্বদিকে ঘাট বাঁধান শিবপুষ্করিনী আছে। মন্দিরটি বাংলা ১৩৫০ সনে শেষ সংস্কার করা হইয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে একটি অষ্টকোণাকৃতি গর্তের মধ্যে কেবলমাত্র শিবলিঙ্গের অগ্রভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গ। ইহা ভিন্ন, মন্দিরে প্রায় সাড়ে তিন ফুট উচ্চ কালভৈরব শীলা ও প্রস্তরনির্মিত একটি ষণ্ডমূর্তি এবং বাণেশ্বর নামে শলকাবিদ্ধ কাঠের পাটাতন আছে।

কালঞ্জয় শিবের নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে সাড়ম্বরে গাজন উৎসব আরম্ভ হইয়া বৈশাখীপূর্ণিমায় শেষ হয়। গাজন উৎসব উপলক্ষে বৈশাখ মাসের দশমীতিথির পূর্বে যে-

কোন শনি অথবা মঙ্গলবার মূল সন্ন্যাসী গাজন ব্রত গ্রহণ করেন। বর্তমানে স্থানীয় শ্রীগোপাল আচার্য মহাশয় গাজনে মূলসন্ন্যাসী হইতেছেন।

দশমীতিথিতে 'ভক্ত কামান' হয়। এইদিন সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণেচ্ছুক নরনারী সারাদিন উপবাস থাকিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প করেন। পরের দিন অর্থাৎ একাদশীতিথিতে তাঁহারা মন্দিরে উপস্থিত হইলে শিব মন্দিরের পুরোহিত তাঁহাদিগকে শিব গোত্রান্তরিত করিয়া হাতের বেতের ছড়ি ও গলায় উত্তরীয় পরাইয়া দেন। এই দিন হইতে গাজন উৎসবের কয়েকদিন তাঁহারা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন এবং প্রতিদিন হবিষ্যান্ন, গ্রহণ ও শুদ্ধাচার পালন করেন।

দশমীতিথিতে অপরাহ্ণে একটি পিতলের চতুর্দোলায় শিবের বিছানা ও সজ্জাদি স্থাপন করিয়া আটপৌরে (বংশানুক্রমের শিবের সেবক; ইঁহাদের কিছু ভূসম্পত্তি দান করা আছে) সেবকসহ গাজন সন্ন্যাসীরা ভান্নাগ্রামে বুড়া শিবের মন্দিরে উপস্থিত হন এবং বুড়া শিবের মন্দিরে যথারীতি পূজাদির পর এই গ্রামের কুম্ভকারপাড়ায় বাঁকুড়ারায়ের (ধর্মরাজ; একটি নির্দিষ্ট গাছতলায় ধর্মরাজের প্রতীকস্বরূপ মাটির হাতী-ঘোড়া রক্ষিত আছে) স্থানে চতুর্দোলা নামাইয়া পূজা হয়। এইস্থানের পূজায় স্থানীয় কুম্ভকারেরা প্রচুর আতসবাজী পুড়াইয়া থাকেন। ইহার পর রাত্রি প্রায় এগার ঘটিকায় ঢাক-ঢোলের বাজনা ও আলোর রোশনাই সহ শোভাযাত্রা করিয়া চতুর্দোলাটিকে কালঞ্জয় শিবের মন্দিরে আনা হয়।

একাদশী তিথিতে 'রাজাভাটা পর্ব' উপলক্ষে বিকাল পাঁচ ঘটিকায় উক্ত চতুর্দোলাসহ মন্দির হইতে উত্তরমুখী একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়া স্থানীয় রাজবাটীতে অর্থাৎ হাজরা মহাশয়দের বাড়ীতে আসিয়া গাজন সন্ন্যাসীরা উপস্থিত হইলে তাঁহাদের কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় উক্ত চতুর্দোলার উপর ভোগ নিবেদন করিয়া হাজরা মহাশয়গণ শিবের উদ্দেশ্যে পূজাদি দিয়া থাকেন। এই পূজা হাজরা মহাশয়দের কুল-পুরোহিত করিয়া থাকেন এবং কালঞ্জয় শিবের পুরোহিতকে সম্মান স্বরূপ কিছু অর্থ দক্ষিণা দিয়া থাকেন। রাজারবাড়ী হইতে নন্দীপাড়ার বিষ্ণুমন্দিরে, মিটির তলায় মহাপ্রভুস্থানে, দক্ষিণপাড়ায় অন্নপূর্ণার মন্দিরের নিকট নির্দিষ্ট স্থানে এবং সর্বশেষে তেলিপাড়ায় শিবের স্থানে চতুর্দোলা নামাইয়া স্থানীয় লোকজনেরা ভোগ-পূজাদি দিয়া থাকেন। তেলিপাড়ার পূজার পর চতুর্দোলাটিকে পুনরায় কালঞ্জয় শিবের মন্দিরে আনিয়া রাখা হয়। অতঃপর মধ্যরাত্রিতে 'ভান্নাদীঘির'-র পাড়ে ঘটস্থাপন করিয়া কামিক্ষ্যা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কামিক্ষ্যা-পূজার পর জনৈক কামার দীঘির জলের মধ্যে একটা পায়রা বলি দেন এবং মূল সন্ন্যাসী জলে ডুব দিয়া একটি নূতন ঘটে উক্ত রক্ত-মিশ্রিত জল পূর্ণ করিয়া ঘটটিকে উল্টাইয়া এমনভাবে মস্তকে স্থাপন করেন যাহাতে ঘটের জল বাহিরে গড়াইয়া আসিতে না পারে এবং ঐ অবস্থায় মূল সন্ন্যাসী ঘটটিকে শিবমন্দিরে আনিয়া মন্দিরাভ্যন্তরের পূর্বদিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করেন। এইদিনই বিগত বৎসরের ঘটটিকে বিসর্জন দেওয়া হয় এবং তাহার স্থানে নূতন ঘটটিকে স্থাপন করিয়া সারা বৎসর শিবেরপূজা হইয়া থাকে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ঘট ভরিতে যাইবার সময় অন্যের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে ঘট ভরিতে যাইতে হয়; কিন্তু ঘট ভরিয়া ফিরিবার সময় ঢাক-ঢোলের বাজনাসহ শোভাযাত্রা করিয়া মন্দিরে ঘট আনা হয়। এই সময় শোভাযাত্রার পথে আতসবাজী পুড়ান হয়।

দ্বাদশীতিথিতে সারাদিনব্যাপী যথারীতি পূজার পর অপরাহ্ণে গাজনের সন্ন্যাসীরা শোভাযাত্রা করিয়া পুনরায় চতুর্দোলা লইয়া বাহির হয় এবং সেনেদের বাড়ী, হালদারদের মহাপ্রভুতলায়, পাত্রসায়র রেলস্টেশনের নিকটস্থিত রঙ্কিণীদেবীর নির্দিষ্ট স্থানে (এইস্থানে রঙ্কিণীদেবীর প্রতীক স্বরূপ একটি পাকুড়গাছের নীচে একটি দশভুজা ও একটি চতুর্ভুজা ভগ্ন শীলামূর্তি রক্ষিত আছে), হাটতলায় কলুদের গৃহ প্রাঙ্গণে, মনসা ও ধর্মরাজের স্থানে, গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে মুসলমান-পাড়ায়, বাউরীপাড়ায়, মুচিপাড়ায়, পালপাড়ায়, মল্লপাড়ায়, সুন্দররায় ঠাকুরের স্থানে (ধর্মরাজের প্রতীক স্বরূপ মাটির হাতী-ঘোড়া রক্ষিত আছে), তাঁতিপাড়ায় শিব দুর্গা মণ্ডপে, পুরাতন হাটতলায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে (একটি মাটির ঘরে দক্ষিণেশ্বরের মৃন্ময় বিশাল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে) পূজার পর চতুর্দোলা লইয়া সন্ন্যাসীরা মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। এইস্থানে উল্লেখযোগ্য যে, রঙ্কিণীদেবীর স্থানে

পূজার পর পুরোহিতকে একটি নির্দিষ্ট গামীরগাছের দিকে লক্ষ্য করিতে হয়। ইহা ভিন্ন, মুসলমানপাড়ায়, বাউরীপাড়ায় ও মুচিপাড়ায় চতুর্দোলাকে সন্ন্যাসীদের কাঁধ হইতে নামান হয় না। ইঁহারা শিবের পূজার জন্য চতুর্দোলার উপর অর্ঘ্যাদি দিয়া থাকেন।

ত্রয়োদশী তিথিতে মধ্যাহ্নে পূজার পর গ্রামের বোষ্টমপাড়ার মনসাতলায়, চাটুর্জ্যেপাড়ার একটি নির্দিষ্ট-স্থানে, গ্রামের উত্তরে শ্মশানকালীতলায়, গ্রামবেড়্যা গ্রামের শিবতলায়, রায়পাড়ায় বুড়াডাহতলায়, রাজপুতপাড়ায় লাহাদের বাড়ীর মহাপ্রভুতলায়, বাংরোরায়তলায়, কামার-পাড়ায় একটি নির্দিষ্টস্থানে, চন্দ্রপাড়ায় জয়দুর্গার মন্দিরে এবং পাত্রসায়র রেলস্টেশনের নিকট গামীরগাছের নীচে পৈতা-সিন্দুর দিয়া পূজা হয়। এইস্থানে পূজার পর জনৈক অগ্রদানী ব্রাহ্মণ গামীরগাছের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া আনেন এবং কামারপাড়ায় পূজার পর স্থানীয় কামারদিগকে ঐ ডালটি দান করেন। চন্দ্রপাড়ায় জয়দুর্গার মন্দিরে অষ্টধাতুনির্মিত দশভূজা সিংহবাহিনী দুর্গার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরে সাড়ম্বরে মালাবদল করিয়া শিব-দুর্গার বিবাহপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পর সন্ন্যাসীরা চতুর্দোলা লইয়া মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

চতুর্দশী তিথিতে সারাদিনব্যাপী যথারীতি পূজার পর অপরাহ্নে সন্ন্যাসীরা শোভাযাত্রা সহকারে চতুর্দোলা লইয়া কামারপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলে পর স্থানীয় কামারেরা ডোমেদের তৈয়ারী একটি নূতন চুপড়িতে লৌহ শলাকাবিদ্ধ গামীরগাছের ডাল শিবের পুরোহিতকে দান করেন। এইখানে উল্লেখ করা যায় যে, পূর্বদিনে যে গামীরগাছের ডালটি কামারদিগকে দান করা হইয়াছিল সেই ডালটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কামারেরা উহাতে লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া রাখেন। উক্ত শলাকাবিদ্ধ চুপড়িসহ গ্রামের সায়রদীঘির ঘাটে একটি নির্দিষ্ট স্থানে চতুর্দোলা স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজার পর সন্ন্যাসীদের দেহে 'বান' (উক্ত শলাকাগুলি) ফোঁড়া হয়। এইস্থানে অনেকে মানসিকের ধূণা পুড়াইয়া থাকেন। বানফোঁড়া অবস্থায় ধূণা পুড়াইতে পুড়াইতে সন্ন্যাসীরা শিবমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্যগীতের পর সন্ন্যাসীদের দেহ হইতে বান অপসারণ করা হয়। চতুর্দোলা লইয়া মন্দিরে প্রত্যাবর্তনের পথে সাধারণ গ্রামবাসী প্রচুর টাকার আতসবাজী পুড়াইয়া থাকেন। চতুর্দশী তিথির এই পর্বকে 'রাতগাজন' বলা হয়। এইদিন ভোর-রাত্রে কেবলমাত্র চাউল-ডাইল-গব্যঘৃত-তেজপাতা (অন্য কোনরূপ মসলার ব্যবহার নিষিদ্ধ) দ্বারা প্রস্তুত ভোগ রন্ধন করিয়া শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়; ইহাকে 'পাথুরে ভোগ' বলা হয়। এই ভোগ নিবেদনের পর মন্দিরে হোম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

পরের দিন পূর্ণিমা তিথিতে সাড়ম্বরে সারাদিনব্যাপী শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন শিবমন্দিরে পূজা দিতে আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় আট-দশ সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। মধ্যাহ্নে পূজার পর গাজন সন্ন্যাসীরা নগ্ন পায়ে অঙ্গারের উপর দিয়া তিনবার হাঁটিয়া যান। অপরাহ্নে ভান্নাদীঘি হইতে মন্দির অবধি 'দণ্ডীখাটা', মন্দির প্রাঙ্গণে 'হিন্দোল সেবা' অর্থাৎ নীচে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া হেঁটমুণ্ড হইয়া ঝুলন্ত অবস্থায় দোল খাওয়া (পানিসর নামে খ্যাত), শলকাবিদ্ধ পাটাতনে শুইয়া ভক্ত সন্ন্যাসীরা নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া থাকেন। এইদিন বিশ্বাসপাড়ায় একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং সরকারপাড়ায় রক্ষাকালীতলায় চতুর্দোলা স্থাপন করিয়া পূজাদি হয়। রাত্রিকালে চতুর্দোলা প্রত্যাবর্তনের পথে আতসবাজী পুড়ান হয়। মধ্য রাত্রিতে পুরোহিত, সন্ন্যাসী ও গ্রামের ভদ্রমণ্ডলী নয়বার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া শিবমন্দিরে আসিয়া শিবের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদনের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। পরের দিন অক্ষয় তৃতীয়ার দিন স্থাপিত ঘটটিকে কামারপুকুরে বিসর্জন দিয়া সন্ন্যাসীরা উত্তরীয় পরিত্যাগ করেন। অপরাহ্নে দরিদ্রসহ সন্ন্যাসী ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বে এই উৎসব উপলক্ষে চড়কপূজা ও ভক্তরা চড়ক গাছে পাক্ খাইতেন। বর্তমানে মন্দিরের পূর্বদিকে পুষ্করিণীর পাড়ে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু চড়কগাছে পাক্ খাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কালঞ্জয় শিবের বর্তমান সেবায়েত স্থানীয় হাজরা পরিবার। মল্লরাজাদের নিকট হইতে এই অঞ্চলের ভূসম্পত্তি বর্ধমানের মহারাজাদের নিকট হস্তান্তরিত হইবার পর মহারাজ বিজয়চাঁদ মহাতাপের নিকট হইতে স্থানীয় হাজরা পরিবার এই অঞ্চলের পত্তনি লন এবং তদনুসারে

তাঁহারা কালঞ্জয় শিবের সেবায়েত হন। অবশ্য উৎসব উপলক্ষে অদ্যাপিও প্রথমে মল্লরাজ চৈতন্য সিংহের নামে সংকল্পের পর হাজরাদিগের নামে সংকল্প পূজা দেওয়া হয়। বর্তমান পূজারী শ্রীপরেশ নাথ সিদ্ধান্ত। ইহারা বাৎসল্য গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং বংশানুক্রমে কালঞ্জয় শিবের গাজন উৎসবের পৌরোহিত্য করিতেছেন। বর্তমান নিত্য পূজারী শ্রীকালীপদ গোস্বামী। পূর্বে কালাঞ্জয় শিবের নামে বহু দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল কিন্তু বর্তমানে উহা নানাভাবে হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণকে লইয়া গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক কালাঞ্জয় শিবের পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়।

কালঞ্জয় শিব বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বর বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। প্রধানতঃ নানারূপ স্ত্রীরোগ; শূলবেদনা, রক্তপিত্ত ও স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব নিবারণের জন্য শিবের নিকট মানসিক করা হয়। মন্দির হইতে পুরোহিত দৈব্য ঔষধ ও মাদুলি দিয়া থাকেন। প্রতি সোমবার বহু নর-নারী মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। মানসিক হিসাবে ষোড়শোপচারে পূজা, স্বর্ণ, অর্থ ইত্যাদি দেওয়া হয়। কিন্তু কোনরূপ পশু বলি দেওয়া নিষিদ্ধ।

কালঞ্জয় শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে দশদিনব্যাপী একটি মেলা বসে।

পাত্রসায়রে কালঞ্জয় শিবের মন্দির ব্যতীত আর অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল মন্দিরগুলির অধিকাংশই ব্যক্তিবিশেষের এবং মন্দিরাভ্যন্তরে পারিবারিক কুলদেবতা প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরগুলি গঠনভঙ্গি ও শিল্প কৌশল দর্শনীয়। নিম্নে ঐ সকল মন্দির সম্পর্কে উল্লেখ করা হইল।

গ্রামের তাঁতিপাড়ায় শিব-দুর্গামন্দির, গ্রামের ঘোষালদের বাড়ীর প্রাঙ্গণে দক্ষিণমুখী এবং পাশাপাশি তিনটি মন্দির আছে। উহার মধ্যে মধ্যস্থলের মন্দিরটি মাকড়া পাথর নির্মিত এবং আটচালা গঠনে নির্মিত। মন্দিরটির সম্মুখভাগে দেওয়াল গাত্রে পোড়ামাটির সুন্দর কাজ আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে ঘোষালদের কুলদেবতা রঘুবীর শিলা প্রতিষ্ঠিত। ইহার পশ্চিম পার্শ্বস্থিত মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের সম্মুখভাগে দেওয়ালগাত্রে একটি বৃহৎ পোড়া মাটির শিবদুর্গা গ্রথিত। পূর্বদিকে প্রস্তর নির্মিত মন্দিরটিতে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহার পিছনদিকের দেওয়াল গাত্রে ত্রিপুরা-সুন্দরী, কালী, বৃষ এবং বাল্মিকী আশ্রমে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ও বাল্মিকী চিত্র প্রদর্শিত পোড়ামাটির কাজ আছে।

হাজরাপাড়ায় একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে স্থানীয় হাজরাদিগের প্রতিষ্ঠিত রেখ-দেউল আকৃতির মাঝারি গঠনের আটটি শিবমন্দির আছে। শিবমন্দিরগুলি মাকড়া পাথর নির্মিত। ইহার নিকটে ইষ্টক নির্মিত অষ্টকোণাকৃতি সুন্দর রাসমঞ্চ আছে। প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় এইস্থানে রাসোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন, একটি বিশাল চণ্ডীমণ্ডপ আছে।

স্থানীয় কর্মকারদের বিষ্ণুমন্দিরটি পুরুষোত্তম দাস কর্তৃক এবং দুর্গামণ্ডপটি কেদার দাস কর্তৃক নির্মিত। বলা হয়, দুর্গামণ্ডপটির পিছনদিকে একটি পুষ্করিণী থাকার জন্য ইহার ভিত নির্মাণকালে সীসা ঢালাইয়া ইহার ভিত সুদৃঢ় করা হইয়াছে।

হাজরাদের দ্বারা নির্মিত একটি ছোট মন্দিরে বুড়ারায় নামে খ্যাত একটি ধর্মরাজ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় ও আশ্বিন মাসে নবমী তিথিতে ধূমধামের সহিত বুড়ারায়ের পূজা হয়। নবমী তিথিতে পূজা উপলক্ষে ছাগ, মেষ ও মহিষ বলি দেওয়া হয়।

ভান্নাদীঘির পাড়ে বসন্তচণ্ডীর শীলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বসন্তচণ্ডী সাধারণের এবং স্থানীয় লায়েকেরা ইহার নিত্যপূজা করিয়া থাকেন। পৌষ সংক্রান্তিতে ধূমধামের সহিত অনুষ্ঠিত উৎসবে চারিদিনব্যাপী অখণ্ড নামকীর্তন ও একটি মেলা বসে। মেলায় নানাবিধ জিনিসপত্রের প্রায় সত্তরটি দোকান বসে এবং ছয়-সাত সহস্র নর-নারীর সমাগম হয়। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা কেন্দুলির মেলা নামে খ্যাত।

হাজরাদের শিবমন্দির প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে একটি মাঝারি ধরণের পিতলের রথে নারায়ণ-শিলা স্থাপন করিয়া রথযাত্রার ও পুর্ণযাত্রার দিন রথের দড়ি টানা হয়।

উল্লিখিত পূজা-পার্বণাদি ব্যতীত পাত্রসায়রে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া সর্বজনীন দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে রামনবমী উৎসব পালিত হয়।

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসবের মেলা
(সাধক পাগল হরনাথ)

বেলুট গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সাধক পাগল হরনাথের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে আশ্রম সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবত বসিতেছে।

হামিরপুর, ইন্দল, নারায়ণপুর, পাত্রসায়র প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রধানতঃ গরুরগাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় কয়েকটি ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

দেউলপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে দেউলেশ্বর শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় কুড়ি বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তুইশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের নরনারী নৌকা, গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। বর্ধমান, সালনা, বুদবুদ, পানাগড়, রামগোপালপুর, পাত্রসায়র, সোনামুখী, নারায়ণপুর প্রভৃতি গ্রাম ও শহর হইতে বিক্রেতারা আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা, মাটির পুতুল প্রভৃতির শতাধিক দোকান বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, যাত্রাগান, কবিগান, রামায়ণগান প্রভৃতির দল আসে। ইহা ব্যতীত, মেলায় জুয়া খেলাও হয়।

নারায়ণপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবস্থান সংলগ্ন প্রায় দশ কাঠা জমির উপর তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের নরনারীগণ আসেন এবং মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন প্রভৃতির কয়েকটি দোকান বসে।

পাত্রসায়র গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে কালঞ্জয় শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন 'ভান্না-দীঘি' নামে প্রসিদ্ধ প্রায় এক মাইল বৃহৎ দীঘিটির পাড়ে দশ-বারোদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

বেলুট, বিউর, ইন্দাস, বালসী, কাকটিয়া প্রভৃতি আশ-পাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পনর-কুড়ি সহস্র নরনারী দৈনিক মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, ধামা-কুলা, পান-বিড়ি প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় শতাধিক দোকান বসে। মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, সার্কাস, লটারী, কবিগান, যাত্রাগান প্রভৃতির দল আসে। ইহা ব্যতীত, মেলায় জুয়া খেলা হয়।

বালসী পূর্বপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বাল্লেশ্বর নামে খ্যাত শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিব-মন্দির সংলগ্ন প্রায় চারি বিঘা জমির উপর তুইদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তুই সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, দা-কোদাল, মাটির পুতুল-খেলনা-হাঁড়ি, ফটো তোলার দোকান বসে। বিক্রেতারা পাত্র-সায়র থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিকের দল আসে এবং অনেকে জুয়া খেলিয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বালসী পূর্বপাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত রথ-যাত্রা মেলা এবং মকর সংক্রান্তির মেলা উল্লিখিত মেলা বিবরণী অনুরূপ।

বীরসিংহা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণে সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের মোট প্রায় এক সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন এবং ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস ও নাগরদোলা আসে এবং রামায়ণগান ও যাত্রাভিনয় হয়। অনেকে জুয়া খেলেন। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ-সাতশত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

সালনা গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন জমিতে প্রায় একপক্ষ-কালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা।

মেলায় আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুই সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন এবং ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, ঔষধপত্র, ধামা-কুলা প্রভৃতি জিনিষপত্রের প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও নাগরদোলা আসে এবং কবিগান, যাত্রাভিনয় ও প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা হইয়া থাকে। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় সহস্রাধিক দর্শক বা শ্রোতার সমাগম হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

জামকুড়ি গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজা মণ্ডপ সংলগ্ন এবং রাজরাজেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন প্রায় ছয় বিঘা দেবোত্তর জমির উপর বারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত চব্বিশ বৎসর হইল শুরু হইয়াছে।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত কুশদ্বীপ, বীরসিংহা, বালসী, পাত্রসায়র, বেলুট, বিউর, নারায়ণপুর, রাউৎখণ্ড, ভগলদীঘি প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় তিন সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, মাদুর, জুতো, চা-পান-বিড়ি প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ পাত্রসায়র থানায় অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়। আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক ও নাগরদোলা আসে এবং যাত্রাভিনয় জলসা ও খেলাধূলা হইয়া থাকে। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় সহস্রাধিক দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

মকরস্নানের মেলা

বেন্দা গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ মকর স্নান উপলক্ষে পার্শ্ববর্তী শালীনদীর তীরবর্তী প্রায় দশ-বারো বিঘা জমির উপর সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের শ্যামদাসপুর, সোনামুখী, ধানসিমলা, ধগড়িয়া, বীরসিংহপুর, কাকটিয়া, পাত্রসায়র, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারী ট্রেন ও মোটরবাস করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। কৃষ্ণনগর এবং হাটকৃষ্ণ নগরের বিক্রেতাগণ ময়রা, মনিহারী, বাসন-কোসন, বই-ছবি, দা-কুড়ুল, ধামা-কুলা প্রভৃতি জিনিষ-পত্রের দোকান বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগানের দল আসে এবং প্রায় আড়াই সহস্র শ্রোতার সমাগম হয়।

মাতঙ্গীপূজার মেলা

শালথাঁড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মাতঙ্গীপূজা উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন প্রায় পঁচিশ বিঘা জমির উপর দুই দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

পাত্রসায়র, ইন্দাস, সোনামুখী, খণ্ডঘোষ প্রভৃতি স্থান হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় সহস্র নরনারী মোটর বাস, গরুরগাড়ী, সাইকেল এবং পাল্কী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন,

কাষ্ঠ শিল্প ও মৃৎশিল্পজাত জিনিসপত্রের শতাধিক দোকান বসে। বিক্রেতারা বিভিন্ন স্থান হইতে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে যৎসামান্য তোলা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, নাগরদোলা আসে এবং কীর্তনগান, যাত্রাভিনয় ও সিনেমা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দুই সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

যোগাদ্যাপূজার মেলা

সুগসায়র গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে স্থানীয় অঞ্চলে যোগাদ্যা নামে পরিচিতা শীতলার পূজা উপলক্ষে আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবত বসিতেছে।

আশপাশের গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন সহস্র নরনারী মেলায় আসেন এবং মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, জামা-কাপড়, মাটির হাঁড়ি, কাঁচের চুড়ি, এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িকুঁড়ি প্রভৃতি জিনিসপত্রের শতাধিক দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, নাগরদোলা, ম্যাজিক ও পুতুলনাচের দল আসে রামায়ণগান, যাত্রাভিনয় ও হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।



থানা ঃ ইন্দাস

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ ভগিৎপুর।১।৫।১৩৪।১।৭০।৩৫৪

(ক) বৈরাগী, সদ্গোপ, বাগ্দী ও মুচি। গ্রামটিতে রায়পাড়া, ঘোষপাড়া, বাগ্দীপাড়া, মুচিপাড়া, মণ্ডলপাড়া ও বাগ্দীপাড়া নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ইন্দাস হইতে জেলা-বোর্ডের কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে উত্থান একাদশী উৎসব ও হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা, তিথিতে এবং শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে ঝুলনযাত্রা উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা, শীতলা ও ভগবতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ভগবতীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। জন্য। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি ভগবতীমন্দির ব্যতীত দুইটি শিব, একটি শীতলা এবং একটি মনসা আছে।

শ্রীঅনাদি কুমার দালাল, প্রধান শিক্ষক,
ভগিৎপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ঃ বেলুট, বাঁকুড়া।

২। গ্রাম ঃ গোপালনগর।
৫।১,৮২৮৭৫।২৬৩।১,২৬৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, গোয়ালা, বাগ্দী, হাড়ী, ডোম, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামটিতে বাগ্দীপাড়া, কায়স্থপাড়া, গোয়ালাপাড়া, মোড়লপাড়া, পশ্চিমপাড়া, ডোমপাড়া, হাড়ীপাড়া প্রভৃতি নামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন ইন্দাস হইতে জেলাবোর্ডের কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ২৩শে চৈত্র হইতে চৈত্রসংক্রান্তি পর্যন্ত বুড়াশিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং ভৈরবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত পঞ্চানন্দ এবং একটি মনসা আছে।

শ্রীসনৎ কুমার সরকার, ব্যবসায়ী,
শ্রীতপন কুমার ঘোষ, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ গোপালনগর, পোঃ ; রোল,
বাঁকুড়া।

৩। গ্রাম ঃ হরিপুর।১৫।২৬০৬৪।১৫৭।৬৯৩

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয়, তিলি, সদ্গোপ, নাপিত, ধোপা, তাম্বুলী, কামার, গন্ধবণিক, গোয়ালা, ছুতার, মেটে, বাগ্দী, ডোম, হাড়ী ও মুচি। গ্রামটিতে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। জেলাবোর্ডের কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি হইতে ছয়দিন-ব্যাপী বাঁকুড়ারায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) বাঁকুড়ারায়ের মেলা। পৌষসংক্রান্তি হইতে ছয়দিনব্যাপী। মেলাটি স্থানীয় অঞ্চলে "কুঁড়চি মেলা" নামে পরিচিত এবং ইহা প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে বাঁকুড়রায় নামে খ্যাত কচ্ছপাকৃতি ধর্মরাজশীলা আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে পঞ্চানন্দ ও মনসা আছে।

জনশ্রুতি আছে, গ্রামের পূর্বনাম 'ইন্দ্রহাস' ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হইয়া 'ইন্দাস' হইয়াছে। চতুর্থ রাজা কালুমল্ল ৩৯ মল্লাব্দে বা ৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রহাসের তদানীন্তন নরপতিকে পরাজিত করিয়া ইহাকে স্বীয় রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। ইন্দ্রহাস রাজবংশের নামানুসারে গ্রামটির নাম 'ইন্দ্রহাস' হয়।

শ্রীগণেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, গ্রামসেবক,
ইন্দাস উন্নয়ন সংস্থা,
পোঃ : ইন্দাস, বাঁকুড়া।

৪। গ্রাম : চকসাপুর (মৌজা : সিমুলিয়া)। ৪৬।২৮৭·১৪।৩৩।১৭৮

(ক) একাদশ তিলি, বাগ্দী, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামটিতে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন ইন্দাস হইতে বিষ্ণুপুর-কোতুলপুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। ইহা ব্যতীত, নৌকা করিয়া সাপুড়া এবং পরামিয়াঘাটে নামিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে অজ্ঞাতনামা জনৈক পীরের সমাধিতে উরস্ অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) পীরের মেলা। মাঘ মাসে পাচদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পীরের সমাধি এবং তৎসন্নিহিত স্থানে সুন্দরদাস মহান্ত নামক জনৈক সন্ন্যাসীর সমাধি আছে। জনশ্রুতি আছে যে, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে বাঁকুড়া জেলার পানশিউলি গ্রামে সুন্দরদাস মহন্ত নামক জনৈক সাধু বাস করিতেন। গ্রামে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে তিনি প্রত্যহ শিকার উদ্দেশ্যে যাইতেন। একদা তিনি ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর হইয়া একটি বটবৃক্ষের তলায় বসেন এবং উক্ত স্থানে ফকির সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উক্ত ফকির সুন্দরদাসকে যত্নসহকারে বনের ফলমূল ও পানীয় দ্বারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করেন এবং পরম সন্তুষ্ট হইয়া মহান্ত ফকির সাহেবকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। পরবর্তীকালে উক্ত ফকির সাহেব শা-সাহেব পীর নামে পরিচিত হন এবং তাঁহার দান গৃহীত স্থানের নাম "চকসাপুর" হইয়াছে।

শ্রীরামদুলাল বৈরাগী, শিক্ষক,
চকসাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ : করিশুণ্ডা, বাঁকুড়া।

৫। গ্রাম : আমরুল।৫২।৬১৩·৯৬।১৭৯।১,০৬৪

(ক) ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয়, কামার, তিলি, তাঁতি, কায়স্থ, বৈরাগী, মালি, ময়রা, গরাই, বণিক, কৈবর্ত, মুচি ও বাগ্দী। গ্রামটিতে মাঝিপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, কামার-পাড়া, মণ্ডলপাড়া, মুচিপাড়া, তেলিপাড়া, বাগ্দীপাড়া, কৈবর্তপাড়া প্রভৃতি নামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেতুড় হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাওয়া যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব ও হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দিরে স্বয়ম্ভু শিব এবং একটি মহাপ্রভুমন্দির ব্যতীত চারটি মনসা, একটি ভৈরব এবং একটি চণ্ডী আছে।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
আমরুল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বালসী, বাঁকুড়া।

৬। গ্রাম : করিশুণ্ডা।৫৪।১,০২৫·৪২।৩২০।১,৬২২

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কৈবর্ত, নাপিত, ধোপা বাগ্দী, বর্গক্ষত্রিয় ও মুসলমান। গ্রামটিতে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন ইন্দাস হইতে খোসবাগ—করিশুণ্ডা রোডে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসাপূজা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা ও কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, পৌষমাসে পৌষপার্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ব্যতীত মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে তিনচারদিন-ব্যাপী।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ব্যতীত মনসা এবং কালুরায়, ক্ষুদিরায় নামে ধর্মঠাকুর আছে।

গ্রামটি প্রাচীন। এই গ্রামের আকৃতি অনেকটা হাতিরশুড়ের ন্যায় বলিয়া গ্রামের নাম 'করিশুণ্ডা' হইয়াছে।

শ্রীভূতনাথ সরকার, শিক্ষক,
করিশুণ্ডা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৭। গ্রাম ঃ চারিগ্রাম ।৬৫।৮৪৬·৬০।১৪২।৬২৯

(ক) ব্রাহ্মণ. বৈরাগী, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, গন্ধবণিক, বাগ্দী, ধোপা, কৈবর্ত, ছুতার, তাঁতি, গোয়ালা, কামার, মুচি, হাড়ী ও ডোম। গ্রামটিতে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন সাঁকরোল হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) শিবপূজার মেলা। চৈত্র মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দ, পাঁচটি বাবাঠাকুর এবং দুইটি মনসা আছে।

শ্রীনিত্যানন্দ পাত্র, শিক্ষক,
চারিগ্রাম নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

৮। গ্রাম ঃ বীর সিমুল ।৭০।১,০৩২·৩৫।২৬২।১,১০২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয়, তাঁতি, কামার, গোয়ালা, গন্ধবণিক ও দুলে। গ্রামটিতে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন ইন্দাস হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বৌদ্ধ জয়ন্তী উৎসব ও আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে কালাচাঁদ মহাদেব নামে খ্যাত শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধুমধামের সহিত রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে একদিন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। জনশ্রুতি, মন্দিরটি মল্লরাজ গোপাল চন্দ্র সিংহ কর্তৃক নির্মিত।

শ্রীকানাই লাল বসু, প্রধান শিক্ষক,
গ্রাম : বীর সিমুল, পোঃ ইন্দাস,
বাঁকুড়া।

৯। গ্রাম ঃ শাশপুর ।৭৫।৮৯৮·৫৪।৩৮০।১,৭৪৮

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, তাঁতি, উগ্রক্ষত্রিয়, তিলি, কামার, শাঁখারী, ছুতার, বৈরাগী, কৈবর্ত, বাগ্দী, মুচি, ডোম, হাড়ী, কলু, গন্ধবণিক ও সুবর্ণবণিক। গ্রামটিতে এগারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন সাহসপুর হইতে পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উৎসব এবং কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি সর্বজনীন এবং শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, একটি রাধা-দামোদর-মন্দির এবং তৎসংলগ্ন একটি ঠাকুরবাড়ী ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দ, দুইটি শীতলা এবং দুইটি মনসা আছে!

ডাঃ রবীন্দ্র নাথ দে, সম্পাদক,
শাশপুর উচ্চ বিদ্যালয়,
বাঁকুড়া।

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা (পীরের উরস্ উপলক্ষে)

শিমুলিয়া মৌজার অন্তর্গত চকসাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে অজ্ঞাত নামা জনৈক পীরের উরস্ উপলক্ষে পীরের সমাধিক্ষেত্র সংলগ্ন স্থানে পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

এই জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ে প্রায় দশ সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, জুতা প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় একশত দোকান বসে। বিক্রেতারা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে আসেন, তাঁহাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়। আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে। সুষ্ঠুভাবে মেলা পরিচালনা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দল সহযোগিতা করিয়া থাকেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

করিশুণ্ডা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখে মাসে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর তিন-চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

নিকটবর্তী পাহাড়পুর, আব্দুলপুর, বনপুকুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের তিন-চারশত নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি প্রভৃতি জিনিসপত্রের মাত্র দশ-পনরটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য তরজাগান ও যাত্রাভিনয় হয়।

চারিগ্রাম গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবপূজা উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় তিনবিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের ইন্দাস, সাহসপুর ইত্যাদি স্থান হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নরনারী গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, দা-কোদাল, ধামা-কুলা ইত্যাদির প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হয়।

গোপালনগর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের ২১শে হইতে চৈত্রসংক্রান্তি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বুড়াশিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দূরে প্রায় দুই বিঘা জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী সাইকেল, গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা ইত্যাদি প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে, বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে কোনপ্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ-ছয়শত দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

আমরুল গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন জমিতে সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

নিজ আমরুল, গভবাণবাটী, কেনেটি, রসুলপুর প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রধানতঃ গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় প্রধানতঃ ময়রা, মনিহারী ইত্যাদি জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকানপাট বসে। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য রামায়ণগান, থিয়েটার বা যাত্রাভিনয় হয়।

প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে কালাচাঁদ মহাদেব নামে খ্যাত শিবের গাজন উপলক্ষে বীর সিমুল গ্রামে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, মাটির পুতুল-খেলনা, তেলেভাজা ইত্যাদির দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দুই সহস্র দর্শক বা শ্রোতার সমাগম হয়।

শাসপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বুড়াশিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন হাটতলায় তিন দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের মঙ্গলপুর, দিঘলগ্রাম, আকুই, ইন্দাস, করিশুণ্ডা প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দশ-বারো সহস্র নরনারী প্রধানতঃ ট্রেনে এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতেই প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে।

ধর্মরাজ পূজার মেলা

হরিপুর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি হইতে সাতদিনব্যাপী বাঁকুড়ারায় নামে ধর্মরাজঠাকুরের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রায় চারি-পাঁচ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন থানা হইতে এবং মেদিনীপুর, বর্ধমান ও কলিকাতা হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় সহস্র নরনারী প্রধানতঃ ট্রেন, মোটরবাস, গরুরগাড়ী এবং সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, জামাকাপড়, কৃষিও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা, হাঁড়ি-কলসী, মাদুর, খেলনা-পুতুল, শাঁখা প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় সত্তর-আশিটি দোকান বসে। বিক্রেতারা নানাস্থান হইতে আসেন। আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাগান, পালাগান, কবিগান, হরিনাম কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় এবং এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দুই সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

ভগবতীপূজার মেলা

ভগিৎপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ভগবতীপূজা উপলক্ষে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে প্রায় বিশ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আড়াই-শত বৎসরের প্রাচীন।

লোদনা, বেলুট রসুলপুর, নারায়ণপুর, পাত্রসায়র প্রভৃতি গ্রাম এবং কোতুলপুর থানা ও সোনামুখী থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় পনর-যোল সহস্র নরনারী প্রধানতঃ মোটরবাসে, গরুরগাড়ীতে এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, জামা-কাপড় প্রভৃতি জিনিষপত্রের প্রায় ষাট-সত্তরখানি দোকান বসে। বিক্রেতারা সাধারণত বর্ধমান, পাত্রসায়র, ইন্দাস, বেতুড়, আদরা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন। আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়। ইহা ব্যতীত, অনেকে জুয়া ও লটারী খেলিয়া থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দুই সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

র গ্রামে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

ময়নাপুর

ময়ূরভট্ট বিরোচিত 'ধর্মপুরাণ'— এ বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণদেশে 'ময়না' নামক নগরীতে ক্ষত্রিয়বংশীয় কণক সেনের পুত্র কর্ণসেন নামে জনৈক সামন্ত রাজা বসবাস করিতেন। তিনি গৌড়েশ্বরের অধীন ছিলেন। উত্তর-রাঢ়ের ঢেকুরগড়ের ইছাই ঘোষকে দমন করিতে গিয়া তাঁহার ছয় পুত্র নিহত হয় এবং সেই শোকে তাঁহার পত্নী প্রাণ বিসর্জন দেন। বৃদ্ধ বয়সে কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে বিবাহ করেন এবং ধর্মরাজের কৃপায় তাঁহার গর্ভে লাউসেন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। লাউসেনের সহিত তাঁহার মাতুল মহামদের বিরোধ ও তাহার মধ্য দিয়া ধর্মরাজের মহাত্ম্য প্রচারিত হয়।

কলিযুগে রামাই পণ্ডিত বল্লুকা নদীর তীরে ধর্মমন্দির গঠন করিয়া ধর্মরাজের পূজার প্রচলন করেন। মার্কণ্ডেয় মুনির শিষ্য 'শূণ্যপুরাণ' রচয়িতা রামাই পণ্ডিত নবম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

'ধর্মপুরাণ'-এ বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠানে সাবিত্রীর অভিশাপে বিষ্ণু শিলারূপ ধারণ করিয়া বল্লুকা নদীর গর্ভে নিহিত ছিলেন। এই কারণে ইহা অতি পবিত্র নদী বলিয়া মনে করা হয়। নদীগর্ভে নিহিত থাকা কালে বজ্রকীটে উক্ত বিষ্ণুশীলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে। ঐরূপ প্রতিটি শিলাখণ্ড ধর্মরাজশীলা নামে খ্যাত। উহার বিভিন্ন আকার ও লক্ষণ বিচার করিয়া বিভিন্ন নামে শিলাগুলি পূজিত হয়। যেমন— যাত্রাসিদ্ধি, স্বরূপনারায়ণ, ক্ষুদিরায়, জগতরায়, কৌতুক-রায়, বৃদ্ধরায়, সুন্দররায়, কালুরায়, বাঁকুড়ারায়, ধিয়ানরায়, মদনরায় প্রভৃতি। পুরাণে ধর্মরাজকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন মনে করা হইলেও পণ্ডিতগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠানে কালের স্রোতে অনেক প্রকার সাধনার ধারা মিশিয়া গিয়াছে। অনেকে ধর্মরাজপূজার মধ্যে বৌদ্ধদের দেবদেবীপূজার প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। আবার কাহারও মতে ধর্মঠাকুর অনার্য দেবতা। রাঢ়বঙ্গে ধর্মরাজ পূজার প্রসার সর্বাপেক্ষা বেশী।

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মরাজ পূজার অন্যতম পীঠস্থানরূপে ময়নাপুরকে চিহ্নিত করা যাইতে পারে। অতি প্রাচীন-কাল হইতে ধর্মরাজকে কেন্দ্র করিয়া এই গ্রামে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে। বলা হয়, 'শূন্যপুরাণ' রচয়িতা রামাই পণ্ডিত এই ময়নাপুরেই বসবাস করিতেন এবং দাবী করা হয় পুরাণোক্ত ময়নাগড়ই বর্তমান বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার অধীন ময়নাপুর। রানী রঞ্জাবতী পুত্র-কামনায় ধর্মরাজকে প্রসন্ন করিতে যে চম্পানদীর ঘাটে তপস্যায় লিপ্ত ছিলেন পুরাণোক্ত ঐ চম্পানদী ময়নাপুরের নিকট-বর্তী কোন অঞ্চলে প্রবাহিত ছিল। এই প্রসঙ্গে প্রমাণ দেওয়া হয় যে, পূর্বে বাঁকুড়া হইতে বর্ধমান পর্যন্ত প্রবাহিত দারকেশ্বর নদীর অংশকে চাঁপাইনদী বলা হইত। এই চাঁপাই নদী উল্লিখিত চম্পা নদী হইতে অভিন্ন মনে করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মেদিনীপুর জেলার ময়নাগড় নামে একটি স্থান আছে এবং এই ময়নাগড়ও ধর্মরাজপূজার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। অনেকে দাবী করেন পুরাণোক্ত ময়নাগড়ই বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ময়নাগড়।

ময়নাপুর এক প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বর্ষাকাল ব্যতীত বাঁকুড়া-জয়পুরগামী মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রামে যাতায়াতের রাস্তাটি কাঁচা। বর্তমানে গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, একাদশ তিলি, সদ্‌গোপ, কামার, কুমার, বেনে, জেলে, নাপিত, মাঝি, ডোম ও মুসলমানদের বসবাস আছে। গ্রামটিকে সদ্‌গোপ প্রধান বলা যাইতে পারে। সদ্‌গোপদের পরেই তিলি ও ব্রাহ্মণদের সংখ্যাই বেশী। গ্রামে মোট সাতাশটি পাড়া আছে। যেমন—ঘোষালপাড়া, বারুইপাড়া, চৌধুরীপাড়া, বাগদীপাড়া, দেওয়ানপাড়া, সেনপাড়া, বাজারপাড়া, কামারপাড়া, পুরাতন মনসাতলা-পাড়া প্রভৃতি। বলা হয় ধোপা ব্যতীত সকল সম্প্রদায়ের লোকজন এই গ্রামে বসবাস করেন। গ্রামের জমিদার

ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের বাড়ীর নিকট পুষ্করিণীর পাড়ে দুইটি শিবমন্দির আছে। গ্রামে ডাকঘর ও স্কুল আছে। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে এই গ্রামের আয়তন ১,০৯৭.১৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২,৭৯৭।

ময়নাপুর গ্রামের হাটতলায় হাকন্দমন্দির নামে পরিচিত মাকড়াপাথর নির্মিত মাঝারি গঠনের একটি প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরটি 'হাকন্দপুষ্করিণী' নামে একটি পুষ্করিণীর পাড়ে অবস্থিত এবং কালের প্রভাবে এতই জীর্ণ যে, যে-কোন সময় ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। ইহা উড়িষ্যা-স্থাপত্যরীতিতে গঠিত এবং পূর্বে এই মন্দিরের সহিত একটি জগমোহন সংযুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে জানা যায় যে, ইংরাজি ১৯৬১-৬২ সালে প্রখর গ্রীষ্মে 'হাকন্দপুষ্করিণীর' জল শুষ্ক হইয়া গেলে পঙ্কোদ্ধারকালে উহার মধ্যস্থলে একটি মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। চূড়াটির চারিধার হইতে প্রায় চারি হাত খনন করিবার পর অর্থাভাবহেতু খননকার্য পরিত্যক্ত হয়। গ্রামবাসীগণ অনুমান করেন, সম্পূর্ণ মন্দিরটি সম্ভবত মাকড়াপাথর দ্বারা নির্মিত। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, 'হাকন্দপুষ্করিণী'র মধ্যস্থলে যে একটি মন্দির আছে এইরূপ জনশ্রুতি এই অঞ্চলে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। কিংবদন্তী আছে যে, রামাই পণ্ডিত উক্ত মন্দিরের গর্ভে গোপনে ধর্মরাজ-পূজা ও সাধনভজন করিতেন। হাকন্দপুষ্করিণীর পাড়ে উল্লিখিত হাকন্দমন্দির হইতে একটি সুড়ঙ্গ পথ দিয়া পুষ্করিণীর মধ্যস্থিত ঐ মন্দিরে যাতায়াত চলিত। বর্তমানে হাকন্দমন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ইহা হাকন্দেশ্বর শিবমন্দির নামে খ্যাত। অবশ্য উল্লিখিত সুড়ঙ্গ পথটির আজ আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। হাকন্দেশ্বর শিবের নিত্যপূজা এবং চৈত্র মাসে গাজন উৎসব হয়। চৈত্র-বারুণীতিথিতে আশপাশের অঞ্চলের লোকজন হাকন্দপুষ্করিণীতে পুণ্যস্নান করিয়া শিবপূজা করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী নামকীর্তন মহোৎসব ও হাটতলায় মেলা বসিয়া থাকে।

গ্রামে পূর্বমুখী সমতল ছাদবিশিষ্ট একটি সাধারণ মন্দিরে কাঠের মঞ্চে চতুষ্কোণ মণ্ডলের মধ্যে অনন্তনাগবেষ্টিত কূর্মমূর্তি, তাহার উপর বিষ্ণুপাদপদ্ম অঙ্কিত ধর্মরাজশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনি যাত্রাসিদ্ধি ধর্মরাজ নামে খ্যাত। এই মন্দিরে একই কাষ্ঠ মঞ্চের উপর যাত্রাসিদ্ধি ব্যতীত আরও অনেকগুলি ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির শিলা আছে। উহার মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত কূর্মাকৃতি একটি বড় ধর্মরাজশিলাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, একটি শিবলিঙ্গ, পদ্মাসনের উপর প্রায় এক ফুট উচ্চ প্রস্তরনির্মিত চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি, একটি চতুষ্কোণ শিলায় খোদিত বিষ্ণু-পাদপদ্ম, পিতলনির্মিত একটি দেবীর মুখমণ্ডল এবং মঞ্চের উভয় পার্শ্বে ধর্মরাজের শক্তি-স্বরূপা দুইটি পিতলের কলসীর মুখে দুইটি পিতলের মুখমণ্ডল স্থাপিত আছে। উক্ত উভয় মুখমণ্ডলের উপর শঙ্খ দ্বারা নির্মিত চক্ষুগুলি গালা দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, মঞ্চের উপর প্রস্তর নির্মিত একটি হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, পূর্বে হস্তীর উপর কোন দেব-দেবী বা মাহুতের মূর্তি স্থাপিত ছিল। বর্তমানে উক্ত হস্তীর সহিত সংলগ্ন হাঁটুর নীচে হইতে কেবলমাত্র একটি পা দেখিতে পাওয়া যায়।

পণ্ডিত পদবীধারী (বর্তমানে শ্রীসিদ্ধেশ্বর পণ্ডিত) ব্রাহ্মণেরা যাত্রাসিদ্ধি ধর্মরাজসহ উল্লিখিত দেব-দেবীর নিত্যপূজা করিয়া থাকেন। ইঁহারা নিজদিগকে রামাই পণ্ডিতের বংশধর বলিয়া দাবী করেন। যাত্রাসিদ্ধি ধর্মরাজ মন্দিরের সন্নিকটে মাটির ঘরে কয়েক ঘর 'পণ্ডিত' উপাধিধারী ব্রাহ্মণের বসবাস আছে। তাঁহারা বলেন যে, বর্তমান সিদ্ধেশ্বরমন্দির সংলগ্ন স্থানেই রামাই পণ্ডিতের বাস্তুভিটা ছিল এবং প্রাচীন ধর্মরাজ মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখে সর্ব-সাধারণের অর্থানুকূল্যে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির নিকট একটি লম্বা মাকড়াপাথর বাঁধান স্থান আছে। বলা হয়, এই স্থানেই রামাই পণ্ডিতের দেহাবশেষ সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময় রামাই পণ্ডিতের সমাধিবেদীর উপর যাত্রাসিদ্ধি ধর্মরাজ স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা ও সয়লা উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে মেয়েরা মেয়েদের সহিত এবং ছেলেরা ছেলেদের সহিত ধর্মসাক্ষী করিয়া পরস্পরের গলায় মালা দিয়া আজীবন বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। সয়লা উৎসবে আশপাশের গ্রাম হইতেও লোকজন আসেন।

যাত্রাসিদ্ধি ধর্মরাজ ব্যতীত ময়নাপুর গ্রামের চৌধুরী-পাড়ায় বাঁকুড়ারায় নামে এবং বাড়ুইপাড়ায় ক্ষুদিরায় নামে ধর্মরাজশীলা দুইটি পৃথক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। বাঁকুড়া-রায় শিলামূর্তিটি অষ্টদল পদ্মের উপর কূর্মমূর্তি তাহার উপর চতুষ্কোণ মণ্ডলে দ্বাদশাবতার মূর্তি ও বিষ্ণুপাদপদ্ম খোদিত। বর্তমানে সর্বশ্রী সুধীর প্রমাণিক, শক্তি প্রমাণিক ও তাহাদের অপর দুই ভ্রাতা পালাক্রমে সারা বৎসর বাঁকুড়া-রায় ধর্মরাজের সেবায়েতের কাজ করিতেছেন। বলা হয় প্রায় সাতপুরুষ ধরিয়া ইঁহারা ধর্মরাজের সেবায়েত নিযুক্ত আছেন। জনশ্রুতি আছে, রামাই পণ্ডিত যাত্রাসিদ্ধি, ক্ষুদিরায় ও বাঁকুড়ারায় ধর্মরাজ শিলা একই মন্দিরে একত্রে পূজা করিতেন। যশাই পণ্ডিতের আমলে পশ্চিম হইতে একদল সাধু তাঁহাদের আরাধ্য বহু শালগ্রাম শিলা সঙ্গে করিয়া ময়নাপুর গ্রামে আসেন এবং যশাই পণ্ডিতের ধর্মরাজ শিলা অপেক্ষা তাঁহাদের শিলা জাগ্রত ঈশ্বর বলিয়া দাবী করেন। এই তর্কের মীমাংসার জন্য স্থির হয় যে, উক্ত তিন ধর্মরাজ শিলাসহ সাধুদের শালগ্রাম শিলাগুলি একটি পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেওয়া হইবে এবং যে শিলা অগ্রে জলের উপর আপনা-আপনি ভাসিয়া উঠিবে তিনিই জাগ্রত বলিয়া মানিতে হইবে। তদনুসারে ময়নাপুর গ্রামের বর্তমান দেওয়ানপাড়ার তেঁতুলে পুষ্করিণীতে ধর্মরাজ শিলাসহ সমগ্র শালগ্রাম শিলাগুলি জলে নিক্ষেপ করা হইলে প্রথম যাত্রাসিদ্ধি, পরে ক্ষুদিরায় জলে ভাসিয়া উঠে; কিন্তু বাঁকুড়ারায় ধর্মশিলার জলে ভাসিয়া উঠিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয় বলিয়া ক্রোধবশতঃ যশাই পণ্ডিত একটি তামার পাত্র দ্বারা বাঁকুড়ারায়ের দক্ষিণপদে আঘাত করেন এবং ইহাতে বাঁকুড়ারায়ের দক্ষিণপদ ভগ্ন হইয়া ক্ষত স্থান হইতে রক্তক্ষরণ হইতে থাকে। যশাই পণ্ডিত প্রতিজ্ঞা করেন পর দিবস প্রভাতে প্রথম যাঁহার মুখদর্শন করিবেন তাঁহাকেই ঐ ভগ্নপদ বাঁকুড়ারায় ধর্মরাজ শিলাটিকে দান করিবেন। প্রতিজ্ঞানুসারে পর-দিবস তিনি চৌধুরীপাড়া নিবাসী জনৈক প্রমাণিককে উক্ত বাঁকুড়ারায় শিলাটি দান করেন। পরে বাড়ুইপাড়া নিবাসী বাড়ুইদের ক্ষুদিরায় শিলাটিকে দান করেন এবং নিজে স্বয়ং যাত্রাসিদ্ধি শিলাটিকে সেবা-পূজাদি করিতে থাকেন। সেই হইতে পুরুষানুক্রমে প্রমাণিকদের মন্দিরেই বাঁকুড়ারায়ের নিত্যপূজাদি হইতেছে। নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর মকরসংক্রান্তি তিথিতে পাঁঠাবলিসহ সাড়ম্বরে বাঁকুড়ারায়ের বার্ষিক ভোগ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বাঁকুড়ারায়ের নিত্যপূজারি শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী; ইনি কাশপ্যগোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, গ্রামবাসীগণ বলেন পরবর্তীকালে তেঁতুলে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় অনেকগুলি শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়; উহার কয়েকটি যাত্রাসিদ্ধি মন্দিরে রক্ষিত আছে।

বাড়ুইপাড়ার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদিরায় ধর্মশিলার নিত্যপূজা ও বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান পূজারী শ্রীসত্যসাধন ভট্টাচার্য।

বাঁকুড়া জেলায় ধর্মরাজ ও মনসা পূজার প্রচলন খুব বেশী। বৎসরের বিভিন্ন সময় বিশেষতঃ চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামে ধর্মরাজপূজা ও ধর্মরাজের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সব গ্রামে ধর্মরাজ নাই; আবার সব ধর্মরাজ শিলাই ষোল আনা ধর্মরাজ শিলা নয়। ষোল আনা ধর্মরাজ শিলা ব্যতীত গাজন হয় না। এই কারণে আশপাশের বিভিন্ন গ্রামে ধর্মরাজ পূজা বা গাজন উৎসব পালনের জন্য ময়নাপুর গ্রাম হইতে ধর্মরাজ শিলা নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং ময়নাপুর মন্দিরে এইজন্য কিছু মান্য দক্ষিণা দিতে হয়।

ময়নাপুর গ্রামে ধর্মরাজঠাকুরের 'গৃহভরণ গাজন' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎসব। মূলতঃ যাত্রাসিদ্ধি ধর্মরাজকে কেন্দ্র করিয়া এই উৎসব পালন করা হয়। বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া হইতে শুরু হইয়া বৈশাখী পূর্ণিমায় এই উৎসব শেষ হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গৃহভরণ গাজন এক বিরাট ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং ইহার আয়োজনও বিপুল। এই কারণে প্রতি বৎসর এই উৎবের আয়োজন করা গ্রামবাসীর পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। সাধারণত দশ-বারো বৎসর অন্তর এই অঞ্চলের গ্রামবাসীরা সমবেতভাবে এই উৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন। ময়নাপুরের ধর্মরাজের গাজন একটি আঞ্চলিক সর্বজনীন উৎসব বলা যাইতে পারে।

প্রায় মাসাধিকাল পূর্ব হইতে উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়। প্রস্তুতিকালে পূজার বিবিধ উপাচার সংগ্রহ, মন্দির সংস্কার, পূজামণ্ডপ নির্মাণ ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। গ্রামবাসীরা নিজ নিজ গৃহ-সংস্কার ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন। আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় আট-দশ হাজার নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন, গাজন উৎসব শুরু হইবার পূর্বে নূতন মাটির হাঁড়িতে ধর্মের নির্মাল্য দিয়া গ্রামের কতিপয় ব্যক্তির বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয়। উৎসব শুরু হইলে তাঁহারা ঐ হাড়ীতে ধর্মরাজ পূজার নানাবিধ উপাচার দিয়া গাজন মণ্ডপে পাঠাইয়া দেন। ইহাকে 'মান্যহাড়ী' বলে।

ধর্মরাজের গাজন উপলক্ষে ময়নাপুর গ্রামে বর্তমানে পঁচিশ হইতে ত্রিশ জন নরনারী সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের যে-কোন লোকই সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। সাধারণভাবে ইঁহাদিগকে ভক্ত্যা বলা হয়। ভক্ত্যাদের ধর্মান্তরিত করিয়া গলায় উত্তরীয় পরাইয়া দেওয়া হয়। উৎসবের বারোদিন ভক্ত্যারা শুদ্ধাচারে জীবনযাপন করেন এবং একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন ধর্মপূজা ও গাজন উৎসবে নানা আচার অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, কমপক্ষে বারোজন পুরুষ ও চার জন নারী ভক্ত্যা ব্যতীত গাজন উৎসব করা যায় না। নারী ভক্ত্যাদের 'আমিনী' বলা হয়। ভক্ত্যাদের মধ্যে একজন 'পাটভক্ত্যা' ও একজন 'রাজভক্ত্যা' থাকেন। পাটভক্ত্যা অন্যান্য ভক্ত্যাদের পরিচালনা করিয়া থাকেন। বর্তমানে সর্বশ্রী মনোহর বাড়ুই ও সীতারাম সিং যথাক্রমে, পাটভক্ত্যা ও রাজভক্ত্যার কর্তব্য পালন করিতেছেন। ইঁহাদের পুরুষানুক্রমেই এই রীতি পালন করিতে হয়। ময়নাপুর গ্রামে বাগদীপাড়া, ঘোষালপাড়া ও পালপাড়া হইতে গাজন উৎসবে একজন করিয়া 'আমিনী' হইয়া থাকেন। দেবতার প্রীতির উদ্দেশ্যে ভক্ত্যা বা আমিনীদের গাজন উৎসবে শালেভর বা প্রণামখাটা, আগুনঝাপ, হিন্দোলসেবা, নবখণ্ড পর্ব ইত্যাদি পালন করিতে হয়।

অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্বদিন ধর্মরাজের অধিবাস হয় এবং পরের দিন সকালে সুসজ্জিত গাজন মণ্ডপের মধ্যস্থিত চতুষ্কোণ মাটির বেদীটিকে শোধনপূজা ও বেদীবন্ধন পাঠ করিয়া যাত্রাসিদ্ধি সহ বাঁকুড়ারায় ও ক্ষুদিরায় ধর্মরাজ শিলা উক্ত বেদীর উপর স্থাপন করিয়া সারাদিনব্যাপী ষোড়শোপচারে পূজাদি হইয়া থাকে। চারিবেদের সমন্বয়ে রচিত সাংজাতোক্ত মতে ধর্মরাজের গাজন-পূজাদি হইয়া থাকে। ধর্ম পূজারীরা 'সাংজাত'-কে পঞ্চ বেদ বলিয়া মনে করেন। গাজনের কয়দিন মূল পূজাদি উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ দ্বারা করান হয়। কারণ ইহা গ্রাম ষোলো আনার পূজা এবং সর্বসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত ব্রাহ্মণই ইহার পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। বর্তমানে শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী (বাঁকুড়ারায় ধর্মরাজের পূজারী) গাজন উৎসবে পৌরহিত্য করিতেছেন। অবশ্য পণ্ডিত পদবীধারী ব্রাহ্মণগণ গাজন উৎসব উপলক্ষে পুরাণ পাঠ, ভক্ত্যাদের ধর্মান্তরিত ও উত্তরীয় দান ও মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি আনুসাঙ্গিক ক্রিয়া-কর্মাদি করিয়া থাকেন।

তৃতীয়া হইতে একাদশী তিথির মধ্যে প্রথম যে শনি অথবা মঙ্গলবার পড়ে সেইদিন রাত্রিকালে কামিণ্যা ঘট ভরা ও কামিণ্যাপূজা করা হয়। এই পর্ব উপলক্ষে একটি নির্দিষ্ট পুষ্করিণীর ঘাটে কামিণ্যার আবহন, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও অধিবাসের পর পুষ্করিণীর জলের মধ্যে একটি মাগুর মাছ বা ছাগ বলি দিয়া রক্ত মিশ্রিত ঐ জল কামিণ্যা ঘটে ভরিয়া লওয়া হয় এবং পাটভক্ত্যা ঐ ঘট মাথায় লইয়া বাজনা-বাদ্যসহ শোভাযাত্রা করিয়া গাজন মণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ঘটটিকে বেদীর উপর ধর্মরাজের বাম-ভাগে স্থাপন করিয়া যথারীতি আড়ম্বরের সহিত ধর্মরাজ ও কামিণ্যাদেবীর পূজা করা হয়। এই শোভাযাত্রায় ভক্ত্যা, আমিনীসহ গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও অংশ গ্রহণ করেন।

দ্বাদশী তিথিতে ভক্ত্যা, আমিনীর ও গ্রামবাসীগণ সাড়ম্বরে সুসজ্জিত চতুর্দোলা ও বাজনা-বাদ্যসহ শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামের একটি নির্দিষ্ট বাড়ী হইতে 'মুক্তির'-র হাঁড়ি আনিতে যান এবং ঐ বাড়িতে অধিবাস ও পূজার পর মুক্তির হাঁড়িটিকে চতুর্দোলায় করিয়া গাজন-মণ্ডপে আনা হয়। মুক্তির হাঁড়িতে কিছু চাল ও পুষ্পমাল্য থাকে। মুক্তিদেবীকে ধর্মরাজের পত্নীরূপে কল্পনা করিয়া গাজন মণ্ডপে ধর্মরাজের সহিত যথারীতি পূজা হয়। মুক্তি-হাঁড়ীর অধিবাস-পূজাদির সময় ধানের জন্ম বিবরণী পাঠ করিতে হয়।

এয়োদশী তিথিতে সন্ধ্যায় ভক্ত্যারা একটি নির্দিষ্ট গামীর গাছের নীচে ঘটস্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা ও গামীর গাছের সৃষ্টি বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া উহার একটি শাখা ভাঙ্গিয়া গাজন-মণ্ডপে আনেন। ঐ গামীর শাখার সহিত লৌহ শলকা লাগাইয়া ভক্ত্যাদের দেহে বান বিদ্ধ করা হয়।

চতুর্দ্দশী তিথিতে 'রাতগাজন' পর্ব উপলক্ষে শোভাযাত্রা সহকারে ধর্মরাজের পাদুকা বহন করিয়া 'নিরঞ্জন সায়র' নামে একটি নির্দিষ্ট পুষ্করিণীর ঘাটে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় ধর্মরাজের পাদুকা পূজা, পাট স্নান ও ভক্ত্যা স্নানের পর পুনরায় শোভাযাত্রা করিয়া ধর্মরাজের পাদুকা গ্রামের হাটতলায় আনা হয়। এই স্থানে পাদুকা পূজার পর উহা গাজন-মণ্ডপে আনিয়া স্থাপন করা হয়। পাদুকা পূজার শোভাযাত্রার সহিত ধর্মরাজের নিকট উৎসর্গকৃত বলির ছাগ বা 'লুইয়া'-কে ঘোরান হয়।

গাজন-মণ্ডপে প্রত্যাবর্তনের পর ভক্ত্যারা প্রথম হিন্দোল এবং পরে আগুন ঝাঁপ ও নবখণ্ড পর্ব পালন করেন। হিন্দোল পর্ব উপলক্ষে বাঁশের মাঁচার উপর পায়ে ভর দিয়া হেঁটমুণ্ড অবস্থায় নীচে প্রজ্বলিত অগ্নির শিখার মধ্যে ভক্ত্যাদের দোল খাইতে হয়।

আগুণ ঝাঁপ উপলক্ষে শ্মশান হইতে সংগৃহীত অর্ধদগ্ধ কাঠে অগ্নি সংযোগ করিয়া জলন্ত অঙ্গারের মধ্য দিয়া ভক্ত্যারা নগ্নপদে যাতায়াত করেন।

নবখণ্ড পর্ব উপলক্ষে গাজন মণ্ডপের নিকট একটি কূপ খনন করিয়া উহাতে জল ঢালিয়া কর্দমাক্ত করিয়া রাখা হয়। ইহাকে 'হাকন্দ পুকুর' বলে। হাকন্দ পুকুরের চারিধারে চারিটি কলাগাছ পুঁতিয়া দেওয়া হয়। উক্ত কর্দমাক্ত পুকুরের মধ্যে নবখণ্ড ব্রতধারী ভক্ত্যা আকণ্ঠ ডুবাইয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহার কণ্ঠে জবাফুলের মালা ও জিহ্বায় একটি লৌহ ত্রিশূল গাঁথিয়া দুই হাতে ও মাথার উপর মোট তিনটি ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়। এই সময় জনৈক ভক্ত্যা কুকুর সাজিয়া হাকন্দ পুকুরের নিকট মৃতবৎ পড়িয়া থাকেন এবং আমিনী ও অন্যান্য ভক্ত্যারা পুকুর পাড়ে বসিয়া কাঁদিতে থাকেন। উহা ছাড়া একজন গায়ক সুর করিয়া লাউসেনের প্রাণদান ও পশ্চিমে সূর্যোদয় প্রদর্শন পালা গান করিতে থাকেন এবং পণ্ডিত পদবীধারী জনৈক ব্রাহ্মণ সাংজাত পুঁথি পাঠ করেন। ময়নাপুর গ্রামে ধর্মরাজ পূজা উপলক্ষে শ্রীরাম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'ধর্মমঙ্গল' পুঁথি পাঠ করা হয়। এইরূপে প্রায় তিনঘণ্টাব্যাপী পূজার পর নবখণ্ডব্রতধারীকে পুকুর হইতে তুলিয়া ধর্মরাজ মন্দির প্রদক্ষিণের পর তাঁহার দেহ হইতে ত্রিশূল বান খুলিয়া ফেলা হয়।

পূর্ণিমা তিথিতে সারাদিনব্যাপী ধর্মরাজপূজা ও হোম-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর ধর্মরাজের নিকট উৎসর্গকৃত ছাগ বলি দিয়া পূর্ণাহুতি দেওয়া হয়। বলি ছাগকে 'লুইয়া' বা চলতি কথা 'লুয়ে' বলা হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, গ্রামবাসীগণ গৃহভরণ গাজনের সংকল্প করিলে একটি শুভদিন দেখিয়া সম্পূর্ণ কালো রংয়ের একটি পাঁঠাকে সংস্কার এবং ধর্মরাজের নামে উৎসর্গ করিয়া উহার গলায় লাল শালুকাপড় বাঁধিয়া এবং চারিপায়ে চারিটি লোহার বেড়ী ও কপালে সিঁদুর দিয়া ছাড়িয়া দেন। ধর্মরাজের নিকট উৎসর্গকৃত 'লুইয়া' আপন ইচ্ছায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া বেড়ায়। স্বেচ্ছায় ভ্রমণকারী এই 'লুইয়ার' কেহ কোনরূপ ক্ষতি করিতে সাহস করেন না। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, গৃহভরণ গাজনের ঢাকে কাঠি পড়িলে 'লুইয়া' যেখানেই থাকুক আপনা-আপনি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়।

পূর্ণিমার দিন বলির পূর্বে 'লুইয়ার' স্নান ও পূজা হয়। লুইয়াকে বলি দিবার জন্য হাঁড়ি কাঠে আবদ্ধ করা হয় না। বলির মুহূর্তে লুইয়া মোহগ্রস্তের মত আপনি আসিয়া স্মৃতি কাঠে গলা দিয়া দাঁড়ায় এবং বলি প্রদানকারী গাজনমণ্ডপ হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া খড়্গের দ্বারা লুইয়ার শিরচ্ছেদ করেন। বলির পর ছাগ মুণ্ডটিকে পুষ্পমাল্য দ্বারা সজ্জিত একটি নূতন মাটির হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া উহার মুখে মন্ত্রপূত দুগ্ধ ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর হাঁড়ির মধ্যে একটি ঘৃত প্রদীপ ও পঞ্চফল রাখিয়া হলুদ রংয়ের এক খণ্ড নূতন কাপড় দ্বারা হাঁড়ি মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং একখণ্ড নূতন কাপড়ে পঞ্চশস্য বাঁধিয়া হাঁড়ির গলায় ঝুলাইয়া দিয়া হাঁড়িটিকে গাজন-মণ্ডপে সযত্নে রক্ষা করা হয়।

পরের দিন প্রতিপদ তিথিতে পূজাদির পর ভক্ত্যা, আমিনী, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সহ গ্রামের অগণিত নরনারী বাজনা-বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া ধর্মরাজ পূজার ঘট ও ছাগ মুণ্ড রক্ষিত হাঁড়িটিকে ধর্ম মন্দিরের উত্তরদিকে

'নন্দপুকুর' নামে একটি নির্দিষ্ট পুষ্করিণীতে বিসর্জন দিয়া গাজন মণ্ডপে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভক্ত্যারা তাঁহাদের উত্তরীয় ত্যাগ করেন এবং পূজা মণ্ডপে সমবেত নরনারী ও ভক্ত্যাদের মস্তকে শান্তিজল প্রদান করিলে ময়নাপুর গ্রামের গৃহভরণ গাজনের সমাপ্তি ঘটে। ইহার পর যাত্রাসিদ্ধি, বাঁকুড়ারায় ও ক্ষুদিরায় ধর্মশিলাকে স্ব স্ব মন্দিরে লইয়া গিয়া স্থাপন করা হয় এবং ভক্ত্যা ও আমিনীরা গায়ে হলুদ মাখিয়া স্নানাদির পর সন্ন্যাস ব্রত ত্যাগ করিয়া পুনরায় দৈনন্দিন সংসার কার্যে নিয়োজিত হয়। এই দিন ধর্মরাজের নিকট উৎসর্গকৃত অন্নভোগ ও লুইয়ার মাংস রন্ধন করিয়া ভক্ত্যা, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ও গ্রামবাসীদের ভোজন করান হয়।

ময়নাপুর গ্রামে ধর্মরাজ ব্যতীত অন্যান্য আরো কয়েকটি দেবদেবী আছেন। গ্রামের ঈশানকোণে একটি পুষ্করিণীর পাড়ে কুসুম গাছের নীচে চণ্ডীর ঘট স্থাপিত আছে। প্রতি বৎসর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে চণ্ডীর বারোয়ারী পূজা হয়। বাড়ুইপাড়ায় একটি শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; ইনি গ্রামের ষষ্ঠিদেবী। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠি পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে শীতলা ও বড়াম্ ঠাকুর আছেন এবং স্থানীয় জমিদার মুখোপাধ্যায়দিগের বাড়ীর নিকট কালীঠাকুর ও পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। গ্রামে প্রতি বৎসর বারোয়ারী শারদীয়া দুর্গোৎসব, কালী-পূজা ও সরস্বতী পূজা হয়।

ইহা ভিন্ন, গ্রামের হাটতলায় পাথর ও ইঁট দ্বারা নির্মিত সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি বৃহৎ মন্দির আছে। ইহাকে কৈলাসধাম বলা হয়। মন্দিরটি সাধারণের এবং সম্ভবতঃ ১২৬৫ বঙ্গাব্দে নির্মিত। কৈলাসধামের উপরের ছাদ ও দেওয়াল গাত্রে সিমেণ্ট-বালি দ্বারা জমান হিন্দুর পৌরাণিক নানা দেবদেবী ও পশুপক্ষীর মূর্তি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। কৈলাসধামে নিত্যপূজা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'গৃহভরণ গাজন' এক বৃহৎ অনুষ্ঠান এবং বারোদিন ব্যাপী এই উৎসবের প্রতিদিন নানা খুঁটিনাটি আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। দুর্ভাগ্য-বশতঃ বর্তমান প্রবন্ধাকার এই উৎসব প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত। পূজা-পার্বণ সম্পর্কে তথ্য-বিবরণী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালে ময়নাপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারেন যে, গত ১৯৬৫ সালে ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কবে আবার এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে সেই সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কেহ কিছু বলিতে পারেন না। যদিও গ্রামবাসীগণ সবিশেষ যত্ন সহকারে গাজন উৎসবের প্রতিদিনকার আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য বিবরণী দিয়া লেখককে সাহায্য করিয়াছিলেন; তথাপি লেখকের অজ্ঞানতাবশতই হোক অথবা সংবাদ সরবরাহকারীদের এই বৃহৎ পর্বের দৈনন্দিন বিবরণী পারম্পর্যভঙ্গের জন্যই হোক ধর্মরাজ গাজনের আচরণীয় অনুষ্ঠানগুলির সকল খুঁটিনাটি পর পর সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হইল না। ইহার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, ময়নাপুর গ্রামে ধর্মরাজের গাজন উৎসব উপলক্ষে যে আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাহা ১৩১০ বঙ্গাব্দে হুগলী জেলার গোঘাটা থানার অন্তর্গত শ্রীআশুতোষ পণ্ডিত কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্রীধর্মপুরাণ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত 'গৃহভরণ গাজন' সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণীর সহিত প্রায় হুবহু মিল দেখিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য নিম্নে উহা উদ্ধৃত করা হইল।

গৃহভরণ গাজনের বিবরণ

গৃহভরণ গাজন ধর্মপুরাণ বা সাংজাত মতে ধর্মব্রত বলিয়া কথিত। কিন্তু এই ধর্মব্রত একা সহজে কেহ করিতে পারে না। মানসিক থাকিলে কদাচিৎ কেহ একা এই ব্রত করিতে বাধ্য হয়। অনেক লোক ইহাকে ব্রত মনে না করিয়া ঠাকুরের পর্ব বলিয়াই ধারণা করে।

যে সমস্ত ধর্মঠাকুর সমগ্র গ্রামের, কিম্বা যাঁহার আয় বেশী, সেই সমস্ত ঠাকুরেরই গাজন হইয়া থাকে। সমগ্র গ্রামের সাহায্য ব্যতীত গাজন অনুষ্ঠিত হয় না।

গাজনের পূর্বে একটি কালো রংয়ের ছাগলকে সাংজাতোক্ত ছাগ-সংস্কারের বিধানে সংস্কার করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। সেই ছাগল ইচ্ছামত ভ্রমণ করে। ইহাকেই 'লুইয়া' বলে। এক ছাগ-সংস্কারের ১ বৎসর পরে ৪।৫ বৎসর মধ্যে গাজন হয়। গাজন আরম্ভ হইলে বা কিছু পূর্বে আর একটি ছাগল সংগ্রহ করিতে হয়; ইহাকে 'কোল-লুইয়া' বলে।

পূর্ব হইতে লুইয়া ছাড়া না থাকিলে, অথচ গাজন করিবার ইচ্ছা করিলে, সন্ত ছাগ-সংস্কার করিয়াও কোন কোন স্থলে গাজন হইতে দেখা যায়। ফাল্গুন-চৈত্র, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, এই কয় মাসের যে কোন মাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়ায় আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমাতে সমাপ্ত হয়।* কিন্তু গৃহভরণ গাজন বৈশাখ মাসেই বেশী প্রচলিত।

গাজনের পূর্বে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা একত্র হইয়া ব্যয়নির্বাহের এবং ভক্ত্যা আমিনী প্রভৃতি নিয়োগের ব্যবস্থা করেন ও ধর্মমন্দিরের পার্শ্বে প্রশস্ত স্থানে গাজনের জন্য একটি দক্ষিণদ্বারী প্রকাণ্ড ছাঁওলা নির্মাণ করান। পূর্ব হইতে ভট্টাচার্য, তন্ত্রধারক, ধামাতকর্ণি, চণ্ডীপাঠক, ধর্মপণ্ডিত, মালাকার, নাপিত, কুম্ভকার, কর্মকার, গায়ক, ঢাকী ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হয়।

প্রায় সকল স্থানে গাজন আরম্ভের পূর্বে বা পরে ব্যক্তি-বিশেষের নিকট 'শট্ হাঁড়ি' পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। তাহা দিতে হইলে, একটি নূতন ছোট হাঁড়িতে ধর্মের নাম নাম লিখিয়া, তাহার ভিতর তণ্ডুল, সুপারি ও ধর্মের নির্মাল্য দিয়া, পত্রদ্বারা হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এবং যে বিষয়ের জন্য যাহাকে শট্ দেওয়া হয়, হাঁড়ির গাত্রে তাহা লিখিয়া পাঠাইয়া দিতে হয়। ইহা 'মান্য শট্' ও 'আদায় শট্' ভেদে দ্বিবিধ। মান্য শট্ মাননীয় ব্যক্তির নিকট থাকে, আর আদায় শট্, যাহার নিকট কিছু পাওয়া যায়, তাহাকেই দিতে হয়। তিনি ঐ শট্ হাঁড়ির ভিতরে ধর্মের প্রাপ্য বস্তু দিয়া হাঁড়ি ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। আদায় শটে চাউল দিতে হয় না।

গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভক্ত্যা ও আমিনী দিবার ব্যবস্থা থাকে। সৎশূদ্রজাতীয় ১২টি ভক্ত্যা ও চারিটি আমিনীর (মেয়ে ভক্ত্যা) মধ্যে যাহাদের যেরূপ দিবার নিয়ম আছে, তাহারা আরম্ভ দিনে গাজনমণ্ডপে তাহা পাঠাইয়া দেয়। এই জন্য তাহারা শট্ হাঁড়ি বা অন্য কোনরূপ মান্য পাইয়া থাকে। এই বারো ভক্ত্যা ও চারি আমিনী ব্যতীত অপর সকল জাতিই ভক্ত্যা হইতে পারে, কিন্তু বারো ভক্ত্যা ও চারি আমিনী অপূর্ণ থাকিলে গাজন হয় না। যদি কেহ একা গাজন করায়, তাহাকে টাকা দিয়া বারো ভক্ত্যা ও চারি আমিনী সংগ্রহ করিতে হয়।

যে নির্দিষ্ট ঠাকুরের গাজন হয়, তাহা ব্যতীত নিকট গ্রামে বা পাড়ায় ধর্মঠাকুর থাকিলে তাহাদিগকেও লইয়া আসিতে হয়। কিন্তু সকল গ্রামে এরূপ নিয়ম নাই। পূর্বদিনে ধর্মের অধিবাস করিয়া রাখিতে হয়।

যদি কেহ মানসিক শোধ করিবার উদ্দেশ্যে বা ধর্ম-প্রীতির জন্য স্বয়ং গৃহভরণ করান, তাঁহাকে দানপতি বা কর্তা বলে। আর সমগ্র গ্রাম কর্তৃক গাজন হইলেও যিনি সকলের আদেশে প্রধান কর্তা মনোনীত হন, তাঁহাকেও দানপতি বলে। এই দানপতিকেই কর্মী বলে। সাংজাতে আছে, এই দানপতিকেই উত্তরীয় ধারণ করিয়া ভক্ত্যা হইয়া ধর্মসেবা করিতে হয়। তিনি অসমর্থ হইলে ধর্ম-সেবার জন্য আপনার প্রতিনিধিস্বরূপে, যাহাকে ভক্ত্যা হইতে আদেশ করেন, তাহাকেই পাটভক্ত্যা বা মুখ্যভক্তা বলে।

স্বয়মুত্তরীয়ং ধৃত্বা ধর্মব্রতং সমাচরেৎ।
অশক্তৌ প্রতিনিধিস্তু পট্ভক্তঃ সমুচ্যতে॥

অপর সকল ভক্ত্যাকে সাংস্বরভক্ত্যা এবং আমিনী-দিগকে বালাভক্ত্যা বলিয়া থাকে।

যে ব্রাহ্মণ গাজনে প্রত্যহ ধর্মসেবা ও মধ্যাহ্নে বা সন্ধ্যায় ভোগদান এবং আরাত্রিকাদি কার্য করেন, তাঁহাকে ধামাতকর্ণি অর্থাৎ 'ধর্মাধিকরণিকঃ' বলে।

যে ধর্মপণ্ডিত গাজনে নিয়মিত পূজাদি কার্য করেন, তাঁহাকে চালক পণ্ডিত বলে।

প্রথম দিনের কৃত্য

অরাম্ভ দিনে প্রাতঃকালে চালক পণ্ডিত রামাইকৃত বেদীবন্ধন পাঠ করিয়া বেদী সংশোধন করতঃ সুসজ্জিত গাজন-মণ্ডপে মৃত্তিকার বেদীতে দক্ষিণমুখে সকামিন্যা ধর্মকে বসাইয়া দেন। পরে ভট্টাচার্যগণ পাটভক্ত্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদির বরণাদি করাইয়া সাংজাতের বিধানে সংকল্প, পঞ্চঘট স্থাপন, পঞ্চ দেবতাদির পূজা, ধর্মের ও কামিন্যা দেবীর ষোড়শোপচার পূজা ও সাংজাতোক্ত আবরণ-দেবতার পূজা করা হয়। ভাণ্ডার-গৃহে লক্ষ্মী ও কুবের পূজার ব্যবস্থা থাকিলেও গাজন-বেদীতেই লক্ষ্মী

* গ্রীষ্মবসন্তকালয়োঃ সিতপক্ষে তৃতীয়ায়াং।
কৃষ্যাদারম্ভং ব্রতস্য পৌর্ণমাস্যাং সমাপয়েৎ॥

স্থাপনপূর্বক লক্ষ্মী ও কুবেরের পূজা করা হয়। পরে মন্ত্র জপ ও স্তবাদি পাঠ করিয়া পূজা শেষ করা হয়। এই দিনে হোম হয় না; যদি কেহ অদ্য হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হোম করিবার ব্যবস্থা করেন, তবে হোম হইতে পারে।

পূজা শেষ হইলে ব্রাহ্মণ কর্তৃক চণ্ডীপাঠ, পণ্ডিত কর্তৃক রামাইকৃত শূন্যবর্ণনা ও সৃষ্টিবিষয়ক ধর্মস্তব পাঠ, এবং গায়ক কর্তৃক ধর্মমঙ্গল পাঠ হয়।

মধ্যাহ্নে ধর্মকে যথাসাধ্য চিড়ে বা লুচি ইত্যাদির ভোগ দেওয়া হয়। এই প্রথম দিনকৃত্য মহাপূজাদি কোন কোন গ্রামে পণ্ডিতের দ্বারা সম্পাদিত হয়। তারপর ভক্ত্যা ও আমিনী কোন নির্দিষ্ট পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া ও ঘাটে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া আসিলে, চালক পণ্ডিত ভক্ত্যাদি সকলকে আচমন করাইয়া, মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্রে পাটভক্ত্যার গলদেশে ধর্মমন্ত্রযুক্ত উত্তরীয় ও হস্তে বেত্রদণ্ড দিয়া, পরে অপর ভক্ত্যা আমিনীদিগকে উত্তরীয় ও বেত্রদণ্ড দান করে। এই সময় পণ্ডিতকে 'স্থাপন-ডাক' বা আদ্যডাক বলিতে হয়। পরে জলপাবন, পুষ্পপাবন, টিকাপাবন পাঠ করিয়া ধাতু বা কাষ্ঠনির্মিত ধর্মপাদপদ্মের উপর ভক্ত্যা ও আমিনীগণ দ্বারা ধর্মের পূজা করান হয়। এই পূজায় পঞ্চ-দেবতা, নবগ্রহ, দশ দিক্‌পাল, দশ অবতার, মূল ধর্মশিলা, প্রত্যেক নামের ধর্মশিলা, কামিন্যা, প্রত্যেক নামের শিবলিঙ্গ, সাংজাতের আবরণ-দেবতা ইত্যাদি প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করা হয়। পূজাশেষে সূর্য্যার্ঘ্যের সময় পণ্ডিতকে সূর্য্যাগমন পাঠ করিতে হয়। পরে ভক্ত্যাগণ সূর্য্যার্ঘ্য দান করিলে পণ্ডিত ধর্মের অষ্ট প্রণাম দ্বারা ভক্ত্যা ও আমিনীগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করাইলে, সকলে বাদ্যসহকারে গাজনমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে। এই সময় পণ্ডিতকে 'ছাঁওলা বেষ্টন' ['বেড়া'] বলিতে হয়।

সন্ধ্যাকৃত্য

সন্ধ্যাকালে ধমাতকর্ণি ব্রাহ্মণ দ্বারা পায়স রন্ধন হয়, ইহাকে 'মহুই ভোগ' বলে। আর আমিনীগণ কর্তৃক চাউল ও নানাপ্রকার কলাই ভাজান হয়, ইহাকে 'চোনা' বলে। এই মহুই, চোনা, ছোলা ভিজা, গুড়, সন্দেশ প্রভৃতি দ্বারা শীতল হয়। ব্রাহ্মণ আরাত্রিক ও শীতল নিবেদন করিলে, পণ্ডিত মহুইপাবন, চোনাপাবন পাঠ করিয়া ধর্মের স্তব কবচ ও কামিন্যার স্তব কবচ পাঠ করে।

পরে পণ্ডিত, ভক্ত্যা ও আমিনীগণকে ধর্মাষ্টক ও কামিন্যা প্রণাম দ্বারা প্রণাম করাইয়া প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করায়। তারপর ভক্ত্যাগণ মহুই রন্ধনের হাঁড়িটিকে বাদ্যসহকারে জলে ভাসাইয়া দিয়া আসে।

দক্ষিণদেশীয় সাংজাতে এই দিন সন্ধ্যাকৃত্যের পর দণ্ড-পূজা ঊর্দ্ধসেবার ব্যবস্থা লিখিত থাকিলেও কামিন্যা আনয়নের পরদিনই সকল স্থানে ইহা হইতে দেখা যায়।

রাত্রে গায়ক কর্তৃক ধর্মমঙ্গলের প্রথম পালা গান হয়। বারমতী পুঁথি প্রায় চব্বিশ পালায় সমাপ্ত। এই পুঁথি দ্বিতীয় দিন হইতে বৈকাল বেলা এক পালা ও রাত্রে এক পালা গান হয়। কিন্তু গায়কেরা এখন অনেক জায়গায় কেবল রাত্রিতেই দুই পালা গান করিয়া থাকে। কিন্তু প্রথম দিনে একবার, কেবল প্রথম পালাই গান হয়। এই সকল কর্মই প্রথম দিনের কর্ম।

দ্বিতীয়াদি দিনের কর্ম

ভোরবেলা গোময় দ্বারা মণ্ডপ পরিষ্কৃত হইলে, আমিনীরা ধর্মের সম্মুখভাগে, চন্দন ঘষিয়া দূর্বা দ্বারা ছড়া দিয়া থাকে। এই সময় পণ্ডিত, 'আমিনী-নিদ্রাভঙ্গ' ও 'ধর্মনিদ্রাভঙ্গ' পাঠ করে। পূর্বাহ্নে ধামাতকর্ণি বা ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ স্নানাদি করিয়া আসিলে, তাঁহা দ্বারা যথাবিধানে দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে ধর্মপূজা, কামিন্যা পূজা, লক্ষ্মী-পূজা, আবরণ-দেবতাপূজা, স্তবাদিপাঠ, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি সম্পাদিত হইলে, ধর্মস্তব পাঠ, ধর্মমঙ্গল পাঠ, মধ্যাহ্নে ধর্মকে ভোগ দেওয়া, ভক্ত্যা ও আমিনীদিগকে পূজা করান, বৈকালে ধর্মমঙ্গল গান, সন্ধ্যাকালে শীতল আরতি, মহুইপাবন, চোনাপাবন, ধর্মস্তবাদি পাঠ, ভক্ত্যাগণের ধর্মপ্রণাম, প্রার্থনামন্ত্রপাঠ, মহুইহাঁড়ি বিসর্জন, রাত্রের গান, প্রত্যূষের কর্ম, সমস্তই পূর্বদিনের ন্যায় সমাধান করিতে হয়।

মালাকার প্রত্যহ নিয়মিত পুষ্প, পুষ্পমালা, চাঁদমালা ও মোউড় প্রভৃতি দেয়।

নাপিত, ভক্ত্যা-পূজার পূর্বে পূজার স্থান সম্মার্জন ও পরে পূজার পুষ্পাদি পরিষ্কার করে। আদায়শট্ট

বা মান্যশট্ হাঁড়ি সকল নাপিত দ্বারাই পাঠান হয়।

কুম্ভকার ঘট, লুয়ের হাঁড়ি, মুক্তিকলস, দণ্ড (ধনুচি), দেরখো, প্রদীপ, সরা, মালসা এবং প্রত্যহ মহুইহাঁড়ি যোগাইয়া থাকে। ভক্ত্যাগণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে পুষ্পচয়ন করিয়া আনে, মধ্যাহ্নে পূজার পর ভক্ত্যা বা আমিনীরা দুগ্ধ, ফল, গুড়, কলাই ভিজা ইত্যাদি দ্বারা জল খায়, সন্ধ্যায় সন্ধ্যাকৃত্য সমাধা হইলে হবিষ্যান্ন ভোজন করে।

ধর্মের সাক্ষাতে ঘৃত বা তৈল-প্রদীপ নিয়মিত দিবারাত্র জ্বলিয়া থাকে।

গায়ক দ্বারা যথাসময়ে ধর্মমঙ্গল গীত হয়। এইরূপ ভাবে কয়েক দিন গত হইলে যথা সময়ে কামিন্যা আনয়ন করিতে হয়।

কামিন্যা আনয়ন

ইহার দিন স্থির নাই। পঞ্চমী হইতে একাদশীর মধ্যে শনি ও মঙ্গলবারে রাত্রে কামিন্যা আনয়ন করিতে হয়।

পঞ্চম্যেকাদশীমধ্যে মন্দমঙ্গলবাসরে।
গৃহাভরণে রাত্রৌ চ কামিন্যানয়নঞ্চরেৎ ॥

সন্ধ্যাকৃত্য সমাধা হইবার পর রাত্রের গান আরম্ভ হইলে, পূজার উপচার সহ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভক্ত্যা, আমিনী, দেউলী, দানপতি প্রভৃতি বাদ্যকর সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট পুষ্করিণীতে উপস্থিত হইয়া, স্থান মার্জনা পূর্বক, ছোট একটি গণেশ-ঘটে, ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত পঞ্চদেব প্রভৃতির পূজা করিয়া, কামিন্যা-ঘটে কামিন্যার আহ্বান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, অধিবাস, কামিন্যা ও কামিন্যার আবরণ-দেবতার পূজা করিয়া ছাগ বা মদ্গুর মৎস্য বলি দিতে হয়। তারপর পাটভক্ত্যার মস্তকে কামিন্যা-ঘট দিয়া বাদ্যসহকারে গাজন-মণ্ডপে আনিতে হয়। সেই কামিন্যা-ঘট, ধর্মের বামভাগে স্থাপন করিয়া, পুনর্বার ষোড়শোপচারে পূজা, আরতি প্রভৃতি করিতে হয়।

দণ্ডপূজা ও উর্দ্ধসেবা

কামিন্যা আনয়নের পরদিন ছাওলার পার্শ্বে হিন্দোলা কাষ্ঠদ্বয় পুতিয়া রাখিতে হয়।

সন্ধ্যাকৃত্য সমাধা করিয়া ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভক্ত্যা, আমিনী প্রভৃতি বাদ্যকর সঙ্গে হিন্দোলা কাষ্ঠের তলে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত একটি নূতন বস্ত্র পাতিয়া, তাহার উপর নয়টি দণ্ড (ধুনুচি) রাখিতে হয়। ইহাই নবদণ্ড ও নব অগ্নিপূজার আধার। সাংজাতের বিধানে উাহার উপর অগ্নিস্থাপন করিয়া, ধুনা, ঘৃত, গুগ্‌গুল ও কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির উপর কাল-বেকালাদি নব দণ্ডের, কপিল-পিঙ্গলাদি নব অগ্নির ও হিন্দোলা কাষ্ঠদ্বয়ের যথাবিধানে পূজা করা হয়। সাংজাতে নব দণ্ডের ও নব অগ্নির নাম গোত্র, আহ্বান, ধ্যান, স্তুতি ও দণ্ডবিশেষে পৃথক্ পৃথক্ নৈবেদ্য ইত্যাদির উল্লেখ আছে। ধর্মপণ্ডিতকে এই সময় দিক্‌ডাক ও মাণিকডাক বলিতে হয়।

পরে ভক্ত্যারা হিন্দোলা কাষ্ঠের নিম্নে দণ্ডে ধুনা জ্বালিয়া উর্দ্ধপদ ও হেটমুণ্ডে উর্দ্ধসেবা বা হিন্দোলা সেবা করে। হিন্দোলা সেবার পূর্বে সূর্যার্ঘ্য দিতে হয়। হিন্দোলা সেবার পর ভক্ত্যা ও আমিনীরা হবিষ্য করিতে যায়, এবং রাত্রের গান আরম্ভ হয়।

কামিন্যা আনয়নের পরদিন হইতে পূর্বোক্ত কর্ম ব্যতীত ভক্ত্যাগণকে প্রত্যহ অতিরিক্ত উর্দ্ধসেবা করিতে হয়। তবে প্রতিদিন দণ্ড ও অগ্নির পূজা করিতে হয় না। কেবলমাত্র উর্দ্ধসেবার পূর্বে সূর্যার্ঘ্য দিতে হয়। যাহারা উর্দ্ধসেবার অপারগ হয়, তাহারা হিন্দোলা কাষ্ঠদ্বয়কে স্পর্শমাত্র করে। এই দিন হইতে ধর্মপ্রীতির জন্য ভক্ত্যাগণকে নির্দিষ্ট দ্বাদশ সেবার মধ্যে যেগুলি সহজসাধ্য, যথা—প্রণাম সেবা (অষ্টাঙ্গ প্রণাম), বেতচালা (স্বহস্তে স্বগাত্রে বেত্রাঘাত), উপরোক্ত উর্দ্ধসেবা ও দণ্ডাগ্নি সেবা ইত্যাদি করিতে হয়। অপর সেবাগুলিরও নির্দিষ্ট সময় আছে। এই সকল সেবা ব্যতীত ভক্ত্যাগণকে আর একপ্রকার সেবা করিতে হয়। ভক্ত্যাগণ সকলে একটি সারি দিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহাদের উপর দিয়া স্কন্ধদেশে পদার্পণ-পূর্বক একজন ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইবে। এইরূপ সেবা দ্বারা দ্বাদশ সেবার অঙ্গহীনতা পূর্ণ হয়। ভক্ত্যাগণ যেরূপ কষ্টকর সেবা করিয়া থাকে, আমিনীদিগকে সেরূপ করিতে হয় না, তাহারা কেবল প্রণাম-সেবাই করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, ধুনা দেওয়া, বাতাস করা, চোনা ভাজা,

পুষ্পমালা নির্মাণ করা, প্রভাতে চন্দন ছড়া, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি সময়বিশেষে করিতে হয়।

সমর্থ হইলে এই সময় নূতন শালবাণ প্রস্তুত করাইয়া, প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিতে হয় এবং বাণবিদ্ধ হইবার জন্য বাণ, জিহ্বাবাণ ইত্যাদি নির্মাণ করাইতে হয়।

একাদশীর মধ্যে এই সমস্ত কার্য ব্যতীত অন্য বিশেষ কোন কার্য নাই। একাদশী দিনে ভক্ত্যা ও আমিনীদিগের হবিষ্যান্ন বন্ধ থাকে, হবিষ্যান্নের পরিবর্তে ফল মূল, দুগ্ধ, গুড় ইত্যাদি ভক্ষণ করে। দ্বাদশীদিনে মুক্তি আনয়ন করিতে হয়।

মুক্তি আনয়ন

মুক্তি আনয়নের একটা নির্দিষ্ট স্থান থাকে। পূর্বে শট্‌হাঁড়ি পাঠাইয়া সেই স্থানের মুখ্যগণকে জানাইতে হয়। মুক্তি আনয়নের পূর্বদিনে তৈলহরিদ্রা এবং মুক্তি আনার দিনে বিবাহের ন্যায় অধিবাস পাঠান হয়।

সন্ধ্যাকৃত্য সমাপনের পর, রাত্রে গান আরম্ভ হইলে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ভক্ত্যা আমিনী একত্র হইয়া সুসজ্জিত চতুর্দোলায় ধর্মের পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া ও মোউড় এবং যাঁতী প্রভৃতি দ্বারা বরসজ্জায় ধর্মপাদুকাকে সজ্জিত করিয়া, দানপতি, দেউলী, অধিকারী ও গ্রামস্থ ভদ্র অভদ্র ব্যক্তিসকল বহুবিধ বাদ্যসহকারে জাঁকজমকের সহিত মুক্তি আনিতে গমন করে। সেখানে উপস্থিত হইলে তত্রত্য ব্যক্তিগণ, উপযুক্ত অভ্যর্থনা দ্বারা সকলের মান্য রক্ষা করে এবং সকলকেই উপযুক্তভাবে জল খাওয়াইবার ব্যবস্থা করে। পরে তাহাদের পুরোহিত মুক্তাহার ধান্যের উত্তম আতপ চাউল পাঁচ সের একটি পাত্রে স্থাপন করিয়া, তাহার উপর মুক্তিদেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আহ্বান, অধিবাস, পূজা, ধর্মপূজা ইত্যাদি সমাপণ হইলে ধর্মের পত্নীরূপে মুক্তিদেবীকে দান করে। এই সময় পণ্ডিতকে 'মুক্তি অধিবাস' ও 'ধান্যের জন্মবিবরণ' বলিতে হয়। পরে ধর্ম ও মুক্তিকে চতুর্দোলে স্থাপন করিয়া গাজনমণ্ডপে লইয়া আসে, মেয়েরা হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করে, ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত ধর্ম ও মুক্তিদেবীকে উঠাইয়া গাজনমণ্ডপে স্থাপনপূর্বক, পুনর্বার পূজা ও আরাত্রিকাদি করে। যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিদেবী মণ্ডপে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত গায়কদিগকে গান করিতে হয়। এই কার্যে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া যায়।

গাম্ভারী ছেদন

এইরূপে দ্বাদশী গত হইলে ত্রয়োদশীদিনে দিনকৃত্য সমাপণ করিয়া, বৈকাল বেলা গাম্ভারীবৃক্ষ ছেদন করিতে হয়। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভক্ত্যাদি বিবিধ বাদ্য সঙ্গে লইয়া নিকটস্থ গাম্ভারীবৃক্ষের তলায় উপস্থিত হইয়া, বৃক্ষতলে ঘট স্থাপনপূর্বক পঞ্চদেব, ধর্ম, কামিন্যা ও গাম্ভারীবৃক্ষের অধিবাস, পূজা যথাবিধি সমাপণ হইলে পণ্ডিত কর্তৃক 'গাম্ভারীবৃক্ষের জন্ম' পাঠ হয়।

পরে পাটভক্ত্যা মন্ত্রপাঠ করিয়া কুঠার দ্বারা গাম্ভারীবৃক্ষ বা একটা বড় ডাল ছেদন করে। সেই ডাল লইয়া সকলে কর্মকারগৃহে যাইয়া, কর্মকারের বরণ করতঃ ব্রাহ্মণ, শাল-গৃহে 'নিয়াই' নামক যন্ত্রের উপরে বিশ্বকর্মার এবং অস্ত্রাদির পূজা করে। এই সময় পাটভক্ত্যা কর্তৃক সকলের হস্তে হরিদ্রাবর্ণ সূত্র বন্ধন করা হয়। পরে ভক্ত্যাদি সকলে গাজনমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিলে, রাত্রির গান আরম্ভ হয়।

কর্মকার ঐ গাম্ভারীডালের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাটা প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যেক পাটার উপর ৫।৭টা লৌহকণ্টক সংযুক্ত করিয়া দেয়। ইহাকে ঝাঁপকাঁটা বলে। এই ঝাঁপ কণ্টকের পূজাকেই পাটপূজা বলে এবং ইহা দ্বারাই পূর্ণিমাদিনে ঝাঁপভাঙ্গা নামক সেবা হয়।

কোন কোন সাংজাতে ত্রয়োদশীদিনে গাম্ভারীছেদনের পর রাত্রিকালে মুক্তি আনয়নের ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থামত কার্যও কোন কোন স্থানে হইয়া থাকে।

চতুর্দশী বা রাত্রি-গাজনের কর্ম

চতুর্দশীদিনেও নিয়মিত ধর্মের পূজাদি করিতে হয়। এই দিনেই চণ্ডীপাঠের রূপসংখ্যা পূর্ণ ও ধর্মমঙ্গল পাঠ পূর্ণ হয়। এই দিন মধ্যাহ্নে ভক্ত্যাগণ কর্তৃক নিয়মিত ধর্মপূজা হয় না; রাত্রিতে হয়।

যথাবিধি ধর্মের পূজাদি শেষ হইলে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, দেউলী, কর্মী, ভক্ত্যাদি সকলে গায়ক ও বাদ্যকর সঙ্গে গ্রামে ও ভিন্ন গ্রামে রাজাদির নিকট অর্থাৎ প্রত্যেক

গাজনে যাঁহাদের বাড়ী যাওয়া হয়, তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের জয়োচ্চারণ করেন ও গায়ক দ্বারা তাঁহাদের জয়গান করান। পরে তাঁহারা ধর্মসেবার্থে কিছু অর্থ দান করেন। ইহাকে রাজা ভেটা বলে।

ভিক্ষাং কৃত্বা রাজাদিভ্যঃ ধর্মনাম্না তু দানেশঃ।
তদ্দ্রব্যৈঃ পূজয়েদ্ধর্মং চতুর্দশ্যাং সভক্তিতঃ॥

এরূপ বিশ্বাস আছে, গৃহভরণের লুয়ের হাঁড়ি ধরিলে, মুখমণ্ডল স্পর্শ করিলে বা ধর্মমঙ্গল গায়কের নিকট হইতে চামর কোলে লইলে, বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। ইহার মধ্যে লুয়ের হাঁড়ি ধরাই সর্বপ্রধান।

ইহা প্রায় নিষ্ফল হইতে দেখা যায় না। এইজন্য ধর্মগাজনের লুয়ের হাঁড়ি ধরা বা মুক্তিমণ্ডল স্পর্শ করার অনুষ্ঠান প্রায় বাদ যায় না। যে ব্যক্তি লুয়ের হাঁড়ি বা মুক্তিমণ্ডল ধরে, তাহারা সস্ত্রীক এই দিনে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি লুয়ে ধরে, তাহাকে রাত্রে লুয়ে স্নান করাইয়া আনিতে হয় এবং স্নানের পর একখানি হরিদ্রাবর্ণ নূতন বস্ত্রে পঞ্চ শস্য প্রভৃতি বাঁধিয়া, তাহা লুয়ের গলায় বাঁধিয়া দিতে হয়। লুয়ের হাঁড়ি বা মুক্তিমণ্ডল ধরিতেই হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই।

ভক্ত্যাগণ রাজা-ভেটা সমাপন করিয়া শালবাণ ও ঝাঁপ-কাঁটা সংগ্রহ করে এবং ফল-পুষ্পাদি দ্বারা ঝাঁপপাত্র সাজাইয়া রাখে। সন্ধ্যায় আরাত্রিকাদি সমাপ্ত হইলে শতাষ্ট ঘৃতপ্রদীপ সকামিন্যা ধর্মের নামে উৎসর্গ করিতে হয়। গ্রামের অধিকাংশ স্ত্রীলোক এই দিন উপবাসী থাকিয়া, ধর্মকে দীপদান করে। অনেক মেয়ে এই সময়ে মাথায় ও বক্ষে জলন্ত ধুনার মালসা রাখিয়া ধুনা পোড়ায়। এই রাত্রে চাউল কলাই তরকারী একসঙ্গে রন্ধন করিয়া এক প্রকার ভোগ প্রস্তুত হয়, ইহাকে পাত্রভোগ বা পাতরভোগ বলে।

ব্রাহ্মণ ধর্মকে ও চারি দ্বারে চারি পাত্রকে (যথা—পূর্বে সূর্য্য, দক্ষিণে হনুমান্, পশ্চিমে চন্দ্র, উত্তরে গরুড়কে) পূজা ও ভোগ নিবেদন করিয়া, অবশিষ্ট অন্নকে কদলীপত্রে ১২০ ভাগে বিভক্ত করিয়া, বিশাশয় পাত্রের পূজা ও ভোগ নিবেদন করেন। প্রত্যেকের নাম সাংজাতে আছে, এই সময় পণ্ডিতকে গন্ধ দিক্‌ডাক বলিতে হয়।

নদ্যাদৌ পুষ্করিণ্যাং বা গত্বা সর্বৈঃ মহোৎসবৈঃ।
মহাস্নানবিধানেন স্নাপয়েদ্ধর্মং মুক্তিদং॥

পরে ভক্ত্যাগণ সুসজ্জিত ঝাঁপপাত্রে ঝাঁপকাঁটা, শালবাণ, বাণ, পূজার উপচার ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া ধর্মমুক্তিকে চতুর্দোলে চাপাইয়া, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, দানপতি, আমিনী, ইত্যাদি সকলে লুইয়া ছাগ ও বহু বাদ্যকর সঙ্গে মহামহোৎসবে নদী বা নির্দিষ্ট পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হয়। তথায় ধর্মপণ্ডিত সঙ্কল্পপূর্বক ধর্ম ও মুক্তিতণ্ডুলগুলিকে নানাবিধ স্নানীয় দ্রব্যদ্বারা মহাস্নানের বিধানে স্নান করায়। এই সময় মুক্তিস্নান ও ঘাটবন্ধন পাঠ হয়। তারপর বাণ, শালবাণ, জিহ্বাবাণ, লুইয়া ছাগ, ঝাঁপকণ্টক ইত্যাদির স্নান হইলে ভক্ত্যা ও আমিনীরা স্নান করে। মধ্যস্থলে ধর্ম, মুক্তি, শালবাণ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া ভক্ত্যা ও আমিনীরা পূর্বনিয়মানুসারে পূজা, সূর্য্যার্ঘ্য, প্রণামসেবা ইত্যাদি সমাপ্ত করিয়া, মহাসমারোহে গাজনমণ্ডপে উপস্থিত হয়। এই সময় ভক্ত্যা ও আমিনীরা বাতি দিলে অন্যান্য সকলেও বাতি দেয়। এই সময় মুণ্ডিমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া মুক্তিপূজা করিতে হয়। ইহা পণ্ডিতেরই কর্ম।

মুক্তিপূজার জন্য একটি স্থান নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। নিজ মন্দিরেই হইয়া থাকে। কোনও কারণবশতঃ যদি মন্দিরে না হয়, তবে গাজন-চালার পার্শ্বে পূর্ব হইতে একটী ছোট চালা বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ইহাকে মুক্তিমণ্ডপ বলে।

পণ্ডিত, নাপিত মুক্তি-তণ্ডুলগুলিকে ও পাটভক্ত্যাকে লইয়া মুক্তিমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া মুষ্টি স্থাপন করে। তারপর সংকল্পপূর্বক পৃথিবী, কূর্ম, ধর্ম, অনন্ত, বাসুকি ইত্যাদির পূজা করিয়া পাটভক্ত্যার দুই হস্তে দুই মুষ্টি মুক্তিতণ্ডুল দিয়া, নূতন গামছা দ্বারা চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া, পণ্ডিত মুষ্টিস্থাপনের মন্ত্র ও পদ্য মুষ্টিস্থাপন পাঠ করে। পাঠ শেষ হইলে পাটভক্ত্যা সেই দুই মুষ্টি তণ্ডুল ভূমিতে রাখিয়া দেয় এবং বাহিরে যাইয়া চক্ষুর আচ্ছাদন খুলিয়া দেয়। পরে পণ্ডিত সেই দুই মুষ্টি তণ্ডুল দ্বারা ধর্মের পাদপদ্ম গঠন করিয়া, মুক্তিমণ্ডল অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করে। এই সময় গায়ক কর্তৃক জাগরণ বা পশ্চিমোদয় পালা গীত আরম্ভ হয় এবং ভক্ত্যাগণ ও আমিনীগণ ফল

জল ইত্যাদি ভক্ষণ করে। এই দিন ভক্ত্যা ও আমিনীদের হবিষ্য বন্ধ থাকে।

এই সময় ভক্ত্যারা অগ্নিসেবার জন্য শ্মশান হইতে অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠাদি সঞ্চয় করিয়া রাখে।

মুক্তিমণ্ডপে মূর্ত্তি স্থাপনের পর পণ্ডিত মুক্তিতণ্ডুল দ্বারা ধর্মের পাদপদ্ম গঠন করিয়া, তাহার চতুর্দিকে মুক্তিতণ্ডুল দিয়া কূর্ম গঠন করে, পরে ঐ মুক্তিতণ্ডুল দ্বারা অনন্ত নাগ ও কৃষ্ণ মুগ কলাই দ্বারা বাসুকি নাগ, কূর্মকে বেষ্টন করাইয়া গঠন করে। পরে চারি দিকে চারি হস্তী, চন্দ্রাদি দ্বারপাল, দিক্‌পাল প্রভৃতি পঞ্চগুড়ি ও অন্যান্য রংদ্রব্য দ্বারা গঠন করা হয়। ইহা সাজাইবার জন্য অনেক রকম জিনিষ আবশ্যক হয়। এই মুক্তিমণ্ডলের পার্শ্বে মুক্তিকলস স্থাপিত করিয়া এবং তাহার উপর শরাব-পূর্ণ মুক্তিতণ্ডুল দিয়া তাহাতে যোড়শোপচারে মুক্তির ও ধর্মের পূজা এবং দশোপচারে, কূর্ম, অনন্ত, বাসুকি, দিক্‌পাল, দ্বারপাল, শ্বেতাই আদি পণ্ডিত, বসুয়াদি আমিনী প্রভৃতি আবরণ-দেবতার পূজা সমাপনান্তে ঐ গৃহ, মহাবাক্য দ্বারা ধর্মশিলার নাম করিয়া ধর্মকে সমর্পণ করিতে হয়।

তণ্ডুলৈঃ কমঠং কৃত্বা তস্য পৃষ্ঠে পাদদ্বয়ং।
শেষবাসুকিনাগাভ্যাং কমঠাকৃতিং বেষ্টয়েৎ॥
দক্ষপাদাব্জং শোভয়েৎ শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
সূর্য্যাত্মজয়া গঙ্গয়া সব্যপাদঃ সুশোভিতঃ॥
শ্বেতরক্তকৃষ্ণপীতৈশ্চতুর্বর্ণৈশ্চতুর্গজান্।
পশ্চাদ্দক্ষপূর্বোদীচ্যাং ক্রমেণ স্থাপয়েত্ততঃ॥
লেখয়েদ্দিক্‌পালাংস্ততো মুক্তিমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
চন্দ্রানিলজভাস্করগরুড়দ্বারপালকান্॥
প্রতীচ্যাং স্থাপয়েদ্বিধুং যাম্যাঞ্চ মরুতাত্মজং।
প্রাচ্যাং স্থাপয়েদাদিত্যমুদীচ্যাং পতগেশ্বরং॥
এতন্মণ্ডলং বিলিখ্য ব্রতে চ গৃহভরণে।
সংপূজ্য মুক্তিধর্মাদিং দদ্যাদ্ধর্মায় তদ্‌গৃহং॥

--সাংজাত।

এই গৃহ সমর্পণের জন্যই এই ধর্মগাজনের নাম গৃহভরণ। পুত্র কামনায় যদি কেহ মুক্তিমণ্ডল ধরে, তবে এই সময় পণ্ডিত তাহাকে সংকল্প করাইয়া মুক্তিমণ্ডল স্পর্শ করাইয়া দেয়। তাহারা সস্ত্রীক এই দিন হবিষ্যাশী থাকিয়া যতক্ষণ না মুক্তি বিসর্জন হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অনাহারে অনিদ্রায় মুক্তিমণ্ডপে বসিয়া থাকে। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে অন্ততঃ একজনকে নিয়ত বসিয়া থাকিতে হয়।

এই গৃহে পণ্ডিত ভিন্ন অপর কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। পণ্ডিত সর্বদাই দ্বার বন্ধ করিয়া রাখে।

চতুর্দশীর রাত্রিতে এই সমস্ত কর্ম করিতে হয়। ভক্ত্যারা অতি প্রত্যুষে পূর্বসঞ্চিত কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, ধর্মের নাম ডাকিতে ডাকিতে, সেই প্রজ্বলিত অগ্নির উপর বারম্বার চলা-ফেরা করে। এই সময় ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্য বাজে। ইহাকে 'অগ্নিসেবা' বা 'আগুন খাওয়া' বলে।

পূর্ণিমা বা দিন-গাজন দিনের কর্ম

পূর্ণিমার দিনে সকাল বেলা বাণপূজা বা পাটপূজা করিয়া নবখণ্ড সেবা করিতে হয়।

পৌর্ণমাস্যাং প্রত্যুষে চ সংপূজ্যাঙ্গং যথাবিধি।
নবখণ্ডাদিসেবয়া সেবয়েৎ সর্বসাক্ষিণম্॥

এই নবখণ্ড সেবার জন্য ছাঁওলার একটু অন্তরে, ধর্মের সম্মুখ দিকে একটি চতুষ্কোণ কূপ খনন করাইয়া রাখিতে হয়। এই কূপের পরিমাণ চারিদিকেই প্রায় দুই হাত করিয়া প্রশস্ত এবং প্রায় দেড় হাত গভীর। ইহার চারি ধারে চারিটী খাট থাকে। এই কূপটিকে হাকন্দ বলে।

ধর্মভক্ত লাউসেন হাকন্দতীরে নিজ দেহ নব খণ্ড করিয়া, নব-খণ্ড-সেবা করিয়াছিলেন। এইজন্য কৃত্রিম হাকন্দ প্রস্তুত করিতে হয়। এই সময় ভক্ত্যারা স্নান করিয়া নূতন, অভাবে পুরাতন শালবাণ, বাণ, জিহ্বাবাণ, ঝাঁপকণ্টক ইত্যাদি লইয়া ছাঁওলায় উপস্থিত থাকে। ব্রাহ্মণ গাজনের নিত্যপূজানুসারে সাবরণ ধর্মপূজা করিয়া বাণ, শালবাণ, জিহ্বাবাণ, ঝাঁপকণ্টক, সূচীমুখ, খড়্গ, অর্দ্ধচন্দ্র, ক্ষুরধার ইত্যাদি অস্ত্রের যথাবিধি পূজা সমাপ্ত করিলে, পাটভক্ত্যা বা নবখণ্ডকারী ভক্ত্যা বাণ লইয়া, মন্ত্রপাঠপূর্বক দেহের নয় স্থানে নয়টি বাণ বিদ্ধ করে। সাংজাতে এই নয়টি স্থান নির্দিষ্ট আছে। নয়টি বাণ বিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে, কেবলমাত্র জিহ্বাবাণ দ্বারা জিহ্বা বিদ্ধ করা হয়। এই সময় ঐ ভক্ত্যাকে রক্তপুষ্পের মাল্য দ্বারা সাজাইতে হয়।

এইরূপে বাণবিদ্ধ হইয়া নবখণ্ডব্রতধারী ভক্ত্যা, পূর্বোক্ত হাকন্দকূপের মধ্যে উপবেশন করিলে, চারিটি ঘাটে চারিটি

ভক্ত্যা ও চারি ধারে অন্যান্য ভক্ত্যারা শয়ন করিয়া থাকে। নবখণ্ডব্রতধারীর দুই পাশে দুইখানি খড়্গ রাখিয়া দিয়া, কূপের উপরিভাগ কদলীপত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া হয়। নবখণ্ডব্রতধারীর মস্তকটি কেবল অনাচ্ছাদিত থাকে। কেহ ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়া নবখণ্ডব্রতধারীর মস্তকে বসাইয়া দেয়। কেহ আল্‌তা গুলিয়া রক্ত ছড়াইয়া দেয়। কেহ কালো কম্বল গায়ে দিয়া বাটুয়া কুকুর সাজিয়া সম্মুখে পড়িয়া থাকে।

যে গায়কদল রাত্রি অবধি আসরে গান গাহিতেছিল, তাহারা সদলে এই সময় হাকন্দকূপের নিকট আসিয়া, লাউ সেনের নব খণ্ড হইতে প্রাণদান এবং পশ্চিমোদয় পর্যান্ত গান করে। এই পর্য্যন্ত গীত হইলেই অন্যকার মত গান শেষ হয় এবং যদি কেহ লাউ সেন (চামর) কোলে লয়, গায়ক তাহার কোলে চামর দিয়া তাহাকে ব্যবস্থা বলিয়া দেয়। গান শেষ হইলে নবখণ্ডব্রতধারী ও অন্যান্য সকলে সেখান হইতে উঠিয়া গাজনমণ্ডপ প্রদক্ষিণপূর্বাক, ছাঁওলায় ধর্মের সাক্ষাতে আসিয়া বিদ্ধ বাণ খুলিয়া দেয়। ইহাকেই নবখণ্ড-সেবা বলে। ইহার পর ব্রাহ্মণরা ধর্মের মহাপূজা আরম্ভ করেন। এই পূজা প্রথম দিনের ন্যায় বিস্তৃতভাবে হয়।

এই সময় ছাঁওলার মধ্যে লুয়ের মুণ্ড রাখিবার জন্য শরা-সহিত একটী বড় হাঁড়ি সংগ্রহ করিতে হয়। সেই হাঁড়ির গাত্রে কামিন্যা ও শক্তিমন্ত্র লিখিয়া হরিদ্রাবর্ণ নূতন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা হাঁড়ির গাত্র আচ্ছাদন করতঃ ভিতরে রক্তপুষ্প ও পঞ্চ ফল ইত্যাদি দিয়া একটী চাউলপূর্ণ কুলাতে বসাইয়া রাখিতে হয়। পঞ্চশস্যযুক্ত একটী হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্রখণ্ড হাঁড়ির গলায় বাঁধিয়া দিতে হয়। তারপর রাত্রিগাজনের রাত্রির ন্যায় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভক্ত্যা, আমিনী, শালবাণ, ঝাঁপপাত্র সহিত ঝাঁপকণ্টক, লুইয়া ছাগ ইত্যাদি সহ সকলে নানাবিধ বাদ্য সহকারে নদী বা নির্দিষ্ট পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হয়। সেখানে ভক্ত্যা, আমিনী, লুয়ে ছাগ, শালবাণ, ঝাঁপকাঁটা ইত্যাদির স্নান হইলে, ভক্ত্যা ও আমিনীরা পূর্বদিনের ন্যায় পূজাদি করিয়া থাকে। তারপর ভক্ত্যাগণ শালে ভর, খড়্গ সন্ন্যাস ইত্যাদি দ্বারা মহা-সমারোহে সকলে গাজনমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিয়া, শালবাণ বা খড়্গসন্ন্যাস হইতে নামিয়া ছাঁওলায় উপস্থিত থাকে।

ব্রাহ্মণেরা পূজা সমাপ্ত করিয়া কামিন্যা দেবীর প্রীতি কামনায় লুইয়া ও কোললুইয়া উৎসর্গ করেন। পণ্ডিতকে এই সময় ছাগজন্ম পাঠ করিতে হয়।

পরে ঘাতক কর্তৃক অগ্রে লুইয়া, পরে কোল-লুইয়া ছেদিত হইলে এবং কোললুয়ের রুধির ও মস্তক উৎসর্গ করা হইলে, পণ্ডিতকে দিকৃডাক ও কাটামঙুই পাঠ করিতে হয়।

লুইয়া ছেদন হইবা মাত্র, তাহার মুণ্ড পূর্বস্থাপিত লুয়ের হাঁড়িতে রাখিয়া, সেই শরা ঢাকা দিয়া, ময়দার আঠা দ্বারা (কিঞ্চিৎ ফাঁক রাখিয়া) হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিতে হয়। এই সময় পণ্ডিত রাউলবন্দনা পাঠ করে। একটি ঘৃতের প্রদীপ হাঁড়ির উপর বসাইয়া, লুইয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহামায়া কামিন্যার পূজা করিতে হয়।

যদি কেহ পুত্র কামনায় লুয়ের হাঁড়ি ধরে, তবে তাহাকে সংকল্প করাইয়া লুয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা দান করতঃ প্রার্থনামন্ত্র সকল পাঠ করাইয়া, পণ্ডিত তাহাকে হাঁড়ি ধরাইয়া দেয়। নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া রাত্রি জাগরণপূর্বক হাঁড়ি ধরিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে হাঁড়ির মুখের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া লুয়ের উদ্দেশে বারম্বার দুগ্ধ ঢালিয়া দিতে হয়।

তারপর ব্রাহ্মণ কর্তৃক যথাবিধানে হোম সমাপ্ত হইলে, লুয়ের রুধিরের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, পূর্ণ-হোম করা হয় ও দ্বাদশ দান উৎসর্গ, স্তবাদি পাঠ ইত্যাদি কার্য সমাধা হইলে, পণ্ডিত কর্তৃক মুক্তিগৃহে মুক্তিধর্মের পূজা হয়।

পরে অধিকারী, দেউলী, কর্মী, ভক্ত্যা, আমিনী ইত্যাদি সকলে মুক্তি দর্শনার্থে মুক্তিগৃহে গমন করে সেখানে পণ্ডিত মুক্তিমণ্ডপের দ্বার না খুলিয়া মুক্তি-মণ্ডপেরদ্বারে, দ্বারমুক্তি, দ্বারভেট, বৈতরণী পাঠ করিলে, সকলে মুক্তিগৃহে প্রবেশ করিয়া, পুষ্পাঞ্জলি দানপূর্বক মুক্তি পূজা করিয়া, ধর্মপাদ-পদ্ম ও মুক্তিমণ্ডল দর্শন করে। পরে অন্যান্য গাজন-দর্শকগণও কিছু কিছু দর্শনী দিয়া মুক্তি দর্শন করিয়া থাকে।

এই সমস্ত কার্য্য সমাধা হইলে, ভক্ত্যারা ঝাঁপ ভাঙ্গা ও কণ্টকশয্যা সেবা করিয়া থাকে। ঝাঁপ ভাঙ্গিবার সময় পণ্ডিত কর্তৃক পাটপূজার বিধানানুসারে ঝাঁপকণ্টকের পূজা

হয়। এই সমস্ত কর্মের পর, ভক্ত্যারা ফলাদি ভক্ষণ করে। রাত্রে শীতল আরতি হইবার পর, পণ্ডিতকে লুয়ের হাঁড়িতে ও মুক্তিগৃহে চারি প্রহরে চারিবার পূজা করিতে হয়।

লুয়ে জাগরণের জন্য এই রাত্রে গায়ক কর্তৃক হরিশ্চন্দ্র পালা গীত হয়। ইহা দিনগাজন বা পূর্ণিমা দিনের কর্ম।

বিসর্জন

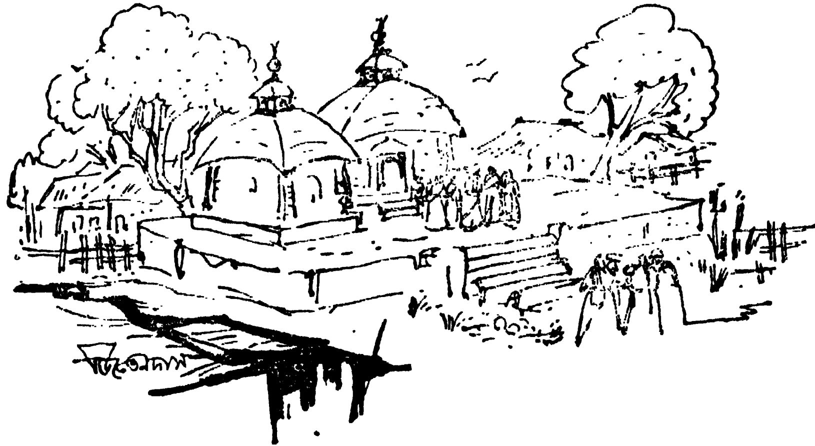
তৎপর দিনেও পূর্বের ন্যায় সাবরণ ধর্ম ও কামিন্যার পূজা হইলে সকলে প্রার্থনা স্তবাদি পাঠ করে।

পরে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত প্রভৃতিকে দক্ষিণা দান, বরণীয় সকলের পরিতোষ, ধর্মকে ভোগদান, আরতি ইত্যাদি হইলে পণ্ডিত মুক্তিমণ্ডপে, মুক্তিধর্মের পূজাদি শেষ করিয়া, মুক্তি বিসর্জনের জন্য, মুক্তিবিজয়া কল্মা ছড়া পাঠ করিয়া মন্ত্রদ্বারা মুক্তি বিসর্জন, হংস বা কপোত পক্ষী দ্বারা মুক্ত-মণ্ডল ভঙ্গ, মুক্তি ঘট বিসর্জন ইত্যাদি সারিয়া, গাজনমণ্ডপে লক্ষ্মী উত্থান করিয়া ঘটাদি বিসর্জন করে।

কামিন্যাঘট প্রায় বিসর্জ্জন করা হয় না। সেই ঘটের উপর অষ্টধাতুনির্মিত মুখ বসাইয়া, কামিন্যা প্রতিষ্ঠার বিধানে প্রতিষ্ঠা করাইয়া, ধর্মের বামে রাখিয়া পূজা করিতে হয়। কামিন্যা রাখিতে ইচ্ছা করিলে, পিত্তলের ছোট কলসে কামিন্যা আনয়ন করিতে হয়। কিন্তু ধর্মের প্রতিষ্ঠিত কামিন্যা থাকিলে বা কমিন্যা প্রতিষ্ঠায় অসমর্থ হইলে, এই সময় কামিন্যাঘট বিসর্জন করা চলে।

পরে লুয়ের হাঁড়ি বিসর্জন, পঞ্চঘট বিসর্জন, ভক্ত্যা ও আমিনী প্রভৃতি সকলকে শান্তিদান, অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্য প্রশমন, ইত্যাদি শেষ হইলে বাদ্যভাণ্ড সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণপূর্বক স্থাপিত পঞ্চঘট, কামিন্যাঘট, মুক্তিকলস, লুয়ের হাঁড়ি প্রভৃতি জলে বিসর্জন করা হয়। কোনও কোনও স্থলে লুয়ের হাঁড়ি মাটিতে গাড়িয়া দেয়। লুয়ের হাঁড়ি ও মুক্তিঘট বিসর্জন করা হইলে, যাহারা লুয়ে বা মুক্তি ধরিয়াছিল, তাহারা জল খাইতে পায়। পরে ভক্ত্যারা ক্ষৌরকর্ম সমাধানপূর্বক তৈলহরিদ্রা মাখিয়া স্নান করিয়া আসিলে ভক্ত্যা ও আমিনীদিগকে সংক্ষেপে ধর্মপূজা করাইয়া, পণ্ডিত, উত্তরীয় ত্যাগ মন্ত্রে উত্তরীয় ত্যাগ করায়। এই দিন ধর্মকে অন্নভোগ দেওয়া হয় এবং এই সময়েই লুইয়া ছাগের মাংস রন্ধন হয়। ইহাতেই ভক্তাদের পারণা হইয়া থাকে। এই দিনের রাত্রে গায়ক কর্তৃক ধর্ম-মঙ্গলের স্বর্গারোহণ পালা গান করা হয়।

পরে সকামিন্যা ধর্মকে যথাশক্তি পূজা করিয়া, নিজ মন্দিরে স্থাপনপূর্বক পুনর্বার পূজা করিতে হয়। ইহাই প্রচলিত গৃহভরণ গাজনের বিবরণ।



[শ্রীদুর্গাচরণ সরকার বাঁকুড়া জেলার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন বড়জোড়া থানার অন্তর্গত জগন্নাথপুর এবং সোনামুখীতে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ সম্পর্কে দুইটি নিবন্ধ প্রেরণ করেন। নিম্নে উহা লিপিবদ্ধ করা হইল।]

সোনামুখী

বাঁকুড়া শহর হতে সোনামুখীর দূরত্ব ২৪ মাইল। বাস চলে বাঁকুড়া হতে, তাছাড়া বি. ডি. আর. রেলপথে স্টেশনও আছে সোনামুখীতে। বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা সোনামুখী—লোকবসতিও বেশ ঘন।

সোনামুখীর বাজারের মধ্যে সরু গলি দিয়ে ঢুকেই সুন্দর একটি মন্দির নজরে পড়ে। এটি শ্রীধর মন্দির। ১২৫২ সন অর্থাৎ ১৮৪৫ সালে রুদ্রদাস নামে কোন ব্যক্তি এটি নির্মাণ করেন। রুদ্রদাস অপুত্রক ছিলেন; তিনি মন্দির নির্মাণ করে যাবতীয় সম্পত্তি দেবোত্তর করে যান। মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপি হতে জানা যায় হরি সূত্রধর মন্দিরটির শিল্পী ও স্থপতি। প্রায় মানুষ সমান উঁচু ভিতের উপর অপরূপ টেরাকোটা কারুকার্যখচিত মন্দিরটি সত্যই দেখবার মত। দুর্গা, কালী, শিব, রামের অভিষেক, অশ্বমেধ প্রভৃতির নিখুঁত প্যানেল আছে। দরজার মাথায় দুটি টিয়া পাখির একদিকে কালী ও অন্যদিকে কৃষ্ণমূর্তি খোদিত।

শ্রীধর মন্দির হতে খানিকদূরে সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির। ১২৭৪ সনে ব্রজমোহন ধরের নির্দেশে রামগোপাল সূত্রধর কর্তৃক মন্দিরটি নির্মিত হয়। এর একতলায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত এবং দোতালায় দুধারে দুই ঘোড়া মাঝে চূড়ার মধ্যে বিরাট চতুর্মুখ মহাদেবমূর্তি—তারও ওপরে সুউচ্চ মন্দিরশীর্ষ। মন্দিরের দরজার উপর পাথরে লেখা আছে "নবাস্তে সপ্তমাব্দে যশে সিদ্ধেশ্বরায় নমঃ। স্বগ্রামীন সহকারী ধরাঙ্ক ব্রজমোহন।" কথিত আছে ১৮৬৭ সালে ব্রজমোহন ধর মশাই নিজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে এটি রচনা করিয়ে আনেন। কিছুটা এগোলেই দেবী স্বর্ণমুখীর মন্দির। মন্দিরের সামনে ফাঁকা জায়গায় মেলা বসে। দুর্গাপূজার সময় জাঁকজমক সহকারে দেবীর পূজা হয়। মন্দিরটি সিমেণ্ট ও ইঁট নির্মিত—রঙিন কারুকার্য করা—তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নির্মিত। মন্দিরে কোন চূড়া নেই তবে সম্মুখ ভাগে ফুল লতাপাতার নক্সার সঙ্গে দুটি সিংহমূর্তি খোদিত আছে। প্রতিমা অতি নিরাড়ম্বর ভাবে বেদীর উপর বসান। একটি ত্রিভুজাকৃতি কালো পাথরের উপর খোদিত চতুর্ভুজা দেবী সম্ভবত ঘোড়ার উপর উপবিষ্ট। মূর্তিটি শীতলা-দেবীর হওয়া বিচিত্র নয়। মূর্তিটি অবশ্য ক্ষয়ে গেছে। এক সময় বোধহয় এঁর মুখ ও চোখ সোনা দিয়ে মোড়া ছিল—তাই দেবীর নাম স্বর্ণমুখী। অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামানুসারে গ্রামের নামও সোনামুখী। দেবীর বামপার্শ্বে একটি ছোট বুদ্ধদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ফুট খানেক উঁচু কালোপাথরের উপর ধ্যানাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধদেব ও তাঁর তলে শিষ্যমণ্ডলী উৎকীর্ণ। বাঁকুড়ায় মাত্র দু-একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছে—সেই হিসাবে মূর্তিটি মূল্যবান। দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটি অষ্টভুজা দুর্গা মূর্তি আছে। পাথর ক্ষয়ে গিয়ে এর আসল রূপটি বোঝা মুস্কিল।

সোনামুখীতে কালীপূজা বিশেষ বিখ্যাত। পাড়ায় পাড়ায় কালীপূজা হয়। বিসর্জন শোভাযাত্রা সারা রাত্র ধরে চলে। এছাড়া কার্তিক পূজাও দেখবার মত। বিরাট বিরাট কার্তিক প্রতিমা জরির সাজে সাজান হয়। প্রতিমা কোন কোনটি দশ এগার ফুট উঁচু হয়। ঢাক ঢোল সানাইয়ের প্রাণমাতান বাজনায় সেদিন সারা শহর মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। পূজার পর চতুর্থ দিনে বিসর্জন শোভাযাত্রা বের হয়। প্রায় সারারাত ধরে চলে বিজয়া। সেই সময় আশেপাশের গ্রামঞ্চল হতে হাজার হাজার নরনারী সোনামুখীতে এসে সমবেত হন।

সোনামুখীর আর একটি দ্রষ্টব্যস্থল মনোহর দাসের সমাধি মন্দির। মনোহর দাস ছিলেন নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের শিষ্য। বীরভদ্রের তিন শিষ্যর মধ্যে ভগবান দাস কালনায়, গোপালদাস কাটোয়ার নিকট দইধিবর্গী

নামক স্থানে ও মনোহর দাস সোনামুখীতে আশ্রম করেন। মনোহর দাসের উপাস্য দেবতা ছিলেন শ্যামরায়। রাম নবমী তিথিতে সন্ধ্যায় শ্যামরায়কে মন্দিরের সম্মুখস্থ দোলমঞ্চে প্রতিষ্ঠা করে দোলউৎসব পালিত হয়। রাত্রি ১২টায় অধিবাস। মনোহর দাসের সমাধি মন্দিরটি একটি পাকা দালানের মধ্যে অবস্থিত—সেখানে অন্নভোগ হয় রাত্রে। সমাগত সমস্ত নরনারী জাতিধর্মনির্বিশেষে মধ্যাহ্নে অন্নভোজন করেন। দশমী ও একাদশী তিথিতে যে অন্নকূট হয় তাতে প্রতিদিন প্রায় ১৫ মণ চালের ভাত রান্না হয়। গোস্বামীদের ভোজনের পর দক্ষিণা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

তিনদিনব্যাপী উৎসবে অসংখ্য আউল-বাউল-বৈষ্ণবদের সমাগম হয়। প্রায় আড়াইশো-তিনশ বাউল আসেন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে। বর্ধমানের পাটলিগ্রাম থেকে গোপালদাস, জয়দেব কেন্দুলির সনাতন দাস, লক্ষ্মণ দাস, নরোত্তম দাস, বীরভূমের গঙ্গাধর দাস, পূর্ণ চন্দ্র দাস, বীরেন দাস ও পূঃ পাকিস্থানের (অধুনা ২৪ পরগণা বাসী) দীনবন্ধু দাস ও আরও অনেক বাউল সন্ন্যাসী মনোহর দাসের মেলা উপলক্ষে সোনামুখীতে সমবেত হন। উৎসবে দিবারাত্র কীতন করবার জন্য কীর্তনের দল আসে বিভিন্ন স্থান থেকে; তার মধ্যে বেলিয়াতোড়ের রাধাবল্লভ দাস, কালনার ননী গোপাল ভট্টাচার্য, গোপীনাথ পুরের রমানাথ দাস, দধিমুখের শম্ভু দাস ও যশোরার নারায়ণ দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাম-নবমীর কিছুদিন আগেই মনোহর দাসের মন্দিরে ১০৮ খোলসংকীর্তন হয়েছিল, তাতে হাজার হাজার নরনারীকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে রাস্তার উপর মেলা বসে। মেলায় প্রায় তিরিশ-চল্লিশটি দোকান বসে এবং অসংখ্য যাত্রী সমাগম হয়।

সোনামুখীর তন্তুবায় সম্প্রদায় বংশানুক্রমিক ভাবে মনোহর দাসের শিষ্য। একসময়ে এঁদের তৈরী রেশমদ্রব্য বিদেশেও রপ্তানী হত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি ছিল সোনামুখীতে— এখনও জন চীপসাহেবের কুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

সোনামুখীর মৃৎশিল্পও বিখ্যাত। এখানকার সূত্রধরেরা একসময় মন্দিরাদি নির্মাণ করে তাতে টেরাকোটার অলংকরণ করতেন। সেই সূত্রধর বংশের লোকেরা এখন রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। বুড়ো শিবতলার পঞ্চানন সূত্রধর কাঠখোদাই করে শিবদুর্গা, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি মূর্তি তৈরী করতে পারেন। এখানকার মৃৎশিল্পীদের তৈরী পোড়ামাটির হাতিঘোড়া, মনসার চালি ও ঘট প্রভৃতিও শিল্প রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

জগন্নাথপুর

বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাস্তায় বেলিয়াতোড়ের কিছু দূরে গদারডিহি মোড়। সেখান থেকে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গিয়েছে বনের মধ্যে দিয়ে সোজা জগন্নাথপুরে। পীচ বাঁধান পাকা রাস্তা থেকে গ্রামের দূরত্ব হবে প্রায় ছয় মাইল। আবার সোনামুখীর রাস্তায় বৃন্দাবনপুরে বাস থেকে নেমে হাটা পথে মাইল চারেক গেলেও জগন্নাথপুর পড়বে। বাঁকুড়া থেকে দিনে একটা বাস যায় এই গ্রামে।

জগন্নাথপুরে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, নাপিত প্রভৃতির বাস। গ্রামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বিদ্যালয় আছে। অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা কৃষিকার্য।

গ্রামের প্রান্তে বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বড় বড় গাছের ছায়ায় শান্ত শীতল এক স্থানে বিরাট একটি প্রস্তর নির্মিত মন্দির চোখে পড়ে—এটি রত্নেশ্বর শিবমন্দির নামে খ্যাত। কথিত আছে রত্নেশ্বর নামে কোন সন্ন্যাসী এখানে তপস্যা করেছিলেন বলে শিবের নাম রত্নেশ্বর। কিন্তু তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই মন্দিরের শিবমূর্তি এক সময়ে রাজানুকূল্যে রত্নখচিত অলংকারে ভূষিত ছিল—তাই বোধ হয় নাম হয়েছে রত্নেশ্বর। অনেকে মনে করেন সেন রাজাদের আমলে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। কথিত আছে মল্লরাজা বীর হাম্বির মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি মন্দিরের পূজারী, মালাকার, ঝাড়ুদার প্রভৃতি সকলকে চাকরান পদ্ধতিতে জমিজায়গা বন্দোবস্ত করে দেন--প্রতিদানে তাঁরা মন্দিরের নানান কাজ করতেন। সেই সমস্ত জমি তাঁরা পুরুষানুক্রমে এখনও ভোগ দখল করছেন। নিকটস্থ বীরবাঁধ নামক পুষ্করিণী বীর হাম্বিরের নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। নিকটের একটি

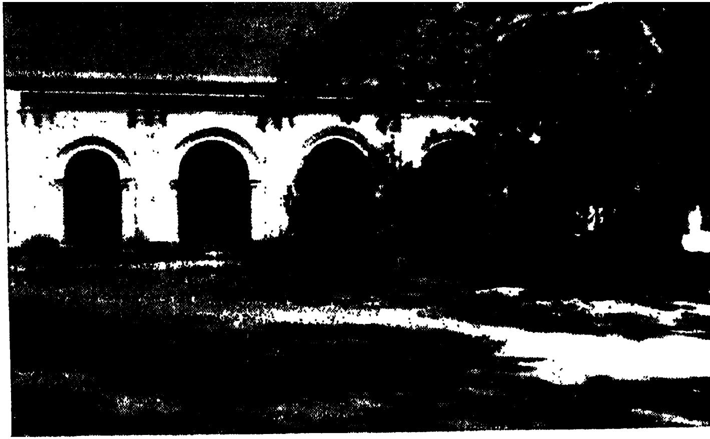
গ্রামের নামও হামিরহাটি। উঁচু ভিতের উপর প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু পাথরের তৈরী শিখর মন্দির। সামনে তার নাটমঞ্চ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে নির্মিত। মন্দির চূড়ায় আমলক ও চতুষ্পার্শে চারিটি ঝম্পমান ক্ষুদ্র সিংহ। মন্দিরের দরজা দক্ষিণমুখী। মন্দিরের অভ্যন্তর অতি সংকীর্ণ তার মধ্যে গর্তের ভিতর জলমগ্ন শিবলিঙ্গ লোকে বলে স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গ। মন্দিরের বাইরে গাছতলায় একটি পাথরের গায়ে আঁকা মনুষ্যমূর্তি ও কিছু মাটির হাতী ঘোড়া পড়ে রয়েছে। গ্রাম্য বৃদ্ধারা বলেন প্রায় চল্লিশ-পয়তাল্লিশ বৎসর আগে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মন্দির পরিদর্শন করে যান।

জগন্নাথপুরের শিবের গাজন বিখ্যাত। বাঁকুড়ায় যে কটি উল্লেখযোগ্য গাজন উৎসব হয়, তারমধ্যে জগন্নাথপুরের নাম এক্তেশ্বরের পরেই। চৈত্র মাসের পনের তারিখ হতে মেলা বসতে সুরু করে ও বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। চৈত্র মাসের ২৭ তারিখে গাজন সন্ন্যাসীসহ রাজভক্ত্যা ও পাট ভক্ত্যার কামান হয়। এই দিন সন্ন্যাসীরা পৈতা গ্রহণ করেন। ২৮ তারিখে 'দিন গাজন' —তাকে রাজাঘাটা বলে। সন্ন্যাসীরা রাজার ঘাট বীর-বাঁধ হতে স্নান সমাপন করে দল বেঁধে নাচতে নাচতে মন্দিরে আসেন। সন্ন্যাসীদের অনেকের পরণে রঙিন শাড়ি ও গায়ে গয়না থাকে। পরের দিন 'রাত গাজন' ও সেদিনই আসল জাঁক। সন্ধ্যার পর সন্ন্যাসীরা বীরবাঁধে স্নান করে শোভাযাত্রা করে মন্দির অভিমুখে রওনা হন। তাঁদের মধ্যে পাট ভক্তা তীক্ষ্ণ শলাকার পাট অর্থাৎ প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা সরু কাঠের পাটার উপর গামছা বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে থাকেন – আশ্চর্য একটি শলাকাও তার দেহে বিদ্ধ হয় না। তাঁর শরীরের দুপাশে পা রেখে পাটার উপর দাঁড়িয়ে থাকেন মূল পুরোহিত "ধামাত কল্পি"। "ধামাতকল্পি"-রা দেবল ব্রাহ্মণ শ্রেণীর—শিবের বামুন নামে পরিচিত। মুহুর্মুহু শিবের জয়ধনির মধ্যে শোভাযাত্রা সহকারে পাটাখানা কাঁধে করে বয়ে আনা হয় মন্দিরে। অন্যান্য ভক্ত্যারা এই সময় বাণ ফোঁড়েন। ছোট ছোট লোহার শিক ও সরু বেতের কাঠি দ্বারা তাঁরা অক্লেশে জিহ্বা, নাক, কান, বুক, পেট প্রভৃতি নব অঙ্গ বিদ্ধ করেন। কী এক অদৃশ্য শক্তি বলে এঁরা বৎসরের পর বৎসর একই ভাবে এই অমানুষিক নির্যাতন স্বেচ্ছায় বরণ করেন তা' ভাবা যায় না। রাত্রি দুটো তিনটে পর্যন্ত তুমুল উন্মাদনার মধ্যে বাণফোঁড়া চলে। নিশীথ রাতের অন্ধকারে হাজার হাজার লোকের অস্পষ্ট অবয়ব নড়াচড়া করে, আর তার মধ্যে শিব ভক্ত্যাদের তাণ্ডব নৃত্য এক অপার্থিব রহস্যলোক সৃষ্টি করে।

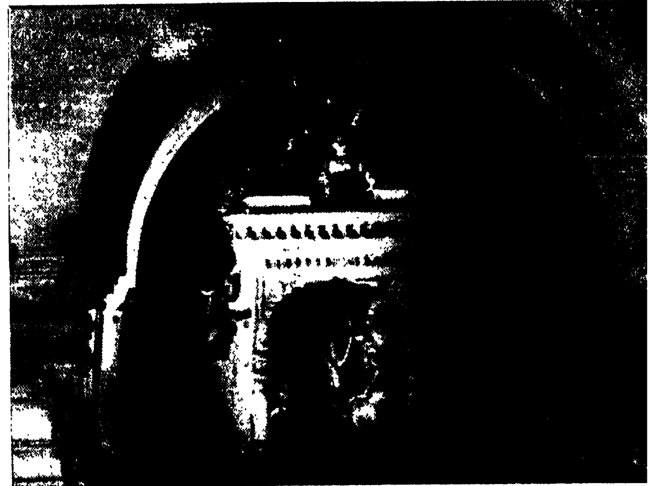
পূর্বে চড়ক উৎসবে পিঠে লোহার হুক বিঁধে সন্ন্যাসীরা বাঁশের দণ্ড হাতে ঝুলন্ত অবস্থায় ঘুরপাক খেতেন। মাত্র কয়েক বৎসর হল তা বন্ধ হয়েছে।

জগন্নাথপুরের গাজন উৎসবে প্রায় চারশত 'ভক্ত্যা' বা সন্ন্যাসী সমবেত হন। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম—আশুরিয়া, মাঝিরডাঙ্গা, রামপুর, কোদমা, হামিরহাটি, স্যাকরাকাটা, গোঁসাইপুর, বেলুট, দধিমুখা, ছান্দার ও জগন্নাথপুর হতে দলে দলে সন্ন্যাসীরা এসে গাজনের দিন সমবেত হন। প্রতি দলে পঁচিশ-তিরিশ থেকে শতাধিক সন্ন্যাসী থাকেন। সকলকে গামছা, গুড় ও ভিজে ছোলা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। চৈত্র মাসের ১৯ তারিখ হতে নাটমঞ্চে রামায়ণ পাঠ হয়। সদারামপুরের প্রভাকর বাবু রামায়ণ গান করেন। রত্নেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে এই সময় বিরাট মেলা বসে। প্রায় দুই শতাধিক দোকানপাট গাছতলায় বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ জুড়ে বসে। মেলায় সব থেকে বেশী আসে মিষ্টির দোকান। তাছাড়া ঘাটশীলা, চন্দ্রকোণা ও চাণ্ডিলের পাথরের থালা বাটি, মেদিনীপুরের মাদুর ও মোড়া, বিষ্ণুপুরের শাঁখা, সোনামুখীর মাটির পুতুল, ও বিভিন্ন জায়গার মাছধরার জাল, কাঁচের চুড়ি, লোহা ও ইস্পাতের দা-কাটারি, হাতা-খুন্তি, চীনামাটির পাত্র, হাতপাখা প্রভৃতি বিপুল দ্রব্য সামগ্রী মেলায় বিক্রির জন্য আসে। মেলায় গাজনের দিন প্রায় তিন চার হাজার লোক সমাগম হয়। বাসে করে, গরুরগাড়ি চড়ে, অথবা পায়ে হেঁটে কাতারে কাতারে লোক মেলা দেখতে ও পূজা দিতে আসে।

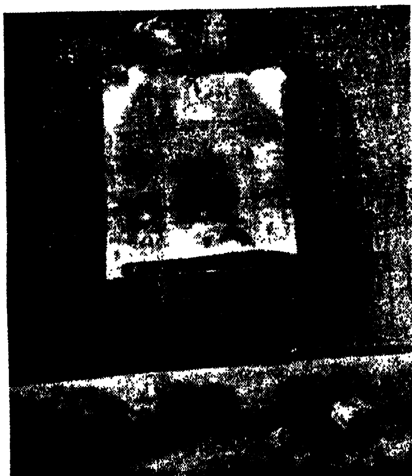
জগন্নাথপুরের অধিবাসীরা গাজন করে—তারই দিন গোণে সারা বৎসর ধরে। কেননা গাজনের কদিন আনন্দে অসংখ্য লোকের কলরবে জগন্নাথপুরের রূপ যায় পালটে—মেলা শেষ হলেই গ্রাম আবার নিশ্চুপ অন্ধকারে ডুবে যায়।



মৃন্ময়ীদেবীর মন্দির—বিষ্ণুপুর

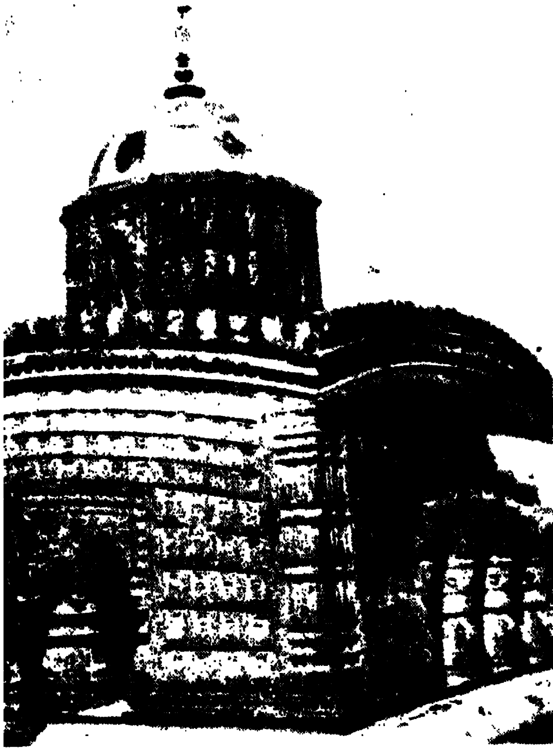


বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীর প্রাচীন
মৃন্ময়ীদেবীর মূর্তি

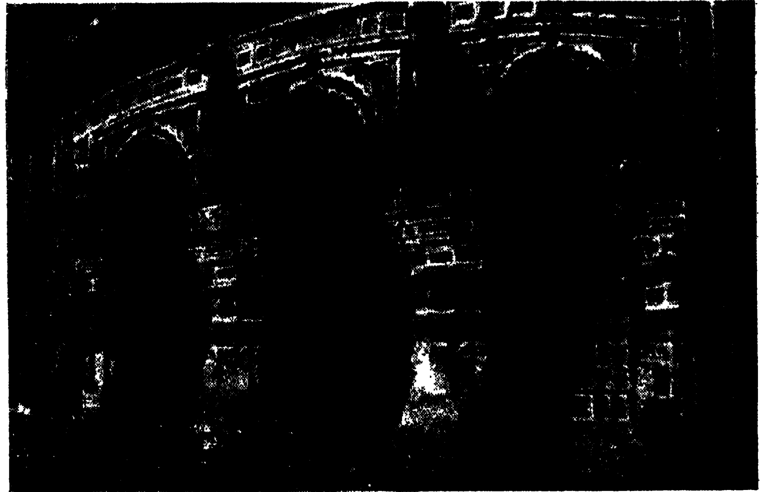


শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে মৃন্ময়ীদেবীর
মন্দিরে পূজিত পটচিত্র—বিষ্ণুপুর

বিষ্ণুপুরের বিগ্রহহীন কয়েকটি প্রাচীন প্রখ্যাত মন্দির



মদনমোহন মন্দির



মদনমোহন মন্দিরের
পোড়ামাটির কাজ



রাধাশ্যাম মন্দির



লালজী মন্দির



জোড়বাংলা মন্দির



আর একটি জোড়বাংলা মন্দির



বিষ্ণুপুরের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন
মন্দিররূপে পরিচিত

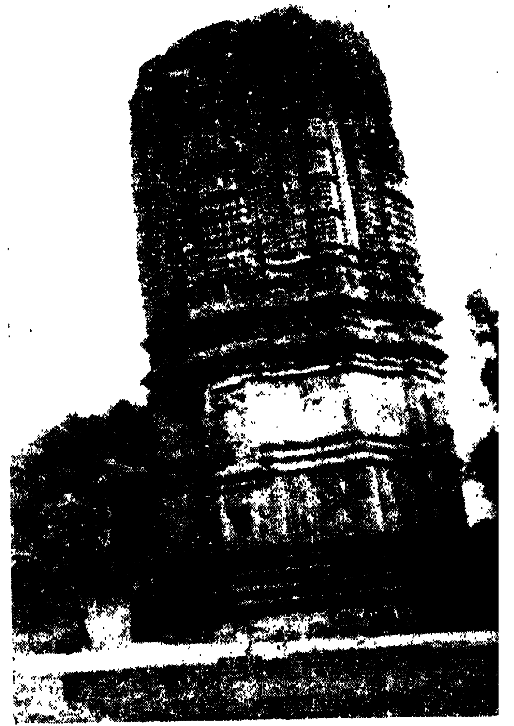
পথের ধারে পাথরের রথ





প্রখ্যাত রাসমঞ্চ

বাঁকুড়ার অন্যান্য কয়েকটি মন্দির



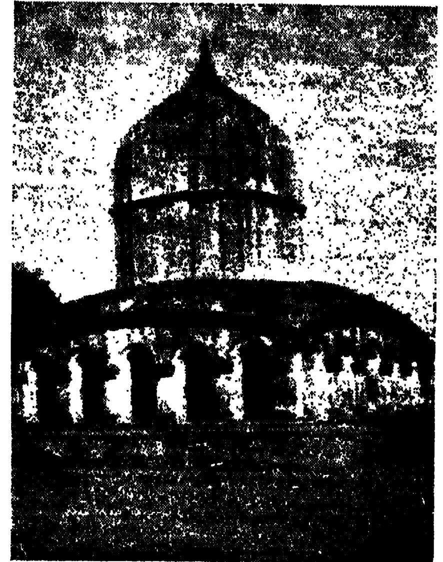
সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির—বহুলাড়া



মল্লেশ্বর শিবমন্দির—বিষ্ণুপুর



এক্তেশ্বর শিবের মন্দির—বাঁকুড়া



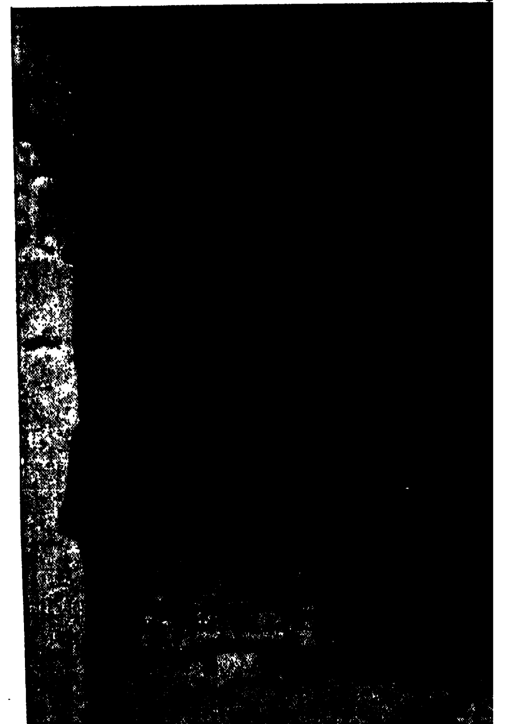
কালঞ্জয় শিবের মন্দির
—পাত্রসায়র



পোড়ামাটির অলঙ্কার সমৃদ্ধ
একটি প্রাচীন মন্দির
—পাত্রসায়র



অম্বিকাদেবীর মন্দিরের সন্নিকটে গাছতলায় বাঁদিকে কালুরায়রূপে পূজিত বীরস্তম্ভ এবং ডানদিকে ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি—অম্বিকানগর



অম্বিকাদেবীর মন্দিরের সন্নিকটে শিবরূপে পূজিত বিষ্ণুমূর্তি



কূর্মাকৃতি যাত্রাসিদ্ধিরায়—ময়নাপুর



মন্দিরাভ্যন্তরে কামিণ্যা কলসীসহ
যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্মরাজ—ময়নাপুর



রামকৃষ্ণজীউর মন্দির—সাত্রাকোন



রামকৃষ্ণ বিগ্রহ—সাত্রাকোন



সোনামুখীর বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের
কুলদেবতা শ্যামসুন্দরজীউ



শনির মেলায় আগত জনতার একাংশ
—মটগোদা



শিলায় খোদিত মহামায়া বিগ্রহ
—সাগারাজোড়া



শতাব্দীর সিন্দুরলিপ্ত আটবাইচণ্ডার অস্পষ্ট
শিলামূর্তি—আটবাইচণ্ডী

হাড়মাসড়া গ্রামে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত
প্রাচীনতম দেউল





বাঁকুড়ার একটি মন্দির



একটি প্রাচীনতম স্তূপমন্দিরের
ধ্বংসাবশেষ—সোনাতাপল

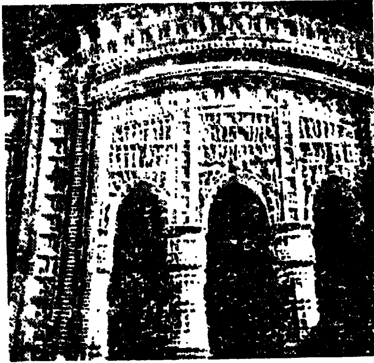


বাঁকুড়ার পোড়ামাটির শলন মূর্তি

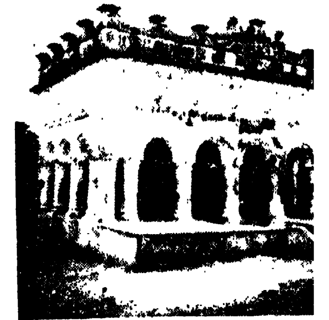
শুশুনিয়া পাহাড়
ডানপাশে নৃসিংহতলা







শ্রীধরমন্দির গায়ে পোড়ামাটির কাজ
ডানদিকে স্বর্ণময়ী মন্দির—সোনামুখী

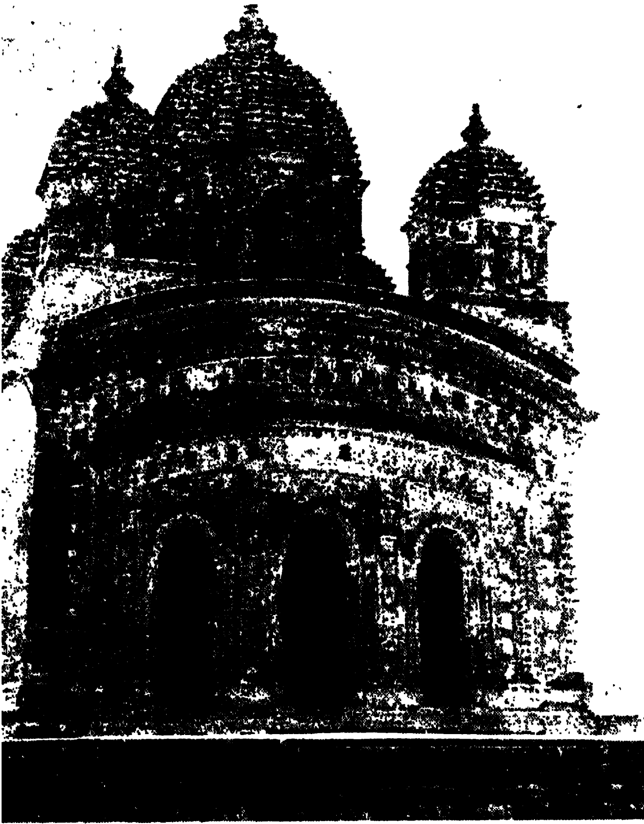




প্রাচীন মৌলেশ্বর শিবমন্দির, পিছনে
নির্মীয়মান নূতন মন্দির—ছাতনা

মৌলেশ্বর শিবমন্দিরের সম্মুখে
রক্ষিত কয়েকটি ভগ্নশিলামূর্তি

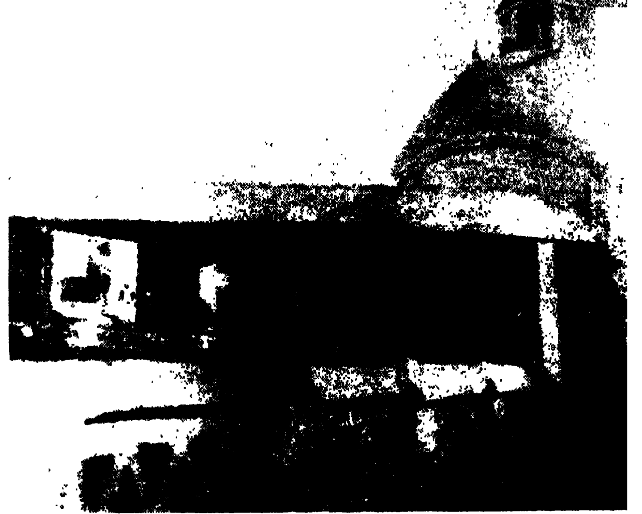




পঞ্চরত্ন মন্দির—বিষ্ণুপুর



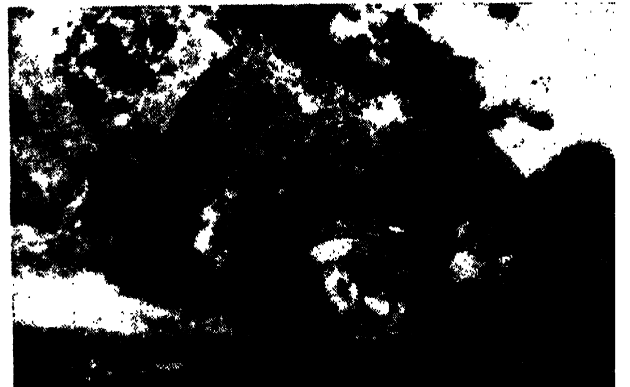
ভগ্নদশা প্রাপ্ত প্রাচীন বাঙ্গলী
মন্দির—আটবাইচণ্ডী



তারামায়ের মন্দির
—তারাপীঠ



শ্বেতকুণ্ডের ধারে বক্রেশ্বর শিবমন্দির
—দুবরাজপুর



বক্রেশ্বর শিবমন্দির সংলগ্ন
অসংখ্য মন্দিরের কয়েকটি



পৌষ উৎসবে ব্রহ্মোপাসনা মন্দির প্রাঙ্গণে
সমাগত ভক্ত নরনারীবৃন্দ
—শান্তিনিকেতন



ছাতিমতলা—শান্তিনিকেতন



বাউলগানের আসর—শান্তিনিকেতন



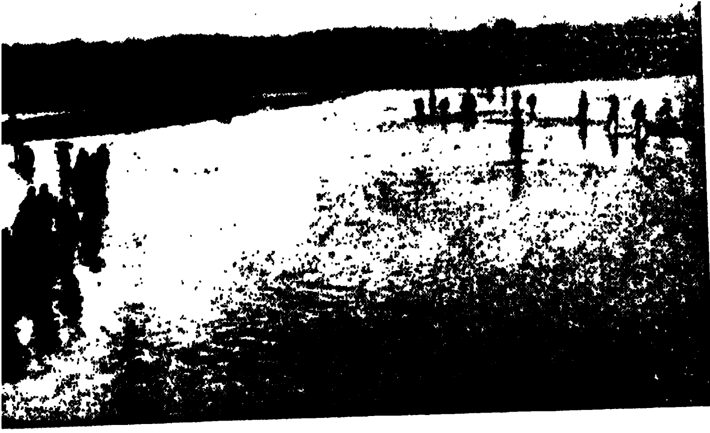
শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার একাংশ



'আমি কোথায় পাব তারে'
—জনৈক বীরভূমের বাউল



প্রস্তরে খোদিত প্রাচীন মনসামূর্তি—বীরভূম



প্রত্যূষে অজয় নদ পেরিয়ে লোক
চলেছে জয়দেব মেলায়

রাধামাধব মন্দির—জয়দেব কেন্দুলি





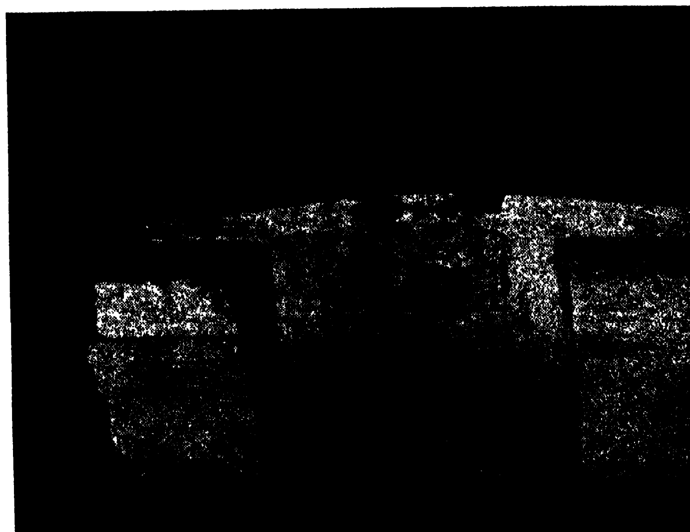
পোড়ামাটির কাজে অলঙ্কৃত রাধামাধব
মন্দিরের দেওয়াল গাত্র



জয়দেব মেলায় পণ্যসামগ্রী বহনকারী
অসংখ্য গরুরগাড়ী



বাউলের আসর—জয়দেব কেন্দুলি



দ্বারবাসিনীদেবী—সাঁইথিয়া

বীরভূম



মানচিত্রে

বীরভূম জিলার

পূজা-পার্বণ ও মেলা

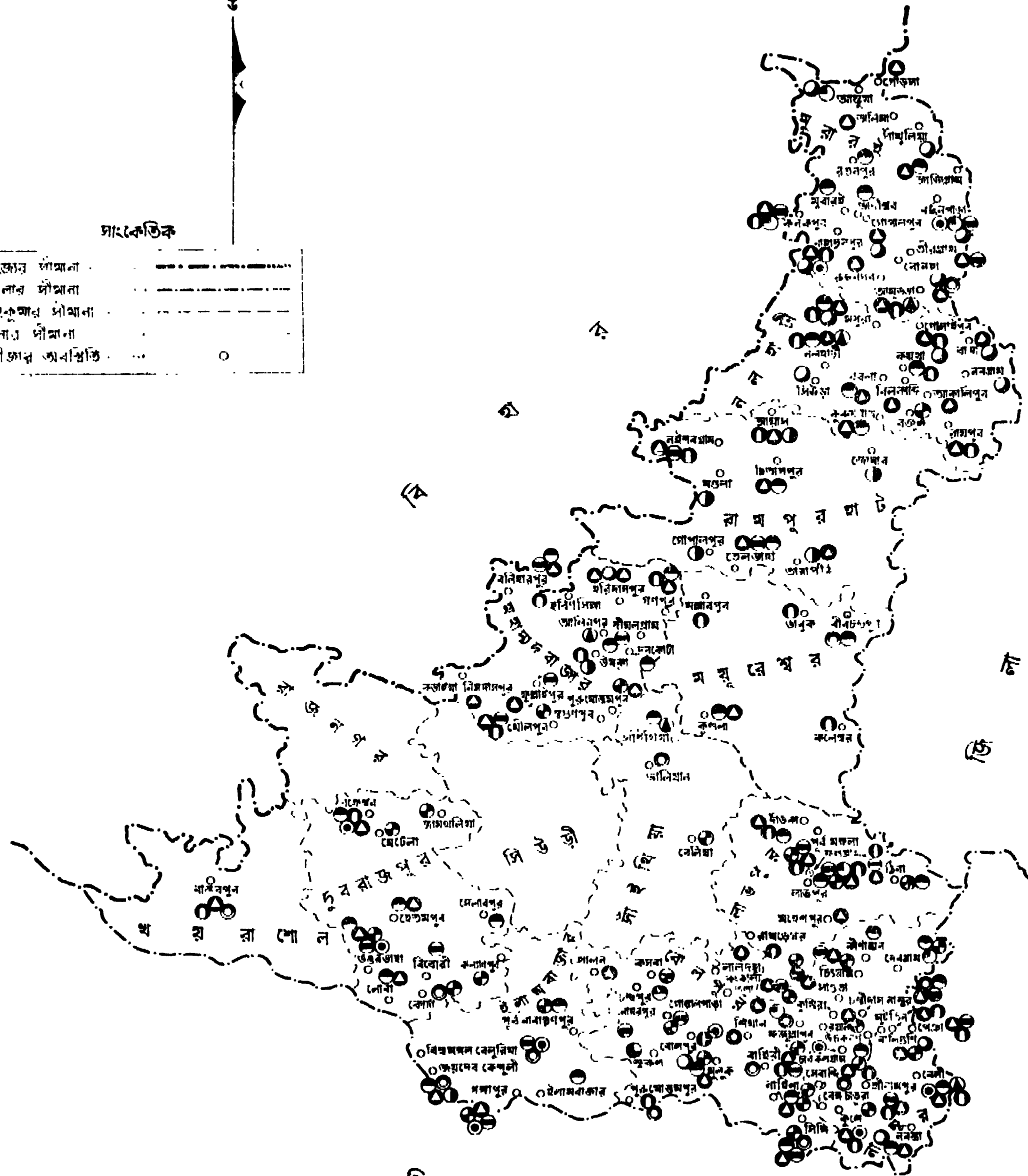
পূজা পার্বণ ও অন্যান্য উৎসবের প্রতীক নির্দেশক

শৈব দেবতা	[শিবপূজা, শিবরাত্রি, চড়ক, গাজন, নীলপূজা প্রভৃতি।]
বিষ্ণু আদি দেবতা	[রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, অক্ষয়তৃতীয়া, অনন্তচতুর্দশী, রাস, দোল, ঝুলন, রথ, স্নান, গোষ্ঠ প্রভৃতি দ্বাদশ যাত্রা এবং বৈষ্ণবীয় মহোৎসব।]
শক্তি	[কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, গন্ধেশ্বরী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি]
ধর্মরাজ	[ধর্মরাজপূজা, ধর্মরাজের গাজন প্রভৃতি]
লৌকিক ও গ্রাম্য দেবদেবী	[ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী, ওলাবিবি, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, দক্ষিণরায় প্রভৃতি]
পুণ্যস্নানাদি পর্ব	[বারুণী, পৌষসংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা, অষ্টমীস্নান প্রভৃতি]
তিথিঘটিত পর্ব	[বাংলা নববর্ষ, পৌষ পার্বণ, অম্বুবাচী, জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি]
অন্যান্য দেবতা	[কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি]
আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসব	[হিন্দু সাধুসন্তদিগের]
পীরের উরস	[মুসলমান পীর, ফকির, দরবেশ প্রভৃতি]
আদিবাসী উৎসব	[করমপূজা, বাঁধনা পর্ব প্রভৃতি]
মুসলমানদিগের উৎসব	[মহরম, ইদ, সবেবরাত প্রভৃতি]
জৈন উৎসব	[জৈন সম্প্রদায়ের যাবতীয় উৎসব]
বৌদ্ধ উৎসব	[বুদ্ধজয়ন্তী প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের যাবতীয় উৎসব]
খৃষ্টানদিগের উৎসব	[ইংরাজী নববর্ষ, বড়দিন, প্রভৃতি খৃষ্টানদিগের যাবতীয় উৎসব]
বিবিধ উৎসব	[ভারতের স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, প্রখ্যাত দেশনেতার জন্মোৎসব]

স্ব.চ.

পূজা পার্বণ ও অন্যান্য উৎসব

জিলা বীরভূম



মানচিত্রটি বিবরণ-প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব।

—সম্পাদক।

শ্রীজলধিভূষণ দাশগুপ্ত

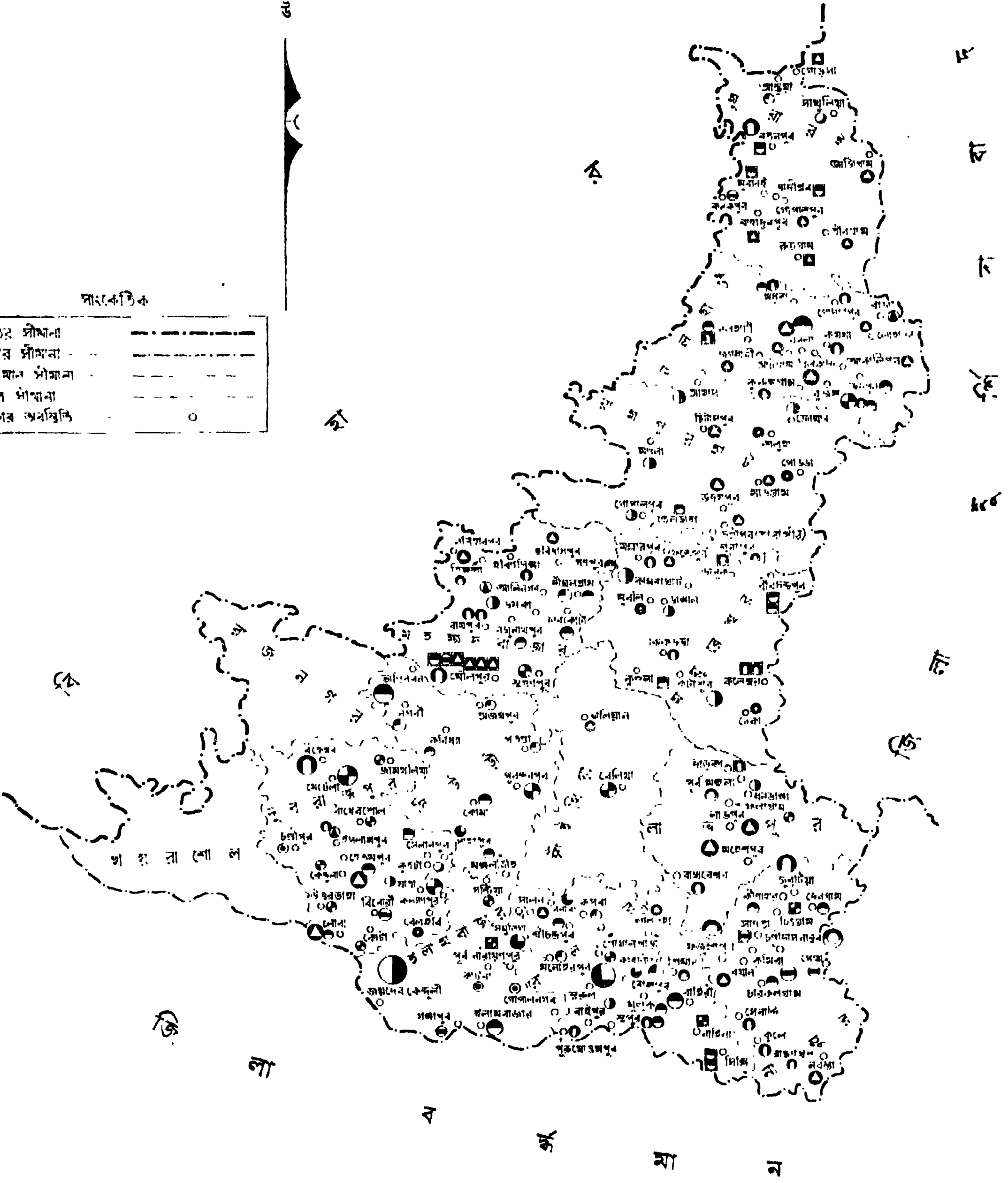
মেলার উপলক্ষ ও লোকসমাগমের প্রতীক নির্দেশক

শৈব দেবতা	[শিবপূজা, শিবরাত্রি, চড়ক, গাজন, নীলপূজা প্রভৃতি]	◐
বিষ্ণুআদি দেবতা	[রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, অক্ষয়তৃতীয়া, অনন্তচতুর্দশী, রাস, ঝুলন, গোষ্ঠ, দোল রথ, স্নান প্রভৃতি দ্বাদশযাত্রা এবং বৈষ্ণবীয় মহোৎসব]	⊖
শক্তি	[কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, গন্ধেশ্বরী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি]	△
ধর্মরাজ	[ধর্মরাজপূজা, ধর্মরাজের গাজন প্রভৃতি]	◕
লৌকিক ও গ্রাম্য দেবদেবী	[ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী, ওলাবিবি, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, দক্ষিণরায় প্রভৃতি]	⊖
পুণ্যস্নানাদি পর্ব	[বারুণী, পৌষসংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা, অষ্টমীস্নান প্রভৃতি]	◑
তিথিঘটিত পর্ব	[বাংলা নববর্ষ, পৌষপার্বণ, অম্বুবাচী, জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি]	◉
অন্যান্য দেবতা	[কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি]	◔
আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসব	[হিন্দু সাধুসন্তদিগের]	◌
পীরের উরস্	[মুসলমান পীর, ফকির, দরবেশ প্রভৃতি]	▲
আদিবাসী উৎসব	[করমপূজা, বাঁধনা পর্ব প্রভৃতি]	⊙
মুসলমানদিগের উৎসব	[মহরম, ঈদ, সবেবরাত প্রভৃতি]	◒
জৈন উৎসব	[জৈন সম্প্রদায়ের যাবতীয় উৎসব]	□
বৌদ্ধ উৎসব	[বুদ্ধজয়ন্তী প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের যাবতীয় উৎসব]	○
খৃষ্টানদিগের উৎসব	[ইংরাজী নববর্ষ, বড়দিন প্রভৃতি খৃষ্টানদিগের যাবতীয় উৎসব]	⊕
বিবিধ উৎসব	[ভারতের স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, প্রখ্যাত দেশনেতার জন্মোৎসব]	◕

লোকসমাগম অনির্দিষ্ট	▫
১,০০০ পর্যন্ত	○
১,০০১ — ২,৫০০	○
২,৫০১ — ৫,০০০	○
৫,০০১ — ১৫,০০০	○
১৫,০০১ — ২৫০০০	○
২৫,০০১ এবং তদূর্দ্ধ	○

মেলার স্থান, উপলক্ষ ও লোকসমাগম

জিলা বীরভূম



শ্রীজলধি ভূষণ দাশগুপ্ত

মাসপঞ্জীর প্রতীক নির্দেশক

বৈশাখ ... ...

জ্যৈষ্ঠ ... ...

আষাঢ় ... ...

শ্রাবণ ... ...

ভাদ্র ... ...

আশ্বিন ... ...

কার্তিক ... ...

অগ্রহায়ণ ... ...

পৌষ ... ...

মাঘ ... ...

ফাল্গুণ ... ...

চৈত্র ... ...

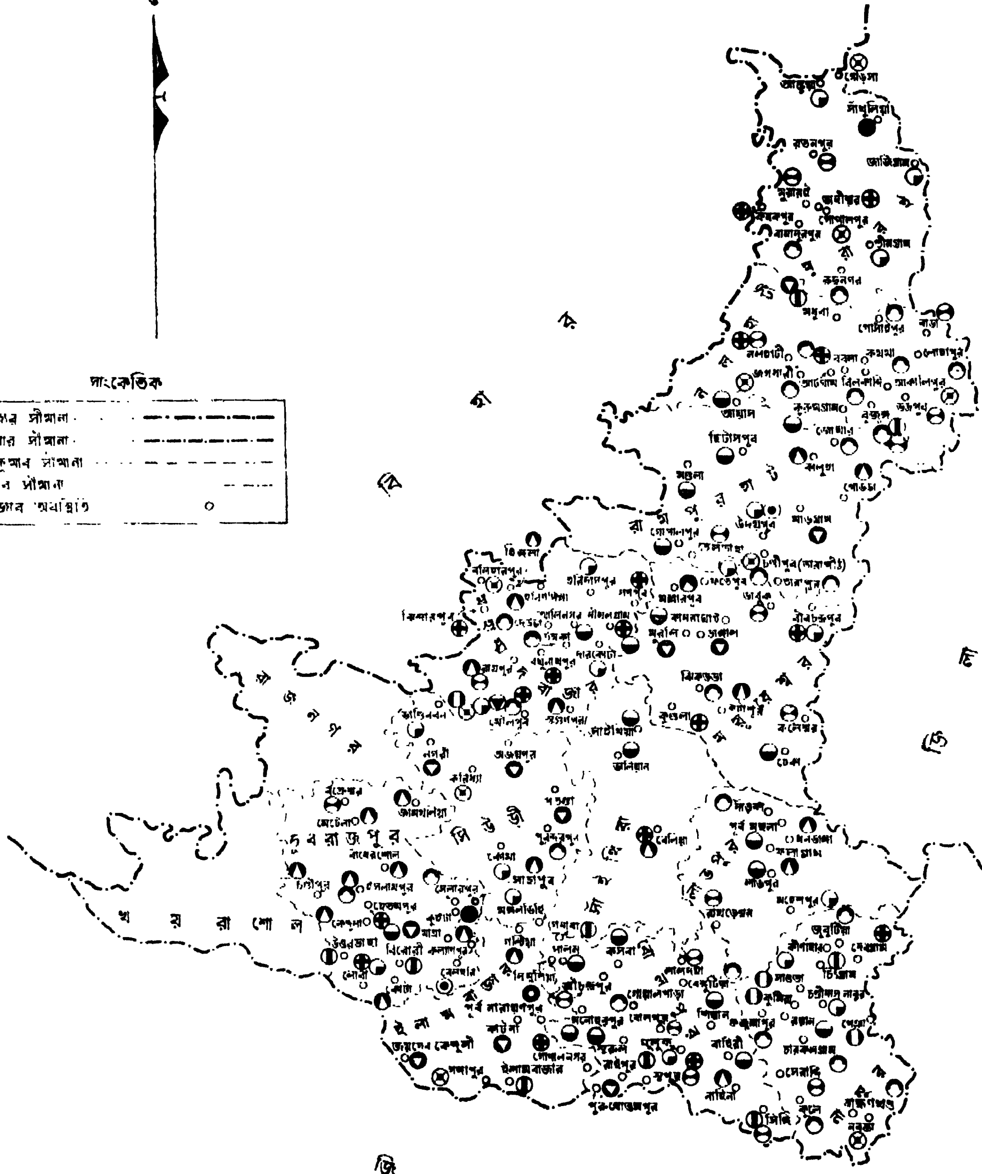
চান্দ্রমাস ... ...

মাস অনির্দিষ্ট ... ...

সু.চ.

মেলার মাসপঞ্জী

জিলা বীরভূম



আনটিপ্রতি বিবরণ-প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব।

-সম্পাদক।

শ্রীজলধি ভূষণ দাশগুপ্ত

উপাসনাস্থলাদির প্রতীক নির্দেশক

কালী, দুর্গা, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, মহামায়া প্রভৃতি ... ...

শিব, ধর্মরাজ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি ... ...

চণ্ডী, শীতলা, মনসা, বিশালাক্ষী, ষষ্ঠী, পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবী ... ...

বিষ্ণু আদি যাবতীয় দেবতা ... ...

হিন্দু সাধুসন্তদের সমাধিমন্দির ... ...

পীর-ফকির প্রভৃতির সমাধিস্থল ... ...

মুসলমান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

জৈন সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

আদিবাসীদের উপাসনাস্থল .. ..

প্রতীক-গোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনাস্থলাদির বিন্যাস

জিলা বীরভূম

উ

সাংকেতিক

রাজ্যের সীমানা	—·—·—·—
জিলার সীমানা	—·—·—·—
মহকুমার সীমানা	— — — —
থানার সীমানা	-- -- -- --
মৌজার অবস্থিতি	○

যে স্থানে এখনও পূজা, আরাধনা অথবা ভক্ত সমাগম হয়, সেই উপাসনার প্রতীক অনুযায়ী মানচিত্রটিতে স্থান নির্দেশিত হইয়াছে।

মানচিত্রটি বিবরণ-প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব।

—সম্পাদক।

শ্রীজলধি ভূষণ দাশগুপ্ত

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ ভাড়কাটা (মৌজা ঃ হরিদাসপুর)। ৫।৮৯৬·৮৩।২৯৫।১,৩৭০

(ক) বাউরী, ডোম, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামটিতে গোয়ালাপাড়া, জেলেপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মল্লারপুর হইতে মোটরবাস-যোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা ব্যতীত মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, একটি কালীমন্দির এবং একটি দুর্গামণ্ডপ ব্যতীত মনসার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীদৈবকী কুমার মণ্ডল, শিক্ষক,
ভাড়কাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বীরভূম।

২। গ্রাম ঃ গণপুর।১৮।৭৫৪ ২০।৩০৫।১,৭১৮

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, বৈরাগী, বাগ্দী, মুচি, হাড়ী, ডোম, বাউরী, মোদক, নাপিত, তাঁতি, লেট, তিলি, শুঁড়ি, কোনাই ও জেলে। গ্রামটিতে বাগ্দীপাড়া, হাড়ীপাড়া, ডোমপাড়া, বাউরীপাড়া, মুচিপাড়া, মোদকপাড়া, লেটপাড়া, কোনাইপাড়া, সোনারপাড়া ও জেলেপাড়া নামে তেরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মল্লারপুর হইতে একটি পাকা রাস্তা দিয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে শ্যামাপূজা ও রাসযাত্রা, অগ্রহায়ণ মাসে অন্নপূর্ণাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পঁয়তাল্লিশটি শিবমন্দির ব্যতীত একটি নারায়ণমন্দিরে শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবমন্দির-গুলির দেওয়াল গাত্রে সুন্দর কারুকার্যখোদিত আছে।

শ্রীশশীভূষণ ভাণ্ডারী, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ দীঘলগাম,
পোঃ মকদুমনগর, বীরভূম।

৩। গ্রাম ঃ আলিনগর।২৩।৫৭১·৮৩।১৪০।৬৬৩

(ক) চামার, ডোম ও মুসলমান। গ্রামটিতে চামারপাড়া, ডোমপাড়া, ও মুসলমানপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মল্লারপুর হইতে একটি কাঁচা রাস্তা ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। বর্ষাকাল ব্যতীত ঐ রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে চান্দপীর নামক জনৈক পীরের উরস্ অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি মাত্র গত বার বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) পীরের মেলা। মাঘ মাসে চারিদিনব্যাপী। মেলাটি গত বার বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) গ্রামে চান্দপীরের বাঁধানো বেদী আছে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ঘোষ, গ্রামসেবক,
মহম্মদবাজার এন, ই, এস, ব্লক,
বীরভূম।

৪। গ্রাম ঃ দরকোটা।২৫।৭২২·১০।২০০।৯৪৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামটিতে ধাঙড়পাড়া, গোড়পাড়া, বেলবাড়ীপাড়া ইত্যাদি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) এই গ্রামেই একটি রেলষ্টেশন আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে শ্যামসুন্দরজীউর পূজা এবং গোষ্ঠাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গোষ্ঠাষ্টমীর মেলা। কার্তিক মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে অবস্থিত শ্যামসুন্দরজীউর মন্দিরটি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ঘোষ, গ্রামসেবক
মহম্মদবাজার এন. ই. এস. ব্লক,
বীরভূম।

৫। গ্রাম ঃ **দীঘলগ্রাম** ।২৬।৫৫২ ৭৩।৪৩৫।২,২৪৭

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামটিতে বাগ্দীপাড়া, জোলাপাড়া, মিঞাপাড়া, মল্লিকপাড়া, বাউরীপাড়া, সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবত রেলস্টেশন দরকোটা হইতে জেলা-বোর্ডের রাস্তায় মোটরবাস করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে গোপালঠাকুরের রথযাত্রা উৎসব এবং মাঘ মাসে ব্রহ্মদৈত্যপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

ব্রহ্মদৈত্য পূজার মেলা। মাঘ মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে ইষ্টক নির্মিত একটি পাকা গোপালঠাকুর-মন্দির এবং পিতলের একটি রথ আছে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ঘোষ, গ্রামসেবক,
মহম্মদবাজার এন. ই. এস ব্লক,
বীরভূম।

৬। গ্রাম ঃ **হরিণসিঙ্গা** ।৩৮।৬৭৫ ৬৬।৬৫।৩৩২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মল্লারপুর হইতে ডেউচা রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবপূজা ও চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ব্যতীত পঞ্চানন্দ, বাবা ঠাকুর, শীতলা ও মনসা আছে।

শ্রীজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,
গ্রাম ঃ দশনদবিঘা,
পোঃ রামপুর, বীরভূম।

৭। গ্রাম ঃ **বলিহারপুর** ।৪৭।৫৩৭ ৩৯।১৭৫।৮৭৬

(ক) ব্রাহ্মণ, সরাক, হাড়ী, তিলি, তামেলী, নাপিত, ভুঁইঞ্যা, মাল, বাউরী ও মুচি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সিউড়ী হইতে কাপিষ্ঠা-সিউড়ী রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও লক্ষ্মী-জনার্দনজীউর রাসযাত্রা উৎসব, অগ্রহায়ণ মাসে অন্নপূর্ণা পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত পূজা-পার্বণগুলি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে অন্নপূর্ণা মন্দির ও নাট্ মন্দির সহ একটি লক্ষ্মীজনার্দনজীউর মন্দির আছে।

শ্রীমাধাই চন্দ্র রজক, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বলিহারপুর,
বীরভূম।

৮। গ্রাম ঃ **উষ্‌কা** ।৭০।৩৬৬ ৭৯।৮৫।৫০৫

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামটিতে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সাঁইথিয়া হইতে পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে গোরক্ষনাথ শিবেরপূজা এবং বারুণীস্নান উৎসব। গোরক্ষনাথের শিলামূর্তিটি গ্রামের সীমান্তবর্তী নদীগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছে।

(ঙ) বারুণীস্নানের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামের গোরক্ষনাথ শিবের স্থান আছে।

শ্রীরবীন্দ্র বিহারী সরকার, গ্রামসেবক,
মহম্মদবাজার এন. ই. এস. ব্লক,
বীরভূম।

৯। গ্রাম : কড়াইয়া নিমদাসপুর। ৮৭।৭০৮·৩৩।৮৫।৫৪৮

(ক) গোঁসাই, কুমার, রাজোয়ার ও মুসলমান। গ্রামটিতে কুমারপাড়া ও মুসলমানপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সিউড়ী হইতে মোটর-বাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে রক্ষাকালী পূজা এবং অগ্রহায়ণ মাসে অন্নপূর্ণাপূজা ও নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজা-পার্বণগুলি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে অন্নপূর্ণামন্দির ও কালীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীরাজ্যধর মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম : ডানজোল,
পোঃ রামপুর, বীরভূম।

১০। গ্রাম : ফুল্লাইপুর।১০৬।৪৭৩·১৩।৭০।৪৩০

(ক) ব্রাহ্মণ, মণ্ডল, সদ্‌গোপ, মাড়া, গড়াই ও ধাঙ্গড়। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, মণ্ডলপাড়া, মাড়াপাড়া, গড়াইপাড়া, ধাঙ্গড়পাড়া প্রভৃতি নামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন সিউড়ী হইতে কাপিষ্টাগামী মোটর-বাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের যে কোন দিন গ্রাম্যদেবী পলাশবাসিনীর বার্ষিকপূজা এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(ঙ) ×

শ্রীঅশ্বিনী কুমার সিংহ, শিক্ষক,
গ্রাম : বৈদ্যানাথপুর,
পোঃ লাঙ্গুলিয়া,
বীরভূম।

১১। গ্রাম : মৌলপুর।১২১।৬৮৩·২৮।১৫০।৬৯৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, তাম্বুলী, গোয়ালা, কামার, সোনার, ছুতার, সাহা, বাগ্‌দী, মুচি ও ডোম।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) সিউড়ী অথবা সাঁইথিয়া এই উভয় রেল-স্টেশন হইতে 'মোরাম রোড' ধরিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে অন্নপূর্ণাপূজা এবং চৈত্র মাসে মৌলেশ্বর শিবের পূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন।
মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে একদিন।
দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন।
কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন।
অন্নপূর্ণাপূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে একদিন।
মৌলেশ্বর শিবপূজার মেলা। চৈত্র মাসে সাতদিনব্যাপী।

শেষোক্ত মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মৌলেশ্বর শিবমন্দিরে অনাদি শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, মন্দির সংলগ্ন

স্থানে একটি অতিথিশালা আছে। জনশ্রুতি আছে, মৌলেশ্বর শিবের নামানুসারে গ্রামের নাম 'মৌলপুর' হইয়াছে।

শ্রীঅশোক সরকার, গ্রামসেবক,
ভুতুরা অঞ্চল,
বীরভূম।

১২। গ্রামঃ পুরুষোত্তমপুর। ১৫৩।২৬২'৮৮।৩৫।১৮১

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, কলু, ডোম ও কলুই। গ্রামটিতে সদ্গোপপাড়া, কলুপাড়া, ডোমপাড়া ও কলুই-পাড়া নামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সাঁইথিয়া হইতে মহম্মদ-বাজার সাঁইথিয়া পাকা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে অন্নপূর্ণাপূজা ও নবান্ন উৎসব এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে দুইটি শিবমন্দির ব্যতীত অন্নপূর্ণা, দুর্গা ও কালীরমন্দির এবং ষষ্ঠীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীশান্তিরাম মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
আসেঙ্গা গৌরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : পুরুষোত্তমপুর, বীরভূম।

১৩। গ্রাম : সুগুণপুর। ১৫৭।২৪৩'৭৮।৫৫।২৮৮

ক) কুমার, ঘেঁটল, ডোম ও বাগ্দী। গ্রামটিতে কুমারপাড়া ও ডোমপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন সাঁইথিয়া হইতে আঙ্গারগড়িয়া রাস্তায় প্যাটেলনগর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিন মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজের শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীকালীপদ সেনগুপ্ত, গ্রামসেবক,
মহম্মদবাজার এন. ই. এস. ব্লক, বীরভূম।

উৎসব বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার উৎসব

প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির তিন দিন পূর্ব হইতে ২রা বৈশাখ পর্যন্ত মোট পাঁচদিনব্যাপী মৌলপুর গ্রামে মৌলেশ্বর নামে খ্যাত শিবের চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। নিত্যপূজা ব্যতীত উৎসবের কয়দিন যথারীতি সাড়ম্বরে পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নর-নারী শিবমন্দিরে মানত পূজাদি দিতে আসেন এবং অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। চড়ক উপলক্ষে সন্ন্যাস ব্রতধারীরা উৎসবকালে নানারূপ আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকেন।

মৌলেশ্বর স্বয়ম্ভু শিব এবং বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস। শোনা যায়, প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে স্থানীয় মহীনামে জনৈক কর্মকার স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করেন। এই সম্পর্কে একটি গাভী কর্তৃক শিবলিঙ্গের মস্তকে সবার অলক্ষ্যে দুগ্ধদান ইত্যাদি বহু প্রচলিত কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। গ্রামে মৌলেশ্বরের মন্দির আছে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং উল্লিখিত কর্মকার পরিবার বংশানুক্রমে শিবের সেবায়েতের কাজে নিযুক্ত আছেন। পূজারী ব্রাহ্মণ।

পলাশাবাসিনীরপূজা

ফুল্লাইপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গ্রামবাসী-গণের সুবিধা মত কোন একটি দিনে গ্রাম্যদেবী পলাশা-

বাসিনীর সাড়ম্বরে বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পলাশবাসিনীদেবীর কোন মন্দির বা মূর্তি নাই। গ্রামের পশ্চিমদিকে পলাশবনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এক খণ্ড শিলাকে পলাশবাসিনী নামে পূজাদি করা হয়। বার্ষিক পূজা উপলক্ষে হোম ও ছাগ বলি হয় এবং পূজা শেষে সাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই গ্রামে দেবীর পূজার প্রচলন সম্পর্কে শুনা যায় যে, প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই গ্রাম নিবাসী মনমুথ নামে জনৈক ব্যক্তি গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত পলাশবনের মধ্যে একটি জলাশয় হইতে উক্ত শিলাখণ্ডটি উদ্ধার করেন। সেই সময় হইতে দেবীর যথারীতি নিত্যপূজাদি হইতেছে। পলাশবনের মধ্যে অবস্থিত উক্ত জলাশয়ের জলেই দেবীর পূজাদি হইয়া থাকে এবং উহার জল কখনই শুষ্ক হয় না বলিয়া বিশ্বাস। দেবীর পলাশবনের মধ্যে অবস্থানের হেতুই 'পলাশবাসিনী' নামে খ্যাত হইয়াছেন। জনশ্রুতি আছে, দেবী নিকটবর্তী পাহাড়ে বাঘের সহিত ক্রীড়া করেন। ভক্তদের বিশ্বাস দেবীর কাছে মানত করিলে পুত্রলাভ করা যায়। আশপাশের গ্রাম হইতে অনেকেই দেবীর নিকট মানত পূজাদি দিতে আসেন। বাৎসরিক বিশেষ পূজা ব্যতীত দেবীর নিত্য পূজা হয়। দেবীর বর্তমান পূজারী ও সেবায়েত শ্রীকানাই লাল চক্রবর্তী।

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা
(চান্দপীর)

আলিনগর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে পীরের বেদী সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর চারিদিনব্যাপী একটি মেলা বসে।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, খেলনা-পুতুল, মাটির হাঁড়ী-কলসী, কাপড়-চোপড়, বই-ছবি প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিকের দল আসে এবং গান-বাজনার আয়োজন করা হয়।

কালীপূজার মেলা

ভাড়কাটা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ প্রাঙ্গণে ব্যক্তি বিশেষের প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

আশপাশের দুই-চারিখানি গ্রাম হইতে হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিনশত যাত্রী আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী ও খেলনা পুতুলের কুড়ি-পচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগানের দল আসে।

গোষ্ঠাষ্টমীর মেলা

দরকোটা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে গোষ্ঠাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে প্রায় এক বিঘা জমির উপর তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী প্রধানতঃ গরুরগাড়ীতে এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, খেলনা-পুতুল, হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে। মকদমনগর, পুরাণগ্রাম, মহম্মদবাজার, সাঁইথিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতারা আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়। আমোদপ্রমোদের জন্য মেলায় 'লোক সংগীত' আয়োজন করা হয়।

চড়ক-গাজন ও নীলপূজার মেলা

হরিণসিঙ্গা গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখ চড়কপূজা উপলক্ষে শিবমন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর জমিতে ময়রা, তেলেভাজা, চা-পান-বিড়ি ও মনিহারীর দশ পনেরটি দোকান বসে। যাত্রী এবং বিক্রেতাগণ উভয়ই স্থানীয়।

মৌলপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মৌলেশ্বর শিবের পূজা উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন প্রায় দশ বিঘা জমির উপর সাতদিনের জন্য একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

সিউড়ী, সাঁইথিয়া, দুমকা প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় সহস্র নরনারীর সমাগম

হয়। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, ধামা-কুলা, মাটির-কলসী, পুতুল ও অন্যান্য নানাবিধ জিনিসপত্রের শতাধিক দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ সিউড়ী, সাঁইথিয়া, কান্দী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে এবং চলচিত্র প্রদর্শনী, রামায়ণগান, কীর্তনগানের আয়োজন করা হয়। ইহা ব্যতীত, মেলায় অনেকে জুয়া খেলিয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—মৌলপুর গ্রামে রথযাত্রা, মনসাপূজা, কালীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা প্রভৃতি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলাগুলি এই গ্রামে অনুষ্ঠিত শিবপূজার মেলার অনুরূপ। তবে, দোকানপাটের সংখ্যা ও লোকসমাগম অপেক্ষাকৃত কম হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

বলিহারপুর গ্রামে প্রতি বৎসর শারদীয়া বিজয়াদশমী দিনে মধ্যাহ্নে আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে দুর্গাপ্রতিমা আনিয়া বলিহারপুর গ্রামের উত্তরদিকে একটি মাঠে আনিয়া রাখা হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐসকল মূর্তিগুলি এইস্থানে থাকে এবং সন্ধ্যার পর একে একে উহা বিসর্জন দেওয়া হয়। তদুপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। এই গ্রাম এবং আশেপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, মাটির হাঁড়ি-পুতুল, ধামা-কুল প্রভৃতির জিনিসপত্রের প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ আসনবনি, সারেগুা, বাণীশ্বর, ডুমকা প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয় না। আমোদপ্রমোদের জন্য থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

ধর্মরাজপূজার মেলা

মুগুনপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজ-পূজা উপলক্ষে গ্রামের মধ্যে 'ধর্মরাজতলায়' প্রায় দুই বিঘা জমির উপর তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

আঙ্গার-গড়িয়া, মহম্মদবাজার, দেরিয়াপুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রধানতঃ হাড়ী, ডোম, ঘেঁটাল, সাঁওতাল, বাউরী, বাগদী এবং মুচি প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় দেড় সহস্র নরনারী প্রধানতঃ গরুরগাড়ী করিয়া ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, লোহার বাসনকোসন, তৈয়ারী জামা-কাপড় ইত্যাদির প্রায় পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ সিউড়ী, সাঁইথিয়া এবং মহম্মদবাজার হইতে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হয়। সাধারণতঃ কোতুলপুর এবং বারাম হইতে প্রতি বৎসর যাত্রাদল আসে।

রথযাত্রার মেলা

গণপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের উত্তরপ্রান্তে রথতলায় প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

গ্রাম ব্যতীত নিকটবর্তী সাঁওতাল পরগণা, ভাড়কাটা, মল্লারপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন সমুহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রধানতঃ মোটরবাস ও গরুরগাড়ী করিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসন-কোসন, ধামা-কুলা, পুতুল প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ ফতেপুর, ভাড়কাটা, মল্লারপুর প্রভৃতি স্থান সমুহ হইতে প্রতি বৎসর আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

দীঘলগ্রাম গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে স্থানীয় রথতলায় খাবার, মনিহারী ও শাকসব্জী প্রভৃতি জিনিসপত্রের পনের-কুড়িটি দোকানপাট বসে এবং আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় আড়াইশত নরনারীর সমাগম হয়। বিক্রেতারা স্থানীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দীঘলগ্রাম গ্রামে অনুষ্ঠিত ব্রহ্মদৈত্য পূজার মেলাটি উল্লিখিত রথযাত্রা মেলায় অনুরূপ।

থানা ঃ সাঁইথিয়া

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ ভালিয়ান।৩৮।৬৪৯.৫১।১৬১।৯০৫

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, কামার, ছুতার, নাপিত, বাগ্দী, হাড়ী, মুচি, ডোম, শুঁড়ি, গোয়ালা ও বৈষ্ণব। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, হাড়ীপাড়া, মুচিপাড়া, শুঁড়িপাড়া ও বাগ্দীপাড়া নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সাঁইথিয়া হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমায় বৈরাগ্যচাঁদের স্মৃতি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বৈরাগ্যচাঁদের স্মৃতি মহোৎসব উপলক্ষে মেলা। মাঘীপূর্ণিমা হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে তিনটি বাণলিঙ্গ শিব এবং তিনটি মনসা আছে।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র সাহা, শিক্ষক,
ভালিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বীরভূম।

২। গ্রাম ঃ বেলিয়া।১৩৯।২৩৯.৩৩।৮৬।৫০৩

(ক) ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বাগ্দী, হাড়ী ও বায়েন। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, শূদ্রপাড়া, বাগ্দীপাড়া প্রভৃতি নামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে আহমদপুর জংশন রেলস্টেশন। রেলস্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে ধর্মরাজপূজা।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে তিনদিনব্যাপী ও আষাঢ় মাসে সাতদিনব্যাপী মেলা বসে। প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন মেলা।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজ মন্দির ব্যতীত একটি বিষ্ণুমন্দির আছে।

শ্রীদুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, কৃষিজীবি,
গ্রাম ঃ বেলিয়া, বীরভূম।

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব
(বৈরাগ্যচাঁদ)

ভালিয়ান গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমা তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী বৈরাগ্যচাঁদের স্মৃতি মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভালিয়ান ও পার্শ্ববর্তী চার-পাঁচটি গ্রামের অধিবাসী মিলিয়া এই উৎসব পালন করিয়া থাকেন। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বৃহৎ একটি বটবৃক্ষের নীচে বৈরাগ্যচাঁদের সমাধিস্থান আছে। প্রতি বৎসর উৎসব উপলক্ষে মধ্যাহ্নে যথারীতি পূজা-আরতি ও হরিনাম সংকীর্তন এবং সর্বজনীন অন্নসত্রের আয়োজন করা হয়। ভক্তরা অনেকে বৈরাগ্যচাঁদের সমাধিস্থানে চিড়া, কলা, মিষ্টান্ন ও গঞ্জিকা মানত করিয়া থাকেন। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। পূজারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার উৎসব

বেলিয়া গ্রামে দক্ষিণমুখী একটি পাকা মন্দিরে ধর্মরাজের শীলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি কতকাল পূর্বে নির্মিত তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। কালের প্রভাবে প্রাচীন মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া পড়িলে বাংলা ১৩৬৪ সনে সিউড়ী নিবাসী ৺ভূপেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে ইহার সংস্কার করা হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত হাত-পা বিশিষ্ট কিন্তু মস্তকহীন (আড়াআড়ি ভাবে ভাঙ্গা) একটি শীলা মূর্তিকে ধর্মরাজ রূপে পূজা করা হয়। অনুমান করা হয় আদিতে এই মূর্তিটি অন্য কোন স্থানে পূজিত হইত এবং কালাপাহাড় কর্তৃক মূর্তিটি ক্ষতি সাধিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তীকালে এ মূর্তিটিকে বর্তমান মন্দিরে স্থাপন করিয়া ধর্মরাজ-

রূপে পূজা করা হইতেছে। ধর্মরাজ মূর্তির উভয় পার্শ্বে আরও দুইটি শীলামূর্তি আছে; উহাদিগকে ভৈরব শীলামূর্তি বলা হয়। ইহা ভিন্ন, মন্দিরাভ্যন্তরে ধর্মরাজের বাহন স্বরূপ মৃত্তিকা ও দারু নির্মিত কয়েকটি ঘোড়ার মূর্তি আছে। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি প্রাচীন বৃহৎ বটবৃক্ষ ও মন্দিরের উত্তরদিকে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীটি স্থানীয় অঞ্চলে 'গদা পুকুর' নামে খ্যাত এবং ভক্তেরা ঐ পুষ্করিণীর জল পবিত্র বলিয়া মনে করেন। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি নলকূপ ও একটি কুয়া আছে। মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে গ্রামের যাতায়াতের প্রধান রাস্তার ধারে ধর্মরাজের সেবায়েত দেয়াসী পরিবারগণ বসবাস করিতেছেন। বংশানুক্রমে দেয়াসীগণ ধর্মরাজের সেবায়েতের কাজ করিতেছেন। বর্তমানে ইঁহারা নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত।

বেলিয়া গ্রামের ধর্মরাজ বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস। প্রতিদিন ধর্মরাজের পূজা দিতে মন্দিরে অনেক লোকজন আসেন। বিশেষ করিয়া প্রতি রবিবার ধর্মরাজের মানত পূজা দিতে এবং বাত ব্যধি নিরাময়ের জন্য স্বপ্নাদ্য তৈল ক্রয়ের জন্য নানাস্থান হইতে বহু লোকজন আসিয়া থাকেন। ধর্মরাজের সেবায়েতগণ ছোটবড় বিভিন্ন আকারের শিশিতে ভর্তি ধর্মরাজের স্বপ্নাদ্য তৈল বিক্রয় করিয়া থাকেন। শোনা যায়, ঐ তৈল ব্যবহার করিয়া বহুলোক বাত ব্যাধি হইতে নিরাময় লাভ করিয়া--ছেন। কথিত আছে বহুকাল পূর্বে বেলিয়া গ্রামের জনৈক কলু বাতে আক্রান্ত হইয়া সম্পূর্ণ পঙ্গু হইয়া পড়েন। নানারূপ চিকিৎসা করিয়াও তাঁহার রোগের কোন উপশম হয় না। এই সময় তৎকালীন সেবায়েত গিরিশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া উক্ত কলুকে দৈব ঔষধ ব্যবহার করিতে বলায় তিনি কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠেন। কলুর রোগমুক্তি সংবাদ লোকমুখে প্রচারিত হইলে নানাস্থান হইতে দলে দলে লোকজন মন্দির হইতে ঔষধ সংগ্রহ করিতে আসেন। সাধারণতঃ ধর্মরাজের নিকট ষোড়শোপচারে পূজা ব্যতীত অর্থ-বস্ত্র-অলঙ্কার এবং ছাগ ও ভেড়া বলি মানত করা হয়।

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি হইতে পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী সাড়ম্বরে ধর্মরাজের বার্ষিক পূজা ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই উৎসবের প্রস্তুতি প্রায় পক্ষকাল পূর্ব হইতে শুরু হয়। ত্রয়োদশী তিথিতে অনেকে ধর্মরাজের 'ভক্ত' বা 'সন্ন্যাসব্রত' গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্তেরা উৎসবের তিনদিন সংযম পালন এবং দিনান্তে একবার হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইদিন সন্ধ্যায় ভক্তেরা ঢাক-ঢোলের বাজনাসহ মন্দির হইতে ধর্মরাজের মূর্তিটিকে মাথায় লইয়া গদা পুকুরের ঘাটে লইয়া আসেন এবং এইস্থানে স্নানাভিষেক ও যথারীতি পূজাদির পর ধর্মরাজের মূর্তিটিকে পুনরায় মাথায় লইয়া ঢাক-ঢোল-বাজনার তালে তালে কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া প্রায় রাত্র দশ ঘটিকায় ধর্মরাজের মূর্তিটিকে মন্দিরে আনিয়া স্থাপন করিলে এইদিনের উৎসবের সমাপ্তি হয়। চতুর্দশীর দিন সারাদিন-ব্যাপী মন্দিরে ধর্মরাজেরপূজা হয় এবং সন্ধ্যায় ভক্তরা বাজনা-বাদ্যিসহ ধর্মরাজের বাহন মৃত্তিকা ও কাঠের তৈয়ারী ঘোড়াগুলিকে মাথায় লইয়া গদা পুকুরে আসেন এবং এই স্থানে পূর্ববৎ যথারীতি পূজা ও নৃত্যের পর প্রায় রাত্রি বারো ঘটিকায় বাহনগুলিকে মন্দিরে আনিয়া রাখা হয়। ইহার পর ভক্তরা কাষ্ঠ সংগ্রহে বাহির হইয়া যান এবং ভোররাত্রির মধ্যে মন্দিরের সম্মুখে প্রচুর কাঠ আনিয়া জড় করেন। রাত্রি প্রায় চারি ঘটিকার সময় সংগৃহীত কাঠে অগ্নিসংযোগ করিয়া দগ্ধবিশিষ্ট অঙ্গারের উপর দিয়া কোন কোন ভক্তরা নগ্ন পায়ে ধীরে ধীরে হাঁটিয়া যান বা হাতে আগুন লইয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গি সহকারে নৃত্য করিয়া ধর্মরাজের নামে ধূণা পুড়াইয়া থাকেন। উল্লিখিত আচার অনুষ্ঠানগুলি দেখিতে মন্দির প্রাঙ্গণে বহু নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে।

পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকাল হইতে সারাদিনব্যাপী মন্দিরে সাড়ম্বরে ধর্মরাজের পূজা, পুরাণপাঠ, হোমযজ্ঞ ও বলিদান হইয়া থাকে। সন্ধ্যায় পূজা শেষ হইলে পর সমবেত যাত্রীদের মধ্যে অন্নসত্র ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এইদিন রাত্রি ৮ ঘটিকার পর মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তরা বাণ ফুঁড়িয়া থাকেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভক্তদের মধ্যে একজনের চোয়ালে উপর কানের কাছে একটি সরু লোহার শলকা ফুঁড়িয়া দেওয়া হয় এবং অপর একজন ভক্তের হাতের মাংসপেশীর মধ্যে একটি লৌহ শলকা ফুঁড়িয়া

তৈলসিক্ত কাপড় জড়াইয়া দেওয়া হয়; তারপর ঐ তৈলসিক্ত কাপড়ে আগুন ধরাইয়া দিলে ভক্তদ্বয় ঢাক ঢোলের বাজনার তালে তালে প্রায় এক ঘণ্টাকালব্যাপী নৃত্য করিয়া থাকেন। নৃত্যের শেষে দেহ হইতে শলকা খুলিয়া ধর্মরাজের নিকট প্রণাম করিয়া তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এইদিন ধর্মরাজের নিকট মানতের পাঁঠা বলি হইয়া থাকে।

উৎসবটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

প্রধানতঃ বীরভূম জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং বর্ধমান জেলা হইতে উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন-চার সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়।

ইহা ব্যতীত, প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের চারিটি রবিবার ধুমধামের সহিত ধর্মরাজের পূজা হইয়া থাকে। প্রথম রবিবার সর্বাধিক যাত্রী আসিতে দেখা যায়। এই দিন অন্তত আট-দশ সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। কারণ প্রচলিত আছে যে, আষাঢ় মাসের প্রথম রবিবার যাঁহারা ধর্মরাজের স্বপ্নাদ্য তৈল ব্যবহার করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই বাত ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। পূজারী ব্রাহ্মণ। বর্তমান সেবায়েত যথাক্রমে সর্বশ্রী শ্যাম চরণ ভট্টাচার্য, বামা চরণ ভট্টাচার্য, দুর্গা চরণ মুখোপাধ্যায়, দেবতা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতি কমল কুমারী দেবী। ইঁহারা প্রত্যেকেই এই গ্রামে বসবাস করেন।

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা (বৈরাগ্যচাঁদ)

ভালিয়ান গ্রামে বৈরাগ্যচাঁদের স্মৃতি মহোৎসব উপলক্ষে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে উক্ত সাধকের সমাধি ভূমি সংলগ্ন পতিত জমিতে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমার তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। নিকটবর্তী মাঠপলশা, হাতোরা, সাঁইথিয়া, দেরিয়াপুর এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় ময়রা, মনিহারী প্রভৃতির দশ-পনরটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বারোজন ফেরিওয়ালা আসিয়া থাকেন। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

ধর্মরাজপূজার মেলা

বেলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে ধর্মরাজমন্দির সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা পরিমাণ জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। বীরভূম জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং নিকটবর্তী অন্যান্য জেলা হইতে ট্রেনে, গরুর-গাড়ীতে, ঘোড়ারগাড়ীতে ও পদব্রজে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচ সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় চল্লিশ হইতে পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-পনরজন ফেরিওয়ালা আসেন। প্রধানতঃ আশে পাশের পাঁচ-ছয় মাইলের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কোনপ্রকার দান বা তোলা আদায় করা হয় না। উল্লিখিত দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, পান-বিড়ি ও চায়ের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ভিন্ন কয়েকটি মনিহারা দোকান, মাটির খেলনা ও পুতুলের দোকান এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা প্রভৃতি শিল্প সামগ্রীর দোকান বসে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: আষাঢ় মাসে প্রথম রবিবার 'বেলিয়া'র ধর্মরাজমন্দির প্রাঙ্গণে যে মেলা বসে তাহা উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ। তবে এই মেলায় প্রায় আট-দশ সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং যাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল জেলা হইতেই আসিয়া থাকেন।

থানা ঃ দুবরাজপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ; মেটেলা ।৫৮।১২৩·৭৬।১১৭।৫৮৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, বাউরী, সদ্‌গোপ, কামার, ছুতার, নাপিত, ময়রা, মাল, বাগ্দী, ডোম, মুচি ও কোড়া। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, গোয়ালপাড়া, মালপাড়া, মুচিপাড়া, বাগ্দীপাড়া, চাষীপাড়া প্রভৃতি নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন দুবরাজপুর এবং প্রায় দুই মাইল দূরে বক্রেশ্বর বাস স্ট্যাণ্ড আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখীপূর্ণিমা হইতে দুইদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজের মাটির ঘর এবং দুইটি শিবালয় ব্যতীত দুইটি মনসা, একটি শীতলা, একটি কালী এবং দুইটি শালগ্রাম শিলা আছে।

শ্রীনলিনাক্ষ মণ্ডল, কৃষিকার্য,
গ্রাম ও পোঃ মেটেলা,
বীরভূম।

২। গ্রাম ঃ জামথলিয়া ।৭৪।১,০৪০·১১।১৪৩।৭৫৮

(ক) বাউরী, ডোম, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামে হিন্দুপাড়া, মুসলমানপাড়া ও সাঁওতালপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে চার মাইল দূরে কচুজোড় হল্ট স্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ঐ রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি ধর্মরাজমন্দির ব্যতীত একটি ধর্মরাজ, একটি মনসা, একটি সিংহবাহিনী এবং জলেশ্বর, ফটিকেশ্বর ও নীলকণ্ঠ নামে তিনটি শিব আছে।

শ্রীসমর নাথ বিশ্বাস, গ্রামসেবক,
পারুলিয়া ইউনিয়ন,
বীরভূম।

৩। গ্রাম ঃ উত্তরডাহা ।১২৯।৪৩২·৬৩।১১৯।৫৪৭

(ক) বৈরাগী, সদ্‌গোপ, বাগ্দী ও মাল। গ্রামটিতে ঘোষপাড়া, দাসপাড়া, মালপাড়া প্রভৃতি নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পাঁচরা ও দুবরাজপুর এই উভয় রেলস্টেশন হইতেই গ্রামে যাতায়াত করা যায়। সিউড়ী-দুবরাজপুর পাকা রাস্তা হইতে একটি কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া গ্রামাভিমুখে গিয়াছে। ঐ রাস্তা ধরিয়া প্রায় চার মাইল পথ অতিক্রম করিলে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব ও ধর্মরাজপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও মারুলী দেওয়ার পরব, অগ্রহায়ণ মাসে অন্নপূর্ণাপূজা ও নবান্ন উৎসব এবং মাঘ মাসে বাথরাই চণ্ডীপূজা প্রভৃতি পূজা ও উৎসব ব্যতীত পৌষপালা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত পূজা ও উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল এবং টিনের ছাউনীযুক্ত একটি মনসা মন্দির এবং অপর একটি মন্দিরে গোপীনাথ-জীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীশিবশঙ্কর চক্রবর্তী, শিক্ষক,
উত্তরডাহা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বীরভূম।

৪। গ্রাম : হেতমপুর।১৪৩।২৩৮·২১।২৮৯।১,৫৭৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, হাড়ী, মুচি, মেথর, বাগ্দী, বাউরী, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, কায়স্থপাড়া, হাড়ীপাড়া, মুচিপাড়া, বাউরীপাড়া, বাগ্দীপাড়া, সাঁওতালপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে। হেতমপুর একটি প্রাচীন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) হেতমপুরে একটি রেলস্টেশন আছে। সিউড়ী-বোলপুর জাতীয় সড়কে নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রা উৎসবটি হেতমপুর রাজপরিবারের পারিবারিক উৎসব এবং প্রায় সত্তর-আশি বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা আষাঢ় মাসে একদিন।
সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে চার-পাঁচদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় সত্তর-আশি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সরস্বতীপূজার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীনীরদেন্দু স্যান্নাল, শিক্ষক,
ও
শ্রীরাম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উকিল
গ্রাম : হেতমপুর, বীরভূম।

'হেতমপুর' গ্রাম সম্পর্কে শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয় লিখেছেন :

A village in the Suri subdivision situated a mile south-east of Dubrajpur and 14 miles south-west of Suri. It contains the residence of Raja Ram Ranjan Chakravarti Bahadur, the owner of the largest estate (known as the Hetampur Raj) in the district. The founder of the family was one Muralidhar Chakravarti, a Srotriya Brahman, whose grandson Radha Nath amassed a fortune which enabled him to purchase a large property in 1796, apparently on the sale of the estate of the Raja of Birbhum's estate...... The village contains a High School, a Sanskrit tol and a charitable dispensary......There is also a second grade college,......which is called the Krishna Chandra College...

(District Handbook, Birbhum, 1951, p. lvii)

৫। গ্রাম : লোবা।১৫৫।১,০৩৩·৭৪।১৬৬।৮০৬

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, তাঁতি, মাল, বাগ্দী, মাঝি ও ডোম। গ্রামে ঘোষপাড়া, বাগ্দীপাড়া, ডোমপাড়া, মুচিপাড়া, মাঝিপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দুবরাজপুর হইতে লোবা-তকলিয়া রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে।
কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলা দুইটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির ব্যতীত পাঁচটি পঞ্চানন্দ দুইটি বাবাঠাকুর, একটি মনসা এবং একটি ধর্মরাজ আছে।

শোনা যায়, বাংলার নবাব হোসেন শাহের আমলে এই গ্রামটির পত্তন হয়। ইহার পূর্বনাম ছিল 'সোনবা' কিন্তু পরবর্তীকালে সরকারী রেকর্ডে 'লোবা' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্রীনীরদেন্দু স্যান্নাল, শিক্ষক,
ও
শ্রীরাম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উকিল,
গ্রাম: হেতমপুর, বীরভূম।

৬। গ্রাম : কোটা।১৫৮।১,১৫৭·৬৮।৩৫৭।১,৮৪৮

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, তাঁতি, ছুতার, বাউরী, ডোম, মুচি ও মেটে। গ্রামটিতে তাঁতিপাড়া, মুচিপাড়া, ডোম-

পাড়া, মেটেপাড়া, বাউরীপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দুবরাজপুর হইতে কোটা-তরুলিয়া রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজপূজা এবং মাঘ মাসে গোঁসাইবাবাজীর আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামের পশ্চিমাংশে একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ এবং গ্রামের দক্ষিণাংশে একটি অতি প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে গোঁসাইবাবাজী নামে জনৈক সাধকের সমাধি স্থান আছে। মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনীযুক্ত একটি গৃহে ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীনীরদেন্দু স্যান্নাল, শিক্ষক,
ও
শ্রীরাম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উকিল,
গ্রাম : হেতমপুর, বীরভূম।

৭। গ্রাম : বিরোল্লী ।১৬৪।২৮৫·০৫।৫৫।৩০২

(ক) ঘোষ ও ডোম। গ্রামটিতে ঘোষপাড়া ও ধর্মপণ্ডিতপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন দুবরাজপুর হইতে জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা উৎসব উপলক্ষে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ষষ্ঠীপূজার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীকুমারীশ চন্দ্র চট্টরাজ, প্রধান শিক্ষক,
বেজল প্রাথমিক বিভালয়,
গ্রাম : বুধগ্রাম, পো : হেতমপুর রাজবাটী,
বীরভূম।

৮। গ্রাম : সেলারপুর ।১৯৩।৪০১·৮০।১৫০।৭৭২

(ক) গন্ধবণিক, তাম্বুলী, নাপিত, ডোম ও মুসলমান। গ্রামে বেনেপাড়া, কলুপাড়া, জেলেপাড়া, ডোমপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চিনপাই হইতে দুবরাজ-পুর-সাহাপুর রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ঘটস্থাপন করিয়া রামনবমী উৎসব পালন করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং চারদিনব্যাপী স্থায়ী হয়। মাত্র গত আট-দশ বৎসর হইল উৎসবটি আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) রামনবমীর মেলা। চৈত্র মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীসীতা নাথ সাধু, কৃষিকার্য,
গ্রাম : সেলারপুর,
পো: সাহাপুর, বীরভূম।

৯। গ্রাম : কল্যাণপুর ।২৩৩।৪৫৪·৪২।৮০।৪৩২

(ক) বৈরাগী, সদ্গোপ, নাপিত, কলু, শুঁড়ি, বাগ্দী, হাড়ী ও মুচি। গ্রামটিতে সদ্গোপপাড়া, বাগ্দীপাড়া, শুঁড়িপাড়া, কলুপাড়া, মুচিপাড়া হাড়ীপাড়া, বৈরাগীপাড়া প্রভৃতি নামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) অণ্ডাল-সাঁইথিয়া শাখা রেলপথে দুবরাজপুর, চিনপাই অথবা কচুজোড়া রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। তাহা ছাড়া দুবরাজপুর-সিউড়ী বাসরুটে কচুজোড়া হইতে প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সাহাপুর হইয়া গ্রামে পৌছান যায়। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্যান্য ঋতুতে ঘোড়ারগাড়ী, রিক্সা অথবা ভাড়া ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজপূজা ও তদুপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে তিন-

চার-দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি পাকা মন্দিরে ধর্মরাজ শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি পূর্বমুখী এবং ইহার পাশাপাশি দুইটি ঘরের সম্মুখভাগে দালানযুক্ত। ইহা ব্যতীত, গ্রামে একটি শিব, একটি ভৈরব এবং চাঁদরায় নামে এক দেবতা আছেন।

শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ, চাকুরি,
গ্রাম : কল্যাণপুর,
পোঃ বাতিকার, বীরভূম।

উৎসব বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার উৎসব

জামথলিয়া গ্রামে পশ্চিমদিকে সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি পাকা মন্দিরে ধর্মরাজের শীলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি প্রায় দশ হাত লম্বা ও আট হাত চওড়া। মন্দিরের সম্মুখের বারান্দা টিনের অচ্ছাদনযুক্ত। ইহার পাশে টিনের চালাযুক্ত ভোগরন্ধন ঘর আছে। ইহা ব্যতীত, মন্দির প্রাঙ্গণে পানীয় জলের জন্য একটি ইন্দারা ও একটি পুকুর আছে।

কিংবদন্তী আছে যে, প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে হাজরাপুর গ্রামে ইটো সাহানা নামে জনৈক ব্যক্তি চালের হাড়ির মধ্যে ধর্মরাজের একটি শিলামূর্তি পান এবং স্বপ্নাদেশ অনুসারে জামথলিয়া গ্রামের পশ্চিমাংশে একটি নির্দিষ্ট স্থানে উক্ত ধর্মরাজ ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করিয়া যথারীতি পূজাদির ব্যবস্থা করেন। সেই সময় হইতে এই গ্রামে ধর্মরাজের পূজা চলিয়া আসিতেছে। ধর্মরাজের সেবাপূজার জন্য প্রায় ১৮ বিঘা দেবোত্তর ধানের জমি আছে। গত ১৯৫৭ সাল হইতে বর্তমান সেবায়েত হাজরাপুর গ্রাম নিবাসী তন্তুবায় সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীপশুপতি সাহানা মহাশয় উৎসবাদির ব্যয় ও পরিচালনা করিতেছেন।

প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমাতিথিতে সাড়ম্বরে ধর্মরাজঠাকুরের বার্ষিক পূজা ও হোম-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখী পূর্ণিমার আটদিন পূর্ব হইতে এই উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয় এবং পূর্ণিমাতিথি হইতে পাঁচদিনব্যাপী উৎসব চলে। ইহা এই অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব এবং স্থানীয় লোকজনেরা দাবী করেন যে, উৎসবটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন।

পূর্ণিমাতিথিতে ধর্মরাজপূজার একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হইতেছে যে, এই গ্রামের জনৈক মদ্য ব্যবসায়ী অতি প্রত্যুষে যে ভাবে পচাই মদ গেঁজানো হয় ঠিক সেই ভাবে শুদ্ধাচারে একটি নূতন মাটির হাঁড়িতে ভাত ইত্যাদি দিয়া হাঁড়িটির মুখ সরায় ঢাকিয়া তাঁহার দোকানের সামনে রাখিয়া দেন। তাহার পর নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন ভক্ত আসিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ হাঁড়ির ভাতগুলি আপনা অপনি ফাঁপিয়া উঠে ততক্ষণ পর্যন্ত বাদ্যাদি সহকারে ধর্মরাজের নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। ভাতগুলি ফাঁপিয়া উঠিলে ভক্তগণ সেই হাঁড়িটি মাথায় করিয়া ধর্মরাজের মন্দিরে লইয়া আসেন এবং হাঁড়ির মধ্যস্থিত পদার্থগুলি ধর্মরাজের মাথায় ঢালিয়া দেন। ইহার পর ধর্মরাজের পূজা, আরতি ও বলিদান আরম্ভ হয়। ভক্তদের বিশ্বাস উক্ত হাঁড়ির ভাতগুলি আপনা-আপনি ফাঁপিয়া উঠার সহিত ধর্মরাজঠাকুরের ঐশ্বরিক শক্তির সম্বন্ধ আছে।

সাধারণতঃ ধর্মরাজের নিকট ষোড়শোপচারে পূজা ও পাঁঠা বলি মানত করা হয়। তবে স্থানীয় মাল, বাউরী, বাগ্দী, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকজনেরা ধর্মরাজের নিকট মানত করিয়া মোরগ বলিও দিয়া থাকেন। মন্দিরের পূর্ব পার্শ্বে 'গোঁসাইয়ের স্থান' নামক একটি নির্দিষ্ট স্থানে ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে ঐ সকল মোরগগুলি বলি দেওয়া হয়। ধর্মরাজের পূজারী ব্রাহ্মণ।

কল্যাণপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় তিন-দিনব্যাপী মহাধূমধামের সহিত গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আদিরাক্ষ নামে খ্যাত ধর্মরাজঠাকুরের বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত

হয়। অবশ্য উৎসবের প্রস্তুতি প্রায় সপ্তাহকাল পূর্ব হইতে শুরু হয়। গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে ধর্মরাজ-ঠাকুরের শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি পূর্ব দুয়ারী ও দুইপ্রকোষ্ঠযুক্ত দালান বাড়ী। উহার সম্মুখ-ভাগে উঁচু বারান্দা ও নাটমন্দির আছে। এই বিগ্রহ ও মন্দির ব্যক্তিবিশেষের হইলেও গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের লোকজন উৎসবে যোগদান করেন। শোনা যায়, প্রায় তিনশতাধিক বৎসর পূর্বে বর্তমান সেবায়েত শ্রীশ্যাম চরণ দেববংশী মহাশয়ের জনৈক পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই গ্রামের পার্শ্বাস্থিত জঙ্গল হইতে ধর্মরাজের শিলামূর্তি আনিয়া এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সময় হইতেই এই উৎসবটি চলিয়া আসিতেছে।

উৎসব উপলক্ষে পূর্ণিমার দুইদিন পূর্বে ভক্তরা ঢাক-ঢোল বাদ্যসহ শোভাযাত্রা সহকারে মন্দির হইতে ধর্মরাজের শিলামূর্তি ও বাণেশ্বর মূর্তি (শলকাবিদ্ধ কাঠের পাটাতন) মাথায় করিয়া গ্রামের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত একটি পুষ্করিণীতে লইয়া যান এবং সেখানে স্নান ও পূজান্তে পুনরায় শোভাযাত্রা সহকারে মন্দিরে বিগ্রহ লইয়া আসেন। গাজন সন্ন্যাসীর ন্যায় এইস্থানে ধর্মপূজা উপলক্ষে অনেকে চারিদিনব্যাপী সন্ন্যাসব্রত পালন করেন। সন্ন্যাসব্রতীগণ উৎসবের চারিদিনব্যাপী ফলমূল খাইয়া শুদ্ধাচারে জীবনযাপন ও ধর্মরাজের পূজাদি করেন। চলিত কথায় ইহাদের 'ভক্ত' বলা হয়। প্রতি বৎসর দুইশত হইতে আড়াইশত ব্যক্তি এইরূপ ভক্ত হইয়া থাকেন। পরের দিন অর্থাৎ পূর্ণিমার পূর্বদিনে সন্ধ্যায় পুনরায় বাণেশ্বর সহ ধর্মরাজ ও গ্রামে প্রতিষ্ঠিত চাঁদরায় বিগ্রহকে শোভাযাত্রা করিয়া উল্লিখিত পুষ্করিণীতে লইয়া গিয়া যথারীতি স্নানাভিষেক পূজাদি হয়। এই সময় এখানে প্রচুর আতসবাজী পোড়ান হয় এবং আশেপাশের গ্রাম হইতেও বহুলোকের সমাগম হয়। পুষ্করিণী ঘাটের অনুষ্ঠানের পর বিগ্রহগুলি লইয়া মন্দিরে ফিরিবার পথে গ্রামস্থ বিভিন্ন শিবমন্দিরে ও সেবায়েতদের বাড়ীতে ধর্মরাজ শিলা আনাইয়া কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করেন। এই সময় মানতকারীরা পুষ্করিণী হইতে "দণ্ডী" কাটিয়া মন্দির অবধি আসেন। উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মরাজঠাকুরের সেবায়েতরা হাঁপানী রোগের জন্য স্বপ্নদত্ত ঔষধ ও কবচাদি দিয়া থাকেন। সেবায়েতদের বাড়ী হইতে ঐ বিগ্রহগুলিকে চাঁদরায়ের মন্দিরে আনা হয় এবং সেখান হইতে ধর্মরাজ বিগ্রহটিকে ধর্মরাজের মন্দিরে লইয়া যাওয়া যায়। এই সময় পথের উপর ভক্তরা পর পর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়েন এবং ধর্মরাজের পুরোহিত মস্তকে ধর্মরাজের বিগ্রহ লইয়া ভক্তদের বুকের উপর দিয়া হাঁটিয়া মন্দিরাভিমুখে যান। বিগ্রহ মন্দিরে ফিরিয়া আসিলে পর মন্দির প্রাঙ্গণে কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্ম পালন করা হয়। যেমন, ভক্তদের কেহ কেহ পায়ে দড়ি বাঁধিয়া উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ড হইয়া ঝুলন্ত অবস্থায় নীচে একটি জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ জলন্ত অঙ্গার লইয়া দুই হাতে লোফালুফি করেন অথবা আগুন বা কাঁটার উপর ঝাঁপ দেন। ইহাকে চলতি কথায় ভক্তদের 'ফুলখেলা' বলে এবং পূর্ণিমার পূর্বের এই দুইদিনকে যথাক্রমে 'ছোট বানামো' ও 'বড় বানমো' বলা হয়।

পূর্ণিমাতিথিতে সাড়ম্বরে ধর্মরাজঠাকুরের মহাপূজা হইয়া থাকে। এই দিন মন্দিরে যাগ-যজ্ঞ-হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মরাজপূজার পর ভক্তরা প্রত্যেকে একটি মাটির ভাড় বা ঘটে দুধ, জল, পয়সা, চাউল প্রভৃতি পূর্ণ করিয়া মন্দির সংলগ্ন পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে সমবেত হন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘটগুলি সম্মুখে রাখিয়া একাগ্র মনে ধর্মরাজের আরাধনা করেন। এই সময় তাঁহাদের সামনে ঢাক-ঢোল ইত্যাদি বাজানো হয় এবং প্রচুর পরিমাণে ধূপ-ধুনা পোড়ান হয়। এই অনুষ্ঠানের পর ভক্তরা স্ব স্ব ঘটগুলি মাথায় লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণের পর মন্দিরে ফিরিয়া আসিলে ধর্মরাজের মাথার 'ফুল চাপান' হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাধারণত একটি পদ্মফুলের কুঁড়িকে ধর্মরাজ শিলার উপর স্থাপন করা হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ ফুল আপনা আপনি স্থানচ্যুত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। ফুলটি স্থানচ্যুত হইলে বোঝা যায় যে, ধর্মরাজের বলির অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। ইহার পর মানতকারী কর্তৃক প্রদত্ত অসংখ্য ছাগ ও মেষ বলি দেওয়া হয়। এই দিন বিগ্রহ দর্শন করিতে এবং বিশেষ করিয়া ছাগ বলি দেখিতে মন্দিরে বহুলোকের সমাগম হয়।

সন্ধ্যায় ধর্মরাজকে পুনরায় মন্দির সংলগ্ন পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চড়কতলায় একটি নির্দিষ্ট বেদিতে স্থাপন করা হয় এবং সেখানে আনুষ্ঠানিক পূজার্চ্চনা শেষ হইলে বিগ্রহকে মন্দিরে আনিয়া স্থাপন করা হয়। ইহাকে চড়কপূজা অনুষ্ঠান বলা হয়।

বৈশাখী পূর্ণিমার পরের দিন ভক্তেরা বাণেশ্বর মূর্তিটিকে তেল-সিন্দুর মাখাইয়া উল্লিখিত পুষ্করিণীতে স্নান করাইতে লইয়া যান। পুষ্করিণীতে যাইবার পথে গৃহস্থরা বাণেশ্বরের উদ্দেশ্যে চাউল-ডাল ইত্যাদি সিধা' দিয়া থাকেন। পরে স্নানান্তে বাণেশ্বরকে মন্দিরে আনিয়া ধর্মরাজের সহিত পূজার্চ্চনা করা হয়। ইহার পর ভক্তগণ 'মুক্তিস্নান' করিয়া তাঁহাদের ব্রত ভঙ্গ করেন। এইদিন প্রধান সেবায়েত তাঁহার বাড়ীতে মিষ্টি, ফলমূল ইত্যাদি দ্বারা ভক্তদিগকে জলযোগে আপ্যায়ন করেন। উৎসব উপলক্ষে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী মন্দিরে পূজাদি দিতে এবং উৎসব দেখিতে আসেন। সাধারণের মধ্যে প্রসাদ ও বলির ছাগমুণ্ড বিতরণ করা হয়। ধর্মরাজের পূজারী কাশপ্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত ধ্যানে ধর্মরাজের নিত্যপূজাদি অনুষ্ঠিত হয়।

"ওঁ ধর্ম্মত্বং ধর্ম্মরূপোসি নির্ণোমসিনিরঞ্জনঃ।
প্রেতরিষ্টি মিদংদেব নশেয়স্তং সদাপ্রভোঃ।
ওঁ ধর্ম্মরাজায় নমঃ ॥"

মেটেলা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় সাড়ম্বরে ধর্মরাজঠাকুরের বার্ষিক পূজা ও সর্বজনীন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন এবং বৈশাখী পূর্ণিমার সাতদিন পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমার পরের দিন শেষ হয়। গ্রামে সাধারণের একটি মাটির ঘরে রক্ষিত একটি শিলাখণ্ডকে ধর্মরাজরূপে পূজার্চ্চনা করা হয়।

পূর্ণিমার দিন সকাল হইতেই ধূমধামের সহিত পূজা হোম, স্তোত্র পাঠ ও প্রসাদ বিতরণ হইয়া থাকে। সন্ধ্যা বেলায় মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে একদল ভক্ত জিহ্বায় লোহার শলকা বিদ্ধ করিয়া নাচিতে নাচিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া আসেন এবং মন্দির প্রাঙ্গণে কাঁটার উপর গড়াগড়ি দেন ও দুই হাতে করিয়া চারিদিকে জলন্ত অঙ্গার ছড়াইতে থাকেন। পূর্ণিমার পরের দিন যথারীতি ধর্মরাজপূজা শেষ হইলে অপরাহ্নে কতিপয় ভক্তর পিঠে প্রায় দুই ইঞ্চি গভীরে বড় বঁড়শী আকারের লোহার কাঁটা ফুঁড়িয়া উহার সহিত মোটা দড়ি বাঁধিয়া প্রায় ষাট ফুট উচ্চ চড়ক গাছে তুলিয়া প্রবল বেগে পাক্ খাওয়ান হয়। ভক্তদের চড়ক গাছের ঘুরপাক খাওয়া দেখিতে এই সময় বহু দর্শকের সমাগম হয়।

উৎসবের প্রধান সেবায়েত গোপ সম্প্রদায়ভুক্ত ও পূজারী ভরদ্বাজ গোত্রীয় রায় পদবীধারী ব্রাহ্মণ। ধর্মরাজের নিকট মানত হিসাবে মিষ্টান্ন, লুচি প্রভৃতি ভোগ এবং পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

মনসাপূজা

বিরোরী গ্রামের পার্শ্ববর্তী চণ্ডীপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মনসাদেবীকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে সাড়ম্বরে মনসার বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শোনা যায় যে, বহুকাল পূর্বে এক বর্ষাকালে গ্রামের চাষীরা এই গ্রামের পশ্চিম দিকে অবস্থিত বাঁধপুকুরে মাছ ধরিবার সময় সিন্দুর রঞ্জিত তিনটি কলসী ভাসিতে দেখেন। ঐ কলসীত্রয়ের মধ্যে খল খল শব্দ হইতে থাকায় উহার মধ্যে মাছ আছে মনে করিয়া কলসী তিনটিকে পুকুর হইতে তুলিয়া আনেন; কিন্তু উহাতে মাছ না পাইয়া তাহারা ঐ পুকুরের কিছুদূরে অন্য একটি পুকুর পাড়ে কলসী তিনটি ফেলিয়া দেন। পরে মনসার স্বপ্নাদেশে জানিতে পারা যায় যে, ঐ কলসী তিনটি অতি পবিত্র এবং তদনুসারে কলসী তিনটি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই গ্রামে কোন ব্রাহ্মণ পরিবারের বসতি না থাকায় পার্শ্ববর্তী চণ্ডীপুরে একটি খড়ের চালাযুক্ত মাটির ঘর নির্মাণ করাইয়া উক্ত সিন্দুর রঞ্জিত কলসীত্রয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনসার নিত্যপূজার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ তিনটি কলসীর উপরিস্থ মনসার মুখাকৃতি গালা দিয়া লাগানো আছে। উক্ত মনসা-মন্দিরের সম্মুখে খড়ের চালাযুক্ত একটি নাটমন্দিরও আছে।

দশহরা তিথিতে প্রাতঃকালে চণ্ডীপুরের মন্দিরে

সাধারণভাবে মনসার পূজার পর উল্লিখিত মূর্তিগুলিকে বিরোরী গ্রামে পূর্বোল্লিখিত বাঁধ পুকুরের ঘাটে আনিয়া দেবীর স্নানাদি পর্ব শেষ করা হয়। ইহার পর মূর্তিগুলিকে বাঁধপুকুরের পাড়ে একটি নির্দিষ্ট বাঁধানো বেদীর (যে স্থানে ঐ মূর্তিগুলি পাওয়া গিয়াছিল) উপর স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা করা হয়।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

লোবা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে কালীতলায় ব্যক্তিবিশেষের প্রায় চার বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চার সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা অধিক। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, শিল্প-সামগ্রী, কারুশিল্পজাত জিনিসপত্র প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ সিউড়ী, গোরাবাজার, জয়দেব কেন্দুলী, দুবরাজপুর, হেতমপুর প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান, লেটোগান, থিয়েটার প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : লোবা গ্রামে আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত রথযাত্রার মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ। রথের মেলা আম-কাঁঠাল ইত্যাদির অনেকগুলি ফলের দোকান বসে।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

মেটেলা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজের গাজন উপলক্ষে ধর্মরাজমন্দির সংলগ্ন প্রায় দশ বিঘা জমির উপর দুইদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন। মেলায় নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় দশ-বারো সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী, রিক্সা এবং সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বইছবি, ধামাকুলা, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে। মেলার বিক্রেতারা প্রধানতঃ দুবরাজপুর, তাঁতিপাড়া, রাজনগর, কড়িধ্যা, সিউড়ী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, থিয়েটার, ম্যাজিক প্রদর্শনী, সাঁওতাল নাচ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে।

জামথলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজ পূজা উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বইছবি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতির পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। পূর্বে আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, কীর্তন ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু আর্থিক অনটনের জন্য গত তিন বৎসর হইল ঐ সকল আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কোটা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমাতে ধর্মরাজ পূজা উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। শির্ষা, বাহেমা প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম হইতে এবং সীমান্তবর্তী বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে প্রায় এক সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন, ধামা-কুলা-মোড়া প্রভৃতি দ্রব্যাদির প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। শির্ষা, কোটা, জয়দেব কেন্দুলী, চণ্ডীপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান,লেটোনাচ ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

কল্যাণপুর গ্রামে ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রায় ছয়-সাত বিঘা জমির উপর তিন-চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। পার্শ্ববর্তী পদুমা, সাহাপুর, বাতিকার, মঙ্গলডিহি, দুবরাজপুর, সিউড়ী, ইলামবাজার, বোলপুর, রাজনগর এমন কি বর্ধমান, বাঁকুড়া হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী মোটরবাস, গরুরগাড়ী, সাইকেল রিক্সা করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা প্রভৃতির প্রায় দেড়শত দোকান বসে। বিক্রেতারা বোলপুর, ইলামবাজার, রাজনগর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে প্রতি বৎসর আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, থিয়েটার এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

উত্তরডাহা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজ পূজা উপলক্ষে ধর্মরাজমন্দির সংলগ্ন প্রায় পাঁচবিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন। আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিনশত নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, খেলনা-পুতুল প্রভৃতির দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, থিয়েটার এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকে।

মনসাপূজার মেলা

বিরোরী গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে বাঁধাপুকুরের দক্ষিণ ধারে প্রায় চার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় প্রায় দুই সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, হাঁড়ি-কলসী, তামা-পিতল-লোহার বাসন, ধামা-কুলা ইত্যাদির দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ কৃষ্ণনগর, কাস্তরী, সাহাপুর, হেতমপুর, দুবরাজপুর, পাহিয়াড়া, গৌরবাজার প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। আমোদপ্রমোদের জন্য মনসামঙ্গল ও যাত্রাভিনয় হয়।

শিবপূজার মেলা

বক্রেশ্বরে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে বক্রেশ্বর শিবের পূজা উপলক্ষে বক্রেশ্বরমন্দির সংলগ্ন প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি সপ্তাহকালব্যাপী চলে এবং দিনরাত্রি প্রায় সব সময় জমজমাট থাকে। মেলাটি প্রাচীন। লক্ষ্মীনারায়ণপুর, পারুলিয়া, চন্দ্রপুর, মুক্তিপুর, দুবরাজপুর প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পনর-ষোল সহস্র নরনারী সাইকেল রিক্সা এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, হাঁড়ি-কলসী, বই-ছবি, ধামা-কুলা-চ্যাঙ্গারী প্রভৃতির প্রায় পাঁচ-ছয়শত দোকান ব্যতীত অন্যান্য জিনিসপত্রের আরও প্রায় একশত দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণের অধিকাংশই স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, কবিগান, ঝুমুর-গান প্রভৃতির দল আসে ও মেলায় জুয়োখেলা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে বহু সংখ্যক দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

সরস্বতীপূজার মেলা

হেতমপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে গ্রামের হাটতলা হইতে কলেজ পর্যন্ত ব্যক্তি বিশেষের প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর চার-পাঁচদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় সত্তর-আশি বৎসরের প্রাচীন। নিকটবর্তী গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, মাটির

পুতুল, হাঁড়ি-কলসী-খেলনা প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, লটারী, যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় এক সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: হেতমপুর গ্রামে রথযাত্রার মেলাটি এই গ্রামে অনুষ্ঠিত সরস্বতীপূজার মেলার অনুরূপ।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ গঙ্গাপুর। ৯৪।৩৯৮·৫৮।৮৫।৩৮১

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, চামার, বাগ্দী, ডোম ও ভাণ্ডারী। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণ-পাড়া, চামারপাড়া, বাগ্দীপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বোলপুর হইতে মোটর-বাসে ইলামবাজার হইয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথি হইতে তিনদিন-ব্যাপী ধর্মরাজপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং বিজয়া-দশমী তিথিতে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ধর্মরাজপূজার প্রথম দিন এই গ্রামের ব্রাহ্মণদের গৃহে উনান জ্বালান নিষিদ্ধ। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শারদীয়া বিজয়াদশমীর দিন মেলা বসে।

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামণ্ডপ, মনসার পাকামন্দির এবং ধর্মরাজের খড়ের চালাযুক্ত একটি ঘর আছে। মনসা-মন্দিরে মনসার প্রতীক স্বরূপ চারিটি পাথর খণ্ড এবং ধর্মরাজমন্দিরে ধর্মরাজের প্রতীক স্বরূপ নয়টি পাথর খণ্ড আছে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে একটি শ্রীধরনাথের মন্দির ও একটি মহাপ্রভুর মন্দির আছে।

জনশ্রুতি আছে, গঙ্গারাম গোস্বামী নামক জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির নামানুসারেই গ্রামের নাম "গঙ্গাপুর" হইয়াছে।

শ্রীহরেরাম শর্মা, প্রধান শিক্ষক,
গঙ্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ইলামবাজার, বীরভূম।

২। গ্রাম ঃ ইলামবাজার। ৯৫।৪৬০·৮০।৩০১১,২৬৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, সদ্গোপ, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, তাঁতি, ময়রা, গরাই, ডোম, ছুতার, ধীবর, হাড়ী, নড়ি, বাউরী, চামার, বাগ্দী, মেটে, তাম্বুলী, চাঁড়াল, কামার, মাল, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণ-পাড়া, স্বর্ণকারপাড়া, জেলেপাড়া, নড়িপাড়, তাঁতিপাড়া, ডোমপাড়া, বাউরীপাড়া, হাড়ীপাড়া, শুঁড়িপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, ব্যবসায় ও তাঁতশিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বোলপুর হইতে বোলপুর-দুবরাজপুর, বোলপুর-সিউড়ী, বোলপুর-পানাগড় প্রভৃতি রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে নামকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাঁচদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি প্রাচীন মন্দির আছে। উহার একটিতে 'নিতাই-গৌর'-এর দারুময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
ইলামবাজার উচ্চ বিদ্যালয়,
বীরভূম।

Illambazar—A village in the Bolpur thana of the Suri subdivision, situated 24 miles south of Suri on the bank of the Ajai river, which here forms the boundary between Birbhum and Burdwan. It contains a police station, a post office and a fine inspection bungalow situated in park-like surroundings. The village used to be a trading centre of some importance, from which three metalled roads radiate, to the Bolpur, Panaghar and Dubrajpur railway stations. It was noted for the manufacture of lac ornaments and toys, but this industry has declined, the large lac-producing factories having been closed. A class of people callled Nuris, however, manufactured lac, lacbangles and toys ; it is reported that there are now one or two families at work, making toys and dyeing cotton with shellac dye. Formerly tusser

silk and cotton weaving were also flourishing industries, but the former is now practically extinct, and the latter has lost much of its importance. A part of the village, near the thana, is still called Tulapatti from the fact that it used to be the centre of the trade in cotton.

Illambazar was at one time the head-quarters of a large European firm known as Erskine & Co.……The founder of the firm was Mr. David Erskine……

(District Census Handbooks, Birbhum, 1951 by A. Mitra, p. lvii)

৩। গ্রাম : পূর্ব নারায়ণপুর।১১৪।৪৫৪·৭১।৬৫।২৮৪

(ক) কলু, বৈশ্য, বাউরী, লোহার, চামার, মাহাতো ও ভাণ্ডারী। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত বোলপুর রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর গ্রামবাসীদের সুবিধামত যে কোন দিনে ধর্মরাজঠাকুরের বার্ষিকপূজার আয়োজন করা হয়। ইহা ভিন্ন, গ্রামের দুইটি আখড়ায় প্রতিষ্ঠিত গোপাল ও নারায়ণশিলার নিত্যপূজা, ভাদ্র ও ফাল্গুন মাসে যথাক্রমে জন্মাষ্টমী ও দোল উৎসব এবং চব্বিশপ্রহরব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন হইয়া থাকে।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। সময় অনির্দিষ্ট। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন এবং তিনদিনব্যাপী স্থায়ী হয়।

(চ) গ্রামে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দুইটি আখড়া ব্যতীত নাটমন্দিরসহ ধর্মরাজের টিনের চালাযুক্ত একটি পাকা মন্দির আছে। গ্রামে একটি শীতলা, একটি মনসা এবং একটি ষষ্ঠি আছে।

শ্রীদেবপ্রসাদ সুর,
গ্রাম : বাহিরী, বীরভূম।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত 'জয়দেব-কেন্দুবিল্ব' ও 'বিল্বমঙ্গল-বেলুরিয়া' গ্রামে অনুষ্ঠিত উৎসব ও মেলা বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

জয়দেব-কেন্দুবিল্ব

বর্ধমান আর বীরভূম জেলার সীমান্ত দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বে বয়ে চলেছে অজয়নদ। অজয়নদের দক্ষিণ-পাড়ে বর্ধমান জেলা আর উত্তরপাড়ে বীরভূম জেলা। শীতকালে দু'পাশের বিস্তীর্ণ শুভ্র বালুকারাশির মধ্য দিয়ে অজয়ের ক্ষীণ জলধারা বয়ে যায়। সরু রেখার মত। তখন এর এক হাঁটু জল। কিন্তু গ্রীষ্ম-বর্ষায় এই নদীই আবার ফুলে ফেঁপে উঠে দু'কূল ভাসিয়ে দিয়ে যায়, তখনকার চেহারা অন্য। অজয়নদীর পাড়ে বীরভূম জেলার সীমান্তে কবি জয়দেবের স্মৃতি-বিজড়িত কেন্দুবিল্ব গ্রাম। লোকে বলে জয়দেব-কেঁদুলি। ভক্ত ও কাব্যরসিক এই দু'জনের কাছেই কেন্দুবিল্ব তীর্থস্থানস্বরূপ। এই গ্রামে বসেই কবি একদা তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ "গীতগোবিন্দ" রচনা করেছিলেন যা আজ আট'শ বছর ধরে সমান সমাদর লাভ করে আসছে ভক্ত ও কাব্যরসিকদের হৃদয়ে। যদিও তাঁর বাস্তুভিটার সন্ধান এই গ্রামে আজ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু লোকে বলে কবির বাস্তুভিটার উপরেই নাকি আজ রাধামাধবের মন্দির উঠেছে।

কবি জয়দেবের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এপর্যন্ত খুব কম কথাই জানা গিয়েছে। শোনা যায়, তিনি কেন্দুবিল্ব গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা ভোজদেব আর মাতা বামাদেবী। জয়দেবের আবির্ভাব সম্পর্কে বলা হয় ত্রেতা-যুগে মান্ধাতার পুত্র যোগভ্রষ্ট মুচকুন্দ কেন্দুবিল্বে এসে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ কবি জয়দেবকে দেবত্বে উন্নীত করার জন্যই ভাগবতাদিতে এ সব ব্যাখ্যা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তার কোন দরকার ছিল না। কবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যের জন্যই ভক্তর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। বুলার সাহেবের কাশ্মীর থেকে সংগৃহীত গীতগোবিন্দের প্রাচীন পুঁথি ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় যে,

কবি জয়দেব কিছুকাল রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন এবং তিনিই কবিকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজকবি রূপে তিনি কিছুকাল নবদ্বীপে বাস করেছিলেন বলেও শোনা যায়। পরে তিনি সম্ভবতঃ উৎকলরাজের সভাপণ্ডিত পদে অভিষিক্ত হন। রাজা লক্ষ্মণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। সেই হিসাবে কবি জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। কবি শেষ জীবনে বঙ্গদেশ ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনধামে অতিবাহিত করেন এবং সম্ভবতঃ শ্রীবৃন্দাবনেই তিনি দেহরক্ষা করেন। বৃন্দাবন-ধামে কবি ও কবি পত্নীর সমাধি আছে। শোনা যায়, বাল্যকাল থেকেই জয়দেব সংসারে উদাসীন ও ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। দয়ানিধি নামে কাশীর জনৈক সাধুর কাছ থেকে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং এক দৈব নির্দেশে অজয় নদীর তীরে কুশেশ্বরশিব ও ভুবনেশ্বরী যন্ত্র পান। এই যন্ত্রাসনে বসেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন এবং পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ গীতগোবিন্দ রচনা করে যশস্বী হন। কবি জয়দেব সুপণ্ডিত ও সুগায়ক ছিলেন বলে জানা যায়। যৌবনে সন্ন্যাসগ্রহণের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করে তিনি শ্রীক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু এখানে এক অলৌকিক ঘটনার আবর্তে পড়ে পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। এ-সম্পর্কে শ্রীকুমুদ নাথ মল্লিক মহাশয় তাঁর 'নদীয়া কাহিনী'তে লিখেছেন,— "এক অপুত্রক ব্রাহ্মণের মানসিক ছিল যে তাঁর স্ত্রীরগর্ভে পুত্র বা কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে প্রথমটিকে জগন্নাথের পদে অর্পণ করিবেন। উক্ত মানসে ব্রাহ্মণ আপন প্রথম তনয়াকে জগন্নাথ সমীপে আনয়ন করিলে ব্রাহ্মণের প্রতি জগন্নাথের প্রত্যাদেশ করেন যে, জয়দেবকে কন্যা দান করিলে সে তাহারই পাওনা হইবে; এই কন্যার নাম পদ্মাবতী। ব্রাহ্মণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ও জগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশক্রমে সন্ন্যাসী জয়দেব পদ্মাবতীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারী হন।" কেন্দুবিল্ব গ্রামে সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে এই কাহিনীটি একটু ভিন্নরূপে প্রচলিত আছে। তা হচ্ছে, জগন্নাথদেবের নিকট মানসিক করে ব্রাহ্মণ যথাসময়ে এক কন্যা লাভ করেন। ঐ কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হ'লে দরিদ্র ব্রাহ্মণ অর্থাভাবে কন্যার জন্য পাত্র স্থির করতে পারেন না। অবশেষে সমাজচ্যুত হবার ভয়ে নিজ কন্যাকে জগন্নাথদেবের দেবদাসী নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে শ্রীক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু জগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশে উক্ত ব্রাহ্মণ কেন্দুবিল্ব গ্রামে এসে পদ্মাবতীকে জয়দেবের হাতে অর্পণ করেন। আবার অন্যমতে বলা হয় যে, পদ্মাবতী রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় নর্তকী ছিলেন এবং পদ্মাবতী কবির স্ত্রী ছিলেন না, প্রণয়িনী-সঙ্গিনী ছিলেন।

ভক্ত কবি জয়দেব নবরসিকের একজন। কিংবদন্তী আছে 'গীতগোবিন্দ' রচনাকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে 'গীতগোবিন্দ'-এর এক অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করে দিয়ে যান। জয়দেবের স্মৃতি বিজড়িত কেন্দুবিল্ব তাই ভক্তর কাছে তীর্থস্থান। কেন্দুবিল্বের তীর্থ মাহাত্ম্যের অবশ্য আরো কারণ আছে। কবি জয়দেব রাধা-মাধব বিগ্রহের পূজারী ছিলেন। অজয়নদীর তীরে কদম্বখণ্ডীর ঘাটে কবি একদা তাঁর রাধামাধব বিগ্রহ পেয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। জয়দেব চরিত প্রণেতা কবি বনমালী দাসের বর্ণনানুযায়ী সেদিন ছিল পৌষসংক্রান্তি।

"পৌষ মাস সংক্রান্তি ব্রহ্মমুক্তির সময়।
পূর্ণিমাতে পূর্ণচন্দ্র হইলা উদয়॥"

রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিই এই পূর্ণচন্দ্র। এখানে আর একটি জনশ্রুতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই জনশ্রুতি অনুসারে বলা হয় বিষ্ণুপুরের জনৈক ভাস্কর রাধামাধব বিগ্রহ বিক্রী করতে কেন্দুবিল্বে আসেন। জয়দেব তাঁর কাছ থেকেই ঐ যুগল মূর্তি পেয়েছিলেন।

তীর্থ মাহাত্ম্যের তৃতীয় কারণ সম্পর্কে শোনা যায় যে, গঙ্গা স্নানের পুণ্য অর্জনের জন্য কবি প্রতিদিন প্রাতঃকালে কেন্দুবিল্ব থেকে পায়ে হেঁটে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে কালনার গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন। কবির ঐকান্তিকতায় ও ভক্তিতে প্রীত হয়ে গঙ্গাদেবী স্বপ্নাদেশ দেন যে, প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে গঙ্গাদেবী অজয়ের উজান বয়ে কেন্দুবিল্ব গ্রামের কদম্বখণ্ডীর ঘাটে এসে হাজির হবেন। সুতরাং অজয় নদীতে স্নান করলেই গঙ্গা

স্নানের পুণ্যলাভ হবে। পৌষসংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান, দান-তর্পনাদি পুণ্য কর্ম বলে বিবেচিত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এইসব অলৌকিক ঘটনা। এই কারণে প্রতি বছর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অর্ধলক্ষাধিক নরনারী সমবেত হন কদম্বখণ্ডীর ঘাটে পুণ্যস্নান ও কবি জয়দেবের স্মৃতি মহোৎসব উপলক্ষে।

এই উৎসব কত কালের প্রাচীন তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। বিভিন্ন গ্রন্থাদির থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কবি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু এই উৎসব যে তাঁর জীবিতকালে প্রচলিত হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন কি কবির তিরোধানে কতকাল পরে এই উৎসবের প্রচলন হয় তাও বলা যায় না। যদিও বনমালী দাসের পুঁথিতে বলা হয়েছে কবি জীবিতকালেই এই উৎসবের প্রচলন করেন। কিন্তু এই দাবী কতটা নির্ভরযোগ্য তা বলা কঠিন। কারণ এই পুঁথিখানি সাড়ে তিনশত বছরের অধিক প্রাচীন নহে। হয়ত পুঁথি রচনাকালে স্থানীয় জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেই এই রকম উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞজনেরা মনে করেন জয়দেব-কেন্দুলির মেলা অন্তত পাঁচ'শ বৎসরের প্রাচীন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, এই মেলা বাংলাদেশের প্রাচীন মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম একটি।

গ্রামে চারিদিকে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা একটি প্রাঙ্গণের মধ্যে ইষ্টক নির্মিত উচ্চ নবরত্নমন্দিরের অভ্যন্তরে একটি বেদির উপর রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ভক্তদের বিশ্বাস এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ মূর্তিই কবি জয়দেবের আরাধ্য রাধামাধব বিগ্রহ। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। এই মন্দিরের বহির্ভাগের দেওয়াল গাত্রে অতি সুন্দর পোড়ামাটির কাজ দেখতে পাওয়া যায়। পোড়ামাটির কাজগুলি রামরাবণের যুদ্ধ, বিষ্ণুর দশাবতার প্রভৃতি অধিকাংশই পুরাণে বর্ণিত বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর অনুকরণে নির্মিত এবং শিল্পকার্যগুলি খুবই নিখুঁত। যদিও আজ কালেরপ্রভাবে ও অযত্নে এই শিল্পসৌন্দর্য অনেকাংশে নষ্ট হতে চলেছে। দেবালয়টি ১৬০৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজা কীর্তচাঁদ বাহাদুরের মাতা নৈরানীদেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলে মন্দিরে রক্ষিত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়। অনেকে বলেন 'বর্ধমানের মহারাণী কেন্দুবিল্বের নিকটবর্তী বর্ধমান জেলার শ্যামরূপার গড় থেকে বিনোদরায় বিগ্রহ আনিয়ে এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। কবি শেষ জীবনে শ্রীবৃন্দাবনধামে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তাঁর তিরোধান ঘটে। কবি বৃন্দাবন যাওয়ার প্রাক্কালে সঙ্গে তাঁর আরাধ্য দেবতা রাধামাধব বিগ্রহকে নিয়ে যান। তাই স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে একটা কিংবদন্তীও আছে। শোনা যায়, ভক্ত কবির দীর্ঘ পথযাত্রার পরিশ্রম লাঘবের জন্য রাধামাধব নিজের ভার কমিয়ে ক্ষুদ্র মূর্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। সে যাই হোক জয়দেবের আবির্ভাবের প্রায় পাঁচ'শ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির ও বিগ্রহের সঙ্গে জয়দেবের আরাধ্য রাধামাধবের কোন যোগ নেই বলেই মনে হয়। জনশ্রুতি আছে কবির আরাধ্য রাধামাধব বিগ্রহ জয়পুর শহরে গোবিন্দজীউর মন্দিরের নিকটবর্তী একটি গ্রামে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত আছে। অবশ্য কেন্দুবিল্বে রাধামাধব বিগ্রহ না থাকলেও জয়দেব সিদ্ধপীঠ কুশেশ্বর শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি অপ্রাচীন। এই মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ ও ভুবনেশ্বরীযন্ত্র নামে খ্যাত অষ্টদল পদ্ম খোদিত শিলাসন আছে। বলা হয় এই যন্ত্রাসনে বসেই জয়দেব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

উল্লিখিত রাধামাধবমন্দির (রাধাবিনোদ মন্দির বলাই শ্রেয়) ব্যতীত কেন্দুবিল্ব গ্রামে আরো অনেকগুলি দেবালয় ও বৈষ্ণব আখড়াদি আছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য মুখুজ্যেদের রাধাবল্লভমন্দির, মহান্তপাটের শ্রীরামচন্দ্রজীউ, শ্রীমন্মহাপ্রভুজীউ, বাড়ুজ্যেবাটির প্রাণনাথজীউ, কাঙ্গালক্ষ্যাপার আখড়া, খেঁটেরেবাবার আখড়া, মনহরক্ষ্যাপার আখড়া, জয়ক্ষ্যাপার আশ্রম, বোষ্টম গোঁসাইয়ের সমাধি, মানভূমের কাঙ্গালবিহারীক্ষ্যাপার সমাধি, সরিষার জমিদারবাবুদের আখড়া, মাজিনারবাবুদের আখড়া, জহুবাজাদের আখড়া, কাঙ্গালক্ষ্যাপার শিষ্য রজনীদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জয়দেব পদ্মাবতী মন্দির এবং ১৩৬১ সনে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ আশ্রম ও কাঙ্গালক্ষ্যাপার কালীবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত মাতৃ আশ্রম প্রভৃতি।

প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে জয়দেব-কেন্দুলির মেলায় ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে অর্ধলক্ষাধিক নর-নারীর সমাগম হয়। সাধারণতঃ যাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার থেকে বিশেষ করে বর্ধমান, বীরভূম, হুগলী ও কলিকাতা থেকে আসেন। তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসী আসেন ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে। এই মেলায় আউল-বাউল, বৈষ্ণব সহজিয়া, কর্তাভজা, দরবেশ, শৈব, শাক্ত এমন কি নাগা সন্ন্যাসীরাও আসেন। এই অসংখ্য যাত্রী আসেন প্রধানতঃ ট্রেনে, বাসে, গরুরগাড়ীতে এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তর পেরিয়ে পায়ে হেঁটে। কেন্দুবিল্ব গ্রামটি বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর রেলষ্টেশন থেকে প্রায় ১৪ মাইল, বীরভূম জেলার বোলপুর স্টেশন থেকে প্রায় ২৩ মাইল এবং সিউড়ী স্টেশন থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এছাড়া অণ্ডাল-সাঁইথিয়া রেলপথে দুবরাজপুর স্টেশনের দূরত্ব প্রায় ১১ মাইল। সিউড়ীর থেকে যে বাস ছাড়ে তা দুবরাজপুর হয়ে কেন্দুবিল্ব গ্রামে এসে পৌছায়। বোলপুর থেকেও মোটরবাস পাওয়া যায়। দুর্গাপুর থেকে মোটরবাস আসে অজয়নদীর তীরে শিবপুরে। দুর্গাপুর থেকে আসা যাত্রীরা শীতে শীর্ণকায় অজয়নদী হেঁটেই পার হয়ে চলে আসেন এপারে কেন্দু-বিল্বের মেলায়।

পৌষসংক্রান্তির প্রত্যূষে সহস্র সহস্র নরনারী, সাধু-সন্ন্যাসী কদমখণ্ডীর ঘাটে অজয়নদীতে পুণ্যস্নান ও তর্পনাদি সেরে রাধাবিনোদের মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন ও পূজা দিতে জড় হন। তিনদিন এই উৎসব স্থায়ী হয়। এই তিনদিনব্যাপী পুণ্যস্নান, তর্পন ও রাধাবিনোদের ভোগপূজা ব্যতীত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীগণ ধর্মালোচনা ও সনাতন ধর্মপ্রচারের আয়োজন করেন। উৎসবের প্রথম দিন থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন শুরু হয়। চতুর্থ দিনে ভোরে শান্তিপুরের রাস উৎসবের ন্যায় কুঞ্জভঙ্গ গান, দুপুরে ধূলট উৎসব, মহান্ত বিদায় ও 'দধিহরিদ্রা' অনুষ্ঠানের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। পূর্বে মহান্ত বিদায় উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়াকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য একখণ্ড হলুদ রংয়ের বস্ত্র দেওয়া হতো। এযাবৎ অনেক নামকরা কীর্তনীয়া এই সম্মান অর্জন করেছেন। জয়দেব মেলায় প্রাপ্ত এই সম্মান বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্ধমানের মহারাণী কর্তৃক বর্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে রাধারমন ব্রজবাসী নামে জনৈক মহান্তকে বৃন্দাবন থেকে আনিয়ে রাধাবিনোদের নিত্য সেবা-পূজা ভার অর্পণ করেন। রাধাবিনোদের নিত্য সেবা-পূজার জন্য বর্ধমানের মহারাজা বেশ কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন বলে জানা যায়। সেই থেকে আজ অবধি প্রায় দু'শ আশি বছর ধরে অবাঙ্গালী পশ্চিমারাই মহান্ত পরম্পরায় রাধাবিনোদের সেবা-পূজা করে আসছেন এবং মন্দিরের যাবতীয় আয় তাঁদেরই করতলগত।

জয়দেব মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ লোকসংগীত। তিনদিনব্যাপী এই উৎসবে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের নানাস্থান থেকে নানা ধর্ম সম্প্রদায় বিশেষ করে বাউল সম্প্রদায়ের সমাগম হয়। বর্ধমান জেলার বৈরাগীতলার মেলা ব্যতীত বাংলাদেশের আর অন্য কোথাও এত বাউল সমাবেশ দেখা যায় না। এরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে সাময়িক আস্তানা গড়ে তোলেন মেলা প্রাঙ্গণের নানাদিকে। এই আস্তানায় সারাদিন তো বটেই এমনকি সারারাত্রিব্যাপী কীর্তন, ভাটিয়ালী ও বাউল গানের আসর বসে। পৌষের হাড় কাঁপান শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য আসরে আসরে কাঠ-কুটোয় আগুন ধরিয়ে উত্তাপের ব্যবস্থা করা হয়। মন মাতানো লোকসংগীতের আকর্ষণে বিমুগ্ধ শ্রোতার দল অগ্নিকুণ্ড মধ্যে রেখে গোল হয়ে ঘিরে বসেন এক একটি আসরে। বাঁহাতে কোমরে বাঁধা ডুগি আর ডান হাতে একতারা, দোতারা বা গুপিযন্ত্র বাজিয়ে ভাবে বিভোর হয়ে হেলে দুলে নেচে নেচে একের পর এক গান গেয়ে চলেন ভক্ত শিল্পীর দল। সঙ্গে তাল ঠোকেন পায়ে আর হাতের কব্জিতে বাঁধা ঘুঙুরের ধ্বনি তুলে। কোথা দিয়ে যে সারারাত কেটে যায় শ্রোতারা টেরও পায় না। বিশেষ করে এই গানের আসরগুলি দেখতে পাওয়া যায় নির্জনে কদমখণ্ডীর শ্মশানঘাটের আশেপাশে বিরাটকায় বটগাছগুলির তলায়। কদমখণ্ডীর শ্মশানক্ষেত্র এক তীর্থস্থান। বীরভূম ও বর্ধমান জেলার নানাগ্রাম থেকে লোকজন আসেন এখানে শবদাহের জন্যে। ঘাটের কাছে লক্ষণীয় একটি প্রাচীন বটগাছ অজয়নদীর তীরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছায়া ফেলে

ছত্রের মত দাঁড়িয়ে আছে। জনশ্রুতি আছে, কয়েক বছর আগে জনৈক সিদ্ধপুরুষ এসেছিলেন জয়দেব কেন্দুলির মেলায়। তিনি তাঁর ধুনির থেকে একখণ্ড পোড়া কাঠ তুলে নিয়ে পুঁতে দিয়েছিলেন অজয়ের তীরে। কালক্রমে ঐ পোড়া কাঠ থেকে নাকি সৃষ্টি হয়েছে আজকের এই মহীরুহ।

বনমালী দাস তাঁর পুঁথিতে কেন্দুবিল্বের পৌষসংক্রান্তি মেলার যে বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

পৌষ সংক্রান্তির এক দিবস থাকিতে।
মহোৎসবের ঘটা প্রভু কৈলা ভালোমতে ॥
দেশ-বিদেশে লোক মহা গোল হৈল।
সংকীর্তন কলরবে পৃথিবী পূরিল ॥

... ...

সাধুমন্ত তেজবন্ত একত্র হৈল।
অজয় কিনারে সব আখড়া বাঁধিল ॥

... ...

কেবা আসে কেবা রাধে কে পরিবেশনয়।
কেবা ভোজন করে কেহ কারে না চিনয় ॥
জগন্নাথ ক্ষেত্রে যেন প্রসাদ বিকায়।
জাতি পাঁতি না বিচারে পহিলেই খায় ॥
সেই মত দেখি জয়দেবের ভঙ্গিতে।
চারিবর্ণ একাকার কদম্বখণ্ডীতে ॥

... ...

এই মতে মহোৎসব তিনদিন গেল।
চতুর্থ দিবস দধি হরিদ্রা করিল ॥
তুমুল করিয়া কৈল হরি সংকীর্তন।
দধি হরিদ্রা দিয়া সভার করিল ভূষণ ॥

... ...

লক্ষ লক্ষ লোক সব পাতিলেক কান।
কহিতে লাগিল ঠাকুর সভা বিদ্যমান ॥
শুন শুন সর্বলোক শুন এই বাণী।
কদম্বখণ্ডীর ঘাট মহাতীর্থ জানি ॥
কোন্ যুগের ঈশ্বরের এই ধাম ছিল।
লুপ্তধাম পুনরপি মহাতীর্থ হইল ॥
কদম্বখণ্ডীতে রাধামাধব পাইল।
পুনরপি সেই ঘাটে গঙ্গা দেখা দিল ॥
কে কহিতে পারে এই তীর্থের মহিমা।
স্নান দানে কত গুণ কে কহিবে সীমা ॥
পৌষ মাস সংক্রান্তির মকর দিবসে।
কদম্বখণ্ডীতে যেবা করিবেক বাসে ॥
কদম্বখণ্ডীতে যেবা করিবেক স্নান।
কদম্বখণ্ডীতে যেবা করিবেক দান ॥
কীর্তন করিবে কেহ শুনিতে যত জন।
সাধু বৈষ্ণব জনে করিব দরশন ॥
কদম্বখণ্ডীর ধূলা মাখিব খাইব।
চতুঃসীমা কেন্দুবিল্বের ভ্রমণ করিব ॥
তাহার ভাগ্যের সীমা কে কহিতে পারে।
অনায়াসে ভবসিন্ধু করিব উদ্ধারে ॥

... ...

এই মত বৎসরের শেষ পৌষ মাসে।
মহামহোৎসব করেন সংক্রান্তি দিবসে ॥
বছরে বছরে বাড়ে লোক-সংঘটন।
স্নান দান মহোচ্ছব নগর কীর্ত্তন ॥

জয়দেব কেন্দুলির উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তির দিন থেকে প্রায় পক্ষকালব্যাপী একটি মেলা বসে। অজয়নদীর তীরে প্রায় আধ মাইল প্রসারিত স্থলে মেলার দোকানপাটগুলি বসে এবং নানাস্থান থেকে প্রতি বৎসর পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক নরনারী আসেন। মেলাটি বাংলাদেশের একটি প্রাচীন মেলা তো বটেই এমন কি লোকসমাগমের দিক থেকে গঙ্গাসাগর মেলার পরই এর স্থান নির্দেশ করা যায়। মেলায় বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় ছয়-সাতশ দোকানপাট বসে। পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত বিহার ও উত্তর প্রদেশ থেকেও ব্যবসায়ীরা প্রতি বৎসর আসেন। প্রধানতঃ ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বাঁশ ও বেতের তৈরী জিনিসপত্র, কৃষি ও কারিগরীসংক্রান্ত জিনিসপত্র, মাটির তৈরী খেলনা ও হাঁড়ি-কলসী, প্লাস্টিকের খেলনা-পুতুল, পাথরের থালা-বাটি, কাঠের দরজা-জানালা, হাল-লাঙল, জালের কাঁঠি, ধর্মীয় পুস্তকাদি মেলায় আসে। এছাড়া বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য যে, মেলায় প্রচুর পাকা কলা আমদানি হয়। প্রধানতঃ বীরভূমের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ব্যবসায়ী ও যাত্রীরা গরুরগাড়ী করে মেলায় আসেন। মেলার কয়দিন কয়েক-শত গরুরগাড়ী জমা হয়। এই সকল গরুরগাড়ী করে গ্রামান্তর থেকে যাত্রীরা আসেন আর আসেন ব্যবসায়ীরা মালপত্র নিয়ে।

মেলার প্রধান আকর্ষণ লোকসংগীত একথা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, সার্কাস, নাগরদোলা ও পুতুল নাচের দল আসে এবং একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

প্রতি বৎসর মেলার জন্য ডাকবিলির ব্যবস্থা করা হয়। যিনি মেলার ডাক গ্রহণ করেন তিনি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেলার এই অগণিত যাত্রীর জন্য থাকা-খাওয়ার কোন সুব্যবস্থাই নেই। যাত্রীরা সাধারণতঃ মাঠে-ঘাটেই খড় বিছিয়ে শীতের রাত কাটিয়ে দেন। অবশ্য মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন আখড়া থেকে ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের জন্য খিচুড়ী ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ব্যতীত কেন্দুবিল্বের সম্পন্ন গৃহস্থরা প্রতি বৎসর অন্ন-সত্রের আয়োজন করেন। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশবাহিনী ব্যতীত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীরাও যথেষ্ট পরিশ্রম করে থাকেন।

বিল্বমঙ্গল-বেলুরিয়া

জয়দেব কেন্দুবিল্ব গ্রামের প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অজয় নদীর তীরে নবরসিকের অন্যতম "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থ প্রণেতা পরম বৈষ্ণব বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত বিল্বমঙ্গল-বেলুরিয়া গ্রামটি অবস্থিত। ইহা বৈষ্ণবদের একটি তীর্থস্থান। অনেকের বিশ্বাস বিল্বমঙ্গল-ঠাকুর এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যৌবন-কালাবধি তিনি এইস্থানেই বসবাস করেন। "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য" প্রণেতা শ্রীহরিদাস বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার "গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ বা শ্রীপাট বিবরণী গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন কেন্দুবিল্বের পশ্চিমে অনতিদূরে শ্রীশ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জন্মভূমির ধ্বংসাবশেষ"। অন্য একস্থানে লিখয়াছেন, জয়দেবের প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে 'বিল্বমঙ্গল-বেলুরিয়া' গ্রাম। ঐ গ্রামের দক্ষিণে অজয়নদীর পাড়ে জামদহে মাতা চিন্তামণির ভিটা। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের ও চিন্তামণির বাড়ী ঐস্থানে ছিল।" বর্দ্ধমান জেলার ধরনী গ্রাম নিবাসী শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লিখিত বাল্যকাহিনী" নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগে "বীরভূম কাহিনী" বিবরণে লিখিয়াছেন :

"এই স্থানে জনমিল শ্রীবিল্বমঙ্গল।
চরমে হইল যার পরম মঙ্গল॥
তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি সর্ব্বজনাদৃত।
রচিল অপূর্ব গ্রন্থ কৃষ্ণ কর্ণামৃত॥"

বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শৈশবকাল বা তাঁহার পিতামাতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই। তাঁহার সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ও সিদ্ধিলাভ সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। শোনা যায় বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যৌবনে চিন্তামণি নামে জনৈক রমনীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। এই আসক্তি এমনই প্রবল ছিল যে, একদা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নিজের পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া অজয়নদের অপর পাড়ে তাঁহার প্রণয়িনী গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। সেদিন ছিল অতি দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি। অজয় নদীতে প্রবল স্রোত। তথাপি প্রণয় আবেগে বিহ্বল বিল্বমঙ্গল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া একটি গলিত শবদেহকে অবলম্বন করিয়া কোনক্রমে নদী পার হন। তখন রাত্রি গভীর, চিন্তামণি নিদ্রিতা, গৃহদ্বার রুদ্ধ। অনেক ডাকাডাকিতেও কাহারও সাড়া মিলিল না। অবশেষে তিনি প্রাচীর গহ্বরে অর্ধ প্রবিষ্ট সর্পকে রজ্জু জ্ঞানে অবলম্বন করিয়া চিন্তামণির গৃহাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। চিন্তামণি তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া বিল্বমঙ্গল ঠাকুরকে ভৎসনা করিয়া বলেন যে, তিনি যদি তাঁহার এই ভালবাসার অর্দ্ধেক ঈশ্বরের পদে নিবেদন করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার মানবজীবন সার্থক হইত। চিন্তামণির ভৎসনায় তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি তাঁহার অদম্য ভালবাসা রাধাকৃষ্ণের পদযুগলে সমর্পণ করিবার জন্য বৃন্দাবনে গমন

করেন এবং রাধাকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়া যথার্থই মানব জীবন সার্থক করেন।

তাঁহার পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি দশনামা সম্প্রদায়ের অন্যতম 'গিরি' সম্প্রদায়ী ছিলেন এবং তাঁহার গুরু ছিলেন সোমগিরি। সন্ন্যাসজীবনে তাঁহার গুরুদত্ত নাম লীলাশুক। অনুমান করা হয় বিল্বমঙ্গল ঠাকুর মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান।

ইহার পর এই গ্রামে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের ভিটা নামে চিহ্নিত স্থানটি বহুকাল পরিত্যক্ত থাকিয়া বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। মাত্র ৩৪ বৎসর পূর্বে মাধবাচার্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত অবধূত প্রেমদাস দাস উল্লিখিত ভিটার জঙ্গলাদি পরিস্কার করিয়া এইস্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর ৩রা মাঘ তারিখে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের স্মৃতিতর্পণ মহোৎসবে ব্যবস্থা করেন।

এইস্থানে একটি প্রাচীন মন্দির আছে; মন্দিরের কিয়দাংশ গত ১৩৬৩ সনে অজয়নদীর প্রবল বন্যায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি বেদীকে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জন্মবেদী (সূতিকাগৃহ) বলিয়া দেখান হয়। ইহা ভিন্ন মন্দিরের প্রাঙ্গণে যুগল তামাল গাছ এবং রাধাকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড আছে। অবশ্য অজয়নদের বন্যার ফলে বর্তমানে কুণ্ডটিও প্রায় মজিয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত মন্দির প্রাঙ্গণে "অক্ষয় বট" নামে খ্যাত একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শোনা যায় এই অক্ষয় বটের নীচেই একদা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁহার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ কার্য সম্পন্ন করিয়া চিন্তামণির গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

৩রা মাঘ উৎসব উপলক্ষে নিকটবর্তী একডালা, শুকডালা, জয়দেব কেন্দুবিল্ব, টিকরবেতা প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রাম হইতে ভক্ত ও বৈষ্ণব, সাঁই, দশনামী, নাথ, আউল-বাউল, দরবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত বহু সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন হয়। মূলতঃ যে সকল সাধু-সন্ন্যাসী ও যাত্রীরা পৌষসংক্রান্তির উৎসব উপলক্ষে জয়দেব কেন্দুবিল্বে আসিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিল্বমঙ্গলপাট দর্শনেও আসেন। সুতরাং পৌষসংক্রান্তির দিন হইতেই প্রতিদিন এইস্থানে যাত্রীরা আসিয়া থাকেন। তবে ৩রা মাঘ তারিখেই যাত্রীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। এইদিন যথারীতি বিল্বমঙ্গল পাঠে পূজাদি হয় এবং প্রায় পাঁচশত যাত্রীর মধ্যে অন্নভোগ বিতরণ করা হয়। ভক্তরা অনেকে চিড়া-গুড়-দই-বাতাসা অথবা লুচি-মিষ্টি ইত্যাদি নৈবেদ্য দিয়া পূজা দেন। উৎসব উপলক্ষে সমাগত ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসীগণ উৎসব প্রাঙ্গণে সারাদিনব্যাপী বাউল সঙ্গীত ও অন্যান্য ভক্তিমূলক সঙ্গীতের আসর বসান।

উৎসব বিবরণী

মহোৎসব

ইলামবাজারে প্রতি বৎসর ২০শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৪শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত সাড়ম্বরে অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তিবিশেষের হইলেও সর্বসাধারণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসব উপলক্ষে মহাপ্রভু গৌর-নিতাই বিগ্রহের পূজা-অর্চনা হইয়া থাকে। গ্রামে একটি মন্দিরে গৌর-নিতাই-এর দারুময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ উক্ত বিগ্রহদ্বয়কে উল্লিখিত মন্দির হইতে নিকটবর্তী আর একটি মন্দিরে মহাসমারোহে আনিয়া সন্ধ্যায় অধিবাস পালন করা হয়। ২০শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৪শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ঐ বিগ্রহদ্বয় এই মন্দিরে রাখিয়া প্রতিদিন যথারীতি মধ্যাহ্নে ভোগ-পূজাদি এবং সন্ধ্যায় মঙ্গলারতি অনুষ্ঠিত হয়। ২৪শে নাম-সংকীর্তন ও ধূলট উৎসবের পর মহাপ্রভুর বিগ্রহদ্বয়কে মূল মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয় এবং এই সঙ্গে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। উৎসবের কয়দিন আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু ভক্ত ও বৈষ্ণব সাধু-সন্ন্যাসীরা আসিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন, নামকীর্তন করিবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়ার দলও আসেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মহাপ্রভুর নিকট প্রধানতঃ লবণ মানত করা হয়। উৎসবকালে মোট প্রায় তিন-চার মণ লবণ মন্দিরে জমা হয়। উৎসবটি প্রায় পৌনে দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মহাপ্রভুর নিত্যপূজা হয়। সেবায়েত জনৈক ব্রাহ্মণ। পূজারী কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী চট্টোপাধ্যায়। মহাপ্রভুর মূল মন্দিরটি বাংলা ১২৬০ সন নির্মিত। উল্লিখিত অপর মন্দিরটি ইহার কিছুকাল পরে নির্মাণ করা হয়।

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

পূর্ব নারায়ণপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে ঠাকুর মন্দিরের সম্মুখে দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমির উপর তিন-চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ধর্মরাজপূজার নির্ধারিত কোন দিন নাই; গ্রামবাসীর সুবিধামত বৎসরের যে-কোন সময় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং মেলাটিও উৎসবের সময়ই বসিয়া থাকে। ইহা প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন মেলা। আশপাশে বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু যাত্রী আসেন। এই সকল যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাই বেশী। বর্ধমান জেলা হইতে কিছু সংখ্যক যাত্রী প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় খাবার, মনিহারী, মাটির খেলনা-পুতুল ও হাঁড়িকুড়ির দোকান এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলার দোকান ও কয়েকটি পান বিড়ির দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। আমোদপ্রমোদের জন্য মেলায় যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

মনসাপূজার মেলা

গঙ্গাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর দিন মনসাপূজা উপলক্ষে মনসামন্দির ও ধর্মরাজ-মন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে এবং ইলামবাজার, ঘুরিষা প্রভৃতি স্থান হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় কয়েকটি মিষ্টান্নের দোকান বসে এবং বিক্রেতারা প্রধানতঃ ইলামবাজার হইতে আসেন। মেলা প্রাঙ্গণে মনসামঙ্গল গানের ব্যবস্থা থাকে।

মহোৎসবের মেলা

ইলামবাজারে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে মহোৎসব উপলক্ষে হাটতলায় ব্যক্তিবিশেষের প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পৌনে দুইশত বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় অঞ্চলের লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী কাঁকসা, আউসগ্রাম প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের গড়ে প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী প্রতিদিন মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, জামাকাপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন শিল্পসামগ্রী প্রভৃতির প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ বোলপুর, দুবরাজপুর, সিউড়ী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসেন। ইহা ভিন্ন স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও মেলায় দোকান দিয়া থাকেন। মেলায় বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, লটারী এবং কীর্তনের দল আসিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত জুয়া খেলা হয়।

থানা ঃ বোলপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ সালন।৮।৯২৩'২৩।৯১।৫৪২

(ক) কায়স্থ, বাগ্দী, সদ্‌গোপ, নাপিত, শুঁড়ি, বারুই ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) বোলপুর রেলস্টেশন হইতে গ্রামটি প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামে যাতায়াতের রাস্তাটির কিছুটা অংশ পাকা এবং কিছুটা অংশ কাঁচা।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীতিথিতে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীকার্তিক চন্দ্র রায়, গ্রামসেবক,
গ্রাম ও পোঃ সাত্তোর,
বীরভূম।

২। গ্রাম ঃ কসবা।১৬।১,১৪৭'৩৪।২২৫।১,১১৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বাগ্দী, সদ্‌গোপ, হাড়ী, ডোম ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) বোলপুল রেলস্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ব্রহ্মদত্যিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রাচীন।

(ঙ) ব্রহ্মদত্যিপূজার মেলা। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীসুন্দর গোপাল দেবাংশী, গ্রামসেবক,
কসবা ব্লক ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফিস,
বীরভূম।

৩। গ্রাম ঃ শ্রীচন্দ্রপুর।৩৮।২২২'৯০।৫০।২২০

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, মেটিয়া ও মুচি। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া ও মুচিপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) বোলপুর রেলষ্টেশন হইতে সিউড়ীগামী রাস্তায় প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে গ্রামটি অবস্থিত। মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে পিত্তল নির্মিত রাধা-মাধবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে ধর্মরাজ, ফকিররায়, বানেশ্বর শিব প্রভৃতি দেবতা আছে।

শ্রীসুন্দর গোপাল দেবাংশী, গ্রামসেবক,
কসবা ব্লক ডেভেলপ্‌মেণ্ট অফিস,
বীরভূম।

৪। গ্রাম ঃ মনোহরপুর।৪৮।৭৪১'৮৩।১৪০।৭১৮

(ক) ব্রাহ্মণ, বাগ্দী, গড়াই, নমঃশূদ্র, কুমার, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, বাউরী, চামার, ছুতার ও সাঁওতাল। গ্রামটি ছয়টি পাড়ায় বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরি ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বোলপুর হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। গ্রামের যাতায়াতের রাস্তাটির কিছুটা অংশ পাকা এবং কিছুটা অংশ কাঁচা।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ব্রহ্মচারীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রাচীন।

(ঙ) ব্রহ্মচারীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীকার্তিক চন্দ্র রায়, গ্রামসেবক,
গ্রাম ও পোঃ সাত্তোর,
বীরভূম।

৫। গ্রাম ঃ গোয়ালপাড়া।৬৫।৩৫৯'৪১।১৪৪।৭৪৮

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, গন্ধবণিক, বাগ্দী, লোহার, ছুতার ও কামার।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বোলপুর হইতে পাকা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে বাৎসরিক চণ্ডীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত চৈত্র পূর্ণিমায় 'বয়ড়া ভাই' নামে খ্যাত ধর্মরাজপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। চৈত্র মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি ধর্মরাজমন্দির এবং একটি চণ্ডী-মন্দির আছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গ্রামের সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত নদীর অপর পাড়ে চণ্ডীদেবীর মঠ আছে।

শ্রীশক্তিপদ চ্যাটার্জী, কৃষিজীবি,
গ্রাম : গোয়ালপাড়া।

৬। গ্রাম : **লালদহা**।৭৬।৩২২·৯৮।৪৩।২০৯

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, যোগী ও কোড়া। গ্রামটিতে কোড়াপাড়া ও সদ্‌গোপপাড়া নামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কোপাই হইতে প্রায় তিন মাইল পূর্ব-দক্ষিণে এবং বোলপুর রেলস্টেশন হইতে প্রায় ছয় মাইল উত্তরে গ্রামটি অবস্থিত।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীতিথিতে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গত ইং ১৯৪৬ সাল হইতে উৎসবটি আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) সারস্বত উৎসবের মেলা। ফাল্গুন মাসে ছয়দিন-ব্যাপী। মেলাটি গত ইং ১৯৪৬ সাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজ, মনসা এবং কালীঠাকুরের নির্দিষ্ট স্থান আছে। বহুকাল পূর্বে গ্রামটি কোপাই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। তৎকালে এই স্থানে 'দহ' থাকায় লোকে ইহাকে লাউদহ বলিত। লাউদহ হইতে গ্রামের নাম 'লালদহা' হইয়াছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ, গ্রামসেবক,
লালদহা ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস,
বীরভূম।

৭। গ্রাম : **সুরুল**।১০৪।২,০০৭·২২।৭৯২।৪,৫৩৩

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, সদ্‌গোপ, বাউরী, ময়রা, হাড়ী ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) বোলপুর রেলস্টেশন হইতে শ্রীনিকেতনের দূরত্ব প্রায় আড়াই মাইল। স্টেশন হইতে পাকা রাস্তায় মোটরবাস অথবা রিক্সায় শ্রীনিকেতনে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা উৎসব।

(ঙ) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনের পল্লী সংগঠন বিভাগের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২৩শে মাঘ হইতে ২৫শে মাঘ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি ইং ১৯২৩ সাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানা যায় যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদের জমিদারীর কার্যোপলক্ষে প্রায়ই শিলাইদহে যাইতেন। তথায় স্বচক্ষে দরিদ্র কৃষি-জীবির দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হন এবং পল্লীবাংলার কৃষক সমাজ তথা বাংলার শ্রীবৃদ্ধি কল্পে শান্তিনিকেতনের নিকটস্থ সুরুল গ্রামে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আদর্শ পল্লীগঠন ও কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষাকেন্দ্র রূপে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেন। সুরুল গ্রামের উত্তর-প্রান্তে লর্ড সিংহের কুঠির বাড়ীতে শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন বিভাগের কার্যালয় কেন্দ্র স্থাপিত হয়। উক্ত কুঠিরটি পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর অধিকারে ছিল। পরবর্তীকালে এই কুঠিটি লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের উত্তরাধিকারিগণের হস্তগত হয়। শ্রীনিকেতনের উদ্যোগে প্রতি বৎসর ২৩শে মাঘ এই স্থানে কৃষি-শিল্প-শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী মেলা বসিতেছে।

শ্রীধীরানন্দ রায়, অধ্যক্ষ,
শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন বিভাগ,
বীরভূম।

Surul—A village in the south of the Suri subdivison, situated three miles west of Bolpur and about five miles north of the Ajai river. The village is noteworthy as

having been the site of a commercial residuary under Mr. John Cheap, whose work has been described at length in the Essay. After the East India Company gave up its mercantile dealings in 1835, the residency was abandoned and allowed to fall into decay. The riuns cover the top of a small hill, and though they are becoming every year more difficult to trace, the extent of the original building can still be seen. (p. lxi)

সুরুল গ্রাম সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করিতে গেলে মিঃ জন চিপের কথা স্বভাবতই মনে পড়িয়া যায়।

......The East India Company had a monopoly of the silk industry, and carried on its trade by means of a Commercial Resident. This trade was on a large scale, the sum spent on the mercantile investment in the district during the latter years of the 18th century varying from $4\frac{1}{2}$ to $6\frac{1}{2}$ lakhs; at times the Collcetor was unable to meet the heavy drafts by the Resident on the treasury......

The first Commercial Resident of Birbhum was Mr. John Cheap, who came to India as a member of the Bengal Civil Service in 1782 and held the post of Resident for 4' years. He lived chiefly at Surul, 20 miles from Suri, where his residence consisted of a pile of buildings surrounded by artificial tanks and spacious gardens, encircled by a strong wall, which gave the place a look of a fortress rather than of a privte dwelling. Such, in fact, it was, for sepoys were posted at Surul to guard the factory. Here Mr. Cheap held an unofficial court, the villagers referring their disputes to his arbitration. "Little parties arrived every morning—one bearing a wild beast, and expecting the reward; another guarding a captured dacoit; a third to request protection against a threatened attack on their village; a fourth to procure the adjustment of some dispute about their water-courses or land marks. In such matters the law gave Mr. Cheap no power; but in the absence of efficient courts, public opinion had accorded jurisdiction to any influential person who chose to assume it, and the Commercial Resident's decision was speedy, inexpensive and usually just."

Besides being the medium for investing the Company's money, Mr. Cheap was a great merchant and manufacturer on his own account. He introduced the cultivation of indigo into the district, improved the manufacture of sugar by means of apparatus brought out from Europe, and established a mercantile house, which flourished till about 90 years ago and whose brand till then bore his initials. To Mr. Cheap also the district was indebted for the only good roads it possessed at the beginning of the 19th century, *viz.*, the roads passing from Suri, through Surul, to Burdwan; from Surul to Ganutia; and from Surul to Katwa He died at Ganutia in 1828 at the age of 62, and was buried in the old factory grounds at that place. He was known as "Cheap the Magnificent" and has been immortalized by Sir William Hunter in the Annals of Rural Bengal. 'The whole industrial classes were in his pay, and in his person Government appeared in its most benign aspect. A long unpaid retinue followed him from one factory to another, and as the procession defiled throughout the hamlets, mothers held aloft their children to catch a sight of his palanquin, while elders bowed low before the providence from whom they derived their daily bread. Happy was the infant on whom his shadow fell'.

[District Census Handbooks, Birbhum, 1951 by A. Mitra, p. xii—xiii]

৮। গ্রাম ঃ সুপুর। ১১৩।২৪৮·৫৩।১১৭।৫৭৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ধোপা, শুঁড়ি, নাপিত, কলু, গোয়ালা, শাঁখারী, চামার এবং বাউরী।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বোলপুর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামে যাতায়াতের পাকা রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে শিবদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সবর্জনীন। তিনদিনব্যাপী। উৎসবের শেষদিন সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়।

(ঙ) শিবদুর্গাপূজার মেলা। ফাল্গুন মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে অনাদিলিঙ্গ (সুরথেশ্বর), সংহারভৈরব ও পদ্মাসন নামে তিনটি শিবলিঙ্গ আছে। কথিত আছে, সংহারভৈরবের প্রস্তর মূর্তিটি কালাপাহাড় কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়।

গ্রামটির পূর্বনাম 'স্বপুর'। 'স্বপুর' হইতে গ্রামের নাম 'সুপুর' হয়। কিংবদন্তী আছে, পুরাণে উল্লিখিত রাজা সুরথ রাজ্যহারা হইয়া এইস্থানে আসিয়া তপস্যায় লিপ্ত হন। এই কারণে গ্রামের একটি অংশের নাম 'সুরথেশ্বরতলা' নামে আজিও পরিচিত।

শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য, কৃষিজীবি,
গ্রাম ও পোঃ : রজতপুর,
বীরভূম।

Supur—A village in the Suri subdivision, situated six miles west of Bolpur. There was formerly a French Factory here which was started in 1768, was abandoned in 1774, and was subsequently reoccupied. In 1787, the Magistrate of Birbhum ordered the two Frenchmen in charge of it not to hoist the flag of their nation, and sent an Assistant Collector with orders to see it was taken down. Five years later the Magistrate took possession of the factory when war broke out between England and France, and it was subsequently placed under the control of Mr. Cheap, the Commercial Resident.

Tradition relates that Supur was the residence of a Hindu Zamindar, named Raja Surat, and there is a *lingam* here known as Surateswar, which he is said to have worshipped, and ruins of buildings have been found beneath the surface of the ground. It is further said that he made 100,000 sacrifices to Kali, the place of sacrifice being therefore called Balipur, the modern Bolpur. He is said to have built a palace in the north-west of the village. The legend regarding the Raja is as follows :—In his young days he was cruel and vicious, but one night he had a dream, which made him abandon his evil courses. He dreamt that he came to a waste place covered with bones and there met the ghosts of all who had suffered at his hands, whether men he had killed or virgins he had outraged. He fled in terror, pursued by the grisly crowd, when a goddess appeared and told him that the only atonement for his sin was a life of virtue. The goddess was Durga herself, and to appease her, Surat daily offered bloody sacrifices. When he was about to ascend to heaven, the numberless victims he had slain rose from the dead and barred the way. Durga then appeared and told him that the slaughtered lives called for vengeance, and that he must atone for his crimes before being rewarded for his virtues. At this she vanished, and the victims falling on the Raja beheaded him. After this he entered heaven in peace.

Other legends attach to the names of Iswar Rai and Bhagwan Rai, two skilful physicians, who settled in the village and gathered a thriving community round them. One of the tanks of Supur commemorates the story of a Kulin girl who married one of their descendants. It is said that she went to this tank to bathe, and, as there was

no regular bathing *ghat*, her ankles and feet were covered with mud. Proud of the alliance with a Kulin family, her father-in-law, Gunapati Rai, ordered a *ghat* to be constructed, from which a brick-built pathway ran to his house ; a portion of this pathway still remains. A less pleasing tradition attaches to what is known as the Jakh tank. A descendant of Bhagwan Rai acquired immense wealth, but there was no one to whom it might justly pass. He determined, therefore, to have a boy entombed alive with his treasure, and for that purpose built a spacious mausoleum. He got hold of a fatherless young boy, and on an appointed day led him, after due ceremony, to the tomb in which he had placed his treasure. When the door was about to be shut for ever, the zamindar asked his victim if there was anything in particular he would like to eat. The boy replied that he would like the first thing he saw in the morning. It so happened that the first thing he saw was a young calf, which he asked the zamindar to kill and dress for him. As a Hindu, the latter could not comply with this request and thereupon the disapointed boy invoked terrible curses upon him. The actual spot where the tomb was raised is forgotten, but the villagers associate it with this tank, and those who live round it believe that at times they can hear the implications of the Jak (Sanskrit Yaksha), *i e.*, the spirit of the dead boy.

Another interesting tradition is told about a pious Goswami, named Anand Chand, who spent his life at Supur, exercising spiritual sway far and wide. At that time the Maraths were ravaging the country, and having plundered the neighbouring villages and driven out their inhabitants, they marched on Supur. Anand Chand placed himself at the head of the villagers, who were armed with bill-hooks, which they kept ready for the defence of their homes, The Marathas surrounded the little force, when to their amazement the Goswami appeared in four places at once, mounted on a white charger. Struck with wonder at this miracle, and admiring his courage, the Maratha leader withdrew and granted him a letter insuring the village against any further attack.

Another miracle ascribed to the Goswami is a fallows :– A pious Maulvi, who himself had miraculous powers, hearing of the wonders he wrought, came to see him mounted on a tiger. Though his visitor was a Musalman, the Goswami made him sit on his own bed and bade his servant place a *hookah* between them, saying them that he recognized no distinctions that were not recognized by heaven. No sooner was this done, than both bed and and *hookah* vanished in a flame of fire, and the Maulvi found himself safely sitting on another bed. On his return home, the Maulvi told what had happened, but one of his hearers would not believe. To test the powers of the Goswami, this sceptic went to him bringing pieces of beef as presents. As soon as he offered them to Anand Chand, they were converted into large red lotuses. Anand chand is said to have acquired considerable wealth, because wherever any Vaishnava died without issue, his property passed to the Goswami. He is evidently the same as the Anand Chand referred to in the Essay as a 'Ghussein' who let some land to the French for a factory in 1768."

[District Census Handbooks : Birbhum, 1951 by A. Mitra, p. lx]

৯। গ্রাম : দেউলী (পুরুষোত্তমপুর)।
১০৭।৬৭৫·১৭।১০০।৫২৩

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, মেটিয়া ও বাগ্দী। গ্রামটিতে পালপাড়া, পশ্চিমপালপাড়া, বাগ্দীপাড়া,

মেটিয়াপাড়া, চক্রবর্তীপাড়া প্রভৃতি নামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বোলপুর হইতে মোটর-বাসে রাইপুর নামিয়া সেখান হইতে ইউনিয়নবোর্ডের কাঁচা রাস্তা ধরিয়া দুই মাইল অগ্রসর হইলে দেউলী গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে একযোগে দেউলেশ্বর শিবেরপূজা ও লোচনঠাকুরের তিরোধান উৎসব পালন করা হয়। ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দেউলেশ্বর শিবপূজার মেলা। পৌষ মাসের সংক্রান্তি হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় অঞ্চলে মেলাটি দেউলেশ্বরের স্নানযাত্রার মেলা নামেও পরিচিত।

(চ) গ্রামে দেউলেশ্বর শিব ও পার্বতীর দুইটি পৃথক পাকা মন্দির আছে। শিবমন্দিরটি পুর্বমুখী এবং পার্বতী মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। এই উভয় মন্দিরই ১৭৭৪ শকাব্দে নির্মিত। শিবমন্দিরে কৃষ্ণপ্রস্তরময় বৃহৎ শিবলিঙ্গ এবং পার্বতী মন্দিরে প্রায় ছয় ফুট উচ্চ প্রস্তরময় দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটির গঠনভঙ্গী অতি সুন্দর। বলা হয় দেউলেশ্বর শিবমন্দিরটি বীরভূম জেলা মধ্যে সর্বোচ্চ মন্দির। প্রায় ৫।৬ মাইল দূর হইতে মন্দিরের শীর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামবাসীরা বলেন উক্ত মন্দির দুইটি মুর্শিদাবাদ জেলা নিপুণ কারিগর দ্বারা নির্মাণ করান হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, গ্রামে ভৈরবনাথ কুবের ও মহিষমর্দিনী দুর্গার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

অনেকে বলেন, গ্রামে শিবের দেউল (মন্দির) থাকায় গ্রামের নাম দেউলে অপভ্রংশে দেউলী হইয়াছে। আবার অনেকে বলেন সীমান্তবর্তী পুরুষোত্তমপুরে প্রবল পরাক্রান্ত 'পালবংশে'র বসবাস ছিল। এক সময় অজয় নদীর প্রবল বন্যায় সমগ্র পুরুষোত্তমপুর জলমগ্ন হইয়া যায়। সেই সময় পালেরা নিঃস্ব অবস্থায় এই গ্রামে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন এবং দেউলিয়াগ্রস্থ পালবংশকে কেন্দ্র করিয়াই নাকি গ্রামের নাম 'দেউলিয়া' হয়। দেউলিয়া অপভ্রংশে 'দেউলী' হইয়াছে।

শ্রীসুধীর চন্দ্র রায়, গ্রামসেবক,
রায়পুর ব্লক,
ও
শ্রীঅজিত কুমার সিংহ, শিক্ষক,
গ্রাম : দাঁকুটিয়া,
পোঃ রায়পুর, বীরভূম।

১০। গ্রাম : মুলুক ।১২।১৫৫৪·৬১।২৫৮।১,১৩১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, সদ্গোপ, গোয়ালা, নাপিত, কলু, শুঁড়ি, তাঁতি, গন্ধবণিক, মাঝি, লোহার, বাগ্দী, হাড়ী, ডোম, মুচি, মগ, ময়রা, কোড়া, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামটিতে মিঞাপাড়া, মুসলমানপাড়া, মুচিপাড়া, লোহারপাড়া, মাঝিপাড়া, ময়রাপাড়া প্রভৃতি নামে পনরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বোলপুর হইতে গ্রামে যাতায়াতের পাকা রাস্তা আছে। ইহা ব্যতীত বোলপুর-পালিতপুর পাকা রাস্তায়ও গ্রামে যাওয়া যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, ষষ্ঠীপূজা এবং ধর্মরাজপূজা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে ঝুলন যাত্রা, ভাদ্র মাসে মনসাপূজা, ভাদুপূজা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব ও রাধাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব উপলক্ষে বৈকালে নারিকেল খেলা নামে একটি উৎসব পালন করা হয়। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও বিজয়াদশমীর সন্ধ্যায় ডাকিলা কালীপূজা, কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও গোষ্ঠাষ্টমী উৎসব, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে স্থানীয় 'মণিকুণ্ড' নামে খ্যাত কুণ্ডের জলে স্নান ও রান্না উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত ইন্দ্রদ্বাদশীর দিন ইন্দ্রপূজা ও সূর্য্যপূজা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গোষ্ঠাষ্টমীর মেলা। কার্তিক মাসে সপ্তাহকাল-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পাঁচটি ধর্মরাজ, একটি শীতলা ও তিনটি মনসা ব্যতীত গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে ডাকিলাকালীমন্দির, শিবমন্দির, রামেশ্বরমন্দির, রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ বিগ্রহসহ রাধাকৃষ্ণমন্দির এবং তৎসংলগ্ন নাটমন্দির ও অতিথিশালা আছে। মন্দিরের সম্মুখভাগে সিংহদ্বারের সম্মুখে অপরাজিতাদেবীর বেদী এবং সিংহদ্বারের প্রবেশ পথে বামপার্শে রামকানাই বৈষ্ণব ঠাকুরের আসন এবং সিংহদ্বারের বহির্ভাগ তমালবৃক্ষ আছে। এই গ্রামটি 'গুপ্ত বৃন্দাবনধাম' নামে খ্যাত। জনশ্রুতি আছে পূর্বে গ্রামটির নাম ছিল মল্লিকপুর। প্রবাদ আছে রামকানাই ঠাকুর নামে জনৈক ভক্ত বৈষ্ণব বৃন্দাবন গমনকালে এইস্থানে আসিয়া বহু গরুরপাল এবং রাখাল বালকের সমাবেশ দেখিয়া এবং রাখালদের বংশীধ্বনি শুনিয়া ভাবাবেশে বলিয়া উঠেন—

"যেথায় গরুরপাল আর রাখালগণ,
মধুর মধুর বংশী বাজে সেই তো বৃন্দাবন॥"

এই স্থানকে বৃন্দাবন তুল্য মনে করিয়া রামকানাই ঠাকুর এই স্থানেই রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিসহ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বিগ্রহদ্বয়ের নিত্যসেবাপূজা এবং অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন। রামকানাই ঠাকুরের বাড়ী ছিল জলুন্দি গ্রামে। এই স্থানে আসিবার পর স্থানীয় গোপগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে থাকেন। কথিত আছে বাংলার নবাব জুম্মা খাঁ ওরফে মুলুক খাঁ রামকানাই ঠাকুরকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদা তিনশত লোকজনসহ অকস্মাৎ ঠাকুরের গৃহে আগমন করেন এবং অতিথি হইয়া বসেন। তৎকালে ঠাকুর এক গামলা অন্নভোগ লইয়া নিকটবর্তী জঙ্গলে ভক্তদের মধ্যে পরিবেশন করিতেছিলেন। ঠাকুরের সাহায্যকারী হিসাবে মনোহর দাস নামে জনৈক শিষ্য তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মনোহর দাসের হাতে ছিল মাত্র পাঁচখানি পাতা এবং এক গামলা ভাত। অতঃপর ঠাকুর তিনশত সহচরের মধ্যে ঐ ভাত পরিবেশন করিলেন অথচ গামলার ভাত যেমন ছিল তেমনিই রহিল। এই ঘটনায় নবাব মুলুক খাঁ বিস্মিত হইয়া ঠাকুরের নিকট করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং দেবসেবায় জন্য কিছু নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি জায়গীর দেবার প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু ঠাকুর যবনের দান গ্রহণ করিবেন না বলিয়া এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং তাহার পরিবর্তে তিনি নাম মাত্র খাজনায় নবাবের নিকট হইতে জমি গ্রহণ করেন। এই সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি আছে যে, রামঠাকুর তাঁর পাত্র হইতে এক মুঠা ভাত চারিদিকে ছড়াইয়া দেন এবং ঐ ভাত যতদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে ততদূর পর্যন্ত জমি তিনি নবাবের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। ভাত ছড়াইয়া পাওয়া জমির সীমানা "ভাতুরা" নামে আখ্যয়িত হয় এবং বর্তমানে ইহা একটি মৌজায় পরিগণিত হইয়াছে। ঠাকুর প্রীত হইয়া নবাবকে আশীর্বাদ করেন এবং জুম্মা খাঁ-র পরিবর্তে 'মুলুক খাঁ' উপাধি দান করেন। নবাবও এই উপাধি সাদরে গ্রহণ করেন এবং নবাব তাঁহার উপাধি অনুসারে পবিত্রধামের নাম 'মুলুক' রাখিবার জন্য অনুরোধ জানান। তদাবধি গ্রামটির নাম 'মুলুক' হইয়াছে। আবার অনেকের মতে জুম্মা খাঁ-র সেনাপতি মুলুক খাঁ-র নামানুসারে গ্রামটির নাম 'মুলুক' হয়।

শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
মুলুকঠাকুরবাড়ী,
ও
শ্রীবিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য, কৃষিজীবি,
শ্রীপাট মুলুক,
পোঃ বোলপুর, বীরভূম।

১১। গ্রাম : শিয়ান।১২৯।৮৫৬.২৫।১৮১।৮৪৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বোলপুর হইতে প্রায় চার মাইল পূর্বোত্তরে গ্রামটি অবস্থিত। পাকা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) শিয়ান গ্রামে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। কথিত আছে যে, অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া নিজ কন্যার সহিত বিবাহ দিলে তাঁহার পিতা বিভাণ্ডক মুনি এইস্থান হইতে চলিয়া গিয়া ভাণ্ডারবনে নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানের একটি গুহাকে মুনির আশ্রম ছিল বলিয়া সাধারণের ধারণা। গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনদিনব্যাপী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির স্মৃতি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এখানে মনিকুণ্ড নামে একটি শীতল প্রস্রবন আছে। উত্তরায়ন সংক্রান্তিতে

বহুলোক এই কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকেন। উৎসব উপলক্ষে এইস্থানে একটি সর্বজনীন অন্নসত্রের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মেলা। মাঘ মাসে তিনদিন মেলাটি প্রাচীন।

(চ) জনশ্রুতি আছে, রামায়ণে বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নামানুসারে গ্রামের নাম হয় "শৃঙগান"। পরবর্তীকালে 'শৃঙগান' অপভ্রংশে 'শিয়ান'-এ পরিণত হইয়াছে।

শ্রীগণপতি ঘোষ, কৃষিকার্য,
গ্রাম : শুৎবাজার,
পোঃ শিয়ান, বীরভূম।

১২। গ্রাম : বাহিরী।১৪০।২,৫৪৯ ৫৪।৫৪৫।২,৭০৪

(ক) হিন্দু। গ্রামটিতে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বোলপুর হইতে গ্রামটির দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াতের রাস্তাটি পাকা।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত গোপালঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গোপালঠাকুরের মেলা। মাঘ মাসে পাঁচদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গোপালমন্দির আছে। জনশ্রুতি আছে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু একদা বক্রেশ্বর যাইবার পথে এইস্থানে বিহার করেন। সম্ভবতঃ এই কারণে গ্রামের নাম হয় বিহারী। 'বিহারী' অপভ্রংশে 'বাহিরী' হইয়াছে।

শ্রীঅম্বুজাক্ষ চৌধুরী, কৃষিকার্য,
গ্রাম : বাহিরী, বীরভূম।

১৩। গ্রাম : নাহিনা।১৬১।৫৩৮·১০।২৬৬।১,৪৭৩

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, সদ্গোপ, কামার, কুমার, ছুতার, তিলি, মুচি, মেটে, গড়াই, হাড়ী, মগ, ধোপা, নাপিত, গোয়ালা, মোদক ও মুসলমান। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, কুমারপাড়া, সদ্গোপপাড়া, মুচিপাড়া, গোয়ালপাড়া, মেটেপাড়া, হাড়ীপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বোলপুর হইতে পালিত-পুর রোডে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মরাজপূজাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিন। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজমন্দির এবং মহাপ্রভুরমন্দির আছে। ধর্মরাজমন্দিরে ধর্মরাজশিলা ও মহাপ্রভুর মন্দিরে গৌরাঙ্গ-দেবের দারুময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, পূর্বে গ্রামটির নাম ছিল 'হেয়াতপুর'। বাংলা ১২৮০ সনে এই গ্রামটিতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়া যায়। পরে এইস্থানে নূতন বসতি গড়িয়া উঠিলে গ্রামের নাম হয় 'নাহিনা'।

শ্রীসুধীর কুমার অধিকারী, জি. টি. শিক্ষক,
আংশিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়, নাহিনা,
পোঃ সিঙ্গি, বীরভূম।

১৪। গ্রাম : সিঙ্গি।১৬৩।২,০২৭·৭৪।৫৪৭।২,৮৯৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, সদ্গোপ, কামার, ছুতার, উগ্রক্ষত্রিয়, তাঁতি, তিলি, স্বর্ণকার, নাপিত, বেনে, জেলে, মুচি, বাগ্দী, হাড়ী, ময়রা, শুঁড়ি, ডোম, বাউরী, গোয়ালা, কোল, সাঁওতাল, কোটাল ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বোলপুর হইতে গ্রামটি প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত। বোলপুর-পালিতপুর রোডে মোটরবাসে করিয়া প্রায় সাত মাইল দূরে মনসাত গ্রামে নামিয়া সেখান হইতে প্রায় তিন মাইল মেঠো পথে হাঁটিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে দিদিঠাকরুণ-পূজা ও হরিনামসংকীর্তন মহোৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজ-পূজা, দশহরা এবং দশহরার তিনদিন পূর্ব হইতে কটারায়

ধর্মপূজা ও মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে ভাদুপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং মহানবমীর দিন বৈকালে স্থানীয় সিংহেশ্বরী নামে খ্যাত দেবীরপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব, চৈত্র মাসে রামনবমীতিথিতে রঘুনাথ গোস্বামীর আবির্ভাব উৎসব এবং একাদশীতিথি হইতে পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত দেড়পোয়া গোস্বামীর আবির্ভাব উৎসব ও ঘেঁটু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামের ভাদু উৎসবটি প্রধানতঃ বাগ্দীপাড়ার যুবকগণ কর্তৃক এবং ঘেঁটুগান উৎসবটি প্রধানতঃ ডোম ও বাগ্দী সম্প্রদায়ভুক্ত যুবকগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্রমাসব্যাপী প্রতিদিন সন্ধ্যায় মাদল বাদ্য সহকারে ঘেঁটুগান গাহিয়া গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় পরিক্রমা করা হয়।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে নয়দিনব্যাপী।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে চার-পাঁচ-দিনব্যাপী। প্রথম মেলাটি বাংলা ১৩৭২ সন হইতে হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বর্তমানে দোলযাত্রার মেলাটি সরকারী উদ্যোগে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী মেলায় পরিণত হইয়াছে।

(চ) গ্রামে দুইটি ধর্মরাজমন্দির, একটি মনসামন্দির, দিদিঠাকরুণেরমন্দির ও মহাপ্রভুমন্দির ব্যতীত সাধক ভাগ্যদাস এবং- দেড়পোয়া গোস্বামীর সমাধিস্থান আছে।

জনশ্রুতি আছে, গ্রামটি পূর্বে অজয়নদীর উত্তর-তীরে অবস্থিত ছিল। অজয়নদী কালক্রমে উহার গতিপথ পরিবর্তন করিয়া বর্তমানে গ্রামটির দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পুরাতন গতিপথের চিহ্ন গ্রামের মধ্যে অদ্যাপি বিদ্যমান এবং উহা কানা অজয় নামে পরিচিত। আরও জানা যায়, সিঙ্গি, রাধাকৃষ্ণপুর, জোত জয়রামপুর শ্যামসুন্দরপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম লইয়া বর্তমান 'সিঙ্গি' গ্রামের উৎপত্তি।

কিংবদন্তী আছে যে, গ্রামটি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রামের দক্ষিণ-প্রান্তে কানা অজয়ের উত্তরদিক দিয়া একটি রাস্তা বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উক্ত রাস্তাটি 'শারিফা' সড়ক নামে খ্যাত। জনশ্রুতি আছে, সম্রাট শাজাহান উক্ত সড়ক দিয়া তাঁহার সেনাবাহিনীসহ গিয়াছিলেন। গ্রামের মধ্যে ঐতিহাসিক নিদর্শনের কয়েকটি ধ্বংসাবশেষ এবং 'রাজার ঢিবি' বা 'ঠাকুরের ঢিপি' নামে খ্যাত একটি ঢিপি আছে। এইস্থানে পুকুর খননকালে একটি কৃষ্ণপ্রস্তরময় লক্ষ্মীনারায়ণমূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। উক্ত মূর্তিটি গ্রামের শ্রীপ্রদ্যোত কুমার মণ্ডল মহাশয়ের বাটীতে রক্ষিত আছে। আরও জানা যায় যে, ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা আক্রমণকালে গ্রামের শীল পরিবারের গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ লাঞ্ছিত হয় এবং তাঁহারা কোন উপায়ন্তর না দেখিয়া রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহসহ গ্রামের 'শীলের দীঘি' নামক পুষ্করিণীতে আত্মগোপন করেন। এই পুষ্করিণীটি আজও দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা আসলে জনৈক প্রতিপত্তিশালী মুসলমান কর্তৃক খনিত হইয়াছিল বলিয়াও শুনা যায়।

মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে যাইয়া শ্যামাপদ চক্রবর্তী এবং বাবু নামে জনৈক মুসলমান ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে অনেক গ্রামবাসী শহীদের মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। গ্রামে একটি শহীদবেদী ব্যতীত বাবু শহীদের একটি পৃথক সমাধিস্থান আছে। বর্তমানে উক্ত স্থানটি 'বাবু শহীদের স্থান' বলিয়া পরিচিত। 'লড়াইয়ের চক্' নামে খ্যাত স্থানটি গ্রামবাসী ও মারাঠা শত্রুর মধ্যে যুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সিংহেশ্বরীদেবীর নামানুসারে গ্রামের নাম সিংহী, অপভ্রংশে 'সিঙ্গি' হইয়াছে।

শ্রীসুধীর কুমার অধিকারী, শিক্ষক,
গ্রামঃ নাহিনা, পোঃ সিঙ্গি
ও
শ্রীপ্রদ্যোত কুমার মণ্ডল শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ সিঙ্গি বীরভূম।

শান্তিনিকেতন

বোলপুর বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি শহর এবং বাণিজ্য কেন্দ্র বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। হাওড়া হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৯৯ মাইল। পূর্ব রেলপথে এই স্থানেই একটি রেলস্টেশন আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম শান্তিনিকেতনের জন্য বোলপুরের নাম আজ জগৎ বিখ্যাত। বোলপুর রেলস্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে শান্তিনিকেতন আশ্রম ও 'বিশ্বভারতী' শিক্ষায়তন অবস্থিত। পূর্বে এইস্থান অনুর্বর প্রান্তর ছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এইস্থানের নির্জনতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ১২৬৯ সনের ১৮ই ফাল্গুন রায়পুরস্থিত প্রতাপ নারায়ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে আনুমানিক প্রায় কুড়ি বিঘা জমি ক্রয় করিয়া সেইস্থানে বাগান এবং শান্তিনিকেতন নামে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করান। কালক্রমে উক্ত অট্টালিকার নামানুসারেই সংলগ্ন অঞ্চলের নাম 'শান্তিনিকেতন' হইয়াছে। বোলপুর, বাঁধগড়া, সুরুল, বল্লভপুর, গোয়ালপাড়া, বয়রাডিহি, শ্যামবাটী, মধুসূদনপুর এবং তালতোড় মৌজাগুলির অংশবিশেষ লইয়া বর্তমান 'শান্তিনিকেতনে'র উৎপত্তি। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা সর্বসাধারণের ঈশ্বর আরধনার জন্য উৎসর্গ করেন। মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম অনুগামী ও একেশ্বরোপাসক ছিলেন। তিনি এইস্থানে যে-দুইটি ছাতিম (সপ্তপর্ণ) গাছের তলায় বসিয়া ধ্যান ও আরাধনা করিতে ভালবাসিতেন তাহা আজিও বর্তমান আছে। এইস্থানে একটি মর্মর প্রস্তরে মহর্ষির নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি উৎকীর্ণ আছে—

"তিনি
আমার প্রাণের আরাম
মনের আনন্দ
আত্মার শান্তি।"

১৯০১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাম দিয়া সম্পূর্ণ নূতন রূপে এখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহের ন্যায় শহরের কোলাহল ও কৃত্রিমতা হইতে দূরে মুক্ত আকাশের তলে স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে যাহাতে সহজে স্বাধীনভাবে ছেলে মেয়েরা গড়িয়া উঠিতে ও শিক্ষালাভ করিতে পারে ইহাই হইল কবির স্বপ্ন ও সাধনা। যতদূর সম্ভব এখানে খোলা আকাশের তলে মুক্তবায়ুতে উদ্যানের মধ্যে অধ্যাপনা করা হয়। প্রতিষ্ঠার একাগ্র সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে বিদ্যালয়টি বড় হইয়া উঠে এবং পৃথিবীর নানাস্থানের মনীষী ও চিন্তাশীল বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে কবি এই বিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ও পুনর্গঠন করিয়া বিশ্বভারতী নাম দিয়া একটি সত্যকার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা বিষয়ে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সহিত অনুশীলন ও গবেষণা করা এবং তাহাদের ঐক্য ও মিলনের সাহায্যে জগৎ হইতে আন্তর্জাতিক হিংসা ও বিদ্বেষ নির্মূল করিয়া মানবতার বিজয় গৌরব ঘোষণা করা। এখন এই শিক্ষায়তনে শিশু শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চস্তর গবেষণার নানারূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। পাঠভবন (স্কুল), শিক্ষাভবন (কলেজ), কলাভবন (আর্ট স্কুল), সঙ্গীতভবন, বিদ্যাভবন, গবেষণা মন্দির ও নিকটস্থ সুরুল গ্রামে শ্রীনিকেতন (আদর্শ পল্লীগঠন ও কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষাকেন্দ্র) প্রভৃতি বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ। সুরুলে পূর্বে ইংরেজদের একটি কুঠি ছিল। এখানকার প্রথম কুঠিয়াল শ্রীযুত জন্ চীপ ৪১ বৎসর কাল সুরুলে অবস্থান করিয়াছিলেন। সাধারণ শিক্ষার জন্য বিশ্বভারতীর আদ্য, মধ্য ও অন্ত পরীক্ষার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ, আই-এস-সি ও পরীক্ষার ব্যবস্থাও এখানে আছে। ইহা ছাড়া চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত, ভারতীয় নৃত্য, কৃষিবিদ্যা, বয়নশিল্প প্রভৃতির ব্যবস্থাও আছে। শান্তিনিকেতনে পৃথক ডাক ও তারঘর, বিজলী-আলো, জলের কল ও ছোট একটি হাসপাতাল আছে। এখানে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থাগার, বালকদের জন্য অনেকগুলি ছাত্রাবাস ও বালিকাদের জন্য শ্রীভবন নামে একটি সুন্দর ছাত্রীনিবাস আছে। বিশ্বভারতীর খ্যাতি আজ সমগ্র বিশ্বব্যাপী।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী, চীন, জাপান, ইরান প্রভৃতি বহু দেশের মনীষী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সূত্রে আগমন করিয়াছেন। শান্তিনিকেতন শুধু বাংলার বা ভারতের নহে, সমগ্র এশিয়ার গৌরবস্থল।

বোলপুর হইতে ভারতীয়গণের মধ্যে প্রথম প্রাদেশিক শাসনকর্তা লর্ড সিংহের জন্মস্থান রাইপুর যাইতে হয়। পার্শ্ববর্তী পল্লী সুপুরের সুরথ রাজার পূজিত বলিয়া কথিত সুরথেশ্বরশিব বর্তমান। প্রবাদ সুরথ রাজার চণ্ডিকার নিকট লক্ষ বলি প্রদান করিলে এইস্থানের নাম হয় বলিপুর। বোলপুর নাম বলিপুর হইতে হইয়াছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

বর্তমানে প্রায় সর্বসম্প্রদায়ের লোকজনই এইস্থানে বসবাস করেন। শান্তিনিকেতনকে প্রধানতঃ কয়েকটি পল্লীতে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন, গুরুপল্লী, শ্রীপল্লী, মধ্যপল্লী, পূর্বপল্লী, দক্ষিণপল্লী, উত্তরপল্লী ও সেবাপল্লী। কৃষিকার্য, শিল্প, ব্যবসায় ও চাকুরী স্থানীয় অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। বোলপুর রেলস্টেশন হইতে সিউড়ীগামী মোটরবাসে অথবা সাইকেল রিক্সায় শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করা যায়।

প্রতি বৎসর পৌষ মাসের ৭ই হইতে ১০ই পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বভারতীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উহা ১২৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে শুরু হইয়াছে এবং ইহা একটি আঞ্চলিক সর্বজনীন উৎসব। প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি হইতে পাঁচদিনব্যাপী এইস্থানে একটি মেলা বসে। মেলাটি ১৩০৩ বঙ্গাব্দ হইতে বসিতেছে। ইহা ভিন্ন, অতি সম্প্রতি বোলপুর ডাকবাংলার মাঠে একটি মেলা বসিতেছে। স্থানীয় লোকজনের আতসবাজী প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করিয়া এই মেলার প্রচলন। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা ও আতসবাজী প্রতিযোগিতা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলার বিস্তারিত বিবরণী যথাক্রমে বিশ্বভারতীর শ্রীযুত নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য ও বোলপুর কলেজের শ্রীরবি দাস মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত বিবরণী 'মেলা বিবরণী' অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা হইল।

Bolpur — A town in the south-east of the Suri Subdivision, with a railway station on the Loop Line of the Eastern Indian Railway. Population (1951) 14,802. The village contains a police thana, sub-registry office and high school, and is the chief rice-exporting centre in the district. The village of Supur close to Bolpur is said to have been the seat of Raja Surat, who made 100,000 sacrifices to Kali ; and it has been suggested that that the name Bolpur is derived from *bali* and *pur*, meaning a place of sacrifice

L. S. S. O'Malley in 1910 wrote as follows :—At Bhubandanga, a mile to the west, is a Brahmo Samaj building known as the Santiniketan *i. e.*, abode of peace of Bolpur, which js associated with the life of the great Brahmo leader Devendra Nath Tagore. It is described as follows by Mr. J. C. Oman in the *Brahmans, Theists and Muslims of India* (1907, pp. 114—15). "To a spot, situated about a mile from the Bolpur station of the East Indian Railway, now known as the Santiniketan of Bolpur, Devendra Nath was wont to retreat in order to hold communion with God, in other words to practise *Yoga*. He used to pitch a tent there and give himself up to religious meditation in the shade of a particular tree. Eventually he secured about six and a-half acres of land, built a dwelling-house on it, and, later on, a chapel and a *Brahmo Vidyalaya* or school. 'The sanctuary or chapel is a marvellous edifice,' says a pious Bengali pilgrim. 'The roof is tiled, but the enclosure is of glass, some painted and some coloured. The Crystal Palace London, is a glass house. We have not heard of any other house besides it made of glass. Although in magnitude the Santiniketan sanctuary cannot be compared with the famous Crystal Palace, it gives the people some ideas as to what sort of edifice the latter is. It undoubtedly is an attraction to the villagers, who come to see it in large

numbers. This glass hall is about 60 feet long and about 30 feet broad. The pavement is of white marble. There are suitable inscriptions in it in Sanskrit. It has four gates from four sides of the garden. Towards the eastern gate, there is a beautiful portico with a tower over it, and the word OM in Bengali, like the figure of the cross in Christian churches, flourishes over the topmost pinnacle. Suitable inscriptions, both is Sanskrit and Bengali, are inscribed on beautiful pedestals for flower vases, and placed at the approach to the holy place. There is a beautiful artificial fountain, which plays on special occasions, and on the two pillars near it are stuck two large pieces of marble, the one bearing an inscription in Sanskrit and the other in Bengali, describing the blessedness of heaven—of which the place assuredly is the foreshadow.'

"In the chapel described as above by a devout Bengali admirer, religious services are held regularly twice a day, in accordance with the liturgy of the Adi Brahman Samaj by a Brahman appointed for the purpose. Within the precincts of the Santiniketan animal food is interdicted. There is a holy of holies in the sanctuary, the spot where Debendra Nath used to practise *Yoga* under a great *Chattim* tree. Here stands a small elevated seat made of white marble—the *Vedi*—upon which, lost in contemplation, the minister used to hold communion with God. The *Vedi* is deemed so sacred, that no one but the Master has ever presumed to occupy it. The *Chattim* tree at Bolpur is in the belief of Debendra Nath's followers destined to become in after years as famous as the Bodhi tree at Bodh Gaya, which some four-and-twenty centuries ago witnessed Gautama's great temptation and his final triumph over Mara the Evil One."

Debendra Nath Tagore gave the Santiniketan an endowment for the purposes of a hermitage, where all are welcome to spend a few days in peaceful retirement, free of cost, provided that animal food and alcoholic drink are not consumed on the premises. In addition to this endowment, he bequeathed a considerable amonut for expenditure by trustees on the up-keep of the institution. There is also at this place a school called the Brahmo Vidyalaya, which was founded by the poet Rabindra Nath Tagore; it is a boarding school, to which both Brahmos and non-Brahmos are admitted. Its object is to impart a sound education in a religious and good moral atmoshere, and it is conducted on the old Hindu ascetic lines, the ideal being "high thinking and plain living," its standard is up to the matriculation examination of the Calcutta University, to which, however, it is not affiliated.

A brief account is necessary of the growth of Visva-Bharati University.

Visva-Bharati grew out of Santiniketan Asram founded by Rabindra Nath Tagore's father, Maharsi Debendra Nath, in 1863. In 1901 an experimental school was started at Santiniketan by Rabindra Nath Tagore with the object of providing for a limited number of children of the new generation an education which would not be divorced from nature, where the pupils could feel themselves to be members of a large community and where they could learn and grow in an atmosphere of freedom, mutual trust and joy. Since 1921 Santiniketan has been the seat of Visva-Bharati, an international university seeking to develop a basis on which the cultures of the East and the West may meet in common fellowship. Visva-Bharati has recently been incorporated as a

University by Act xxxix of 1951 of the House of the Peoples.

The University has an all-India complexion with students and teachers drawn from all over India. What is more, it draws lecturers and scholars from abroad. It is a residential university with extensive grounds and hostels: the campus is one of the most beautiful in the East. Besides a Central General Library there are sectional libraries attached to various departments. The university has several wings called, Patha-Bhaban (School section) providing instruction up to High School certificate, Siksha-Bhaban (College section) providing instruction up to B. A. standard. Vidya Bhavan (College of Post Graduate Studies and Research) mainly concerned with Indological studies, Vinaya-Bhaban (College of Teaching) providing instruction for the degree of B. T., Cheena-Bhaban (Institute for Sino-Indian Studies and Research), Kala-Bhaban (College of Fine Arts and Crafts), Sangita-Bhaban (College of Music and Dance) and Hindi-Bhaban (Institute of Hindi Studies and Research).

The Sri-niketan, adjacent to Santiniketan, an institute aimed at rural reconstuction, was really started in February 1922 with L. K. Elmhirst and Rathindra Nath Tagore. The aim of the institution was (a) to win the friendship and affection of villagers and cultivators by taking a real interest in all that concerns their life and welfare and by making a lively effort to assist them in solving their most pressing problems; (b) to take the problems of the village and the field to the class room for study and discussion and to the exprimental farm for solutions; (c) to carry the knowlege thus gained back to the villager in an endeavour to improve their sanitation and health, to develop their resources and credit; to help them to sell their produce and buy their requierements to the best advantage; to teach them better methods of growing crops, vegetables and of keeping livestocks; to encourage them to learn and practise arts and crafts; and to bring home to them the benefits of associated life, mutual aid and common endeavour.

Work started in 1922 with only three villages. The Centre now benefits eighty-five villages in the district of Birbhum, comprising an inner ring or 'intensive area' and an outer ring or 'extensive area'. The objects of impovement are agriculture, animal husbandry; health and sanitation, rural industries, education, village organisation, co-operatives and economic survey and economic research.

(District Handbooks, Birbhum, 1951 by A. Mitra, p. lv-lvi)

শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসব

শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসব সমগ্র বংলার নয়, সমগ্র ভারতবাসীর উৎসব বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত। এই উৎসব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবসকে এবং বিশ্বভারতীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া একযোগে অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই পৌষ হইতে ১০ই পৌষ পর্যন্ত নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিন অর্থাৎ ৭ই পৌষ প্রত্যূষে মন্দিরে উপাসনা করা হয়। মন্দিরে কোন মূর্তি নাই, নির্বিকার ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করা হয়। উপাসনা-স্থলে যাইতে জাতিধর্মের কোন বাধা বা বিধিনিষেধ নাই; বিশ্বভারতীর আবাসিক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলী সকলে উপাসনায় অংশগ্রহণ করেন। ৮ই পৌষ বিশ্বভারতীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে বিশ্বভারতীর আচার্য ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র দান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতার পর হইতে ভারতের প্রধান মন্ত্রীই বিশ্ব-ভারতীর আচার্য পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। এইদিনে

বাজী পোড়ান হয় এবং বহুসংখ্যক দর্শকের সমাগম হয়। ৯ই পৌষ বুদ্ধ স্মরণোৎসব এবং ১০ই পৌষ প্রত্যুষে খৃষ্ট স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা ১৩৬৪ সনে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত পৌষ উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী হইতে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠানের আড়ম্বরের কিছুটা আন্দাজ করা যায়। এই উৎসবের প্রথমদিন অর্থাৎ ৬ই পৌষ রাত্রি নয় ঘটিকায় 'বৈতালিক' অনুষ্ঠান, দ্বিতীয়দিনে শান্তিনিকতনের ছাতিমতলা, বকুলবীথি, মেলা প্রাঙ্গণ প্রভৃতি স্থানে দিবাভাগের বিভিন্ন সময়ে বৈতানিক, সানাই, উপাসনা, বিশ্বভারতীর পরিষৎ-এর কীর্তনগান, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র সম্মিলন, সিনেমা, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলির পর এই দিনের উৎসবের সমাপ্তি। ৮ইপৌষ অর্থাৎ তৃতীয়-দিনে আম্রকুঞ্জে, মেলা প্রাঙ্গণে, 'উদয়ন' ও পূর্বপল্লী নামক স্থানে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি নয় ঘটিকা পর্যন্ত সানাই, সমাবর্তন উৎসব, কবিগান, বিশ্বভারতী সংসদ সম্মিলন, সিনেমা, বাজি পোড়ান, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পর এইদিনের উৎসবের সমাপ্তি হয়। ৯ই পৌষ অর্থাৎ উৎসবের চতুর্থদিনে আম্রকুঞ্জে, 'উদয়ন' নামক স্থানে এবং মেলা প্রাঙ্গণে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিকাল পর্যন্ত পরলোকগত আশ্রম বন্ধুদের স্মৃতিবাসর, আশ্রমিক সংঘের বার্ষিক অধিবেশন, সাঁওতালদের নাচ খেলাধুলা, প্রাক্তন ছাত্র সংঘের বার্ষিক অধিবেশন, লোক-সংগীত, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ১০ই পৌষ অর্থাৎ উৎসবের শেষদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় যীশু খৃষ্টের স্মরণোৎসব এবং তাঁহার আত্মার শান্তিকামনার পর উৎসবের সমাপ্তি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সাধু-সন্ন্যাসী, আউল-বাউল প্রভৃতির সমাবেশ হয়।

শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসব সম্পর্কে জনৈক দর্শক শ্রীকৃষ্ণ ধর তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ তুলে ধরেছেন। ইং ২৩.১২.৫৯ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য়। নিম্নে উহা হুবহু উদ্ধৃত করা হইল :—

কতবার যে গেছি, তবু প্রতিবারই মনে হয় সবটুকু জানা হোল না। অশেষের ধর্মই এই। মাঝ রাতে বোলপুর ষ্টেশনে এসে গাড়ি থামবে। বীরভূমের শীত, কলকাতার তুলনায় একটু বেশিই। যাত্রীরা নামলেন। এই পৌষ মেলার যাত্রীদের দেখলেই চেনা যায়। কেমন জানি তীর্থযাত্রীর মতো চেহারা। দূর দূর গ্রাম থেকেও কতো লোক এসেছে। তাঁরা মেলায় যাবেন। নানান পসরা সাজিয়ে বসবেন। মেলা জমজমাট হয়ে উঠবে। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা, আমাদের বাংলাদেশে, এখন একটা বার্ষিক জাতীয় উৎসবের চেহারা নিয়েছে। একে বাদ দিয়ে শান্তিনিকেতনের পুরো রূপটা যেন আমরা আজ আর ভাবতেই পারি না।

শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গুরুদেবের পিতা। যিনি মহর্ষি। বীরভূমের এই রুক্ষ প্রান্তরে ছাতিম গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় তিনি লাভ করেছিলেন প্রাণের আরাম, মনের শান্তি, জীবনের পরিপূর্ণতা। তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। মহর্ষির পর এর দায়িত্ব নিলেন রবীন্দ্রনাথ। যে আশ্রম ছিল ছোট্ট, মাত্র কয়েকজন ব্রতী বালক নিয়ে যার সুরু, ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের বিস্মিত করস্পর্শে সে আশ্রম বড়ো হোল, নাম নিল বিশ্বভারতী। যত্র বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম্। যেখানে সারা পৃথিবী এক নিলয়ে সমধর্মী, আপন মনের যোগে পরস্পর সংযুক্ত। শান্তিনিকেতনের ঐশ্বর্য তার হৃদয়ের, তার প্রাণসত্তার। বাইরের দৃষ্টিতে দেখলে, ট্যুরিস্টের চোখে এমন কী সৌন্দর্য তার মনে লাগবে। বীরভূমের গেরুয়া মাটিতে সবুজ তৃণদলও তেমন নেই, বাংলাদেশের যে শস্যশ্যামলতার বন্দনা রবীন্দ্রনাথ করে গেছেন, বীরভূম তার ব্যতিক্রম। দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসীর মতো অবারিত প্রান্তর যেন ধ্যানমগ্ন। ছাতিমের ছায়া, আম্রকুঞ্জের স্নিগ্ধ শীতলতা আর ক্ষীণতনু কোপাইয়ের তীরে শর আর কাশের বন, এই তো শান্তিনিকেতনের ছবি। তারই মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে গড়া মাটির কুটির, ক্ষুদ্রের মধ্যে একদিন যেখানে মহতের সাধনা সুরু হয়েছিল। আজকের শান্তিনিকেতন সেই মহতের অঙ্গীকার অঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বিস্মিত দৃষ্টিতে, শ্রদ্ধানতচিত্তে সেই মহৎকে দেখবার জন্য শান্তিনিকেতনে তীর্থযাত্রা করে ধন্য হই।

সাতই পৌষ শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে তিন দিন ধরে এই উৎসবের আয়োজন। প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে এই দিনটিতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক ধ্যানতন্ময় মুহূর্তে বীরভূমের এই প্রান্তরে পরম সত্যের সান্নিধ্যে গিয়ে পৌঁছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকরা তাঁদের প্রতিবেশী সরলপ্রাণ সাঁওতাল গ্রামবাসীদের হৃদয়ের ভিতরে আসন নিক। শান্তিনিকেতন বীরভূমের গ্রামবাসীদের আপন হোক। এই উদ্দেশ্য নিয়েই শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা উৎসবের সময়ে এই মেলার প্রবর্তন। রবীন্দ্রনাথের সত্যদৃষ্টি এই মেলার মাধ্যমেই বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের পরিচয়কে নিবিড় করতে চেয়েছিলেন। মেলা বাঙালীর চির চেনা, চির জানার আনন্দোৎসব। আমরা মহতের স্মৃতিকে মেলার মধ্যে অবিস্মরণীয় রেখেছি। এই বীরভূমেই কেন্দুলিতে জয়দেবের মেলার কথা মনে পড়বে। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলাও যে একদিন গুরুদেবের মেলা নামে লোক প্রসিদ্ধি লাভ করবে না, কে বলতে পারে।

আজ বিশ্বভারতী রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু একদিন তাকে উপেক্ষায়, খ্যাতির অন্তরালে নেপথ্য-সাধনা করতে হয়েছে। সেই নিঃসঙ্গ দিনের ইতিহাস আজ হয়তো অনেকে বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের প্রতিটি তৃণদল সে দিনের তপশ্চর্যার নীরব সাক্ষী। ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তিনি বেরোননি। নিজের শ্রমে, কর্মে ও কল্যাণব্রতে শান্তিনিকেতন দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল, অর্জন করেছিল ভালবাসা। তপোবনের আদর্শে শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা ত এ যুগের দ্রুতগতির সঙ্গে থাপ খাওয়ানো বিশ্বভারতীর নতুন কর্তৃপক্ষের পক্ষে দুঃসাধ্য পরীক্ষা মনে হতে পারে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ছায়াঘন শালবীথিতে, আম্রকুঞ্জের নীল নির্জনে শিক্ষার যে সূত্রপাত তিনি করেছিলেন তার সঙ্গে আমাদের নিজস্ব চেতনা, নিজস্ব ভাবনার অন্তরযোগ ছিল। শান্তিনিকেতনে বহু বছর আগে থেকেই আমরা বিশ্ববাসীরূপে একত্র বাস করতে শিখেছি। ভাষা কিংবা জাতি, শাদা কিংবা কালো, এশীয় কিংবা ইয়োরোপীয় কোনো প্রভেদ সেখানে তিনি রাখেননি। আজকের এক পৃথিবীর স্বপ্নের পুরোগামী দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ স্মারকসৌধ। পৌষ মেলার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনকে সাধারণ মানুষের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। মেলার তিন দিন শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণ জনসাধারণের জন্যেই থাকে উন্মুক্ত। ভুবনডাঙ্গার মাঠে গোরুর গাড়িগুলো মাথা গুঁজে পড়ে থাকে, দলে দলে নারী-পুরুষ গ্রামবাসীরা মেলা দেখতে আসে। যাত্রা, কবিগান, কীর্তন, বাউল, সার্কাস, সিনেমা সমস্ত আয়োজন পূর্ণ। কবির স্মৃতিপূত শান্তিনিকেতনের পথে-ঘাটে হাজার মানুষের চরণ চিহ্ন পড়ে। তখন ইস্কুল ছুটি। ছেলেরা, মেয়েরা স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব নিয়ে মেলার উদ্যোগ, আয়োজন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে। সঙ্গীতভবন, সিংহ-সদন, বিনয়ভবন, শ্রীসদনগুলো প্রাক্তন ছাত্র, ছাত্রী ও অতিথিদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। মনে হয় যেন আত্মীয় বাড়ীতে এসে ছুটি যাপন করছি। ভোর হ'তে না হতেই বৈতালিক দল মেলা প্রাঙ্গণের পথে পথে ঘুরে গান গেয়ে সকলের সুপ্তি ভাঙাবে। সে গান প্রার্থনার মতো উঠবে আকাশে, শীতার্ত রাত্রির শেষ আমেজটুকু যাবে মিলিয়ে। কানে আসবে সমবেত কণ্ঠের সুর: 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে।' সে গান একটা সুরের শরীর নিয়ে বিচরণ করবে অনেকক্ষণ, গান থামলেও জেগে থাকবে তার রেশ। প্রভাতী সঙ্গীতের পর উপাসনাগৃহে মহর্ষির স্মৃতির উদ্দেশ্যে, কখনো বা ছাতিমতলায় বসবে প্রার্থনা। যিনি আনন্দরূপে বিরাজমান, সেই পরম একের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উঠবে সমবেত প্রার্থনা সঙ্গীত। সমস্ত বিশ্ব-মানবের জয়ে এ প্রার্থনা উঠবে আকাশে। প্রেমের জন্য, মৈত্রীর জন্য, ভালবাসার জন্য। পৌষ উৎসবের প্রধান অঙ্গ হলো সমাবর্তন। বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের এই সময়ে দেওয়া হয় পরীক্ষার কৃতিত্বের অভিজ্ঞানপত্র। আম্রকুঞ্জে সুসজ্জিত বেদীতে বসে একদিন গুরুদেব স্বয়ং সস্নেহ আমন্ত্রণ জানাতেন তাঁর ছাত্রদের। ছাতিমের পাঁচটি পর্ণপুট ও মঙ্গল চন্দন-টীপ সমাবর্তনের অভিজ্ঞান। ৮ই পৌষ বড়দিন। শান্তিনিকেতনে এইদিনটিতে পালিত হবে খৃষ্টোৎসব। মানুষের মুক্তির জন্য যীশু একদিন আপন রক্তে পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করে গিয়েছিলেন।

যীশুর এই পবিত্র আবির্ভাব দিনটি শান্তিনিকেতনে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা হয়। কবিগুরু খৃষ্টোৎসবের জন্য গান লিখেগেছেন। আশ্রমিকরা সেই গান গেয়ে খৃষ্টের আবির্ভাবকে স্বাগত জানায়।

এই সমস্ত অনুষ্ঠানের বাইরে কান পাতলে শোনা যাবে আর এক চকিত কোলাহল। তীর্থযাত্রিদের মতোই পৌষমেলায় আগত হাজার নরনারীর চোখে-মুখে এক বিব্রত বিস্ময়। বাউলরা এসে কবে থেকে ধূনো জ্বালিয়ে বসেছে বুড়ো বটের গোড়ায়। অবিরাম চলেছে তাদের গান। শ্রোতারা অবাক হয়ে শুনছে। গুপীযন্ত্রে সুর উঠছে পঞ্চমে: 'শুক তুমি কৃষ্ণ বলো না। আমি কৃষ্ণ নাম আর শুনতে পারি না। শুক তুমি কৃষ্ণ বলো না।' সে কি আবেগ-গলানো সুর। বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে বাউলরাই শান্তিনিকতনের সঙ্গে একাত্ম। উদয়নের সামনে বাউলটিকে বারবার প্রশ্ন করেছিলাম, এখানে কী জন্যে আসো তোমরা? সশ্রদ্ধ একটি প্রণামে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে সে বিনা দ্বিধায় বলেছিল: তিনি যে আমাদের বাউল-রাজা। আমরা তো রাজদর্শনে আসি। কথাটা আমাকে তোলপাড় করেছিল। সাঁইথিয়ার কোন গ্রামের বাউল যাকে রাজা মনে করে, তিনিই তো চিরকালের কবি। আমরা, ভারতবর্ষে, এভাবেই তো মহাকবির স্মৃতিকে, তাঁর রচনাকে লোকমুখে যুগ থেকে যুগান্তরে বাঁচিয়ে রেখেছি উত্তরকালের জন্য। এ যুগে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই এই সৌভাগ্য সম্ভব হল। আমরা যাকে বিশ্ব-কবি মনে করি, সেই নিরক্ষর বাউলটির কাছে তাঁর পরিচয় 'বাউলরাজা'। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এদের আপনজন মনে করতেন। এদের ভিতরেই তিনি আবিষ্কার করে গেছেন জীবনের পরম সত্য। পৌষ-মেলার আর একটি দিক হ'লো গ্রামীণ শিল্পের প্রসার। শান্তিনিকেতনের এই এই মেলাতে গ্রাম-গ্রামান্তের শিল্পসম্ভার এসে জড়ো হয়। পণ্যরূপে তাদের বিক্রয়ের সুযোগ দানও এই মেলার একটি বড়ো উদ্দেশ্য।

গ্রামবাসীদের আনন্দ দেবার জন্যই তিনদিন ধরে কতো বিচিত্র আয়োজন। শেখ গুমানী দেওয়ানের কবিগান, বাউল নবনীদাসের গান, নাগরদোলা, গুরুপল্লীর মধ্যে বাজী পোড়ানো, কোনো ত্রুটিই নেই পৌষ-মেলায়।

শান্তিনিকেতনকে প্রাক্তন ও বর্তমান এবং আগামী-কালের কাছে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যেই কবিগুরুর স্বপ্নের পৌষ মেলা আজ সার্থক হয়ে উঠেছে।

তিনি সকলের সমবেত আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে যে গান লিখেছিলেন আজ শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়:

আমাদের শান্তিনিকেতন
সে যে সব হতে আপন
তার আকাশ-ভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে
নিত্যির নূতন।

নিত্য-নূতনের মধ্যেই চিরপুরাতনকে আবিষ্কার করি। কারণ, এই আবিষ্কারের ভিতরে রয়েছে এক মুগ্ধ বিস্ময়, স্থিত প্রত্যয়:—

আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার
বাঁধাযে তার সুরে

মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে
সে যে মিলিয়েছে এক তানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে
করেছে একজন

আমাদের শান্তিনিকেতন।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংকলিত।]

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক 'কংকালীতলা' সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

কংকালীতলা

কংকালীতলা। বোলপুর রেলস্টেশন থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি নগণ্য গ্রাম বলা যেতে পারে। সম্প্রতি সুরুল-গণটিয়া রুটে মোটরবাস যাতায়াত করছে; এই মোটরবাসেই গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

তবে এই বাস এত অনিয়মিত চলাচল করে যে, মোটর-বাস থেকে হাঁটা পথে কংকালীতলায় যাওয়াই শ্রেয়। কংকালীতলা লেন্দুটিয়া মৌজার অন্তর্গত। লোকে বলে কংকালীতলা একটি প্রাচীন গ্রাম। তবে গ্রামের মধ্যে প্রাচীনত্বের তেমন কোন চিহ্ন নেই। গ্রামে কয়েক ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ও সদ্‌গোপ পরিবারের বাস। গ্রামের যে কয়টি বাড়ী ঘর আছে তার সবগুলি খড়ের বা টিনের ছাউনীযুক্ত মাটির ঘর। গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য। সব থেকে অবাক লাগে এই ভেবে যে, বোলপুর শহর থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত এই গ্রামটিতে শহরের কোন প্রভাবই পড়েনি। মনে হয় বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন এই শান্ত-নির্জন গ্রামটি যেন কোন আদ্যিকাল থেকে এমনিভাবেই থমকে দাঁড়িয়ে আছে তার নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রেখে। বোলপুর শান্তিনিকেতন আন্তর্জাতিক মিলন ক্ষেত্র। দেশ-বিদেশ থেকে কত গুণী-জ্ঞানী প্রতিদিন আসছেন বোলপুর শান্তিনিকেতন। কিন্তু শান্তিনিকেতন যেমন নির্বিকার কংকালীতলা গ্রাম সম্পর্কে, তেমন কংকালীতলাও উদাসীন শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রা সম্পর্কে। বোলপুর শহরের ত্রিশূলপল্লী পেরিয়ে মেঠো রাস্তা ধরে মাঝিপাড়া, পারুলডাঙ্গা গ্রাম ডিঙ্গিয়ে কংকালীতলায় এসে হাজির হওয়া যায়।

কংকালীতলা একান্ন পীঠের একটি পীঠ বলে পরিচিত। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কংকালী। বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হয়ে সতীর 'কাঁক' অর্থাৎ কোমরের এক অংশ এখানে পড়েছিল। এই কারণেই দেবীর নাম 'কংকালী' এবং কংকালীদেবীর নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছে 'কংকালীতলা'। গ্রামে কংকালীদেবীর না আছে কোন মন্দির, না আছে কোন মূর্তি। আছে কেবল একটি নির্দিষ্ট বাঁধানো স্থান। উৎসব-পার্বণেও তেমন জাঁকজমক ও জৌলুস আছে বলে শুনিনি। গ্রামটির মত দেবীর স্থানটিও অবহেলিত, কেমন যেন শ্রীহীন। একথা বিশেষ করে মনে হয় এই কারণে যে, এটা একটা পীঠস্থান, সতীতীর্থ। মন্দির বা মূর্তি না থাকার কারণ সম্পর্কে বলা হয় কংকালী জলময়ী দেবী। এখানে একটি পবিত্র কুণ্ডের পাড়ে ইঁট দিয়ে বাঁধানো একটি নির্দিষ্ট স্থানে তেল-সিঁদুর লেপন করা কেবলমাত্র তিনটি ত্রিশূল প্রোথিত আছে। দেবী এই কুণ্ডেই জলমগ্না। বাঁধানো চত্বরের উপর একটি জীর্ণ খড়ের ছাউনী আছে বটে তবে চারিদিক খোলা। ত্রিশূলগুলির পাদদেশে স্থাপিত মাটির ঘটে কালীর ধ্যানে কংকালীদেবীর পূজা করা হয়। লোকে বলে, দেবীর নির্দিষ্ট বেদীর নীচে একশ' আটটি নরমুণ্ড প্রোথিত আছে। স্থানটির বাঁ পাশে একটি হাঁড়িকাঠ আছে। দেবীর নিকট উৎসর্গকৃত মানতের পাঁঠাগুলি এখানেই বলি দেওয়া হয়। বলা হয়, সতীর দেহের অংশ উল্লিখিত কুণ্ডের ঈশানকোণে পড়েছিল। কুণ্ডটি অগভীর তবে সারা বৎসরই জলে পূর্ণ থাকে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে উৎসবের সময় কুণ্ডটির সংস্কার করা হয়। অনেকে বলেন, কুণ্ডের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। এর একধারে একটি প্রাচীন বটগাছ সহ অন্যান্য আরও কয়েকটি গাছ আছে। দেবীর বাঁধানো স্থান ও তৎসংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রের চারিদিকে নীচু ধান জমি। আশেপাশে লোকবসতি নেই বললেই চলে। কংকালী স্থানের দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটি বাঁধানো স্থান, একটি ছোট শিবমন্দির এবং এই মন্দিরের পূর্বদিকে আরও একটি শিবমন্দির আছে। প্রথমটি রক্ত ভৈরব ও দ্বিতীয়টি কাঞ্চনেশ্বর শিবমন্দির নামে খ্যাত। কাঞ্চনেশ্বর শিব-মন্দিরটি বারান্দাযুক্ত এবং উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে একটি করে দরজা আছে। মন্দিরাভ্যান্তরে একটি গোলাকার বাঁধানো স্থানের মধ্যে শিবলিঙ্গের অগ্রভাগ দেখতে পাওয়া যায়। রক্ত ভৈরবের মন্দিরেও একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। নিকটবর্তী তালজোর গ্রাম নিবাসী ধরনীধর ঘোষ মহাশয় বাংলা ১৩২৪ সনের ১লা বৈশাখ মন্দির দুইটি নির্মাণ করান। রক্ত ভৈরব শিবমন্দিরের সামনেই একটি খেজুর গাছ তলায় তেল-সিঁদুর মাখানো কয়েকটি পাথরখণ্ড আছে। এই পাথরখণ্ডগুলিকে ষষ্ঠী জ্ঞানে পূজা করা হয়। কংকালীদেবীর সঙ্গে উক্ত শিবলিঙ্গদ্বয়েরও নিত্যপূজা হয়। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে ব্যঞ্জনাদিসহ আড়াই সের চালের অন্নভোগ দিয়ে দেবীর নিত্যপূজা করা হয়। স্থানীয় চৌধুরী পরিবার পুরুষানুক্রমে দেবীর নিত্য সেবা-পূজা করছেন। ইঁহারা কাশ্যপ গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। আসল পদবী অবশ্য চট্টোপাধ্যায়। বর্তমান পূজারী শ্রীরামদাস চৌধুরী। পূজারীরা প্রায় পঁয়ত্রিশ

বিঘা দেবোত্তর জমি ভোগদখল করেন। এছাড়াও প্রায় দেড়শ বিঘা দেবোত্তর জমির আয় থেকে দেবীর নিত্যপূজা ও বাৎসরিক উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। 'ধরনীধর কংকালী ট্রাষ্টী' দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেবীর নিত্যপূজা ও উৎসবে তত্ত্বাবধান করেন। বর্তমানে ট্রাষ্টী কর্তৃক মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক শ্রীপূর্ণ চন্দ্র মিশ্র।

প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি থেকে তিনদিন কংকালী দেবীর বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের তিন-দিন কংকালীদেবীর বিশেষপূজা, হোম ও ভোগারতি অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে এই সময় পাঁচ সহস্রাধিক নরনারী আসেন এবং দেবীর উদ্দেশ্যে কয়েক শত মানতের ছাগ বলি দেওয়া হয়। পূজা প্রাঙ্গন সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় দশ-বারো বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলায় মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী, লোহার ও এ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি, মাটির হাঁড়ি-কলসী-পুতুল ইত্যাদির শতাধিক দোকান-পাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ বোলপুর, সিউড়ী প্রভৃতি স্থান থেকে প্রতি বৎসর আসেন। কোন কোন বৎসর মেলায় যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

কংকালী পীঠ সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রের চারিদিকে ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে কয়েকটি তাল, খেজুর ও জাম গাছ। আর আছে দু-একটি বাঁধানো সমাধি-স্তম্ভ। শ্মশানের প্রান্তর দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলেছে স্বচ্ছসলিলা উত্তরবাহিনী কোপাই নদীর ক্ষীণধারা। পশ্চিম থেকে পূর্বে এসে শ্মশানের ধার ঘেঁষে উত্তরদিকে মুখ ফিরিয়েছে কোপাই নদী। ক্ষীণাঙ্গী হোক তবু উত্তরবাহিনী নদীতে স্নান করলে পূণ্যার্জন হয়। তাই ধর্ম-পিপাসু নর-নারী তৃপ্তিভরে স্নান করেন কোপাইয়ের অগভীর জলে। শবদাহান্তে ভস্মাচ্ছাদিত চিতায় কলসী কলসী জল ঢেলে দেন শববাহকেরা। তারপর যে যার মত কোপাই নদীতে স্নান করে ঘরে ফিরে যান। শ্মশানের এক প্রান্তে গাঁদা-বেল-শিউলী প্রভৃতি দেশীয় ফুল গাছের বাগান দিয়ে ঘেরা একটি দো-চালা মেটে ঘর দেখতে পাওয়া যায়। শ্মশানের বুকে যত্ন করে ফুল বাগান দিয়ে ঘেরা ঘরটি দেখে স্বভাবতই কৌতূহল জাগে। শুনলাম এই ঘরটিতে বাস করেন জনৈক তান্ত্রিক। তাঁরই স্বহস্তে রচনা এই ফুল-বাগান। তান্ত্রিকের অবশ্য দর্শন পাইনি। কিছুদিন হলো তিনি তাঁর গুরুর আশ্রমে গিয়েছেন। তাই বর্তমানে শূন্য পড়ে আছে সাধুজীর শ্মশান কুঠীর। লোক মুখে তান্ত্রিকজী সম্পর্কে অনেক কথাই শোনা যায়।

এই প্রসঙ্গে কংকালীতলা ভৈরবী মায়ের কথা না উল্লেখ করলে শেষটুকু বলা হবে না। কংকালীতলার দক্ষিণে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট তেঁতুল গাছ। এই তেঁতুলগাছ তলায় ভগ্ন প্রায় একটা দো-চালা কুঁড়ে ঘরে বাস করেন কংকালীতলার সাক্ষাৎ ভৈরবী—লোকে যাঁকে বলে 'ভৈরবী মা'। ঘরটির চালে কতদিন যে খড় ছাওয়া হয়নি তা কে জানে। ঘরের মধ্যে উনুন জ্বালার ফলে দিনের পর দিন ধোঁয়া লেগে লেগে ঘরের দেয়াল ও উপরের বাঁশের মাচার রঙ গিয়েছে একেবারে বদলে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ঘরের ভেতরটা আগাগোড়া যেন আলকাতরা দিয়ে রঙ করা হয়েছে। ঘরে জিনিসপত্র বলতে বিশেষ কিছুই চোখে পড়ে না। ঝাঁপ দেওয়া দরজার ফাঁক দিয়ে শুধু দেখা যায় কয়েকটা ছেঁড়া কাঁথার স্তূপ আর মাচার থেকে দড়ির শিকেয় ঝুলানো দু-একটা মাটির হাঁড়ি আর কয়েকটি নারকেল মালা। ঘরের সমানে এক ফালি বারান্দায় মলিন ও শতজীর্ণ বস্ত্রে গা ঢেকে এক অতি বৃদ্ধা অনর্গল কথা বলে চলেছেন। আর তাঁর সামনে পাতা মাদুরে বসে গুটি-কয়েক নর-নারী নির্বাক চিত্তে তাঁর কথা শুনছেন। বয়সের ভারে জীর্ণ দেহে অসংখ্য রেখা পড়েছে। কিন্তু বয়সের তুলনায় আশ্চর্য্য সজীব তাঁর চক্ষু দু'টি। উজ্জল চক্ষু দু'টির নীচে মনে হয় এইমাত্র কাজলের রেখা টেনে দিয়েছেন। তাতো নয়। চক্ষু দু'টিই যে এমন। ভৈরবী মা প্রায় চল্লিশ বৎসর কংকালীতলাতেই বাস করছেন। জানা যায়, বীরভূম জেলার মৌড়েশ্বর থানার কনেশ্বর গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে ভৈরবী মা জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হ'বার আগেই তাঁর পিতা সংসার ত্যাগ করে কোথায় চলে যান। ভৈরবী মায়ের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার নেন তাঁর কাকা-কাকিমা। কিন্তু কাকার মনেও একদিন বৈরাগ্য এলো। হঠাৎ একদিন ঘরবাড়ী জমিজমা বিলিয়ে দিয়ে স্ত্রী আর ভৈরবী মার হাত ধরে

রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। তারপর শুরু হয় কেবল পথে পথে, তীর্থে তীর্থে ঘোরা। এইভাবেই কেটে গেল বেশ কয়েক বৎসর। তারপর হঠাৎ যেমন একদিন তাঁরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তেমনই একদিন হঠাৎ ফিরে এলেন কংকালীতলায়। এখানে এসেই কাকা দেহরক্ষা করলেন। কংকালীতলাতেই তার অস্থি সমাধি আছে। সেই থেকে ভৈরবী মা এই কংকালীতলাতেই রয়ে গেছেন। লোকে তাঁকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, ভৈরবী মা বলে ডাকে। রোগে-শোকে তাঁর পাশে এসে বসে শান্তি পান।

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা

শিয়ান গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির গুহা সংলগ্ন স্থানে তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

এখানে দৈনিক প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাবেশ ঘটে। মেলায় প্রচুর মাটির হাঁড়ি-কলসী আমদানী হয়। এছাড়া অন্যান্য দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, খেলনা-পুতুল ও মনিহারী দোকানপাট থাকে।

মেলার কয়দিন আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাগানের ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রা দেখিতে বহুলোকজনের সমাগম হয়।

গোষ্ঠাষ্টমীর মেলা

মুলুক গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে গোষ্ঠাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমিতে সাতদিনব্যাপী মেলাটি বসে। ইহা প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন মেলা বলিয়া শোনা যায়।

বাহিরী, পাঁচশোয়া, নানুর, সুখবাজার, শিয়ান, বোলপুর, খোদবাদামপুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতিদিন নানা সম্প্রদায়ের বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রায় সহস্রাধিক যাত্রীর সমাগম হয়। তাহা ছাড়া, মানভূম, দুমকা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রধানতঃ ট্রেন, মোটরবাস ও সাইকেল রিক্সা করিয়া যাত্রী আসেন।

প্রায় সত্তর আশীটি দোকানপাট বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালাও আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, পান-বিড়ি প্রভৃতি দোকানপাট বসে। মহাপুরুষ ও ঠাকুর দেবতার মহাত্ম্যমূলক নানা পুস্তকাদি বিক্রয় হয়। তাহা ছাড়া বিক্রেতাদের নিকট হইতে আদায়কৃত অর্থ দ্বারা উৎসবের ব্যয়ভার নির্বাহ করা হয়।

নাগরদোলা, ম্যাজিক, সার্কাস, কীর্তনগান, বাউলগান প্রভৃতি আমোদপ্রমোদের আয়োজন করা হয়। তাহা ছাড়া, কোন কোন বৎসর স্থানীয় সখের যাত্রাদল কর্তৃক পৌরাণিক যাত্রাভিনয় হয়। প্রায় চার-পাঁচ শত নরনারী এই সকল আনন্দানুষ্ঠানে যোগদান করিতে দেখা যায়।

গোপালঠাকুরের মেলা

বাহিরী গ্রামে গোপালঠাকুরের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে ও প্রতি বৎসর মাঘ মাসে প্রায় পনর বিঘা জমি জুড়িয়া পাঁচদিনব্যাপী একটি বিরাট মেলা বসে। মেলাটি বাংলাদেশে প্রাচীন মেলাগুলির অন্যতম।

মেলায় দৈনিক গড়ে প্রায় তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের অধিকাংশই বীরভূম জেলার লোকজন।

বোলপুর শহর এবং ইহার চতুর্পার্শ্বস্থিত গ্রামাঞ্চল হইতে বিক্রেতাগণ প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। দোকান-পাটের সংখ্যা প্রায় একশত। উহাদের মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকানের সংখ্যা সর্বাধিক। তাহা ছাড়া, বই-ছবি, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, কুটির শিল্পজাত দ্রব্য, পান-বিড়ি প্রভৃতি দোকানপাটও বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, নাগরদোলার দল আসেন এবং যাত্রাভিনয় ও কবিগানের আয়োজন করা হয়।

বিবিধ মেলা

বোলপুরে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে

অবশ্য এই মেলা বসে না। স্থানীয় অঞ্চলের আতসবাজী প্রস্তুতকারকরা প্রতিযোগিতামূলক বাজী পোড়ানর আয়োজন করেন, এবং তদুপলক্ষে বোলপুরের ডাকবাংলো সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর সম্প্রতি এই মেলাটি বসিতেছে। সাধারণতঃ বৈকাল হইতে অধিকরাত্র পর্যন্ত মেলায় লোকসমাগম হয়।

নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে কৃষক সম্প্রদায়ের প্রায় চারি-পাঁচশত নরনারী ও শিশুরা মেলায় আসেন। পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান।

মেলায় স্থানীয় অঞ্চলের ব্যবসায়ীরাই দোকানপাট দেন। মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, তাঁতের কাপড়চোপড় প্রভৃতি আমদানী হয়। তাহা ছাড়া, স্থানীয় মহিলা সমিতির স্চী শিল্পজাত দ্রব্যাদির একটি দোকান প্রায় প্রতি বৎসর বসে। মেলা কমিটি কর্তৃক বিক্রেতাদের নিকট হইতে আদায়ীকৃত অর্থে মেলা পরিচালনের ব্যবস্থা করেন।

নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, যাত্রাগান, কবিগান প্রভৃতি চিত্তবিনোদক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া আতসবাজী প্রতিযোগিতা দেখিতে অগণিত নরনারীর সমাগম হয়।

শ্রীনিকেতনের মেলা

সুরুলে শ্রীনিকেতন নামে আদর্শ পল্লীগঠন ও কৃষি বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর ২৩শে মাঘ হইতে ২৫শে মাঘ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী মহাসমারোহে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষ্যে কার্যালয়ের প্রধান অফিস ইমারতটির সম্মুখস্থিত প্রায় পনর কুড়ি বিঘা বিস্তৃত প্রাঙ্গনে মেলার সীমানা বিস্তার লাভ করে। ইহা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রচলিত হয়। তাহা ছাড়া মেলাটি এতদঞ্চলে কৃষি-শিল্প-শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর মেলা নামেও বিশেষভাবে পরিচিত।

এই উপলক্ষ্যে বোলপুর থানার অন্তর্গত গ্রামবাসীই সর্বাপেক্ষা অধিক এবং অধিকাংশই কৃষিজীবি ও শিল্প-ব্যবসায়ী। তাহা ছাড়া কলিকাতা, দুমকা, বর্ধমান প্রভৃতি জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতেও কিছু সংখ্যক যাত্রীর আগমন লক্ষ্য করা যায়। এই মেলায় সর্বসম্প্রদায়ের প্রত্যহ প্রায় কুড়ি হাজার নরনারীর সমাগম হয়। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ট্রেনে, বাসে এবং গরুরগাড়ী করিয়া আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ শিয়ান, মুখবাজার, আদিত্যপুর বোলপুর, ভুবনডাঙ্গা, বাঁধগড়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসেন। আচ্ছাদনযুক্ত দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি এবং উন্মুক্ত স্থানের দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশটি। ময়রা, তেলেভাজা, লোহা-পিতল-কাঁসা ও মাটির বাসনকোসন, টোট্‌কা ঔষধপত্রাদি, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, কৃষিজাতদ্রব্য প্রভৃতি মেলায় আমদানি হয়। ইহা ছাড়া পার্শ্ববর্তী প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি গ্রাম হইতে কৃষিজাত, শিল্পজাত দ্রব্য এবং গবাদি পশু, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি লইয়া প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। এই প্রদর্শনী এখানকার মেলার এক বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা গ্রহণ করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং সিনেমা দেখানো, কৃষি-শিল্প-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিষয়ক তথ্যমূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ভিন্ন, কবিগান, বাউলগান, সাঁওতালীনৃত্য, রাইবেশেনৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান, ছাত্রদের ব্যায়ামচর্চা প্রদর্শনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া এই মেলায় ব্রতীবালক সম্মেলন এবং এন-সি-সি সম্মেলন ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে।

শান্তিনিকেতনের মেলা

শান্তিনিকতনের মেলাটি আজ আর কেবলমাত্র বাংলা-দেশে নয়, সমগ্র ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য মেলা বলিয়া পরিচিত। প্রতি বৎসর ৭ই পৌষ হইতে এইস্থানের "পৌষ উৎসবের" সঙ্গে সঙ্গে মেলাটি আরম্ভ হয় এবং বিহিত অনুসারে তিনদিনের জন্য বসিলেও ইহার মেয়াদ আরও পাঁচ-ছয়দিন বর্ধিত হয়। শান্তিনিকেতনের উত্তর প্রান্তে বিশ্বভারতী ট্রাষ্টীর প্রায় পনর বিঘা জমি জুড়িয়া মেলায় দোকানপাট বসে। বাংলা ১৩০৩ সন হইতে ইহার প্রচলন হইয়াছে এবং বিশ্বভারতী সংসদ কর্তৃক ইহা পরিচালিত হয়।

মেলায় সাঁওতাল, সাধারণ গ্রামবাসী এবং শিক্ষিত ব্যক্তি সকলেই আসেন। তাঁহারা প্রধানতঃ বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, ডুম্‌কা, কলিকাতা প্রভৃতি জেলা ও শহর হইতে এমন কি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান, বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্মাধর্মি ও শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে দৈনিক গড়ে প্রায় পনর-কুড়ি হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে প্রায় একতৃতীয়াংশ নারী। ট্রেন, মোটরবাস, গরুরগাড়ী, সাইকেল রিক্সা এবং হাঁটিয়া এই বিপুল নরনারী মেলায় আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য নিকটবর্তী অঞ্চলের বহু সাঁওতাল নরনারী মেলায় আসেন।

এই মেলায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র হইতে এবং বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, আসাম প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। বিহার, উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে সাধারণতঃ আভিজাত্য রুচিসম্পন্ন চারু এবং কারুশিল্পজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতে দেখা যায়। তাহা ছাড়া সাঁওতালী এবং উড়িষ্যা শিল্পীগণের হস্তশিল্পজাত দ্রব্য বিশেষ আকর্ষণীয়। মেলায় দোকানপাট এবং ফেরিওয়ালার সর্বমোট সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশত। দোকানপাটের মধ্যে সরকারী জনস্বাস্থ্যবিভাগের একটি ষ্টল, দশটি রবীন্দ্র, অরবিন্দ ও সর্বসাহিত্যের পুস্তকাবলির ষ্টল, কাঠ-পাথর-মাটির নানা-প্রকার সৌখীন জিনিষপত্র, কয়েকটি সুসজ্জিত চায়ের দোকান, হোটেল ও পানের দোকান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, মনিহারী, মিষ্টান্ন, ফলমূল, কয়েকটি কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতির দোকান বসে। বিশ্বভারতী সংসদ কর্তৃক বিক্রেতাগণের নিকট হইতে আদায়ীকৃত খাজনার অর্থ দ্বারা ইহার সুষ্ঠু পরিচালনা এবং উৎসবের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্ত ব্যয় করা হয়।

মেলার কয়েকদিনব্যাপী আশ্রমবাসী ও সাঁওতালীদের সম্মিলিত খেলাধূলা, সাঁওতালী নৃত্য, নাগরদোলা, বাজী পোড়ান, সানাই বাদ্য, যাত্রা, কীর্তনগান, কবিগান, লোকসংগীত, সিনেমা প্রদর্শনী ইত্যাদি ব্যবস্থা করা হয়। বীরভূম জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে সাধারণতঃ কবিগান, যাত্রাগান, বাউলগানের দল প্রভৃতি প্রায় প্রতি বৎসর আসে। তাহা ছাড়া সানাই, বাদ্যকার, কীর্তনীয়া এবং সিনেমা প্রধানতঃ কলিকাতা হইতে আসে। ট্রাষ্টীর সর্তপত্রে লিখিত আছে যে, "এই মেলাতে সকল সম্প্রদায়ের সাধু-পুরুষেরা আসিয়া ধর্মালোচনা করিতে পারিবেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে কোনপ্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না। কুৎসিত আমোদ উল্লাস বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য। মদ্য-মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় হইতে পারিবে। মেলায় খাজনা হিসাবে উপার্জিত অর্থে মেলা, উৎসব এবং আশ্রমের উন্নতি বিধানের কার্যে ব্যয়িত হইবে।" এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি বিশ্বভারতীর আচার্য ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী স্বর্গত জওহরলাল নেহেরু এই মেলার উপযোগিতা এবং প্রসার সাধনের আবশ্যকতায় গুরুত্ব আরোপ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

স্নানযাত্রার মেলা

পুরুষোত্তমপুর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে দেউলেশ্বরশিবের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী দেউলেশ্বরমন্দিরের পার্শ্বস্থিত এবং পার্বতীদেবীর মন্দির সম্মুখস্থিত ব্যক্তিবিশেষের প্রায় ছয় বিঘা জমিতে মেলা বসে। সাধারণতঃ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেলায় লোকসমাগম বেশী হয়। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

বীরভূম জেলার প্রায় প্রতিটি থানা এবং বর্ধমান জেলা হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিদিন মোট প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ ট্রেনে, বাসে ও গরুগাড়ীতে করিয়া মেলায় আসেন।

বোলপুর শহর, ইলামবাজার এবং লাভপুর হইতে প্রধানতঃ বিক্রেতাগণ আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, তামা পিতল ও লোহার তৈয়ারী জিনিষপত্র, কাঁচের চুড়ি, মাটির হাঁড়িকলসী, বই-ছবি প্রভৃতি জিনিসপত্র পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে। তাহা ছাড়া তাঁতের কাপড়, গামছা, মাটির ও কাঠের তৈয়ারী পুতুল, বাঁশের তৈয়ারী চ্যাঙারী, কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্র আমদানী হয়। শেষোক্ত পণ্যগুলি সাধারণতঃ রাইপুর, কাঙ্কুটিয়া,

সেনকাপুর, বোলপুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক ও সার্কাসের দল আসে। যাত্রা ও লটারী খেলা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় তিন-চার শত শ্রোতা ও দর্শকের সমাগম হয়।

সারস্বত উৎসবের মেলা

লালদহা গ্রামের প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে সারস্বত উৎসব উপলক্ষে গ্রামের বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রায় ছয় বিঘা জমিতে ছয়দিনব্যাপী জনশিক্ষামূলক প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করা হয়। মাঘ মাসে বিদ্যালয়ে সরস্বতীপূজার পর ঐ মূর্তি বিসর্জন না দিয়া ফাল্গুন মাস অবধি রাখিয়া দেওয়া হয় এবং ফাল্গুন মাসে সারস্বত উৎসবের পর ঐ মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়।

আমধড়া, শ্রীনিধিপুর, তাসজোড় প্রভৃতি ইউনিয়ন সমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারী মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে নারী ও পুরুষ যাত্রীর সংখ্যা সমান সংখ্যক দেখা যায়।

বোলপুর শহর ও মহোদরী গ্রাম হইতে প্রধানতঃ মিষ্টান্নজাত দ্রব্য লইয়া বিক্রেতাগণ প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন দোকানের সংখ্যা সর্বাধিক। তাহা ছাড়া, কয়েকটি মনিহারী ও কারুশিল্পজাত দ্রব্যের দোকানপাটও বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলার কয়েকটি দিন নানা অনুষ্ঠানসূচীর মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। ইহার প্রথমদিন মেলার উদ্বোধন উৎসব, কৃষিশিল্প প্রদর্শনী, পশু-পক্ষী প্রদর্শনী, সিনেমা, কবিগান, বাজী পোড়ান প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা সূচিত হয়। দ্বিতীয় দিন সমবায় সম্মেলন, খেলাধূলা, থিয়েটার প্রভৃতি। তৃতীয় দিনে নামসংকীর্তন, কর্মীসম্মেলন ও যাত্রাভিনয় প্রভৃতি। চতুর্থদিনে বা শেষদিনে, মহিলা সম্মেলন, পুরস্কার বিতরণ ও যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠান থাকে। এই সকল অনুষ্ঠানে অগণিত নরনারীর সমাবেশ ঘটে।



গ্রাম বিবরণী

থানা : লাভপুর

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক লাভপুরে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

লাভপুর

বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাভপুর একটি প্রাচীন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে জমিদার বন্দোপাধ্যায় পরিবার। এখানে একটি থানা ও ডাকঘর আছে। গ্রামটির আয়তন ৫২০·৬২ বর্গ মাইল। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে জানা যায় এই গ্রামে মোট ৩২৫টি পরিবারে ১,৬৭৩ জন নরনারী বসবাস করেন। বর্তমানে গ্রামে ব্রাহ্মণ, বাউরী, বণিক, স্বর্ণকার, শুঁড়ি, ময়রা, নাপিত, গড়াই, মুচি, ডোম, হাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকজন আছেন। দত্তপাড়া, শুঁড়িপাড়া, কেওটপাড়া প্রভৃতি নামে ছয়টি পাড়া আছে। গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য ও ব্যবসায়। এক সময় লাভপুর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। নদীপথে এইস্থানে বাণিজ্য চলিত বলিয়া শোনা যায়। বিশেষ করিয়া এখানকার লৌহশিল্প ও রেশম শিল্পের বিশেষ খ্যাতি ছিল। লাভের ব্যবসা চলিত বলিয়া বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বকালে গ্রামের নাম হয় লাভপুর। শোনা যায় অতীতে এই গ্রাম অট্টহাস নামে পরিচিত ছিল। পূর্ব রেলপথে আহম্মদপুর জংশন হইতে একটি ছোট রেলপথ বর্ধমান জেলার কাটোয়া পর্যন্ত গিয়াছে। এই রেলপথেই লাভপুর স্টেশন পড়ে। আহম্মদপুর হইতে লাভপুরের দূরত্ব প্রায় আট মাইল। মাঝে মাত্র দুইটি স্টেশন চৌহাট্টা ও গোপালপুর হল্ট।

লাভপুর বীরভূম জেলার আর একটি সতীপীঠ। এখানে বিষ্ণুচক্রে কর্তিত সতীর অধরওষ্ঠ পড়িয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস। এখানে দেবী ফুল্লরা নামে খ্যাত। অথবা দেবী অট্টহাসও বলা হয়। অট্টহাসে চঃ ফুল্লরা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় বর্ধমান জেলায় কেতুগ্রামে অট্টহাস নামে দেবী আছেন। অনেকে দাবী করেন, কেতুগ্রামে অট্টহাসই প্রকৃত পীঠস্থান। এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর, মন্তব্যও নিষ্প্রয়োজন।

লাভপুর স্টেশন হইতে ফুল্লরাদেবীর মন্দির মাত্র মিনিট তিন চারেকের পথ। চারিদিকে সমতল জমি হইতে কচ্ছপের পিঠের ন্যায় উঁচু একটি মাটির ঢিপির উপর দেবীর মন্দিরটি অবস্থিত। আশেপাশে বড় বড় কয়েকটি প্রাচীন তেঁতুল গাছ ও নানা রকম ফুলগাছ স্থানটিকে ছায়াচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। ইষ্টকনির্মিত মন্দিরটি সম্মুখভাগ বারান্দাযুক্ত। দক্ষিণমুখী মন্দির, সামনেই নাট্মন্দির। লাভপুরের জমিদার ৺যাদব লাল বন্দোপাধ্যায় বাংলা ১৩০২ সনে ইহা নির্মাণ করান। মন্দিরাভ্যন্তরে কচ্ছপাকৃতি সম্পূর্ণ সিন্দুরলিপ্ত একটি বৃহৎ শিলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইনিই দেবী ফুল্লরা বা অট্টহাস। কথিত আছে এইস্থানে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দেবী পরিত্যক্ত অবস্থায় দীর্ঘকাল পড়িয়াছিলেন। শ্যামলাবাদের শেষ রাজা দিনমণি মিশ্রের আমলে কাশীর জনৈক সন্ন্যাসী কৃষ্ণদয়াল গিরি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দেবীর শিলামূর্তি প্রকাশ করেন। কৃষ্ণদয়ালকে দেবী জয়দুর্গারূপে দর্শন দেন বলিয়া জয়দুর্গার ধ্যানেই দেবীর নিত্যপূজাদি অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখানে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। মন্দিরের পশ্চিম কোণে একটি বৃক্ষের নীচে বাঁধানো স্থানে প্রোথিত একটি শিবলিঙ্গের অগ্রভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। বলা হয়, ইনিই দেবীর ভৈরব। ইনি বিশ্বাসভৈরব নামে খ্যাত। ইহার আশেপাশের গাছগুলির শাখাপ্রশাখা সুতায় একখণ্ড ঢিল বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিয়া অনেকে ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে মানত করেন। গাছের নীচে মাটির ঘোড়ার স্তূপ জমে আছে। ইহা ভিন্ন, ফুল্লরামন্দিরের বায়ু কোণে প্রায় দশ ফুট উচ্চ ইষ্টকনির্মিত প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন একটি শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি বাংলার চারচালা গঠনে নির্মিত এবং ইহার বাহিরের দেওয়াল গাত্রে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক বিষয়ক

দৃশ্যাবলি খোচিত। মন্দিরাভ্যান্তরে গৌরীপট্টসহ একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ১২ শ' শতকে ফুল্লরামন্দিরের মহান্ত নারায়ণগিরি এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া জানা যায়। ইহা ভিন্ন, এইস্থানে কয়েকজন মহান্তের সমাধির উপর একটি ছোট মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমানে মহান্তপ্রথা উচ্ছেদ করিয়া একটি কমিটির হাতে দেবীর মন্দিরের তত্ত্বাবধান ও নিত্যপূজাদির ভার অর্পণ করা হইয়াছে।

ফুল্লরামন্দিরের নিকটেই পূর্বদিকে দেবীদহ নামে একটি বৃহৎ শুষ্ক দহ আছে। ইহাকে দালদলি দহ বলা হয়। কিংবদন্তী আছে শ্রীরামচন্দ্র অকালবোধনকালে এই দহ হইতে নীলপদ্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ৺যাদব লাল বন্দোপাধ্যায় ইহার ঘাটের দুইদিকে পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটি শিবমন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

ফুল্লরাদেবীর নিত্যপূজা উপলক্ষে প্রাতঃকালে আরতি, মধ্যাহ্নে প্রায় পনর সের চালের অন্নভোগ ও সন্ধ্যায় শীতলারতি অনুষ্ঠিত হয়। ফুল্লরাদেবীর নিত্যপূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য শিবাভোগ। মন্দিরের ঈশান কোণের অনতিদূরে শিবাভোগের নির্দিষ্ট স্থান আছে। দেবীর অন্নভোগের একটি অংশ ঐস্থানে রাখিয়া দেওয়া হয় এবং আশপাশের বনজঙ্গল হইতে শিয়াল আসিয়া ঐ ভোগ খাইয়া গেলে দেবীর অন্নভোগ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। শিবাভোগের পর মন্দিরে আগত অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে অন্নভোগ বিতরণ করা হয়। প্রতিদিনই কিছু কিছু নরনারী মানতপূজাদি দিতে মন্দিরে আসেন। বিশেষ করিয়া সপ্তাহের প্রতি শনি-মঙ্গলবার মন্দিরে যাত্রীর ভীড় বেশী হয়। মন্দির হইতে রোগব্যাধি নিরাময়ের জন্য দৈব কবচ দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ষোড়শোপচারে পূজা, বস্ত্র অলংকার, মাটির ঘোড়া, অথবা ছাগ-মেষ-শুকর-মুরগী ইত্যাদি পশুপক্ষী বলি মানত করা হয়। মন্দিরে সম্মুখস্থ নাটমন্দিরের মধ্যে প্রোথিত দুইটি যুপকাষ্ঠে ছাগ ও মেষ বলি এবং মন্দিরের অনতিদূরে জঙ্গলের মধ্যে শুকর ও মুরগী বলি দেওয়া হয়।

প্রতি বৎসর মন্দিরে শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে চারদিন এবং মাঘীপূর্ণিমায় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দশদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহার মধ্যে বার্ষিক উৎসবটিই বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ। শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে চারদিনব্যাপী সাড়ম্বরে ভোগপূজাদি এবং মহাষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে দেবীর উদ্দেশ্যে একটি ছাগ ও মেষ বলি দেওয়া হয়। মহাষ্টমী ও নবমীর ঠিক সন্ধিক্ষণে দেবীদহ হইতে একটি শব্দ উত্থিত হয় এবং ঐ শব্দ শুনিয়া দেবীর সন্ধিবিহিত পূজা ও বলি প্রদান হয়। এই সময় আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু লোকজন মন্দিরে আসেন।

প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমা হইতে দশদিনব্যাপী ফুল্লরা-দেবীর বার্ষিক মহাপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই উৎসবের প্রস্তুতি পয়লা মাঘ হইতে শুরু হয়। উৎসব উপলক্ষে পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকালে যথারীতি স্নানাভিষেক, মধ্যাহ্নে হোম, অন্নভোগ, সন্ধ্যায় আরতি ও ভোগপূজা হয়। এইদিন প্রাতঃকাল হইতে মন্দির প্রাঙ্গণে হরিনাম সংকীর্তন ও দশদিনব্যাপী ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসবকালে দেবীমূর্তি দর্শন করিতে বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে বহু নরনারী এবং সাধু সন্ন্যাসীরা আসিয়া থাকেন। বিশেষ করিয়া দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম বেশী দেখা যায়। অহিন্দুরাও এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। এইদিন অনেকে মন্দিরে মানসিক পূজাদি দেন। মাঘীপূর্ণিমার দিন প্রায় বার মন চাউলের অন্নভোগ ও প্রসাদ সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বর্তমানে দেবীর পূজারী পরাশর গোত্রীয় মৈথিলী ব্রাহ্মণ শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ঝাঁ এবং শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন উকিল। দেবীর নিত্যপূজাদির জন্য চারিটি পুকুর সহ শতাধিক বিঘা দেবোত্তর জমি আছে। উহার মধ্যে মাত্র বাইশ বিঘা ধানী জমি ব্যতীত অবশিষ্ট সবই প্রায় পতিত জমি। এই জমির আয় হইতেই দেবীর নিত্যপূজার ব্যয়ভার বহন করা হয়। ইহা ভিন্ন, উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে চাউল ও আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা হয়। একটি কমিটি দেবীর নিত্যপূজাদির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। বর্তমানে উহার সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন উকিল।

ফুল্লরাদেবীর বার্ষিক মহাপূজা উপলক্ষে তাঁহার মন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় ত্রিশ বিঘা জমির উপর পূর্ণিমা

তিথি হইতে দশদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন ; অবশ্য মাঝে কয়েক বৎসর অজ্ঞাত কারণে মেলাটি বন্ধ ছিল। বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, নদীয়া, কলিকাতা ও বিহার প্রদেশের ভাগলপুর, গয়া প্রভৃতি স্থান হইতে ট্রেনে ও গরুরগাড়ীতে করিয়া সর্বসম্প্রদায়ের প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন-চার সহস্র যাত্রী আসিয়া থাকেন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। ফুল্লরা ম্যানেজিং কমিটির তত্ত্বাবধানে মেলাটি পরিচালিত হয়। উক্ত কমিটি মেলায় বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা খাজনা বাবদ যে অর্থ আদায় করেন তাহা দেবীর মন্দির সংস্কার ও মেলায় বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠানের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন।

মেলার দেড় শতাধিক দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলির এক তৃতীয়াংশ খোলা জায়গায় বসিয়া থাকে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ সাঁইথিয়া, সিউড়ী, রামপুরহাট, বর্ধমান, কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর, কীর্ণাহার এবং নদীয়া হইতে আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি বিভিন্ন খাবারেরদোকান এবং মনিহারী দোকান ব্যতীত কাপড়চোপড়, তামা-পিতল-লোহা এবং কাঁচ ও মাটির বাসনপত্রের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, কাঠের তৈয়ারী দরজা, কপাট ; গরুরগাড়ীর চাকা প্রভৃতির দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা, মাদুর প্রভৃতির দোকান, বইছবির দোকান এবং কৃষ্ণনগর ও শ্রীনিকেতনের তৈয়ারী মাটির পুতুলের দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক এবং লটোগান, সত্যপীরেরগান ও কবিগানের আয়োজন করা হয় এবং আতসবাজী পোড়ান হয় কমিটির উদ্যোগে প্রতি বৎসর একটি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী এবং বালক-বলিকাদের জন্য একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন ও তদুপলক্ষে মেলার শেষদিন বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ইহা ভিন্ন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার ও শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মেলায় শিক্ষামূলক ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়। মেলায় অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের জন্য সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতা এবং স্থানীয় জেলাবোর্ড প্রতি বৎসর অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত উৎসব ও মেলা ব্যতীত লাভপুরে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজপূজা, ভাদ্র মাসে বিশ্বকর্মাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ইহা ব্যতীত, ব্যক্তিবিশেষের গৃহে বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ, বাসুদেব, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, রাজরাজেশ্বর, লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মীজনার্দন প্রভৃতি বিগ্রহাদির নিত্যপূজা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে নানারূপ পালপার্বণ অনুষ্ঠিত হয়।

১। গ্রাম : রাখড়েশ্বর। ৪৫।৪০৭·৪০।৭৫।৪৩৭

(ক) হিন্দু।

গ্রামে মণ্ডলপাড়া, বায়েনপাড়া, লোহারপাড়া প্রভৃতি নামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) লাভপুর, আহম্মদপুর অথবা কোপাই রেল-স্টেশন হইতে হাঁটিয়া অথবা গরুরগাড়ী করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে প্রায় এক মাস। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছে। ইনি অনাদি শিবলিঙ্গ বলিয়া কথিত। ইহা ভিন্ন, গ্রামে মনসা ও ভৈরবঠাকুর আছেন।

শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ কর,
লাভপুর ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস,
গ্রাম : ধানখড়া,
পোঃ মহোদরী, বীরভূম।

২। গ্রাম : মহেশপুর। ৭৬।৬৪১·০৬।১১৫।৬২২

(ক) ব্রাহ্মণ, বণিক, সদ্‌গোপ, ডোম, চামার ও সাঁওতাল। গ্রামটিতে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন মহেশপুর হইতে গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে দশদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি শীতলা আছে।

গ্রামসেবক,
লাভপুর ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস,
লাভপুর, বীরভূম।

৩। গ্রাম : ফলগ্রাম। ৯৮।১৪১·৭১।১৩৫।৭৫২

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, গন্ধবণিক, কামার, তিলি, বৈরাগী, নাপিত, চামার, ডোম, বাগ্দী ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন লাভপুর হইতে ইউনিয়ন-বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজ-পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে ব্রহ্মদৈত্যপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা এবং কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মরাজ ও শিবপূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে চারিদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজের নির্দিষ্ট স্থান এবং একটি দুর্গামণ্ডপ আছে।

শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার, শিক্ষক,
গ্রাম : ফলগ্রাম,
পোঃ লাভপুর, বীরভূম।

৪। গ্রাম : দাঁড়কা। ১৩৬।২,২৬৮·২৬।৮৫৫।৪,৭১৯

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, বৈরাগী, তাঁতি, কলু, নাপিত, জেলে, ছুতার, ময়রা, কামার, বায়েন, ডোম, বাগ্দী, হাড়ী, বাউরী ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) আহমদপুর-কাটোয়া ছোট রেলপথে লাভপুর রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে রটন্তীকালীপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ও সন্ন্যাসী গোস্বামীর মহোৎসব, চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা ও চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তি হইতে সাত-দিন। মেলাটি গত প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) গ্রামে দণ্ডকেশ্বর শিবেরমন্দির এবং সন্ন্যাসী গোঁসাই নামে জনৈক শক্তিধর সাধকের একটি সমাধি মন্দির আছে। এই সমাধি মন্দির দেখিতে জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতি বৎসর বহুলোকের সমাগম হয়।

গ্রামে প্রতিষ্ঠিত দণ্ডকেশ্বর শিবের নামানুসারেই গ্রামের নাম 'দাঁড়কা' হইয়াছে। গ্রামটি ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত।

শ্রীবিজয় কুমার অধিকারী, কৃষিকার্য,
গ্রাম ও পোঃ দাঁড়কা, বীরভূম।

৫। গ্রাম : পূর্ব মহুলা। ১৩৮।৬৯৬·১০।১৯০।১,০৩৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, সদ্গোপ, গন্ধবণিক, বাগ্দী, জেলে, কলু, শুঁড়ি ও চামার। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) আহমদপুর-কাটোয়া ছোট রেলপথে লাভপুর রেলস্টেশন হইতে একটি পাকা রাস্তা গ্রাম পর্যন্ত গিয়াছে। আরাডাঙ্গা হইতে মোটরবাসে করিয়া এবং বর্ষাকালে ময়ূরাক্ষী নদীতে নৌকা করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজপূজা, ভাদ্র মাসে বগা পঞ্চমীতিথিতে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, পয়লা মাঘ গোঁসাই সন্ন্যাসীর আবির্ভাব উৎসব ও সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা বা হোম উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হোম উৎসবটি চৈত্র মাসের পনর তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়া চৈত্র সংক্রান্তিতে শেষ হয়। গোঁসাই সন্ন্যাসীর কোন মূর্তি নাই; স্থানীয় একটি দীঘির পাড়ে বিল্ববৃক্ষের মূলে পূজাদি হইয়া থাকে। ভক্তদের বিশ্বাস, গোঁসাই সন্ন্যাসীর স্থানে মানত করিলে অভীষ্ট ফল পাওয়া যায়। উল্লিখিত পূজা-পার্বণগুলি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গোঁসাই সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের মেলা। পয়লা মাঘ হইতে পনরদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মঙ্গলচণ্ডী ও শিবেরমন্দির ব্যতীত আরো কয়েকটি প্রাচীন জীর্ণ মন্দির ও মনসার স্থান আছে।

শ্রীনরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
পূর্ব মঙ্গলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বীরভূম।

৬। গ্রাম : ঠিবা। ১৫০।৮৫১·১৭।২৭০।১,৫৭৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, বাগ্দী, ছুতার, হাড়ী, মুচি, বাউরী, বৈরাগী, গন্ধবণিক, নাপিত, গড়াই, স্যাকরা, কুমার ও কেওট। গ্রামটিতে মুখুজ্যেপাড়া, কুমোরপাড়া, শুঁড়িপাড়া, হাড়ীপাড়া, বাগ্দীপাড়া, মোড়লপাড়া, গোমস্তাপাড়া, শিবতলাপাড়া এবং ঠাকুরপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরি ও ব্যবসায়।

(গ) আহম্মদপুর-কাটোয়া রেলপথে কীর্ণাহার অথবা লাভপুর স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। লাভপুর-লাঙ্গলহাটা পাকা রাস্তা হইতে আর একটি পাকা রাস্তা বাহির হইয়া ঠিবা পর্যন্ত (বাগাসনা-ঠিবা রোড) গিয়াছে। বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের অন্যান্য সময় এই রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে। বর্ষাকালে মুর্শিদাবাদের হিজল বিল দিয়া অথবা লাভপুর হইতে কোপাই নদী পথে নৌকায় গ্রাম পর্যন্ত যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজ-পূজা ও জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় ধর্মরাজের স্নানযাত্রা উৎসব, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, ভাদ্র মাসে নন্দোৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে অন্নপূর্ণাপূজা ও পৌষ মাসে লক্ষ্মীপূজা ও পৌষপার্বণ, মাঘ মাসে রটন্তীকালীপূজা, সরস্বতীপূজা ও শীতলাপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, গ্রামে রসিকরায়জীউ, রাধাবল্লভজীউ, নারায়ণজীউ প্রভৃতি পারিবারিক বিগ্রহাদির নিত্যপূজা ও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে পালপার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। পূজা ও উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে শিব, ধর্মরাজ ও দুর্গামন্দির আছে। উল্লিখিত তিনটি মন্দিরই ইষ্টক নির্মিত। ইহা ভিন্ন, একটি ভগ্নপ্রায় কালীমন্দির ও ষষ্ঠীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গ্রামের নাম ঠিবা। ইহা বীরভূম জেলার পূর্বপ্রান্তস্থিত লাভপুর গ্রাম হইতে প্রায় সাত মাইল পূর্বে কোপাই নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। কোপাই নদীর আর একটি নাম বক্রেশ্বর, অর্থাৎ বহু বাঁক সম্পন্ন এই নদী। অপর নাম কুয়োনদী। ঠিবা সম্ভাবত 'দ্বীপা' শব্দের অপভ্রংশ। গ্রামটির উত্তর ও পূর্বদিকে সুপ্রসিদ্ধ লাঙ্গলহাটা জলাভূমি প্রধান। এই দুইটি দিক নদী ও খানা-কন্দরে বর্ষাকালীন প্লাবনে জলমগ্ন থাকায় স্থানটিকে দ্বীপের মতই দেখায়। 'দ্বীপা' হইতে গ্রাম্য কথা ঢিপা (উচ্চভূমি) এবং পরবর্তীকালে 'ঠিবা'-য় পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

শ্রীগদাধর মণ্ডল, শিক্ষক,
ঠিবা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ঠিবা, বীরভূম।

উৎসব বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার উৎসব

দাঁড়কা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত দণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া সাড়ম্বরে চড়ক ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহা এই অঞ্চলে সর্বজনীন উৎসব।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই গ্রামে দণ্ডেশ্বর শিব-লিঙ্গ ও তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিংবদন্তী আছে যে, কালাপাহাড় যখন বাংলাদেশের সর্বত্র হিন্দুমন্দির ধ্বংসে প্রবৃত্ত হন, তখন দণ্ডেশ্বর তাঁহার মন্দির হইতে একটি সুড়ঙ্গ পথে অবতীর্ণ হইয়া আত্মগোপন করেন। সুড়ঙ্গপথটি মন্দির হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্তী ময়ূরাক্ষী নদীর সহিত মিশিয়াছে। দণ্ডেশ্বরের উক্ত প্রাচীন মন্দির ও সুড়ঙ্গটি অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। ময়ূরাক্ষী নদীতে প্রবলবন্যা হইলে উক্ত সুড়ঙ্গপথে জল আসিয়া মন্দির গর্ভ

জলমগ্ন হইয়া যায়। শুনা যায়, সুড়ঙ্গ পথে শিবলিঙ্গটি ময়ূরাক্ষীর জলে ভাসিতে ভাসিতে নিকটবর্তী একটি গ্রামে নদীর চড়ায় আঁটকাইয়া যায়। ঐ গ্রামের জনৈক মহিলা শিবলিঙ্গটিকে দেখিতে পাইয়া স্বগৃহে লইয়া যান এবং গুগ্‌লি ভাঙ্গিবার কাজে উহাকে ব্যবহার করিতে থাকেন। ইহার কিছুকাল পরে দাঁড়কা গ্রাম নিবাসী সীতারাম মণ্ডল নামক জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদেশ পাইয়া উক্ত মহিলার গৃহ হইতে দণ্ডেশ্বরের শিবলিঙ্গকে দাঁড়কা গ্রামে আনিয়া একটি নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিত্যপূজা ও উৎসবাদির ব্যবস্থা করেন। যে গ্রাম হইতে শিবলিঙ্গটিকে পাওয়া যায় বর্তমানে তাহা শিবপুর গ্রাম নামে পরিচিত।

প্রতি বৎসর দণ্ডেশ্বর শিবঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া চৈত্র মাসের ২৭শে তারিখে হইতে ২৯শে তারিখ পর্যন্ত গাজন উৎসব এবং সংক্রান্তি তিথিতে চড়কপূজা হইয়া থাকে। উৎসবের কয়েকদিন নিয়মিত হোমপূজাদি হয় এবং সমস্ত রাত্রিব্যাপী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারীদের নৃত্যগীত ও বাজী পোড়ান হয়। প্রতি বৎসর জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রায় আড়াইশত ব্যক্তি ভক্ত বা সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। ঐ সকল ভক্তদের উৎসব উপলক্ষে নানারূপ ক্রিয়াকর্মের মধ্যে 'বাণফোঁড়া' অনুষ্ঠানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি ভক্ত প্রায় ½″ ইঞ্চি চওড়া ও প্রায় ৮ হাত লম্বা একটি লোহার শিককে লম্বালম্বিভাবে জিহ্বার অগ্রভাগে ফুঁড়িয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় এক ঘণ্টাকালব্যাপী নৃত্য করিয়া থাকেন। ভক্তরা বলেন শিবঠাকুরের কৃপায় তাঁহারা এইরূপ শিক্ ফোঁড়ার জন্য কোনরূপ দৈহিক যন্ত্রণা বোধ করেন না।

উৎসবকালে বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় দশ সহস্র নরনারী আসিয়া থাকেন এবং বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে। দণ্ডেশ্বরশিবের নিকট মানসিক করিয়া প্রধানতঃ ঢাক-ঢোলের বাজনা, দুধ-মিষ্টি ও মাটির ঘোড়া মানত করিরা থাকেন। কেহ কেহ মানত স্বরূপ ছাগ ও মেষ বলি দেন। বর্তমানে পূজারী শ্রীনারায়ণ পাণ্ডা এবং উৎসবের প্রধান ভক্ত শ্রীজগন্নাথ মণ্ডল। একটি ট্রাষ্টী কর্তৃক দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও উৎসবাদি পরিচালিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব মহুলা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে হোম উৎসব উপলক্ষে মহাকাল শিবেরপূজা হয়। গ্রামে একটি বিল্ববৃক্ষমূলে মহাকালের নির্দিষ্ট স্থান আছে। চৈত্র মাসের ১৫ই তারিখ হইতে ঐস্থানে প্রত্যহ পূজা হয় এবং সংক্রান্তি তিথিতে হোমপূজা হইয়া থাকে। হোমপূজার দিন ভক্তরা চোখের পাতায় এবং জিহ্বায় বংশশলাকা বিদ্ধ করিয়া পূজা প্রাঙ্গণে বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিয়া থাকেন। হোমপূজার পূর্ণাহুতির পর একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু যাত্রী আসিয়া থাকেন। যাত্রীদের মধ্যে অন্নসত্র ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। পূজারী কশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী ভট্টাচার্য।

ঠিবা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির দুইদিন পূর্ব হইতে পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত সাড়ম্বরে গাজন উৎসব উপলক্ষে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বুড়াশিবের বিশেষ পূজাদির ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে ইষ্টক নির্মিত উত্তর দুয়ারীর একটি পাকা মন্দিরে একটি পাষাণময় শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। এই শিলাখণ্ডই বুড়াশিব নামে খ্যাত এবং শিবের ধ্যানে নিত্যপূজাদি হইয়া থাকে। শোনা যায়, গ্রামের পূর্বদিকস্থ একটি বিল হইতে শিলাটি পাওয়া গিয়াছিল। মন্দির এবং বিগ্রহটি সাধারণের।

উৎসব উপলক্ষে ২৮শে চৈত্র হইতে অনেকে গাজনের সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন এবং এইদিন হইতে তাঁহার শুদ্ধাচার পালন করিয়া থাকেন। সংক্রান্তি ও তাহার পূর্বদিন উপবাস থাকিয়া শিবেরপূজা ও পুষ্পাঞ্জলি দেন। উৎসবের কয়েকদিন প্রত্যহ নানাবাদ্য, যথারীতি শিবপূজা ও বিশেষ ভোগারতির আয়োজন করা হয় এবং প্রত্যহ মন্দির হইতে 'বাণ গোঁসাই'কে ভক্তরা মাথায় করিয়া মহাসমারোহে 'স্নানযাত্রা' করাইতে লইয়া যান। উৎসবকালে আশেপাশের গ্রাম হইতে অনেক নরনারীর সমাগম হয়। কেহ কেহ এই সময় মানতপূজাদি দিয়া থাকেন। সাধারণতঃ ফলমূলাদি দিয়া মানতপূজা দেওয়া হয়। উৎসবটি প্রাচীন ও সর্বজনীন। ইহার প্রস্তুতি সংক্রান্তির প্রায় সপ্তাহকাল পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়। শিবের বর্তমান পূজারী শ্রীশক্তিপদ সরকার, ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা

প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সন্ন্যাসী গোঁসাইয়ের আবির্ভাব উপলক্ষে পূর্ব মণ্ডলা গ্রামে একটি দীঘির পাড়ে সন্ন্যাসী গোঁসাইয়ের নামে উৎসর্গকৃত প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর পক্ষকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

দাঁড়কা, আবাডাঙ্গা, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়াই মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, মাটির খেলনা-পুতল প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশটি দোকান ব্যতীত চার-পাঁচজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

কালীপূজার মেলা

মহেশপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালী-পূজা উপলক্ষে গ্রামের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত কালীমন্দির সংলগ্ন প্রায় দেড় বিঘা দেবোত্তর জমির উপর দশদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। জনশ্রুতি আছে, রাণীভবানীর আমল হইতে মেলাটি বসিতেছে।

বিপ্রটিকুরী, সাওতা, নানুর, কীর্ণাহার, দাসকল, রামজীবনপুর, লাভপুর, ঠিবা, মহোদরী, ঘাটতোড়, দাঁড়কা প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় চার-পাঁচ সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী ও সাইকেল করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন, মনিহারী, বই-ছবি, জামা-কাপড়, কৃষিও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধামা-কুলা-চ্যাঙ্গারী, মাটির খেলনা-পুতুল-হাঁড়ি প্রভৃতির প্রায় দুইশত দোকান বসে এবং প্রায় পঞ্চাশজন ফেরিওয়ালা আসেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ ব্যতীত কাটোয়া, কীর্ণাহার, লাভপুর, বোলপুর, সিউড়ী প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতারা প্রতি বৎসর আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, সার্কাস সিনেমা এবং লটারীর দল আসে।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

ফলগ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের পূজা উপলক্ষে পূজাপ্রাঙ্গনে দেবোত্তর জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

ঘাটতোড়, কামারহাট, ধনডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি দিন গড়ে প্রায় সাতশত নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ লাভপুর, কামারহাট, ধনডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। ময়রা, তেলেভাজা ব্যতীত মনিহারী ও শিল্পসামগ্রীর দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

শিবরাত্রির মেলা

রাখড়েশ্বর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দশী উপলক্ষে গ্রামের শিবতলায় প্রায় চারি বিঘা পরিমিত দেবোত্তর জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলার দোকানপাট প্রায় একমাস থাকিলেও প্রথম দশদিনই যাত্রীর ভীড় খুব বেশী হয়। ইন্দাস, চৌহট্টা, হাতিয়া, লাভপুর, জায়না, ঠিবা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় আড়াই সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা এবং অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত, মনিহারী বাসনকোসন, বই-ছবি, কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী চ্যাঙ্গারী-ধামা-কুলা, মাটির হাঁড়ি-কলসী-খেলনা এবং জুতার দোকান প্রভৃতি বসে। স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ ব্যতীত সিউড়ী, বোলপুর, সাঁইথিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতারা প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। মেলায় প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকানপাট ব্যতীত ছয়-সাতজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য আলকাপগান, যাত্রাগান, সাঁওতালীনৃত্য ব্যতীত নাগরদোলা, সার্কাস এবং ম্যাজিকের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

গ্রাম বিবরণী

চণ্ডীদাস নানুর

বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা ভক্ত কবি চণ্ডীদাসের স্মৃতি বিজড়িত নানুর একটি প্রাচীন গ্রাম। ভক্তর কাছে গ্রামটি তীর্থস্থান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি রসিকের কাছে একটি প্রিয় নাম। গ্রামটির পূর্ব নাম ছিল 'নানোর', চলতি কথায় 'নানুর' হইয়াছে। বর্তমানে সরকারী নথীপত্রে 'চণ্ডীদাস নানুর' নামে পরিচিত। শোনা যায় গুপ্তযুগের নরসিংহ গুপ্ত বলাদিত্য রায় যাঁর অপর নাম 'নলরাজা' গ্রামটির পত্তন করেন।

গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে। স্থানীয় লোকে বলেন, ইহা রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। এইস্থানে নলগড়্যা, তেলগড়্যা, কুলগড়্যা প্রভৃতি নামে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কয়েকটি জলাশয় এবং 'সাতরায়' দীঘি নামক একটি বৃহৎ দীঘি আছে। এই স্থানে খননকালে পাকাবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। পূর্বোক্ত রাজবাড়ীর সম্মুখে দক্ষিণ ভাগে 'অগ্রতোরণ' নামে একটি বিরাট তোরণ ছিল। তোরণটির চতুস্পার্শ্বে গড় ও পরিখার নিদর্শন আছে। ইহার চতুপার্শ্বস্থিত স্থানজুড়িয়া বর্তমান মুসলমান সম্প্রদায়ের বাসস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং পাড়াটির নাম হইয়াছে "আস্তরতোর"। মুসলমান অধ্যুষিত এই পাড়াটির উৎপত্তি সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, অগ্রতোরণের পূর্ব দিকে আগে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু পরিবারের বসবাস ছিল। মুসলমান শাসনের আমলে বহু নিম্নশ্রেণীজাত হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং ক্রমশ মুসলমান পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উল্লিখিত রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষের উপর বর্তমানে চাষ-আবাদি হইতেছে। জমিতে হাল-কর্ষণকালে কৃষকেরা সময় সময় স্বর্ণমুদ্রা এবং প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি পাইয়াছেন। এইরূপ একটি স্বর্ণমুদ্রা গ্রামের বিশালাক্ষী মন্দিরের পুরোহিতের নিকট রক্ষিত আছে। মুদ্রাটির এক পৃষ্ঠে নরসিংহ গুপ্ত বলাদিত্য রায়ের নামাঙ্কিত এবং অপর পৃষ্ঠে এক দেবীমূর্তি খোদিত আছে। মূর্তিটি বিশালাক্ষীদেবীর প্রতিমূর্তি বলিয়া অনুমান করা হয়। বিশালাক্ষীদেবীর বৃহৎ মন্দির এবং তৎসংলগ্ন রাজবাড়ী, জলাশয় প্রভৃতি দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে, এক কালে এইস্থানে জনৈক সামন্ত বা রাজা বাস করিতেন এবং নানুর এক সময় একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল।

বীরভূম জেলার সদর সিউড়ী হইতে পূর্বদিকে প্রায় ২৪ মাইল দূরে চণ্ডীদাস নানুর গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। বোলপুর হইতে কীর্ণাহারগামী যাত্রীবাহী মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, সদ্গোপ, গন্ধবণিক, মোদক, কামার, মালাকার, তাঁতি, ছুতার, কৈবর্ত, কলু, ধোপা, হাড়ী, শুঁড়ি, নমঃশূদ্র, বাগ্দী, মুচি ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বসবাস আছে এবং বাগ্দীপাড়া, মুচিপাড়া, হাড়ীপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে নয়টি পাড়া আছে। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে গ্রামে মোট ৫৩৪টি পরিবারে ২,৯১৯ জন নরনারী বসবাস করিতেছেন। কৃষিকার্য এবং ব্যবসায়ই গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা।

নানুর গ্রামে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করা হয়। যদিও এবিষয়ে বিদগ্ধ মহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কারণ অনেকে দাবী করেন বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামেই কবির প্রকৃত জন্ম ও লীলাভূমি। ছাতনায় বিশালাক্ষী বা বাসুলীমন্দির এবং চণ্ডীদাস-রামীর ভিটা ইত্যাদি আছে (৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং কবি চণ্ডীদাস নানুরের না ছাতনার সে রহস্য আজও ইতিহাসের অন্ধকারে আবৃত। শুধু তাহাই নহে, অতীতে চণ্ডীদাস নামে এক না একাধিক কবি ছিলেন সে বিষয়েও গুরুতর মতভেদ আছে। কবি চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত বিভিন্ন পদাবলীর ভনিতা এবং তাহার ভাষা ও ভাবের তারতম্য বিচার করিয়া

চণ্ডীদাস নামে একাধিক কবি ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। অথবা মূল কবি চণ্ডীদাসের নাম গ্রহণ করিয়া পরবর্তীকালে অন্যান্য কবিদের পদাবলী রচনা করাও অসম্ভব নহে।

কবি চণ্ডীদাস চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পূর্বপুরুষেরা বংশ-পরম্পরায় বিশালাক্ষী দেবীর সেবায়েত ছিলেন। প্রথম জীবনে কবি নিজেও শক্তির উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার আরাধ্য দেবী ছিলেন বিশালাক্ষী। পরবর্তীকালে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে আকৃষ্ট হন এবং রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে সুললিত বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন—

"The traditions current about the life of Chandidas give us some clue to the nature of the rivalry which has ever existed in Bengal between the Vaishnava and Sakta creeds. Chandidas, as his name implies, was by birth a Sakta, *i.e.*, a worshipper of Chandi, Durga or Sakti, as the goddess is variously called. It is said that in his early youth, Chandidas worshipped an image of Sakti which was called Bishalakshmi, and the poet often addresses the goddess in his works. As may well be imagined, the conversion of Chandidas to Vaishnavism has given rise to many tales. It is said that, on a certain day, he saw a beautiful flower floating on the river, where he had gone to bathe. He took it up and went to worship Bishalakshmi. The goddess appeared in person, and asked for the flower that she might place on her head. The worshipper was awe-struck, and enquired what strange virtue the flower could possess, so as to induce the goddess to appear in person, and to wish to keep it on her head, instead of allowing the poet to place it at her feet. The goddess replied : "Foolish child, my master has been worshipped with that flower ; it is not fit for my feet ; let me hold it on my head. "And who may thy Master be ?" enquired the poet. Krishna, was the reply ; and from that day the poet exchanged the worship of the goddess for that of Krishna. It is scarcely necessary to add that later Vaishnava writers have taken advantage of Chandidas's conversion to prove the superiority of their deity, and have invented this fable. One thing, however, is plain, namely, that the rivalry between the two creeds has prevailed in Bengal, as elsewhere in India, from remote times.

"Chandidas has immortalized the washerwoman Rami in his poems, and numerous are the stories told about their loves. The poet was informed that he could not perform *Sadhan* till he had a fair companion, not by marriage, not for money, but one to whom his heart would be spontaneously drawn at the first sight. Our poet went out in search of such a person, and it was not long before he found one. A washerwoman was washing clothes on the river side, the poet saw her and was fascinated. Day after day he would go to the river side, with a fishing rod as pretext and sat there, gazing on the woman. Words followed and love ensued, and the poet left his home and parents, and ever afterwords lived with Rami, a washerwoman as she was by caste.

"Chandidas was a renowned singer. One day, it is said, he went to a neighbouring village Matipur to sing with his paramour ; and when they were returning, the house in which they had taken shelter fell down, and they were both crushed and died in each other's arms. The story has perhaps little foundation in fact."

চণ্ডীদাসের কালে নাহুরের উত্তরে প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্তী কীর্ণাহার গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা নবাব কিরগীর খাঁ নামে জনৈক প্রতিপত্তিশালী মুসলমান ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তিনি এই অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীভুক্ত হিন্দুগণকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।

তদুপরি তান্ত্রিক সাধনাকারীগণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অনেক নিম্ন হিন্দু সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আশপাশের অগ্রতোরণ, কালিপুর, দুর্গাপুর, রামবাটী, বলরামপুর, গঙ্গারামপুর প্রভৃতি একদা হিন্দু প্রধান পল্লীতে বর্তমানে হিন্দু জাতির বাস নাই বলিলেই চলে। চণ্ডীদাস বিশালাক্ষীদেবীর সেবায়েত পদে আসীন হইবার পর সম্ভবতঃ তান্ত্রিক সাধনার প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে। চণ্ডীদাসের এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া তৎকালীন তান্ত্রিক সাধকগণ কৌশলে নবাব কিরগীর খাঁর নিকট চণ্ডীদাসকে ইসলাম ধর্মের বিশেষ শত্রু হিসাবে প্রচার করেন। তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় নবাব তাঁহার লোকজন মারফত চণ্ডীদাস ও তাঁহার সাধন সঙ্গিনী রামীকে হত্যা করেন এবং দেবদেবীর বিগ্রহাদিসহ বিশালাক্ষী মন্দির ভাঙ্গিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন বলিয়া শোনা যায়।

পরবর্তী প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া মুসলমান শাসনের ভয়ে হিন্দু সম্প্রদায় উক্ত ধ্বংসস্তূপকেই বিশালাক্ষী জ্ঞানে পূজা করিয়াছেন। প্রায় তিন শত বৎসর হইল স্থানীয় তিলি সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক গ্রামবাসী দেবীর মূর্তি এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি দেবী মূর্তি উদ্ধার করেন এবং স্থানীয় জমিদার ও গ্রামবাসীগণের একান্ত প্রচেষ্টায় বিশালাক্ষীদেবীর মন্দির পুনর্নির্মিত এবং এই নব নির্মিত মন্দিরের চতুষ্পার্শে চৌদ্দটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মন্দিরগুলি 'সরকারী পুরাকীর্ত্তি রক্ষা আইনে' সরকারী পূর্তবিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীশচীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ বিভাগের প্রধান অধিকর্তা শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপে পরীক্ষামূলকভাবে খনন কার্য চলে। খনন কার্যকালে স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কালের অংশ, একটি পূর্ণাবয়ব নরকঙ্কাল এবং কয়েকটি মৃতপাত্র পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্যাদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে বলিয়া জানা যায়। এই খনন কার্যের রিপোর্ট ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি দেবীর পূর্বতন মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি, প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রা এবং মৃৎপাত্রগুলিকে গুপ্তযুগের বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয় গ্রামটিই গুপ্তযুগে উৎপত্তি।

বীরভূম জেলায় কয়েকটি পীঠস্থান থাকার কারণে এই জেলা চিরকালই তান্ত্রিক সাধনাক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। চণ্ডীদাসের কালে বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের সমাজে অতিমাত্রায় প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহাদের মধ্যে ধর্মের নামে বীরাচার সাধন পদ্ধতিতে সমাজে তন্ত্রের তমাসিকতার স্রোত প্রবল ভাবে প্রবেশ করে। এই সাধনার জন্য প্রায়ই নরবলি হইত এবং নরবলি হিসাবে চণ্ডাল শিশুদের ব্যবহার করা হইত। বিশালাক্ষীর মন্দিরে এই তান্ত্রিক সাধন ভজনের এক মহাক্ষেত্র বলিয়া মনে হয়।

বিশালাক্ষী মন্দির সম্পর্কে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের রিডার শ্রীডেভিড ম্যাকচিয়ন মহাশয়ের মন্তব্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল :—

"The main Bishalakshi temple is of little architectural interest, but is associated with a number of temples of more traditional design. To the south are two *at-chala* Siva temples decorated with terracottas on the north facades: lotuses above the archways, floral decoration and figures in the panels up and round. The left temple has Krishnalila and dosavatara in a style very similar to those of the Lakshmi-Janardan temple at Surul, the right temple has crudely duplicated motifs. Behind them is a row of five smaller *char-chala* shrines, undecorated. To the west of the courtyard is another row of small *char-chala* temples, decorated with floral plasterwork in large panels; further to the west a solitary *at-chala* Siva temple has little decoration, but is dated 1687 Sakabda. Inside the main temple a small blackstone Saraswati is worshipped as Bishalakshi. To the north is a large mound, the site of an earlier temple,

with broken Pala images of Vishnu under a tree on top. The whole area is protected under the Ancient Monuments Act."

নান্নুর গ্রামে বিশালাক্ষী মন্দির ও তৎসংলগ্ন শিব-মন্দির ব্যতীত ধর্মরাজ ও রক্ষাকালীমন্দির আছে। নিত্যপূজা হয় এবং আশ্বিন মাসে অনেকগুলি দুর্গাপূজা হয়। অবশ্য নান্নুরের উল্লেখযোগ্য উৎসব আশ্বিনে বিশালাক্ষীপূজা এবং কার্তিকে কবি চণ্ডীদাস স্মরণোৎসব।

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শুক্লা সপ্তমী হইতে নবমী পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী মহাআড়ম্বরে বিশালাক্ষী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বিশালাক্ষী মূর্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত বাগদেবীর মূর্তির অনুরূপ। মূর্তির এক হস্তে জপমালা, এক হস্তে গ্রন্থ এবং অপর দুই হস্ত দ্বারা ধৃত বীণা। পূর্বে স্থানীয় জমিদারগণ দেবীরপূজা, হোম এবং ছাগ, মেষ ও মহিষ বলিদানের ব্যয়ভার বহন করিতেন। বর্তমানে গ্রামবাসীর সাহায্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত দেবীর পূজার পূর্বে বিশালাক্ষীর নিকট পূজা ও বলিদানের একটি প্রাচীন প্রথা প্রচলিত আছে। দেবীর ধ্যান—

"ধ্যায়েদ্দেবী বিশালাক্ষীং শরদিন্দু স্মবদনাং।
চতুর্বাহুযুক্তাং বীনাং ধারয়ন্তীং দ্বিভূর্জেঃ॥
মেব হস্তেন দাক্ষমালং মেক হস্তেন পুস্তকং।
বাম পদ্মাসনে পস্কোপাদং দক্ষং ব্রহ্মোপরি॥
ওঁ হ্রীং বিশালক্ষে নমঃ॥"

জনশ্রুতি আছে, চণ্ডীদাস মুসলমান শাসনকর্তা কর্তৃক নিহত এবং মন্দির ধ্বংস হইয়াছিল বলিয়া স্থানীয় হাড়ী সম্প্রদায় প্রতিহিংসার প্রতীক স্বরূপ বিশালাক্ষী মন্দিরের বহির্ভাগে শারদীয়া সপ্তমীতিথির দিন একটি শূকর বলি দিয়া থাকেন। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন এবং বহু নরনারীর সমাগম হয়।

কার্তিক মাসের উত্থান একাদশী তিথি হইতে নয়দিনব্যাপী চণ্ডীদাসের স্মরণোৎসব এবং তদুপলক্ষে সাত-দিন অবিরাম হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাধাকৃষ্ণ, বৈষ্ণব কবি জয়দেব-পদ্মাবতী, চণ্ডীদাস-রাইমণি, শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ ও পার্ষদগণ, কালীমূর্তিসহ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা-মূর্তি, শ্রীপার্থসারথি, অর্জুন এবং বিভিন্ন দেবদেবীর মৃন্ময় মূর্তি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ইহা ব্যতীত, উৎসব প্রাঙ্গণে চারিদিনব্যাপী বিখ্যাত কীর্তনীয়া দল কর্তৃক লীলাকীর্তন, গীতাপাঠ, বাউলগান, চণ্ডীদাসের স্মৃতিসভা, চণ্ডীদাসের জীবনীমূলক ছায়াচিত্র, রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ, ভারত সেবাশ্রম সংঘের পরিচালনায় হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে সর্বজনীন অন্নসত্রের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশ এমনকি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু নরনারী, সাধু-সন্ন্যাসী, আউল-বাউল ব্যতীত 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের' বহু সন্ন্যাসীগণ প্রায় প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। এই উৎসবটি 'চণ্ডীদাস স্মরণোৎসব কমিটি'-র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

চণ্ডীদাসের স্মরণোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে বিশালাক্ষীমন্দির সংলগ্ন চণ্ডীদাস মেলার প্রবর্তক শ্রীঅনাদি কিঙ্কর রায় মহাশয়ের প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর নয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

স্থানীয় এবং আশপাশের গ্রাম ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে সর্বসম্প্রদায়ের বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রায় সাত সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, হাঁড়িকুড়ি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয় এবং 'চণ্ডীদাস কমিটি'র কর্মীবৃন্দ তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করেন এবং সংগৃহীত অর্থের দ্বারা চণ্ডীদাস স্মরণোৎসব উপলক্ষে ব্যয় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য চণ্ডীদাস নাট্য সমিতির 'চণ্ডীদাস' নাটক অভিনয়, রাইবেঁশে নৃত্য, ব্রতচারীনৃত্য, পটচিত্রযোগে রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রায়ণ প্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

[চণ্ডীদাস নান্নুর গ্রাম নিবাসী শ্রীঅনাদি কিঙ্কর রায় মহাশয়ের প্রেরিত তথ্যের এবং পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাস দপ্তর হইতে প্রকাশিত ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের বীরভূম জেলার হ্যাণ্ডবুক-এর সাহায্য অবলম্বনে শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক রচিত।]

১। গ্রামঃ দেবগ্রাম। ১৫।৮১০·৫৪।২৭৯১,৬৯৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, সদ্গোপ, তিলি, গোয়ালা, ময়রা, আচার্য, উগ্রক্ষত্রিয়, কামার, ছুতার, নাপিত, মুচি, হাড়ী, বাগ্দী, কুলাই ও সাহা। গ্রামটিতে বারোটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কীর্ণাহার হইতে কীর্ণাহার-দাদকলগ্রাম রুটে মোটরযোগে আসিয়া কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজপূজা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, ভাদ্র মাসে বিশ্বকর্মাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিক-পূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। পূজা-পার্বণ গুলি প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রা মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিব ও ধর্মরাজের প্রস্তরময় মূর্তি এবং গ্রামের আচার্যদের বাড়ীতে একটি শীতলা ঠাকুর আছে।

এই গ্রামে বহু প্রাচীন অট্টালিকা ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ইহা ভিন্ন, ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রায় তিনশত পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীর ভগ্নপ্রায় ঘাটগুলি হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, পুষ্করিণীগুলি বহুকালের প্রাচীন। জনশ্রুতি আছে, প্রাচীনকালে এখানে বসন্ত নামে এক রাজার রাজধানী ছিল এবং গ্রামের মধ্যে হাতীডাঙ্গা নামে একটি স্থানকে উক্ত রাজার গড় ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

ইহা ব্যতীত, এই গ্রামটি পূর্বে সমৃদ্ধশালী ছিল। বহু প্রাচীন ভগ্নপ্রায় দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভবতঃ দেবলায় অধ্যুষিত বলিয়া গ্রামটির নাম 'দেবগ্রাম' হইয়াছিল।

শ্রীআদি নাথ রায়, প্রধান শিক্ষক,
ও
শ্রীনন্দদুলাল রায়, সহ-শিক্ষক,
গ্রামঃ দেবগ্রাম, পোঃ কড়েয়া, বীরভূম।

২। গ্রামঃ কীর্ণাহার। ২০।১,৩৩০·৭৩।৬৩৪।৩,৬৫০

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, বৈদ্য, বণিক, সদ্গোপ, নাপিত, ধোপা, কলু, কামার, স্যাকরা, বাগ্দী, হাড়ী, ডোম, মুচি, বাউরী ও ছুতার। গ্রামটিতে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) এখানেই একটি রেলস্টেশন আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের শুক্লা পক্ষে গোষ্টাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে গ্রামের গোচারণ ভূমিতে গোষ্ঠযাত্রা এবং মাঠের একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাধা-বিনোদজীউরপূজা হয়। পূজান্তে সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরদিবস নামকীর্তন, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ভোজ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। ইহা ব্যক্তিবিশেষের উৎসব হইলেও সর্বসাধারণ এই উৎসবে যোগদান করেন।

(ঙ) গোষ্টাষ্টমীর মেলা। কার্তিক মাসে পাঁচদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের একটি পাকা মন্দিরে রাধাবিনোদজীউ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কৃষ্ণ মূর্তিটি কষ্টি পাথরের এবং রাধার মূর্তিটি পিতল নির্মিত।

শ্রীসত্যকিঙ্কর মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ কীর্ণাহার, বীরভূম।

Kirnahar — On Ahmadpur-Katwa line. According to local tradition, Karnahar, a local chieftain of Amargarh near Mankar in Burdwan came to this place and defeated Satray of Nanoor. Some ruins round about are pointed out as the court, residence and granary of this king.

Kinkin was one of the descendants of Karnahar. He was murdered by a Pathan, Kilgghis Khan. Kinkin's consort, Rani Durgabati, retired to an adjacent village.

(District Handbooks, Birbhum, 1951 by A. Mitra, p. 148)

৩। গ্রামঃ ফজুল্লাপুর।৪৭।২৪৪.৬০।৩২।১৭৪

(ক) ব্রাহ্মণ, নাপিত, সাহা, ডোম, বাগ্দী, হাড়ী ও মুসলমান। গ্রামটিতে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বোলপুর। ইহা ব্যতীত, নানুর হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের অমাবস্যার তিথিতে ধ্রুবানন্দ নামে জনৈক সাধকের আবির্ভাব উৎসব এবং শুক্লাচতুর্দশী তিথিতে কুড়ারাজঠাকুরের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি প্রাচীন।

(ঙ) ধ্রুবানন্দ আবির্ভাব উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে পাঁচদিনব্যাপী।

(চ) গ্রামে শ্রীবিনয়ানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীধ্রুবানন্দ সেবাশ্রম এবং একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে বুড়াশিবের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীকালীকিঙ্কর দাশ, কৃষিজীবি,
গ্রাম: ফজুল্লাপুর,
পো: চালকলগ্রাম, বীরভূম।

৪। গ্রাম ঃ বেলুটি (মৌজাঃ রয়ান)।
৪৯।৯১০.৯৫।১৪৩।৭৯৭

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, নাপিত, ছত্রী, হাড়ী, মুচি, বাগ্দী ও বাউরী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বোলপুর হইতে নানুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে সপ্তাহ-কালব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহা মহাকবি কালিদাসের মেলা নামেও পরিচিত।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে অর্ধভগ্ন সরস্বতীর শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কিংবদন্তী আছে মহাকবি কালিদাস এই মূর্তির পূজা করিতেন। সম্ভবতঃ কালাপাহাড় কর্তৃক মূর্তিটি লাঞ্ছিত হইয়াছিল। সরস্বতী-মন্দিরের নিকট একটি কুণ্ড ও একটি প্রাচীন ঢিবি আছে।

অনুমান করা হয় বহুকাল পূর্বে অজয়নদী গতিপথ পরিবর্তন করায় এইস্থানে চরভূমির সৃষ্টি হয় এবং ক্রমেই জনবসতি গড়িয়া উঠে। ঐ চরাভূমিতে প্রচুর বিল্ববনের সৃষ্টি হয়। খুব সম্ভবতঃ বিল্ববন হইতে গ্রামটির নাম 'বেলুট' হয়। জনশ্রুতি আছে, রাজকন্যা বিদ্যাবতী কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া কালিদাস গভীর দুঃখে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অজয়নদীর তীরবর্তী বিল্ববৃক্ষ সমাকীর্ণ এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং এক অলৌকিক ঘটনার মধ্যে সরস্বতীদেবীর কৃপালাভ করিয়া মহাকবিরূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

শ্রীকাশীনাথ ঘোষ, শিক্ষক,
গ্রাম : বেলুটি,
পো : চারকলগ্রাম, বীরভূম।

৫। গ্রাম ঃ চারকলগ্রাম।৫৪।২,৮০৮.৬১।৫৭৫।২,৯১০

(ক) ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয়, সদ্গোপ, নাপিত, ধোপা, গোয়ালা, তাঁতি, কলু, তিলি, কামার, স্যাকরা, ছুতার, জেলে, ডোম, বাগ্দী, মুচি, বাউরী, গন্ধবণিক ও মুসলমান। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, সদ্গোপপাড়া, উগ্রক্ষত্রিয়পাড়া, বাগ্দীপাড়া, ডোমপাড়া, মুচিপাড়া, গোয়ালাপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে আঠারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরি ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বোলপুর হইতে বোলপুর-কীর্ণাহার, বোলপুর-নানুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজপূজা, ভাদ্র মাসে বিশ্বকর্মাপূজা ও মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব ও অন্নপূর্ণাপূজা, পৌষ মাসে পৌষপার্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, চৈত্র মাসের ১১ই হইতে ১৪ই পর্যন্ত 'রাধামাধবজীউ'-র বার্ষিক উৎসব এবং মহানবমীর দিনে গ্রামের মধ্যস্থলে কনকেশ্বরী দেবী নামে খ্যাত গ্রাম্যদেবীর পূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) রাধামাধবের বার্ষিকপূজা উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে তিন-চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে রাধামাধব নামে খ্যাত শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটির পায়ে নুপুর, হাতে বাঁশী ও মস্তকে মুকুটসহ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। ইহা ব্যতীত, কনকেশ্বরীদেবীর সিংহবাহিনী শিলামূর্তি, কলিঙ্গেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ এবং একটি পীরতলা আছে। প্রায় আঠার-উনিশ বৎসর পূর্বে ভারত সেবা সঙ্ঘের জনৈক প্রচারক স্বামী প্রেমানন্দ চারকলগ্রাম গ্রামে একটি মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে এই গ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধে 'পূজার-ফুল' নামে তথ্যপূর্ণ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। উক্ত পুস্তিকা হইতে জানা যায় যে, পূর্বকালে এইস্থানে কলিঙ্গ নামক জনৈক রাজার রাজধানী ছিল এবং তৎকালে এইস্থানটি কলগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি শ্বেত পাথরের শিবলিঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ শিবলিঙ্গটি কলিঙ্গেশ্বর শিব নামে খ্যাত। অনুমান করা হয়, শিবলিঙ্গটি রাজা কলিঙ্গ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আবার কাহারও মতে শিবলিঙ্গটি চারকলগ্রাম নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত মন্দিরের প্রায় অর্ধ ক্রোশ উত্তরে একটি কাঁদর আছে। মন্দির হইতে কাঁদর পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে বলিয়াও জানা যায়। 'কাঁদর' গর্ভে ইষ্টক নির্মিত কুণ্ডটি আছে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে 'ফাঁসীর পুকুর', 'হাতিডাঙ্গা', 'ঘোড়াডাঙ্গা', 'কাছারিডাঙ্গা', 'রাজার মায়ের গড়' প্রভৃতি নামে খ্যাত স্থানগুলি উল্লিখিত কলিঙ্গ রাজার স্মৃতি বহন করিতেছে। খুব সম্ভবতঃ কলিঙ্গ রাজার নামানুসারেই গ্রামের নাম 'কলগ্রাম' হয়। মতান্তরে এইস্থানটি অজয়নদীর চরাভূমির উপর অবস্থিত বলিয়া পরবর্তীকালে গ্রামটি 'চড়কলগ্রাম' অপভ্রংশে 'চারকলগ্রাম' হইয়াছে।

শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী,
গ্রাম ও পো: চারকলগ্রাম,
ও
শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
ও
শ্রীকালী নাথ ঘোষ, শিক্ষক,
চারকলগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয় বীরভূম।

৬। গ্রাম : কুমিরা ।৫৭।১৯২ ৩৭।৯২।৫২৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, বণিক, ছুতার, কলু, হাড়ী, বায়েন ও বাগ্দী।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) কীর্ণাহার অথবা বোলপুর এই উভয় রেলস্টেশন হইতেই গ্রামে যাতায়াত করা যায়। বোলপুর হইতে নানুরগামী মোটরবাসে গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা, ভাদ্র মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে দুই-তিনদিনব্যাপী।

মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে একদিন। দুইটি মেলাই বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজমন্দিরে ধর্মরাজশীলা ও মনসা-মন্দির ব্যতীত একটি প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে কালীর প্রস্তরময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

জনশ্রুতি বহুকাল পূর্বে এখান দিয়া অজয় নদী প্রবাহিত ছিল। অজয়নদের চরায় প্রচুর কুমীর দেখিতে পাওয়া যাইত। কালক্রমে এই চরার উপর জনবসতি গড়িয়া উঠিলে গ্রামের নাম হয় কুমিরা।

শ্রীসচ্চিদানন্দ ঘোষ, শিক্ষক,
কুমিরা রামরঞ্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়, বীরভূম।

৭। গ্রাম : সাওতা ।৫৯।৯৭৩ ৩১।৩৬২।১,৭১৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, তাঁতি, কলু, ধোপা, শুঁড়ি, বাগ্দী, হাড়ী, মুচি, তিলি, কামার, ছুতার, নাপিত ও মুসলমান। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, কায়স্থপাড়া, মুচিপাড়া, হাড়ীপাড়া, বাগ্দীপাড়া, কামারপাড়া, সেখপাড়া, শুঁড়িপাড়া প্রভৃতি নামে পনরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কীর্ণাহার। বোলপুর-নানুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসপূজা এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পাঁচটি শিব, দুইটি ষষ্ঠী এবং একটি মনসা আছে।

শ্রীবটকৃষ্ণ পাণ্ডা, প্রধান শিক্ষক,
সাগুতা কিরণশশী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সাগুতা, বীরভূম।

৮। গ্রাম : চিৎগ্রাম ।৬২।৫১২·০৫।৭৬।৪৮০

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, হাড়ী, মুচি ও শুঁড়ি। গ্রামটিতে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কীর্ণাহার হইতে নানুর-গামী মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজপূজা, ভাদ্র মাসে মনসাপূজা এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মাটির দেবালয় গ্রাম্যদেবী চিতিচণ্ডী প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত দেবীর নামানুসারেই গ্রামের নাম 'চিতিগ্রাম' অপভ্রংশ 'চিৎগ্রাম' হইয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ রায়, শিক্ষক,
গ্রাম : চিৎগ্রাম,
পোঃ চণ্ডীদাস নানুর
বীরভূম।

৯। গ্রাম : পেঞ্জা ।৭০।৩৬৩·৭৩।৮৪।৪৫১

(ক) বাগ্দী, হাড়ী, বায়েন ও মুসলমান। গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন গোমথ হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে পঞ্চ ভৈরবসহ মনসা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্তমানে মন্দিরটি ভগ্নপ্রায়।

শ্রীসৈয়দ আবদুস সাত্তার, শিক্ষক,
গ্রাম : বালিগুণি,
পোঃ উচকরণ, বীরভূম।

১০। গ্রাম : মুইতিন ।৭৩।২০২·৭৮।৬১।৩৫৮

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, গোয়ালা, নাপিত, গঁড়াই, হাড়ী, বাগ্দী, ডোম ও কোটাল। সদ্গোপপাড়া, গোয়ালাপাড়া প্রভৃতি নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কীর্ণাহার এবং মোটর-বাস ষ্ট্যাণ্ড নানুর হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজাটি বহু প্রাচীন এবং বর্ধমানের মহারাজ কীর্তি চন্দ্র দ্বারা প্রবর্তিত বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি মাটির দেবালয়ে শিব ও কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে মনসা ও ষষ্ঠী আছে।

প্রবাদ আছে যে, বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে ভীত হইয়া কয়েকটি পরিবার তাঁহাদের স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া জনহীন এইস্থানে আসিয়া অস্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেন। পরের বর্গীর হাঙ্গামা মিটিয়া গেলে তিনটি পরিবার ব্যতীত অন্যান্যেরা স্বগ্রামে ফিরিয়া যান। ঐ তিনটি পরিবার হইতেই গ্রামের পত্তন হয় এবং গ্রামের নাম হয় "মুইতিন" অর্থাৎ আমরা তিনজন।

শ্রীনীলকণ্ঠ রুদ্র, প্রধান শিক্ষক,
মুইতিন-মাসরা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বীরভূম।

১১। গ্রাম ঃ বালিগুণি।৭৪।৮০।১০।৩১৩।১,৬১৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, বণিক, নাপিত, ছুতার, কলু, শুঁড়ি, কামার, হাড়ী, মুচি, বাগ্দী, বাউরী ও মুসলমান। গ্রামটিতে হালদারপাড়া, শুঁড়িপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, বাগ্দীপাড়া, হাড়ীপাড়া, মুচিপাড়া, কাজিপাড়া, মিঞাপাড়া, মোল্লাপাড়া, মল্লিকপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কীর্ণাহার হইতে জেলাবোর্ডের কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়। ইহা ব্যতীত, বোলপুর হইতে নানুরগামী মোটরবাসে করিয়াও গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে অন্নপূর্ণাপূজা এবং চান্দ্রমাস অনুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে নাটমন্দিরসহ ধর্মরাজের একটি পাকা মন্দির আছে। মন্দিরে ধর্মরাজের শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহা ব্যতীত, গ্রামে দুইটি মসজিদ, একটি মনসা, একটি ষষ্ঠী এবং দুইটি শালগ্রামশিলা আছে।

কিংবদন্তী আছে যে, প্রাচীনকালে অর্থাৎ পাঠান রাজত্বকালে এইস্থানটি একটি বালুকাময় চর ছিল। এই চরে অজ্ঞাতনামা এক সাধুব্যক্তি আশ্রম স্থাপন করিয়া বসবাস করিতেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁহার আশ্রমে আসিতেন। তিনি যে প্রকৃতপক্ষে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহা অজ্ঞাত। গ্রামের সর্বসম্প্রদায়ের লোকজনই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তিনি নানা অলৌকিক গুণের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার কৃপায় বহু দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় হইত এবং বন্ধ্যা নারী সন্তানবতী হইতেন। তাঁহার এইরূপ গুণ থাকার জন্য গ্রামবাসীগণ তাঁহাকে 'গুণি' বলিতেন। বালিচরের উপর এই গুণির আশ্রম ছিল বলিয়া গ্রামের নাম হয় "বালিগুণি"।

শ্রীনায়েরউদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ উচকরণ, বীরভূম।

১২। গ্রাম ঃ উচকরণ।৭৮।১,৪৩২।৬৩।৩৩০।১,৭৩১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, নাপিত, কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতি, ময়রা, শুঁড়ি, ডোম. হাড়ী, বাউরী, বাগ্দী, মুচি ও মুসলমান। গ্রামটিতে চৌদ্দটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) কীর্ণাহার ও বোলপুর এই উভয় রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। গ্রামের প্রায় দুই মাইল দূর দিয়া বোলপুর-নানুর রুটের মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজপূজা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, চাঁদ রায়ের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত পূজা ও উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি ধর্মরাজমন্দির, একটি কালীমন্দির এবং একটি চাঁদরায়মন্দির আছে। চাঁদরায়ের মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ শিল্পকার্য বিশেষ প্রশংসনীয় এবং মন্দিরের দরজাটি কাষ্ঠনির্মিত হইলেও উহার কারুকার্য দেখিলে স্বভাবতই প্রস্তর নির্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। মন্দিরটি স্থানীয় অঞ্চলের একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

উচকরণ একটি প্রাচীন গ্রাম। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রামটির উৎপত্তি বলিয়া মনে করা হয়। অতীতে গ্রামটির উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল যার অনেক নিদর্শন আজও দেখিতে পাওয়া যায়। এছাড়া একদা গ্রামে তন্ত্র সাধনারও খুব প্রচলন ছিল; এখনও গ্রামে তান্ত্রিক সাধনার কিছু কিছু প্রমাণ বিদ্যমান। পরবর্তীকালে গ্রামে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব পড়ে। গ্রামে গোপাল, শ্রীধর, লক্ষ্মীজনার্দন প্রভৃতি দেবতার পূজাই তাহার প্রমান। ইহা ভিন্ন, ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি বাসুদেব মূর্তি পূজা হয়। বাসুদেব অধ্যুষিত এই গ্রামটির নাম এককালে 'বাসুদেবনগর' ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। নবাব আলিবর্দী খাঁর শাসনকালে বর্গীর অত্যাচারের ভয়ে ভীত হইয়া গাঙ্গেয় অঞ্চল হইতে বর্তমান গ্রামের চৌধুরীরা এই গ্রামে

আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। চৌধুরীবাবুদের পূর্বে উপাধি ছিল চট্টোপাধ্যায়। চৌধুরী পরিবারের অনেকেই নবাব সরকারে কাজ করিতেন এবং তাঁহাদের কাজে সন্তুষ্ট হইয়া নবাব আলিবর্দী খাঁ চৌধুরীদের প্রভূত ভূ-সম্পত্তি এবং চৌধুরী উপাধি দেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামবাসীগণের সেবাকার্যের দ্বারা চৌধুরী পরিবার ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন এবং তৎকালীন সরকার বাহাদুর গ্রামটির নাম 'বাসুদেবনগর' স্থলে "উচ্চকরণ" নামে রাজস্ব নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দেন। 'উচ্চকরণ' হইতে কালক্রমে গ্রামটির নাম 'উচ্‌করণ' হইয়াছে।

শ্রীতারাপদ দাস, প্রধান শিক্ষক,
উচকরণ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ উচকরণ, বীরভূম।

১৩। গ্রাম : সেরান্দি ।৮১।২,৯৬৭·৭২।৩৪৭।২,০৩৫

(ক) বৈষ্ণ, সদ্‌গোপ, বাগ্দী, বাউরী, চুনারি, ডোম ও গন্ধবণিক। গ্রামটিতে আঠারোটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বোলপুর হইতে পালিত-পুরগামী রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে পঞ্চমী তিথিতে আদিরাক্ষ নামে খ্যাত ধর্মরাজপূজা এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মরাজ পূজাটি খুবই প্রাচীন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে দুই-তিনদিন ব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজ ও শিবের মন্দির ব্যতীত একটি পঞ্চানন্দ আছে।

শ্রীবিভূতি রায়, শিক্ষক,
সেরান্দি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
বীরভূম।

১৪। গ্রাম : বঙ্গছত্র (মৌজা বেঙ্গচাতরা)।
৮৩।৭১৫·০২।১৭৫।৯২৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, সদ্‌গোপ, কামার, ছুতার, শুঁড়ি, মোদক, কলু, ডোম, বাগ্দী, চামার ও হাড়ী। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, কামারপাড়া, বাগ্দীপাড়া, ডোমপাড়া, হাড়ীপাড়া, চামারপাড়া প্রভৃতি নামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, পশুপালন, চাকুরি ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। ইহা ব্যতীত, বোলপুর হইতে মোটরবাসেও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনীযুক্ত একটি মন্দিরে ধর্মরাজের শীলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরে সম্মুখে একটি নাটমন্দির আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে পঞ্চানন্দ ও দুইটি মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীশংকর প্রসাদ নায়ক, প্রধান শিক্ষক,
বঙ্গছত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সেরান্দি, বীরভূম।

১৫। গ্রাম : কুলে ।৮৪।৫৭২·৫৪।১৯৭।৯৮১

(ক) ব্রাহ্মণ, গন্ধবণিক, সদ্‌গোপ, বাগ্দী, চামার, ডোম, হাড়ী, নাপিত, উগ্রক্ষত্রিয়, স্যাকরা, ছুতার ও মুসলমান। গ্রামটিতে বাগ্দীপাড়া, মুচিপাড়া, বেণেপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, সেখপাড়া, মোল্লাপাড়া প্রভৃতি নামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বোলপুর। বোলপুর-পালিতপুর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে পদ্মেশ্বরীপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসব-পার্বণগুলি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে চারদিন ব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও একটি দুর্গামণ্ডপ ব্যতীত কালীঠাকুরের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীঅনাদি প্রসাদ ভাণ্ডারী, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ কুলে, বীরভূম।

১৬। গ্রাম ঃ শ্রীরামপুর।৮৭।৩৩২৭।৮০।৫১০

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, সদ্‌গোপ, গোয়ালা, ডোম, মেটে, বায়েন ও নাপিত। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, বায়েনপাড়া, গোয়ালাপাড়া এবং মণ্ডলপাড়া নামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বোলপুর। গ্রামের পশ্চিম দিক হইতে একটি কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া বনগ্রামের মধ্য দিয়া বঙ্গছত্র গ্রামের কাছে বোলপুর-পালিতপুর পাকা রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। বঙ্গছত্র হইতে মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও চামুণ্ডাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত পূজা ও উৎসবগুলি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে শিব, কালী ও মনসার মন্দির আছে। জনশ্রুতি আছে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য এখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে এখানে সাধুসন্ন্যাসীগণের সাধনস্থলে পরিণত হয়। পরবর্তী কালে জনৈক রামভক্ত সন্ন্যাসী এইস্থানে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন এবং তিনিই নাকি তাঁহার আরাধ্য দেবতার নামানুসারে গ্রামের নাম রাখেন শ্রীরামপুর।

শ্রীশিবকিঙ্কর দত্ত, শিক্ষক,
শ্রীদিবাকর ফৌজদার, শিক্ষক,
শ্রীসত্যকিঙ্কর রজক, শিক্ষক,
শ্রীরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জলন্দী, বীরভূম।

১৭। গ্রাম ঃ বেলী।৯২।৩৮৩ ৩৪।১০০।৪৮৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, সদ্‌গোপ, নাপিত, কামার, ছুতার, চামার, ডোম ও মুসলমান। গ্রামে চামারপাড়া, ডোমপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে রেলস্টেশন বোলপুর হইতে একটি কাঁচা রাস্তায় যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবের গাজন, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব এবং রাধাবিনোদ ও শ্রীধর বিষ্ণুর নিত্যপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ, মহরম, সবেবরাত প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দিরে ষষ্ঠী ও বেলইচণ্ডী সহ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, গ্রামের সীমান্তে বেলাইচণ্ডীর একটি অনাচ্ছাদিত পাকা মণ্ডপ ও একটি আশ্রম এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীরজনীমোহন গোস্বামী, প্রধান শিক্ষক,
বেলী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ঃ বেলী পোঃ বন্দর, বীরভূম।

১৮। গ্রামঃ নবস্তা।১৩০।৭৬২ ৪১।৯৫।৬১৭

(ক) সদ্‌গোপ, মোদক, কলু, গন্ধবণিক, গোয়ালা, কুমার, নাপিত, ছুতার, ডোম, মুচি, বাগ্‌দী ও মুসলমান। গ্রামটিতে মল্লিকপাড়া, সেখপাড়া, খাঁপাড়া, মোল্লাপাড়া, খাদিমপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, বেনেপাড়া, কুমারপাড়া, ডোমপাড়া, বাগ্‌দীপাড়া, কোটালপাড়া, মুচিপাড়া প্রভৃতি নামে অনেকগুলি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বোলপুর হইতে মোটরবাসযোগে বাঁশাপাড়া বাসষ্ট্যাণ্ডে নামিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। ইহা ব্যতীত, বোলপুর-পালিতপুর রুটের মোটরবাসে করিয়াও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চান্দ্রমাস অনুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। মেলাটি স্থানীয় অঞ্চলে 'সুকো বাগানের মেলা' নামে খ্যাত।

(চ) গ্রামে জগন্নাথ মন্দির ও দুর্গামণ্ডপ ব্যতীত বিষ্ণু, ভগবতী, লক্ষ্মী এবং ধর্মরাজ আছে।

শ্রীসামশুল বারী খোন্দকার, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ দাস্তপাড়া,
পোঃ সরস্বতীবাজার, বীরভূম।

উৎসব বিবরণী

কনকেশ্বরী পূজার উৎসব

চারকলগ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের শুক্লা মহানবমী তিথিতে গ্রাম্যদেবী কনকেশ্বরীর বার্ষিকপূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি সিংহবাহিনী শিলামূর্তি আছে; এই মূর্তিকেই কনকেশ্বরী নামে পূজা করা হয়। মূর্তিটি সারা বৎসর গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে থাকে এবং তথায় নিত্যপূজা হয়। বার্ষিকপূজা উপলক্ষে নবমী তিথিতে উক্ত ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে শোভাযাত্রা সহকারে মূর্তিটি আনিয়া গ্রামের পূব সীমানায় একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের মূলে নির্দিষ্ট বাঁধানো বেদীর উপর স্থাপন করিয়া সারাদিনব্যাপী মহাসমারোহে ষোড়শোপচারে পূজা এবং পূজার শেষে দেবীর নিকট উৎসর্গীকৃত প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি ছাগ ও মেষ বলি হইয়া থাকে। দুর্গার ধ্যানে কনকেশ্বরীর পূজা হয়। উৎসবকালে দেবীমূর্তি দর্শন করিতে ও পূজা দিতে আশপাশের গ্রাম হইতে চার-পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়। দর্শকদের মধ্যে সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যাকালে কনকেশ্বরী মূর্তিটিকে পুনরায় ঢাক-ঢোলের বাদ্যসহ শোভাযাত্রা করিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। দেবীর নামে প্রদত্ত দৈব ঔষধের দ্বারা নানারূপ দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হয় বলিয়া ভক্তদের বিশ্বাস। এই কারণে বিভিন্ন স্থান হইতে এমনকি মধুপুর, গিরিডি ও কলিকাতা হইতে বহু নরনারী দৈব ঔষধ সংগ্রহ করিতে এখানে আসেন। বর্তমান দেবীর সেবায়েত শ্রীক্ষীরোদ গোপাল মুখোপাধ্যায়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার উৎসব

বঙ্গছত্র গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত মহাসমারোহে ধর্মরাজঠাকুরের বার্ষিকপূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন ও সর্বজনীন। এই উৎসবের প্রস্তুতি প্রায় একমাস পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়। গ্রামে মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনীযুক্ত একটি ঘরে ধর্মরাজের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসব উপলক্ষে ধর্মরাজেরমন্দির ও তৎসংলগ্ন নাটমন্দিরটিকে সুসজ্জিত করা হয়।

উৎসবের প্রথম দিন অর্থাৎ দ্বাদশী তিথিতে এই অঞ্চলের অনেকে ধর্মরাজের নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এইদিন ভক্তরা ধর্মরাজেরমন্দির হইতে ধর্মরাজের প্রতীক স্বরূপ দারুময় বাণেশ্বর মূর্তিটিকে মাথায় করিয়া একটি পুষ্করিণীতে স্নান করাইতে লইয়া যান এবং নিজেরাও স্নান করিয়া বাণেশ্বরসহ মন্দিরে ফিরিয়া আসেন।

ত্রয়োদশীর দিন ব্রতগ্রহণকারী ভক্তরা সারাদিন উপবাস থাকেন এবং সন্ধ্যাবেলায় ধর্মরাজের পূজার পর মন্দিরের পুরোহিতের নিকট হইতে উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া গলায় ধারণ করেন। চতুর্দশীর দিন ভক্তরা সমস্ত দিন উপবাসী থাকেন এবং সন্ধ্যাবেলায় বাণেশ্বরকে পুষ্করিণীতে মুক্তিস্নান করাইয়া নিজেরাও স্নান করেন। স্নানের পর ভক্তরা মহোল্লাসে ঢাক-ঢোলের বাদ্যিসহ শোভাযাত্রা করিয়া বাণেশ্বর মূর্তিটিকে মাথায় লইয়া মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। পুষ্করিণী ঘাট হইতে মন্দিরে আসিবার সময় ভক্তরা নানারূপ শারীরিক ক্রিয়া-কৌশল দেখাইয়া থাকেন। রাত্রিকালে ধর্মরাজের পূজা শেষ হইলে পর ভক্তরা সামান্য ফলমূল ও দুগ্ধ সেবন করিয়া উপবাস ভঙ্গ করেন।

পরদিন অর্থাৎ পূর্ণিমা তিথিতে সাড়ম্বরে ধর্মরাজের হোম পূজাদি হয়। এইদিন ধর্মরাজের "ভাণ্ডার ভরা" নামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে দ্বিপ্রহরে ভক্তরা কলসীপূর্ণ মদ্য ও দুগ্ধ লইয়া বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। গ্রাম প্রদক্ষিণের পর ভক্তরা মন্দিরে ফিরিয়া আসিলে ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে ছাগ ও মেষ বলির পর উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এইদিন প্রকৃতপক্ষে উৎসবের সমাপ্তি হইলেও পরের দিন ভক্তগণ বাণেশ্বরকে মাথায় লইয়া গ্রামের প্রতিটি গৃহস্থদের বাড়ী হইতে চাউল ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন এবং সংগৃহীত চাউল ও অর্থাদির দ্বারা সন্ধ্যাকালে বান্ধব ভোজনের আয়োজন করেন। বান্ধব ভোজনের পূর্বে ভক্তরা নিজ নিজ উত্তরীয় পরিত্যাগ করেন। উৎসব উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয় এবং আশপাশের গ্রাম হইতে বহু নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে।

চামুণ্ডাপূজা

শ্রীরামপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের শুক্ল নবমী তিথিতে গ্রামের সাধারণের দেবী চামুণ্ডার মহা-সমারোহে বার্ষিকপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তগণের বিশ্বাস দেবী চামুণ্ডা বিশেষ জাগ্রত দেবী। শুনা যায়, প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে গ্রামের মধ্যবর্তী জঙ্গলের মধ্য হইতে চামুণ্ডা মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয় এবং তদবধি দেবীরপূজা চলিয়া আসিতেছে। মূর্তিটি চতুর্ভুজা, ক্রোড়ে ভৈরব। তবে মূর্তিটি একটি পদ ভগ্ন। গ্রামে লতাগুল্ম আবৃত সুউচ্চ প্রাচীন ঢিবির উপর চামুণ্ডার পূজা হইয়া থাকে। এই ঢিবির উপর একটি নরমুণ্ড ও একটি মনুষ্য কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। উৎসবকালে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী দেবী দর্শন করিতে ও পূজা দিতে আসেন। যথারীতি পূজার শেষে দেবীর নিকট উৎসর্গীকৃত অগণিত মেষ ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে প্রসাদ বিতরণ ও সর্বজনীন ভোগ বিতরণ করা হয়।

রাধামাধবজীউর পূজা

চারকলগ্রামে প্রতি বৎসর ১১ই চৈত্র হইতে ১৪ই চৈত্র পর্যন্ত চারদিনব্যাপী সাড়ম্বরে রাধামাধবজীউর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাধামাধবজীউর বিগ্রহ অবশ্য সীমান্তবর্তী বর্ধমান জেলার খড়ো গ্রামে থাকে। উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ২৯শে ফাল্গুন খড়ো গ্রাম হইতে রাধামাধব, রাধারানী ও জগন্নাথদেবের বিগ্রহসহ দ্বাদশ শালগ্রামশিলা মহাসমারোহে পাল্কী করিয়া এই গ্রামের পূজা মণ্ডপে আনা হয় এবং উৎসবান্তে ১৫ই চৈত্র পুনরায় পাল্কী করিয়া উল্লিখিত বিগ্রহাদি খড়ো গ্রামে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় সারা বৎসরব্যাপী রাধামাধবজীউর নিত্যপূজাদি হইয়া থাকে।

রাধামাধব বিগ্রহ সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, কোন এক সময় যশোহরের মহারাজ (?) তীর্থ করিতে বৃন্দাবনে আসিয়া অষ্টসখী বেষ্টিত রাধামাধবের অপূর্ব সুন্দর বিগ্রহ দর্শন করিয়া অভিভূত ও মুগ্ধ হইয়া যান এবং স্বয়ং সেবাপূজা করিবার জন্য কোনক্রমে রাধামাধব বিগ্রহকে স্বদেশে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কিছুকাল পরে প্রেমানন্দ গোস্বামী নামে জনৈক বৈষ্ণব সাধক তীর্থ পর্যটনে বাহির হইয়া যশোহরে-এ আসিয়া উপস্থিত হন এবং উল্লিখিত রাধামাধব মূর্তি দর্শন করিবামাত্রই তাঁহার ভাব সমাধি হয়। তিনি এইরূপ সমাধিস্থ অবস্থায় যশোহরের মহারাজাকে রাধামাধব বিগ্রহকে মুক্তি দিয়া প্রেমানন্দ গোস্বামীর হস্তে সেবাপূজার ভার অর্পণ করিতে নির্দেশ দেন। রাধামাধব বিগ্রহকে ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া মহারাজ বড়ই ব্যথিত ও হতাশ হইয়া পড়েন এবং অবশেষে প্রেমানন্দ গোস্বামীকে ছলনা করিবার উদ্দেশে রাধামাধবের মূর্তির অনুরূপ আরও কয়েকটি নিখুঁত মূর্তি নির্মাণ করাইয়া আসল মূর্তিটির সহিত একত্র রাখিয়া প্রেমানন্দ গোস্বামীকে আসল মূর্তিটি বাছিয়া লইতে বলেন। এইরূপ বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়া প্রেমানন্দ গোস্বামী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে স্বয়ং রাধামাধবের ইঙ্গিতে কোনটি আসল মূর্তি তাহা স্থির করিতে পারেন এবং তদানুযায়ী তিনি রাধামাধবের মূর্তি লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

চারকলগ্রামে প্রতি বৎসর রাধামাধবের পূজা ও উৎসব উপলক্ষে ভোরে মঙ্গলারতি ও ক্ষীর, ছানা, ননী ইত্যাদি নৈবেদ্য দিয়া বাল্যভোগ, দ্বিপ্রহরে অন্নভোগ ও রাজভোগ, অপরাহ্নে ডাব ও ফলাদি দিয়া গাত্রোত্থান ভোগ, সন্ধ্যায় আরতি এবং অর্ধরাত্রে ভোগ ও শয়নারতির পর প্রতিদিনের পূজা ও উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। ইহা ভিন্ন, উৎসব প্রাঙ্গণে চব্বিশপ্রহরব্যাপী অখণ্ড হরিনামকীর্তন ও ধুলট উৎসব হয়। উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন বিগ্রহ দর্শন করিতে ও পূজাদি দিতে আশপাশের গ্রাম হইতে বহু নরনারী আসিয়া থাকেন। দিবাভাগে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে রাজভোগের পর উপস্থিত নরনারীদের মধ্যে অন্নভোগ বিতরণ করা হয় উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন। প্রেমানন্দ গোস্বামীর বংশধরগণ অদ্যাপিও রাধামাধবের নিত্যপূজাদি করিতেছেন।

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা

ফজুল্লাপুর গ্রামের ধ্রুবানন্দজীউর আবির্ভাব উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে প্রায় পনর বিঘা জমির উপর পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন থানা এবং আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় ছয়-সাত সহস্র যাত্রী ট্রেন, মোটরবাস এবং সাইকেল করিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির খেলনা প্রভৃতির প্রায় পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের অর্থ দিয়া উৎসবের ব্যয়ভার বহন করা হয়।

গোষ্ঠাষ্টমীর মেলা

কীর্ণাহার গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে গোষ্ঠাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে রাধাবিনোদমন্দিরের সম্মুখে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর পাঁচদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

গ্রাম এবং আশপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায় প্রায় এক সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ স্থানীয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য ঝুমুরগান, রামায়ণগান এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

চড়ক-গাজন ও নীলপূজার মেলা

কুলে গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে গ্রামের খ্যাওড়াপুকুরের পাড়ে প্রায় এক বিঘা জমির উপর চারদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচশত নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা মনিহারী, ধামা-কুলা, মাটির হাঁড়িকুড়ি-খেলনা ইত্যাদির প্রায় পঁচিশটি দোকান বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, যাত্রাগান, আলকাপগান, লুটোগান প্রভৃতির দল আসে।

দুর্গাপূজার মেলা

নবস্থা গ্রামের প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামে কুমারথালি নামক পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত স্থকোবাগান নামক আমবাগানে প্রায় দশ বিঘা জমির উপর তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। স্থানীয় অঞ্চলে মেলাটি "স্থকো বাগানের মেলা" নামে পরিচিত।

আশপাশের নওয়ানগর, কড্ডা, পলিশগ্রাম এবং বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দেড় সহস্র নরনারীর মোটরগাড়ী এবং গরুরগাড়ী করিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দোকান ব্যতীত অস্থায়ী হোটেল এবং রেঁস্তোরাও বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ নূতনহাটা, বোলপুর, বর্ধমান, কাটোয় প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক ব্যতীত চলচিত্র দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

মনসাপূজার মেলা

পেঞা গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে মনসামন্দির সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের উচকরণ, চায়কলগ্রাম, নান্নর প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসন-কোসন, প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রায় পঞ্চাশটি দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ সেরান্দি, কীর্ণাহার, দধিয়া, বালিগুণি, থানপুর, আরগুস প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য মল্লক্রীড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে।

কুমিরা গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে গ্রামের ধর্মরাজতলায় তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

সাওতা, নান্নুর, কলাগ্রাম এবং আশপাশের অন্যান্য কয়েকটি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, মাটির হাঁড়িকুড়ি, সস্তার বই-ছবি, ধামা-কুলা, খেলনা প্রভৃতির প্রায় পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাগান, কবিগান, বোলানগান প্রভৃতির দল আসে।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : কুমিরা গ্রামে অনুষ্ঠিত ধর্মরাজপূজার মেলাটি উল্লিখিত মেলা বিবরণী অনুরূপ।]

সাওতা গ্রামের শ্রাবণ মাসে মনসাপূজার মেলাটি মনসামন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য বসে। মেলাটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন। উদয়পুর, বেলগ্রাম, মুণিগ্রাম, কুমিরা, সন্তোষপুর, বেলুটি, ফতেপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচশত নরনারী প্রধানতঃ গরুরগাড়ী এবং সাইকেল করিয়া মেলায় আসেন। ময়রা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, খেলনা, ধামা-কুলা প্রভৃতির দোকান বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য বোলানগানের ব্যবস্থা থাকে।

রথযাত্রার মেলা

দেবগ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের ধর্মরাজমন্দির সংলগ্ন প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় সাত-আটশত নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বই-ছবি প্রভৃতি দ্রব্য-সামগ্রীর প্রায় কুড়িটি দোকান ব্যতীত আইসক্রীম, চানাচুর ইত্যাদি দুই-চারটি দোকান বসে। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাগান ও পালাগানের দল আসে।

রাধামাধবের মেলা

চারকলগ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রাধামাধবজীউর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রাধামন্দির সংলগ্ন প্রায় পাঁচ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তির উপর তিন-চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

রয়ান, নান্নুর, কীর্ণাহার, কেউপুর, মধুপুর, সাওতা, কুমিরা, বনগ্রাম, সেরান্দি, বেঙচাতরা, কুরন্বঘোষ, নদাওয়া, যূপপাড়া, শাঁকবাহা, উচকরণ, গোয়াসেবান্দি বন্দর, পুন্দরা, থানা, হাটতলা, মোহনপুর, বাহিরী, মুলুক, বোলপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে প্রতিদিন গড়ে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী মোটরবাস ও গরুরগাড়ী করিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বইছবি, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী নানাপ্রকার সৌখীন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা, কাগজের ফুল প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকান বসে। মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কাটোয়া, বোলপুর, দাইহাট, কৃষ্ণনগর, সিউড়ী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, নাগরদোলা, কীর্তনগান, বাউলগান ব্যতীত বিভিন্ন খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয়।

শিবরাত্রির মেলা

সেরান্দি গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে গ্রামের শিবতলা নামক স্থানে তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, হাঁড়িকুড়ি, খেলনা প্রভৃতির প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, যাত্রা-গান, কবিগান, থিয়েটার, আলকাপগান প্রভৃতির দল

আসে এবং জলসার ব্যবস্থা থাকে। এই সকল অনুষ্ঠানে বহু দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

সরস্বতীপূজার মেলা

বেলুটি গ্রামে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে প্রায় সপ্তাহকাল একটি মেলা বসে। সরস্বতী-মন্দির সংলগ্ন প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর এবং বোলপুর নানুর রোডের উভয় পার্শ্বে মেলার দোকানপাট বসে। মেলাটি 'কবি কালিদাসের মেলা' নামেও পরিচিত এবং 'কালিদাস মেলা কমিটি' নামে একটি সঙ্ঘের দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন মেলা।

আশপাশের বড়া, নানুর, সাওতা প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুই সহস্র নরনারী ট্রেন, মোটরবাস এবং গরুরগাড়ী করিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, কাপড়-চোপড়, বই-ছবি, মাটির হাঁড়িকুড়ি-খেলনা প্রভৃতির দোকানপাট ব্যতীত বোলপুর, নানুর, সাওতা, শিয়ান, বড়া, চারকলগ্রাম প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে বিক্রেতারা আসেন। মেলার প্রায় একশত দোকান বসে এবং পঞ্চাশজন ফেরিওয়ালা আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও নাগরদোলা সার্কাসের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় ও লটোগানের আয়োজন করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দেড় সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : মল্লারপুর ।২২।১,৩১০·৩২।৫৯৫।৩,০৭৪

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ ও মেথর। গ্রামটিতে মোট আঠারোটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে এবং স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াতের জন্ম পাকা রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে মল্লেশ্বর শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাঁচদিন। মেলাটি প্রায় আটশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবি করা হয়।

(চ) গ্রামে নাটমন্দিরসহ মল্লেশ্বর সিদ্ধনাথশিবের একটি বৃহৎ পাকা মন্দির ব্যতীত আরো কয়েকটি শিবমন্দির এবং সিদ্ধেশ্বরীদেবীর মন্দির আছে।

জনশ্রুতি আছে, স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী রাজা মল্লনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বরশিবের নাম হইতে গ্রামের নাম 'মল্লপুর' হইয়াছে।

শ্রীবিজয়শশি ভট্টাচার্য, শিক্ষক,
বার্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বীরভূম।

মল্লারপুর—থানা জংশন হইতে ৫৪ মাইল দূর। ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এই গ্রামে মল্লেশ্বর নামে এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শিব আছেন। গ্রামের পূর্ব্বাংশে শিবপাহাড়ী নামে একটি পাহাড় আছে। কথিত আছে, যে দ্রৌপদী হরণে অকৃতকার্য্য ও ভীম কর্তৃক অপমানিত জয়দ্রথ এই শিবপাহাড়ীতে আসিয়া সিদ্ধনাথ শিবের উপাসনা করিয়া যুদ্ধে অজেয়তার বর লাভ করেন। শিবরাত্রি ও চৈত্রসংক্রান্তির সময় এখানে মেলা হয়।

[১৯৪০ খৃষ্টাব্দে 'পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ' হইতে প্রকাশিত "বাংলায় ভ্রমণ", গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পৃঃ ১২৫]

Mallarpur—Compound of Malleshwar Siva, to the south of the village: 25 temples surtounded by a wall, the majority small *char-chala* shrines each containing a lingam, all built of *phulpathar*. Those on the east generally display carving above the archways and sometimes in the vertical panels as well: subjects include Krishna, Kirtan, Durga, Siva, floral designs, etc. One of these is dated 1724 Sakabda, The most interesting is a slightly larger *pancha-ratna* in the centre with early floral motifs and evident signs of rebuilding. Rebuilding is also evident on the west side, where many carvings from earlier structures (especially Krishnalila scenes) have been reincorporated in the walls. One such structure is now used as a kitchen: another, octogonal, with a large porch, now houses a crude stone Kali. The northwest temple is modern. The temples to the south and southwest are plain. The main, double-storied entrance to the compound is on the north, but a subsidiary entrance leads to the pond on the east: more carvings from earlier structures have been incorporated in the walls of this subsidiary entrance; Singhavahini, warriors, etc.

(District Census Handbook, Birbhum, 1961 : by Shri B. Ray, p. 119)

২। গ্রাম : কুণ্ডলা ।৮১।২১৮·৩২।২১৫।১,০৬০

(ক) ব্রাহ্মণ, হাড়ী, সদ্গোপ, বাগ্দী, জেলে, চুনারী, নাপিত, ডোম ও মুসলমান। গ্রামটি ব্রাহ্মণপাড়া, সদ্গোপপাড়া, হাড়ীপাড়া, জেলেপাড়া, বাগ্দীপাড়া, চুনারীপাড়া, ডোমপাড়া প্রভৃতি নামে সাতটি পাড়ায় বিভক্ত।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে সাঁইথিয়া রেলস্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটিই প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীচণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
গ্রাম : কুণ্ডলী, পো : ইন্দুরী, বীরভূম।

৩। গ্রাম : ডাবুক।১৫৮।১,০৫৮·৩৫।২৮৫।১,৫১২

(ক) রাজপুত, সদ্‌গোপ,লেট, দাই, ভুঁইমালী ও মুসলমান। সদ্‌গোপপাড়া, রাজপুতপাড়া, লেটপাড়া, দাইপাড়া, ভুঁইমালীপাড়া প্রভৃতি নামে গ্রামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন মল্লারপুর হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের অন্যান্য সময় এই রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে ডাবুকেশ্বর নামে খ্যাত এক অনাদি শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি প্রাচীন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে সাত-আটদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ডাবুকেশ্বর শিবের ইষ্টক নির্মিত একটি মন্দির আছে। প্রাচীন মন্দিরটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইলে বাংলা ১২৮৪ সনে শিবমন্দিরটি পুনঃনির্মিত হয়। বর্তমান মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় আশী হাত এবং উহার চতুর্দিকে প্রায় দুই বিঘা জমির সীমানার মধ্যে অনেকগুলি যাত্রীনিবাস আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে একটি ধর্মরাজ-মন্দির এবং একটি মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির আছে।

শ্রীগুরুপদ পাণ্ডা, চিকিৎসক,
গ্রাম : চণ্ডীপুর, পোঃ সাহাপুর, বীরভূম।

৪। গ্রাম : বীরচন্দ্রপুর।১৬৪।৮২৫·১৮।৩০১।১,৬৬৪

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, বৈরাগী, ময়রা, তাঁতি, গরাই, লেট, মাল ও নাপিত। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, সদ্‌গোপ-পাড়া, ময়রাপাড়া, তাঁতিপাড়া, গড়াইপাড়া প্রভৃতি নামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। রামপুর-হাট স্টেশন হইতেও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, কার্তিক মাসে গোষ্ঠাষ্টমী ও রাসযাত্রা এবং মাঘ মাসে মাঘীপূর্ণিমা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি খুবই প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) বীরচন্দ্রপুর গ্রামটি বৈষ্ণবদিগের একটি তীর্থ-স্থান। ইহা 'চক্রতীর্থ' নামে খ্যাত। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ পার্ষদ নিত্যনন্দ মহাপ্রভু এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামে একটি মন্দিরে গৌরাঙ্গদেব ও নিত্যানন্দের মৃন্ময় মূর্তি নিত্য পূজিত হয়। ইহা ভিন্ন, গ্রামে জগন্নাথদেবের একটি পাকা মন্দির, একটি ধর্মশালা ও অনেকগুলি দেবদেবী আছে।

শ্রীগুরুপদ পাণ্ডা, চিকিৎসক,
গ্রাম : চণ্ডীপুর, পোঃ সাহাপুর
বীরভূম।

"মল্লারপুর হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বদিকে বীরচন্দ্রপুর ও গর্ভবাস নামক স্থানদ্বয় বৈষ্ণবদিগের অতি প্রিয় তীর্থ। গর্ভবাসের প্রাচীন নাম একচক্রপুর বা একচাকা। এই গ্রামের সহিত পাণ্ডবগণের সংশ্রব ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। প্রবাদ অনুসারে এই স্থানে ভীম হিড়িম্ব রাক্ষসকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং তাহার ভগ্নী ও ঘটোৎকচের মাতা হিড়িম্বাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। একচক্রপুরে নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম হাড়ো ওঝা ও মাতার নাম পদ্মাবতী। অতি অল্প বয়সেই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং ভারতের প্রায় সমুদয় তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া নবদ্বীপে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত মিলিত হন। বৈষ্ণব-জগতে তিনি বলরামের অবতাররূপে পূজিত। নিত্যানন্দের জন্মতিথি মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী উপলক্ষে গর্ভবাসে

এবং দোল ও রাসযাত্রার সময় বীরচন্দ্রপুরে মহোৎসব হয়। মল্লারপুর হইতে বীরচন্দ্রপুর শীতকালে মোটরবাসযোগে ও অন্যান্য সময় গোযানে যাওয়া যায়।"

[১৯৪০ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত "বাংলায় ভ্রমণ" গ্রন্থ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২৫-১২৬]

"......the village is a place of pilgrimage at which two large *melas* are held, one during the Ras Jatra festival in Kartik and the other at the Dol Jatra festival in Phalgun. There is an image in this village of a deity called Banka Rai, which is said to have suffered at the hands of the Muhammadan iconoclast Kalapahar.

Near this village is a small village named Garbhabas, which is famous as the birth-place of the great Vaishnavite reformer Nityananda. It is a place of pilgrimage, and *mela* is held there every year in his honour."

(District Handbooks, 1951, Birbhum by A. Mitra, p. liv)

৫। গ্রাম : কলেশ্বর।২০৭।৫৫০'৩৮।১৪৯।৭২৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গন্ধবণিক, সদ্‌গোপ, ছুতার, মাল, বাগ্দী, ভূঁমালী, তাঁতি ও বৈরাগী।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সাঁইথিয়া হইতে মোটরবাসে এই গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে কলেশ্বরনাথ অনাদিলিঙ্গ শিবকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি খুবই প্রাচীন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে একমাসব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি বৃহৎ পাকা মন্দিরে কলেশ্বরনাথ শিব নামে খ্যাত এক অনাদি শিবলিঙ্গ আছে। প্রাচীন শিবমন্দিরটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইলে শ্রীদ্বারিকা নাথ সাধুবাবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়। এই মন্দিরের উচ্চতা প্রায় সত্তর-আশি হাত হইবে। মন্দিরে শিবলিঙ্গ ব্যতীত, অষ্ট-ধাতু নির্মিত একটি দুর্গামূর্তি আছে। ইহা ভিন্ন, এই শিবমন্দিরের পাশেই পার্বতীদেবীর ইষ্টক নির্মিত মন্দির আছে।

শ্রীমুক্তিপদ পাণ্ডা,
গ্রাম : চণ্ডীপুর,
পোঃ কলেশ্বর, বীরভূম।

উৎসব বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার উৎসব

মল্লারপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ২৫শে চৈত্র হইতে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত সাড়ম্বরে মল্লেশ্বরশিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি আটশতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মল্লেশ্বর মন্দির গাত্রে খোদিত একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মন্দিরটি প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, মন্দির গাত্রে খোদিত কারুকার্যগুলিও প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। নিকটস্থ অপর একটি মন্দিরে শিবের শক্তি স্বরূপ সিদ্ধেশ্বরীর শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

উৎসব উপলক্ষে উল্লিখিত দেবদেবীর সাড়ম্বরে পূজা, বলিদান ও হোম-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী আসিয়া থাকেন। ভক্তরা শিবের নিকট অর্থ, বস্ত্র, তৈজসপত্র স্বর্ণ, মিষ্টান্ন বা ছাগ বলি মানত করিয়া থাকেন।

মল্লেশ্বরশিব ও তাঁর শক্তি স্বরূপা সিদ্ধেশ্বরীদেবীর প্রত্যহ প্রাতঃকালে মঙ্গল আরতি, মধ্যাহ্নে অন্নভোগ ও রাত্রিতে লুচি এবং মিষ্টান্ন ভোগ নিবেদন করিয়া যথারীতি পূজা হয়। বর্তমান পূজারী শ্রীনিত্যগোপাল পাণ্ডা।

মেলা বিবরণী

চড়ক গাজন-নীলপূজার মেলা

মল্লারপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মল্লেশ্বর শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমির উপর পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি আটশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

স্থানীয় এবং আশপাশের কানাচি, বাজিতপুর, লাভপুর, বোলপুর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থান সমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের কয়েক সহস্র নরনারী ট্রেনে ও গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রায় একশতটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিকের দল আসে এবং কবিগান ও জলসার আয়োজন করা হয়।

রাসযাত্রার মেলা

বীরচন্দ্রপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় বাঁকারায় ঠাকুরের রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা পরিমাণ দেবোত্তর জমির উপর সাত-আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

সাহাপুর, বুধিগ্রাম, ডাবুক, তুরিগ্রাম প্রভৃতি বীরভূম জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে এমনকি কলিকাতা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে ট্রেন, মোটরবাস ও গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া বহু নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়চোপড়, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল প্রভৃতি বিবিধ জিনিস-পত্রের প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে। কবিগান, যাত্রা ও সিনেমার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় লোকজনেরাই যাত্রাভিনয় করেন।

শিবরাত্রির মেলা

কলেশ্বর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন প্রায় চার-পাঁচ বিঘা দেবোত্তর জমির উপর একমাসব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

আশপাশের গ্রাম হইতে মেলায় বহু নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসন-কোসন, ঔষধপত্র প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় সত্তরটি দোকান বসে। বিক্রেতার মল্লারপুর, রামপুরহাট, কান্দী, কাঁতরা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সিনেমা, কবিগান ও যাত্রাগানের প্রভৃতির দল আসে।

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : মণ্ডলা ।১৬।৫৭৫·৫২।৯৯।৪৮১

(ক) সাহা, সদ্‌গোপ ও লেট। গ্রামটিতে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরি।

(গ) গ্রামটি রামপুরহাট-দুমকা সড়কের পাশে অবস্থিত বলিয়া রামপুরহাট অথবা লালপাহাড়ী রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে সরাসরি গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ মকরস্নান উপলক্ষে বুংকেশ্বর ভৈরবের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) মকরস্নানের মেলা। পয়লা মাঘ হইতে প্রায় পনরদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি নির্দিষ্ট বাঁধানো বেদীর উপর বুংকেশ্বর ভৈবেবের প্রতীক স্বরূপ একটি ত্রিশূল প্রোথিত আছে এবং কয়েকটি মাটির ঘোড়া আছে।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ দেবীপুর, পোঃ খরবনা, বীরভূম।

২। গ্রাম ঃ গোপালপুর ।৪৬।২৫৩·১১।৯৫।৫০৬

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, বারুই, তাঁতি, নাপিত, মাল, লেট ও কোনাই। গ্রামটিতে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন লোহপুর হইতে গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে মাকরী সপ্তমী তিথিতে দামোদর শিবমন্দিরে মাঘীব্রত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মাঘব্রতের মেলা। মাঘ মাসে মাকরী সপ্তমী তিথি হইতে পনরদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দামোদরশিবের একটি পাকা মন্দির ব্যতীত, মনসা, শীতলা, পার্থিবশিব, বাণলিঙ্গশিব, একটি পিতলের দুর্গামূর্তি এবং গ্রাম্যদেবী আছে।

শ্রীত্রিপুরারী ভট্টাচার্য, প্রধান শিক্ষক,
গ্রাম ঃ রামপুরহাট, পোঃ নোনাডাঙ্গা, বীরভূম

৩। গ্রাম : তেলডাহা ।৪৮।৩৯৮·০২।৭৯।৪০৪

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, বাগ্দী, ডোম ও চামার। গ্রামটিতে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন লোহাপুর হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে অন্নপূর্ণাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে চব্বিশ-প্রহরব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। ফাল্গুন মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীবনদেব কুমার পাল, প্রধান শিক্ষক,
তেলডাহা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়,
বীরভূম।

৪। গ্রাম : আয়াস ।৮৯।২,০২৪·২৯।৭০১।৩,৮০৪

(ক) ব্রাহ্মণ, তাঁতি, কোনাই, লেট, বাউরী, ধোবা, নাপিত, কামার, ছুতার, সোনার, মালী ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন রামপুরহাট হইতে একটি কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও মকরস্নান এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মকরস্নানের মেলা। মাঘ মাসে সপ্তাহকালব্যাপী।

(চ) ×

শ্রীআব্দুল গফুর, প্রধান শিক্ষক,
আয়াস প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ আয়াস, বীরভূম।

৫। গ্রাম : ছিটাসপুর ।১০১।৪৪৮ ০৮।৬৮।৩৩৮

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। ব্রাহ্মণপাড়া, মালপাড়া ও জেলেপাড়া নামে গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রামপুরহাট হইতে লোক্যাল বোর্ডের একটি রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে এক মাসব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন সাড়ম্বরে রাধাবিনোদজীউর পূজা হয় এবং ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে ধূলোট অনুষ্ঠানের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। শেষদিনে অন্নসত্রের আয়োজন করা হয়। ইহা ব্যতীত, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং মাঘ মাসে ক্ষ্যাপাকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। মাঘ মাসে তিন-দিনব্যাপী। মেলাটি গত প্রায় বিশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে বহুকালের প্রাচীন তিনটি মঠ আছে। মঠের দেওয়াল পাত্রে অঙ্কিত বহু পৌরানিক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত, গ্রামে দুইটি শিবলিঙ্গ ও ধর্মরাজতলা, মনসাতলা, ষষ্ঠীতলা, জটাধারীবাবাতলা এবং রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত একটি কালী বেদী আছে। ঐ কালী বেদীতে বৎসরান্তে একবার কালীপূজা হয়।

শ্রীশান্তিময় ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
ছিটাসপুর স্পেশ্যাল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রামপুরহাট, বীরভূম।

৬। গ্রাম : জোঘার ।১৭৬।২১২'৭৮।১৩৯।৮৩৪

(ক) ব্রাহ্মণ, গন্ধবণিক, তাঁতি, কামার, ছুতার, চামার, শুঁড়ি, মাল, বাগ্দী, কোনাই ও মুসলমান। গ্রামে সাত-আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন রামপুরহাট হইতে জেলাবোর্ডের একটি রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়। বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের অন্যান্য ঋতুতে গ্রামে যাতায়াতের মোটর-বাস পাওয়া যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ত্রয়োদশী তিথিতে যোগাদ্যাদেবীর পূজা ও বারুণীস্নান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বারুণীস্নানের মেলা। চৈত্র মাসে পনরদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে যোগাদ্যাদেবীর মন্দির ব্যতীত শিব, কালী ও ধর্মরাজের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীশম্ভু নাথ দত্ত, চাকুরি,
হাঁসন প্রাথমিক বিদ্যালয়, বীরভূম।

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক তারাপীঠে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

তারাপীঠ

"তারাপীঠং মহাপীঠং গন্তব্যং যত্নতঃ সদা।
বশিষ্ঠারাধিতা তারা যত্র তারা শিলাময়ী ॥"

বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত তারাপীঠ একটি প্রাচীন গ্রাম। গ্রামটি চণ্ডীপুর মৌজার (নং ৬২) অন্তর্গত। গ্রামে কামার, কুমার, গন্ধবণিক, ছুতার, লেটু, কোনাই, শুঁড়ি এবং ব্রাহ্মণ জাতির লোকজনের বসবাস আছে এবং ব্রাহ্মণপাড়া, লেটপাড়া, গন্ধবণিকপাড়া, কুম্ভকারপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে। ১৯৬১ সালে জনগণনা অনুসারে গ্রামে মোট পরিবারের সংখ্যা ৯১টি ও জনসংখ্যা ৪৩২। পূর্ব রেলপথে রামপুর-হাট ও মল্লারপুর এই উভয় রেলস্টেশন হইতেই গ্রামের দূরত্ব প্রায় ৭ মাইল। রেলস্টেশন হইতে তারাপীঠ পর্যন্ত জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে। এই রাস্তা খুবই দুর্গম ; বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে এই পথে যাতায়াত খুবই কঠিন ব্যাপার। এই সাত মাইল পথ যাত্রীদের হাঁটা, অন্যথায় গরুরগাড়ী ভিন্ন অন্য কোন গত্যন্তর নেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে তারাপীঠের পশ্চিমদিকে প্রায় তিন মাইল দূরে তারাপুর হল্ট স্টেশন হইয়াছে এবং

সম্প্রতি ঐ স্টেশন হইতে এই তিন মাইল পাকা রাস্তা হওয়া যাত্রীবাহী মোটরবাস চলাচল করিতেছে।

তারাপীঠে তারাদেবীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। জনশ্রুতি দক্ষযজ্ঞকালে বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া সতীর 'নেত্রমণি' বত্রিশযোজন অন্তর ত্রিভুজাকৃতিভাবে তিনটি স্থানে পড়িয়াছিল। উহার মধ্যে সতীর বাম নেত্রমণি মিথিলার দক্ষিণ-পূর্বদিকে ভাগীরথীর উত্তরে ত্রিযুগী নদীর পূর্বতীরে, দক্ষিণ নেত্রমণি করতোয়া নদীর পশ্চিমতীরে বগুড়ায় এবং উর্দ্ধনেত্রমণি বীরভূম জেলার দ্বারকা নদীর পূর্বতীরে তারাপীঠে পতিত হইয়াছিল। ত্রিযুগী নদীর তীরে নীলসরস্বতী তারা, করতোয়া নদীর তীরে একজটা তারা এবং বীরভূমে দ্বারকা নদীর তীরে ইনি উগ্রতারা নামে পরিচিতা। এই কারণে তারাপীঠ একটি পীঠস্থান। তবে ইহা সতীপীঠ কিংবা একটি উপপীঠ এবিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও তারাপীঠ যে একটি মহাসিদ্ধপীঠ এবং তন্ত্রমতে তারা-সাধনার যে একটি প্রাচীন ও বিশিষ্ট কেন্দ্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কথিত আছে, এইস্থানে চণ্ডীকাদেবী সর্বদাই বিরাজ করেন বলিয়া মৌজার নাম 'চণ্ডীপুর' হইয়াছে। এখানে কেবলমাত্র তারা মন্ত্র জপ করিলেই অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

বক্রেশ্বরস্য ঐশান্যাং বৈদ্যনাথস্ত পূর্ব্বতঃ।
দ্বারকায়াং পূর্ব্বভাগে তত্রতারা অধিষ্ঠিতা॥
শিলাময়েতি তদ্দেবী নিবসন শাল্মলীমূলে।
প্রত্যক্ষং সর্ব্ব যুগেহস্মিন চণ্ডিকাস্থিতি সর্ব্বদা॥
তত্র সিদ্ধির্ণ সন্দেহো দিবা রাত্র মুহুর্ত্ত কৈঃ।
অকস্মাৎ মন্ত্র সিদ্ধি স্যাদুগ্রতারা প্রসাদতঃ॥

মহাচীনাচার ক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মার মানসপুত্র পুরাণ প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠমুনি কামাখ্যা প্রভৃতি স্থানে বেদাচারে দীর্ঘকাল উপাসনা করিয়া তারা-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে ব্যর্থ হন। অবশেষে দৈবাদেশে মহাচীন গমন করিয়া বুদ্ধরূপী জনার্দনের নিকট চীনাচারে তারা-সাধনার শিক্ষালাভ করেন এবং বুদ্ধদেবের পরামর্শে বক্রেশ্বরের ঈশানকোণে, বৈদ্যনাথধামের পূর্বদিকে, দ্বারকানদীর পূর্বতীরে তারাপীঠ মহাশ্মশানে এক শ্বেত শিমুল বৃক্ষের নীচে পঞ্চমুণ্ডির আসন পাতিয়া তারা-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাই তারাপীঠের 'তারা-মা' বশিষ্ঠারাধিতা তারা বলিয়া প্রসিদ্ধা। বশিষ্ঠমুনির সিদ্ধিলাভের পর বহুকাল এই মহাপীঠে তাঁহার আরাধিত ব্রহ্মশিলায় খোদিত তারা-মূর্তি, তারা মায়ের পদযুগলের ছাপবিশিষ্ট শিলা ও চন্দ্রচূড় শিবলিঙ্গ শিমূল বৃক্ষের নীচে গভীর বনজঙ্গলের মধ্যে অজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়াছিল। পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যের সাধক কবীন্দ্র কর্ণাভরণ তারাপীঠে বশিষ্ঠমুনি স্থাপিত পঞ্চমুণ্ডির আসনে সস্ত্রীক সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া জানা যায়।

অধুনাকালে সর্বসাধারণের মধ্যে তারাপীঠ মাহাত্ম্য প্রকাশ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী শোনা যায়। উহা এইরূপ—একদা জয়দত্ত নামে জনৈক ব্যবসায়ী কার্যোপলক্ষে সওদা লইয়া দ্বারকা নদীপথে যাইবার কালে তারাপীঠ মহাশ্মশান সংলগ্ন নদীর তীরে নৌকা নোঙর করেন। রাত্রিকালে জয়দত্ত ও তাঁহার পুত্র যখন হিসাবপত্র লইয়া ব্যস্ত ছিলেন তখন দ্বারকার তীরে দাঁড়াইয়া একটি কুমারী বালিকা বার বার "সওদাগর তোমার নৌকায় কি আছে" এইরূপ প্রশ্ন করিতে থাকে। ইহাতে বিরক্ত হইয়া জয়দত্ত উত্তর দেন—"নৌকায় ছাই আছে।" এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সত্য সত্যই নৌকায় পরিপূর্ণ দ্রব্য-সামগ্রী ভস্মে পরিণত হয়। এমন কি তাঁহার পুত্রও অল্পক্ষণের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইদিন রাত্রে এক স্বপ্নাদেশে সওদাগর জয়দত্ত 'তারাপীঠ মাহাত্ম্য' অবগত হন এবং মহাশ্মশানে শিমুলবৃক্ষের নীচে দেবীর অবস্থানের কথাও জানিতে পারেন। বলা বাহুল্য, পরের দিনই সওদাগরের নৌকা ভস্মের পরিবর্তে পুনরায় দ্রব্য-সামগ্রীতে ভরিয়া উঠে এবং উল্লিখিত শিমুলবৃক্ষের পূর্বদিকে অনতিদূরে জীয়ৎকুণ্ড নামে একটি পবিত্র কুণ্ডের জল সওদাগরের মৃতপুত্রের দেহে ছিটাইয়া দিলে তিনি পুনর্জীবন লাভ করেন। এই ঘটনার পর সদাগর জয়দত্ত লোকজন লাগাইয়া এইস্থানের বনজঙ্গল পরিষ্কার করান এবং বহু অর্থব্যয়ে তারাদেবী ও চন্দ্রচূড়শিবের মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। এই কাহিনীটি আবার একটু ভিন্নরূপেও শোনা যায়। যেমন জয়দত্ত পথভ্রষ্ট হইয়া একটু আশ্রয়ের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে গভীর রাত্রে এই মহাশ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নানারূপ বিভীষিকা দর্শনে ভীত হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলে মানবীরূপে দেবী

তাঁহাকে আশ্রয় দেন ইত্যাদি। শুধু বশিষ্ঠমুনি নহেন এইস্থানে বহু সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই সকল সাধকদের মধ্যে তারাপীঠের নিকটবর্তী অটলা গ্রামের বামাচরণ যিনি পরবর্তীকালে বামাক্ষ্যাপা নামে পরিচিত হন তাঁহার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পিতার নাম শ্রীসর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম রাজকুমারী দেবী। ধর্মজীবনে তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন তারাপীঠের ব্রজবাসী কৈলাসপতি বাবা। বামাচরণ ১২৪৪ বঙ্গাব্দে ১২ই ফাল্গুন, শিবচতুর্দশী তিথিতে আটলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১৮ সনে ২রা শ্রাবণ, তারাপীঠে দেহরক্ষা করেন। প্রকৃতপক্ষে সাধক বামাক্ষ্যাপা হইতেই তারাপীঠ জনমানসে প্রসিদ্ধিলাভ করে। লোকে বলে তারাপীঠ ভৈরব বামাক্ষ্যাপা।

বাংলাদেশে বহু তন্ত্রসাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং নানাস্থানে তান্ত্রিক সিদ্ধপীঠও আছে। তবে তন্ত্রমতে তারা-সাধনার কেন্দ্র হিসাবে তারাপীঠের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। চীনাচারে তারা-সাধনা শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া বিবেচিত। ডাঃ হীরানন্দ শাস্ত্রী, ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে হিন্দুতন্ত্রের আরাধ্য তারাদেবী মূলতঃ বৌদ্ধতান্ত্রিক উগ্রতারা বা মহাচীনতারা এবং তাঁহাদের মতে এই সাধনার প্রকৃত উৎপত্তিস্থল হিমালয় সন্নিহিত ভুটান, নেপাল ও তিব্বত অঞ্চলে ডঃ শশি ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও এই মত পোষণ করেন। কিন্তু কোন সময়ে তারা-সাধনার উৎপত্তি এবং তারাপীঠে তারাসাধনাই বা কতকালের প্রাচীন এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁহার "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—"আর্যনাগার্জুনপাদৈর্ভোটেষু উদ্ধৃতম্" আর্য নাগার্জুন ভোটদেশ থেকে এই তারা-সাধনার পুনরুদ্ধার করেছিলেন। নাগার্জুনের কাল আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী। এই সপ্তম শতাব্দেই হর্ষবর্ধন ও কামরূপের ভাস্করবর্মণ বাংলার শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে এই সময় তিব্বতের রাজা স্রঙ-সন গ্যাম্পো ভারতে (বিহার পর্যন্ত) অভিযান করেন এবং আসাম ও নেপাল দখল করেন। তিব্বত ও আসামের সঙ্গে এই সপ্তম শতাব্দেই বাংলার (গৌড়-রাঢ়ের) সাংস্কৃতিক সংঘাত হয় এবং এই সংঘাতের ফলেই তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান নবজীবন লাভ করে। এই সময়ই বৌদ্ধতন্ত্রের গোড়াপত্তন হয় বলে মনে হয়, বিশেষ করে তারা-সাধনার। তারপর অরাজকতার শেষে পালযুগের শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির মধ্যে পূর্ণবিকাশ হয় বৌদ্ধতন্ত্রের এবং মনে হয় তারা-সাধনারও। যে-অঞ্চলে বৌদ্ধতন্ত্রের বিকাশ হয় তারমধ্যে বীরভূমের এই অঞ্চল অন্যতম—উত্তর-পূর্ব অঞ্চল। চণ্ডীপুর-তারাপুর ও তারাপীঠ এই অঞ্চলের সীমানার মধ্যেই অবস্থিত। তারা-সাধনার অন্যতম কেন্দ্র এই অঞ্চল হয়ত সপ্তম-অষ্টম খৃষ্টাব্দ থেকেই ছিল। পরে হিন্দুতন্ত্রের তারাসাধনার যুগে সিদ্ধ নাগার্জুনের ভোটদেশ (নেপাল-তিব্বত অঞ্চল) থেকে তারাসাধনা পুনরুদ্ধারের কাহিনী বর্জন করে বশিষ্ঠের কাহিনী যোগ করা হয়েছে। মূল কাহিনীর কাঠামো ঠিক আছে। কেবল নাগার্জুনই বোধ হয় বশিষ্ঠ হয়েছেন।"

তারাপীঠে তারামন্দিরটি ইষ্টক নির্মিত ও চারচালা বাংলারীতিতে গঠিত। মন্দিরটি সুউচ্চ, উত্তরমুখী এবং চারিপাশের জমি হইতে বেশ একটু উচ্চ জমির উপর অবস্থিত। এই কারণে বহুদূর হইতেই মন্দিরের চূড়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়। বর্তমান মন্দিরটি মল্লারপুর নিবাসী জগন্নাথ রায় বাংলা ১৩২৫ সনে নির্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির কিছু শিল্পকার্য দ্বারা অলংকৃত। ইহার সম্মুখে অষ্টকোনাকৃতি ইষ্টক নির্মিত একটি চণ্ডীমণ্ডপ বা নাটমন্দির আছে। ইহার আট কোনে আটটি এবং মধ্যস্থলে একটি মোট নয়টি চূড়া, অভ্যন্তরে ডমরু আকৃতি বাঁধান বেদী ও পাশেই বলির হাড়িকাঠ প্রোথিত আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তারামন্দিরটি একাধিকবার সংস্কার বা নবনির্মিত হইয়াছে। সওদাগর জয়দত্ত কর্তৃক শ্মশানের উপর নির্মিত মন্দিরটি বহুকাল পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বাংলা ১৩১৮ সনে তারাপীঠ ভৈরব বামাক্ষ্যাপার মরদেহ সমাধিস্থ করার জন্য নির্বাচিত স্থানটি খননকালে একটি প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন ঐস্থানে জয়দত্ত নির্মিত প্রাচীন মন্দিরটি অবস্থিত ছিল। বর্তমানে ঐস্থানে বামাক্ষ্যাপার সমাধির উপর একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

জয়দত্ত নির্মিত মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে এঁড়োল গ্রামের রাজা রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় তারাপীঠ শ্মশান

হইতে কিছু দূরে জীয়ৎকুণ্ডের দক্ষিণে একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। কালে ঐ মন্দিরও জীর্ণ প্রাপ্ত হইলে বর্তমান মন্দিরটি জগন্নাথ রায় কর্তৃক বাংলা ১৩২৬ সনে নির্মিত হয়।

তারামন্দিরের ঈশানকোনে নির্মিত চন্দ্রের ন্যায় চূড়া বিশিষ্ট ইষ্টক নির্মিত পশ্চিমমুখী চন্দ্রচূড়শিব মন্দিরে অভ্যন্তরে রক্ষিত গৌরীপট্টহীন লোড়াকৃতি একটি শীলা চন্দ্রচূড়শিব নামে খ্যাত। ইহা ভিন্ন, এই মন্দিরে গৌরী পট্টযুক্ত একটি শিবলিঙ্গ আছে। তারামন্দিরের তুলনায় চন্দ্রচুড়শিব মন্দিরটি উচ্চতায় ছোট।

তারামন্দিরের উত্তরদিকে জীয়ৎকুণ্ড নামে একটি দীঘি আছে। এই দীঘির জল পবিত্র বলিয়া মনে করা হয়। ইহার পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ পাড়ে শান বাঁধান তিনটি ঘাট এবং পশ্চিম পাড়ে তাল, নিম ও কয়েকটি ফুলের গাছ আছে। বর্তমান তারামন্দির নির্মিতা জগন্নাথ রায় মহাশয় কুণ্ডটির আমুল সংস্কার করাইয়া বৃহৎ দীঘিতে পরিণত করেন। মন্দির হইতে দীঘির ঘাটে যাইবার পথে মন্দির প্রাঙ্গণ বেষ্টিত প্রাচীর গাত্রের সহিত সংযুক্ত একটি ছোট প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণ প্রস্তরের দুইটি বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত আছে। ইহাদের দৈর্ঘ যথাক্রমে ৪৫" ও ৩০" ইঞ্চির মত হইবে। বিষ্ণু মূর্তিগুলির উভয় পার্শ্বে চামর হস্তে ব্যঞ্জনরতা নারীমূর্তি খোদিত আছে এবং ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট মূর্তিটির উর্ধাংশ কিঞ্চিৎ ভগ্ন। শিব-মন্দিরের পিছন দিকে একটি বৃহৎ ইঁদারা আছে। ইঁদারাটি জনৈক ভক্ত খনন করান। তবে বর্তমানে উহা অব্যবহার্য।

তারামন্দির প্রাঙ্গণের চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত। যদিও স্থানে স্থানে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে চারিটি দ্বার দিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা যায়। পূর্বদিকের প্রবেশ পথের উপর দো-চালা ধরণের আচ্ছাদন ও পশ্চিম দিকের প্রবেশ পথে উপর নহবৎখানা আছে।

দ্বারকা নদীর তীরে বিস্তীর্ণ স্থান জুড়িয়া তারাপীঠ মহাশ্মশান। ইহার চারিদিক শেওড়া প্রভৃতি গভীর বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকায় স্থানটি সর্বদাই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। ইহার চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অজস্র নরকরটি ও দেহস্থিতে ছড়াইয়া আছে। এই ভয়ঙ্কর স্থানে দিনের বেলায়ও একাকী দাঁড়াইতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই মহাশ্মশানে শবদাহ করিলে মৃতের অক্ষয় স্বর্গবাস হয়, এই বিশ্বাসে বীরভূম জেলার নানাস্থান হইতে এমনকি সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান হইতে অনেকে এই মহাশ্মশানে শবদাহ করিতে আসেন। এমনকি যাঁহারা শব আনিতে পারেন না, তাঁহারাও মৃত আত্মীয়-স্বজনের এক টুকরো অস্থি আনিয়া এখানে পুঁতিয়া দিয়া যান। কাঠের অভাবে অনেকেই মৃতদেহ পুরাপুরি দাহ করিতে পারে না। ফলে অর্ধদগ্ধ শবদেহগুলি দ্বারকার তীরে ফেলিয়া রাখিয়া যান। দিনের বেলায়ও শৃগাল, কুকুর, শবদেহ লইয়া শকুনিরদল কাড়াকাড়ি করে।

শ্মশানে শববহনকারীদের জন্য ইষ্টক নির্মিত একটি বিশ্রামাগার আছে। হুগলী জেলার মাহেশের শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস বাংলা ১৩৪১ সনে তাঁহার মাতা এবং অগ্রজের স্মৃতি রক্ষার্থে ইহা নির্মাণ করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে তারামন্দিরের বায়ুকোনে শ্মশানে সাধক বামাক্ষ্যাপার সমাধির উপর একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্বেতপাথরের চতুষ্কোন একটি বেদী এবং বেদীর উপর ফনা বিস্ফারিত একটি সর্প মূর্তি আছে। মন্দিরটি জীর্ণপ্রাপ্ত এবং ১৩৬৩ সনের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে।

শ্মশানের পূর্ব প্রান্তে একটি প্রশস্ত বাঁধন বেদী আছে। এই বেদীর নীচেই বশিষ্টদেবের পঞ্চমুণ্ডির আসন পাতা। বেদীর উপর একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে সম্পূর্ণ সিন্দুর লিপ্ত শিলাসনে রক্ষিত দেবীর পাদপদ্ম এবং নিকটেই পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি আছে।

তারামন্দিরে ব্রহ্মশিলায় খোদিত বশিষ্টারাধিতা যে তারামূর্তি আছেন তিনি দ্বিভুজা, সর্পযজ্ঞোপবীতে ভূষিতা এবং বাম কোলে পুত্ররূপে শিব। মূর্তিটি প্রায় ৮" ইঞ্চি উচ্চ।

দ্বিভুজাং চিন্তয়েদ্দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।
বামে শিব স্বরূপকম্ তং কল্পিতং বৎস্যরূপকম্॥

তবে, দেবীর এই মূর্তি সাধারণের দর্শনীয় নয়। এই ব্রহ্মশিলাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া, বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রৌপ্য নির্মিত ত্রিনয়যুক্ত মুখমণ্ডল, মাথায় রৌপ্য মুকুট, স্বর্ণময় জিহ্বা, কণ্ঠে রৌপ্য নির্মিত নরমুণ্ডমালা ও নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া এক অপরূপ রূপে সজ্জিত করা হয়।

মাথার মুকুটের দুই পাশ হইতে আলুলায়িত কেশরাশি বেদী অবধি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ইহার দেবীর বাহ্যিক রূপ; এইরূপ সর্বসাধারণের দর্শনীয়। প্রতিদিন সকাল ৮ ঘটিকায় দেবীরমন্দির সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। তৎপূর্বে মন্দিরাভ্যন্তরে পুরোহিত উক্ত শিলামূর্তি স্নানাভিষেক পূজাদি সারিয়া দেবীরবেশ পরিবর্তন করেন। মন্দিরে তারাদেবীর বেদীর নীচে কালী, তারা, কুমারী, নারায়ণশিলা, শিবলিঙ্গ, মহিষাসুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্তি আছে। এই সকল মূর্তির অধিকাংশই ব্যক্তিবিশেষের। তাঁহারা এই মন্দিরে মূর্তিগুলি রাখিয়া নিত্যপূজাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রতিদিন প্রাতেঃ, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনবার দেবীর নিয়মিত ভোগ পূজাদি হয়। মধ্যাহ্নে অন্নভোগ নিবেদন করা হয়। প্রতিদিনই মন্দিরে পূজাদি দিতে নানাস্থান হইতে লোকজন আসেন। বিশেষ করিয়া প্রতি শনি-মঙ্গল লোকজন বেশী আসেন। এই দুইদিন দেবীর নিকট ছাগ বলি দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন, বৎসরের বিভিন্ন তিথিতে যেমন, অষ্টমী, সংক্রান্তিতে, চতুর্দশী, অমবস্যা, শারদীয়া নবমীতে, কার্তিক মাসে অমাবস্যায়, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন, চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজার দিন ছাগ বলিসহ সাড়ম্বরে তারামায়ের পূজা হয়। শারদীয়া পূজা উপলক্ষে মন্দিরে মেষ ও মহিষ বলি দেওয়া হয়। আশ্বিন মাসে কোজগরী পূর্ণিমা তিথিতে উৎসব উপলক্ষে তারামন্দিরের বায়ুকোনে সুসজ্জিত চণ্ডীমণ্ডপ মন্দির হইতে তারা মূর্তি আনিয়া সাড়ম্বরে ভোগ-পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন দেবীর নিকট অনেকগুলি মানতের ছাগ বলি ও হোম হয়।

কাশ্যপ গোত্রীয় চট্টোপাধ্যায় (পাণ্ডা) পদবীধারী ও তাঁহাদের দৌহিত্রগণ বংশপরম্পরায় পালাক্রমে দেবীর নিত্যপূজাদি করিতেছেন। বীরভূম জেলা পূর্বে রাজশাহীর রাজা উদয়নারায়ণের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবস্থান্তরে এই জমিদারী বিভিন্ন সময় হস্তান্তর হয় এবং সেই সঙ্গে তারাদেবী সেবা পূজার ভারও হস্তান্তরিত হয়। নাটোরের ছোট তরফের রাজা চণ্ডীপুর তালুকটি দেবীর সুষ্ঠু সেবাপূজার নিমিত্তে দান করেন। এখনও উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে তারামন্দিরে নাটোরের রাজাদের নামে সঙ্কল্প করা হয়। তাঁহার এখনও নিত্যপূজার জন্য কিছু চাউল ও আর্থিক সাহায্যদান করেন। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর দেবীর সেবা পূজার ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস করিতে হইয়াছে। বর্তমানে মাত্র ৩২ বিঘা দেবোত্তর জমি আছে।

তারাপীঠে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে কোজাগরী পূর্ণিমায় তারামায়ের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এবং চৈত্র মাসে দ্বারকেশ্বর নদীতে বারুণী পুণ্য স্নান উপলক্ষে মেলা বসে। কোজগরী পূর্ণিমায় মেলাটি প্রায় আটদিন এবং বারুণী স্নানের মেলাটি ছয় দিন স্থায়ী হয়। দ্বারকেশ্বর নদীর ধারে, জেলা বোর্ডের রাস্তার দু'ধারে এবং মন্দির সংলগ্ন জমিতে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, লোহার তৈয়ারী দ্রব্য, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা-পুতুল, মাদুর, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের মোট পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে। সাঁইথিয়া, নলহাটি, সিউড়ী, রামপুরহাট প্রভৃতি স্থান হইতে প্রধানতঃ প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন এবং নিকটবর্তী ডাবুক, বুধিগ্রাম, বরশাল প্রভৃতি গ্রাম হইতে এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া ও কলিকাতা হইতে দৈনিক প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। কোন কোন বৎসর ম্যাজিক বা সার্কাসের দল আসে। তবে প্রায় প্রতি বৎসরই কৃষ্ণযাত্রা হয়।

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

ছিটাসপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথিতে ক্ষ্যাপাকালীর বার্ষিকপূজা অনুষ্ঠিত হয়। জানা যায়, বহুকাল পূর্বে জনৈক তান্ত্রিক সাধক এই গ্রামে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করিয়া কালীপূজা করিতেন; তদাবধি ঐ নির্দিষ্ট স্থানেই কালীপূজা হইতেছে।

উৎসব উপলক্ষে আশপাশের গ্রাম হইতে বহু ভক্তর সমাগম হয় এবং এইদিন শতাধিক মানতের ছাগ বলি

দেওয়া হয়। ভক্তদের বিশ্বাস দেবী জাগ্রতা এবং তাঁহার নিকট মানত করিলে মনস্কামনা পূর্ণ আশীর্বাদী ফুল-বেলপাতা গ্রহণ হইয়া থাকে। দেবীর নিত্যপূজা হয় এবং প্রতিদিনই বিভিন্ন গ্রাম হইতে ভক্তরা আসিয়া ঢাল-ঢোল বাজাইয়া মানতের পূজা দিয়া যান। উৎসব উপলক্ষে এবং মাঝে মাঝে এখানে সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন হইয়া থাকে। গ্রামের চক্রবর্তী পরিবার বংশানুক্রমে দেবীর সেবায়েত ছিলেন। তবে পূর্ব সেবায়েত শ্রীশশি ভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় অপুত্রক ছিলেন; তাই তাঁহার দত্তক পুত্র শ্রীবিনয় পদ লস্কর বর্তমানে সেবায়েতের কার্যে নিযুক্ত আছেন।

ভৈরবপূজা

মণ্ডলা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের পয়লা বুংকেশ্বর ভৈরবের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাঁধান বেদীর উপর ভৈরবের প্রতীক স্বরূপ মাটির ঘোড়া ও একটি ত্রিশূল প্রোথিত আছে। উৎসবকালে ঐ বেদীর উপর একটি অস্থায়ী খড়ের চালা নির্মাণ করিয়া যথারীতি উৎসব পালন করা হয়। বৈষ্ণব মতে ভৈরবের পূজাদি সম্পন্ন হয় এবং সাধারণতঃ ফলমূল, অর্থ, বস্ত্রাদি মানত জানান হয়। বর্তমান সেবায়েত দাস পদবীধারী জনৈক বৈষ্ণব। আশপাশের গ্রাম হইতে ভৈরবের মানত পূজাদিতে লোকজন আসেন। পূজার শেষে সাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভৈরবপূজা উপলক্ষে মণ্ডলা গ্রামের অধিবাসীরা একটি বিশেষ রীতি পালন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পূজার দিন তাঁহারা গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে একটি নির্দিষ্ট পুকুরে স্নান করিয়া প্রত্যেকে একটি করিয়া ঢিল নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এইরূপ রীতির কি তাৎপর্য তাহা বুঝা যায় না। তবে সকলেই ইহা নিষ্ঠাভরে পালন করিয়া থাকেন। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

মাঘীব্রত উৎসব

গোপালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত অর্থাৎ একপক্ষকালব্যাপী দামোদরশিবের মাঘীব্রত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তিবিশেষের হইলেও বর্তমানে ইহা স্থানীয় অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসবরূপে পরিগণিত। উৎসবটি বহুদিনের প্রাচীন। গ্রামেরর উত্তর সীমানায় ব্রাহ্মণী নদীর তীরে শিবের একটি পাকা মন্দির আছে। মন্দিরটি বর্তমানে ভগ্নদশাগ্রস্থ। মন্দিরাভ্যন্তরে সবুজবর্ণের বর্তুলাকার একখণ্ড প্রস্তরকে শিবরূপে পূজা করা হয়। ইনি দামোদর-শিব নামে খ্যাত। অমাবস্যা তিথি হইতে প্রতিপদ পর্যন্ত আতপ চাল, দুধ, মিষ্টি ও ফলমূলাদি দ্বারা প্রতিদিন পায়সান্ন ভোগ দেওয়া হয় এবং উক্ত ভোগ সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তৃতীয় দিন শিবের ভক্তগণ নিজ নিজ ক্ষৌরকর্ম সাধন করে এবং চতুর্থী ও পঞ্চমীর দিন ফলাহার এবং ষষ্ঠীতে নিরম্বু উপবাস পালন করিয়া রাত্রিতে চারিপ্রহরে চারবার নদীতে স্নান করিয়া শিবের মাথায় 'ফুল চাপান' হয়। পরের দিন অর্থাৎ মাকুরী সপ্তমীর দিন খুব আড়ম্বরে শিবের পূজাদি সম্পন্ন হয়। এইদিন শিবের নিকট চৌদ্দটি ছাগ বলি দেওয়া হয় এবং রাত্রে একটি মহিষ, দুইটি মেষ ও একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। প্রধানতঃ শিবের নিকট ফল, মিষ্টি, ছাগ বলি মানত করা হয়। তবে কেহ কেহ মেষ ও মহিষ বলিও দিয়া থাকেন। শিবের বর্তমান সেবায়েত ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী মুখোপাধ্যায়।

দেবোত্তর প্রায় ষাট বিঘা পরিমাণ জমির আয় হইতেই দামোদরশিবের নিত্যপূজাদির ব্যয়ভার বহন করা হয়। ইহা ভিন্ন, প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের শেষ শনি বা মঙ্গলবার শিবের অভিষেক পূজা এবং শারদীয়া বিজয়া দশমী তিথিতে সাড়ম্বরে শিবেরপূজা হয়। এই উৎসবেও একটি করিয়া ছাগ বলি দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, জনৈক গ্রামবাসী স্বপ্নাদেশ পাইয়া এই গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্ব কোনে ব্রাহ্মণী নদীর তীরে উক্ত বর্তুলাকার শিলা পান। সেই সময় হইতেই নিয়মিত দামোদরশিবের পূজাদি চলিয়া আসিতেছে।

যোগাদ্যাপূজা

জোঘার গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি হইতে সাত-আটদিনব্যাপী গ্রামে

প্রতিষ্ঠিত যোগাত্মাদেবীর বার্ষিকপূজা ও তদুপলক্ষে বারুণীস্নান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। গ্রামে একটি বৃহদাকার দীঘির উত্তরপাড়ে ঘাট সংলগ্ন একটি পাকামন্দিরে সিংহবাহিনী যোগাত্মা-দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসব উপলক্ষে এই মন্দিরেই সাড়ম্বরে দেবীর হোম পূজাদি হইয়া থাকে। বারুণী তিথিতে যোগাত্মাদেবীর মানত-পূজাদি দিতে এবং উল্লিখিত দীঘিতে পুণ্যস্নান করিতে আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারীর সমাগম হয়। সাধারণের বিশ্বাস, এইদিন ঐ দীঘিতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের পুণ্যার্জন হয়।

যোগাত্মাদেবী সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে যে, কোন এক সময় দেবী গয়থা গ্রামের নিঃসন্তান জমিদার শ্রীরাম রায়চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা পরিচয়ে জনৈক শাঁখারীর নিকট হইতে শাঁখা পরেন এবং শাঁখারীকে উক্ত রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে শাঁখার মূল্য লইবার জন্য নির্দেশ দেন। শাঁখারী মুখে এই ঘটনা শুনিয়া রায়চৌধুরী মহাশয় বিষয়টি তদন্ত করিতে আসিলে দেবী উল্লিখিত দীঘির জলের মধ্য হইতে শাঁখা পরিহিত দুই হস্ত তুলিয়া দেখান। এই সময় হইতেই দেবী যোগাত্মার পূজা হইতেছে। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই উক্ত জমিদার মহাশয়ের একটি কন্যা সন্তান লাভ করেন। তিনি উক্ত দীঘির চারি পাড়ে চারিটি পাকা ঘাট নির্মাণ করিয়া দেন। ঘাটগুলির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবোত্তর প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বিঘা জমির আয় হইতে দেবীর নিত্যপূজাদি হইয়া থাকে। দেবোত্তর ঐ জমি যথাক্রমে পূজারী ব্রাহ্মণ, মন্দিরের ঝাড়ুদার ও বাদ্যকার বংশানুক্রমে ভোগ করিতেছেন। যোগাত্মাদেবীর নিকট মানতের পূজাদি দিতে প্রত্যহ বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু ভক্তের সমাগম হয়। মানত হিসাবে সাধারণতঃ ষোড়শোপচারে পূজা, ছাগ ও মেষ বলি দেওয়া হয়।

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

ছিটাসপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথিতে ক্ষ্যাপাকালীর পূজা উপলক্ষে দেবীর নির্দিষ্ট বেদীর আশপাশে সাধারণের প্রায় এক বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত মাত্র বিশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দেড় সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, কাপড়চোপড় প্রভৃতি জিনিসপত্রের কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ প্রতি বৎসর রামপুরহাট এবং মল্লারপুর হইতে আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, যাত্রাগান, ম্যাজিক, কবিগান, ঝুমুরগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

বারুণীস্নানের মেলা

জোথার গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণী-স্নান উপলক্ষে যোগাত্মাদেবীর মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে প্রশস্ত এবং খোলা জায়গায় পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন। যে জমির উপর মেলা বসে পূর্বে তাহা স্থানীয় জমিদারের ছিল কিন্তু বর্তমানে ইহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমি।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত কালুহা, দুনীগ্রাম, মাড়গ্রাম, দখলবাটী, বসোয়া, বিষ্ণুপুর, বরদা, আয়াস, রামপুরহাট প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় দুই সহস্র নরনারী গরুরগাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন, মনিহারী ব্যতীত অন্যান্য জিনিসপত্রের দোকানও বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ রামপুরহাট, নলহাটী, মাড়গ্রাম, লোহাপুর, জলিপুর, ভদ্রপুর, বসোয়া, বিষ্ণুপুর, মল্লারপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে আসেন। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য ম্যাজিক, নাগরদোলা, কবিগান, লটারী, যাত্রাগান প্রভৃতির দল আসে এবং জুয়া খেলা হয়।

মকরস্নানের মেলা

মণ্ডলা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে মকরস্নান উপলক্ষে

বুংকেশ্বর ভৈরবের নামে দেবত্তোর প্রায় ছয় বিঘা পরিমান জমির উপর পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। বুংতলা শ্মশান উন্নয়ন সমিতি কর্তৃক মেলাটি পরিচালিত হয়।

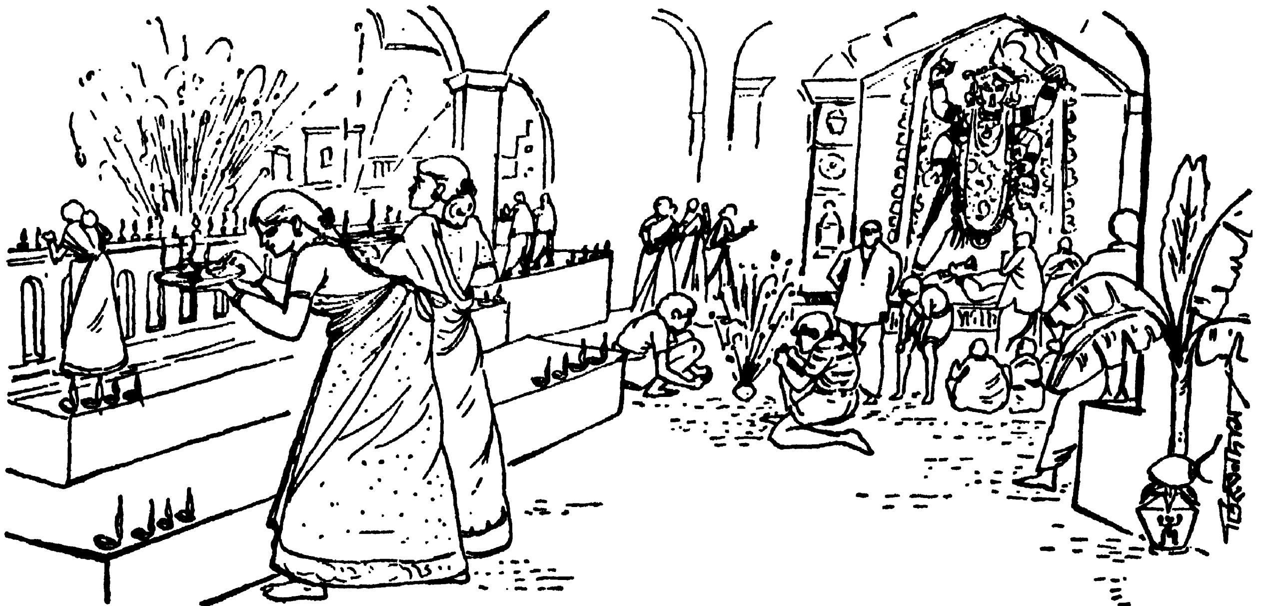
গ্রাম ব্যতীত কুশুম্বা, নারায়ণপুর, রামপুরহাট প্রভৃতি স্থান হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পনর সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন ব্যতীত অন্যান্য জিনিসপত্রের প্রায় আশিটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, নাগরদোলা, কবিগান, যাত্রাগান প্রভৃতির দল আসে। এই অনুষ্ঠানে প্রায় দুই সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

আয়াস গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে গ্রামের সন্নিহিত ব্রাহ্মণী নদীতে পুণ্যস্নান উপলক্ষে শিবতলায় প্রায় তিন-চারি বিঘা জমির উপর সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় আড়াই সহস্র নরনারী হাঁটিয়া মেলায় আসেন। মেলায় বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় চল্লিশটি দোকন বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, সিনেমা এবং গান-বাজনার ব্যবস্থা থাকে।

মাঘীব্রত উৎসব

গোপালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে দামোদর শিবের মাঘীব্রত উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণী নদীতীরে প্রায় বারো বিঘা পরিমান জমির উপর পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

মেলায় শীতলগ্রাম, বিন্নী, ছুনিগ্রাম প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে নরনারী আসিয়া থাকেন। ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি প্রভৃতির প্রায় একশতটি দোকান বসে। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, কবিগান, ঝুমুরগান, যাত্রাগান প্রভৃতির দল আসে।



থানা ঃ নলহাটি

গ্রাম বিবরণী

[আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক নলহাটি-তে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

নলহাটি

নলহাটি বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি শহর। ইহা বিহারের সাঁওতাল পরগণার সীমান্তে অবস্থিত। পূর্ব রেলপথে সাহেবগঞ্জ লুপ্ লাইনে এখানে একটি রেলস্টেশন আছে। এই শহরটি অবশ্য পৌরসভার অধীনে নয়, তবে থানা, ডাকঘর, উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ডাকবাংলো, হাট-বাজার, সিনেমা প্রভৃতি শহরের সবই সুযোগ সুবিধা আছে নলহাটিতে। এখানকার জলবায়ুও বেশ স্বাস্থ্যকর। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে বাস করেন।

নলহাটি একান্ন সতীপীঠের একটি। অবশ্য কেউ বলেন ইহা একটি উপপীঠ। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ললাটেশ্বরী। পীঠমালা মহাতন্ত্রে বলা হয়েছে—

"নলাহট্টাং নলাপাতো যোঃ ভৈরব।
কালিকা দেবতা তত্র, তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়।"

পীঠমালা মহাতন্ত্র অনুসারে নলহাটি একান্ন পীঠের একটি। স্টেশন থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটি অনতিউচ্চ পাহাড়ী টিলার উপর দেবী ললাটেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। কারও মতে বিষ্ণুচক্র কর্তৃক সতীদেহ ছিন্ন হয়ে সতীর ললাট অংশ পড়েছিল এখানে। আবার কেউ বলেন এখানে সতীর কণ্ঠনালি পড়েছিল। আবার অন্য মতে সতীর 'নলা' অর্থাৎ কনুয়ের নিম্নভাগ পড়েছিল। দেবী পর্বতবাসিনী বলে পার্বতী নামেও খ্যাত। ললাটেশ্বরী থেকেই নাকি গ্রামের নাম নলহাটি হয়েছিল। অপরপক্ষে কেহ কেহ বলেন নল নামে জনৈক নরপতির রাজধানী ছিল এখানে। এই কারণে গ্রামের নাম হয় নলহাটি। প্রমাণ স্বরূপ ললাটেশ্বরী মন্দিরের অদূরে একটি ভগ্নস্তূপ দেখিয়ে বলা হয়, ঐখানেই নলরাজার প্রাসাদ ছিল। তিনি মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। এ সবই অবশ্য কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি।

রেলে স্টেশন থেকে হেঁটে অথবা সাইকেল রিক্সায় চেপে মন্দিরে পৌছান যায়। পাকা রাস্তার পাশেই একটি অনুচ্চ টিলার উপরে মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের পিছন দিকে পাহাড়টি বিস্তৃত। পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে একটি ক্ষীণ জলধারা আছে। তার নিকটেই আছে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ। স্থানটিকে পবিত্র জ্ঞান করা হয়। মন্দিরের চূড়ায় স্থাপিত পিতলের কলসীগুলি বহুদূর থেকেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্থানটি নির্জন এবং মন্দির প্রাঙ্গণের আশপাশে অনেকগুলি প্রচীন বৃক্ষাদি আছে। নহবৎখানা পেরিয়ে অনেকগুলি প্রশস্ত সোপান বেয়ে দেবীরমন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। পূর্বমুখী মন্দিরটি লাল পাথর দিয়ে তৈয়ারী করা হয়েছে। মন্দিরাভ্যন্তরে ডমরু আকৃতির বেদীর উপর সম্পূর্ণ সিন্দুর লিপ্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডকে ললাটেশ্বরী রূপে পূজা করা হয়। ঐ প্রস্তর খণ্ডের গায়ে নাসিকা সহ তিনটি স্বর্ণনির্মিত চক্ষু লাগিয়ে মাতৃমুখের একটি ভাব আনা হয়েছে। এ ছাড়া সিঁথি, টায়রা, নোলক প্রভৃতি অলঙ্কারে সাজান। মন্দিরে উঠবার প্রথম সোপানটির ধারেই রুধির ভৈরবের নির্দিষ্ট স্থান আছে। ইহার সম্মুখে প্রোথিত হাঁড়িকাঠে দেবীর নিকট উৎসর্গকৃত পাঁঠা বলি দিয়ে কর্তিত ছাগ মুণ্ডটি রুধির ভৈরবের নিকট নিবেদন করা হয়।

মন্দিরের উত্তরে একটি আমগাছের নীচে ষষ্ঠীর নির্দিষ্ট স্থান এবং দক্ষিণে কয়েকটি স্বর্ণচাঁপা গাছের ধারে ভোগ মন্দির আছে। মন্দির এলাকার বাইরে উত্তর দিকে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। শোনা যায়, ঐ পঞ্চমুণ্ডির আসনে নাটোরের রাণী ভবাণীর জামাতা রামকৃষ্ণ তন্ত্র

সাধনা করে ছিলেন। বাংলা ১৩৬৫ সনে পঞ্চমুণ্ডির আসনটি সংস্কার করা হয়েছে।

মন্দিরের ঈশান কোণে রাস্তার ধারে দেবীর ভৈরব যোগেশ নামে খ্যাত শিবেরমন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে কয়েকটি ভগ্ন শিলাখণ্ডকে দেবীর ভৈরবরূপে পূজা করা হয়। অবশ্য কেউ কেউ দাবী করেন ললাটেশ্বরী মন্দিরের প্রায় দেড় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে হরিত্তক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গই দেবীর প্রকৃত ভৈরব।

শোনা যায়, লালটেশ্বরীর বর্তমান মন্দিরটি জনৈক শিকদার (সাহা) পশ্চিম ভুনিয়ার বেনিয়া নির্মাণ করে দেন। অপর পক্ষে কেহ কেহ বলেন, বর্গীয় হাঙ্গামা দমনের জন্য বাংলার নবাব জনৈক সুবাদারকে এই অঞ্চলে পাঠালে তিনি নলহাটিতে এসে আস্তানা স্থাপন করেন এবং কথিত আছে এক স্বপ্নাদেশ অনুসারে তিনি দেবীর মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। মন্দির নির্মাণের আগে পাহাড়ের উপর একটি বৃক্ষমূলে দেবীর পূজাদি হ'তো। আরো শোনা যায়, নাটোরে রাণী ভবানী রাজধানী বড়নগর থেকে নদীপথে বৈদ্যনাথ ধামে, যাবার পথে রাত্রিকালে মন্দিরের শঙ্খঘণ্টার ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে ললাটেশ্বরী মন্দির দর্শনে আসেন এবং দেবীর ভোগপূজাদির জন্য প্রায় তিনশ'-বিঘা জমি দেবত্তোর স্বরূপ দান করেন। ঐ ভূসম্পত্তি মন্দিরের পুরোহিত, নিত্য চণ্ডীপাঠক, ব্রাহ্মণ-পাচক, পঞ্চপর্বের ব্রাহ্মণ, চৌকিদার, নাপিত, ঢাকী, জেলে, কলু, কুমার এবং রাজমিস্ত্রী ও ছুতার মিস্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া আছে। তাঁরা পুরুষানুক্রমে দেবীর মন্দিরে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করছেন। পরবর্তীকালে নসীপুরের রাজা দেবী সিংহ এই অঞ্চলে জমিদারী ক্রয় করলে (১১৫২ নং তৌজি) দেবীর মন্দির ও ভূসম্পত্তি তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। নসীপুরের রাজারা দেবীর সেবাপূজার জন্য বার্ষিক অর্থ সাহায্য করতেন। এমন কি পরে তাঁহাদের জমিদারী 'কোর্টস অব্ ওয়ার্ডস্' এর হাতে গেলেও সেখান থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যেত। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী উচ্ছেদের পর স্থানীয় একটি কমিটির হাতে দেবীর সেবা পূজা ও মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করা হয়। কমিটির বর্তমান সম্পাদক শ্রীবিষ্ণুপদ ঘোষ। বর্তমানে মাত্র পঞ্চাশ বিঘা দেবোত্তর ধান জমির আয় থেকে মন্দিরে ভোগপূজা হয়।

প্রতিদিন মধ্যাহ্নে সোয়া সের চালের অন্নভোগ এবং সন্ধ্যায় লুচি ও মিষ্টি দিয়ে দেবীর নিত্যপূজা ও শীতলারতি দেওয়া হয়। কালিকা ধ্যানে দেবীর পূজা হয়। চণ্ডীপাঠক মন্দিরে প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ করেন। নিত্য-পূজা ব্যতীত, প্রতি বৎসর শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী, কার্তিকী অমাবস্যায়, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজায়, চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজায় এবং আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষের নবমী-তিথিতে দেবীর সর্বজনীন ভোগ-পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে বিশেষ করে শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন-চার সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। এই সময় প্রায় তিন-চার মন চালের ভোগ সাধারণ দর্শনার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উৎসবকালে দেবীর নিকট ছাগ বলি হয়। অবশ্য মানত থাকলে বৎসরের যে-কোন সময় মানতের বলি দেওয়া চলে। সাধারণতঃ স্বর্ণ-বস্ত্র-অলঙ্কার, ষোড়শোপচারে পূজা, ছাগবলি প্রভৃতি মানত করা হয়। চক্রবর্তী পদবীধারী শাণ্ডিল্য গোত্রীর রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে দেবীর পুরোহিতের কাজ করছেন। বর্তমান দেবীর পাণ্ডারা বিভিন্ন শরিকে বিভক্ত ও পালাক্রমে দেবীর সেবাপূজা করেন।

ইহা ভিন্ন, নলহাটিতে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং শিবরাত্রি উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে।

ললাটেশ্বরী মন্দিরের অনতিদূরে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি মসজিদ এবং আনারসাহী চল্লিশ পীরের একটি মাজহার শরীফ আছে। মসজিদটি অপ্রাচীন। মাত্র বৎসর ত্রিশ পূর্বে স্থানীয় ডাক্তার বাবর আলি হাজী সাহেব ইহা নির্মাণ করান।

১। গ্রাম ঃ মধুরা।৬৭।৯৯৫·২৬।৪৯৫।২,২৫৪

(ক) মাল, চণ্ডাল, মুচি, ডোম, ছুতার, ডুলে, কামার, নমঃশূদ্র, মুসলমান ও রাজপুত। গ্রামটিতে হিন্দুপাড়া, মোল্লাপাড়া, মোড়লপাড়া, জোলাপাড়া, চাঁদনিচকপাড়া প্রভৃতি নামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কুটিরশিল্প।

(গ) গ্রামটি পূর্বরেলপথের নলহাটি জংশন বা চাতরা স্টেশন অথবা নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেলপথে তাকিপুর এই তিনটি রেলস্টেশনের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া উক্ত তিনটি স্টেশন হইতে জেলাবোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের পয়লা পর্যন্ত একমাসব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, আষাঢ় মাসের যে-কোন মঙ্গলবার গ্রাম্যদেবী-পূজা ও অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা, চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা ব্যতীত মুসলমান সম্প্রদায়ের চান্দ্রমাস অনুযায়ী মহরম, ঈদলফেতর, ইদোজ্জোহা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। পয়লা জ্যৈষ্ঠ। বহু প্রাচীন।

শিবপূজার মেলা। চৈত্রসংক্রান্তি হইতে দুইদিন। বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির ব্যতীত মনসা ও বাবাঠাকুর আছে।

শ্রীআব্দুল ওয়াহেদ মোল্লা, শিক্ষক,
গ্রাম : মধুরা, পো : পাইকপাড়া, বীরভূম।

২। গ্রাম ঃ বরলা।৭৫।৬৩৯·৬৮।১৭৩।৮৫৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, বাগদী, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ও চামার।

(খ) কৃষিকার্য ও রেশম ব্যবসায়।

(গ) নলহাটি রেলস্টেশন হইতে পূর্বদিকে জেলা-বোর্ডের একটি রাস্তা ধরিয়া আটগ্রাম গ্রামের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মনী নদী পার হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে ক্ষ্যাপাকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

কালীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে।

(চ) গ্রামে ইষ্টক নির্মিত একটি সুন্দর শিবমন্দির আছে। মন্দিরগাত্রে সুন্দর শিল্পকার্য দেখিতে পাওয়া যায়।

যতদূর জানা যায়, গ্রামের বর্তমান পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়রা রেশম কীট পালনের জন্য এইস্থানে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন এবং ক্রমে গ্রামের পত্তন হয়। গ্রামটি নদীতীরবর্তী বলিয়া এবং রেশমকীটের খাদ্য তুঁত পাতার চাষ নদীর তীরে ভাল হয় বলিয়া পুণ্ডরী ক্ষত্রিয়েরা এইস্থানে বসবাস স্থাপনে আসেন।

শ্রীদুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রামসেবক,
গ্রাম ও পো : বরলা, বীরভূম।

৩। গ্রাম ঃ কুরুমগ্রাম।৭৮।১,০০০·১৪।৩৭৮।১,৯৮৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কোনাই, চামার, কামার, নাপিত, গন্ধবণিক, জেলে, শাঁখারী ও লেট। গ্রামটিতে বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরি।

(গ) স্বাদীনপুর ও নলহাটি এই উভয় স্টেশন হইতেই মোটরবাস যোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, প্রতি বৎসর সরস্বতীপূজার দিন হইতে দুইদিনব্যাপী বুড়শিবের হোম উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হোম উৎসব উপলক্ষে শিবের নিকট ছাগ বলি দেওয়া হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) বুড়াশিবের মেলা। মাঘ মাসে পাঁচ-ছয়-দিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বুড়াশিবের মন্দির আছে।

শ্রীমাখন চন্দ্র চ্যাটার্জী, গ্রামসেবক,
গ্রাম : সাওরা, পোঃ কুরুমগ্রাম, বীরভূম।

৪। গ্রাম ঃ বুজুঙ্গ।৮১।১,৯১২·২৭।৬২৬।৩,৩৩৫

(ক) কামার, কুমার, বনিক, ক্ষত্রিয়, বারুজীবি, বাগদী, মাল, কোনাই, ঢুলি, ছুতার, জেলে,

চামার, মাল পাহাড়ী, ধোপা শুঁড়ি, নাপিত ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রামপুরহাট হইতে মোটরবাসে সরধা আসিয়া, সেখান হইতে প্রায় দেড় মাইল হাঁটিয়া অথবা গরুরগাড়ীতে করিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ধর্মরাজের স্নানযাত্রা, ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দোল এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ধর্মরাজের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে ছয়দিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে পাঁচদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীদুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রামসেবক,
গ্রাম ও পোঃ সরধা
বীরভূম।

৫। গ্রাম ঃ আকালিপুর ।৯২।৪১১·৮১।১২৪।৬৬৩

(ক) ব্রাহ্মণ, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কুমার, কুরি, কোনাই, হাড়ী, নাপিত, কামার ও চামার। গ্রামটিতে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন হইতে বোর্ডের কাঁচা রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে গুহ্যকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তি-বিশেষের।

(ঙ) গুহ্যকালীপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে দশদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে সর্পবিভূষিতা দ্বিভুজা গুহ্যকালীর শিলা মূর্তি ও গৌরীশঙ্কর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীফটিক চন্দ্র সিংহ, শিক্ষক,
রঘুনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কুরুমগ্রাম
ও
শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য, শিক্ষক,
আকালীপুর গিরিন্দিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ভদ্রপুর, বীরভূম।

শ্রীযুত বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', গ্রন্থে আকালীপুর গ্রাম সম্বন্ধে লিখেছেন :

"ভদ্রপুরের কাছে আকালীপুরে মহারাজ নন্দকুমারের প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত সর্পাসীনা সর্পাভূষিতা দ্বিভুজা গুহ্যকালী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরটি আজও অসম্পূর্ণ রয়েছে। ব্রাহ্মণী নদীর পাশে শ্মশান এবং শ্মশানের কোলে কালীমন্দির। শোনা যায়, দেবী প্রতিষ্ঠার সময় মহারাজা নিজে উপস্থিত থাকতে পারেননি বলে তাঁর পুত্র গুরুদাসকে তান্ত্রিক মতে কালী প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেবীমন্দিরের দক্ষিণে একটি সিদ্ধাসন আছে, 'পঞ্চমুণ্ডী' বলে পরিচিত। এই অঞ্চল থেকে বৌদ্ধমূর্তিও কয়েকটি পাওয়া গেছে। মূর্তিগুলি সংগ্রাহক-ব্যবসায়ীদের কৃপায় স্থানান্তরিত হয়েছে। ভদ্রপুরও মনে হয় তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মতন বৌদ্ধ তন্ত্রযানের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, পরে হিন্দু তান্ত্রিক, শৈব ও বৈষ্ণবদের প্রতিপত্তিও বাড়ে। গুহ্যকালী প্রতিষ্ঠা থেকে মহারাজা নন্দকুমারের শক্তি উপাসনার কথা মনে হয়। বাংলা-দেশের অনেক প্রতিপত্তিশালী রাজা ও জমিদারের মতন নন্দকুমারও শক্তির পূজারী ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। কিন্তু এসব আজ ভদ্রপুরের অতীত ইতিবৃত্ত। আজ সেই অতীত সমৃদ্ধির প্রায় সবটাই লুপ্ত হয়ে গেছে। ইতিহাসের উত্থান-পতনের আঘাতের চিহ্ন, আরও অনেক গ্রামের মতন, ভদ্রপুরের বুকেও অঙ্কিত রয়েছে।" (পৃঃ ১৬৬)

৬। গ্রাম ঃ কয়থা ।৯৮।১,২১৭·২৯।৯৫২।৪,৯৭৮

(ক) কায়স্থ, গন্ধবণিক, কামার, ছুতার, জেলে, ধোপা, শুঁড়ি, ভূঁইমালী, নাপিত, কোনাই, মাল, ডোম,

সেখর ও মুসলমান। গ্রামটিতে মীরপাড়া, মল্লিকপাড়া, দেশমুখীপাড়া, মিঞাপাড়া, জেলেপাড়া, পোদ্দারপাড়া, চৌধুরীপাড়া, বেনেপাড়া, মণ্ডলপাড়া প্রভৃতি নামে আঠারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও তাঁতশিল্প ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন তকীপুর হইতে একটি কাঁচা রাস্তা ধরিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে মহোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখ হইতে সারামাসব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন এবং সংক্রান্তির দিন 'ধূলট' অনুষ্ঠানের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। এইদিন দরিদ্রনারায়ণসেবার আয়োজন করা হয়। চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিবের একটি মন্দির ব্যতীত, মনসা ও কালী এবং দুইটি অজ্ঞাতনামা পীরের স্থান আছে। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনই উক্ত পীরের স্থানে পূজাদি দিয়া থাকেন।

গ্রামে একটি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকশ্রুতি ঐ স্থানে কন্দুপ নামে জনৈক রাজার প্রাসাদ ছিল। প্রসংগতঃ উল্লেখ করা যায়, এই গ্রামে প্রায় তিনশত তাঁত চালু আছে।

শ্রীজগন্নাথ দত্ত, শিক্ষক,
কয়থা প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালক বিভাগ),
পোঃ কয়থা, বীরভূম।

৭। গ্রাম ঃ বিলকান্দি।৯৯।৬৪৫৺৩৩।১৩৬।৭৭৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কুমার, নাপিত, বাগদী, হাড়ী, কোনাই ও মাল। গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরি ও ব্যবসায়।

(গ) নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেলপথে তকিপুর রেল-স্টেশনের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে এবং ব্রাহ্মণী নদীর দক্ষিণ তীরে এই গ্রামটি অবস্থিত। কেবল মাত্র বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা দুইটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে দুই দিন। মেলাটি পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালাযুক্ত একটি দুর্গামণ্ডপ ব্যতীত গ্রামদেবতা, ষষ্ঠী ও শীতলার স্থান আছে।

বর্তমানে যে স্থানে গ্রামটি অবস্থিত শোনা যায়, পূর্বে সেইস্থানে একটি বিরাট বিল ছিল। নিকটবর্তী ব্রাহ্মণী নদীর বন্যার জন্য কালক্রমে ঐ বিল পলিমাটি দ্বারা ভর্তি হইয়া চাষোপযোগী হইয়া উঠে। তখন আশপাশের গ্রামের লোকজন আসিয়া প্রথমে ঐ জমিতে চাষ-আবাদ করে পরে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। ঐ মজিয়া যাওয়া বিলর উপর গ্রামটির পত্তন হয় বলিয়া সম্ভবতঃ গ্রামের নাম 'বিলকান্দি' হইয়াছে।

শ্রীবিরজাপতি পণ্ডিত, শিক্ষক,
গ্রাম বিলকান্দি, পোঃ কয়থা, বীরভূম।

৮। গ্রাম ঃ গোঁসাইপুর।
১০৩।১,০৩০৺০৪।৩৪৭।১,৬৩২

(ক) মাল, মুচি, গন্ধবণিক, তিলি ও মুসলমান। গ্রামটিতে মালপাড়া, মুচিপাড়া, হিন্দুপাড়া, ডাহাপাড়া, মোড়লপাড়া, সেখপাড়া প্রভৃতি নামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন তকীপুর।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা ব্যতীত চান্দ্রমাস অনুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায় ঈদলফেতর, ইদুজ্জোহা ও রমজান ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠিত যয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন।

(চ) ×

শ্রীমহম্মদ তাহেরুদ্দিন, শিক্ষক,
গোঁসাইপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জেষ্ঠা ভবানীপুর, বীরভূম।

৯। গ্রাম ঃ বাড়া। ১০৭।৩,৫৫৬৺০০।১,১৪৫।৫,৫৩৪

(ক) গ্রামটি মুসলমান প্রধান। ইহা ভিন্ন, হিন্দু ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকজনের বসবাস আছে। গ্রামে

মালপাড়া, মীরপাড়া, মণ্ডলপাড়া, জোলাপাড়া, গোয়ালপাড়া, বাউরীপাড়া, হাড়ীপাড়া প্রভৃতি নামে আঠারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্যই গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা।

(গ) নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেলপথে লোহাপুর স্টেশনের নিকটেই গ্রামটি অবস্থিত। জেলাবোর্ডের একটি রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া উৎসব ও ভুবনেশ্বরীপূজা এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর ফাল্গুন মাসের প্রথমদিকে বড়পীরের (লৌহজন পীর) ফতেহা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বড়পীরের ফতেহা উপলক্ষে মেলা। প্রতি তিন বৎসর অন্তর ফাল্গুন মাসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং আটদিনব্যাপী স্থায়ী হয়।

(চ) গ্রামে একটি মাটির ঘরে সিংহবাহিনী ভুবনেশ্বরীদেবীর সুন্দর শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটি সর্বসাধারণের। নাটোরের রাণী ভবানী কর্তৃক প্রদত্ত প্রায় বারো বিঘা দেবোত্তর জমির আয় হইতে দেবীর নিত্যপূজাদি হইয়া থাকে। গ্রামে একটি চতুর্মুখ শিলামূর্তি আছে। ইহাকে ব্রহ্মাজ্ঞানে পূজা করা হয়। ইহা ভিন্ন, বড়পীরের মাজার ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণে আরো আশী জন বিভিন্ন মুসলমান পীরের সমাধি আছে।

শ্রীমহম্মদ আব্দুল মজিদ, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বাড়া, বীরভূম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

বালানগর থেকে গ্রামের নাম বাড়া হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। উপরে উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক হইতে গ্রামটি একটি বৃহৎ ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামটি বহু পীর-ফকিরের আবাস্থল ও মুসলমান প্রধান গ্রাম। এখানে বহু প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা বলেন বাড়া গ্রামে যে-কোন স্থানের কয়েক হাত মাটি খুড়লেই একটি না একটি দেবদেবীর শিলামূর্তি পাওয়া যাইবে। কথাটি অত্যুক্তি নহে।

বস্তুতঃ এযাবত বাড়া গ্রামে বহু দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যদিও সযত্ন তত্ত্বধানের অভাবে বর্তমানে উহার অধিকাংশ অপহৃত বা স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে বাড়া গ্রামে একটি মূর্তি আবিষ্কার সম্পর্কে ২০শে চৈত্র ১৩৬৭ সনে আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়—

"সম্প্রতি বীরভূম জেলার বাড়া গ্রামে একটি রূপময় ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন মিলেছে। বজ্রাসন উপবিষ্টা কৃষ্ণ প্রস্তরের এ মূর্তি বৌদ্ধদেবী বজ্রতারার পদ্মাসনা অষ্টভুজা দেবীমূর্তির মুলমুখমণ্ডলে যে দিব্য সৌন্দর্য তা সহজেই মহাপ্রতিশবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বজ্রতারার মুকুটে বৌদ্ধশিল্পশাস্ত্র সম্মত ক্ষুদ্রাকার ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি খোদিত, এবং মূল মূর্তির চতুষ্পার্শে আবেগসমৃদ্ধ আলীঢ় ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান ক্ষুদ্রতর দেবী মূর্তিগুলি নিঃশংসয়ে বজ্রতারার সঙ্গিনী।

দেবীর প্রসন্নমুখভাগ এবং উর্ধাঙ্গের পূর্ণায়ত উদ্বেলতা প্রাণশক্তির নিগূঢ় তচ্চজ্ঞাপক।

বিশেষজ্ঞদের মতে মূর্তির কোমল এবং ভাবময় শিল্পাচরণ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পাল বাংলার ভাস্কর্যশিল্পের স্বাক্ষর বহন করছে। দূর চীন এবং তুষারমণ্ডিত তিব্বতের ভাস্কর্যকলার সঙ্গে বজ্রতারার এ মূর্তি তুলনীয়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব অধিকারিকের চেষ্টায় এটি সংগৃহীত হয়েছে।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, গ্রামে উল্লিখিত ভুবনেশ্বরী ও ব্রহ্মামূর্তি হিন্দু দেবদেবীরূপে পূজিত হইলেও মূলতঃ ইহারা যে বৌদ্ধ দেবদেবী এবিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই; মতভেদ আছে কেবলমাত্র মূর্তি-লক্ষণ বিচারে উহাদের নামাকরণ সম্পর্কে। ভুবনেশ্বরী মূর্তিটিকে কেহ বলেন বৌদ্ধদের সিংহনাদ লোকেশ্বর মূর্তি, কেহ বলেন 'মঞ্জুশ্রী' মূর্তি, আবার কেহ বলেন 'প্রজ্ঞাপারমিতা' মূর্তি। বিনয়তোষবাবু যদিও মূর্তিটি দেব বা দেবী মূর্তি সে

বিষয়ে নিঃসন্দেহ নন তথাপি তিনি ইহাকে 'প্রজ্ঞাপারমিতা' মূর্তি বলিয়াই অনুমান করিয়াছেন। শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয়ও এই মূর্তিটিকে প্রজ্ঞাপারমিত মূর্তি বলিয়াই সনাক্ত করিয়াছেন।

বাড়া গ্রামে ব্রহ্মারূপে পূজিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট সম্মুখে তিনটি ও পিছনে একটি এই চতুর্মুখ মূর্তিটি মূলতঃ দেবীমূর্তি এবং প্রত্নতত্ত্ববিভাগের মতে ইহা উষ্ণীষ-বিজয়া মূর্তি। শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় ইহাকে অবশ্য 'মহাপ্রতিসরা' মূর্তি বলিয়া অনুমান করেন।

বাড়া গ্রাম সম্পর্কে শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাহার বিস্তারিত উদ্ধৃতি দেওয়া বাহুল্য মাত্র। আগ্রহী পাঠক তাঁর মূল গ্রন্থটি পাঠ করিলে লাভবান হইবেন।

শ্রীঘোষ মহাশয় মনে করেন—মুর্শিদবাদ সীমান্তে বীরভূম জেলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বাড়া গ্রাম অন্তর্ভুক্ত বাংলার এই অঞ্চল শশাঙ্কের আমল থেকে পাল রাজাদের কাল পর্যন্ত বৌদ্ধ প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলার ব্রজবাসী বৌদ্ধদের শোচনীয় পরিনতির সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে মুসলমানদের অভিযান সুরু হয়। মুসলমান পীর ও গাজীসাহেবদের পক্ষে তাই এই বৌদ্ধদের ধর্মান্তরিত করা অনেক সহজ হয়েছিল। পশ্চিমবাংলায় এই রকম বৌদ্ধ প্রাধান্য কেন্দ্রই কিছু কিছু মুসলমান প্রধান অঞ্চলে পরিণত হয়েছে বলে মনে হয়। বাড়া গ্রাম তারই একটা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

তাঁর মতে বোখারা, সমরকন্দ, বোগদাদ, তেহারান থেকে বাড়ার মুসলমানদের পূর্ব-পুরুষরা আসেননি। দু'একজন পীর বা সিদ্ধপুরুষ আসতে পারেন, কিন্তু তাঁদের বংশধররাই বাড়ার মুসলমান অধিবাসী নন। লোহাজন সাহেব বা বোগদাদের সৈয়দশাহ গোলাম আলীর বংশধর সকলে নন। স্থানীয় অধিবাসীরাই ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। শোনা যায়, বাড়ার বাকি এক সময় ব্রাহ্মণের বাস ছিল যথেষ্ট; কিন্তু এখন বাড়া ব্রাহ্মণশূণ্য গ্রাম। প্রচুর মুসলমান পীরের সমাধি আছে বাড়া গ্রামে। (যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন—লোহজন ছাড়াও সুলতান শাহ, ন্যাংটাশাহ, জামালশাহ, শেখদুম গিলানী, শেখদুম হোসেনী, সৈয়দশাহ, মেহের আলি, মহরম আলি, লাঙ্গশাহ ইত্যাদি।) বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বাড়ার মুসলমান সাধুদের অনেক শিষ্য আছেন। বাড়ার বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে এগুলি যে যুগ বিপ্লবের নিদর্শন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—শ্রী অরুণ কুমার রায়।

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের উৎসব
(বুড়াপীর)

বাড়া গ্রামে প্রতি তিন বৎসর অন্তর ফাল্গুন মাসের প্রথমার্ধে বুড়াপীরের ফাতেহা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুদিনের প্রাচীন। কথিত আছে, পীর সাহেব বা শাহ সুফী হজরত লোহজন সোন্দকার রহমতুল্লাহে আলায় হে ভারত সম্রাট আকবরের আমলে এদেশে ধর্ম-প্রচারের জন্য আসেন। সম্রাট তাঁহাকে প্রায় ষাট বিঘা জমি নিষ্কর হিসাবে দান করেন। এই পীরোত্তর জমির আয় হইতে তাঁহার উৎসবের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। ইহা ভিন্ন, দৈনন্দিন সেবার্চ্চনা ও রক্ষণাবেক্ষনের ভার যাঁহাদের হাতে দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের উক্ত জমি হইতে কিছু কিছু নিষ্কর জমি দেওয়া হইয়াছে। পীরস্থানের ঝাড়ুদারাকে বারো বিঘা জমি, আড়াই পোয়া দুধ; পীরস্থানে যোগানকারী ব্যক্তিকে বারো বিঘা এবং ঢুলীকে বারো বিঘা জমি বন্দোবস্ত দেওয়া আছে।

পীর সাহেবের মাজাহরে সপ্তাহে প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কিছু কিছু লোক মানত করিবার জন্য আসেন। লোকের বিশ্বাস, পীরের নিকট মানত করিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। সাধারণতঃ মিষ্টি, মুরগী, খাসী প্রভৃতি মানত হিসাবে দেওয়া হয়। বড়পীরের মাজার সংলগ্ন স্থানে আরও আশী জন পীরের মাজার আছে। পীর সাহেবের সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, এই গ্রামে মাটির

নীচে 'রাক্ষসডাঙ্গা' নামে একটি স্থান ছিল। উক্ত স্থানের রাক্ষসরাজাকে এই পীর নিধন করিয়াছিলেন

কালীপূজার উৎসব

বরুলা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বদিন সাড়ম্বরে ক্ষ্যাপাকালীর বার্ষিকপূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। গ্রামে ক্ষ্যাপাকালীর কোন মন্দির বা মূর্তি নাই একটি নির্দিষ্ট স্থানে কতকগুলি শিলাখণ্ডকে দক্ষিণাকালীর ধ্যানে পূজা করা হয়। এই গ্রামের সীমান্ত দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। শোনা যায়, বহুকাল পূর্বে উক্ত শিলাখণ্ডগুলি নদীর স্রোতে বাহিত হইয়া এইস্থানে আসিয়া জমে এবং জনৈক ভক্তর প্রতি ঐ শিলাখণ্ডগুলিকে কালীজ্ঞানে পূজা করিবার স্বপ্নাদেশ হয়। সেই হইতেই এই গ্রামে ক্ষ্যাপাকালীর পূজা চলিয়া আসিতেছে। গ্রামের শ্মশান ক্ষেত্রের ধারে ক্ষ্যাপাকালীর স্থানটি শেওড়াগাছ, শিমুলগাছ ও নানাবিধ বনফুল গাছের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ভক্তদের বিশ্বাস, দেবী জাগ্রতা এবং তাঁহার নিকট মানত করিলে কঠিন ব্যাধি হইতে নিরাময় ও বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের সন্তান লাভ হয়। সপ্তাহের প্রতি শনি-মঙ্গলবার বহু দূরবর্তী অঞ্চল হইতে অনেক ভক্ত দেবীর নিকটে মানত পূজাদি দিতে আসেন।

চৈত্র মাসে বার্ষিক উৎসবের কায়েকদিন পূর্ব হইতে ভক্তরা গলার উত্তরীয় এবং হাতে বেতের ছড়ি ধারণ করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিরা চাউল ভিক্ষা করিয়া আনেন এবং সংগৃহীত ঐ চাউলের দ্বারা উৎসবের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বদিন প্রাতঃকাল হইতে দেবীর যথারীতি পূজা আরম্ভ হয় এবং রাত্রিতে হোম-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। উৎসব উপলক্ষে মানত স্বরূপ প্রতি বৎসর দেড়শত হইতে দুইশত ছাগ বলি হয়। দেবীর নিত্যপূজা দেয়াসীন করিয়া থাকেন। তবে উৎসবের সময় ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করান হয়।

আকালিপুর গ্রামের দক্ষিণে শ্মশানক্ষেত্রের নিকট প্রবাহিত ব্রাহ্মণী নদীর তীরে একটি পাকা মন্দিরে গুহ্যকালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটি কষ্টি পাথরের। দেবী নাগের উপর উপবিষ্টা এবং তাঁহার মাথার উপর সহস্র সর্পফণার ছত্র বিস্তারিত। দেবী দ্বিভুজা এবং কণ্ঠে নর মুণ্ডমালা। ইনিই গুহ্যকালী নামে খ্যাত। কালী মূর্তির বাম পার্শ্বে দেবীর ভৈরব গৌরীশঙ্কর নামে শিব আছেন। শিব মূর্তিটি শ্বেত পাথরের। এই মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানা যায় যে, মহারাজ নন্দকুমার যে সময়ে নবাবের চাকুরী গ্রহণ করিয়া আকালীপুর গ্রামের সন্নিহিত ভদ্রপুর গ্রামে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। সেই সময় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তিনি এই মন্দির নির্মাণ করেন; কিন্তু দুভাগ্যবশতঃ মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্বেই তাঁহার ফাঁসী হয় বলিয়া তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাস মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবীর নিত্য ভোগপূজাদির জন্য কিছু ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দেন। বর্তমানে মন্দিরটির অবস্থা খুবই জীর্ণ।

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে সাড়ম্বরে দেবীর বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে মানত স্বরূপ দেবীর নিকট মেষ, মহিষ, ছাগ ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। দেবীর নিকট মানতের পূজাদি দিতে বারো মাসই আশপাশের গ্রাম হইতে যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে; তবে উৎসবের দিন যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উৎসব শেষে প্রসাদ বিতরণ ও সর্বজনীন অন্নসত্রের ব্যবস্থা করা হয়।

আশ্বিন মাসের পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর মাঘ মাসে রটন্তী কালীপূজা উপলক্ষে মন্দিরে খুব ধুমধামের সহিত পূজা হয়; এই সময়ও বহুযাত্রীর সমাগম হয়।

দেবীর বর্তমান সেবায়েত রাণী সর্বমঙ্গলা দেবী এবং পূজারী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

বিলকান্দি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বদিন সাড়ম্বরে কালীর বাৎসরিক বিশেষপূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি আঞ্চলিক সর্বজনীন এবং বহু প্রাচীন। দেবীর কোন মূর্তি বা মন্দির নাই। বিলকান্দি গ্রামের পশ্চিমে ব্রাহ্মণী নদীর তীরে একটি প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষতলে লতাগুল্ম বেষ্টিত জঙ্গলের মধ্যে রক্ষিত পাঁচখানি শিলা-খণ্ডকে দক্ষিণাকালীর ধ্যানে পূজা করা হয়। এই স্থানটি কালীতলা নামে পরিচিত। চৈত্র মাসের ২৮শে তারিখ হইতে উৎসব আরম্ভ হয়। এইদিন রাত্রি বেলা দেবীর ভক্তগণ ব্রাহ্মণী নদীতে স্নান করিয়া ঢাক-ঢোল

ইত্যাদি নানা বাদ্যসহকারে কালীতলায় উপস্থিত হন। তারপর তাঁহারা শিলাখণ্ডগুলিকে ধোয়াপোছা করিয়া তেল, সিঁন্দুর লেপন করেন ও ফুল প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করেন। পরদিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি এক ঘটিকা পর্যন্ত দেবীর বিশেষ-পূজা হইয়া থাকে। পূজা শেষে বলিদান ও পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। পরে ভক্তদের নানাপ্রকার নৃত্যগীতের মধ্য দিয়া উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। এই উৎসবে স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহু নরনারীর সমাগম হয়। পূজা উপলক্ষে শুধু ছাগ ও মেষ বলি দেওয়া হয়। দেবীর পূজারী বাৎসল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

চড়ক-গাজন ও নীলপূজার উৎসব

কয়থা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তিবিশেষের হইলেও গ্রামবাসী সকলেই এই উৎসবে যোগদান করেন। উৎসব উপলক্ষে গ্রামে একটি দেবালয়ে রক্ষিত একটি শিলাখণ্ডকে শিবজ্ঞানে পূজা করা হয়। চৈত্রসংক্রান্তির তিনদিন পূর্ব হইতে ভক্তগণ শুদ্ধাচারে সংযম পালন করেন এবং গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় এবং নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে বোলানগান গাহিয়া বেড়ান। সংক্রান্তির দিন বিকালে চড়কগাছ পূজা হয় এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে হোম পূজার সময় একটি পাঠা বলি দেওয়া হয়। উৎসবটি বহু প্রাচীন। বর্তমান সেবায়েত শ্রীধীরেন্দ্র কুমার দত্ত ও শ্রীনৃসিংহ মুরারী দত্ত। ইঁহারা গন্ধবণিক সম্প্রদায়ভুক্ত। পূজারী ব্রাহ্মণ, পদবী ভট্টাচার্য।

বুজুঙ্গ গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক। গ্রামের শিবতলায় এই পূজা মহাধূমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্ব হইতে ভক্তরা পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করিয়া চাউল সংগ্রহ করেন এবং সংগৃহীত চাউলের দ্বারা উৎসবের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কাষ্ঠ নির্মিত বানলিঙ্গ কাঁধে করিয়া ভক্তরা গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন এবং উৎসব উপলক্ষে নানারূপ আচার অনুষ্ঠান পালন করেন। বুজুঙ্গ গ্রামের গাজন উৎসবের জন্য রাণী ভবাণী কর্তৃক প্রদত্ত কিছু ভূসম্পত্তি ছিল; বর্তমানে উহা হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে।

ধর্মরাজের গাজন

বুজুঙ্গ গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সাড়ম্বরে ধর্মরাজের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং জাতি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন লোকই ভক্তব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। ব্রতীরা স্ব স্ব ক্ষৌরকার্য ও স্নান সারিয়া আসিলে তাঁহাদের কানে মন্ত্র দেওয়া, কণ্ঠে উপবীত ও হাতে একটি করিয়া বেতেরছড়ি দেওয়া হয়। উৎসবের সময় নানাপ্রকার ফল-মূলাদি ব্যতীত ধর্মরাজের নিকট ছাগশিশু বলি দেওয়া হয়। অনেকে মানত হিসাবে মাটির ঘোড়া ও ধানের শীষ, চোলাই মদ প্রভৃতি দিয়া থাকেন। আতপ চাউল দ্বারা শুদ্ধাচারে চোলাই তৈয়ারী করা হয়। মদ চোলাই করিয়া নতুন মাটির ভাঁড়ে মদ পূরণ করাকে 'ভাঁড়াল' বলে। ভক্তগণ উৎসবের পূর্ব হইতেই ভাঁড়াল তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন ঐ ভাঁড়ালগুলি ধর্মরাজের স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। পূর্ণিমা তিথি হইতে যথারীতি পূজা আরম্ভ হয়। ভাঁড়ালগুলি দেবতাকে উৎসর্গ করার পর ভক্তগণ যথারীতি সংযম ও উপবাস পালন করিয়া ভাঁড়ালগুলিকে মাথায় করিয়া ঢাক-ঢোল প্রভৃতি বাদ্যসহকারে নৃত্য করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। এইরূপ নৃত্য করিতে করিতে অনেকে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতে দেখা যায়। এইরূপ ব্যক্তিদের গ্রাম প্রদক্ষিণের পর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ধর্মরাজ-তলায় আনা হয় এবং পরে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে ভক্তগণ ধর্মরাজের নিকট পূজা দিয়া উপবাস ভঙ্গ করিয়া থাকেন।

দোলযাত্রা উৎসব

বুজুঙ্গ গ্রামে বন্দোপাধ্যায় পরিবারের কুলদেবতা রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সাড়ম্বরে দোলযাত্রা উৎসব পালন করা হয়। পারিবারিক উৎসব হইলেও গ্রামের সর্বসাধারণ ইহাতে যোগদান করিয়া থাকেন।

পূর্ণিমার পূর্বদিন বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের গৃহে অধিবাস পূজাদি হয় এবং সন্ধ্যাকালে বহ্নি উৎসব উপলক্ষে খড় ও

বাঁশ দিয়া একটি কুটির নির্মাণ করিয়া উহার মধ্যে আতপ চাউলের পিটুলি দিয়া একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী মেষ স্থাপন করা হয়। পরে ঐ গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া খোল করতালের বাজনাসহ কীর্তন গাহিতে গাহিতে গ্রামবাসীরা ঐ প্রজ্জোলিত কুটির প্রদক্ষিণ করেন। পূর্ণিমার দিন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের বাড়ী হইতে মিছিল করিয়া রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আনিয়া দোলমঞ্চে স্থাপন করা হয় এবং ঐস্থানে যথারীতি পূজা ও রং আবির দিয়া দেবদোলের পর সংকীর্তনসহ শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। পরবর্তী পঞ্চমী তিথিতে পঞ্চমদোল উৎসব পালনের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

মনসাপূজা

কয়থা গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে তিনদিনব্যাপী মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজা 'বগা' পঞ্চমীর তিনদিন পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়া পঞ্চমীর রাত্রে শেষ হয়। মনসার কোন মূর্তি নাই, নির্দিষ্ট স্থানে ঘট স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা হয়। পূজাটি ব্যক্তিবিশেষের হইলেও গ্রামের সর্বসাধারণ এমনকি অহিন্দুরাও পূজায় যোগদান করেন। পঞ্চমী পূজার দিন মনসার উদ্দেশ্যে একটি ছাগ বলি দেওয়া হয় এবং পরে মানতের বলি হয়। পূজা প্রাঙ্গণে ঝাপানগান ও মনসামঙ্গলগানের ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্র-নারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। দেবীর বর্তমান সেবায়েত শুঁড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহা এবং পূজারী জাতিতে ব্রাহ্মণ, পদবী ভট্টাচার্য।

রথযাত্রা

বহুলা গ্রামের প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে বিশেষ ধূমধামের সহিত রথযাত্রা উৎসব পালন করা হয়। উৎসবটি ব্যক্তিবিশেষের হইলেও গ্রামের সর্বসাধারণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। এই গ্রাম নিবাসী শ্রীভোলা নাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের পূর্বপুরুষ অনন্ত লাল মণ্ডলের পিতা রেশম ব্যবসা উপলক্ষে এই গ্রামে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। অনন্ত লাল স্বীয় বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে বহু অর্থ উপার্জন করিয়া জমিদারী ক্রয় করেন। বাংলা ১২৫৫ হইতে ১২৬৫ সনের মধ্যে তাঁহার জমিদারী প্রসার লাভ করে এবং এই সময়ে তিনি সাড়ম্বরে রথযাত্রা উৎসবের প্রচলন করেন।

প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রায়চৌধুরী পরিবারের গৃহদেবতা রামচন্দ্রজীউ ও জগন্নাথদেবকে কেন্দ্র করিয়া রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে মধ্যাহ্নে ঐ বিগ্রহদ্বয়ের যথারীতি পূজা ও অপরাহ্নে রথ বাহির হয়। প্রায় দশ-বারো ফুট উচ্চ কারুকার্যখচিত পিতলের এই রথটির গঠন ভঙ্গী অতি সুন্দর। রথটি অনন্ত লাল মণ্ডল মহাশয় নির্মাণ করান। অবশ্য রামচন্দ্রজীউ-কে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের গৃহে বহুকাল পূর্ব হইতেই রথযাত্রা উৎসব পালন করা হইত; সেই সময় যে রথটি ব্যবহার করা হইত তাহা দারুনির্মিত। প্রায় পনের-ষোল ফুট উচ্চ প্রাচীন সেই রথটির স্থানে স্থানে ভাঙিয়া যাওয়ায় বর্তমান পিতলের রথটি নির্মাণ করা হয়। উল্লিখিত প্রাচীন রথটি অদ্যাবধি ঠাকুরবাড়ী প্রাঙ্গণে রক্ষিত আছে। রথযাত্রার প্রাক্কালে রামচন্দ্র ও জগন্নাথকে প্রথমে পুরাতন কাঠের রথের উপর কিছুক্ষণের জন্য রাখা হয় এবং পরে উহা পিতলের রথের উপর স্থাপন করিয়া রথের দড়ি টানা হয়। রথের দড়ি টানিতে আশপাশের গ্রাম হইতে বহু লোকজন আসেন। সাতদিন পরে উল্টোরথের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা
(বুড়াপীর)

বাড়া গ্রামে প্রতি তিন বৎসর অন্তর বুড়াপীর সাহেবের ফাতেহা উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় তিন বিঘা পরিমাণ জমির উপর আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। পার্শ্ববর্তী নওপাড়া, ভদ্রপুর, আকালীপুর, কয়থা, আজিমগঞ্জ, রামপুরহাট প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রত্যহ

প্রায় গড়ে দেড় সহস্র নরনারী মেলায় আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশটি দোকান ব্যতীত দুই-চারিজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ জঙ্গীপুর কালীতলা, ভগবানগোলা প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য কবিগান, আলকাপগান ও সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থ' করা হয়।

কালীপূজার মেলা

বরূলা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বদিন হইতে ক্ষ্যাপাকালীর পূজা উপলক্ষে কালীতলা সংলগ্ন ব্যক্তিবিশেষের প্রায় সাত-আট বিঘা জমিতে দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলায় কলিধা, কয়থা, নলহাটি, বরূলা, কুরুমগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন সহস্র নরনারী প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে এবং সাত-আটজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা তেলেভাজা প্রভৃতির খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, মাটির খেলনা পুতুল, ফলমূল, বাতাসা প্রভৃতির দোকান বসে।

অকালিপুর গ্রামে প্রতি বৎসর গুহ্যকালীরপূজা উপলক্ষে আশ্বিন মাসের শুক্ল চতুর্দশী তিথি হইতে আট-নয়দিনব্যাপী পূজা প্রাঙ্গণে দেবোত্তর প্রায় ছয়-সাত বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায়-পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে এবং আট-দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ স্থানীয়। উল্লিখিত দোকানপাটের মধ্যে মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তেলেভাজা, ময়রা প্রভৃতি খাবারের দোকানও থাকে। ইহা ভিন্ন, দুই-চারটি কাপড়চোপড়, বাসনকোসন এবং মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুলের দোকান থাকে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য আলকাপগান, ঝুমুর-গানের ব্যবস্থা করা হয় এবং ম্যাজিক, সার্কাসের দল আসে।

বিলকান্দি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বদিন কালীপূজা উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রায় সাত-আট বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং মুর্শিদাবাদ ও বিহারের সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থান হইতে মেলায় সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী আসেন। মেলায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে এবং কিছু ফেরিওয়ালা আসন। দোকানপাটগুলির অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়-চোপড়, মাটির খেলনা-পুতুল প্রভৃতির দোকান বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য আলকাপগানের ব্যবস্থা করা হয়।

চড়ক-গাজন ও নীলপূজার মেলা

মধুরা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে শিবের হোম উৎসব উপলক্ষে গ্রামের শিবতলায় প্রায় দশকাঠা দেবোত্তর জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন। মেলায় স্থানীয় এবং আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয় এবং ময়রা, তেলেভাজা ব্যতীত মনিহারী, কাপড়চোপড়, বই-ছবি প্রভৃতির দোকানপাট বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য আলকাপ ও কবিগানের ব্যবস্থা করা হয়।

কুরুম গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে বুড়োশিবের হোম উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন ব্যক্তিবিশেষের প্রায় ছয়-সাত বিঘা জমির উপর পাঁচ-ছয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলায় স্থানীয় এবং আশপাশের হাসন, কালুহা, দুনিগ্রাম, বরূলা, কয়থা, কলিধা, বাউটিয়া, নলহাটি, ভদ্রপুর, প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় সাত-আটশত নরনারী গরুর-গাড়ী, রিক্সা ও মোটরবাসে করিয়া আসেন।

স্থানীয় এবং নলহাটি, মীরগ্রাম, কয়থা, ভদ্রপুর, গোপগ্রাম, দেবগ্রাম ও রামপুরহাট হইতে বিক্রেতাগণ মেলায় আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন,

কাপড়চোপড় প্রভৃতির প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকান বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়। আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়, থিয়েটার, কবিগান প্রভৃতির দল আসে। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় দেড় সহস্র দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হয়।

বুজুঙ্গ গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি তিথি হইতে শিবের গাজন উপলক্ষে পূজা-প্রাঙ্গণে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন। মেলায় সাত-আট শত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ বুজুঙ্গ ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া থাকেন।

মেলায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে এবং আট-দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। উহার অধিকাংশই খাবার ও মনিহারীর দোকান। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে শিবপূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য তোলা আদায় করা হয়।

কয়থা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা উপলক্ষে গ্রামের 'চড়ক পুষ্করিণী' নামক পুষ্করিণীর দক্ষিণ পূর্বকোন সংলগ্ন প্রায় ছয়-সাত বিঘা পরিমাণ জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। স্থানীয় লোকজন ব্যতীত নিকটবর্তী বরলা ও ভদ্রপুর ইউনিয়ন হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র নরনারীর আগমন হয়।

আশপাশের গ্রাম হইতে বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসর দোকানপসার লইয়া মেলায় আসেন। মেলায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান ব্যতীত দশ-বারোজন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, প্রভৃতি বেশী। ইহা ব্যতীত, মনিহারী দোকান, লোহা ও মাটির জিনিসপত্রের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদির দোকানপাট বসে।

গোঁসাইপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা উপলক্ষে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে মহাকালী মন্দিরের সম্মুখে প্রায় দশ-কাঠা পরিমাণ জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। মেলায় আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকান ব্যতীত দশ-বারোজন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় প্রধানতঃ ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের ও মনিহারী দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশই দোকানই খোলা জায়গায় বসে।

ধর্মরাজের মেলা

বুজুঙ্গ গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ধর্মরাজের স্নানযাত্রা উৎসব উপলক্ষে ধর্মরাজ-তলায় প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর ছয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলায় স্থানীয় লোকজন এবং পার্শ্ববর্তী কুকুমগ্রাম, ভদ্রপুর, দুনিগ্রাম, বরলা প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন-চার সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাই বেশী। মেলায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকান ব্যতীত কুড়ি-পঁচিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। ময়রা, মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, ধামা-কুলো প্রভৃতির দোকান ব্যতীত ফলের দোকান বসে। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাগানের দল আসে এবং জুয়া খেলা হয়।

দোলযাত্রার মেলা

বুজুঙ্গ গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে ঠাকুরবাড়ীর দোলমঞ্চ সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির উপর পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে মেলাটি প্রাচীন। মেলায় প্রায় পঁচিশটি দোকানপাট বসে এবং আমোদপ্রমোদের জন্য কীর্তনগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য মেলার বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়। মেলার অন্যান্য তথ্য এই গ্রামে অনুষ্ঠিত মেলার অনুরূপ।

মহোৎসবের মেলা

মধুরা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষে গ্রামের ভগবতীতলায় প্রায় দশকাঠা জমির উপর দুইদিনের জন্য একটি মেলা বসে।

আশপাশের গ্রাম হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নরনারী মেলায় আসেন এবং ময়রা মনিহারী, বই-ছবি, কাপড়চোপড় প্রভৃতির কুড়ি-পঁচিশটি দোকান বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ নলহাটি ও চাতরা হইতে আসেন।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য কৃষ্ণযাত্রা, আলকাপগান ও কবিগানের দল আসে।

রথযাত্রার মেলা

বর্‌লা গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রথযাত্রার দিন ও উল্টোরথের দিন সকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সাত-আট বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে।

মেলায় কয়থা, কলিধা, বর্‌লা, কুরুমগ্রাম, নলহাটি প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় পাচ-ছয় সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই অধিক। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ভিন্ন কুরুমগ্রাম, নলহাটি প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। মেলার ময়রা, তেলেভাজা মনিহারী, কাপড়চোপড় প্রভৃতির ত্রিশ-চল্লিশটি দোকান বসে। আমোদপ্রমোদের জন্য আলকাপগান ও কবিগানের ব্যবস্থা করা হয়।



গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : আস্তুয়া।১৪।১,২০৫·৯৪।৫৫১।১,৮৮৩

(ক) কায়স্থ, রাজবংশী, ভুঁইয়া, রবিদাস, কামার, সাহু, কোড়া এবং মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রাজগাঁ হইতে বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের অন্য সময় মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর খুব ধুমধামের সহিত কার্তিক পূজা হয়। কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের ২'রা পর্যন্ত এই উৎসব চলে। ইহা ব্যতীত, মুসলমান সম্প্রদায়ের সবেবরাত, ঈদ এবং মহরম অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) কার্তিকপূজার মেলা। কার্তিক মাসে দুইদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় নব্বুই বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীমহম্মদ গিয়াসুদ্দিন, শিক্ষক,
আস্তুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রাজগাঁ,
বীরভূম।

২। গ্রাম : গোড়সা।১৬।১,২৬৯·৩৪।২৯৯।১,৪৬৯

(ক) ব্রাহ্মণ, গন্ধবণিক, কামার, কুমার, চামার, সদ্গোপ, গোয়ালা, ছুতার, রাজবংশী, কোনাই, নাপিত এবং মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন রাজগাঁ হইতে জেলাবোর্ডের রাস্তা ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের কোজাগরী পূর্ণিমায় স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কর্তৃক লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

গ্রামের শ্রীশ্যাম প্রসন্ন রায় ও শ্রীশশাঙ্ক শেখর রায় মহাশয়ের বাটিতে ধাতুনির্মিত সিংহবাহিনী দুর্গার নিত্য-ভোগপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শারদীয়া পূজার সময় চারদিন-ব্যাপী ছাগ বলি সহ যথারীতি পূজা এবং ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন করা হয়।

(ঙ) লক্ষ্মীপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে জয়া-বিজয়াসহ লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি ও মধ্যপাড়ায় টিনের ছাউনীযুক্ত দুইটি ঘরে শিবলিঙ্গ ব্যতীত নাককাটা শিব এবং শিবকালী আছে।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
গোড়সা টোলবাটি,
পোঃ রাজগাঁ, বীরভূম।

৩। গ্রাম : ডালিমা।১৯।৪০১·২১।১৩৯।৬৯৫

(ক) নাপিত, সদ্গোপ, বেনে, রাজবংশী, কুড়ল, কাহার ও পাণ্ডা। গ্রামটিতে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন রাজগাঁ হইতে গ্রামে যাওয়া যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে প্রস্তরময় কালী, মধ্যভাগে ষষ্ঠী এবং পূর্বপ্রান্তে একটি অশ্বত্থ গাছেরতলায় শিব ও দুলাল কালী আছে।

শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ দাস, প্রধান শিক্ষক,
ডালিমা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ আমডোল, বীরভূম।

৪। গ্রাম : রতনপুর।৩১।১৬৩·৬৬।৬০।৩০৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাল, কোনাই, তিলি, মুচি, হাড়ী, কুমার, সাঁওতাল, খৃষ্টান ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রাজগাঁ।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে পনরদিনব্যাপী। শ্যামসুন্দর ঠাকুরের উৎসব। উৎসবটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) শ্যামসুন্দর ঠাকুরের উৎসব উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুন মাসে পনরদিন। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে শ্যামসুন্দর ঠাকুরের পাকা দেওয়াল ও টিনের ছাউনীযুক্ত মন্দির আছে।

শ্রীজানকী নাথ দাস, ব্যবসায়ী,
গ্রাম : রতনপুর, বীরভূম।

৫। গ্রাম : সাঁখুলিয়া।৫৮।৪৩২ ৫১।১৮।৭৪৪

(ক) রাজবংশী, মুচি ও মুসলমান। গ্রামটিতে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রাজগাঁ হইতে জেলা-বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চান্দ্রমাসানুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) মহরমের মেলা। একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীবিনয় কুমার ঘোষ, শিক্ষক,
সাঁখুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, বীরভূম।

৬। গ্রাম : জাজিগ্রাম।৭২।২,২২০৫৫।৪৪৫।২,২৩১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বারুজীবি, সদ্গোপ, বেনে, কামার, কুমার, গোয়ালা, জেলে, মাল, কোনাই, ফুলমালী, ভুঁইমালী, ভড়, তিয়র, ডোম, নাপিত, কোড়া ও রাজপুত। গ্রামটিতে বামনপাড়া, কায়স্থপাড়া, বৈদ্যপাড়া, সদ্গোপপাড়া, ভুঁইমালীপাড়া, বারুজীবিপাড়া, মালপাড়া, ভড়পাড়া, কোড়াপাড়া, গোয়ালাপাড়া, কোনাইপাড়া, কুমারপাড়া, কামারপাড়া, জেলেপাড়া, তিয়রপাড়া, চামারপাড়া প্রভৃতি নামে অনেকগুলি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) মুরারই অথবা জঙ্গীপুর রোড রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। মুরারই হইতে গরুরগাড়ী করিয়া এবং জঙ্গীপুর রোড হইতে বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে ছয়টি দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও দশটি কার্তিকপূজা, মাঘ মাসে গ্রামের বিভিন্ন পল্লীতে পারিবারিক ও সর্বজনীন মোট প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ইহা ব্যতীত, গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে 'ভক্তমারা' নামে খ্যাত উৎসব উপলক্ষে হর-গৌরীর পূজা হয়।

গ্রামবাসীগণ শ্রাবণ মাসে সুবৃষ্টির আশায় চাঁদা তুলিয়া গ্রামের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দেবদেবীর একযোগে পূজার আয়োজন করিয়া থাকেন। উক্ত দেব-দেবীর মধ্যে আছেন গ্রামের পূর্বদিকে অবস্থিত কালী, পশ্চিমদিকে দ্বারবাসিনী ও শিব, উত্তরদিকে রক্ষাকালী, বৃদ্ধমাতা কালী ও শ্মশাননাথ শিব এবং দক্ষিণদিকে পঞ্চদুর্গা, চতুর্ভুজা দুর্গা, হর-গৌরী, তারা ও ভগবতী প্রভৃতি দেব-দেবী।

উল্লিখিত উৎসব পার্বণ ব্যতীত ভুবনেশ্বরী, কৈলাসবাসিনী, মৎস্যাবতার, তারাদেবী, গণেশ, ভৈরব, শিব প্রভৃতি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দেব-দেবীর নিত্য-পূজা ও সময় সময় বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে তিনদিন হইতে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও একটি মাটির ঘরে হর-গৌরীর শিলামূর্তি আছে।

শ্রীদেবানন্দ গুপ্ত, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ জাজিগ্রাম, বীরভূম।

৭। গ্রাম : বর্দ্ধনপাড়া।৭৫।৫০১ ০৯।২৪২।১,১৫৩

(ক) রাজবংশী, মুচি, বাউরী ও মুসলমান। গ্রামটিতে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) মুরারই অথবা জঙ্গীপুর রোড স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রাম হইতে হাঁটিয়া অথবা

গরুরগাড়ীতে পাইকর হইয়া উল্লিখিত স্টেশন দুইটিতে যাতায়াত চলে। ইহা ব্যতীত, বর্ষা ও শরৎকালে গ্রাম সংলগ্ন পাগলী নদী দিয়া নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে মনসাপূজা, কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব ব্যতীত মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ, সবেবরাত প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে সের কাটানী নামে খ্যাত জনৈক পীরের আস্তানা আছে। এই পীরের প্রকৃত পরিচয় কি তাহা জানা যায় না। প্রবাদ আছে যে, এই পীর ঘণ্টায় এক সের তুলার সুতা কাটিতে পারিতেন বলিয়া গ্রামবাসীরা তাঁহাকে সের কাটানীপীর বলিতেন।

বর্তমানে বর্দ্ধনপাড়াটি যে স্থানে অবস্থিত প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে এখানে বিনোদনগর ও শ্যামনগর নামে দুইটি গ্রাম ছিল। কালক্রমে গ্রাম দুইটি জনশূন্য হইয়া যায়। বিনোদনগরের পার্শ্ববর্তী, পাইকর একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পাইকর গ্রামের লোকসংখ্যা বাড়িয়া ক্রমেই এইস্থানে জনবসতি গড়িয়া উঠে। এই কারণে পাইকর গ্রামের পার্শ্ববর্তী এই অংশটিকে লোকে বর্দ্ধনপাড়া বলে। বর্তমানে ইহা একটি গ্রামে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীআব্দুল হামিদ, শিক্ষক,
গ্রাম: বর্দ্ধনপাড়া, পোঃ পাইকর বীরভূম।

৮। গ্রাম : তীরগ্রাম।৯১৷১,০৮০·৮৬৷১৪৫৷৮৬৩

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, বৈশ্যসাহা, মাল, নাপিত, হাড়ী, কোনাই, চামার, তাঁতি, কাহার, দুলে ও কলু। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণপাড়া, নাপিতপাড়া, হাড়ীপাড়া, কলুপাড়া, চামারপাড়া, তাঁতিপাড়া, কাহারপাড়া, দুলেপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাতরা ও মুরারই। মুরারই রেলস্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে জহ্নুসপ্তমীর দিন হইতে আরম্ভ হইয়া দশমী পর্যন্ত চারদিনব্যাপী ভুবনেশ্বরীপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং তারাদেবীপূজা এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে ভুবনেশ্বরী পূজাটি অতি প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা, কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে তারা, ভুবনেশ্বরী, দুর্গা, কালী ও কালীর মন্দির ব্যতীত ক্ষেত্রপাল, লক্ষ্মীপাল, ষষ্ঠী ও দক্ষিণাকালীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীকিরীট ভূষণ সাহা, চাকুরি,
গ্রাম ও পোঃ বোনহা, বীরভূম।

৯। গ্রাম : বোন্‌হা।৯২৷৮৩২·৬৬৷৩২১৷১,৬৩৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামটিতে মালপাড়া, চামারপাড়া প্রভৃতি নামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাতরা হইতে জেলা-বোর্ডের একটি রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত, পাইকর রুটের মোটরবাসে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, চৈত্র মাসে শিবপূজা ব্যতীত মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ এবং চৌধুরী ওবেদার রহমান সাহেবের তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে ভগবতীমন্দির আছে।

গ্রামের 'বোন্‌হা' নামকরণ সম্পর্কে বলা হয় যে, 'বোন্‌হা' পার্শি শব্দ এবং ইহার অর্থ শিক্ষিত, পীর মহাপুরুষের আবির্ভাব স্থান। এই গ্রামে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নেসার মিঞা নামে জনৈক পার্শি ভাষার পণ্ডিত এই গ্রামে বাস করিতেন। শিক্ষিত ব্যক্তির আবাসস্থল হিসাবে খুব সম্ভবতঃ গ্রামের নাম 'বোনহা' হইয়াছে।

শ্রীরমজান আলী,
গ্রাম ও পোঃ বোন্‌হা, বীরভূম।

১০। গ্রাম : গোপালপুর।১০২।৯৫৪'৫৮।১৩৭।৬৪৬

(ক) রাজপুত, ভাট, ঘাটওয়াল, মুচি ও মুসলমান। গ্রামটিতে ঘাটওয়ালপাড়া, মুচিপাড়া প্রভৃতি নামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রাজগাঁ হইতে একটি কাঁচা রাস্তা ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ব্যতীত মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ ও রমজান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে বিজয়া-দশমীতে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীহাবিবর রহমান, শিক্ষক,
গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রাজগাঁ, বীরভূম।

১১। গ্রাম : ভাদীশ্বর।১০৩।৩৬২'০৯।৫৭৫।২,৮৪৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, সদ্গোপ, তাঁতি, কামার, স্যাকরা, গন্ধবনিক, তিলি, বৈরাগী, মাল, হাড়ী, ডোম, বাগ্দী, কোনাই, চামার ও মুসলমান। গ্রামটিতে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মুরারই হইতে জেলা-বোর্ডের একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্যান্য ঋতুতে জেলা বোর্ডের ঐ রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুর্নযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং মাত্র পনর বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুর্নযাত্রার দিন। মেলাটি মাত্র গত পনর বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) গ্রামে মনসাদেবীর একটি স্থান আছে। গ্রামের নাম সম্পর্কে অনুমান করা হয় যে, বাংলায় মুসলমান শাসনকালে এই অঞ্চলে ভদ্রেশ্বর নামে এক রাজা বাস করিতেন এবং সম্ভবতঃ উক্ত রাজার নামানুসারে গ্রামের নাম "ভদ্রেশ্বর" অপভ্রংশে "ভাদীশ্বর" হইয়াছে। গ্রামে রাজা ভদ্রেশ্বরের বৃহৎ অট্টালিকার ও একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজারবাড়ীর ভগ্নস্তূপ বর্তমানে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব কর্তৃক সংরক্ষিত।

শ্রীশ্যামাপদ রায়, শিক্ষক,
গ্রাম: ভাদীশ্বর, পোঃ মুরারই, বীরভূম।

Bhadiswar—Adjacent to the railway station of Murarai. Two large mounds protected under the Ancient Monunent Preservation Act. I could not find anything of historical interest. These are said to the ruins of the of the palace of king Bhadiswar. I could not find any historical reference to him."
(District Handbooks, Birbhm, 1951 by A Mitra, p. 149)

১২। গ্রাম : মুরারই।১০৪।২৫৮'৭১'৩১০।১,৫৫৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, কামার, কুমার, বাউরী, মুচি, গন্ধবনিক, মাল, ডোম, মেথর ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই রেলস্টেশন আছে এবং গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের জন্য জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরজীউর আট-দশদিনব্যাপী সাড়ম্বরে পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) শ্যামসুন্দরজীর মেলা। ফাল্গুন মাসে আট-দশদিনব্যাপী। ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) একটি মাটির ঘরে শ্যামসুন্দরজীউ নামে খ্যাত শ্রীকৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, একটি মনসাদেবী আছে।

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার, গ্রামসেবক,
মুরারই, বীরভূম।

১৩। গ্রাম : কনকপুর। ১০৯।১,৫৬৪'৩৩।১৯১।৯১৬

(ক) ব্রাহ্মণ, কোনাই, নমঃশূদ্র, ভুঁইমালী, মুচি, কামার, পাশি, বনিক, সোহানা ও মুসলমান। গ্রামটিতে

ব্রাহ্মণপাড়া, কোনাইপাড়া, নমঃশূদ্রপাড়া, ভূঁইমালীপাড়া, মুচিপাড়া, বনিকপাড়া, কামারপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মুরারই হইতে গ্রামে যাতায়াতের জন্য জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ভুবনেশ্বরীপূজা, আষাঢ় মাসে অপরাজিতাদেবীর বার্ষিক পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা ব্যতীত কালী, শীতলা, ষষ্ঠী, জীমূতবাহন প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) অপরাজিতাদেবীর পূজা উপলক্ষে মেলা। আষাঢ় মাসে চার-পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে শিব ও নারায়ণ শিলাসহ অপরাজিতাদেবীর (কালী) মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে সাতটি অনাদিলিঙ্গশিব ও একটি শীতলা আছে।

শ্রীভৈরব নাথ চট্টোপাধ্যায়,
গ্রাম: কনকপুর, পোঃ মলয়পুর,
বীরভূম।

Kanakpur -About 3 miles west of Murarai railway station. There is an old image called Aparajita in a temple which was renovated by Udaynarayan. Very near Kanakpur is a village called Birkiti where there are remains of a fort on a high mound. This was built by Raja Udaynarayan. Close to Birkiti is the field of Murmurer Danga where the famous battle of Jagannathpur was fought, and Udaynarayan was made captive by the Nawab's army."

(District Handbooks, Birbhum, 1951 by A. Mitra ; p. 149)

১৪। গ্রামঃ বাহাদুরপুর।
১১৫।১,১২৪·২৪।৩১৭।১,৫০৮

(ক) বৈরাগী, গন্ধবনিক, সদ্গোপ, রাজপুত, ভূঁইহার, কামার, নরসুন্দর, কাহার, কোনাই, রাজবংশী, রাজমান, মুচি ও মুসলমান। গ্রামটিতে মুচিপাড়া, ঝালপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মুরারই হইতে গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা তিথিতে স্থানীয় জমিদার পরিবারের পরিচালনায় ফলহারিনীকালী ও ষষ্ঠীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা ও শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন, গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় মহরম উৎসব পালন করেন। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে পাঁচদিন-ব্যাপী। মেলাটি গত মাত্র আট-নয় বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে শিব ব্যতীত ষষ্ঠীতলা এবং পীরতলা নামে দুইটি স্থান আছে।

শ্রীরামপদ দত্ত, চিকিৎসক,
গ্রাম: বাহাদুরপুর,
পোঃ মুরারই, বীরভূম।

১৫। গ্রামঃ রুদ্রনগর।১৩৭।২,৩৩৬·৪৬।৬৪২।৩,৫৬৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোয়ালা, নাপিত, ভূঁইমালী, মুচি, কোনাই, ধোপা, কলু, ছুতার, কামার, জেলে, শুঁড়ি, রাজবংশী, বেদে, বেনে, তাঁতি, তামলি ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাতরা হইতে জেলা-বোর্ডের ও ইউনিয়নবোর্ডের রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুইটি স্থানে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে সাত-আটদিন ব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বাসন্তীমন্দির, দুর্গামন্দির ও পীরতলা ব্যতীত একটি শিব, দুইটি ষষ্ঠী, একটি মনসা এবং রুদ্রকালী নামে দেবদেবী আছে।

গ্রামে প্রতিষ্ঠিত রুদ্রকালীর নামানুসারে গ্রামের নাম রুদ্রনগর হইয়াছে। রুদ্রকালী বিশেষ জাগ্রতা ঈশ্বরী বলিয়া বিশ্বাস।

শ্রীজবোর আলি, প্রধান শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ রুদ্রনগর, বীরভূম।

১৬। গ্রামঃ আমুড্ডা।১৪৯।৫৯৮·০৯।৩৬২।১,৬৬৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামটিতে হিন্দুপাড়া, সেখপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাতুরা এবং তকীপুর ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শিবপূজা এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, বুড়াপীরের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শিবপূজা ও পীরের উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামন্দির এবং একটি চণ্ডীমণ্ডপ আছে। ইহা ব্যতীত, বুড়াপীর নামে জনৈক পীরের দরগাহ আছে।

শ্রীফতেহ মহম্মদ, প্রধান শিক্ষক,
আমুড্ডা বিশেষ পর্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ ছাতিনা, বীরভূম।

ডালিমা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ দাস কর্তৃক 'আমডোল' গ্রামের উৎসব সম্পর্কে প্রেরিত বিবরণী নিম্নে দেওয়া হইল—

আমডোলা গ্রামে জনৈক সাধুবাবার একটি আশ্রম আছে। বাংলা ১৩৩২ সন হইতে এই আশ্রমে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে সাধুবাবার অনুরাগী ভক্তরা তাঁহার আবির্ভাব উৎসব পালন করেন। উৎসব উপলক্ষে নামগান ও দরিদ্রনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। এই আশ্রমের নিকটেই একটি প্রাচীন মন্দিরে কালী শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কালীর নিত্যপূজা হয়। তবে প্রতি শনি-মঙ্গলবার আশপাশের গ্রাম হইতে মন্দিরে পূজা দিতে লোকজন আসেন। গ্রামে রসিকরায় নামে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত, প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামের পূর্বপাড়ায় মহাসমারোহে অন্নপূর্ণাপূজা, মাঘ মাসে গ্রামের তিনটি স্থানে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে রাজবংশী সম্প্রদায় কর্তৃক শিবের মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয়। উৎসবগুলিতে বহু লোকজনের সমাগম হয়। উৎসব প্রাঙ্গণে কীর্তনগান, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসব বিবরণী

অপরাজিতা পূজা

কনকপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে ষষ্ঠী তিথি হইতে চারিদিনব্যাপী অপরাজিতাদেবীর বাৎসরিক উৎসব মহাধূমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রস্তুতি সাধারণতঃ রথের দিন হইতে শুরু হয়।

ষষ্ঠী তিথিতে অধিবাস এবং সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে যথারীতি ভোগপূজা ও হোম হয়। সন্ধিপূজা উপলক্ষে ইক্ষু, চালকুমড়া ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। নবমী তিথিতে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি মানতের ছাগ ও দুই একটি মহিষ বলি পড়ে। উৎসবকালে আশপাশের গ্রাম হইতে প্রতিদিন প্রায় তিন-চারিশত নরনারী মন্দিরে পূজা দিতে এবং দেবীর মূর্তি দর্শন করিতে আসেন। মন্দিরে নারায়ণ ও শিবের মূর্তিসহ অপরাজিতার নিত্যপূজা হয়।

কনকপুরের অপরাজিতা দেবীর মন্দিরটি একটি সিদ্ধ-পীঠ বলিয়া খ্যাত। শুনা যায়, ভাদুড়ী রাজা উহা স্থাপন করেন। গ্রামের পার্শ্ববর্তী নদীতীরে দেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। ভাদুড়ী রাজা পরে গ্রামের মধ্যে স্থাপন করেন। দেবীর নিত্য ভোগপূজা পূর্বে রাণী ভবানীর অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হইত। উৎসব উপলক্ষে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

আবির্ভাব ও তিরোভাবের উৎসব
(জঙ্গলীপীর)

বাহাদুরপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মহরম মাসে জঙ্গলীপীর সাহেবের আস্তানায় পীরের উরস্ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বহু নরনারী পীরের আস্তানায় আসিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং অনেকে আস্তানায় ধূপধুনা, আগরবাতি, মাটির ঘোড়া, বাতাসা প্রভৃতি মানত হিসাবে দিয়া থাকেন। এই সময় মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসবের সময় বলিয়া লাঠি খেলওয়াড়গণ পীরের আস্তানায় আসিয়া লাঠি খেলিয়া যান।

কিংবদন্তী আছে যে, অনূ্যন দুইশত বৎসর পূর্বে শাহ জাঙ্গলী নামে জনৈক মুসলমান সিদ্ধপুরুষ বাহাদুরপুর গ্রামে বসবাস করিতেন। তিনি বাকসিদ্ধ ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার নানা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অনেকেই তাঁহার ভক্ত ও অনুরাগী হন। শোনা যায়, তিনি ঐশী শক্তির সাহায্যে রোগ-ব্যাধি নিরাময় করিতে পারিতেন। দেহরক্ষার পর তাঁহার অনুরাগীরা প্রতি বৎসর মহরম মাসে তাঁর স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে এই উৎসবের প্রচলন করেন।

কালীপূজা

ডালিমা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে খুব ধুমধামের সহিত কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং ইহা নাটোরের রাণী ভবানী কর্তৃক প্রবর্তিত। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কালীর প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্তমানে শ্রীভোলা নাথ পাণ্ডা নামে জনৈক পশ্চিমা ব্রাহ্মণ দেবীর নিত্যপূজাদি করিয়া থাকেন এবং কার্তিক মাসে কালীমন্দিরে বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ব্রাহ্মণ পরিবার পুরুষানুক্রমে দেবীর পূজারী।

ডালিমা গ্রামে এবং এই গ্রামের আশপাশের আরও কতকগুলি গ্রামে অনুষ্ঠিত কালীপূজা সম্পর্কে জানা যায় যে, একদা নাটোরের রাণী ভবানী একদিনে বারো লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন বলিয়া সংকল্প করেন; কিন্তু একদিনে এই বিপুল সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন কিরূপে সুসম্পন্ন করা যায় তাহাই হইল সমস্যা। অবশেষে স্থির হয় যে, রাণী ভবানীর বিভিন্ন মহলের বিভিন্ন স্থানে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় মোট এক লক্ষ কালীপূজা করিয়া প্রতিটি পূজারস্থানে বারো জন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে একই দিনে বারো লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন সম্পন্ন হইতে পারে। তদনুযায়ী রাণী ভবানীর মহালের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রামে মহাধুমধামের সহিত কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। রাণীর রাজধানী নাটোরে এই উপলক্ষে বিপুল সংখ্যক পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কোন কোন গ্রামে রাণী ভবানী দ্বারা প্রবর্তিত এইরূপ পূজা অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে এবং ঐ সকল পূজা রাণী ভবানীর বংশধরগণের নামেই সংকল্প করা হয়। অবশ্য বর্তমানে কার্তিক মাসে অমাবস্যা তিথির পরিবর্তে কোন কোন স্থানে গ্রামবাসীর সুবিধামত বৎসরের যে কোন সময়ে এই পূজা হইয়া থাকে।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার উৎসব

আমুড্ডা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ২৬শে হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়দিনব্যাপী শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথমদিন একজন প্রধান ভক্তা এবং দুইজন সহভক্তা ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করিয়া সংযমীব্রত পালন করেন। পরদিন তাহাদিগকে শিব গোত্রান্তরিত করিয়া গলায় উত্তরীয় পরাইয়া দেওয়া হয়। পরদিন ভক্তরা সারাদিন উপবাস থাকিয়া গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া বেড়ান এবং সন্ধ্যায় শিবপূজা ও শিব বন্দনার পর জলগ্রহণ করেন।

চতুর্থ দিনে শিবের গাজন উপলক্ষে একটি বিশেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্ব উপলক্ষে ভক্তরা মন্দিরের পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে লস্করদীঘি নামে একটি দীঘির উত্তর পাড়ে পোয়াল (খড় বিশেষ) দ্বারা ভোগরান্না করেন। এই সময় একজন ভক্ত দীঘি জলে ডুব দিয়া এক ডুবে একটি চিংড়ী মাছ ধরিয়া আনেন। ঐ চিংড়ি মাছটিকে অগ্নি দগ্ধ করিয়া উক্ত খিচুড়ী সমেত দীঘির জলে শিবের উদ্দেশ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়।

এই অনুষ্ঠানের পর ভক্তগণ পুরোহিতকে লইয়া সরাসরি শিবের মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শিবপূজা করার পর হোমযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। হোম-যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে একটি

পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। অবশ্য মানতের বলি প্রায় সারা রাত্রিব্যাপী চলে। উৎসবের পঞ্চম দিনে অপরাহ্নে শিবের পূজা শেষ হইলে ভক্তগণ ও গ্রামের সকল শ্রেণীর লোকজন আসিয়া মন্দিরে সমবেত হন। এই সময় নানাপ্রকার ও নানা রংয়ের ফুলের মালা দিয়া শিবকে সাজাইয়া বাদ্যভাণ্ডার সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন। প্রসংগতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গ্রামের শ্রীকালী পদ কর্মকার নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শোভাযাত্রা বাহির হইবার পূর্বে তাঁহার নিজ বাটিতে শোভাযাত্রাকারীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। কর্মকার মহাশয় এই উৎসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু স্থাবর সম্পত্তি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশিমবাজারের জমিদার কমলা রঞ্জন রায় বাহাদুরের নিকট হইতে দানসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইদিন উৎসবটি অধিকরাত্রি পর্যন্ত চলে এবং বহু নরনারীর সমাগম হয়। পরদিন অর্থাৎ পয়লা জ্যৈষ্ঠ পুরোহিত মহাশয় অন্যান্য দিনের ন্যায় পূজা শেষ করিলে ভক্তগণ গঙ্গাজলে হরিদ্রা বাঁটিয়া সরিষা তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুরোহিতকে অর্পণ করেন। পুরোহিত উক্ত হরিদ্রামিশ্রিত সরিষার তৈল শিবের সর্বাঙ্গে লেপন করেন এবং অবশিষ্টাংশ ভক্তগণকে ফেরত দেন। ভক্তগণ পুনরায় ক্ষৌরকার্য সম্পন্নের পর উক্ত হরিদ্রামিশ্রিত তৈল সর্বাঙ্গে মাখিয়া স্নান সমাপন করেন। ইহার পর কিছু জলযোগের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

তারাদেবীরপূজা

তীর গ্রামে তারাদেবীর নিত্যপূজা এবং প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের শুক্লাচতুর্দশীর দিন বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার দেবীর সেবায়েত। স্থানীয় লোকজন এই উৎসবে যোগদান করেন এবং মানত পূজাদি দেন।

তারাদেবীপূজা সম্পর্কে এই গ্রামে একটি কিংবদন্তী আছে। শোনা যায়, এই গ্রামের জনৈকা বৃদ্ধা তারাপীঠে তারাদেবীর নিকট মানতের পূজা দেবার জন্য তারাপীঠের উদ্দেশ্যে পদব্রজে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি ক্লান্ত হয়ে অবসন্ন দেহে একটি গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়িলে তারাদেবীর স্বপ্নাদেশ হয় যে, তাকে তারাপীঠে যাবার দরকার নেই। তীর গ্রামের শ্মশানঘাটে কালীর মৃন্ময় মূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিলেই দেবী প্রসন্ন হইবেন। স্বপ্নাদেশ অনুসারে বৃদ্ধা তীর গ্রামে তারার ধ্যানে কালী পূজার ব্যবস্থা করেন এবং তদাবধি এই পূজা চলিয়া আসিতেছে। উৎসবটি প্রাচীন।

ভক্তমারা উৎসব
(হর-গৌরীপূজা)

জাজি গ্রাম 'ভক্তমারা' নামে খ্যাত উৎসবটি স্থানীয় তপশীলভুক্ত জাতির একটি বিশেষ উৎসব। উৎসবটি প্রতি বৎসর মাঘ মাসের চতুর্থী তিথি হইতে আরম্ভ হয় এবং চারদিনব্যাপী চলে। এই উৎসব উপলক্ষে হর-গৌরী ও বুড়াশিবের সাড়ম্বরে পূজাদি হইয়া থাকে। গ্রামে একটি মাটির ঘরে হরের কোলে উপবিষ্টা গৌরীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাই হর-গৌরী নামে খ্যাত এবং মূর্তিটি প্রস্তর নির্মিত। অপর একটি পাকা মন্দিরে বুড়াশিব নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

উৎসবের চারদিন প্রত্যহ ব্রাহ্মণ পূজারী কর্তৃক যথারীতি হর-গৌরী ও বুড়াশিবের পূজার পর ভক্তরা পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকেন। ষষ্ঠীর দিন পূজান্তে অপরাহ্নে ভক্তরা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া মন্দিরের নিকট সমবেত হইলে মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের 'ঝাঁপ' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঝাঁপ প্রদানকারীরা একটি উচ্চ বাঁশের মঞ্চ হইতে নীচে রক্ষিত 'বাণ'-এর উপর এক এক করিয়া ঝাঁপ দেন। সপ্তমীর দিন শেষ পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এবং এইদিন মানতের বলি প্রদান করা হয়। মানত হিসাবে প্রধানতঃ ছাগ ও মেষ বলি হইয়া থাকে। পূজারী সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী মুখোপাধ্যায়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং উৎসবে হিন্দু-অহিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় বারো শত ভক্তের সমাবেশ হইয়া থাকে।

মেলা বিবরণী

অপরাজিতা পূজার মেলা

কনকপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে অপরাজিতা দেবীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির পার্শ্বস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর চার-পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

আশপাশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে প্রত্যহ সকল সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয়শত নরনারীর সমাগম হয়। খাবার, মনিহারী, কাপড়চোপড় এবং অন্যান্য শিল্প-সামগ্রীর পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে এবং দশ-বারো জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসর আশ-পাশের গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন।

আমোদপ্রমোদের জন্য আলকাপগান ও সাঁওতালী নাচের ব্যবস্থা করা হয়।

কার্তিকপূজার মেলা

আড়ুয়া গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা উপলক্ষে রাজবংশী পাড়ায় প্রায় এক বিঘা জমির উপর দুইদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আশি-নব্বুই বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের গ্রামসমূহ হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় চারি-পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় মোট ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং চারি-পাঁচজন ফেরিওয়ালা আসেন। ঐ সকল দোকান-পাটের মধ্যে বিভিন্ন খাবারের দোকান ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। বিক্রেতারা রাজগ্রাম, কাঁশল, গোড়াল প্রভৃতি হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

কালীপূজার মেলা

জাজিগ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে গ্রামের উত্তরাংশে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। উল্লিখিত জমির কিয়দাংশ দেবোত্তর এবং কিয়দাংশ ব্যক্তিবিশেষের। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং তিনদিন হইতে পাঁচদিন-ব্যাপী স্থায়ী হয়। মেলায় নিকটবর্তী হিলোড়া, মিত্রপুর, আস ভাগ, নন্দীগ্রাম, পাইকর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে এবং নলহাটি, কাঁথি, বহরমপুর, ধুলিয়ান, রাজগাঁ ও সাঁওতাল পরগণা হইতে প্রতি বৎসর যাত্রী আসিয়া থাকেন। প্রতিদিন গড়ে প্রায় আড়াই সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়; তবে কালীপ্রতিমা বিসর্জনের দিন যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এইদিন প্রায় ছয়-সাত সহস্র যাত্রীর সমাবেশ হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ভিন্ন নলহাটি, কাঁথি, লালগোলা ও ধুলিয়ান হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতাগণ আসেন। মেলায় প্রায় দুশত দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। ঐ সকল দোকানপাটের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ-ষাট খানি দোকান খোলা জায়গায় বসে। উল্লিখিত দোকান-পাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও হোটেল জাতীয় খাবারের দোকানের সংখ্যা প্রায় একশতটি, লোহা-কাঁচ ও মাটির বাসনপত্রের দোকান প্রায় ত্রিশটি, কাপড়-চোপড়ের দোকান প্রায় চল্লিশটি এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যা প্রায় কুড়িটি। ইহা ভিন্ন, কয়েকটি বই-ছবির দোকান ও বেতের তৈয়ারী চাঙ্গারী, ধামা এবং বাঁশের তৈয়ারী শিল্প সামগ্রীর দোকানপাট বসে। বেতের তৈয়ারী জিনিসগুলি মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর হইতে এবং বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রগুলি জঙ্গীপুর হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই মেলায় প্রতিদিন কুড়ি হইতে পঁচিশ গরুর-গাড়ী আঁখ বিক্রয় হইয়া থাকে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নাগোরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক এবং আলকাপগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। মেলায় জুয়াও লটারী খেলাও হয়।

প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে তীর গ্রামের ভুবনেশ্বরী ও তারাদেবীর মন্দিরের সম্মুখস্থিত

রাস্তায় দুই পার্শ্বে একদিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

মেলায় প্রায় দুই-তিনশত যাত্রীর সমাগম হয় এবং খাবার, মনিহারী দ্রব্যের মাত্র দশ-পনেরটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ স্থানীয়।

দুর্গাপূজার মেলা

গোপালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের পূর্ব প্রান্তে প্রায় দশ-বারো বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

মেলায় আশপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়, মেলায় খাবারের দোকান, মনিহারী দ্রব্যের দোকান, পান-বিড়ি চায়ের দোকানসহ মোট কুড়ি-বাইশটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ রাজগাঁ, মাকুড় প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন, পাঁচ-ছয়জন ফেরিওয়ালাও আসেন। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য সাঁওতালী নৃত্যের ব্যবস্থা করা হয়।

বাসন্তীপূজার মেলা

রুদ্রনগর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে পশ্চিম পাড়ায় বাসন্তীপূজা উপলক্ষে দেবীমন্দির সংলগ্ন এবং জেলাবোর্ডের রাস্তার উভয় পার্শ্বে সাত-আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মুরারাই থানার অন্তর্গত প্রায় সবগুলি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের বহুযাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ প্রধানতঃ গরুরগাড়ী করিয়া আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, খেলনা-পুতুল ইত্যাদির প্রায় ত্রিশটি দোকান বসে।

আমোদপ্রমোদের জন্য থিয়েটার, যাত্রা, প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় এক সহস্র দর্শকের সমাগম হয়।

মহরমের মেলা

সাঁখুলিয়া মৌজার অন্তর্গত লম্বাপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব উপলক্ষে ব্যক্তি-বিশেষের জমির উপর মহরমের দিন কয়েক ঘণ্টার জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশপাশের কয়েকখানি গ্রাম হইতে মোট সাত-আটশত যাত্রীর সমাগম হয় এবং খাবার ও মনিহারী দ্রব্যাদির মাত্র পনর কুড়িটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।



[বক্রেশ্বরধাম ও সাঁইথিয়া সতীপীঠ সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক রচিত নিবন্ধ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ভ্রমবশতঃ নিবন্ধ দুইটি গ্রন্থে দুবরাজপুর ও সাঁইথিয়া থানার প্রদত্ত বিবরণীর সহিত যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। —সম্পাদক।]

বক্রেশ্বর

"বক্রেশ্বর মনঃ পাতু দেবী মহিষমর্দিনী
ভৈরবো বক্রনাথস্তু নদী তত্র পাপহরা।"

শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায়। এই জেলার নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে এই তিন ধর্ম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেবালয়, বিভিন্ন দেবদেবী। যত মত তত পথ। খুব সহজেই এককথায় মর্মোপলব্ধি করা যায় বীরভূমে এলে। বাংলা ও বাঙ্গালীর সাধন পদ্ধতির বিচিত্রতায় ভরা এই বীরভূম।

একান্ন পীঠের পাঁচটি পীঠই দেখতে পাওয়া যায় এই জেলায়। কোপাই বা কোপাবতী নদীর তীরে কংকালীতলায় দেবী কংকালী ও ভৈরব কাঞ্চীশ্বর, সাঁইথিয়া দেবী নন্দিনী ভৈরব নন্দীকেশরী, নলহাটিতে দেবী ললাটেশ্বরী, ভৈরব যোগেশ, লাভপুরে দেবী ফুল্লরা ভৈরব বিশ্বাস, বক্রেশ্বর নদের তীরে দেবী মহিষমর্দিনী ভৈরব বক্রনাথ। এছাড়াও আছে দ্বারকার তীরে বামাক্ষ্যাপার সিদ্ধপীঠ তারাপীঠের বশিষ্ঠারাধিতা উগ্রতারা ভৈরব চন্দ্রচূড় শিব, কনকপুরে অপরাজিতাদেবী, পাইকর গ্রামে ক্ষ্যাপাকালী, জয়দুর্গা প্রভৃতি। শিবভক্ত শৈবদের মন্দিরও কম নেই বীরভূমে। শৈবধাম বক্রেশ্বর ব্যতীত, ডাবুক গ্রামে ডাবুকেশ্বর শিব, কলেশ্বর গ্রামে কলেশ্বর শিব, কোটাশূর গ্রামে মদনেশ্বর শিব, মল্লেশ্বর গ্রামে মল্লেশ্বর শিব, ভাণ্ডারীবন গ্রামে বিভাণ্ডমুনির আশ্রমে সিদ্ধিনাথ ভাণ্ডেশ্বর শিব, কীর্ণাহারের কাছে যুগটিয়া গ্রামে যজ্ঞেশ্বর শিব প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণবতীর্থের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য অজয়নদীর তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে বৈষ্ণব কবি জয়দেবপাট, নান্নুর গ্রামে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের ভিটা ও তাঁহার আরাধিত বিশালাক্ষীদেবী, বীরচন্দ্রপুরে বাঁকারায়, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান একচক্র গ্রামে মহাপ্রভু মন্দির ও গর্ভবাস প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি নানা লৌকিক দেবদেবী তো আছেই। এই প্রসঙ্গে বেলিয়া গ্রামের ধর্মরাজঠাকুরের কথাও স্মরণীয়।

বক্রেশ্বর একাধারে শৈবধাম ও শক্তিপীঠ। তাই শৈব ও শাক্ত এই উভয় সম্প্রদায়েরই তীর্থস্থান এই বক্রেশ্বর। তবে শৈবতীর্থরূপেই-এর খ্যাতি সমধিক। বক্রেশ্বরধামকে ঘিরে প্রবাহিত বক্রেশ্বরনদের ক্ষীণজলধারা গিয়ে মিশেছে কোপাই বা কোপাবতী নদীর সঙ্গে। বক্রেশ্বর নদের অপর পাড়ে বক্রেশ্বরধাম ও বক্রেশ্বর গ্রাম (মৌজা নং ৬২)। রেলস্টেশন দুবরাজপুর থেকে প্রায় ৬ মাইল উত্তর-পূর্বে এবং সদর শহর সিউড়ী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ১৪ মাইল দূরে এই গ্রামটি অবস্থিত। দুবরাজপুর বা সিউড়ী থেকে যাত্রীবাহী মোটরবাস এসে হাজির হয় বক্রেশ্বরে।

বর্তমানে এই গ্রামের জনসংখ্যা সাতশ'র বেশী নয়। তারমধ্যে ব্রাহ্মণ, বাগ্দী ও ডোমের সংখ্যাই বেশী। এছাড়া মাত্র দু'একঘর ছুতার ও ময়রার বসবাস আছে। গ্রামে চৌধুরীপাড়া (ব্রাহ্মণ), আচার্যপাড়া, চক্রবর্তীপাড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বাগ্দীপাড়া, ডোমপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে। যজন-যাজন ও কৃষিকার্যই গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা।

আগেই বলা হয়েছে, বক্রেশ্বর কেবলমাত্র শৈবধামই নয়, একান্নপীঠের মধ্যে একটি পীঠস্থান বলেও গণ্য। বলা হয়, এখানে সতীর ভ্রূমধ্য পড়েছিল। এখানকার দেবী মহিষমর্দিনী ও ভৈরব বক্রনাথ। মহাশ্মশানের উপর এই মহাপীঠ অবস্থিত।

বক্রেশ্বরধামে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবন আছে। এই প্রস্রবনগুলির মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, খরকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, জীবিতকুণ্ড, চন্দ্রকুণ্ড বা সৌভাগ্যকুণ্ড প্রভৃতি সাতটি কুণ্ডই প্রধান। কুণ্ডগুলি ইঁট দ্বারা বাঁধানো। এছাড়া আছে পাপহারিণী গঙ্গা। পাপহারিণীকে একটি

দীঘিই বলা চলে ; তবে এর মধ্য দিয়ে উষ্ণকুণ্ডের ক্ষীণ জলধারা খাল পথে প্রবাহিত হয়ে কিছুদূরে গিয়ে বক্রেশ্বর নদের সঙ্গে মিশেছে। পাপহারিণী গঙ্গা স্নানযোগ্য।

উল্লিখিত কুণ্ডগুলির মধ্যে অগ্নিকুণ্ডের জল সর্বাপেক্ষা উষ্ণ। এই কুণ্ডের জল এতই উষ্ণ যে সর্বদাই এই কুণ্ড থেকে বাষ্প উঠছে। এই কুণ্ডের জলপান করলে অম্ল রোগে আরাম হয় বলে বিশ্বাস। খরকুণ্ডের জলও বেশ উষ্ণ ; তবে খরকুণ্ডের থেকে ভৈরবকুণ্ডের জল আরো বেশী উষ্ণ। জীবিতকুণ্ডের জল বেশ ঠাণ্ডা। বন্ধ্যা নারীরা সন্তান কামনায় এই কুণ্ডে স্নান করে থাকেন। চন্দ্রকুণ্ড বা সৌভাগ্যকুণ্ডের জলে ঈষদুষ্ণ। তবে এই কুণ্ডের একটি বিশেষ বিশেষত্ব আছে। ভোরের দিকে সূর্য উদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই কুণ্ডের জল সাদা দুধের মত দেখায় এবং সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এর জল আবার স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে। সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান করলে সৌভাগ্য লাভ করা যায় বলে ভক্তদের বিশ্বাস।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি কুণ্ড সম্পর্কে এক একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। 'সূর্যকুণ্ড' সম্পর্কে কথিত আছে যে, একবার নারদ মুনি বিন্ধ্যপর্বতের কাছে গিয়ে বিন্ধ্যপর্বত অপেক্ষা সুমেরু পর্বতের উচ্চতার গুণগান করেন। তাতে বিন্ধ্য-পর্বত অপমানবোধ করে সগর্বে স্ফীত হয়ে এত উঁচুতে মস্তক উত্তোলন করেন যে, সূর্যদেব তাঁর আড়ালে পড়ে যান। ফলে পৃথিবী সূর্যের আলো-তাপ থেকে বঞ্চিত হয়। বিপন্ন হয়ে সূর্যদেব বক্রেশ্বরের এই কুণ্ডে এসে শিবের স্মরণাপন্ন হয়ে তপস্যায় মগ্ন হন। শিব তুষ্ট হয়ে বিন্ধ্যকে মস্তক সংকুচিত ও অবনত করতে বাধ্য করেন।

'জীবিতকুণ্ড' সম্পর্কে শোনা যায় যে, পুরাকালে সর্ব ও চারুমতী নামে এক ধর্মপরায়ণ দম্পতি সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ করেন। সেই সময়ে একটি বাঘ সর্বকে হঠাৎ আক্রমণ করে মেরে ফেলে। শোকেদুঃখে কাতর হয়ে চারুমতী তাঁর স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করেন। চারুমতীর ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে শিব তাঁকে স্বামীর হাড়গুলি একত্র করে বক্রেশ্বর তীর্থের এই কুণ্ডে ধুতে বলেন। মহাদেবের নির্দেশ মত কাজ করলে সর্ব প্রাণ ফিরে পায়।

'ভৈরবকুণ্ড' সম্পর্কে কথিত আছে যে, ব্রহ্মার পাঁচটি মুখ থাকায় তিনি দেবসমাজে নিজেকে শিবের সমকক্ষ বলে দাবী করতেন। শিব তাতে রুষ্ট হয়ে একদা নিজের মাথার থেকে একটা জটা ছিঁড়ে ফেললে জটা থেকে তৎক্ষণাৎ বটুক ভৈরব বেরিয়ে এসে শিবের আদেশ প্রার্থনা করেন। শিব তাঁকে ব্রহ্মার প্রধান মুখটি কেটে ফেলতে আদেশ দেন। এই আদেশ অনুসারে বটুক ভৈরব ব্রহ্মার মুখটি তৎক্ষণাৎ কেটে ফেললেন বটে কিন্তু ঐ কর্তিত মুণ্ডটি তাহার আঙ্গুলে এমনভাবে এঁটে গেল যে, তিনি ভারতের নানাতীর্থে ভ্রমণ করেও মুণ্ডটি আঙ্গুল থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। অবশেষে তিনি কাশীতে গিয়ে হাজির হলে মুণ্ডটি তাঁর আঙ্গুল থেকে খসে পড়ে যায়। কিন্তু মস্তক খসার পর বটুক ভৈরবের আঙ্গুলে দারুণ ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং তার যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হয়ে নানাস্থান ঘুরতে ঘুরতে বক্রেশ্বর তীর্থের এই কুণ্ডে এসে স্নান করলে আরোগ্যলাভ করেন। সেই থেকে এই কুণ্ডটি 'ভৈরব কুণ্ড' নামে পরিচিত হয়।

'অগ্নিকুণ্ড' সম্পর্কে শোনা যায় যে, পরম কৃষ্ণ বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন পরম কৃষ্ণভক্ত। হিরণ্যকশিপু পুত্রের এই কৃষ্ণপ্রীতি মোটেই সুনজরে দেখতেন না। এই কারণে তিনি সর্বদাই প্রহ্লাদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার করতেন। ভক্তের প্রতি অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে একদা শ্রীকৃষ্ণ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। এতে প্রহ্লাদের মনে এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ; পিতৃহত্যার জন্য তিনি নিজেকেই দায়ী মনে করেন। এই অবস্থায় তিনি নানাতীর্থ পর্যটন করে অবশেষে বক্রেশ্বরে এসে শিবের আরাধনা করেন ও অগ্নিকুণ্ডে স্নান করে অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পান।

'ব্রহ্মকুণ্ড' সম্পর্কে বলা হয় যে, একদা ব্রহ্মা তাঁর কন্যার প্রতি কামাতুর হয়ে দৃষ্টিপাত করেন। তাঁর এই পাপ ইচ্ছার জন্য তিনি বড়ই মানসিক যন্ত্রনাভোগ করতে থাকেন এবং শান্তিলাভের আশায় তীর্থপর্যটনে বার হয়ে অবশেষে বক্রেশ্বরধামে এসে হাজির হন এবং এই কুণ্ডে স্নান করে মানসিক শান্তিলাভ করেন।

'সৌভাগ্যকুণ্ড' সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা'তে বলা হয় যে, হিমালয় দুহিতা গৌরী শিবকে

পতিরূপে লাভ করার জন্য বক্রেশ্বর এসে তপস্যা করেন এবং এই কুণ্ডে স্নান করে শিবকে পতিরূপে লাভ করার বরলাভ করেন। এইজন্য এই কুণ্ডটি 'সৌভাগ্যকুণ্ড' নামে পরিচিত হয়।

'খরকুণ্ড' সম্পর্কে বলা হয় যে, সত্যযুগে অগস্ত্যমুনি সমুদ্র শোষণ করে সমস্ত জল পান করে ফেলেন। পরে তিনি প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে এইখানে ঐ জল উদ্গীরণ করে দেন।

এছাড়া 'শ্বেতগঙ্গা' সম্পর্কে বলা হয় যে, বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের জনৈক শ্বেত নামে রাজা এখানে এসে শিবের তপস্যা করেন এবং তাঁর ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে একটি বর দিতে চাইলে তিনি প্রার্থনা করেন যে, এই কুণ্ডটি যেন চিরকাল তাঁর নাম বহন করে। এই কারণে কুণ্ডটি 'শ্বেতগঙ্গা' নামে পরিচিত হয় বলে বিশ্বাস।

কাহিনী যাই হোক এই উষ্ণ কুণ্ডগুলির জল নানা-রোগ আরোগ্য করবার যে বিশেষ ক্ষমতা আছে সেবিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ।

বক্রেশ্বরমন্দির ও উষ্ণ প্রস্রবনগুলি সম্পর্কে ১৯৫১ সালে বীরভূম জেলার হ্যাণ্ডবুকে শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয় যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন নিম্নে তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল :—

··It contains a large group—almost a small city—of temples and a number of sulphurous hot springs, with cold springs in close proximity to them. They all discharge into a rivulet, which runs past them and joins a small stream about 200 yards from the temples. The hot springs are regarded as a manifestation of divine power, and are frequented by barren women and women suffering from miscarriage, who are believed to derive special benefit from diving under a submerged arch in one of the reservoirs. Captain Sherwill found that the temperature of the hot-test spring was 162° Fahr. and of the coolest 128° at noon on 28th December 1850, the temperature of the air in shade being 77°, while the temperature of the stream above the influence of the hot-springs was 83°.········· (p. liii)

পরবর্তীকালে বীরভূমের জেলাশাসক Mr. F. H. B. Skrine এ সম্পর্কে যে বিবরণ রেখে গেছেন তা উল্লিখিত গ্রন্থ থেকেই তুলে ধরা হল :—

This shrine still stands to give ocular demonstration of this narrative, though sooth to say, its appearance would indicate a less remote antiquity and a more common-place origin. It differs neither in size nor other essentials from the temples which swarm in our larger cities, and its style of of architecture is decidedly modern. No inscription exists on the central building, but a tablet let into the pediment of an outwork on the notrh-east records the fact that this portion of the edifice was erected by one Darpanarayan in the year Salivahana 1683, *i.e.*, 1761 A.D. Two other stones inserted in an interior wall east of the temple give the names of two brothers named Hatambar and Taralasara, and a third bears the date of 1677 Salivahana or 1755 A.D., but is otherwise illegible. These annexes are to all appearances as old as Viswakarma's alleged handiwork, and it is doubtful if any portion of the buildings, as they stand, dates further back than the commencement of the 18th century. Their purlieus are more intersting. They consist of street upon street of miniature fanes, each containing the phallic emblem of Mahadeva in graven stone, erected from time to time by wealthy worshippers. But for their uniformity the impression left on the mind of one threading the labyrinth would be that he was visiting the older portion of some great cemetery, so precisely similar in style and appearance are these smaller temples to the tombs most affected by our predecessors of the 18th century. To the south-west of this curious group are three tanks of various sizes known as the Shat Katali, the Chandra Sayer and the Damu Sayer. Their origin is lost in the mists of time, but the attendant priests aver

that they are named after the votaries at whose expense they were excavated.

Southwards the hot springs, to which this mass of buildings owes its existence, send skyward their clouds of sulphurous vapour. They are eight in number and of varying temperature; that of the hottest, known as the Agni Kundu, is not far short (sic) of 200° Fahr. Each is enclosed in a cistern 10 feet in depth, and of dimensions ranging from a square of 9 feet to a rectangle of 75 by 30 feet.… (p. liii)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ডক্টর মেঘনাথ সাহা প্রমুখ প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা এই সকল উষ্ণ প্রস্রবণগুলির জল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য এইস্থানে অনেকবার এসেছেন।

বক্রনাথ তীর্থ সম্বন্ধে দুটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রথম কাহিনী অনুসারে বলা হয় যে, সত্যযুগে সুব্রত মুনি লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হলে তাঁকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করায় অপমানবোধে তিনি ঐ স্বয়ম্বর সভা ত্যাগ করেন এবং অপরিসীম ক্রোধে তাঁর দেহের অষ্ট অংগ বেঁকেচুরে যায়। এই কারণে তিনি অষ্টবক্রমুনি নামে খ্যাত হন। অষ্টবক্রমুনি এরূপ কদাকার চেহারা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কাশীতে এসে হাজির হন এবং শিবত্বপ্রাপ্তির জন্য তপস্যা আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁর প্রতি দৈবাদেশ হয় যে, তিনি গৌড়দেশে গুপ্ত কাশীতে (বক্রেশ্বর গুপ্তকাশীরূপে খ্যাত) গিয়ে তপস্যা করলে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে। দৈবাদেশে অষ্টবক্রমুনি দশ হাজার বৎসর ধরে এখানে তপস্যা করে শিবত্ব প্রাপ্ত হন। এই কারণে এই শৈবতীর্থ বক্রেশ্বরধাম নামে পরিচিত হয়।

অপর এক কাহিনী অনুসারে বলা হয় যে, ভগবান নারায়ণ নরসিংহ মূর্তি ধারণ করে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান। তাই এই ব্রহ্মহত্যার অপরাধে ভগবান নারায়ণের হস্ত ও পদনখে দারুণ জ্বালা সমুদ্ভব হয়। দেব সমাজে ও ঋষি-মণ্ডলে এই কথা প্রচার হলে অষ্টবক্রমুনি নারায়ণের তীব্র জ্বালা স্বেচ্ছায় আপন মস্তকে ধারণ করেন। ফলে মুনি অসীম যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন। ভক্তের যন্ত্রণা নিবারণের জন্য নারায়ণ অষ্টবক্রমুনিকে বক্রেশ্বরে গিয়ে শিবের মস্তক স্পর্শ করে বসে থাকতে বলেন এবং নির্দেশ দেন যে, ভারতের যাবতীয় তীর্থবারি সুড়ঙ্গ পথে এসে অষ্টবক্রমুনির মাথায় পড়লে তার যন্ত্রণার উপশম হবে। এই নির্দেশ অনুসারে সর্বতীর্থবারি এসে মুনির মাথায় পড়লে তিনি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান। বলা হয়, এই বারিধারা অষ্টবক্রমুনির জ্বালাস্পর্শে উষ্ণভাব ধারণ করে নিকটস্থ পাপহরা নদীতে গিয়ে পড়েছে।

বক্রেশ্বরধামের প্রধান মন্দির বক্রনাথ শিবমন্দির ও তৎসংলগ্ন মহিষমর্দিনী মন্দির। বক্রনাথ শিবের বিশাল মন্দিরটি উড়িষ্যার রেখ দেউল স্থাপত্যরীতিতে গঠিত। মন্দিরাভ্যন্তরে গৌরীপট্টহীন একটি শিলা আছে। ইনিই বক্রনাথ মহাদেব। এই সুবিশাল মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ছোট, বড় ও মাঝারী আকারে অসংখ্য (শতাধিক) শিবমন্দির। এই সকল মন্দিরের অধিকাংশই আড়ম্বরহীন বাংলা চারচালা মন্দির এছাড়া রেখ দেউল আকৃতিতে গঠিত কিছু মন্দিরও আছে। এই সকল প্রাচীন মন্দিরগুলির অধিকাংশই সংস্কার ও উপযুক্ত তত্ত্বধানের অভাবে জীর্ণ, ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায়। খুব কম মন্দিরেই শিবলিঙ্গ বা অন্য কোন দেবমূর্তি আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার কিরীটিশ্বরী ও বর্ধমান জেলার ১০৮ শিবমন্দির ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে অন্যত্র একত্রে এতো মন্দিরের সমাবেশ আর কোথায়ও দেখা যায় না। এই কারণে বক্রেশ্বরকে দেবালয় নগরী বলা হয়। বক্রেশ্বর শিবমন্দির ও তৎসন্নিহিত উল্লিখিত মন্দিরাদির অন্তর্গত এলাকাটি বক্রেশ্বর ধাম বলা হয় এবং ধামের বাইরের এলাকাটুকু বক্রেশ্বর গ্রাম, সেখানে লোকবসতি আছে। এই ধামের পূর্ব ও উত্তরে বক্রেশ্বর নদ এবং দক্ষিণ দিকে পাপহারা নদী প্রবাহিত।

বক্রেশ্বর মহাপীঠে পূজিতা মহিষমর্দিনী দেবী মূর্তিটি ধাতুময়ী এবং দশভূজা। মনে করা হয় পূর্বের প্রাচীন মূর্তিটি কোন কারণে এখান থেকে অপসারিত হলে বর্তমান ধাতুময়ী দশভূজা মহিষমর্দিনী মূর্তিটি পরবর্তী-কালে কোন সময় মন্দিরে স্থানলাভ করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বক্রেশ্বর গ্রামে ধর্মগড় নামে

একটি পুষ্করিণীর মাটি খননকালে একটি অষ্টদশভুজা পাষাণময়ী মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া যায় এবং পুষ্করিণী গর্ভে একটি মন্দিরের পাকা ভিত পরিলক্ষিত হয়। অনেকে অনুমান করেন এই পাষানময়ী মূর্তিটি আদিতে মহিষমর্দিনী মূর্তিরূপে বক্রেশ্বরধামে পূজা হতো। বর্তমানে ঐ মূর্তিটি গ্রামের দুর্গাবাড়ীতে রক্ষিত আছে এবং সেখানে নিত্যপূজা হয়।

বক্রেশ্বরধামে এলাকার মধ্যে অবস্থিত পূর্ব উল্লিখিত অসংখ্য শিবমন্দিরগুলি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকজনে নির্মাণ করেছিলেন বলেই মনে হয়। তবে বক্রনাথের মূল মন্দিরটি কার দ্বারা এবং কবে নির্মিত সে সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিংবদন্তী অনুসারে অবশ্য বলা হয় বিশ্বকর্মা স্বয়ং এই মন্দির নির্মাণ করেছে। সুতরাং এককথায় বলা চলে বক্রনাথ যেমন অনাদিলিঙ্গ, মন্দিরটির তেমন অনাদিকালের। বক্রেশ্বরধামের সেবায়েত যে কে এ প্রশ্নেরও সদুত্তর পাওয়া তো দূরের কথা, এরকম প্রশ্ন করাই বোধহয় ঝকমারী। আচার্য, চৌধুরী, চক্রবর্তী, পতণ্ডী (পতিতুণ্ডী), অধিকারী, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পদবীধারী ব্রাহ্মণের পালাক্রমে বক্রেশ্বর ও মহিষমর্দিনী দেবীর নিত্য-সেবা পূজা করে থাকেন। সাধারণভাবে এনারা পাণ্ডা নামে পরিচিত এবং এঁরা সকলেই নিজেদের বক্রেশ্বরধামের আদি সেবায়েতরূপে দাবী করেন। সুতরাং সেবায়েতের প্রশ্ন তুললে বাগ্‌বিতণ্ডাই বাড়ে, তথ্য উদ্ঘাটন হয় না। এমনকি পাণ্ডারা বংশ পরম্পরায় যে দেবোত্তর ভূসম্পত্তির স্বত্ব উপসত্ব ভোগ করছেন সে সম্বন্ধে তাঁদের দলিল-পত্র দেখাতেও তাঁরা নারাজ। বর্তমানে বক্রেশ্বর তত্ত্বাবধায়ক সমিতি দ্বারা এখানকার পূজা-পার্বণ পরিচালিত হয়।

বক্রেশ্বরধামের বক্রনাথ শিব, মহিষমর্দিনী দেবী ও ক্ষেত্রপাল বটুক ভৈরব এই তিন প্রধান দেবতা ভিন্ন শ্বেত-গঙ্গার উত্তর পাড়ে একটি কালীমন্দির আছে। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত চতুর্ভুজা কালীর নিত্যপূজা হয়। ইহা হরিশ্বরী কালীবাড়ী নামে পরিচিত। বাংলা ১৩১৬ সনে বর্ধমান জেলার দাঁইহাটার হরিচরণ মুখোপাধ্যায় মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একটি অক্ষয়বটের মূলে হরগৌরীর শিলা মূর্তি রক্ষিত আছে। মূর্তিটি ভগ্ন। মূর্তিটির এইরকম দুর্গতির জন্য কালাপাহাড়কে দায়ী করা হয়। এছাড়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দের একটি স্মৃতি মন্দির আছে। মন্দিরটি ১৪০৭ শকে নির্মিত। শোনা যায়, মহাপ্রভু নিত্যানন্দ একদা এই শৈবধাম দর্শনে এসেছিলেন। তারই স্মৃতিস্বরূপ মহাপ্রভুর চরণ চিহ্ন খোদিত শিলা এখানে রক্ষিত আছে।

বীরভূম জেলার তারাপীঠের ন্যায় বক্রেশ্বরও তন্ত্র-সাধনার একটি অন্যতম স্থান। এখানকার মহাশ্মশানে বহু তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ অঘোরবাবার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। এছাড়া আছেন খাঁকিবাবা, চক্রবর্তীবাবা, দুঃখগিরি প্রভৃতি সাধকেরা। মহাশ্মশানে অঘোরবাবা, তান্ত্রিক প্রমথ চক্রবর্তীও খাঁকিবাবার সমাধি মন্দির আছে। এখানে একটি জনশ্রুতি আছে যে, সিপাই বিদ্রোহের আত্মগোপনকারী নেতা নানাসাহেব খাঁকিবাবা নামে এই মহাশ্মশানে অবস্থান করেন। এছাড়া বক্রেশ্বর-ধামের সীমানার বাইরে গ্রামের মধ্যে মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজাদি হয়।

বক্রেশ্বরধামে বক্রনাথ মহাদেব ও মহিষমর্দিনী দেবীর নিত্যপূজা হয়। পাণ্ডারা পালাক্রমে শিব ও দুর্গার ধ্যানে পূজা করে থাকেন। প্রতিদিন পূজায় পাঁচ সের দুধের পায়সান্ন নিবেদন করা হয়। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশী তিথিতে মহাধুমধামের সঙ্গে বক্রনাথ শিবের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিনই এখানে তীর্থযাত্রী এসে থাকেন। তবে উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এমন কি নেপাল-ভূটান থেকেও তীর্থযাত্রী ও সাধু-সন্ন্যাসীরা আসেন। প্রতি বৎসর উৎসবে মোট প্রায় পনর থেকে বিশ সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। সাধারণতঃ শিবের নিকট অর্থ-বস্ত্র-মণ্ডা-পায়সান্ন মানত জানানো হয়। শিবচতুর্দশীতে এখানে একটি বৃহৎ মেলা বসে। প্রতি বৎসর শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে মহিষমর্দিনীর সাড়ম্বরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নবমীর সন্ধিক্ষণে দেবীর নিকট ছাগ, ইক্ষু, কুমড়া ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। এছাড়া প্রতি বৎসর দশহরা, কার্তিকসংক্রান্তি, মাকড়ীসপ্তমী, দোলপূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে বক্রেশ্বরধামে বিশেষ পূজাদি হয় এবং বহু তীর্থযাত্রী এখানের কুণ্ডে পুণ্যস্নানাদি করে থাকেন।

সাঁইথিয়া

পূর্বরেলপথে সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে সাঁইথিয়া একটি জংশন স্টেশন এবং বীরভূম জেলার একটি বাণিজ্য প্রধান শহর। এখানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকজন বসবাস করেন। ইহার প্রাচীন নাম নন্দীপুর। সাঁইথিয়া রেল-স্টেশনের সন্নিকটেই রেললাইনের পূর্বদিকে নন্দেশ্বরীর পীঠস্থান অবস্থিত। ইহা একান্নপীঠের মধ্যে একটি এবং বলা হয় এইস্থানে সতীর কণ্ঠনলী পড়িয়াছিল। এখানকার দেবীনন্দিনী এবং ভৈরব নন্দীকেশ্বর। রেললাইনের পাশে এই পীঠস্থানে বিরাট প্রাঙ্গনটির চারিদিকে সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং সমগ্র প্রাঙ্গনটি পাথরের টালি দ্বারা বাঁধান। প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি অশ্বত্থ ও একটি বটবৃক্ষ পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং এই প্রাচীন বৃক্ষ দুইটি অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমগ্র প্রাঙ্গনটিকে ছায়াসুশীতল করিয়া রাখিয়াছে। এই বৃক্ষ দুইটির গোড়া ইট দ্বারা বাঁধান এবং এই বাঁধান বেদীর উপর একটি প্রকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ তেল-সিন্দুর রঞ্জিত একটি ত্রিকোনাকৃতি ব্রহ্মশিলাকে নন্দিনীদেবী জ্ঞানে পূজাদি করা হয়। মন্দিরে প্রবেশের জন্য দক্ষিণ ও পশ্চিম এই উভয় পার্শ্বে সিঁড়ি আছে। দেবীর ভৈরব নন্দীকেশ্বরের কোন মূর্তি নাই। উল্লিখিত বৃক্ষদ্বয়ের একটি কোঠরে ভৈরবের উদ্দেশ্যে পূজাদি হয়। বলা হয়, দেবীর ভৈরব এই বৃক্ষ কোঠরে নিহিত আছেন। দেবীর বর্তমান মন্দিরটি অপ্রাচীন। স্থানীয় শ্রীগুরুপদ চন্দ্র ও শ্রীনারায়ণ প্রসাদ চন্দ্র ইহা নির্মাণ করিয়া দেন। মন্দির প্রাঙ্গনে অবস্থিত রাগমন্দিরটি বাংলা ১৩১০ সন ২৩শে ফাল্গুন শ্রীধরণীধর গুঁই ও তাঁহার ভ্রাতা মহীন্দ্র নাথ গুঁই নির্মাণ করিয়া দেন। দেবীর মন্দিরের পশ্চিমে একটি ছোট ভোগমন্দির এবং সম্মুখভাগে একটি বৃহৎ বলির যূপকাষ্ঠ প্রোথিত আছে। ইহা ভিন্ন, মন্দির প্রাঙ্গনের চারিদিকে নিম, পাকুড়, শ্যাওড়া প্রভৃতি কয়েকটি গাছ আছে।

দুর্গার ধ্যানে দেবীর নিত্যপূজা এবং প্রতি বৎসর শারদীয়া বিজয়া দশমী তিথিতে সাড়ম্বরে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে ৺অটল বিহারী চক্রবর্তী ও ৺রাসবিহারী চক্রবর্তী দেবীর সেবাপূজাদি করিতেন। বর্তমানে তাঁহাদের জ্ঞাতি সর্বশ্রী গোকুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ চক্রবর্তী ও দ্বিজপদ ভট্টাচার্য পালাক্রমে দেবীর সেবা-পূজা করিতেছেন। দেবোত্তর প্রায় চল্লিশ বিঘা জমি আছে। উক্ত জমির মধ্যে মন্দিরে চাকি ছয় বিঘা এবং বাকী ছত্রিশ বিঘা উক্ত তিন সেবায়েত সমানভাবে দেবসেবার জন্য ভোগ করিতেছেন। সাধারণতঃ অর্থ-বস্ত্র-অলংকার, ছাগবলি ও মাটির ঘোড়া দেবীর নিকট মানত করা হয়। পূজারীরা রোগব্যাধি নিরাময়ের জন্য দৈব মাদুলি দিয়া থাকেন।

নন্দিনীদেবীর মন্দিরের পূর্বপার্শ্বে পূর্বমুখী একটি মন্দিরে হিন্দুস্থানীদের মহাবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, এখানের একটি মন্দিরের শ্রীকৃষ্ণের কালিয়াদমনমূর্তি আছে। এই মন্দিরে নিম্নাংশ সর্পযুক্ত একটি নারীমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটি দক্ষিণামুখী, ইহার সম্মুখে একটি বৃহৎ নাটমন্দির ও ইঁদারা আছে। মন্দিরে নিত্য-পূজা হয়।

শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের পশ্চাতে ও দেবীমন্দিরের পূর্বপার্শ্বে পশ্চিমমুখী একটি মন্দিরের শ্বেত প্রস্তর নির্মিত একটি ছোট শীতলামূর্তি এবং পাশের অপর একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ সহ গৌরী, গণেশ প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্তি আছে। মন্দির দুইটিতে নিত্যপূজা হয় এবং শিবরাত্রিতে এইস্থানে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ইহা ভিন্ন, সাঁইথিয়া শহরের মধ্যে একটি রক্ষাকালী মন্দির আছে। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরের অভ্যন্তরে রক্ষাকালীর বিকটদর্শন শিলামূর্তি আছে। স্থানীয় শ্রীহরি প্রসন্ন দত্ত মহাশয় বাংলা ১৩৬৪ সনে মন্দির প্রাঙ্গনটি পাথর দ্বারা বাঁধাইয়া দেন। দেবীর নিত্যপূজা এবং প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ সাড়ম্বরে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নিত্যপূজায় দেবীর নিকট খিচুড়ী ও মাংসভোগ নিবেদন করা হয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্দিরের পূর্বদিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে শিবাভোগ দেওয়া হয়। স্থানীয় শ্রীমহিমা রঞ্জন মিশ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) দেবীর নিত্যপূজা করেন। প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ রক্ষাকালীর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গনে রাস্তার ধারে একটি মেলা বসে। মেলায় নানাবিধ জিনিষপত্রের প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক

মেলা সারণি

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡ ১	বাঁকুড়া	বাঁকুড়া	২১	মগরা	...	অদ্বৈতানন্দের আবির্ভাব উৎসব	৪০ বৎসর	২ দিন	৮,০০০
† ২	"	"	২৪	মানকানালী	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৫,০০০
‡ ৩	"	"	"	"	কার্তিক	রাসযাত্রা	বহু প্রাচীন	৩ দিন	...
‡ ৪	"	"	৫৩	পলাশবনী (মৌজা : লদাডিহি)	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	...	৩-৪ দিন	...
‡ ৫	"	"	"	"	ভাদ্র	মনসাপূজা	৫০-৬০ বৎসর	১ দিন	...
‡ ৬	"	"	৫৪	রামডিহি	পৌষ	পৌষ পার্বণ	বহু প্রাচীন	৪ দিন	১৫০-২০০
† ৭	"	"	৫৬	আচুড়ি	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৩,০০০
‡ ৮	"	"	৫৭	ধোবারগ্রাম	আশ্বিন	মারাংবুরুপূজা	সম্প্রতি	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
† ৯	"	"	৮০	উরিয়ামা	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	২,০০০
†১০	"	"	৮৯	কেঞ্জাকুড়া	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	১০,০০০
‡১১	"	"	"	"	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২০০ বৎসর	৪ দিন	৮,০০০-১০,০০০
†১২	"	"	৯৯	কালপাথর	মাঘ	শ্রীপঞ্চমী	...	৩ দিন	৫,০০০
†১৩	"	"	১০৩	লক্ষ্মীশোল (মৌজা : জামবেদিয়া)	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৫,০০০
‡১৪	"	"	"	"	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	সম্প্রতি	৪ দিন	৮০০-৯০০
†১৫	"	"	১৩৮	শুশুকপাহাড়ী	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৫,০০০

†১৬	বাঁকুড়া	বাঁকুড়া	১৯১	ভগবানপুর	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	১,০০০
†১৭	"	"	১৯১	বাঁশী	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৫০০
†১৮	"	"	১৯৬	জগদ্দলা	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৩,০০০
‡১৯	"	"	"	"	মাঘ	রাসযাত্রা	বহু প্রাচীন	৪ দিন	৫,০০০-৬,০০০
*২০	"	"	২০২	একেশ্বর	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	"	১ দিন	৪০,০০০
‡২১	"	"	"	"	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	"	১ দিন	৪০,০০০
*২২	"	"	"	"	বৈশাখ	গাজন	"	২ দিন	৮০,০০০
†২৩	"	"	২১৫	কানকাটা	বৈশাখ	গাজন	"	১ দিন	১,০০০
†২৪	"	"	২৪৪	পুরন্দরপুর	বৈশাখ	গাজন	"	১ দিন	৩,০০০
‡২৫	"	"	"	"	কার্তিক	রাসযাত্রা	৩০০ বৎসর	৪ দিন	...
‡২৬	"	"	২৭১	গোপীনাথপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	২০০ বৎসর	৭ দিন	১,০০০
*২৭	"	"	২৭৫	নড়্‌রা	আষাঢ়	রথযাত্রা	১০০ বৎসর	২ দিন	১৫,০০০
†২৮	"	"	৩০৮	কুষ্টিয়া	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	২,০০০
†২৯	"	"		দশের বাঁধ	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	২,০০০
‡৩০	"	"		গোবিন্দধাম (পূর্বনাম : কানিয়ামারা)	জ্যৈষ্ঠ	গোবিন্দ প্রসাদের মেলা	সম্প্রতি	৭ দিন	৭০০
†৩১	"	ওন্দা	২	কৃষ্ণনগর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	২০০-৩০০
*৩২	"	"	৩	ছাগুলিয়া	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	৩ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৩৩	"	"	৬	হীরাপুর	চৈত্র	গাজন	সম্প্রতি	১ দিন	১০,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
*৩৪	বাঁকুড়া	ওন্দা	৭	ভোলা	বৈশাখ	গাজন	৫০ বৎসর	২ দিন	১০,০০০
‡৩৫	”	”	১৩	কল্যাণী	কার্তিক	কালীপূজা	২৫০ বৎসর	৩ দিন	২,০০০
‡৩৬	”	”	১৫	দলদলী	কার্তিক	রাসযাত্রা	৩০০ বৎসর	৩ দিন	২,৫০০-৩,০০০
‡৩৭	”	”	১৭	লাউদা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১৬০ বৎসর	৩ দিন	...
‡৩৮	”	”	৩১	মাধব্‌পুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	৩০-৩৫ বৎসর	২ দিন	...
‡৩৯	”	”	৩৩	রতন্‌পুর	মাঘ	সরস্বতীপূজা	১০০ বৎসর	৪ দিন	৪০০
†৪০	”	”	৩৭	ছোট কুর্পা	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৬০০-৭০০
†৪১	”	”	৩৮	মান্দবুবনী	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	৩ দিন	৬০০-৭০০
†৪২	”	”	৪৪	কিয়াবতি	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	৪ দিন	৫০০-৬০০
†৪৩	”	”	৪৫	ভুলন্‌পুর	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	৩ দিন	৪,০০০-৫,০০০
†৪৪	”	”	৪৯	গোপালপুর	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	৩ দিন	১,০০০-১,৫০০
‡৪৫	”	”	৫২	জাম্‌জুড়ি	মাঘ	সরস্বতীপূজা	৫০-৬০ বৎসর	১দিন	৩,০০০-৪,০০০
†৪৬	”	”	৫৮	নূতনগ্রাম	বৈশাখ	গাজন	...	২ দিন	১,০০০-২,০০০
†৪৭	”	”	৬৪	হাতবাড়ী	আশ্বিন	লক্ষ্মীপূজা	...	২ দিন	৬০০-৭০০
*৪৮	”	”	৬৬	আশনাশোল	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০০ বৎসর	৪ দিন	১,০০০
*৪৯	”	”	৮৯	লোদনা	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
†৫০	”	”	৯৫	সন্তোড়	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৫০০-৬০০
†৫১	”	”	৯৬	তপোবন	আশ্বিন	দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা	...	৬ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৫২	”	”	৯৭	বীরসিংহপুর	মাঘ	নিরগিন শাহ পীরের উরস্‌	৪০০ বৎসর	২ দিন	২,৫০০

‡৫৩	বাঁকুড়া	ওন্দা	১০৮	হরিহরপুর (মৌজা : পাহাড়পুর)	চৈত্র	গাজন	বহু প্রাচীন	৬ দিন	৪০০০-৫,০০০
‡৫৪	”	”	১১৫	নিকুঞ্জপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২০০ বৎসর	৪ দিন	২,০০০
‡৫৫	”	”	”	”	কার্তিক	রাসযাত্রা	২০০ বৎসর	৪ দিন	২,০০০
‡৫৬	”	”	”	”	চৈত্র	গাজন	২০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
‡৫৭	”	”	১২২	মুড়াকাটা	চৈত্র	গাজন	...	১ দিন	৬০০-৭০০
†৫৮	”	”	১৩৯	মৈঠা	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৪,০০০
*৫৯	”	”	১৪৯	চন্দ্রকোনা	বৈশাখ	গাজন	বহু প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
*৬০	”	”	”	”	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	বহু প্রাচীন	৩ দিন	১,০০০
†৬১	”	”	১৫১	বহড়ামুড়ি	বৈশাখ	গাজন	...	৩ দিন	১,০০০-১,৫০০
†৬২	”	”	”	”	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	৩ দিন	১,০০০-১,৫০০
‡৬৩	”	”	১৬৫	অমরপুর	জ্যৈষ্ঠ	মনসাপূজা	৩০০ বৎসর	৪-৫ দিন	১,০০০
†৬৪	”	”	১৮০	ওন্দা	বৈশাখ	গাজন	...	৭ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৬৫	”	”	১৯২	গামিড্যা	চৈত্র	গাজন	বহু প্রাচীন	১ দিন	...
‡৬৬	”	”	১৯৪	মাজ্ ডিহা	জ্যৈষ্ঠ	বালুকেশ্বর শিবপূজা	বহু প্রাচীন	৬ দিন	২,৫০০
‡৬৭	”	”	২১১	বহুলাড়া	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১০০ বৎসর	৫ দিন	১২,০০০
৬৬৮	”	”	”	”	চৈত্র	গাজন	২৫০ বৎসর	৭ দিন	৩০,০০০
‡৬৯	”	”	২১৯	চড়ুইকুঁড়	বৈশাখ	মহোৎসব	বহু প্রাচীন	৫ দিন	৭০০-৮০০
†৭০	”	”	২২৭	খামারবেড়ে	বৈশাখ	গাজন	...	২ দিন	১,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡৭১	বাঁকুড়া	ওন্দা	২২৮	দামোদরবাটী	চৈত্র	গাজন	বহু প্রাচীন	১ দিন	৮০০-৯০০
*৭২	”	”	২৩০	পুরুষোত্তমপুর (মৌজা : দাতিনা পুরুষোত্তমপুর)	মাঘ	সরস্বতীপূজা	প্রাচীন	৭ দিন	১,০০০
*৭৩	”	”	২৩৮	তেলিবেড়ীয়া	চৈত্র	গাজন	৩০ বৎসর	১ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡৭৪	”	”	২৪৬	লাপুর	জ্যৈষ্ঠ	মনসাপূজা	১৫০ বৎসর	২ দিন	৭,০০০-৮,০০০
+৭৫	”	”	২৪৮	রামসাগর	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৩০০-৪০০
*৭৬	”	”	”	”	শ্রাবণ	মনসাপূজা	বহু প্রাচীন	২ দিন	১০,০০০-১২,০০০
+৭৭	”	”	২৬১	যাদবনগর	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৩০০-৪০০
+৭৮	”	”	২৭০	ঝাটিবনি	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৩০০-৪০০
+৭৯	”	”	২৭১	আগরদা পুরুষোত্তমপুর	বৈশাখ	গাজন	...	১৩ দিন	২০০-৩০০
‡৮০	”	”	২৭৮	গোড়াসোল	কার্তিক	রাসযাত্রা	৩০০ বৎসর	৬ দিন	১২,০০০-১৩,০০০
+৮১	”	”	”	”	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	...	৩ দিন	৫০০-৬০০
+৮২	”	”	২৭৯	নাকাইজুড়ি	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	...	৩ দিন	৫০০-৬০০
‡৮৩	”	”	২৮৫	চান্দাবিলা	শ্রাবণ	মনসাপূজা	১৫০ বৎসর	২ দিন	৫০০-৬০০
‡৮৪	”	”	”	”	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১৫০ বৎসর	১ দিন	৫০০-৬০০
+৮৫	”	”	২৮৮	জামডহরা	বৈশাখ	গাজন	...	২ দিন	৩০০-৪০০
+৮৬	”	”	”	”	শ্রাবণ	মনসার গাজন	...	১ দিন	৩০০-৪০০
+৮৭	”	”		আলোটি	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৫০০
+৮৮	”	”		হরিহরপুর	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৫০০-৬০০
+৮৯	”	”		পেরোরা	বৈশাখ	গাজন	...	২ দিন	১,০০০-২,০০০
+৯০	”	”		ধন্না	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৬০০-৭০০

† ৯১	বাঁকুড়া	ওন্দা		রায়দি	বৈশাখ	গাজন	…	১ দিন	৬০০-৭০০
† ৯২	„	„		ঘোলকুণ্ডা	মাঘ	সরস্বতীপূজা	…	১ দিন	৬০০-৭০০
† ৯৩	„	„		জটাবাড়ী	বৈশাখ	গাজন	…	৩ দিন	৩০০-৪০০
‡ ৯৪	„	ছাতনা	৮	জামথোল	মাঘ	বাসুলীপূজা	বহু প্রাচীন	৩ দিন	৫০০
‡ ৯৫	„	„	২১	গোপিনাথডিহি	জ্যৈষ্ঠ	কালীপূজা	৫০ বৎসর	৩ দিন	১,৫০০-২,০০০
† ৯৬	„	„	৩১	জিড়রা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	…	৩ দিন	৫০০
‡ ৯৭	„	„	„	„	কার্তিক	কালীপূজা	বহু প্রাচীন	২ দিন	…
‡ ৯৮	„	„	৩৭	আড়াজুড়ী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	…	৩ দিন	…
‡ ৯৯	„	„	৬৮	পেঁচাসিমূল	বৈশাখ	চণ্ডীপূজা	বহু প্রাচীন	২ দিন	…
†১০০	„	„	৮৯	শুশুনিয়া	বৈশাখ	গাজন	…	৩ দিন	১,৫০০
‡১০১	„	„	„	„	চৈত্র	বারুণীস্নান	বহু প্রাচীন	৩ দিন	১০,০০০
*১০২	„	„	১১৪	কামারকুলী	বৈশাখ	গাজন	…	১ দিন	৭০০
‡১০৩	„	„	১৩৩	লোহাগড়	চৈত্র	মহোৎসব	৬০ বৎসর	৬ দিন	…
*১০৪	„	„	১৪৬	ঝান্টিপাহাড়ী	জ্যৈষ্ঠ	গাজন	৭০ বৎসর	১ দিন	১০,০০০-১২,০০০
†১০৫	„	„	১৫৫	আড়রা	মাঘ	শ্রীপঞ্চমী	…	৩ দিন	৫০০
‡১০৬	„	„	১৮০	জামতড়া	কার্তিক	রাসযাত্রা	১৫০ বৎসর	৫ দিন	৪০০-৫০০
‡১০৭	„	„	২১৪	উপরডিহি	চৈত্র	গাজন	বহু প্রাচীন	১ দিন	…
‡১০৮	„	„	২১৭	মস্তমুড়া	চৈত্র	গাজন	৩০০ বৎসর	২ দিন	৪,০০০
‡১০৯	„	„	২১৯	সিমলা	জ্যৈষ্ঠ	শিবপূজা	২৫ বৎসর	২ দিন	২০০-৩০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
✣১১০	বাঁকুড়া	ছাতনা	২১৯	সিমলা	কার্তিক	কালীপূজা	বহু প্রাচীন	২ দিন	…
✣১১১	„	„	২৪৫	মেট্যালা	চৈত্র	শিবপূজা	বহু প্রাচীন	১ দিন	৭০০-৮০০
*১১২	„	„		ছাতনা	চৈত্র	রাণীর গাজন	…	২ দিন	৫,০০০-৬,০০০
†১১৩	„	„		কুলগেড়া	বৈশাখ	গাজন	…	১½ দিন	৫০০
†১১৪	„	„		মস্তেমেমনো	বৈশাখ	গাজন	…	১½ দিন	৫০০
†১১৫	„	„		কামারটেনলী	বৈশাখ	গাজন	…	১½ দিন	৩০০
†১১৬	„	গঙ্গাজলঘাটি	২	বড়শাল	বৈশাখ	গাজন	…	৩ দিন	২০০
✣১১৭	„	„	৯	লালপুর বড়	শ্রাবণ	মনসাপূজা	সম্প্রতি	৪ দিন	…
†১১৮	„	„	১৮	ফুলজাম	বৈশাখ	গাজন	…	৩ দিন	১৫০
✣১১৯	„	„	২৪	নিত্যানন্দপুর	বৈশাখ	মহোৎসব	বহু প্রাচীন	৩ দিন	৪০০
✣১২০	„	„	২৫	স্থবির আড়া	শ্রাবণ	ঝুলনযাত্রা	১৫ বৎসর	৩ দিন	২,০০০
✣১২১	„	„	২৭	বাঁকদহ	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	বহু প্রাচীন	৩-৪ দিন	২,০০০
✣১২২	„	„	৩০	লটিয়াবনি	পৌষ	ভৈরবপূজা	…	৭ দিন	২,০০০-৩,০০০
✣১২৩	„	„	„	„	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	১০০ বৎসর	৪ দিন	২,০০০-৩,০০০
✣১২৪	„	„	৫৮	ধিশিগুা	ফাল্গুন	নাচনচণ্ডীপূজা	সম্প্রতি	৫ দিন	৩,০০০-৪,০০০
✣১২৫	„	„	৬৫	বেলবনি (মৌজা : বালিখুন)	মাঘ	নাগরদোলা উৎসব	১০০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
*১২৬	„	„	৮১	কেশিয়াড়া	চৈত্র	গাজন	৩০০ বৎসর	৮ দিন	৫,০০০
*১২৭	„	„	৮৬	ভক্তাবান্দ	চৈত্র	কালীপূজা	৬৪ বৎসর	৩ দিন	২,০০০-৩,০০০
†১২৮	„	„	৮৯	তালঝিট্‌কা	কার্তিক	রাসযাত্রা	…	৩ দিন	১০০
*১২৯	„	„	১৪৯	পীড়রাবনি	চৈত্র-বৈশাখ	গাজন	২০০ বৎসর	৪ দিন	১০,০০০-১২,০০০

‡১৩০	বাঁকুড়া	গঙ্গাজলঘাটি	১৬৪	ভট্টপাড়া (মৌজা : রাণীয়াড়া)	পৌষ	মদনমোহনঠাকুরের পৌষালী উৎসব	৩০০ বৎসর	৩ দিন	৮,০০০
†১৩১	„	„		ভুইফোড়	চৈত্র	রামনবমী	...	৩ দিন	১,০০০
‡১৩২	„	বড়জোড়া	৩	নপাড়া	আষাঢ়	ভৈরবঠাকুরের গাজন	২০০ বৎসর	৪ দিন	৩৫০
‡১৩৩	„	„	৫	মালিয়াড়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	বহু প্রাচীন	২ দিন	৪০০ ৫০০
‡১৩৪	„	„	১৩	মেট্যালী	বৈশাখ	ধর্মরাজের গাজন	৫০০ বৎসর	২ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡১৩৫	„	„	১৪	নূতনগ্রাম	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	...	১ দিন	৫০০-৬০০
†১৩৬	„	„	১৫	প্রতাপপুর	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	১ দিন	২,০০০
‡১৩৭	„	„	৪০	খাঁড়ারী	বৈশাখ	মহোৎসব	...	১০ দিন	...
‡১৩৮	„	„	„	„	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজের গাজন	৩০০ বৎসর	৩ দিন	...
‡১৩৯	„	„	„	„	চৈত্র	গাজন	৩০০ বৎসর	৫ দিন	৫,০০০-৬,০০০
*১৪০	„	„	৪৬	বড়জোড়া	চৈত্র	গাজন	২৫০ বৎসর	২ দিন	৫,০০০-৬,০০০
*১৪১	„	„	৫২	কৃষ্ণনগর	চৈত্র	রুক্মিণীপূজা ও বারুণীস্নান	২০০ বৎসর	৩ দিন	১,০০০
‡১৪২	„	„	৫৬	তাজপুর	বৈশাখ	শীতলাপূজা	বহু প্রাচীন	১০-১১ দিন	১,৫০০
†১৪৩	„	„	৫৮	পখন্না	মাঘ	মকর সপ্তমী স্নান	...	৫ দিন	১,০০০
‡১৪৪	„	„	১১৭	নিরিশা	জ্যৈষ্ঠ	দশহরা	২৫০ বৎসর	১ দিন	...
‡১৪৫	„	„	„	„	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২৫০ বৎসর	১ দিন	...
‡১৪৬	„	„	„	„	কার্তিক	কালীপূজা	২৫০ বৎসর	১ দিন	...
*১৪৭	„	„	১৩০	বেলিয়াতোড়	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজের গাজন	...	২ দিন	৮,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡১৪৮	বাঁকুড়া	বড়জোড়া	১৭৭	গোঁসাইপুর	বৈশাখ	মহোৎসব	২০০ বৎসর	৪ দিন	২০০-৩০০
‡১৪৯	"	"	"	"	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	...	২০০-৩০০
‡১৫০	"	"	"	"	চৈত্র	গাজন	...	৩ দিন	২০০-৩০০
*১৫১	"	"	১৮১	জগন্নাথপুর	চৈত্র	গাজন	বহু প্রাচীন	৪-৫ দিন	১৫,০০০-১৬,০০০
‡১৫২	"	"	১৯১	ভৈরবপুর	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	১৫০ বৎসর	৩ দিন	৭০০
†১৫৩	"	"		গৌরবেড়া	মাঘ	মকরমেলা	...	৩ দিন	৫০০
†১৫৪	"	মেজিয়া	১	ভাড়া	বৈশাখ	গাজন	...	৩ দিন	৪০০-৫০০
†১৫৫	"	"	৭	অৰ্দ্ধগ্ৰাম	বৈশাখ	গাজন	...	৩ দিন	৩০০
†১৫৬	"	"	১৭	তেঘরিয়া	বৈশাখ	গাজন	...	৩ দিন	২০০
*১৫৭	"	"	৩৭	মেজিয়া	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	৫ দিন	৭,০০০-৮,০০০
*১৫৮	"	"	"	"	পৌষ	মকর স্নান	...	১ দিন	৭,০০০-৮,০০০
‡১৫৯	"	"	৬৫	রামচন্দ্রপুর	কার্তিক	রাসযাত্রা	২০০ বৎসর	৩ দিন	৬,০০০
†১৬০	"	"	"	"	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	৩ দিন	৫০০
‡১৬১	"	"	৭৩	বানজোড়া	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	প্রাচীন	১ দিন	...
†১৬২	"	"		পালেরবাঁধ	বৈশাখ	ভগরী মেলা	...	৩ দিন	১,০০০
‡১৬৩	"	শালতোড়া	৬	তিলুড়ি	আষাঢ়	রথযাত্রা	৫০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡১৬৪	"	"	"	"	চৈত্র	উড়েশ্বরীর মেলা	...	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
*১৬৫	"	"	"	"	চৈত্র	চড়কপূজা	...	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡১৬৬	"	"	১১	উদয়পুর	কার্তিক	বাঁধনাপরব (আদিবাসী উৎসব)	প্রাচীন	৩০ দিন	৫০০ ৬০০
†১৬৭	"	"	৬৪	বেহারী	বৈশাখ	গাজন	...	২ দিন	১,০০০

‡১৬৮	বাঁকুড়া	শালতোড়া	৬৪	বেহারী	ফাল্গুন	শিবরাত্রি উৎসব	প্রাচীন	৪ দিন	১,৫০০
*১৬৯	”	”	৮১	ঢেকিয়া	বৈশাখ	গাজন	বহু প্রাচীন	২ দিন	৩,০০০
*১৭০	”	”	৮৬	পাবড়া	বৈশাখ	গাজন	বহু প্রাচীন	৩ দিন	৫,০০০
‡১৭১	”	”	১১৯	ছাতাপাথর	…	শিবতলার মেলা	১৩২৮ সন (আরম্ভকাল)	৫ দিন	…
‡১৭২	”	”	১৫১	বারকোনা	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	১ দিন	…
*১৭৩	”	খাতড়া	৮	ধানারাঙ্গী	চৈত্র	গাজন	৮০০ বৎসর	১ দিন	২০০
‡১৭৪	”	”	১০	ফতেপুর	ভাদ্র	ছাতাপরব	৮০ বৎসর	২ দিন	৩,০০০
†১৭৫	”	”	১৫	নন্দা	বৈশাখ	শিবপূজা	…	২ দিন	১,০০০
‡১৭৬	”	”	১৮	পাথুরিয়া	বৈশাখ	গাজন	১২ বৎসর	১ দিন	২০০-৩০০
†১৭৭	”	”	২৫	দেউলী	পৌষ	প্রহর সংকীর্তন	…	৫ দিন	৫,০০০
†১৭৮	”	”	৪২	বাম্‌নী	ফাল্গুন	চব্বিশপ্রহর সংকীর্তন	…	৫ দিন	২,০০০
‡১৭৯	”	”	৪৮	ঝাপানডিহি	শ্রাবণ	মনসাপূজা	প্রাচীন	৩ দিন	৫০০-৬০০
‡১৮০	”	”	”	”	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	৩ দিন	৫০০-৬০০
‡১৮১	”	”	৫৯	কেন্দুয়া	চৈত্র	গাজন	বহু প্রাচীন	…	৫০০-৬০০
‡১৮২	”	”	৭৬	হিড়বান্ধ	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০০ বৎসর	৩ দিন	…
‡১৮৩	”	”	”	”	চৈত্র	গাজন	৪৫ বৎসর	১ দিন	…
‡১৮৪	”	”	৭৮	চাঁপাশোল	বৈশাখ	মহোৎসব	২০০ বৎসর	৩ দিন	৫০০-৬০০
†১৮৫	”	”	৮৪	ভোগড়া	জ্যৈষ্ঠ	গাজন	…	১ দিন	১,৫০০
†১৮৬	”	”	১২৩	শিমলা	জ্যৈষ্ঠ	শিবপূজা	…	২ দিন	২,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
†১৮৭	বাঁকুড়া	খাতড়া	১৪৭	ভোজ্ দা	বৈশাখ	শিবপূজা	...	১ দিন	১,৫০০
‡১৮৮	„	„	১৮৭	দুবরাজপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	প্রাচীন	৫ দিন	১০,০০০
*১৮৯	„	„	১৯২	খাতড়া (শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)	ভাদ্র	ইন্দ্রোৎসব	৫০০ বৎসর	৩ দিন	১২,০০০
†১৯০	„	„	„	„	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	৪ দিন	৫০০
*১৯১	„	„	২১৭	পরকুল	পৌষ	পৌষপার্বণ	প্রাচীন	৪ দিন	৫,০০০
‡১৯২	„	„	২৫০	দহলা	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	গাজন	৩৫ বৎসর	১ দিন	৫০০
‡১৯৩	„	„	২৭৩	গোপালপুর	মাঘ	সরস্বতীপূজা	১৫ বৎসর	৩ দিন	১,৫০০
†১৯৪	„	„		মেটালা	চৈত্র	শিবপূজা	...	১ দিন	১,০০০
†১৯৫	„	ইঁদপুর	১৭	হাটগ্রাম	শ্রাবণ	গাজন	...	৩ দিন	৫০০
‡১৯৬	„	„	„	„	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০০ বৎসর	৫ দিন	২,০০০
‡১৯৭	„	„	১৯	সাতামী	শ্রাবণ	মনসাপূজা	১৫০ বৎসর	২ দিন	৩,০০০-৬,০০০
‡১৯৮	„	„	৬৩	খট্গ্রাম	চৈত্র-বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	১ দিন	৩০০
‡১৯৯	„	„	১০৫	জিয়ড়দা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	১ দিন	...
†২০০	„	„	১১৬	পুয়াড়া	চৈত্র	গাজন	...	১ দিন	২,০০০
†২০১	„	„	১৪১	ইঁদপুর	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৩০০
†২০২	„	„	১৫৩	ডাক্তারামপুর	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৪০০
†২০৩	„	„	১৭৫	ব্রজরাজপুর	কার্তিক	রাসযাত্রা	৪০০ বৎসর	১ দিন	১,৫০০
*২০৪	„	„	„	„	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৪০০ বৎসর	২ দিন	১,৫০০
*২০৫	„	„	১৯২	আটভাইচণ্ডী	চৈত্র	গাজন	...	...	৪,০০০-৫,০০০
†২০৬	„	„		বড়বাঁধ	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৫০০

†২০৭	বাঁকুড়া	ইঁদপুর		নেলাবনী	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৪০০
*২০৮	„	রানিবাঁধ	১১	নারকোলি	বৈশাখ	গাজন	২০ বৎসর	১ দিন	৪০০
*২০৯	„	„	১৬	পরেশনাথ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	২০ বৎসর	৯ দিন	১,০০০
‡২১০	„	„	১৯	অম্বিকানগর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	বহু প্রাচীন	২ দিন	২,০০০-৩,০০০
*২১১	„	„	২৬	বড়িড	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	২ দিন	৪,০০০-৫,০০০
*২১২	„	„	২৭	ঘোলকুড়ি	জ্যৈষ্ঠ	গাজন	২০০ বৎসর	১ দিন	৮০০-৯০০
*২১৩	„	„	৩৮	রুদড়া	মাঘ	সরস্বতীপূজা	সম্প্রতি	১ দিন	৫,০০০-৬,০০০
*২১৪	„	„	„	„	চৈত্র	গাজন	২০০ বৎসর	২ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡২১৫	„	„	৪৭	শিমুলী (মৌজা : জয়নগর)	বৈশাখ	গাজন	বহু প্রাচীন	২ দিন	৫০০-৮০০
‡২১৬	„	„	৫২	মহেশপুর	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	২ দিন	৫০০
‡২১৭	„	„	৫৩	দেউলি	বৈশাখ	শিবপূজা	১৫০ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
‡২১৮	„	„	৫৮	শুথলা	মাঘ	বামনিসিনীপূজা	১৫০ বৎসর	১ দিন	৬০০-৭০০
†২১৯	„	„	৬০	বুধখিলা	মাঘ	টুসু উৎসব	...	১ দিন	৪০০
‡২২০	„	„	৭২	বেঠ্যালা	বৈশাখ	গাজন	সম্প্রতি	১ দিন	...
†২২১	„	„	৭৫	রানিবাঁধ	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৩০০
‡২২২	„	„	৭৬	ভুরকুড়া	মাঘ	বামনিসিনীপূজা	১৫০ বৎসর	৩ দিন	১০,০০০
‡২২৩	„	„	১১১	রাজাকাটা	কার্তিক	বাঁধনাপরব (আদিবাসী)	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
*২২৪	„	„	১২৯	রাউতারা	মাঘ	সরস্বতীপূজা	১২২৭ সন (আরম্ভকাল)	৪ দিন	৪,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
*২২৫	বাঁকুড়া	রানিবাঁধ	১৩০	বাঁশডিহা	জ্যৈষ্ঠ	শিবপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৭০০-৮০০
‡২২৬	„	„	১৫১	বুড়িশাল	ফাল্গুন-চৈত্র	বাহাপূজা	বহু প্রাচীন	১ দিন	৬০০-৭০০
†২২৭	„	„		শিমলা	জ্যৈষ্ঠ	গাজন	...	১ দিন	৪০০
†২২৮	„	„		মাহতপুর	জ্যৈষ্ঠ	গাজন	...	৭ দিন	১,০০০
†২২৯	„	রাইপুর	৬	ভগ্ড়া	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৭০০
‡২৩০	„	„	২০	ভাঙ্গাদেউলী	মাঘ	গোরামপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	...
‡২৩১	„	„	৮৩	সোনাগাড়া	মাঘ	সরস্বতীপূজা	৭০ বৎসর	৪ দিন	১,০০০
‡২৩২	„	„	৯১	কদমাগড়	বৈশাখ	শিবপূজা	১৩৬৫ সন (আরম্ভকাল)	১ দিন	৪০০-৫০০
‡২৩৩	„	„	১৫১	জগন্নাথপুর	কার্তিক	বাঁধনাপরব	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
*২৩৪	„	„	১৬২	মট্গোদা	মাঘ	ধর্মরাজপূজা	...	৭ দিন	৪০,০০০-৫০,০০০
‡২৩৫	„	„	২২৩	সারেঙ্গা	জ্যৈষ্ঠ	গাজন	১০০ বৎসর	৩ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡২৩৬	„	„	২৪৭	রামচন্দ্রপুর (মৌজা : মগ্রা)	ফাল্গুন	মহাপ্রভুর আবির্ভাব	২৫ বৎসর	২ দিন	২০০
‡২৩৭	„	„	২৪৯	রসপাল	চৈত্র-বৈশাখ	চড়ক	প্রাচীন	মাসের প্রতি সোমবার	৫০০-৭০০
‡২৩৮	„	„	„	„	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৩০০ বৎসর	৫ দিন	১,২০০
‡২৩৯	„	„	২৭৯	ধানাড়া	শ্রাবণ	মনসাপূজা	১০০ বৎসর	৭ দিন	...
‡২৪০	„	„	২৮৩	হর্‌য়াকী (মৌজা : বিক্রমপুর)	বৈশাখ	গাজন	৫০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡২৪১	„	„	২৯৮	পেঁচাকোলা	শ্রাবণ	মনসাপূজা	৩০ বৎসর	২ দিন	৫০০-৭০০
‡২৪২	„	„	„	„	মাঘ	সরস্বতীপূজা	৩০ বৎসর	...	৫০০-৭০০

‡২৪৩	বাঁকুড়া	রাইপুর	২৯৮	পেঁচাকোলা	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	৪ দিন	৫০০-৭০০
‡২৪৪	"	"	৩১৩	ফুলকুসমা	মাঘ	এখান উৎসব	২৫০ বৎসর	১ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡২৪৫	"	"	৩৪২	শালবনি	মাঘ	ভৈরবপূজা	প্রাচীন	২ দিন	১,০০০
‡২৪৬	"	"	১৯৯	গড়গড়্যা	আষাঢ়	রথযাত্রা	সম্প্রতি	৮ দিন	১,৫০০
‡২৪৭	"	"	"	"	কার্তিক	কালীপূজা	"	৩ দিন	১,৫০০
‡২৪৮	"	"	"	"	মাঘ	সরস্বতীপূজা	"	৩ দিন	১,৫০০
‡২৪৯	"	"	৩৬৭	বাইশপাতড়া	চৈত্র	রামনবমী	৮০-৮৫ বৎসর	২ দিন	১,০০০
‡২৫০	"	সিমলাপাল	১০	পুখুরিয়া	পৌষ	মহোৎসব	৬০ বৎসর	৫ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡২৫১	"	"	২৮	পার্শলা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	৬ দিন	৭০০-৮০০
‡২৫২	"	"	"	"	মাঘ	শিমূলসিনীপূজা	প্রাচীন	...	৭০০-৮০০
‡২৫৩	"	"	৩১	বনকাটা	মাঘ	কালীপূজা	বহু প্রাচীন	১ দিন	৩০০-৪০০
‡২৫৪	"	"	১১১	মাচাতোড়া	বৈশাখ	গাজন	বহু প্রাচীন	১ দিন	৫০০
‡২৫৫	"	"	১১৪	সুশুনিয়া	শ্রাবণ	মনসাপূজা	বহু প্রাচীন	৪ দিন	...
‡২৫৬	"	"	১৩৫	জামিরডিহা	মাঘ	নাগরদোলা	৩০০ বৎসর	১ দিন	...
†২৫৭	"	"	১৪১	সিমলাপাল	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	৪,০০০
†২৫৮	"	"	"	"	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	৩ দিন	৩,০০০
*২৫৯	"	"	১৬৭	ভুবরাজপুর	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	৬ দিন	৩,০০০
‡২৬০	"	"	১৭২	চাঁদপুর	শ্রাবণ	মনসাপূজা	প্রাচীন	১ দিন	২,০০০
†২৬১	"	"	১৭৬	নেকড়াতাপাল	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	...	১ দিন	২,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
†২৬২	বাঁকুড়া	সিমলাপাল	১৯৯	ভূতসহর	কার্তিক	কালীপূজা	…	২ দিন	৩,০০০
†২৬৩	”	”		ভেলাইডিহা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	…	৪ দিন	৩,০০০
†২৬৪	”	”		”	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	…	৩ দিন	২,০০০
‡২৬৫	”	তালডাঙ্গরা	৬	বিবড়দা	আষাঢ়	রথযাত্রা	…	১ দিন	১,০০০
‡২৬৬	”	”	”	”	কার্তিক	কালীপূজা	…	১ দিন	১,০০০
‡২৬৭	”	”	”	”	চৈত্র	গাজন	…	৪ দিন	১,০০০
‡২৬৮	”	”	১১	খালগ্রাম	বৈশাখ	গাজন	২০০ বৎসর	২ দিন	২,০০০
‡২৬৯	”	”	১২	কামারডিহা	শ্রাবণ	মনসাপূজা	…	১ দিন	৪০০-৫০০
‡২৭০	”	”	”	”	আশ্বিন	লক্ষ্মীপূজা	…	১ দিন	৪০০-৫০০
‡২৭১	”	”	২৮	হাড়মাসড়া	পৌষ	পৌষপার্বণ	…	১ দিন	৬,০০০
‡২৭২	”	”	৮১	তালডাঙ্গরা	মাঘ	নাগরদোলা	বহু প্রাচীন	১ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡২৭৩	”	”	৮৫	ফুলমতী	শ্রাবণ	মনসাপূজা	বহু প্রাচীন	১ দিন	৫০০
‡২৭৪	”	”	১০০	বাঁশকোপা	মাঘ	নাগরদোলা	১৫-১৬ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡২৭৫	”	”	১০৪	পাঁচমুড়া	বৈশাখ	গাজন	৩৫ বৎসর	১ দিন	২,০০০
‡২৭৬	”	”	”	”	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২০০ বৎসর	৪ দিন	২,০০০
‡২৭৭	”	”	”	”	মাঘ	মহোৎসব	১৫০ বৎসর	৪ দিন	২,০০০
‡২৭৮	”	”	”	”	ফাল্গুন	মহোৎসব	১৫০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
‡২৭৯	”	”	১৩৩	সোণাঝোড়	বৈশাখ	মহোৎসব	প্রাচীন	১ দিন	৫০০-৬০০
‡২৮০	”	”	”	”	শ্রাবণ	মনসাপূজা	…	১ দিন	৫০০-৬০০
‡২৮১	”	”	১৩৪	মুড়াকাটি	আষাঢ়	রথযাত্রা	…	৮ দিন	…

*২৮২	বাঁকুড়া	তালডাঙ্গরা	১৪০	সাবরাকোণ	মাঘ	রাম উৎসব	প্রাচীন	৩ দিন	৫,০০০-৮০০০
†২৮৩	„	বিষ্ণুপুর	১১	দ্বারিকা	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	…	৩ দিন	৩০০
†২৮৪	„	„	৩৫	বাসুদেবপুর	কার্তিক	কালীপূজা	…	২ দিন	৫০০
*২৮৫	„	„	৪২	তুড়কী-সীতারামপুর	চৈত্র	রামনবমী	…	…	৯,০০০-১০,০০০
‡২৮৬	„	„	৬১	মড়ার	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	বহু প্রাচীন	৪ দিন	৪০০-৫০০
‡২৮৭	„	„	„	„	…	মহরমের মেলা	…	৩ দিন	৪০০-৫০০
‡২৮৮	„	„	৭১	ছোট বাঁকাদহ	বৈশাখ	গাজন	২০০ বৎসর	২ দিন	১,৫০০
*২৮৯	„	„	৮১	চাঁচর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	বহু প্রাচীন	৪ দিন	২,০০০
‡২৯০	„	„	৯০	পচাডহরা	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	প্রাচীন	৩ দিন	৭০০
†২৯১	„	„	৯৯	জিয়াবান্দী	কার্তিক	কালীপূজা	…	২ দিন	৫০০
*২৯২	„	„	১০২	অযোধ্যা	জ্যৈষ্ঠ	দশহরা	৩০০ বৎসর	…	১০,০০০-১২,০০০
*২৯৩	„	„	„	„	কার্তিক	রাসযাত্রা	৩০০ বৎসর	৩-৭ দিন	১০,০০০-১২,০০০
‡২৯৪	„	„	১১২	জয়কৃষ্ণপুর	জ্যৈষ্ঠ	পঞ্চরাত্রি	…	৫-৬ দিন	২,০০০-৩,০০০
†২৯৫	„	„	১৩১	চুয়াসিনা	বৈশাখ	গাজন	…	২ দিন	২,৫০০
*২৯৬	„	„	১৩২	রাধানগর	জ্যৈষ্ঠ	গাজন	৩০০ বৎসর	৫ দিন	১৩,০০০
†২৯৭	„	„	১৩৪	জাম্বা	চৈত্র	বারুণী	…	৭ দিন	২,৫০০
†২৯৮	„	„	১৩৬	ডিহার	বৈশাখ	গাজন	…	২ দিন	১,৫০০
‡২৯৯	„	„	১৫৮	ভড়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	৩০০ বৎসর	২ দিন	২,০০০
†৩০০	„	„		ভরাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	…	১ দিন	৮০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
✝৩০১	বাঁকুড়া	বিষ্ণুপুর	১৪৮	ভড়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৪ দিন	৯০০
†৩০২	„	„	„	পানশোলী	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	২ দিন	১,০০০
✝৩০৩	„	„	„	পিয়ারডোবা	কার্তিক	কালীপূজা	...	২ দিন	৫০০
✝৩০৪	„	„	„	কেল্লা (বিষ্ণুপুর টাউন)	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	৭ দিন	১,৫০০
*৩০৫	„	„	„	„	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	...	১০,০০০-১২,০০০
‡৩০৬	„	জয়পুর	১৭	রাউৎখণ্ড	জ্যৈষ্ঠ	মনসাপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৪০০
✝৩০৭	„	„	২৪	ব্রজশোল	বৈশাখ	গাজন	...	২ দিন	৬,০০০
✝৩০৮	„	„	২৬	হেতিয়া	বৈশাখ	গাজন	...	২ দিন	৪,০০০
‡৩০৯	„	„	৩৪	রাজগ্রাম	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	২ দিন	...
‡৩১০	„	„	৩৫	সলদা	চৈত্র	রক্ষাকালীপূজা	১০০ বৎসর	৭ দিন	২,০০০-৪,০০০
‡৩১১	„	„	৩৬	জয়পুর	কার্তিক	রাসযাত্রা	১৫০ বৎসর	৫ দিন	৪,০০০
*৩১২	„	„	৪৩	গোকুলনগর	বৈশাখ	গাজন	...	৫ দিন	...
‡৩১৩	„	„	„	„	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	...	১৫,০০০-২০,০০০
‡৩১৪	„	„	৪৫	ফুটকরা (মৌজা : চামট)	জ্যৈষ্ঠ	মনসাপূজা	৫০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৩১৫	„	„	„	„	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	১৫০ বৎসর	৯ দিন	১,০০০
‡৩১৬	„	„	৪৬	দিঘপাড়	বৈশাখ	গাজন	২০০ বৎসর	৩-৪ দিন	২০০-৩০০
‡৩১৭	„	„	„	„	কার্তিক	কালীপূজা	৫০ বৎসর	১ দিন	২০০-৩০০
✝৩১৮	„	„	৪৮	কুচিয়াকোল	জ্যৈষ্ঠ	রক্ষাকালীপূজা	...	৩ দিন	৫,০০০
*৩১৯	„	„	„	„	আষাঢ়	রথযাত্রা	৫০০ বৎসর	২ দিন	১৫,০০০

‡৩২০	বাঁকুড়া	জয়পুর	৭৬	গোপালনগর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	২০০ বৎসর	৩ দিন	২০০-৩০০
‡৩২১	„	„	৮৪	শ্যামনগর	ফাল্গুন	মহোৎসব	১০০ বৎসর	২-৩ দিন	১,০০০
*৩২২	„	„	১১০	গেলিয়া	জ্যৈষ্ঠ	দশহরা	প্রাচীন	৬-৭ দিন	৫০০-৬০০
‡৩২৩	„	„	১১৩	দাসদিঘী	জ্যৈষ্ঠ	দশহরা	১০০ বৎসর	১ দিন	…
†৩২৪	„	„	১২০	ময়নাপুর	চৈত্র	হাকন্দ বারুণী	…	৩ দিন	৫,০০০
‡৩২৫	„	„	১২৭	উত্তরবাড়	আশ্বিন	ঝগড়াভঞ্জনীপূজা	৪০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
*৩২৬	„	„	১৩৫	দক্ষিণবাড়	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	৩ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡৩২৭	„	„	১৩৫	রোহিলাকোণ	জ্যৈষ্ঠ	দশহরা	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
‡৩২৮	„	„	„	„	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	প্রাচীন	২ দিন	১,০০০
†৩২৯	„	„		বৈতাল	বৈশাখ	গাজন	…	২ দিন	৪,০০০
*৩৩০	„	কোতুলপুর	৫৪	মির্জাপুর	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	৫ দিন	১,৫০০
‡৩৩১	„	„	„	„	জ্যৈষ্ঠ	দশহরা	প্রাচীন	২ দিন	১,৫০০
‡৩৩২	„	„	„	„	আষাঢ়	রথযাত্রা	১০০ বৎসর	৩ দিন	২,০০০
‡৩৩৩	„	„	„	„	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১০০ বৎসর	৫ দিন	২,০০০
†৩৩৪	„	„	৬৪	মদনমোহনপুর	কার্তিক	রাসযাত্রা	…	৫ দিন	৩০০
†৩৩৫	„	„	৭০	নপুকুর	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	…	১ দিন	২,০০০
*৩৩৬	„	„	৮৮	কোতুলপুর	কার্তিক	রাসযাত্রা	…	১৫ দিন	১,০০০
‡৩৩৭	„	„	৯১	কারকবেড়িয়া	বৈশাখ	গাজন	…	৩ দিন	২,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡৩৩৮	বাঁকুড়া	কোতুলপুর	১০০	সেহাস	আষাঢ়	রথযাত্রা	৩০০ বৎসর	৩ দিন	১,০০০
‡৩৩৯	„	„	„	„	মাঘ	মহোৎসব	...	৪ দিন	১,০০০
‡৩৪০	„	„	১০৩	বড়পুকুর (মৌজা : লাউগ্রাম)	জ্যৈষ্ঠ	মনসাপূজা	প্রাচীন	...	১,০০০
‡৩৪১	„	„	১২০	কোয়ালপাড়া	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	৭ দিন	৫০০
‡৩৪২	„	„	১৩২	দেশরা	আষাঢ়	রথযাত্রা	২৫০ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
‡৩৪৩	„	„	১৪৪	বালিঠা	জ্যৈষ্ঠ	দশহরা	...	৭ দিন	২,০০০
‡৩৪৪	„	„	„	„	মাঘ	মকরস্নান	২০০ বৎসর	৪ দিন	২,০০০
‡৩৪৫	„	„	১৪৫	লেগো	বৈশাখ	গাজন	১২৫ বৎসর	...	১,২০০০
‡৩৪৬	„	„	১৫০	রামডিহা	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	৩-৪ দিন	৫০০-৬০০
†৩৪৭	„	„	১৯৩	সিহর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	১,০০০
†৩৪৮	„	„	„	„	চৈত্র	চৈত্রসংক্রান্তি	...	২ দিন	৫০০
†৩৪৯	„	„		বালিখ্যা	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	...	১ দিন	২,০০০
†৩৫০	„	„		„	চৈত্র	চৈত্রসংক্রান্তি	...	৩ দিন	২,০০০
†৩৫১	„	„		মাপুরা	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	...	১ দিন	১০,০০০
†৩৫২	„	„		ছাতরা	অগ্রহায়ণ	রাবণকোড়া রথ	..	২ দিন	৩০০
‡৩৫৩	„	সোনামুখী	১৪	ধূলাই	বৈশাখ	গাজন	বহুপ্রাচীন	৩ দিন	৫০০
‡৩৫৪	„	„	১৭	বীরচন্দ্রপুর	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	প্রাচীন	...	১,০০০
*৩৫৫	„	„	৫১	পলশড়া	বৈশাখ	গাজন	১০০ বৎসর	৩ দিন	৩,০০০
*৩৫৬	„	„	৬৫	রামপুর	বৈশাখ	গাজন	৭০ বৎসর	৩ দিন	২,০০০

†৩৫৭	বাঁকুড়া	সোনামুখী	৮৫	সোনামুখী	বৈশাখ	মনোহরদাসের মেলা	...	৩ দিন	৫,০০০
†৩৫৮	”	”	১০৯	খয়েরবনী	চৈত্র	চৈত্রসংক্রান্তি	...	২ দিন	৩০০
*৩৫৯	”	”	১১০	নাহিরাবাঁধ মোহনপুর (মৌজা : রাধামোহনপুর)	মাঘ	বৌদ্ধজয়ন্তী	৩৭ বৎসর	১০ দিন	...
*৩৬০	”	”	১২৪	দারিয়াপুর	বৈশাখ	গাজন	৫০০ বৎসর	১০-১২ দিন	১,০০০
*৩৬১	”	”	১৫১	ধনসিমলা	বৈশাখ	গাজন	১০০ বৎসর	৩ দিন	২,৫০০
*৩৬২	”	”	১৬৪	পাচাল	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	৩ দিন	৫০০
*৩৬৩	”	”	১৮৫	নারায়ণসুন্দরী	জ্যৈষ্ঠ	মনসাপূজা	৩০০ বৎসর	২ দিন	৬০০-৭০০
†৩৬৪	”	”		নফরডাঙ্গা	বৈশাখ	গাজন	...	৩ দিন	২,০০০
*৩৬৫	”	পাত্রসায়র	২	দেউলপাড়া	বৈশাখ	গাজন	২০০ বৎসর	১ দিন	...
*৩৬৬	”	”	৭	নারায়ণপুর	বৈশাখ	গাজন	৩০০ বৎসর	৩ দিন	..
‡৩৬৭	”	”	৩৯	বেন্দা	পৌষ	মকরস্নান	২৫০ বৎসর	৭ দিন	২,০০০-৩,০০০
†৩৬৮	”	”	৪৭	কৃষ্ণনগর	মাঘ	কেন্দুলী মেলা	...	১ দিন	৫০০
†৩৬৯	”	”	৪৯	পাত্রসায়ের	বৈশাখ	গাজন	...	৩ দিন	১,৫০০
†৩৭০	”	”	৫৪	ডাল্লা	বৈশাখ	গাজন	...	১ দিন	৩০০
‡৩৭১	”	”	৫৯	বেলুট	মাঘ	সাধক হরনাথের আবির্ভাব	৩০ বৎসর	৩ দিন	১,০০০
*৩৭২	”	”	৬৪	শালখাড়া	চৈত্র	মাতঙ্গীপূজা	প্রাচীন	২ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡৩৭৩	”	”	৮০	সুখসাগর (মৌজা: পাটীত ডোমমহল)	আশ্বিন	যোগাভাপূজা	২৫ বৎসর	৮ দিন	৩,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
‡৩৭৪	বাঁকুড়া	পাত্রসায়র	৮৪	বালশী পূর্ব্বপাড়া	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	২ দিন	২,০০০
‡৩৭৫	„	„	„	„	মাঘ	রথযাত্রা	প্রাচীন	৫ দিন	২,০০০
‡৩৭৬	„	„	„	„	মাঘ	মকরসংক্রান্তি	প্রাচীন	১ দিন	২,০০০
‡৩৭৭	„	„	৯৮	জামকুড়ি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২০০ বৎসর	১২ দিন	৩,০০০
+৩৭৮	„	„	„	„	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	...	১ দিন	৫০০
*৩৭৯	„	„	১০৫	বীরসিংহ	জ্যৈষ্ঠ	গাজন	৭০০ বৎসর	৭ দিন	১,০০০
‡৩৮০	„	„	১১৪	সালনা	জ্যৈষ্ঠ	গাজন	৫০০ বৎসর	১৫ দিন	২,০০০
+৩৮১	„	„	১৫০	কুশদ্বীপ	বৈশাখ	গাজন	...	২ দিন	১,৫০০
+৩৮২	„	„	১৫৮	নাড়িচা	পৌষ	সর্বমঙ্গলা	...	২ দিন	১,৫০০০
+৩৮৩	„	„		মহেশপুর	পৌষ	মকরস্নান	...	১ দিন	১,০০০
+৩৮৪	„	„		বুলশী	বৈশাখ	গাজন	...	২ দিন	১,৫০০
+৩৮৫	„	„		সেহাপুর	জ্যৈষ্ঠ	মকরচণ্ডীপূজা	...	২ দিন	১,৫০০
‡৩৮৬	„	ইন্দাস	১	ভগিৎপুর	চৈত্র	ভগবতীপূজা	২৫০ বৎসর	১ দিন	১৫,০০০-১৬,০০০
*৩৮৭	„	„	৫	গোপালনগর	চৈত্র	গাজন	৫০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
‡৩৮৮	„	„	১৫	হরিপুর	পৌষ	বাঁকুড়ারায়ের মেলা (ধর্মরাজ)	৩০০ বৎসর	৬ দিন	৫,০০০-৬,০০০
+৩৮৯	„	„	৪০	কলাগ্রাম	বৈশাখ	গঙ্গাধর গাজন	...	২ দিন	৫০০
‡৩৯০	„	„	৪৬	চকসাপুর (মৌজাঃ সিমুলিয়া)	মাঘ	পীরের মেলা	প্রাচীন	৫ দিন	২০,০০০
+৩৯১	„	„	৫০	কেনেটী	ফাল্গুন	সন্তোষরাম মেলা	...	৬ দিন	৫০০
‡৩৯২	„	„	৫২	আমরুল	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	৭ দিন	১,০০০

✦৩৯৩	বাঁকুড়া	ইন্দাস	৫৩	আবদুলপুর	পৌষ	গুরুধাম শান্ত আশ্রম মেলা	...	৮ দিন	৩,০০০
‡৩৯৪	„	„	৫৪	করিশুণ্ডা	বৈশাখ	গাজন	...	৩-৪ দিন	৩০০-৪০০
†৩৯৫	„	„	৫৭	সাঁপুড়া	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	...	১ দিন	১,০০০
‡৩৯৬	„	„	৬৫	চারিগ্রাম	চৈত্র	শিবপূজা	বহু প্রাচীন	৯ দিন	৫০০
‡৩৯৭	„	„	৭০	বীর সিমুল	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	১ দিন	২,০০০
*৩৯৮	„	„	৭৫	শাশপুর	বৈশাখ	গাজন	প্রাচীন	৩ দিন	১০,০০০-১২,০০০
✦৩৯৯	„	„	১০৩	বেহার	জ্যৈষ্ঠ	কালুরায়ের গাজন	...	২ দিন	১,০০০
‡৪০০	„	„		ময়নাপুর	চৈত্র	বারুণী স্নান	...	৩ দিন	...
*৪০১	বীরভূম	মহম্মদবাজার	৫	ভাড়াকাটা (মৌজা : হরিদাসপুর)	কার্তিক	কালীপূজা	বহু প্রাচীন	১ দিন	২০০-৩০০
*৪০২	„	„	১৮	গণপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	১০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
*৪০৩	„	„	২৩	আলিনগর	মাঘ	চান্দপীরের উরস্	১২ বৎসর	৪ দিন	১,০০০
*৪০৪	„	„	২৫	দরকোটা	কার্তিক	গোষ্ঠাষ্টমী	৫০ বৎসর	৩ দিন	২,০০০
*৪০৫	„	„	২৬	দীঘলগ্রাম	আষাঢ়	রথযাত্রা	২০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
*৪০৬	„	„	„	„	মাঘ	ব্রহ্মদৈত্যপূজা	৩০০ বৎসর	২ দিন	১,০০০
✦৪০৭	„	„	৩৩	মকদুমনগর	...	মহরম	...	২ দিন	৫০০
*৪০৮	„	„	৩৮	হরিণসিঙ্গা	বৈশাখ	চড়ক	১০০ বৎসর	১ দিন	...
✦৪০৯	„	„	৪০	হিঙ্গলা	বৈশাখ	চড়ক	...	১ দিন	১,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

✦ কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡৪১০	বীরভূম	মহম্মদবাজার	৪৭	বলিহারপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
†৪১১	„	„	৫৩	ভিক্কুরপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	৫০০
†৪১২	„	„	৬৭	ডেউচা	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	৫০০
*৪১৩	„	„	৭০	উষ্‌কা	চৈত্র	বারুণীস্নান	প্রাচীন	১ দিন	...
†৪১৪	„	„	৭১	রঘুনাথপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	৪০০
†৪১৫	„	„	৭৬	রায়পুর	বৈশাখ	চড়ক	...	৪ দিন	১,০০০
†৪১৬	„	„	„	„	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	১ দিন	৫০০
‡৪১৭	„	„	১২১	মৌলপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡৪১৮	„	„	„	„	শ্রাবণ	মনসাপূজা	...	১ দিন	৫,০০০-৬০০০
‡৪১৯	„	„	„	„	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	১ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡৪২০	„	„	„	„	কার্তিক	কালীপূজা	...	১ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡৪২১	„	„	„	„	অগ্রহায়ণ	অন্নপূর্ণাপূজা	২০০ বৎসর	১ দিন	৫,০০০-৬,০০০
*৪২২	„	„	„	„	চৈত্র	মৌলেশ্বর শিবপূজা	২০০ বৎসর	৭ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡৪২৩	„	„	১৫৭	সুগুণপুর	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	৩ দিন	১,৫০০
‡৪২৪	„	সাঁইথিয়া	৩৮	ভালিয়ান	মাঘ	বৈরাগ্যচাঁদের স্মৃতি মহোৎসব	১০০ বৎসর	৩ দিন	১,০০০
‡৪২৫	„	„	১৩৯	বেলিয়া	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	১০০ বৎসর	৩ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৪২৬	„	„	„	„	আষাঢ়	”	১০০ বৎসর	৭ দিন	৮,০০০-১০,০০০
*৪২৭	„	দুবরাজপুর	৪২	বক্রেশ্বর	...	শিবরাত্রি	বহু প্রাচীন	...	...
*৪২৮	„	„	৫৮	মেটেলা	বৈশাখী	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	২ দিন	১০,০০০-১২,০০০
*৪২৯	„	„	৭৪	জামথলিয়া	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	৫০ বৎসর	১ দিন	১,০০০

†৪৩০	বীরভূম	দুবরাজপুর	১০০	বাঁধেরশোল	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	...	১ দিন	৫০০
†৪৩১	„	„	১১৯	চণ্ডীপুর	বৈশাখ	বৈশাখী পূর্ণিমা	...	১ দিন	৫০০
‡৪৩২	„	„	১২৯	উত্তরডাহা	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	১৫০ বৎসর	১ দিন	৩০০
†৪৩৩	„	„	১৪০	ইস্লামপুর	বৈশাখ	ফকিরসাহেবের মেলা	...	৩ দিন	১,০০০
†৪৩৪	„	„	„	„	চৈত্র	চৈত্রসংক্রান্তি	...	১ দিন	৫০০
*৪৩৫	„	„	১৪৩	হেতমপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	২,০০০-৩,০০০
*৪৩৬	„	„	„	„	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	৪-৫ দিন	২,০০০-৩,০০০
†৪৩৭	„	„	১৪৫	কেন্দুলা	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	...	২ দিন	৫০০
*৪৩৮	„	„	১৫৫	লোবা	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	৫০০
*৪৩৯	„	„	„	„	কার্তিক	কালীপূজা	...	২ দিন	১,০০০
*৪৪০	„	„	১৫৮	কোটা	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
‡৪৪১	„	„	১৬৪	বিরোরী	জ্যৈষ্ঠ	মনসাপূজা	২০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
†৪৪২	„	„	১৯১	সাহাপুর	বৈশাখ	বিবিধ	...	৭ দিন	১,০০০
*৪৪৩	„	„	১৯৩	সেলারপুর	চৈত্র	রামনবমী	সম্প্রতি	৪ দিন	...
†৪৪৪	„	„	১৯৫	কুইটা	...	মহরম	...	১ দিন	৫০০
†৪৪৫	„	„	২১০	বেলাহারী (মৌজা : সাজিনা)	...	দশহরা	...	১ দিন	১,০০০
†৪৪৬	„	„	২২৩	যাত্রা	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	...	৩ দিন	৩০০
‡৪৪৭	„	„	২৩৩	কল্যাণপুর	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	৩০০ বৎসর	৩-৭ দিন	৫,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
†৪৪৮	বীরভূম	দুবরাজপুর		খগেশ্বর	ফাল্গুন	শিবচতুর্দশী	...	৭ দিন	১০,০০০
†৪৪৯	"	"		কাভাং	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	...	৬ দিন	১,০০০
†৪৫০	"	ইলামবাজার	২২	মঙ্গলডিহি	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	৩ দিন	৫০০
†৪৫১	"	"	৩৬	গণ্টিয়া	বৈশাখ	ধর্মীয়	...	৫ দিন	৫০০
*৪৫২	"	"	৬৩	জয়দেব কেন্দুবিল্ব	পৌষ	পৌষসংক্রান্তির স্নানযাত্রা	প্রাচীন	১৫ দিন	৫০,০০০
‡৪৫৩	"	"	৯৪	গঙ্গাপুর	আশ্বিন	মনসাপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
*৪৫৪	"	"	৯৫	ইলামবাজার	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	প্রাচীন	৫ দিন	৫,০০০
†৪৫৫	"	"	১০৯	কাটনা	পৌষ	...	...	২ দিন	৫০০
‡৪৫৬	"	"	১১৬	পূর্ব্ব নারায়ণপুর	...	ধর্মরাজপূজা	২৫০ বৎসর	৩ দিন	...
†৪৫৭	"	"	১৩২	গোপালনগর	আষাঢ়	আষাঢ়ীপূর্ণিমা	...	১ দিন	৫০০
†৪৫৮	"	"		গুরিসা	জ্যৈষ্ঠ	...	...	১ দিন	৫০০
†৪৫৯	"	বোলপুর	২	গণড়া	জ্যৈষ্ঠ	...	...	২ দিন	৩০০
†৪৬০	"	"	৫	সিমুলিয়া	ফাল্গুন	...	...	৩ দিন	৩,০০০
*৪৬১	"	"	৮	সালন	মাঘ	সরস্বতীপূজা	১৫০ বৎসর	৩ দিন	...
*৪৬২	"	"	১৬	কসবা	মাঘ	ব্রহ্মদত্যিপূজা	প্রাচীন	...	...
*৪৬৩	"	"	৩৮	শ্রীচন্দ্রপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	বহু প্রাচীন	৪ দিন	...
*৪৬৪	"	"	৪৮	মনোহরপুর	মাঘ	ব্রহ্মচারীপূজা	৫০০ বৎসর	১ দিন	...
*৪৬৫	"	"	৬৫	গোয়ালপাড়া	চৈত্র	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	২ দিন	...
*৪৬৬	"	"	৭৩	কংকালীতলা (মৌজা : বেলুটিয়া)	চৈত্র	কংকালীদেবীর বাৎসরিক উৎসব	...	৩ দিন	৫,০০০

*৪৬৭	বীরভূম	বোলপুর	৯৬	লালদহা	ফাল্গুন	সারস্বত উৎসব	১৯৪৬ খৃঃ (আরম্ভকাল)	৬ দিন	১,০০০
‡৪৬৮	”	”	৯৯	বোলপুর	ফাল্গুন	বিবিধ মেলা	...	৩ দিন	৪০০-৫০০
*৪৬৯	”	”	”	”	পৌষ	সমাবর্তন উৎসব	১৩০১ সন (আরম্ভকাল)	৫-৬ দিন	১৫,০০০-২০,০০০
+৪৭০	”	”	১০২	সুরথেশ্বরতলা (মৌজা : শিবপুর)	ফাল্গুন	শিবচতুর্দশী	...	...	৩০০
*৪৭১	”	”	১০৪	শ্রীনিকেতন (মৌজা : সুরুল)	মাঘ	শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব	১৯২৩ খৃঃ (আরম্ভকাল)	৩ দিন	২০,০০০
*৪৭২	”	”	১০৭	দেউলী (মৌজা : পুরুষোত্তমপুর)	পৌষ	শিবপূজা	১০০ বৎসর	৩ দিন	১,০০০
+৪৭৩	”	”	১০৯	রাইপুর	জ্যৈষ্ঠ	...	...	৩ দিন	৩০০
+৪৭৪	”	”	১১৩	সুপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	৩০০
*৪৭৫	”	”	”	”	ফাল্গুন	শিবদুর্গাপূজা	প্রাচীন	৩ দিন	...
*৪৭৬	”	”	১২১	মুলুক	কার্তিক	গোষ্ঠাষ্টমী	২৫০ বৎসর	৭ দিন	১,০০০
+৪৭৭	”	”	১২৮	দ্বারকানাথপুর	ফাল্গুন	...	...	১ দিন	২০০
*৪৭৮	”	”	১২৯	শিয়ান	মাঘ	ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির স্মৃতি মহোৎসব	প্রাচীন	৩ দিন	১,০০০
*৪৭৯	”	”	১৪০	বাহিরী	মাঘ	গোপালঠাকুরের আবির্ভাব	প্রাচীন	৫ দিন	৩,০০০
+৪৮০	”	”	১৫৭	মহাদেবপুর	ফাল্গুন	...	...	৩ দিন	৩০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
+ কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
‡৪৮১	বীরভূম	বোলপুর	১৬১	নাহিনা	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	৩০০ বৎসর	১ দিন	…
‡৪৮২	”	”	১৬৩	সিঙ্গি	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	১৩৬২ সন (আরম্ভকাল)	৯ দিন	…
‡৪৮৩	”	”	”	”	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	…	৪-৫ দিন	…
*৪৮৪	”	লাভপুর	৪৫	রাখড়েশ্বর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	…	১ মাস	২,৫০০
*৪৮৫	”	”	৭৬	মহেশপুর	কার্তিক	কালীপূজা	প্রাচীন	১০ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৪৮৬	”	”	৯৮	কলগ্রাম	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	১০০ বৎসর	৪ দিন	৭০০
*৪৮৭	”	”	১০১	লাভপুর	মাঘ	ফুল্লরার মহাপূজা (অষ্টপ্রহর)	৭০ বৎসর	১০ দিন	৩,০০০-৪,০০০
†৪৮৮	”	”	১৩৪	ধনডাঙ্গা	বৈশাখ	…	…	২-৪ দিন	৪০০
‡৪৮৯	”	”	১৩৬	দাঁড়কা	চৈত্র	চড়ক	৩০ বৎসর	৭ দিন	…
†৪৯০	”	”	১৩৮	পূর্ব্বমহুলা	পয়লা মাঘ	গোঁসাই সন্ন্যাসীর আবির্ভাব	প্রাচীন	১৫ দিন	২,০০০
‡৪৯১	”	নান্নুর	১৫	দেবগ্রাম	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	১ দিন	৭০০-৮০০
†৪৯২	”	”	১৭	জুবুটিয়া	চৈত্র	শিবপূজা	…	১ মাস	৮,০০০
‡৪৯৩	”	”	২০	কীর্ণাহার	কার্তিক	গোষ্ঠাষ্টমী	১০০ বৎসর	৫ দিন	১,০০০
‡৪৯৪	”	”	৪৭	কজুল্লাপুর	চৈত্র	ধ্রুবানন্দ আবির্ভাব	…	৫ দিন	৬,০০০ ৭,০০০
‡৪৯৫	”	”	৬৯	বেলুটি (মৌজা: রয়ান)	মাঘ	সরস্বতীপূজা	২০০ বৎসর	৭ দিন	২,০০০
*৪৯৬	”	”	৫৪	চারকলগ্রাম	চৈত্র	রাধামাধবের বার্ষিকপূজা	১৫০ বৎসর	৩-৪ দিন	১,০০০

‡৪৯৭	বীরভূম	নান্নুর	৫৭	কুমিরা	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	২-৩ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡৪৯৮	”	”	”	”	শ্রাবণ	মনসাপূজা	প্রাচীন	১ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡৪৯৯	”	”	৫৯	সাওতা	শ্রাবণ	মনসাপূজা	২০০ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
‡৫০০	”	”	৬২	চিংগ্রাম	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	…
‡৫০১	”	”	৭০	পেঞা	শ্রাবণ	মনসাপূজা	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
‡৫০২	”	”	৮১	সেরান্দি	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	সম্প্রতি	২-৩ দিন	১,০০০
‡৫০৩	”	”	৮৪	কুলে	চৈত্র	গাজন	সম্প্রতি	৪ দিন	৪০০-৫০০
†৫০৪	”	”	১২৫	ব্রাহ্মণখণ্ড	চৈত্র	…	…	৩ দিন	৫০০
*৫০৫	”	”	১৩০	নবস্তা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	৩ দিন	১,৫০০
†৫০৬	”	ময়ূরেশ্বর	১৭	মুরলি	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	…	৩ দিন	৫০০
*৫০৭	”	”	২২	মল্লারপুর	চৈত্র-বৈশাখ	গাজন	৮০০ বৎসর	৫ দিন	কয়েক সহস্র
†৫০৮	”	”	২৬	ফতেপুর	প্রতি শনিবার	কালীপূজা	…	১ দিন	৪০০
†৫০৯	”	”	৫০	কামরা	মাঘ	…	…	৪ দিন	৩,০০০
‡৫১০	”	”	৮১	কুণ্ডলা	আষাঢ়	রথযাত্রা	৫০ বৎসর	১ দিন	…
†৫১১	”	”	৮৫	ঝিকাড্ডা (মৌজা : দড়ি হরকী)	চৈত্র	চৈত্রসংক্রান্তি	…	১ দিন	৬০০
†৫১২	”	”	১০২	কোটাসুর	বৈশাখ	…	…	৭ দিন	৪,০০০
‡৫১৩	”	”	১৫৮	ভাবুক	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	প্রাচীন	৮ দিন	…
‡৫১৪	”	”	১৬৪	বীরচন্দ্রপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	…	…

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়ীত্ব	জনসমাগম
+৫১৫	বীরভূম	ময়ূরেশ্বর	১৬৪	বীরচন্দ্রপুর	কার্তিক	গোষ্ঠযাত্রা	...	৬ দিন	৭০০
*৫১৬	”	”	২০৭	কলেশ্বর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	বহু প্রাচীন	১ মাস	বহু সংখ্যক
+৫১৭	”	”	২১৫	ঢেকা	মাঘ	ধর্মীয়	...	১ দিন	৫০০
+৫১৮	”	”	”	ফকিরথানা মেলা	মাঘ	...	...	৭ দিন	২,০০০
+৫১৯	”	”	”	আরাধনা মেলা	মাঘ	...	...	৩ দিন	৩,০০০
‡৫২০	”	রামপুরহাট	১৬	মণ্ডলা	মাঘ	মকর স্নান	বহু প্রাচীন	১৫ দিন	১৫,০০০
*৫২১	”	”	৪৬	গোপালপুর	মাঘ	মাঘীব্রত	প্রাচীন	১৫ দিন	..
‡৫২২	”	”	৪৮	তেলভাহা	ফাল্গুন	মহোৎসব	প্রাচীন	৩ দিন	...
*৫২৩	”	”	৬২	চণ্ডীপুর (তারাপীঠ)	আশ্বিন	তারামায়ের বার্ষিক উৎসব	...	৮ দিন	১,০০০
‡৫২৪	”	”	”	”	চৈত্র	বারুণী স্নান (তারামায়ের)	...	৬ দিন	১,০০০
+৫২৫	”	”	৬৪	উদয়পুর	কার্তিক	কালীপূজা	...	২ দিন	২,০০০
+৫২৬	”	”	”	”	...	কালীপূজা	...	১ দিন	৫০০
‡৫২৭	”	”	৮৯	আয়াস	মাঘ	মকর স্নান	...	৭ দিন	২,৫০০
‡৫২৮	”	”	১০১	ছিটাসপুর	মাঘ	কালীপূজা	২০ বৎসর	৩ দিন	১,৫০০
+৫২৯	”	”	১২৩	তারাপুর	চৈত্র	...	...	১ দিন	৪০০
+৫৩০	”	”	১৩৮	মাড়গ্রাম	পৌষ	কালীপূজা	...	১ দিন	৫০০
+৫৩১	”	”	১৫৮	কালুহা	বৈশাখ	বৈশাখী পূর্ণিমা	...	১ দিন	৫০০
*৫৩২	”	”	১৭৬	ভোষার	চৈত্র	বারুণী স্নান	প্রাচীন	১৫ দিন	২,০০০

†৫৩৩	বীরভূম	রামপুরহাট	১২৭	পোড়্ডা	বৈশাখ	বৈশাখী পূর্ণিমা	…	১ দিন	৫০০
†৫৩৪	„	নলহাটি	৫০	জগধারী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	…	৩ দিন	২০০
†৫৩৫	„	„	৫৩	নলহাটী	আষাঢ়	রথযাত্রা	…	১ দিন	২০০
*৫৩৬	„	„	„	„	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	…	১ দিন	…
‡৫৩৭	„	„	৬৭	মধুরা	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	বহু প্রাচীন	১ দিন	৫০০
‡৫৩৮	„	„	„	„	চৈত্র	শিবপূজা	বহু প্রাচীন	২ দিন	৫০০
*৫৩৯	„	„	৭৫	বর্‌লা	আষাঢ়	রথযাত্রা	১০০ বৎসর	২ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡৫৪০	„	„	„	„	চৈত্র	কালীপূজা	…	…	২,০০০-৩,০০০
†৫৪১	„	„	৭৬	আটগ্রাম	চৈত্র	কালীপূজা	…	৩ দিন	৩০০০
*৫৪২	„	„	৭৮	কুরুমগ্রাম	মাঘ	বুড়াশিবের মেলা	বহু প্রাচীন	৫-৬ দিন	৭০০-৮০০
‡৫৪৩	„	„	৮১	বুজুঙ্গ	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজপূজা	বহু প্রাচীন	৬ দিন	৩,০০০-৪,০০০
*৫৪৪	„	„	„	„	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	প্রাচীন	৫ দিন	…
‡৫৪৫	„	„	„	„	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	৭০০-৮০০
†৫৪৬	„	„	৯০	ভদ্রপুর	ফাল্গুন	শ্যামসুন্দরপূজা	…	৬ দিন	২,০০০
*৫৪৭	„	„	৯২	আকালিপুর	আশ্বিন	গুহ্যকালীপূজা	২০০ বৎসর	১০ দিন	…
‡৫৪৮	„	„	৯৮	কয়থা	চৈত্র	চড়ক	বহু প্রাচীন	১ দিন	২,০০০
‡৫৪৯	„	„	৯৯	বিলকান্দি	চৈত্র	কালীপূজা	৫০-৬০ বৎসর	২ দিন	৫,০০০
‡৫৫০	„	„	১০৩	গোঁসাইপুর	চৈত্র	চড়ক	…	১ দিন	৫০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জিলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
‡৫৫১	বীরভূম	নলহাটি	১০৭	বাজা	ফাল্গুন (প্রতি ৩ বৎসর অন্তর)	বড়পীরের ফতেহা উৎসব	বহু প্রাচীন	৮ দিন	১,০০০
†৫৫২	”	”	১১৭	লোহাপুর	চৈত্র	কালীপূজা	…	৭ দিন	১,০০০
‡৫৫৩	”	মুরারই	১৪	আতুয়া	কার্তিক	কার্তিকপূজা	৯০ বৎসর	২ দিন	৪০০-৫০০
‡৫৫৪	”	”	১৬	গোড়সা	আশ্বিন	লক্ষ্মীপূজা	১৫০ বৎসর	৩ দিন	…
*৫৫৫	”	”	৩১	রতনপুর	ফাল্গুন	শ্যামসুন্দর ঠাকুরের উৎসব	সম্প্রতি	১৫ দিন	…
‡৫৫৬	”	”	৫৮	সাঁথুলিয়া	চান্দ্রমাস	মহরম	বহু প্রাচীন	১ দিন	৭০০-৮০০
*৫৫৭	”	”	৭২	জাজিগ্রাম	কার্তিক	কালীপূজা	১০০ বৎসর	৩-৫ দিন	২,৫০০
‡৫৫৮	”	”	৯১	তীরগ্রাম	কার্তিক	কালীপূজা	সম্প্রতি	১ দিন	২০০-৩০০
‡৫৫৯	”	”	১০২	গোপালপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	বহু প্রাচীন	১ দিন	৫০০
‡৫৬০	”	”	১০৩	ভাদীশ্বর	আষাঢ়	রথযাত্রা	১৫ বৎসর	২ দিন	…
*৫৬১	”	”	১০৪	মুরারই	ফাল্গুন	শ্যামসুন্দরজীউয়ের পূজা	১০০ বৎসর	৮-১০ দিন	…
‡৫৬২	”	”	১০৯	কনকপুর	আষাঢ়	অপরাজিতাদেবীরপূজা	প্রাচীন	৪-৫ দিন	৫০০-৬০০
‡৫৬৩	”	”	১১৫	বাহাদুরপুর	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	৮-৯ বৎসর	৫ দিন	…
‡৫৬৪	”	”	১৩৭	রুদ্রনগর	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	১০০ বৎসর	৭-৮ দিন	…

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

পরিশিষ্ট খ

স্থানসূচী

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

(as on 7th October, 1972)

AGRA

1 National Book House, Jeoni Mandi (Reg.)
2 Wedhwa & Co., 45, Civil Lines (Reg.)
3 Banwari Lal Jain, Publishers, Moti Katra (Rest)
4 Asa Ram Baldev Dass & Sons, Bagh Muzaffarpur (Rest)

AHMEDABAD

1 Balgovind Booksellers, Gandhi Road (Rest)
2 Chandra Kant Chimanlal Vora, Gandhi Road (Reg.)
3 New Order Book Co., Gandhi Road, Ellis Bridge (Reg.)
4 Mahajan Bros., Super Market Basement, Ashram Road, Navrangpura (Rest)
5 Sastu Kitab Ghar, Near Relief Talkies, Patthar Kava Relief Road (Reg.)
6 Gujarat Law House, Near Municipal Swimming Bath (Rest)
7 Himanshu Book Co., 10, Mission Market, Near Gujarat College (Rest)

AHMEDNAGAR

1 V. T. Jorkar, Prop. Rama General Stores, Navi Path (Rest)

AJMER

1 Book Land, 663, Madar Gate (Reg.)
2 Rajputana Book House, Station Road (Reg.)

ALIGARH

1 Friend's Book House, Muslim University Market (Reg.)
2 New Kitab Ghar, Mill Market (Rest)

ALLAHABAD

1 Chandralok Prakashan, 73, Darbhanga Colony (Rest)
2 Kitabistan, 17-A, Kamla Nehru Road (Reg.)
3 Law Book Co., Sardar Patel Marg, P. Box 4 (Reg.)
4 Ram Narain Lal Beni Modho, 2-A, Katra Road (Reg.)
5 Universal Book Co., 20, M. G. Road (Reg.)
6 University Book Agency (of Lahore), Elgin Road (Reg.)
7 Bharat Law House, 15, Mahatma Gandhi Marg (Rest)
8 Ram Narain Lal Beni Prashad, 2-A, Katra Road (Rest)
9 S/s. A. H. Wheeler & Co. P. Ltd., City Book Shop (Rest)

AMBALA CANTT.

1 English Book Depot, Ambala Cantt. (Reg.)

AMBALA CITY

1 Sethi Law House, 8719, Railway Road, Ambala City (Reg.)

AMRITSAR

1 Law Book Agency, G. T. Road, Putligarh (Reg.)
2 The Booksellers Retreat, Hall Bazar (Reg.)
3 Amar Nath & Sons, Near P. O. Majith Mandi (Reg.)

ANAND

1 Vijaya Stores, Station Road (Rest)

BANGALORE

1 Atma Stores, 5th Cross Malleswaram (Rest)
2 S. S. Book Emporium, 118, Mount Joy Road, Hanumant Nagar (Reg.)
3 Bangalore Press, Lake View, Mysore Road, P. O. Box 507 (Reg.)
4 Standard Book Depot, Avenue Road (Reg.)
5 Vichara Sahitya Ltd., Balepet (Reg.)
6 Mukkala Pustak Press, Balamandira, Gandhinagar (Reg.)
7 International Book House (P) Ltd., 4-F, Mahatma Gandhi Road (Reg.)
8 Balajee Book Co., No. 2, East Tank Bank Road, Ramkrishnapura (Rest.)

BANSDRONI

1 S/s. Monoj Book Corner, B-20, Niranjan Pally, 24-Parganas (Rest)

BAREILLY

1 Agarwal Brothers, Bara Bazar (Reg.)

BARODA

1 Sh. Chandrakant Mohan Lal Shah Gaini, Shankar Bldg., Diwanji's Wada, Dandia Bazar (Rest)
2 New Medical Book House, 540, Madenzampa Road (Rest)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

BELGHARIA

1 Granthloka, 5/1, Ambica Mukherjee Road, 24-Parganas, W. B. (Rest)

BHAGALPUR

1 Paper Stationery Stores, D. N. Singh Road (Reg.)

BHOPAL

1 Bhopal Sahitya Sadan, Publishers, Booksellers & Stationers, 37, Lalwani Press Road (Rest)
2 Lyall Book Depot, Mohd. Din Bldg., Sultania Road (Reg.)

BHUBANESHWAR

1 Prabhat K. Mahapatra, Bhubaneshwar Marg (Reg.)

BHAVANAGAR

1 Shah Parsotam Dass Gigabhai, M. G. Road (Rest)

BOLPUR

1 Bolpur Pustakalaya, Rabindra Sarani, P. O. Bolpur, Birbhum, W.B. (Rest)

BIJAPUR

1 Sh. D. V. Deshpane, Recognised Law Booksellers, Prop. Vinod Book Depot, Near Shiralshetti Chowk (Rest)

BIKANER

1 Bhandari Bros., Goga Gate (Rest)

BOMBAY

1 Charles Lambert & Co., 101, Mahatma Gandhi Road (Reg.)
2 World Literature, Pyare Singh Chug House, Agra Road (Rest)
3 Current Book House, Maruti Lane, Raghunath Dadaji Street (Reg.)
4 Current Technical Literature Co. (P) Ltd., India House, 1st Floor (Reg.)
5 International Book House Ltd., 9, Ash Lane, M. G. Road (Reg.)
6 Lakhani Book Depot, Girgaum (Reg.)
7 P. P. H. Book Stall, 190-B, Khetwadi Main Road (Reg.)
8 New Book Co., 188-190, Dr. Dadabhai Naroji Road (Reg.)
9 Popular Book Depot, Lamington Road (Reg.)
10 Sunderdas Gain Chand, 601, Girgaum Road, Near Princess Street (Reg.)
11 Thacker & Co., Rampart Row (Reg.)
12 N. M. Tripathi (P.) Ltd., Princess Street (Reg.)
13 Kothari Book Depot, King Edward Road (Reg.)
14 C. Jamnadas & Co., Booksellers, 146-C, Princess Street (Reg.)
15 Indo Nath & Co., Office No. 8, 1st Floor, 257, Frase Road (Reg.)
16 Minerva Book Shop, 10, Kailash Darshan, 3rd Floor, Nava Chowk (Reg.)
17 Asian Trading Co., 310, The Miraballe, P. B. 1505 (Rest)
18 M. & J. Services, 2-A, Bahri Building, P. B. 6007 (Rest)
19 Swastik Sales Co., Scientific & Technical Booksellers (Rest)
20 All India Supply Co., 342, Kalbedevi Road (Rest)
21 Amalgamated Press, 41, Hamam Street (Rest)
22 Secretary, Salestax Practioner Association, Room No. 8, Palton Road (Rest)
23 Usha Book Depot, 585, Chira Bazar (Reg.)
24 Co-operators Book Depot, 5/32, Ahmed Sailor Bldg., Dadar (Reg.)
25 S. S. Taxation Publications, B/22, Sea Gull Appartment, 4-A, Bholabhai Desai Road (Rest)

CALCUTTA

1 Chatterjee & Co., 3/1, Becharam Chatterjee Lane (Reg.)
2 Dass Gupta & Co. Ltd., 54/3, College Street (Reg.)
3 Hindu Library, 69-A, Balaram De Street (Reg.)
4 S. K. Lahiri & Co., Ltd., College Street (Reg.)
5 M. C. Sarkar & Sons P. Ltd., 14, Bankim Chatterjee Street (Reg.)
6 W. Newman & Co. Ltd., 3, Old Court House Street (Reg.)
7 Oxford Book Stationery Co., 17, Park Street (Reg.)
8 R. Chambrary & Co. Ltd., Kant House, P-33, Misson Row Extension (Reg.)
9 S. C. Sarkar & Sons P. Ltd., 1C, College Square (Reg.)
10 Thacker Spink & Co. (1933) P. Ltd., 3, Esplanade East (Reg.)
11 Firma K. L. Mukhopadhya, 6-1A, Banchharam Akrur Lane (Reg.)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

12 K. K. Roy, 55, Gariahat Road, P. Box No. 10210 (Rest)
13 Sm. P. D. Upadhyay, 16, Munshi Sardaruddin Lane (Rest)
14 Universal Book Dist., 8/2, Hastings Street (Rest)
15 Modern Book Depot, 9, Chowringhee Centre (Rest)
16 S. Bhattacharjee & Co., 49, Dharamtalla Street (Rest)
17 Mukherjee Library, 1, Gopi Mohan Datta Lane (Rest)
18 Current Literature Co., 208, Mahatma Gandhi Road (Rest)
19 Scientific Book Agency, 103, Netaji Subhas Road (Rest)
20 Manimala, 123, Bow Bazar Street (Reg.)
21 New Script, 172/3, Rash Behari Avenue (Reg.)
22 Gyan Bharati, 171/A, M. G. Road (Reg.)
23 Indian Book Dist. Co., C-52, Mahatma Gandhi Road (Rest)
24 N. M. Roy Chowdhury Co. P. Ltd., 72, M. G. Road (Rest)
25 Manisha Granthalaya P. Ltd., 4/3 B, Bankim Chatterjee Street (Rest)
26 Mukta Dhara, 23, Gariahata Road, Gol Park (Rest)
27 Moonage Publishers, India Exchange Place (Rest)
28 Shanti Book Stores, Eagle House, 4, Govt. Place North (Rest)

CALICUT

1 Touring Book Stall, Court Road (Rest)

CHANDIGARH

1 Jain Law Agency, Shop No. 5, Sector No. 22 D (Reg.)
2 Rama News Agency, Booksellers, Sector No. 22 (Reg.)
3 Universal Book Store, Booth No. 25, Sector 22 D (Reg.)
4 English Book Shop, 34, Sector 22 D (Rest)
5 Mehta Bros., 1933, Sector 22 B (Reg.)

CUTTACK

1 Cuttack Law Times, Cuttack (Reg.)
2 D. P. Soor & Sons, Mangalabad (Rest)
3 New Students Store (Rest)

DEHRADUN

1 Jugal Kishore & Co., Rajpur Road (Reg.)
2 National News Agency, Paltan Bazar (Reg.)
3 Bishan Singh & Mahendra Pal Singh, 318, Chukhuwala (Reg.)
4 Sant Singh & Sons, 28, Rama Market (Rest)
5 Universal Book House, 39A, Rajpur Road (Rest)
6 Natraj Publishers, 52, Rajpur Road (Reg.)

DELHI

1 J. M. Jaina & Brothers, Mori Gate (Reg.)
2 Atma Ram & Sons, Kashmere Gate (Reg.)
3 Federal Law Book Depot, Kashmere Gate (Reg.)
4 Bahri Bros., 243, Lajpat Rai Market (Reg.)
5 Bawa Harkishan Dass Bedi (Vijaya General Agency Delhi), Ahata Kodara, Chamalian Road (Reg.)
6 Bookwells, 4, Sant Narankari Colony, P. B. 1565, Delhi-9 (Reg.)
7 Imperial Publishing Co., 3, Faiz Bazar, Daryaganj (Reg.)
8 Metropoliton Book Co., 1, Faiz Bazar (Reg.)
9 Publication Centre, Subzi Mandi, Opp. Birla Mills (Reg.)
10 Youngman & Co., Nai Sarak (Reg.)
11 Indian Army Book Depot, 3, Ansari Road, Daryaganj (Reg.)
12 All India Educational Supply Co., Sri Ram Bldg., Jawahar Nagar (Rest)
13 Dhanwant Medical & Law Book House, 1522, Lajpatrai Market (Reg.)
14 University Book House, 15, U. B. Bangalow Road, Jawahar Nagar (Rest)
15 Law Literature House, 2646, Balimaran (Rest)
16 Summer Bros., P. O. Birla Lines (Rest)
17 Universal Book & Stationery Co., 16, Netaji Subhas Marg (Reg.)
18 B. Nath & Bros., 3808, Charkawalan (Chowri Bazar) (Rest)
19 Amar Hind Book House, Nai Sarak (Rest)
20 Premier Book Co., Printers, Publishers & Bookseller, Nai Sarak (Reg.)
21 Universal Book Traders, 80, Gokhle Market (Reg.)
22 General Book Depot, 1691, Nai Sarak (Rest)
23 Oversees Book Agency, 3810, David Street, Daryaganj-9 (Reg.)
24 Saini Law Publishing Co., 1899, Chandni Chowk (Rest)
25 Sat Narain & Sons, 2, Shivaji Stadium, Jain Mandir Road, New Delhi (Reg.)
26 Kitab Mahal (Wholesale Division) P. Ltd., 28, Faiz Bazar (Reg.)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

27 Hindi Sahitya Sansar, 1547, Nai Sarak (Rest)
28 Munshi Ram Manohar Lal, Oriental Booksellers & Publishers, P.B. No. 1165, Nai Sarak (Rest)
29 K. L. Seth, Suppliers of Law, Commercial & Tech. Books, Shantinagar, Ganeshpura (Reg.)
30 Adrash Publicity Service, 5A/10, Ansari Road, Daryaganj (Rest)
31 Amir Book Depot, Nai Sarak (Rest)
32 Rajpal & Sons, Kashmere Gate (Rest)
33 Moti Lal Banarasi Dass, Bangalow Road, Jawahar Nagar (Reg.)
34 Sangam Book Depot, Main Market, Gupta Colony (Reg.)
35 Om Book Stall, Civil Court Compound (Reg.)
36 Ashoka Book Agency, 66-A, Kamala Nagar (Rest)
37 Educational Book Agency (India), 5-D, Kamalanagar (Rest)
38 D. K. Book Organisation, 74-D, Anand Nagar (Rest)

DHANBAD

1 New Sketch Press, Post Box 26 (Rest)

DHARWAR

1 Bharat Book Depot & Prakashan, Subhas Road (Rest)
2 Akalwadi Book Depot, Vijay Road (Rest)

ERNAKULAM

1 Pai & Co., Broadway (Rest)
2 South India Traders, C/o Constitutional Law Journal (Reg.)

FEROZEPUR CANTT.

1 English Book Depot, 78, Jhoke Road (Reg.)

GAYA

1 Sahitya Sadan, Gautam Budha Marg (Reg.)

GHAZIABAD

1 Jayana Book Agency, Outside S. D. Inter College, G. T. Road (Rest)
2 S. Gupta, 342, Ram Nagar (Reg.)

GOA

1 Singhal's Book House, P.O.B. No. 70, Near the Church (Rest)

GUNTUR

1 Book Lovers Private Ltd., Arnudelpet, Chowrasta (Reg.)

GURGAON

1 Prabhu Book Service, Nai Subzi Mandi (Rest)

GWALIOR

1 Tater Bros., Sarafe (Rest)
2 Loyal Book Depot, Patankar Bazar, Lashmar (Rest)
3 M. C. Daftari, Prop. M. B. Jain & Bros., Booksellers, Sarafa, Lashkar (Rest)
4 Anand Pustak Bhandar, M. L. B. Marg (Rest)
5 Grover Law House, Near High Court Gali (Rest)
6 Kitab Ghar, High Court Road (Reg.)
7 Adarsha Pustak Saadan, 5/26, Bhauka Bazar (Rest)

HARDWAR

1 Seva Kunj, Kanshal Bhawan, Brashampuri (Rest)

HATHARS

1 A. Jain Book Depot, Rohtak, Wala Nohra Agra Road (Rest)

HUBLI

1 Pervaje's Book House, Station Road (Reg.)

HYDERABAD

1 Bhasha Prakashan, 22-5-69 Gharkaman (Rest)
2 The Swaraj Book Depot, Lakdikapul (Reg.)
3 Booklovers Private Ltd., Kachiguda Chowrasta (Rest)
4 Labour Law Publications, 873, Sultan Bazar (Reg.)
5 Book Syndicate, Devka Mahal, Opp. Central Bank (Reg.)
6 Book Links Corporation, Narayanagoda (Reg.)

INDORE

1 Wadhwa & Co., 27, M. G. Road (Reg.)
2 Swarup Brothers, Khajuri Bazar (Reg.)
3 Madhya Pradesh Book Centre, 41, Ahilyapura (Rest)
4 Modern Book House, Shiv Vilas Palace (Rest)
5 Vinay Pustak Bhandar (Rest)

JAIPUR CITY

1 Raj Books & Subs. Agency, 16, Nehru Bazar (Rest)
2 Bharat Law House, Booksellers & Publishers, Opp. Prem Prakash Cinema (Reg.)
3 Vani Mandir, Sawami Mansing Highway (Reg.)
4 Popular Book Depot, Chaura Rasta (Reg.)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

5 Krishna Book Depot, Chaura Rastra (Rest)
6 Best Book Co., S. M. Highway (Rest)

JAMNAGAR

1 Swadeshi Vastu Bhandar, Ratnabai Masid Road (Reg.)

JAMSHEDPUR

1 Amar Kitab Ghar, Diagonal Road, P.B. No. 78 (Reg.)
2 Gupta Stores, Dhatkidith (Reg.)
3 Sanyal Bros., Booksellers & News Agents, 26, Main Road (Rest)

JHUNJHUNU (RAJ)

1 Shashi Kumar Sharat Chandra (Rest)

JODHPUR

1 Dwarka Das Rathi, Wholesale Books and News Agents (Reg.)
2 Kitab Ghar, Sojati Gate (Reg.)
3 Chopra Brothers, Tripolia Bazar (Reg.)
4 Rajasthan Law House, High Court Road (Rest)

JUBALPUR

1 Modern Book House, 286, Jawaharganj (Reg.)
2 Popular Book House, Near Omti P.O. (Rest)

JULLUNDER CITY

1 Hazoorina Bros., Mai Hiran Gate (Rest)
2 Jain General House, Bazar Bansanwala (Reg.)
3 University Publishers, Railway Road (Rest)
4 Law Book Depot, Adda Basti G. T. Road (Rest)

KANPUR

1 Advani & Co., P. Box 100, The Mall (Reg.)
2 Sahitya Niketan, Sharadhanand Park (Reg.)
3 Universal Book Stall, The Mall (Reg.)

KAPSAN

1 Pakashan Parasaran, 1/90, Namdhar Niwas, Azad Marg (Reg.)

KOLAPUR

1 Maharashtra Granth Bhandar, Mahadwar Road (Rest)

KUMTA

1 S. V. Kamat, Booksellers & Stationers (S. Kanara) (Reg.)

LUCKNOW

1 Balkrishna Book Co. Ltd., Hazratganj (Reg.)
2 British Book Depot, 84, Hazratganj (Reg.)
3 Ram Advani, Hazratganj, P.B. 154 (Reg.)
4 Universal Publishers (P) Ltd., Hazratganj (Reg.)
5 Eastern Book Co., 34, Lalbagh Road (Reg.)
6 Civil & Military Educational Stores, 106/B, Sadar Bazar (Rest)
7 Acquarium Supply Co., 213, Faizabad Road (Rest)

LUDHIANA

1 Lyall Book Depot, Chaura Bazar (Reg.)
2 Mohindra Brothers, Katchori Road (Rest)
3 Nanda Stationery Bhandar, Pustak Bazar (Rest)
4 The Pharmacy News, Pindi Street (Rest)

MADRAS

1 C. Sitaraman & Co., 33, Royapettach High Road (Reg.)
2 Account Test Institute, P.O. 760, Emgora (Reg.)
3 C. Subbiah Chetty, 62, Big Street, Triplicance (Reg.)
4 K. Krishnamurty, Post Box 384 (Reg.)
5 P. Vardhachary & Co., 8, Linghi Chetty Street (Reg.)
6 Reliance Trading Co., 79/10, Sambhu Das Street (Reg.)
7 M. Sachchalam & Co., 14, Bankuram Chetty Street (Rest)
8 Madras Book Agency (Rest)
9 Nav Bharat Agencies, 18, Andiappa Street, Sadhana Sadan (Rest)
10 The Rex Trading Co., P. B. 5049, 31 & 32, James Street (Rest)
11 Mohan Pathippagam & Book Depot., 3, Pyecrafts, Triplicance (Rest)
12 Naresh Co., 3, Dr. Rangachari Road, Mylapore (Rest)

MADURAI

1 Oriental Book House, 258, West Masi Street (Reg.)
2 Vivekananda Press, 48, West Masi Street (Reg.)

MANDSAUR

1 Nahta Bros., Booksellers & Stationers (Rest)

MANGALORE

1 U. R. Shaneye Sons, Car Street, P. Box 128 (Reg.)
2 K. Bhoga Rao & Co., Kodial Bail (Rest

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

MATHURA

1 Rath & Co., Tilohi Bldg., Bengali Ghat (Rest)

MEERUT

1 Prakash Educational Stores, Subhash Bazar (Reg.)
2 Loyal Book Depot, Chhipi Tank (Reg.)

MUSSOURI

1 Hind Traders, N. A. A. Centre, Dick Road (Rest)

MUZAFFARNAGAR

1 Gargya & Co., 139G, New Market (Rest)
2 B. S. Jain & Co., 71, Abupura (Reg.)

MUZAFFERPUR

1 Scientific & Educational Supply Syndicate (Rest)

MYSORE

1 H. Vankataramiah & Sons, Krishnaragendra Circle (Reg.)
2 People Book House, Opp. Jagan Mohan Palace (Reg.)
3 Geeta Book House, New State Circle (Reg.)
4 Indian Mercantile Corporation, Ramvilas (Rest)

NADIAD

1 R. S Desai, Station Road (Rest)

NAGPUR

1 Western Book Depot, Residency Road (Reg.)
2 The Executive Secretary, Mineral Industry Association, Mineral House, Near All India Radio Square (Rest)

NAINITAL

1 Consal Book Depot, Bara Bazar (Reg.)

NEW DELHI

1 Amrit Book Co., Connaught Circus (Reg.)
2 Bhawani & Sons, 8F, Connaughat Place (Reg.)
3 Central News Agency, 23/90, Connaughat Circus (Reg.)
4 Aapki Dukan, 5/5777, Dev Nagar (Reg.)
5 English Book Stores, 7-L, Connaught Circus, P. B. 328 (Reg.)
6 Subhas Book Depot, Shop No. 111, Central Market, Srinivaspuri (Rest)
7 Jain Book Agency, C-9, Prem House, Connaught Place (Reg.)
8 Oxford Book & Stationery Co., Scindia House (Reg.)
9 Ram Krishna & Sons (of Lahore) 16/B, Connaught Place (Reg.)
10 N. C. Kaunchal & Co., 40, Model Basti, P. O. Karol Bagh, New Delhi-5 (Rest.)
11 Suneja Book Centre, 24/90. Connaught Circus (Reg.)
12 United Book Agency, 31, Municipal Market, Connaught Circus (Reg.)
13 Jayana Book Depot, P. B. 2505, Karol Bagh (Reg.)
14 Navyug Traders. Desh Bandhu Gupta Road, Dev Nagar (Reg.)
15 Ravindra Book Agency, 4D/50, Double Storey, Lajpat Nagar (Reg.)
16 The Secretary, Indian Met. Society, Lodi Road (Reg.)
17 New Book Depot, Latest Books, Periodicals, Stationery, P.B. 96, Connaught Place (Reg.)
18 Mehra Brothers, 50-G, Kalkaji, New Delhi-19 (Reg.)
19 Luxmi Book Stores, 72, Janpath, P. Box 553 (Reg.)
20 Hindi Book House, 82, Janpath (Reg.)
21 People's Publishing House (P) Ltd., Ranijhansi Road (Reg.)
22 R. K. Publishers, 23, Beadonpura, Karol Bagh (Reg.)
23 Sharma Bros., 17, New Market, Moti Nagar (Reg.)
24 Glob Publications, C-33, Nizamudin East (Rest)
25 Scientific Instruments Stores, A-355, New Rajendra Nagar (Rest)
26 Shyam Pustak Bhandar, 3819, Arya Smaj Road (Rest)
27 The Secretary, Federation of Association of Small Industry of India, 23/B/2, Rohtak Road (Rest)
28 Standard Booksellers & Stationers, Palam Enclave (Rest)
29 Lakshmi Book Depot, 57, Ragarpura, Karol Bagh (Rest)
30 Santi Ram, Booksellers, 16, New Municipal Market, Lodi Colony (Rest)
31 Jain Map & Book Agency, Karol Bagh (Rest)
32 Hukam Chand & Sons, 32226, Ranjit Nagar (Rest)
33 Star Publications (P) Ltd., 4/5 B, Asaf Ali Road (Rest)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

34 Indian Publications Trading Corporation, A-7, Nizamuddin East (Rest)
35 Sheel Trading Corporation, 5/5777, Sant Nari Das Marg (Rest)

NILGIRIS

1 Mary Martin Booksellers, Kotagiris, Madras States (Rest)

PATIALA

1 Jain & Co., 17, Shah Nashin Bazar (Reg.)

PATNA

1 To-day & To-morrow, Ashok Raipath (Rest)
2 J. N. P. Agarwal & Co., Padri-ki-Haveli (Reg.)
3 Luxmi Trading Co., Padri-ki-Haveli (Reg.)
4 Moti Lal Banarsi Dass & Co., Padri-ki-Haveli (Reg.)

PONDICHERRY

1 Honesty Book House, 9, Rue Duplix (Rest)

POONA

1 Deccan Book Stall, Deccan Gymkhana (Reg.)
2 Imperial Book Depot, 266, M. G. Road (Reg.)
3 International Book Service, Deccan Gymkhana (Reg.)
4 Raka Book Agency, Opp. Natu's Chawl, Near Appa Balwant Chowk (Reg.)
5 Sarswat, 67, Patel Flats, 2 Bombay Poona Road (Rest)
6 Secy. Bharati Itihasa Samshodhalla Mandir, 1321, Sadashiv Path (Rest)

PUDUKKOTTAI

1 Sh. P. N. Swaminathan Shivam & Co., East Main Road (Rest)
2 Meenakashi Pattippagam, 4142, East Main Street (Rest)

PUNALUR

1 Shri M. J. Abraham, Kerala (Rest)

RAJPUR

1 Pustak Pratisthan, Sati Bazar (Rest)

RAIKOT

1 Mohan Lal Dossbhai Shah, Booksellers & Subs & Advt. Agent (Reg.)

RANCHI

1 Crown Book Depot, Upper Bazar (Reg.)

REWARI

1 Tika Ram Singh Lal (Rest)

SAUGAR

1 Yadav Book Stall, Publishers & Booksellers (Rest)

SECONDERABAD

1 Hindustan Diary Publishers, Market Street (Rest)

SIMLA

1 Minerva Book Shop, The Mall (Reg.)

SIVAKASI

1 Ganesh Stores, South Car Street (Rest)

SURAT

1 Shri Gajanan Pustakalaya, Tower Road (Reg.)
2 Gujarat Subs. Agency, Jawahar Lal Nehru Marg, Athwa Lines (Rest)

TEZPUR

1 Jyoti Prakshan Bhawan, Tezpur, Assam (Rest)

TIRUPATI

1 Ravinder Book Centre, 204, Bazar Street (Rest)

TRICHINOPOLLY

1 S. Krishnaswami & Co., 35, Subhash Chandra Bose Road (Rest)

TRIPURA

1 G. R. Dutta & Co., Scientific Equipments Suppliers (Rest)

TRIVANDRUM

1 International Book Depot, Main Road (Reg.)
2 Reddiar Press & Book Depot, P. B. No. 4 (Rest)
3 Bhagya Enterprises, M. G. Road (Rest)

TUTICORIN

1 Shri K. Thiagarajan, 51, French Chapai Road (Rest)

UDAIPUR

1 Ashutosh & Co., Station Road, Opp. University of Udaipur (Rest)
2 Book Centre, Maharana Bhopal College, Consumers Co-operative Society Ltd. (Rest)
3 Jagadish & Co. (Rest)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

UJJAIN

1 Rami Bros, 41, Mallipura (Rest)

VARANASI

1 Viswavidlyalaya Prakashan, K40/18, Bhairo Nath Marg (Reg.)
2 Chowkhamba Sanskrit Saries Office, Gopal Mandir Lane, P.B. No. 8 (Reg.)
3 Glob Book Centre, P. O. Hindu University (Rest)
4 Kohinoor Stores, University Road, Lanka (Reg.)
5 The Managar, Banaras Hindu University Book Depot (Reg.)

VELLORE

1 A. Venkatasubban, Law Booksellers (Reg.)

VZEGAPATAM

1 Gupta Brothers, Vizia Building (Reg.)
2 The Secretary., Andhra University General Co-operative Stores (Rest)

WARDHA

1 Swarajeya Bhandar, Rathi Market (Reg.)

For Local Sale

1 Govt. of India Kitab Mahal, Janpath, Opp. India Coffee House, New Delhi, Phone No. 312561
2 Govt. of India Book Depot, 8, Hastings Street, Calcutta, Phone No. 23-3813
3 High Commissioner for Indian in London, India House, London W.C. 2
4 Sales Counter Publication Branch, Udyag Bhawan, New Delhi, Phone No. 372081
5 Sales Counter Publication Branch C. B. R. Building, New Delhi
6 Sales Counter, Mohan Singh Market. I. N. A. Colony, New Delhi

S. & R. Agents as on 31. 3. 72

1 The Asstt. Director, Extension Centre, Bhuli Road, Dhanbad
2 The Asstt. Director, Extension Centre, Santnagar, Hyderabad-18
3 The Asstt. Director, Govt. of India, S.I.S.I. Ministry of C & I Extension Centre, Kapileshwar Road, Belgaum
4 The Asstt. Director, Extension Centre, Krishna Distt. (A.I.)
5 The Asstt. Director, Footwear, Extension Centre, Polo Ground No. 1, Jodhpur
6 The Asstt. Director, Industrial Extension Centre, Nadiad (Gujarat)
7 The Development Commissioner, Small Scale Industries, Udyog Bhawan, New Delhi
8 The Dy. Director, Incharge, S.I.S.I. C/o Chief Civil Admn., Goa, Panjim
9 The Director, Govt. Press, Hyderabad
10 The Director, Indian Bureau of Mines, Govt. of India, Ministry of Steel Mines & Fuel, Nagpur
11 The Director, S.I.S.I. Industrial Extension Centre, Udhna, Surat
12 The Employment Officer, Employment Exchange, Dhar, Madhya Pradesh
13 Do Gopal Bhavan, Morena
14 Do Jhabue
15 The Head Clerk, Govt. Book Depot, Ahmedabad
16 The Head Clerk, Photozincographic Press, 5, Finance Road, Poona
17 The Officer-in-Charge, Assam, Govt. B. D., Shillong
18 The O.I/C., Extension Centre, Club Road, Muzaffarpur
19 The O.I/C., Extension Centre, Industrial Estate, Kokar, Ranchi
20 The O.I/C., State Information Centre, Hyderabad
21 The O.I/C., S.I.S.I Extension Centre, Malda
22 The O.I/C., S.I.S.I., Habra, Tabaluria, 24-Parganas
23 The O.I/C., University Employment Bureau, Lucknow
24 The O.I./C., S.I.S.I. Chrontanning Extension Centre, Tangra, 33/1, North Topsia Road, Calcutta-46
25 The O.I./C., S.I.S.I., Extension Centre (Footwear), Calcutta-2
26 The O.I./C., S.I.S.I., Model Carpentry Workshop, Puyali Nagar, P. O. Buripur, 24-Parganas
27 Publication Division, Sales Depot, North Block, New Delhi
28 The Press Officer, Orissa Sectt., Cuttack
29 The Registrar of Companies, Andhra Bank Bldg., 6, Linghi Chetty Street, P.B. 1530, Madras
30 The Registrar of Companies, Assam, Manipur and Tripura, Shillong

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

31 The Registrar of Companies, Bihar, Journal Road, Patna-1
32 The Registrar of Companies, 162, Brigade Road, Bangalore
33 The Registrar of Companies, Everest, 100, Marine Drive, Bombay
34 The Registrar of Companies, Gujarat, State Samachar Building, Ahmedabad
35 The Registrar of Companies, Gwalior (M.P.)
36 The Registrar of Companies. H. No. 3-5-87, Hyder Guda, Hyderabad
37 The Registrar of Companies, Kerala, 70, Feet Road, Ernakulam
38 The Registrar of Companies, M. G. Road, West Cott. Bldg., P. B. 334, Kanpur
39 The Registrar of Companies, Narayani Bldg., Brabourne Road, Calcutta-1
40 The Registrar of Companies, Orissa, Chandni Chouk, Cuttack
41 The Registrar of Companies, Pondicherry
42 The Registrar of Companies, Punjab & Himachal Pradesh, Link Road, Jullundur City
43 The Registrar of Companies, Rajasthan & Ajmer, Sh. Kunta Prasad House, Ist Floor, 'C' Scheme, Ashok Marg, Jaipur
44 The Registrar of Companies, Sunlight Insurance Bldg., Ajmeri Gate Extension, New Delhi
45 The Registrar of Trade Unions, Kanpur
46 Soochna Sahita Depot, (State Book Depot) Lucknow
47 Supdt. Bhupendra State Press, Patiala
48 Supdt. Govt. Press & Book Depot, Nagpur
49 Supdt. Govt. Press, Mount Road, Madras
50 Supdt. Govt. State Stores and Pubs., P.O. Gulzenbagh, Patna
51 Supdt. Govt. Printing & Stationery Depot, Rajasthan, Jaipur City
52 Supdt. Govt. Printing & Stationery, Rajkot
53 Supdt. Govt. Printing & Stationery, Punjab, Chandigarh
54 Supdt. Govt. State Emporium, V. P. Rewa
55 Dy. Controller Printing. & Stationery Office, Himachal Pradesh, Simla
56 Supdt. Printing & Stationery, Allahabad, U.P.
57 Supdt. Printing & Stationery, Gwalior, Madhya Pradesh
58 Supdt. Printing & Stationery, Charni Road, Bombay
59 Supdt. State Govt. Press, Bhopal
60 The Asstt. Director, Publicity & Information, Vidhan Sandha, Bangalore-1
61 Supdt. Govt. Press, Trivandrum
62 Asstt. Information Officer, Press Information Bureau, Information Centre, Srinagar
63 Chief Controller of Imports & Exports, Panjim, Goa
64 Employment Officer, Employment Exchange. (Near Bus stop) Sidhi (M.P.)
65 The Director, Regional Meteorological Centre, Alipur, Calcutta
66 The Asstt. Director, State Information Centre, Hubli
67 The Director of Supplies and Disposal Deptt. of Supply, 10, Mount Road, Madras-2
68 Director General of Supplies and Disposals, N. I. C. Bldg., New Delhi
69 The Controller of Imports & Exports, Rajkot
70 The Inspector, Dock Safety, M I & E Madras Harbour, Madras-1
71 The Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, Kerala, Ernakulam
72 The Under Secretary, Rajya Sabha Sectt., Parliament House, New Delhi
73 Controller of Imports & Exports, 7, Portland Park, Visakhapatnam
74 The Senior Inspector, Dock Safety, Botwwalla Chambers, Sir P. M. Road, Bombay
75 Controller of Imports & Exports, I. B. 14-P, Pondicherry
76 Dy. Director Incharge, S. I. S. I., Sahakar Bhavan, Trikon Bagicha, Rajkot
77 The Publicity and Liaison Officer, Forest Research Institute & Colleges, Near Forest, P. O. Dehradun
78 The Asstt. Controller of Imports and Exports, Govt. of India, Ministry of Commerce, New Kandla
79 The Dy. Director General (S. D.), 6, Esplanade East, Calcutta
80 The Director, Govt. of India, S. I. S. I. Ministry of I & S Industrial Areas—B, Ludhiana
81 The Govt. Epigraphist for India
82 The Asstt. Director, Incharge, S. I. S. I. Extension Centre, Varansi
83 The Director of Supplies. Swarup Nagar, Kanpur
84 The Asstt. Director (Admn.), Office of the Dte. of Supplies & Disposal, Bombay

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

85 The Chief Controller of Imports & Exports, Ministry of International Trade, Madras
86 The Dy. Collector of Customs, Custom House, Visakhapatnam
87 The Principal Officer, Merantile Marine Department, Calcutta
88 The Director, I/C, S.I.S.I., 107, Industrial Estate, Kanpur
89 The Director, S.I.S.I., Karan Nagar, Srinagar
90 The Director of Inspection, New Marine Lines, Bombay-1
91 The Dy. Chief Controller of Imports & Exports, T. D. Road, Ernakulam
92 The Asstt. Director, Govt. Stationery & Book Depot, Aurangabad
93 The Asstt. Director I/C, S.I.S.I., Club Road, Hubli
94 The Employment Officer, Talcher
95 The Director of Inspection, Dte. of G. & S Disposal, 1, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-1
96 The Collector of Customs, New Custom House, Bombay
97 The Controller of Imports & Exports, Bangalore
98 The Admn. Officer, Tariffic Commissioner, 10!, Queen's Road, Bombay
99 The Commissioner of Income Tax, Patiala
100 The Director, Ministry of I & Supply, (Deptt. of Industry) Cuttack
101 The Dy. Director of Public Relations, State Information Centre, Patna
102 The Officer-in-charge, State Information Centre, Madras
103 The Asstt. Director, S.I.S.I., M.I. Road, Jaipur
104 The Collector of Customs, Madras
105 National Building Org., Nirman Bhavan, New Delhi
106 The Controller of Communication, Bombay Region, Bombay
107 The Karnatak University, Dharwar
108 The Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar
109 The Principal Publications Officer sending commission for Scientific & Tech., Terminology, UGC, Building, New Delhi
110 The Officer-in-Charge, Information Centre, Swai Ram Singh Road, Jaipur
111 The Director General of Civil Aviation, New Delhi
112 Controller of Aerodrumes, Delhi
113 Do Calcutta
114 Do Bombay
115 Do Madras
116 The Registrar, Punjab Agrl. University, Ludhiana
117 The Land & Development Officer, M. Of Health Family Planning, W.H. & U.D., Nirman Bhava n, New Delhi
118 Acting Secretary, Official Language (Leg.) Commission, Ministary of Law, Bhagwan Dass Road, New Delhi
119 The Director of Industries & Commerce, Bangalore-1
120 The Registrar General, India, 2/A, Mansingh Road, New Delhi-11
121 The Director of Census Operations, Manipur, Imphal
122 Do West Bengal, 20, British Indian Street, 10th floor, Calcutta-1, Phone 23-8533
123 Do Andhra Pradesh, 11. 4. 646, Khushro Manzil, A. C. Guards, Hyderabad-4
124 Do A. & N. Islands, Port Blair
125 Do Bihar, Boring Canal Road, Patna
126 Do Madhya Pradesh, Opp. Vidya Vihar P. O., Civil Lines, Bhopal-2
127 Do Tripura, 14/1, Krishnannagar, Agartala
128 Do Nagaland, Kohima
129 Do Mysore, 23, Basappa Cross Road, Shanthinagar, Bangalore-1
130 Do Himachal Pradesh, Boswel, Simla-5
131 Do Goa, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli, Navelkar Building, 2nd floor, Dr. A. Broker Road, Panaji-403001
133 Do Punjab, No. 72, Sector-5B, Chandigarh
134 Do Tamilnadu, 10, Poes Garden, Madras-6
134 Do Gujarat, Kerawala Building, Ellis Bridge, Ahmedabad-6
135 Do Delhi, 2 Under Hill Road, Delhi-6
136 Do Arunachal Pradesh, Laithumkharah, Shillong-793003
137 Do Assam, Bomfyle Road, Shillong-1
138 Do Haryana, Kothi No. 1, Sector 10-A, Chandigarh
139 Do Jammu & Kashmir, 19, Karan Nagar, Srinagar-190010
140 Do Kerala, Bella Vista, Kowdiar, Trivandrum-3
141 Do Maharashtra, Sprott Road, Bombay-400001
142 Do Meghalaya, Nongrim Hills, Shillong-3
143 Do Orissa, Chandni Chouk, Cuttack-2
144 Do Rajasthan, Rambagh Palace Annexe, Sawai Ram Singh Road, Jaipur

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

145 The Director of Census Operations, Uttar Pradesh, 6, Park Road, Lucknow-1
146 Do Chandigarh, Kothi No. 1012, Sector, 8-C, Chandigarh-160018
147 Do L. M. & A. Islands, Kavaratti, Calicut
148 Do Pondicherry, 10, Poes Garden, Madras-6

RAILWAY BOOK STALL HOLDERS

1 S/s. A. H. Wheeler & Co., 15, Elgin Road, Allahabad
2. S/s. Higginbothams & Co. Ltd., Mount Road, Madras
3 S/s. Gahlot Bros,. K. E. M. Road, Bikaner

FOREIGN

1 S/s. Education Enterprise Private Ltd., Kathmundu (Nepal)
2 S/s. Aktiebologat, C. E. Fritzes Kungal. Hovbokhandel, Fredsgation-2 Box 1656, Stockholm-16 (Sweden)
3 Reise-und-Ver Kehrsverlage Stutt Gait.. Post 730 Gutenleergstrelee 21, Stuttgort Nr. 11245 Stuttgart, den (Germany West)
4 S/s. Book Centre, Lakshmi Mansion, 49, The Mall, Lahore (Pakistan)
5 S/s. Drghi Ranchi International Booksellers, via Cavour, T-9-11, 35000 Padova (Italay)
6 S/s. Wepf & Co. Booksellers, English Deptt., Elsengasse 5 Basel (Switzerland)
7 Otto Harrassowitz, Buchhandiung Und Antiquarial, 6200 Wisesbaden, Taunustra (Germany)
8 S/s. A. Asher & Co., 386 Herengracht, Amsternam.C (Holland)
9 S/s. Swets & Zettlinger N. V., 471 & 487 Keizersgracht Amsterdam (Holland)
10 .M. G. Von Piere, Rechitract 62, Eindhoven (Holland)
11 Herbert Wilson Ltd., Booksellers & Sub-Agents, 161, Borough High Street, London S, E. I. (England)
12 H. K. Lowis & Co. Ltd., 136, Gower Street (London C. I.)
13 Buch Und Zettachrifren, M. B. H. I-IND Export, Grosso Und, Knnissionbuch Handling Internation Verlagsauslieferundenm, Humbarg (Germany)
14 S/s. Store Nordiske Videnskaboghandel, Remersgade 27 DK 1362 (Compenhagen K.)
15 The Ex-libris, Buchhandeisgellschaff, Harinnon Oswold & Co. K. G. Frankfurat/Main (Germany)
16 Dr. Ludwing Hantaschel Universitats-Buchhandlung, 34, Cottingen (Germany)
17 Otto Koeltz Antiquaiat, 624, Koenigsting/ Taunus, Rerrnwaldstr-6 (West Germany)
18 Asia Library Service, 1841, 69th Avenyes, California (U. S. A.)
19 Publishing and Distributing Co. Ltd., Mitre House, 177, Regent Street, (London W. I.)
20 Reise-U-Verkehrsverlag, 7, Stuttgart-Vaihingen, Posfaih-80-0830, Hosigwiesenstr-25 (Germany)
21 Arthur Probsthain Oriental Booksellers & Publisher, 41, Great Russel Street, (London W. C. I.)
22 Independent Publishing Co., 38, Kennington Lane, London S. E. II.
23 Inter Continental Marketing Corporation, Tokyo, (Japan)
24 Fritzer Kungl Havbokhondal AB, Stockholen-16 (Sweden)

পি. আর. জি. ১৬৩ (বি) (iv) (এম)
১,০০০

অগ্ন প্রেস, ৫১এ, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯, ভারত হইতে মুদ্রিত এবং দি কণ্ট্রোলার অব পাবলিকেশনস, সিভিল লাইনস, দিল্লী হইতে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত।

মূল্য : ১০ টা. ৫০ প. বা পা. ১.২৩ বা ৩ ড. ৭৮ সে.